ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

ঊনচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৫৮—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অপরাজিতা (কবিতা)—আশা গঙ্গোপাধ্যায় ... ২৯

আধুনিক ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলার ধারা (আলোচনা)

—শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ২৮৫

অহম্ (কবিতা)—শান্তশীল দাশ ... ৪৬৯

ইতালীয় পীঠস্থান (ভ্রমণ কাহিনী)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৩০৯

ইতিহাসের পটভূমিকায় পুরীর শ্রীক্ষেত্র (প্রবন্ধ)—

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪০২

উইলিয়ম কেরী হইতে মৃত্যুঞ্জয় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের

ইতিহাস (প্রবন্ধ)—শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী ... ৩৬১

উজানীর কবি (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ৬৪

উত্তরায়ণ (উপন্যাস)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৩০, ১[illegible] ২১০, ২৮৯, ৪০৭, ৪৬৪

ঋষি রাজনারায়ণ বসু (আলোচনা)—শ্রী[illegible]ভূষণ মিত্র ... ৩৯

একখানি কিশোর পত্রিকার কথা (প্রবন্ধ)

—অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ... ৪০৪

একাডেমির বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী (প্রবন্ধ)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ... ৪৭৪

এবার গাহিব আমি সুন্দরের জয়গান (কবিতা)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৫৮

ওলন্দাজের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৮২

কলিকাতার রাস্তাঘাট ও যানবাহন ([illegible])—

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ২৬

কানামাছি (চিত্র-নাট্য)—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]৬, ১০৬, ১৯৫, ২৭১, ৩৫৭, ৪৫৬

[illegible]রজনীতে (কবিতা)—সন্তোষকুমার অধিকারী ... ৫১৬

[illegible]তীরে অমরনাথ (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪, ৩০৬, ৩৭৭, ৪৮৩

[illegible]গার ও তাহার রাসায়নিক প্র[illegible]ধক (প্রবন্ধ)—

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস ... ৩৯১

[illegible]গ্রাম (কবিতা)—শ্রীকালি[illegible] রায় ... ২৪৯

[illegible]লা-ধূলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ৮২, ১৬৯, ২৬০, ৩৪৭, ৪৩৮, ৫১৭

[illegible]ন (কবিতা)—[illegible]মেন চৌধুরী ... ১৪১

গত এব (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ৪৪৮

গান—কথা : শ্রীগোপাল ভৌমিক : সুর ও স্বরলিপি :

শ্রীবুদ্ধদেব রায় ... ১৯৪

গ্রাম-ভারত (আলোচনা)—শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য ... [illegible]০৪

চম্পার হিন্দুসভ্যতা (প্রবন্ধ)—প্রণবকুমার সরকার ... [illegible]

চরণিকা (গল্প)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ... ৩০২

চাকরী ক্ষেত্র (গল্প)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ... ৩৯৮

চিকিৎসা বিভ্রাট (নাটিকা)—শ্রীমানিক ভট্টাচার্য ... [illegible]৪০

চিরায়ুষ্মান (কবিতা)—প্রভাময়ী মিত্র ... ১১৭

জীবন সন্ধ্যায় (কবিতা)—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৮[illegible]

জৈন আগম-সাহিত্য (প্রবন্ধ)—ডাঃ শ্রীনাথমল টাটিয়া ... ২৪৬

জ্যোতির্ময় (কবিতা)—শ্রীমেনকারাণী চন্দ্র ... ২৫৯

দিলওয়ারা মন্দিরের মিস্ত্রী (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ ... ৪৩১

দিব্য-জীবন বার্তা (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু ... ২৬৫

দি রেফিউজ ও তার প্রতিষ্ঠাতা (প্রবন্ধ)

—শ্রীনির্মলকুমার বিশ্বাস ... ৩[illegible]

দীনবন্ধু-সাহিত্যে হাস্যরস (প্রবন্ধ)—প্রভাকর ... ২৭৫

দুঃস্বপ্ন (গল্প)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৯৪, ৩৬৬,

দেশ-বিদেশ—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৫০, ১৪৬, ২৩০, ৩১৪, ৪১৩, ৫০৮.

ধাত্রীমণ্ডল (উপন্যাস)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৫, ১৬০, ২৪৪, ৩৩৬, ৪২৮, ৫.

নাদ ও সঙ্গীত (প্রবন্ধ)—

শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ... ৮৯

নিরুপমা দেবীর "দিদি" (সাহিত্য আলোচনা)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৭৯, ৪৬[illegible]

নিজেরে শুধাও (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...

নির্মোক (কবিতা)—দিবাকর সেনরায় ...

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে (ভ্রমণ কাহিনী)—

শ্রীসুষমা মিত্র ৩৬৯ ৪[illegible]

নীড় (কবিতা)—শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২২৯

নীড়হারা (কবিতা)—শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ... ২২৯

পঁচিশে বৈশাখ (কবিতা)—শ্রীপ্রমথরঞ্জন সেনগুপ্ত ... ৪২১

পাপবোধের উৎপত্তি ও উদ্ভব (প্রবন্ধ)—
শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায় ... ২৫০

পিতামহ (উপন্যাস)—বনফুল ৪৬, ১৪২, ২২২, ৩২৪, ৩৮৫, ৪৯১

প্রতীক্ষা (কবিতা)—নীরেন্দ্র গুপ্ত ... ১১২

প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র শিল্প ও তাহাদের বর্তমান সমস্যা (প্রবন্ধ)
—শ্রীস্বরাজকুমার চক্রবর্তী ... ৬৮

ফুলমণির বিয়ে (কথিকা)—শ্রীবীণা দে ... ৩০৩

বাংলা নাট্য সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা (প্রবন্ধ)—প্রভাকর ... ৩৪

বানপ্রস্থ (গল্প)—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য ... ৪৪৪

বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)—শ্রীজ্যোতির্ময় গোন ... ৬০

বাংলা দ্রুত শ্রুতিলিপি (প্রবন্ধ)—শ্রীজনরঞ্জন রায় ... ২১৫

বাঁশী (কবিতা)—শ্রীঅশ্বিনী পাল ... ২৪২

বার্গস (প্রবন্ধ)—শ্রীতারকচন্দ্র রায় ২০, ১১০,

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (জীবনী ও আলোচনা)—
শ্রীতারকচন্দ্র রায় ১৯০, ২৯৯, ৩৬৪

বাবলা-পত্র (গল্প)—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় ... ১৭০

বিত্রান্ত (গল্প)—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার ... ৫

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা (প্রবন্ধ)—শ্রীরমেশনাথ ভট্টাচার্য ... ৩৫৩

বিস্মৃত কিশোর (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ... ৪৭৮

বিলাতের হৃদপল্লী (ভ্রমণকাহিনী)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৯৭২

বিলাতের নির্বাচন (আলোচনা)—শ্রীমতী শান্তি বসু ... ১৫৬

বীজ সংগ্রহ (প্রবন্ধ)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৩২৮

বেহালা (অনুবাদ গল্প)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ... ১৩৪

বেঙ্গল কেমিক্যালের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তি (প্রবন্ধ)
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৪৯৫

ভক্তাবতার (প্রবন্ধ)—শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য ... ১৩৫

ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কংগ্রেস (প্রবন্ধ)—
সতীন্দ্রজীবন দাশগুপ্ত ... ১৫৯

ভাগবতীয় কৃষ্ণচরিত্র (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ১, ১০২, ১৮৬, ২৮৭, ৩৫৫,

ভারতের দাক্ষিণে (ভ্রমণ কাহিনী)—
শ্রীভূপতি চৌধুরী ১১, ১১৭, ২০৪, ২৯১,

ভেনিস (ভ্রমণ কাহিনী)—
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ১২৯, ২২৬

মধু ও স্বাস্থ্য (প্রবন্ধ)—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ... ৩৭৪

মর্মবাণী (কবিতা)—আশা গঙ্গোপাধ্যায় ... ৫১৬

মহাব্যোম (কবিতা)—বিনয়কৃষ্ণ রায় ... ৪৯০

মনের কথাটি (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ... ৭২

মুখোমুখ কৃষ্ণ (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ... ২৮২

মেঘ তুঙ্গ (জীবনী)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৬৩

[illegible] জাতি ও প্রকৃতি (প্রবন্ধ)—
শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৫

যুগতুলিকা (কবিতা)—আশা গঙ্গোপাধ্যায় ... ২০৯

[illegible] (প্রবন্ধ)—ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস ... ১২৭

[illegible] রক্তচাপের চিকিৎসা (প্রবন্ধ)—
[illegible] এন, মৈত্র ... ৪৬৩

[illegible] শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৪১

রবীন্দ্র কাব্যে জীবনাদর্শ (প্রবন্ধ)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ১৬০

রাইমণি (কবিতা)—সতীন্দ্রনাথ লাহা ... ৪১২

রামপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য (প্রবন্ধ)—
শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৪২

রিভিয়েরা সাগর বেলা (ভ্রমণ কাহিনী)—
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৩৯৩

শবরী (গল্প)—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৮০

শিক্ষার বোঝা (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ... ৩১২

শিল্পগুরু পুজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধানে (কবিতা)
—অসিতকুমার হালদার ... ৭৩

শুধাই তোমারে বন্ধু আমার (কবিতা)—
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ৩৭৬

শুদ্ধকল্যাণ—তেতালা (গান ও স্বরলিপি)—রচনা ॥
গীত-সম্রাট শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ স্বরলিপি—
শ্রীমতী [illegible] ভট্টাচার্য ... ১১১

শোক সংবাদ ... ৮২

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ৪২, ১৩৮, ৩২৯

শ্রীরামদাস বাবাজী (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৪০১

'সমুদ্র মন্থন' বিষয়ে দুটিকথা (আলোচনা)—
শ্রীঅমলেন্দু [illegible] ... ৭৯

সাজাহান (কবিতা)—সুধীর গুপ্ত ... ২৩

সাময়িকী ৭৭, ১৬৫, ২৫৪, ৩৩৯, ৪৩২, ৪৯৮

সাহিত্য সংবাদ ৮৮, ১৭৬, ২৬৪, ৩৫২, ৪৪০,

সাহিত্যে কলিকাতা (প্র-)—
অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৭

সাহিত্যের লক্ষণ ও উদ্দেশ্য (প্রবন্ধ)—ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী ... ১৭৭

সুয়েজ খাল (প্রবন্ধ)—শ্রীদিননাথ সেন ... ২৫০

সোভিয়েট দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)—
শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ২১৮, ৩৩০, ৪১২, ৪৭০

সৌরশক্তির সদ্ব্যবহার (প্রবন্ধ)—লেঃ কর্ণেল সুধীন্দ্রনাথ সিংহ ... ৪৪৯

হিন্দু প্রাণী বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)—শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল ... ৪৫৪

হারজিত (প্রবন্ধ)—শ্রীহরিহর শেঠ ... ৪৬২

চিত্র-সূচী-মাসানুক্রমিক

পৌষ—১৩৫৮…বহুবর্ণ চিত্র—'চাঁদনী রাতে' এবং এক রঙা চিত্র ৩৯ খানি

মাঘ— " " —'আচার্য অবনীন্দ্রনাথকে অর্ঘ্যদান' এবং এক রঙা চিত্র ২৫ খানি

ফাল্গুন— " " —'মহাত্মা গান্ধী' এবং এক রঙা চিত্র ২৭ খানি

চৈত্র— " " —'দ্রৌপদী' এবং এক রঙা চিত্র ২৫ খানি

বৈশাখ—১৩৫৯… " —'রাধা বিরহ' এবং এক রঙা চিত্র ২৯ খানি

জ্যৈষ্ঠ— " " —"রামু" এবং এক রঙা চিত্র ৩৫ খানি

পৌষ—১৩৫৮

দ্বিতীয় খণ্ড | উনচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

ভাগবতীয় কৃষ্ণচরিত্র

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

ভাগবতীয় কৃষ্ণকথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই কার্য্যের উপযোগী বয়স আমার হইয়াছে অর্থাৎ বৃদ্ধ হইয়াছি। অন্য অধিকার জন্মিয়াছে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। তবে "ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।" এই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভাগবত ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে আদিরসের একটু বাড়াবাড়ি আছে। এজন্য অনেকে শ্লেষ করিয়া বলিয়া থাকেন—এই আদি রসাত্মক বৈষ্ণব ধর্ম্মের জন্যই দেশটা উৎসন্ন গিয়াছে। ভাগবতের কৃষ্ণ বর্জন করিয়া মহাভারতের কৃষ্ণকে লইতে হইবে এরূপ বক্তৃতাও শুনিয়াছি। উড়িষ্যার এক মন্ত্রীও কিছুকাল হইল বলিয়াছিলেন চৈতন্য প্রভাবেই উড়িষ্যার যত কিছু ক্ষতি হইয়াছে। ইত্যাদি।

আদিরসের চর্চ্চাতেই দেশটা গোল্লায় গিয়াছে একথা অশ্রদ্ধেয়। পাশ্চাত্য বীর জাতিবৃন্দের মধ্যে আদিরসের চর্চ্চা কিছুমাত্র কম নহে। বলনাচ প্রভৃতি রাসলীলারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সাহিত্যে পর্য্যাপ্ত আদিরস। সিনেমা ও থিয়েটরেও তাই। পুরুষদিগের মধ্যে আদিরস উদ্দীপিত করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষা, যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও কামোদ্দীপক।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট উড়িয়াবাসী কত ঋণী তাহা তাহারা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। রামানন্দ রঘুনাথ প্রভৃতি শূদ্রদিগকে ধর্ম্মাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগের আত্মসম্মান ও হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু নিম্নজাতীয়দিগের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিস্তার করেন। বর্ত্তমান নব্য সমাজ সংস্কারকরা—যাঁহারা কিছু সমাজ সংস্কার কামনা করেন:অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহ বন্ধন ছেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্য বর্জন—ইত্যাদি

সকলই নিত্যানন্দ প্রভু ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব সমাজে চালাইয়াছিলেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতাবলম্বী ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় বিশেষত পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চ জাতীয়গণ উৎকট গোঁড়া পবিত্রতাবাদী (puritan) ছিলেন। তাহার ফলে তাহারা নিম্নজাতীয়গণকে এবং দোষাশ্রিত উচ্চ জাতীয়গণকে ক্রমাগত হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্করণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার পরিণামে তাহাদের বংশধরদিগকে দেশ-ভ্রষ্ট হইয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সক্রিয় জীবনের অধিকাংশ ভাগ উড়িষ্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। আজ ভারতের মধ্যে উড়িষ্যাই একমাত্র প্রদেশ যেখানে মুসলমান সমস্যা নাই।

বৈষ্ণব কবিদিগের—জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, রূপ গোস্বামী, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস—প্রভৃতির ধর্ম্মকবিতায় আদিরসের বাড়াবাড়ি আছে। ভাগবতেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে। ধর্ম্মের মধ্যে এ আদিরস কেন? এ কটাক্ষপাত অনেকেই করেন, বঙ্কিমও করিয়াছেন। ইহার উত্তর বৈষ্ণবদিগের—"যেন কেন উপায়েন কৃষ্ণে মন নিবেশয়েৎ"—যে কোনও উপায়ে কৃষ্ণে—ভগবানে মন নিবিষ্ট করিবে। স্বপ্নেশ্বরাচার্য্যের শাণ্ডিল্য সূত্র ভাষ্যে ঐ শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধর্ম্মে আদিরসের প্রয়োগের প্রধান যুক্তি বঙ্কিমের সময়ে উপস্থিত ছিল না। বর্ত্তমান কালের ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বে (Freudian Psychology) উহার স্বপক্ষের উত্তর মিলিতেছে। কাম প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল প্রবৃত্তি। উহার আত্যন্তিক দমন (Suppression) অনেক সময়ে উৎকট ফল প্রসব করে। যৌবনে নবদ্বীপে ললিতা সখীকে দেখিয়াছিলাম। পুরুষের স্ত্রীলোকের পোষাক ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তৎকালে বন্ধুবান্ধবদের সহিত যে একটু হাস্য তামাসা করি নাই তাহা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। পরে বৈষ্ণব সাধন প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হইলে বুঝিলাম উহা দোষের নহে। সখীভাবে যাহারা সাধন করেন তাহারা নিজদিগকে মনে মনে শ্রীরাধার সখী ভাবেন। রাধাকৃষ্ণ তাহাদের দেবতা। মনে কল্পনা করেন যেন বৃন্দাবনে যমুনাতটে, কুঞ্জে তাহারা রাধাকৃষ্ণের প্রীতিকর ...না-সর্ব্বে ব্যাপৃত আছেন। কেহ ফুল চয়ন করিতেছেন। কেহ কুঞ্জ ঝাট দিয়া পরিষ্কার করিতেছেন। কেহ কিসলয় শয়ন নির্ম্মাণ করিতেছেন। কেহ ধূপ দীপ নৈবেদ্য সংগ্রহ করিতেছেন। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের কমললতাদের আশ্রমে এই সাধন প্রণালীর সুন্দর চিত্র আছে। উহাতে কামোদ্দীপক চিত্র বিশেষ কিছু নাই।

বঙ্কিম লিখিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বরের অবতার ইহা আমি দৃঢ়বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি যে কোনও অলৌকিক বা অনৈসর্গিক কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করি না। ভাগবতের কৃষ্ণকে যে তিনি বাদ দিয়াছেন তাহার কারণ ভাগবতে কৃষ্ণের অনেক অলৌকিক কার্য্যাবলীর বিবরণ আছে। এই অলৌকিক বা অনৈসর্গিক কার্য্য কি তৎসম্বন্ধে এক্ষণে মতপরিবর্ত্তন করিবার সময় আসিয়াছে।

একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমের এক বন্ধু দিন সাত আট তাঁহার সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ করিলে বঙ্কিম তাহাকে বলিলেন কিহে এতদিন কোথায় ছিলে। বন্ধু বলিল আরে ভাই বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি এই কয়দিন লণ্ডন প্যারী ঘুরিয়া আসিলাম। বঙ্কিম অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—কিহে তুমি গাঁজা টাজা খাইতে আরম্ভ করিয়াছ নাকি। না তোমার মধ্যমনারায়ণ তৈলের প্রয়োজন। বঙ্কিমের সময় যে ব্যাপার অসম্ভব ছিল বর্ত্তমানে তাহা সম্ভব হইয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের গুণচর্চ্চা করিয়া এবং তাহাদের বিবিধ সংযোগ বিয়োগ ব্যবস্থা করিয়া মানুষের শক্তি অসাধারণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জুলসভার্ণ যে সকল ব্যাপার কল্পনা—সমুদ্রের অভ্যন্তর দিয়া পোতে গমন, আকাশ যানে গমন ইত্যাদি গল্প লিখিয়া তৎকালীন বালকদিগের মনোরঞ্জন করিতেন, সে সকল এখন সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। রেডিয়ো, টেলিভিসন, র‍্যাডার, অ্যাটমবম্ প্রভৃতি বঙ্কিমী কালে অবিশ্বাস্য বস্তু এখন সত্যে পরিণত হইয়াছে।

ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ লিখিয়াছেন নিউটনের প্রতিভা যদি সেই সময়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি তৎকালীন মনীষীদিগের প্রতিভাকে কার্য্যে না লাগাইয়া মনোবিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞানের দিকে লাগাইতেন তাহলে হয়ত এতদিন আত্মবিজ্ঞানের সাহায্যেও মানুষের অলৌকিক শক্তিসমূহ উদ্ভূত হইত।

প্রাচীন ভারতে এই আত্মবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল ইহা আমার বিশ্বাস। বঙ্কিমের সময়ের শিক্ষিত-

গণকে একথা বিশ্বাস করান যাইত না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতগণের পক্ষে এসব কথা বিশ্বাস্য হইতেছে। রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, কাঠিয়া বাবা, রমণ মহারাজ, অরবিন্দ, গান্ধী প্রভৃতির চরিত আলোচনায় লোকে যোগ শক্তিতে বিশ্বাসবান হইতেছে।

যোগেশ্বর কৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের যোগেশ্বর এই বিশেষণ গীতায় কয়েকবার প্রযুক্ত হইয়াছে।

১২ অধ্যায় ৯ম শ্লোক—'মহা যোগেশ্বরো হরিঃ'

১৮ " শ্লোক—'যত্র যোগেশ্বরো কৃষ্ণঃ'

ভাগবতীয় কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই যোগেশ্বর কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে। মহাভারত ও অন্য পুরাণেও ঐ একই শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। কেবল সাধকের মনোবৃত্তির উপযোগী করিয়া তাহার সাধন সাচ্যের জন্য একটু আধটু পরিবর্ত্তিত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

পাতঞ্জল দর্শন, বিভূতিপাদে যোগীদিগের নানা রূপ সিদ্ধির বিবরণ বর্ণিত আছে। ভাগবত একাদশ স্কন্ধে এই সকল সিদ্ধি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শন বিভূতিপাদ ৭৫শ সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে প্রধান সিদ্ধিগুলির অর্থ দেওয়া হইয়াছে। যথা :—অণিমা—ভবত্যণুঃ, লঘিমা—লঘুর্ভবতি; মহিমা—মহান্ ভবতি; প্রাপ্তি—অঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমা (অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্রমা স্পর্শ করেন); প্রাকাম্য—ইচ্ছানভিঘাত ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে (তাহার ইচ্ছা অপ্রতিহত হয় জলে যেমন লোকে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিতে পারে ভূমিতেও তাহারা সেইরূপ পারেন। বশিত্বং—ভূত ভৌতিকেষু বশী ভবতি, অবশ্যশ্চান্যেষাম্।—(ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকলের বশকর্ত্তা হন, অন্যের দ্বারা বশ্য হন না); ঈশিত্বং—তেষাম্প্রভবা-পয়ব্যূহামামিষ্টে (ভূত সকলের উৎপত্তি ও বিনাশের কর্ত্তা হয়); যত্র কামাবসায়িত্বং—সত্যসংকল্পতা, তাহার সংকল্প সত্য হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর ছিলেন। তিনি যোগ বিভূতি দেখাইয়াছিলেন। মহাভারতে :—তিনি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি দুর্ব্বাসার রোষ হইতে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি ন ত্বং বেত্থ পরংতপ॥

—তোমার আমার বহুজন্ম হইয়াছে। সে সকল আমি জানি। তুমি জান না।

ভাগবতের বিভূতির কথা পরে বলিব।

দক্ষ নারদ বিরোধ

দক্ষ নারদ মতদ্বৈধ সৃষ্টির প্রথম কাল হইতেই চলিতেছে। দক্ষের আনন্দ সৃষ্টি করিতে এবং সৃষ্ট বস্তু-নিচয়কে ভোগ করিতে। হারবার্ট স্পেনসার বলিলেন ঈশ্বর অজ্ঞেয়। ওদিকে মাথা না ঘামাইয়া যাহা জানা যাইতে পারে সেই দিকে মন দাও। স্ত্রী পুত্র কন্যাহীন স্পেনসার অন্য লোকের পুত্র কন্যাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমাজ ব্যবস্থায় মন দিলেন। পুত্র কন্যাহীন বার্ণার্ড শর সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই খাটে। অকরুণ লোকে বলিবে এ যেন যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। তাহাদের এই মনের প্যাচ—(tuist) প্রেরণা কোথা হইতে আসিল?

প্রজাপতি দক্ষ বহু পুত্র সৃষ্টি করিলেন। এবং তাহাদিগকে সৃষ্টি কার্য্যে মন দিতে উপদেশ দিলেন। পথিমধ্যে নারদের সহিত তাহাদিগের দেখা। নারদ বলিলেন ও সব কি করিতে যাইতেছ। জগতের যে আদি কারণ তাহাকে জানাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। তপস্যা ধ্যান ধারণা দ্বারাই তাহাকে জানা যায়। দক্ষের ছেলে-গুলির মাথায় ঐ চক্র (প্যাচ) ছিল। তাহারা সৃষ্টি কার্য্য ও সৃষ্ট জগৎ ভোগ করিবার মাধুর্য্য বুঝিল না। তাহারা নারদ শিষ্য হইয়া বিরাগী হইল।

দক্ষ পুনর্ব্বার বহু পুত্র সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাহারাও পরে নারদের পরামর্শে সংসার ত্যাগী সাধু হইল।

এবারে দক্ষ কুপিত হইলেন নারদকে পাইয়া তাহাকে অনেক কটু বাক্য বলিলেন। শেষে শাপ দিলেন জগতে তুমি কখন পদ পাইবে না।

নারদ ঈশ্বর শক্তি সম্পন্ন পুরুষ হইলেও কুপিত হইলেন না। তাহার শাপকে তথাস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। নারদ তাই কোথাও স্থায়ী নন। তিনি আজ গোলোকে, অন্য সময় বৃন্দাবনে, বৈকুণ্ঠে, ব্রহ্মলোকে, কৈলাসে। হরিকার্য্যার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিতেছেন।

সমস্ত ভাগবতের মধ্যে বা জগতে এই দক্ষ নারদ সমস্যা চলিতেছে। দক্ষ মতাবলম্বী জীবগণ নিজ নিজ সত্ত্ব, রজ, তম গুণানুসারে জগৎকে ভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আবার কখনও কখনও তাহাদের মনোমধ্যে নারদ মত উকী মারিতেছে। রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা বিবাহ দিয়া ভাবিলেন সংসারী করিলাম। কিন্তু মহামায়া তাঁহাকে এমন টানিলেন যে সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল।

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম

এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমার ব্যাখ্যাত কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে সাহায্য করিবে। কিছুদিন হইতে নিষ্কাম কর্ম্মের একটা ধুয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম বোধ হয় বর্ত্তমান যুগে একথা প্রথম আবিভূর্ত করেন। পরে তিলক, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী। এখন রামা শ্যামাও লোককে নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ অভ্যাস করিতে পরামর্শ দেন। তাহারা ভুলিয়া যান বেদের অধিকাংশ অংশই সকাম কর্ম্মের ব্যাপার। উপনিষদও একবারে নিষ্কাম নহেন। মন্ত্ররাজ গায়ত্রীর অর্থ—বিশ্বের যিনি আদি কারণ তাঁহার তেজকে ধ্যান করি। তিনি আমার বুদ্ধিকে পরিচালিত করুন। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি এই গায়ত্রী মন্ত্রের সাহায্যেও অভিচার ক্রিয়া করা যায়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু-পরমাত্মা

আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি যুক্ত করুন।

মা ন স্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি
মান গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধি—

আমাদিগের পুত্রে, পৌত্রে আয়ুতে, আমাদের গো ও অশ্বের প্রতি হিংসা করিও না। আর আমাদের বীর পুরুষদিগকে ক্রোধিত হইয়া বধ করিও না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের শেষাংশে—তে মা সর্ব্বৈ কামৈস্তর্পয়ন্তু—দেবগণ আমার সকল কামনা তৃপ্ত করুন এই মন্ত্র আছে। ইচ্ছামত বলবান, রূপ ও গুণবান পুত্র লাভ করিবার ব্যবস্থা এবং মন্ত্র এই উপনিষদে আছে।

গীতা মহাত্ম্যে আছে :—

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরি বাসরে।
স্বপন্ জাগ্রচ্চলংস্তিষ্ঠন শত্রুভির্ন স হীয়তে॥
শালগ্রামে শিলায়ং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্।
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে।

অর্থ সহজ।

ভাগবত পাঠের ফল (ভাগবতে—শেষ অধ্যায়)

দেবতা মুনয়াঃসিদ্ধাঃ পিতরো মনবো নৃপাঃ।
যচ্ছন্তি কামান্ গৃণতঃ শৃণ্বতো যস্য কীর্ত্তনাৎ।

—ভাগবত যিনি নিজে পাঠ করেন, যিনি অন্যকে পাঠ করিয়া শুনান এবং যিনি শ্রবণ করেন, দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃগণ, মনু প্রভৃতি নৃপগণ—তাহার কামনা পূর্ণ করেন।

বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যো নিধি পতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুধ্যেত পাতকাৎ।

ভাগবত পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা লাভ করেন। রাজা পৃথিবী লাভ করেন। বৈশ্য প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। এবং শূদ্র পাতক হইতে শুদ্ধ হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বন পথে দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন—

রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষমাম্।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্।

এই শ্লোক পড়িয়া চলিয়াছিলেন।

যোগবাশিষ্টের বক্তা, শ্রীরামচন্দ্রের গুরু, ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ ঋষি বশিষ্ঠ সম্বন্ধে রঘুবংশের একটুকু বর্ণনা :—

দিলীপ বশিষ্ঠাশ্রমে পুত্র কামনায় রাজ্ঞী সুদর্শনাসহ পৌছিয়া নানাবিধ বার্ত্তালাপের মধ্যে বলিতেছেন :—

তবমন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈর্দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ।
প্রত্যাদিশ্যন্ত ইব মে দৃষ্টলক্ষ্যভিদঃ শরাঃ॥

—মন্ত্রকৃৎ আপনার মন্ত্রের দ্বারা আমার অরিগণ দূর হইতেই প্রশমিত হয়। আমাদের পৌরুষের কোনও প্রয়োজনই হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুর গুরু তাঁহার পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী নিম্ন শ্লোক পড়িতে পড়িতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদবলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।

—হে দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ তোমাকে কখন দেখিব। তোমার দর্শনের নিমিত্ত হৃদয় কাতর হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। আমি কি করিব।

এই যে আবেগ ইহা কি নিষ্কাম?

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

চতুর্ব্বিধাভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোর্জ্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

—চারিবিধ সুকৃতিবান লোক আমাকে ভজনা করেন। আর্ত্ত—রোগশোকাদি দ্বারা অভিভূত, অর্থার্থী—যাহার কোনও আত্যন্তিক কামনা আছে, জিজ্ঞাসু—যিনি ভগবানকে জানিতে ইচ্ছুক, জ্ঞানী—যিনি ভগবানকে জানিয়াছেন। অতএব আর্ত্ত ও অর্থার্থী ভক্ত ও সুকৃতকারীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ভাগবতে আমরা এই চতুর্ব্বিধ ভক্তই দেখিতে পাই। একদিকে নারদ—আর দিকে দক্ষ।

(ক্রমশঃ)

বিভ্রান্ত

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

ছুটতে ছুটতে ক্রয়ডন্ এরোড্রোমে এসে দেখি প্লেন ছাড়তে তখনো ঘণ্টা খানেক দেরি। উঃ, সকালে যা তাড়াতাড়ি গেছে! সেই আগের যুগের কথা মনে পড়ল। জাহাজ ছাড়বার একমাস আগে থেকে যাত্রার আয়োজন, প্যাকিং কেস কিনে তাতে জিনিস ঠেসে পেরেক ঠুকে লেবেল আঁটা, জাহাজে দুসপ্তাহের পরবার মতো ঠাণ্ডা-গরম পোষাকের বন্দোবস্ত, সুয়েজ খাল আর লোহিত সাগর দিয়ে যাবার সময় কি কষ্টেই কাটবে সেই দারুণ গ্রীষ্মের দিনগুলো! আর আজ! পৃথিবীটা আজ খুব ছোট্ট হয়ে গিয়েছে, মানুষের আরামের প্রসারতা অত্যন্ত খাটো হ'য়ে এসেছে। উপকরণের বাহুল্য নেই, একটিমাত্র বস্ত্রাধার সম্বল, আর বড় জোর দুএকটা চর্মাবরণ পুঁটুলি।

চেয়ে দেখলাম চারিদিক। এটা যেন প্রকাণ্ড বড় এক আলাপন-কক্ষ, নিমন্ত্রিতরা এসেছেন যেন দলে দলে। কেউ যাবেন উত্তর-মেরু-প্রতিবাসী অস্লো, কেউ যাবেন দক্ষিণে কেপ্ টাউন, কেউ পূর্বে, কেউ পশ্চিমে। সারা পৃথিবীর হাতছানি যেন দেখতে পাচ্ছি সোফা-সেটি-মণ্ডিত এই প্রকাণ্ড ঘরটিতে, মানুষকে ডাকছে যেন নানা দেশ-দেশান্তর। আর এত বিচিত্র জাতের মানুষও ছিল! কালো কাফ্রি আর পীত চৈনিক, সাদা চামড়া আর বাদামি, উন্নাসিক আর খর্বনাসা, সবাই তাদের আপন আপন ভাষায় অনুচ্চ কলকাকলি তুলেছে। এত বিভিন্নতা অথচ মূলতঃ সবাই এক, one world, একা পৃথ্বী—'একটি জাতি, মানুষ জাতি, একটি আকাঙ্ক্ষাই রে!'—আশ্চর্য! কোনো নাটকে এরোড্রোমের দৃশ্য দেখেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না। অথচ এমন নাটকীয় পরিবেশ খুব অল্পই আছে জগতে।

"Your attention please—" গর্জন করে উঠল মাইক্ কোন্ অদৃশ্য ঊর্দ্ধ হ'তে। ব'লে চলল—এখনি কোন্ প্লেন ছাড়বে কোন দেশে যাবার জন্যে। অমনি একদল নরনারী উঠে চলে গেলেন, তাঁদের অপেক্ষা করবার মেয়াদ শেষ হয়েছে। কোথায় গেল সেই ট্রেণ-ষ্টীমারের প্রলোভনকর ছবি-আঁটা বিজ্ঞাপনে সুপুষ্ট কলেবর টাইম্-টেব্‌ল। কোথায় গেল সেই নম্বর ছত্রিশ আর ছটা ছাপান্ন, সেই তিন নম্বর প্ল্যাট্‌ফর্মের তেষট্টি নম্বর ট্রেণ! ইতিমধ্যে দাঁড়িপাল্লায় আমার মাল ওজন হয়ে গেছে, কাষ্টম্‌স্ মহাপ্রভুরা জিনিষপত্র তছ্‌নছ্ ক'রে আধার চর্মের ওপর খড়ি পেতে ছোট্ট একটি টিকিট সেঁটে দিয়েছেন। এগুলি হল মূল্যবান দলিল, মালের ছাড়পত্র। ঠেলা-গাড়ী চেপে মালপত্র রওনা হয়ে গেল এরোপ্লেনের কুক্ষীগত হবার জন্যে। আমার শরীরের ছাড়পত্র একটি নীল মলাটের বই, তার ভিতর আমার একটি প্রশান্ত হাস্যময় প্রতিকৃতি,

আজকের এই গলদঘর্ম অবস্থার নয়। সেটি পেতে ধরলাম পাসপোর্ট কর্মচারীর সামনে, তিনি একবার আমার মুখের দিকে শুভ দৃষ্টি ক'রে তাতে দিলেন ছাপ মেরে। 'জীবনে আর এক শুভ দৃষ্টির ফলে নিজে যেমন চিরকাল দাগী হয়ে আছি, এ শুভ দৃষ্টির ফলেও আমার পাসপোর্টখানি তেম্‌নি দাগী হয়ে রইল। ইতিমধ্যে বার তিনেক সোঁ সোঁ শব্দে তিনখানি প্লেন পৃথিবীর তিনদিক জয় করতে উড়ে গেল।

"Your attention, please"—এইবার আমাদের পালা। সবাই গিয়ে দাঁড়ালাম নির্দিষ্ট বারান্দায়, সেখানে টিকিট পাসপোর্ট দেখিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়ানো প্লেনে মইএর সাহায্যে চড়ে বসা গেল। গোল কাচ দিয়ে আঁটা একটা জানালার কাছের আসনে বসে ভিতরের দিকে তাকালাম। মাঝখান দিয়ে কার্পেট-আঁটা সরু যাতায়াতের পথ, দুধারে আসন শ্রেণী। প্রবেশ দ্বারের সামনে পানীয় জলের আধার. জলপানের গ্লাসের স্থানে সাদা কাগজের ঠোঙা। অপরদিকে দরোজা বন্ধ, তার ভিতর দিয়ে কাপ্তেন, পাইলট প্রভৃতিদের প্রকোষ্ঠে যেতে হয়। আলোর সুইচ, হাওয়া আসার ফুটা, কলিং বেল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করা গেল। যাত্রীরা এসে পৌছাতেই প্লেনের বহির্গমন-দরোজা বন্ধ হল। লাল আলোয় লেখা ফুটে উঠল ধূমপান নিষেধ, বেল্ট পরো। আমরা মোটা ফিতার বেল্টে নিজেকে নিজের আসনের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। এক তন্বঙ্গী কর্মতৎপরতার মূর্তিমতী প্রতীক যেন, এসে সবাইকে সনমস্কারে জানালেন তাঁর নাম ঈভা উইল্‌কিন্স্, আমাদের এয়ার হোষ্টেস্। আশা করলেন আমাদের যাত্রা নিরাপদ ও আরামের হবে। 'নিরাপদ'—তাই তো! ধ্বক্ ক'রে মনে হল বিপদ হতেই বা কতক্ষণ! সকলি ভগবানের ইচ্ছা। মনের এক কোণ মনের আর এক কোণকে বিদ্রূপ ক'রে বলল—যখন উপায় না থাকে তখন ভগবান বেচারিকে ভূতের বোঝা বইতে হয়।

প্লেন ছাড়ল। চাকা গড়গড়িয়ে চলেছে যেন বিরাট একটা গঙ্গা ফড়িং। কংক্রিটে বাঁধানো লম্বা লম্বা রাস্তার দৌড়। তারি একটা দিয়ে ছুটছে। খানিকটা এসে থমকে দাঁড়াল। যেন প্রকাণ্ড পাখী ওড়বার আগে নভোবন্দনা করছে! সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিন চারটের সে কী কর্ণপটাহ-ভেদি চীৎকার! কাপ্তেন সাহেব এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে পরখ ক'রে নিচ্ছেন এঞ্জিন যন্ত্রের নাড়ীনক্ষত্র সব ঠিক আছে কিনা। তারপর, প্লেন আবার ঐ কংক্রীটের দৌড় পথে ছুটল, এবার তার দুর্দমনীয় বেগ, যাত্রীর শিরায় শিরায় এই গতিবেগের উন্মাদনা জাগে, মনে জাগে মানুষের জয়গান। আকাশকেও মানুষ জয় করেছে—ধন্য মানুষ!

সর্বনাশ, লাগল বুঝি ধাক্কা সামনের ঐ শ্লেটে-ছাওয়া ঘরবাড়ীগুলার সঙ্গে, ঐ গাছগুলার সঙ্গে। প্রতিবারই আমার এম্‌নি ভয় হয়। কিন্তু প্রতিবারের মতোই আশ্বস্ত হয়েছি জানালার কাচ-চক্র দিয়ে দেখে। নাঃ, ইতিমধ্যেই কখন প্লেনখানা তরুশীর্ষের ওপর উঠে পড়েছে। চষা মাঠ আর সবুজ বেড়া দাবার ছকের মতো নিচে দেখা যাচ্ছে। লাল আলোর ধূমপান নিবারণী লেখা মুছে গেল।

বসবার আসনখানিতে নানা রকম কলকব্জার তন্ত্র। এটা টিপলে আসনটিকে হেলিয়ে আরাম-চেয়ার করা যায়, ওটা টিপলে আসনটি সোজা হ'য়ে বসে। সামনের আসনের পিঠে ছোট্ট একটি কাঠের বারকোষ অদৃশ্য হয়ে আছে। একটা বোতাম টিপলেই যেন মন্ত্রের চোটে বারকোষটি বেরিয়ে আসে। সেটা খাবার টেব্‌লের কাজ করে। তাকিয়ে দেখি জনচল্লিশেক যাত্রী যাত্রিণী বসে আছেন। হু হু ক'রে প্লেন ওপরে উঠছে, সাত হাজার, দশ হাজার, পনের হাজার, উনিশ হাজার ফিট। এই স্তরে আব-হাওয়া নেই, বিদ্যুৎ নেই। প্লেনের ভিতর আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধার জন্যে চাপ দেওয়া বাতাস ঈষৎ গরম করে রাখা হয়েছে।

প্রায় বিশহাজার ফিট ওপর থেকে পৃথিবীটা একটি অস্পষ্ট সবুজাভ সমতল বলে মনে হয়। ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়ামের মানচিত্রখানি কে যেন পায়ের অনেক নিচে মেলে ধরেচে। মাঝে মাঝে পাহাড়গুলি ম্যাপে আঁকা শুঁয়ো পোকার মতো দেখাচ্ছে। নদী নদ-গুলি যেন ছোট্ট ছোট্ট পয়ঃপ্রণালী'। সমুদ্রতরঙ্গ যেন নীল-বালুকা ললাটের ভ্রূকুঞ্চন। পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক যেন চুকিয়ে এসেছি আমরা, অথচ পৃথিবী এখনো দৃষ্টিপথের বাইরে' চলে যায় নি। মাটীর হাসি-কান্না, মাটীর সুখ-দুঃখ সে সব এখান হ'তে কত দূরে—যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমার প্রতিবারই মনে হয়েছে যখন পৃথিবীর কাছে শেষ বিদায় নিয়ে চলে যাবো, তখনো কি এই মাতৃসমা বসুন্ধরা

এম্‌নি করেই ক্রমে ম্লান অস্পষ্ট হয়ে আসবে? বাস্তব কি ধীরে ধীরে স্বপ্ন হ'য়ে শেষে বিস্মৃতিতে মিলিয়ে যাবে? কে জানে!

এয়ার হোস্টেস্ খানিক চকোলেট, লেমনড্রপস্—আর কি সবের একটা প্লেট হাতে গুঁজে দিয়ে যেতে চমক ভাঙল। ভাবছিলাম মরে গিয়ে আত্মা হয়ে গেছি, প্লেট দেখে স্মরণ হল পাথিব দেহ আজও খসে নি।

পাশের ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হল। অক্সফোর্ড থেকে সদ্য-পাশ-করা ইংরেজ যুবক, নাম বলল, হিলারী স্মিথ, যাচ্ছে সস্ত্রীক কলকাতা। সেখানে কোন্ ব্যাঙ্কে পেয়েছে চাকরি। স্ত্রী বসেছেন ঠিক পিছনের আসনটিতে, মিঃ স্মিথ দেখিয়ে দিল। অনবদ্যা সুন্দরী তরুণী ইংরাজ মহিলা পাশের আসনে উপবিষ্ট এক প্রিয়দর্শন ভারতীয় যুবকের সঙ্গে আলাপে মগ্না। ভারি বিস্ময় বোধ হল নবদম্পতীর ছাড়াছাড়ি কেন? বোধ করি আমার ভ্রূযুগলের মধ্যে জিজ্ঞাসার চিহ্নের ঈষৎ আভাস দেখে মিঃ স্মিথ বলল, 'ঐ ভারতীয় ভদ্রলোক হারীন ঘোষ, আমার ইউনিভার্সিটির সতীর্থ, মডার্ণ গ্রেট্‌স্ এ ফার্ষ্ট ক্লাস, ও একটি জিনিয়াস্। উনি আমার ও আমার স্ত্রী মার্থার প্রিয় বন্ধু। মার্থাও উক্ত ইউনিভার্সিটির ছাত্রী, অনেকদিন হতে এঁদের তিনজনের আলাপ পরিচয়। ভারতযাত্রার প্রাক্কালে মার্থার সঙ্গে হিলারীর বিবাহ হয়েছে।

সাধারণতঃ ইংরাজ এত কথা বলে না। ভগবান ওদের আড়ষ্ট-জিহ্ব ক'রে তৈরি করেছেন। তবে কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম, আমিও এক বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এ কথা শুনে যুবক হিলারী প্রৌঢ় আমার দিকে যে-দৃষ্টিতে চেয়েছিল সেটা আমায় একটা ছবির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। এই ছবি হচ্ছে উত্তর সাগরের একটি তরুণ ওয়ালরাসের উক্ত সাগরের একটি প্রৌঢ় ওয়ালরাসের দিকে তাকিয়ে থাকবার দৃশ্যটি। এই ছবিটি লণ্ডনের একটি চিত্রগৃহে আছে। এটি আমার একটি বিশিষ্ট প্রিয় ছবি। সহাস্য ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমি অনেকবার ছবিটি দেখেছি।

হিলারী তদীয় পত্নী মার্থা ও বন্ধু হারীনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। ইংরাজ-দম্পতী ভারতবর্ষে অর্থোপার্জন করতে যাচ্ছে—আগে আগে এ দৃশ্য আমার চোখে খুব প্রীতিকর ঠেকত না। শ্বেত মনুষ্যের ভার, সাম্রাজ্য, শোষণ-নীতি, এম্‌নি ধারা কয়েকটি কথা মনে আসত। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পর ইংরাজ জাতিকে অশ্রদ্ধা করতে আর মন সরত না, অ্যাটলী সাহেবকে তো দস্তুরমতো ভক্তিই করতাম, যদিচ ওদের চার্চিল সাহেবটিকে আজও মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে পারলাম কই? শ্রদ্ধার কথা উঠলেই প্রবল হাস্যবেগ দমন করা কঠিন হয়ে ওঠে। জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির বিভিন্ন অন্তরায়, বিভিন্ন উৎপাত ও বিপত্তির জন্যে এই সুপুষ্ট ইংরাজ পুঙ্গবের অসঙ্কোচ হাহাকার আমার মনে এমন অট্টহাস্য আনে, যা অশোভন।

মিসেস্ মার্থাকে ভারতে সাদর আহ্বান জানিয়ে হারীন ঘোষকে বাংলায় বললাম, "নমস্কার। আপনি তো বাঙালী। নমস্কার। যাচ্ছেন কোথায়, বোম্বাই না কলকাতায়?"

প্রত্যুত্তরে হারীন ঘোষ বললেন, "উঃ"।

ঠিক বুঝতে না পেরে বিনীতভাবে জিগেস করলাম, "আজ্ঞে?"

হারীন ঘোষ তাঁর পাইপটি দাঁতে চেপে ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কি আজ্ঞে আজ্ঞে করছেন! ঐ তো বললুম, উঃ।"

মডার্ণ গ্রেট্‌সের সেরা ছাত্র, অথচ এম্‌নি তার ব্যবহার! অনুমানে বুঝলাম তরুণী ইংরাজ মেয়েটির সঙ্গে ফ্লার্ট করতে এতই সে মগ্ন যে তার স্বজাতির সঙ্গে একটা সাধারণ ভদ্রতা বিনিময় করতেও নারাজ। তার ওপর মেয়েটি বিবাহিতা। শুধু তাই নয়, স্বামী রয়েছে সামনেই বসে! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীটা যে কোথায় যাচ্ছে কে জানে! এই আমার স্বজাতি! ধিক্!

কিন্তু দেখলাম বিরক্তি শুধু আমারি হয় নি। একটু উত্তেজিত স্বরে মার্থা বলছেন, শুনতে পেলাম, "ছিঃ হারীন, তোমার স্বজাতি ঐ বুড়ো ভদ্রলোকটির প্রতি অকারণ অমন অশিষ্ট ব্যবহার করলে কেন?"

হারীন বলল, "কেমন ক'রে জানলে শিষ্ট কি অশিষ্ট? আমি তো ইংরাজীতে কথা বলি নি।"

মার্থা বললেন, "তোমার ভাবভঙ্গীতে বুঝলাম। ভদ্রলোকটি নিশ্চয় দুঃখিত হয়েছেন। অমন নাইস্ ওল্ড ম্যান্!"

"নাইস্ ওল্ড্ ম্যান্"—হায় রে জরা! এম্নি ক'রে তুমি মানুষের আত্ম মর্য্যাদায় আঘাত দাও!

চাপা গর্জনে হারীন বলল, "তুমি মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষের মতো থাকলেই হয়। আমার আচরণে কটাক্ষ করো কোন স্পর্দ্ধায়!"

দুজনের মধ্যে চাপা কলহ অনেকক্ষণ ধরে চলল। দেখলাম মিঃ স্মিথ কান খাড়া ক'রে দুজনের ঝগড়া শুনছে।

অবশেষে মার্থা বললেন, "হারীন, আমার ওপর তোমার রাগ কেন? তোমায় বিয়ে না ক'রে আমি হিলারীকে বিয়ে করেছি ব'লে? তুমি কি জানো না আমি তোমায় কতখানি—"

বাধা দিয়ে হারীন বলল, "আঃ থামো থামো। আমি বেঁচে গেছি। খুব বেঁচে গেছি। বেচারি হিলারী! তার দুঃখে সহানুভূতি জানাই।"

মার্থা গুম্ হ'য়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। মনে হ'ল অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন। তারপর কান্নার সুরে বললেন, "কিন্তু হারীন, এই সেদিনও তুমি আমাকে কত ভালবাসতে! এত শীগগির তোমার মত বদলাবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।"

"মত্ বদলানো আমার অধিকার। আমার খুশি। আমি মেয়ে মানুষ নই যে একটিমাত্র মত্ চিরদিন আঁকড়ে ধরে থাকব তোমার মতন।"

মার্থা বললেন, "মেয়েদের সম্বন্ধে অতটা নিশ্চিন্ত হ'য়ো না হারীন। তারাও অপদার্থ প্রণয়ীকে ঘৃণা করতে পারে দরকার হ'লে। তাদের ভালবাসা যতটা গভীর ছিল, তাদের ঘৃণা ঠিক ততটাই গভীর হয়, তা জানো না?

"অসম্ভব, অসম্ভব!" হারীন বললে, "মেয়েদের ভেতর আঘাত খাবার আকাঙ্ক্ষাটা খুব প্রবল। তাই তারা যত মার খায়, ততই যে মারে তাকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে।"

তীক্ষ্ণ শ্লেষের স্বরে মার্থা বললেন, "ইস্, আজ দেখছি তুমি যে নারী মনস্তত্ত্বে সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছ। কেমন ক'রে হ'লে?"

"উনিশ হাজার ফুটের উচ্চতায় বিরল বাতাসে আজ আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

মার্থা কান্না চেপে বললেন, "তুমি হয়তো কোনদিন আমায় সত্যি ভালোবাসনি। তোমাকে বিয়ে করবার অন্তরায়—আমার কন্‌সার্ভেটিভ বাপ মা'র প্রবল আপত্তি, —আমি স্বচ্ছন্দে তাকে উপেক্ষা করতে পারতুম যদি না তুমি নিজে এসে অনুরোধ করতে আমায় হিলারীকে বিয়ে করতে। তখনি আমার মনে খটকা লেগেছিল।"

"খট্‌কা লেগেছিল তো? যাক্ তোমাকে যতটা বোকা ঠাউরেছিলাম, তুমি ততটা বোকা নও তাহলে। দেখ, হিলারী আমার সব থেকে বড়ো বন্ধু, তার তুলনায় তুমি কি ছার? তুমি তো একটি নারী মাত্র।"

"একটি নারী মাত্র! আর কিছুই নয়!"

"নাঃ, আর কিছুই নয়। তাছাড়া খুব যে আহা মরি প্যাটার্ণের নারী-তাও নয়। অতি সাধারণ। আর হিলারী আমার সহোদর ভাইএর মতো। জানো আমাদের আদি কবি বাল্মীকি বলেছেন—দেশে দেশে নারী মিলবে—এন্‌তার, যত চাও, কিন্তু সহোদর ভাই একটিও মিলবে না।"—এই ব'লে হারীন ঘণ্টা বাজালো। এয়ার হোষ্টেস এসে বলল, "হুইস্কি"।

মার্থা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই অসময়ে তুমি মদ খাবে কেন?"

হারীন বললে, "মহাকবি বাল্মিকীর স্বাস্থ্য পান করতে হবে।" বলে সে সমস্ত পানীয়টা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল। তারপর আর এক গ্লাসের হুকুম দিল।

আমার মনে হ'ল হারীন ঘোষ লোকটা পাঁড় মাতাল। সেই থেকে একটি অসহায়া তরুণীকে অপমানের পর অপমান করছে। এখন আবার মাতাল হ'ল। কি কাণ্ড করে কে জানে! অথচ মেয়েটির স্বামী চুপক'রে বসে আছে! ভাবলাম, আমার বেশি ঔৎসুক্য বা মেয়েটির প্রতি দরদ দেখানো ঠিক হবে না, বিশেষতঃ মেয়েটির স্বামীরই যখন কোনো ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে না। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, আমি যদি দরদ দেখাতে যাই, লোকে আমাকে বলবে কি? দূর হোক ছাই—আমি চুপ করেই রইলাম।

কাচের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বত, আল্‌প্‌স্ গিরিমালা। বানিশকরা আবলুষের মতো কালো কালো পাথরে জমানো ক্ষীরের মতো বরফ পড়ে আছে।

প্লেন এসে জেনীভায় নামল, আমরা একটু ঘুরে এসে আবার চড়ে বসলুম যে যার আসনে। হারীন ঘোষ

দেখলুম আরো অনেক মদ গিলে গুম্ হয়ে বসে আছে মার্থার পাশে।

প্লেন ছাড়লে মার্থা বললেন, "কি হারীন, অমন চুপচাপ কেন ?"

অপরিচিত হ'লেও আমি বুঝলাম—মার্থা মেয়েটি প্রবল শক্তিতে হারীনকে ঘৃণা করবার চেষ্টা সত্ত্বেও ঘৃণা করতে পারছে না, এমনি প্রগাঢ় তার ভালবাসা।

হারীন বলল, "রোমান্সের স্বপ্ন দেখছি। দেশে ফিরে গিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে চেলী পরে বিয়ে করতে যাবো। That reminds me—আহা কি সুন্দর কাপড় চেলী। আর এই ধোকড় কাপড় চোপড় গুলো, এই মোটা পুরু জুতা, এই কুটকুটে মোজা—ঐগুলো অসহ্য। আহা এখন যদি হাতের কাছে একটা চেলী থাকত, পরতুম।"

বুঝলাম লোকটা ভীষণ মাতাল হয়েছে। মদের খেয়ালে চেলী পরবার শখ্ হয়েছে।

মার্থা একটা রেশমের "ভেল" দিলেন। হারীন সেটা টেনে নিয়ে বললে, "এইটা পরে থাকি, এসব ধোকড় টান মেরে খুলে ফেলি, কি বল মার্থা ?"

মার্থা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। হারীনের এই উক্তিতে তার মনে কি আতঙ্ক যে হ'ল আমি তা সহজেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য লোক মার্থার স্বামীটি। তার মুখে ভাবান্তর মাত্র নেই। আমি থাকতে না পেরে বললাম, আমার আসন ছেড়ে দিচ্ছি, তোমার স্ত্রীকে এখানে উঠে আসতে বলো। প্রত্যুত্তরে নির্বিকার মিঃ হিলারী বলল—"না, না। অনেক ধন্যবাদ।"

আমাদের খাওয়া-দাওয়ার বিরাম ছিল না, কিন্তু হারীন ঘোষ দেখি পানীয় ছাড়া আর কিছুই খায় না। থাকে থাকে ব'লে ওঠে, "এই রেশমের ভেল্‌টা পরব। অনেকটা চেলীর মতোই।"

আতঙ্কে মার্থা নির্বাক হয়ে থাকেন। তিনি জানেন প্রতিবাদ করলেই মাতালের রোখ্ চেপে যাবে, তখন তাকে থামানো মুস্কিল। আর এ তো ঘর নয় যে তাকে বার করে দেওয়া চলে। উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে মাতাল বার ক'রে দেওয়া সহজ কথা ?

ক্রমশঃ রাত হয়ে আসছে। আমার জানালা থেকে প্লেনের যে দুটো এঞ্জিন দেখা যায় সে দুটো দেখি তেতে লাল হয়ে উঠল। অথচ তার বাইরে বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা বাতাস। হারীন ঘোষের দিকে চোখ মেলে দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখ হাঁ-করা, অতি বিরাট শব্দে তার নাক ডাকছে, আর ঘুমের ঘোরে তার ঘাড়টা ক্রমে মার্থার দিকে এগিয়ে আসছে।

বেচারী মার্থার অবস্থা শঙ্কটজনক। দু একবার সে ঠেলা মেরে মাতালটাকে সচেতন করবার প্রয়াস করেছে, কিন্তু প্রতিবারই জেগে উঠে সে বলেছে—এইবার চেলী পরবে। একবার ঝোঁকের মাথায় কলার টাই খুলে মার্থার কোলের ওপর ফেলে দিয়েছে, একবার কোট খুলে ফেলে দিয়েছে মার্থার পায়ের কাছে। বাকি যা পরিধেয় আছে কখন নেশার ঝোঁকে তা খুলে ফেলে সেই ভয়ে মার্থা বেচারী তটস্থ হয়ে আছে।

কাইরো এসে গেলে, আমরা সবাই নেমে ঘুরে এলাম, কিন্তু হারীন ঘোষের অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

সারারাত ঘুমে জাগরণে আচ্ছন্ন হয়ে কাটল আমাদের। কিন্তু যতবারই ঘুম ভেঙেছে, আড় চোখে চেয়ে দেখেছি মার্থার চোখে ঘুম নেই। সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে আমিই মার্থাকে বলেছি আমার আসনটিতে এসে বসতে, কিন্তু মার্থার স্বামী প্রবল আপত্তি করেছেন—"না, না, সে কি হয়, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কষ্ট হবে যে!" সুতরাং মার্থার আর আসন পরিবর্ত্তন ঘটে ওঠে নি। হারীন ঘোষ যখনি জেগেছে তখনি বলেছে—এইবার চেলী পরবে।

সকলেই জানেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের এক অভিনব যুদ্ধ প্রক্রিয়া war of nerves—অনিশ্চয়তার আতঙ্কে মানুষ নীরবে যম-যন্ত্রণা ভোগ করত। হারীন ঘোষ দেখলাম মার্থার ওপর সেই হিটলারি war of nerves চালাচ্ছে। মার্থার মুখ দেখে মনে হ'ল, বেচারি এখুনি ভেঙে পড়বে।

আমাদের প্লেন এখন সোজা সূর্য্যোদয়ের পথে উড়ে চলেছে। কতক্ষণে সূর্য্য উঠবে তারি প্রতীক্ষা করছেন মার্থা। হঠাৎ দেখি সামনের আকাশে সে কী অপূর্ব বর্ণচ্ছটা! সহসা যেন সমুদ্র স্নান ক'রে সূর্য্যদেব দিগ্বলয়ের ওপরে লাফিয়ে উঠলেন।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। এক একটি মিনিটকে দশগুণ দীর্ঘায়ত মনে হচ্ছিল। যাই হোক, অবশেষে এয়ার

ফিরে এসে দেখা গেল—বন্ধুরা তখনও শয্যা গ্রহণ করেন নি। পরদিন প্রভাতে প্রবন্ধ শ্রবণের পরিবর্ত্তে তাঁরা "উতকামণ্ড" ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন।

উতকামণ্ড—মহীশূর থেকে ৯৯ মাইল। মোটরে ৪ ঘন্টার পথ। একটী ষ্টেশন ওয়াগন যোগাড় করে—সোমবার বেলা দশটায় রওনা হওয়া গেল। আমাদের দলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেছে। মিহিজাম চিত্তরঞ্জন থেকে—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ও বেলা রায়—"কৃষ্ণরাজসাগর" হোটেল ছেড়ে—আমাদের হোটেলে এসে স্থান নিলেন।

উতকামণ্ডের পথ খুব ভাল নয়—সহরটী মাদ্রাজ রাজ্যে। মহীশূরের সীমানা শেষ হতেই একটা ফটক—সেখানে মোতায়েন রক্ষী দল আমাদের আটক করে জানতে চাইল—সঙ্গে মাদকদ্রব্য আছে কিনা—মাদ্রাজ শুষ্ক রাজ্য—ওখানে স্তলীয় মাদক প্রবেশ নিষিদ্ধ। অনুসন্ধান একমিনিটেই শেষ। আমরা যথারীতি অগ্রসর হতে লাগলাম।

পথের দুধারে বাঁশবন—বাঁশগুলি বেশ মোটা রকমের ৮" ইঞ্চি

মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজা

কি ৯" ইঞ্চি। দেখে স্বতঃই এই কথাটা মনে হল—যে এ বাঁশের জন্য বোধহয় বেণু শব্দটী প্রযোজ্য নয়।

৬৬ মাইল পথ অতিক্রম করতে বেলা একটা বেজে গেল। সহসা গাড়ীর গতি রুদ্ধ হল—চাকার টায়ার ফুটো হয়ে গেছে।

চাকা বদল করে যাত্রা সুরু করতে প্রায় ৪৫ মিঃ দেরী হয়ে গেল। সঙ্গে সেদিনের মতো যা রসদ নেওয়া হয়েছিল—তা এই অবকাশে সদ্ব্যবহার করে ফেলা হল।

যাবার পথে, "উটী"র ১২ মাইল আগে মাদ্রাজের বিখ্যাত পাইকারা বাঁধের তৃতীয় অংশ নির্ম্মিত হচ্ছে দেখা গেল। দুধারে উঁচু পাহাড়, মধ্যে গভীর নদী—কালো কড়া পাথরের ওপর বনিয়াদ করে বাঁধ তৈরী হচ্ছে। এই বাঁধটী শেষ হ'লে মাদ্রাজের বিদ্যুত সরবরাহ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হবে।

পথে একটী বসতি পাওয়া গেল—কমুর। এখানে সিনকোনা ও চায়ের চাষ দেখা গেল। উতকামণ্ডের উঁচু চড়াইয়ের সুরু এখান থেকে। দৃশ্য সুন্দর, কিন্তু দার্জ্জিলিংয়ের পথের দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা চলেনা।

উতকামণ্ড রেল ষ্টেশন পৌছালাম বেলা তিনটায়। আশা করেছিলাম নিকটেই ভাল হোটেল পাওয়া যাবে। নিরাশ হয়ে সারা সহর ঘুরে অবশেষে যখন সেভয় হোটেলে প্রবেশ করা হ'ল তখন বেলা পৌনে চারটা। দুপুরে কিঞ্চিৎ জলযোগ হলেও সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজন পর্ব্ব বাদ পড়েছিল। সুতরাং সকলের ক্ষুধার্ত্ত বোধ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। হোটেলের কর্ত্রী ঠাকুরাণী ব্যাপার শুনে বললেন—একটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত চাকর বেয়ারাদের ছুটীর সময়—৫টার পূর্ব্বে তাদের দর্শন পাওয়া যাবে না। সুতরাং পূর্ণ মাত্রায় মধ্যাহ্নভোজন অসম্ভব। তবে তিনি মোটামুটী রকমের কিছু রন্ধন করে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারেন। কর্ত্রীঠাকরুণকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিশ মিনিটের মধ্যেই ভোজ্য প্রস্তুত হয়ে এল—ডিম, রুটী, মাংস, আলু ও কপি সিদ্ধ, তাছাড়া জ্যাম, জেলি এবং বলা বাহুল্য চা। আহার্য্য দ্রব্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি মনোমত।

ললিতা-মহল

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উতকামণ্ডের পথে, রেসকোর্স লেক প্রভৃতি দেখে মহীশূর প্রত্যাবর্ত্তন করা হল রাত দশটায়। কাল বিলম্ব না করে হোটেলে আহার শেষ করে শয্যাগ্রহণ করা হল।

পরদিন সকালে (৬ই ফেব্রুয়ারী) সদলবলে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভায় যোগদান করা হ'ল, পূর্ব্ব দিনের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। আলোচনায় উত্তেজিত হয়ে "রায়সাহেব", তাঁর জীবনের প্রথম বক্তৃতা প্রদান করলেন। বিনয়দা তাঁকে শান্ত ক'রে বললেন—রাত্রে ডিনারের জন্য কিছুটা রেখে দিন।

বাৎসরিক ডিনার বা নৈশ-ভোজন সাধারণত এক সমারোহ ব্যাপার, তার উপর এবৎসর নৈশ-ভোজনের স্থান নির্দ্ধারিত হয়েছিল—বৃন্দাবন উদ্যানে—কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধের গা ঘেঁসে। কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ—শুধু মহীশূর নয় সারা ভারতের দ্রষ্টব্য স্থান। সহর থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে। কাবেরী, হেমাবতী ও লক্ষ্মণ তীর্থ এই তিনটী নদীর সঙ্গম স্থলে।

বাঁধটা আকারে বিরাট—১৩০ ফুট উঁচু ; জলাশয়ের আয়তন ৫০ বর্গ মাইল। বাঁধের ওপর ১৪ ফুট চওড়া মোটর যাবার পথ। এর নির্ম্মাণ কাজ সুরু হয়েছিল—১৯১১ সনে—শেষ হতে লেগেছিল ২০ বৎসর ; বাঁধটার সামনে নদীর দুই তীরে মুসলমানী ছাঁচে বিস্তীর্ণ উদ্যান। হ্রদের জলে নানা ধরণের বিচিত্র ফোয়ারা ও রঙিণ আলো।

এই আবেষ্টনীর মধ্যে কৃষ্ণরাজসাগর হোটেল—তিনতলা বাড়ী, ইংরাজি ধরণের ব্যবস্থা—বেশ উচ্চশ্রেণীর। স্থাপত্যের দিক থেকে কিন্তু হোটেলের বাড়িটা বৃন্দাবন উদ্যানের আবেষ্টনীতে একান্ত অশোভন।

ফোয়ারার বৈচিত্র্য ও আলোয় রঙের বাহুল্য থাকলেও মোটের উপর জলের ধারায় যখন আলোর খেলা চলে তখন স্থানটা সত্যই এক অপূর্ব্ব রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

রাত সাড়ে দশটায় ভোজন পর্ব্ব শেষ হল—মহীশূরের প্রধানমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার প্রভৃতি যথারীতি ভোজনান্তিক বক্তৃতা দিলেন। এতে বিলাতি আমলের ঠাট ছিল যথেষ্ট, কিন্তু জৌলুষের একান্ত

উত্কামণ্ডের যাত্রীদল

অভাব। গেলাসে সোমরসের পরিবর্ত্তে সাদা জল রেখে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত তুলে আবার নামিয়ে "Toast" পান করার ব্যর্থ অনুকরণ বড় হাস্যকর মনে হয়।

এই ব্যাপারের আলোচনা করতে করতে হোটেলে ফিরে পরের দিনের কার্য্যসূচী একবার দেখে নেওয়া হল। সকালে ব্যবস্থা ছিল—রাসায়নিক সার-কারখানা পরিদর্শন। বাংলার প্রতিনিধিরা ধানবাদ সিন্দ্রির "সার কারখানা"র অজুহাত করে সহরের দোকান পরিদর্শন সুরু করলেন। বাজারে গিয়ে দেখা গেল—একাজে অন্য রাজ্যের প্রতিনিধিরাও পশ্চাৎপদ নন।

অপরাহ্নে পরিদর্শন করা হল—চন্দন তেল ও সরকারী সিল্কের কারখানা এবং মহীশূরের রেলের কারখানা। চন্দন তেল নিষ্কাশন ব্যাপারটা সারা ভারতে শুধু মহীশূরেই হয় এবং এই তেলটা প্রচুর পরিমাণে আমেরিকায় পাঠান হয়—ঔষধ হিসাবে ; এবং ডলার উপার্জ্জনের অন্যতম উপকরণ হিসাবে। কারখানার যন্ত্রপাতি প্রায় প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের।

সিল্কের কারখানাটা বেশী বড় নয়। অধিকাংশ স্থানে মেয়েরাই কাজ করছেন। কারখানার গেটের সামনেই বিক্রয় কেন্দ্র। বিভিন্ন দেশের

উতকামণ্ডের রেসকোর্স

প্রতিনিধিরা যে মহীশূরের সিল্কের গুণগ্রাহী তা' বিক্রয় কেন্দ্রের জনতা থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

রেলের কারখানাটা ছোট হলেও এখানে এঞ্জিন ও গাড়ীর অংশ নির্ম্মাণের যাবতীয় কাজ হয়—যাতে সরকার যতদূর সম্ভব কম পর মুখাপেক্ষী হতে পারেন।

মহীশূর ডিনার পার্টিতে—বাংলার প্রতিনিধিবৃন্দ

সন্ধ্যায় স্থানীয় টেকনিকেল কলেজে চা পানের পর খবর পাওয়া গেল যে মহারাণী প্রতিনিধিদের সঙ্গী মহিলাদের একটী সান্ধ্য সম্মিলনে আহ্বান করেছেন এবং রাজ্যকার সংসদের প্রতিনিধিদের সম্মানার্থে রাজপ্রাসাদ আলোকিত করা হবে। আলোকিত করার ব্যবস্থা থাকা

রকমের—কাঠের ফ্রেমে বালব পর্য্যন্ত সর্ব্বদা লাগান থাকে—শুধু সুইচ্ টেপার যা অপেক্ষা।

রাজবাড়ীর আলোক সজ্জা দেখার পর কয়েকজন ললিতামহল

টিপুসুলতানের সমাধি

দেখতে গেলেন। প্রকাণ্ড গম্বুজশোভিত প্রাসাদ—মার্ব্বেল মোড়া হল ঘর, রঙিণ কাচের জানালা। শ্রেণিরা কাচের ঝাড় লণ্ঠন—মেঝেতে
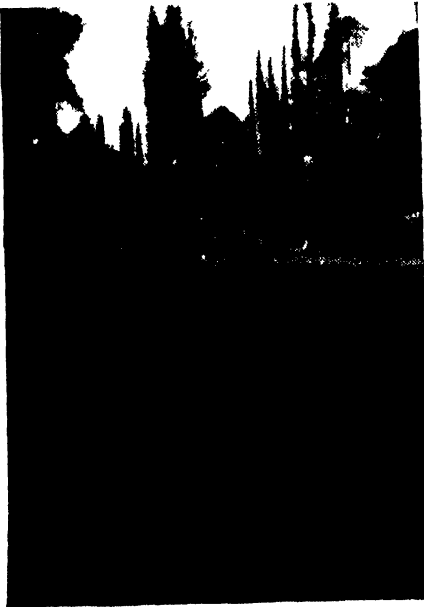
সমাধির প্রবেশপথ

চার ইঞ্চি পুরু কার্পেট। দেয়ালে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরসি। চার পাশে কেয়ারী করা ফুলের বাগান। রাজ-অতিথিদের বাসস্থানের যোগ্য সন্দেহ নেই। হোটেলে ফিরে এসে দেখা গেল—শ্রী জিতেন্দ্রনাথ ও বেলা রায় কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত। তাঁর ছুটী ফুরিয়ে গেছে।

এই কদিনে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের পরিকল্পনা বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিছুটা পথ সময় সংক্ষেপ করার জন্য—এরোপ্লেনে যেতে হবে। অতএব বাড়তি জিনিষ একান্ত পরিত্যাজ্য। জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে সে জিনিষগুলি চালান করে দেওয়া হল।

মহীশূরের কাছাকাছি দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে—সেরিঙ্গাপত্তনে পদ্মনাভের মন্দির। টিপুসুলতানের প্রাসাদ ও সমাধি। সোমনাথপুরের মন্দির।

সোমনাথপুরের মন্দির

সকালে প্রাতরাশ সেরে বাসে ওঠা হ'ল। প্রথমে টিপুসুলতানের প্রাসাদ ও সমাধি—স্থাপত্যের দিক থেকে বিশেষ কিছু নয়, তবে এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সমাধি মন্দিরের পরিকল্পনাটী বেশ পরিচ্ছন্ন। দুধারে তরু শ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রবেশ পথটী বড় সুন্দর।
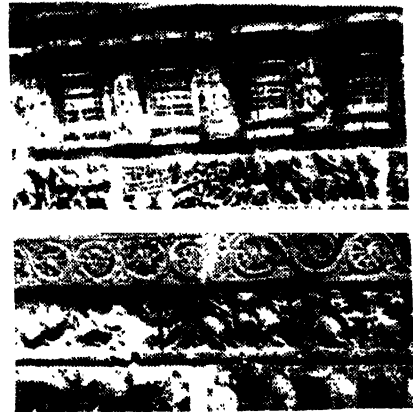
মন্দিরের কারুকার্য

সেরিঙ্গা-পত্তনমের পদ্মনাভের মন্দির দেখে কিন্তু হতাশ হতে হয়। মন্দিরটীতে দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন পুরোমাত্রায়, কিন্তু কেমন যেন বলিষ্ঠতার অভাব। যত্নের অভাবে মন্দির প্রাঙ্গণ ও তার চতুষ্পার্শ্ব অত্যন্ত অপরিষ্কার। মন্দিরের ভিতর ভগবানের মূর্ত্তি অনন্তশয্যায় শায়িত, নাম

"রঙ্গনাথস্বামী"। মন্দিরের অবস্থা যাই হোক—"রঙ্গনাথস্বামী"র অবস্থা কিন্তু মন্দ নয়। অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য তাঁর ঐশ্বর্য্যেরই পরিচায়ক।

সেরিঙ্গাপত্তনম্ সহরটী কিন্তু বেশ পুরাতন—সরু গলি ও ধূলিময় পথের সংখ্যা যথেষ্ট। বসতি ও পাকা বাড়ীর সংখ্যাও অল্প নয়। অধিকাংশ বাড়ীই পুরানো, তবে সিমেন্ট কোম্পানীর প্রচারের ফলে এখানেও দু'চারটী ঢালাই কংক্রিটের রেলিং ওয়ালা বাড়ী নজরে পড়ে।

ধূলিময় পথ পার হয়ে কাবেরীর ওপর সেতু অতিক্রম করে পৌছানো হল—সোমনাথপুর। প্রায় ৩৩ মাইল দূরত্ব। সোমনাথপুর নামটার সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় ছিল না। ফলে পথে যেতে যেতে সন্দেহ হচ্ছিল যে সোমনাথপুরের মন্দির—এমন কি একটা! গাড়ী থেকে নেমে চার পাশ লক্ষ্য করলে হতাশ হতে হয়। চার পাশে শুধু মাঠ; কয়েকঘর নিম্নশ্রেণীর বসতি। মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ অপরিস্কার। অদূরে একটা পাকা ইন্দারা—স্থানীয় মহিলারা তা থেকে জল সংগ্রহ করছেন। মন্দিরের চারপাশে সুউচ্চ প্রাচীর সুতরাং বাইরে থেকে কিছুই নজরে আসে না।

মন্দিরের ভাস্কর্য
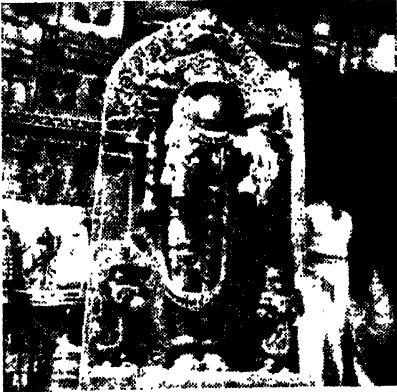
তোরণ অতিক্রম করে যখন চত্বরে প্রবেশ করলাম তখন পেলাম মন্দিরের পূর্ণ পরিচয়। যেমন অপূর্ব্ব গঠন, পারিপাট্য তেমনই সুষমাময় ভাস্কর্য্য শিল্প। মন্দিরের আগাগোড়া অপূর্ব্ব শিল্পমূর্ত্তি ভূষিত।

মন্দিরটী বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত—ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমানের আক্রমণে মন্দিরটী কলুষিত হওয়ায় আর বিগ্রহের পূজা হয় না। বহুদিন অবহেলিত অবস্থায় থাকার পর সম্প্রতি মহীশূর সরকার এটীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতীয় স্থাপত্যের শিল্প নিদর্শন হিসাবে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বেলুড় ও হালেবিদের মন্দিরের নাম জগদ্বিখ্যাত, সোমনাথপুরের মন্দিরের কারুকার্য্য বেলুড় ও হালেবিদের মন্দির থেকে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়।

সোমনাথপুরের পর আমাদের যাবার কথা ছিল—শিবসমুদ্রম্। প্রায় ৫০ বছর আগে কাবেরী নদীর ওপর বাঁধ তৈরী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার চেষ্টা ভারতে প্রথম এই শিবসমুদ্রমের বাঁধ। প্রায় ৫০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি ঐই বাঁধ থেকে উৎপন্ন হয়; এই বাঁধটীর পরিদর্শন আমাদের ত্যাগ করতে হ'ল ডাক্তারের পরামর্শে—শিবসমুদ্রমের নিকটবর্ত্তী গ্রামে কলেরার প্রকোপ হওয়ায়।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুণ্ণ মনে সহরে ফেরা হল—পথে গুটীপোকার চাষ ও সিল্ক বার করার ব্যবস্থা দেখতে হল। দুপুরে রাজবাড়ী পরিদর্শন। রাজপ্রাসাদ আয়তনে বিরাট—কারুকার্য্য ঐশ্বর্য্যময়, আসবাবপত্র বৈচিত্র্য-

আলোকসজ্জায় শোভিত রাজপ্রসাদ
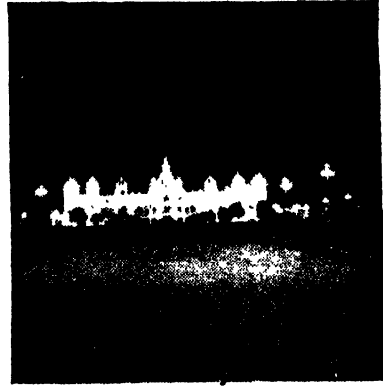
ময়! কিন্তু সত্য বলতে কি—স্থাপত্যের বলিষ্ঠতা বা পরিকল্পনার কুশলতার আভাস এখানে পাওয়া গেল না।

রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন শেষ করে—মহীশূর ত্যাগ করার পূর্ব্বে আর একবার এখানকার দোকান পাট, বিশেষ করে টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউটের প্রদর্শনশালা ঘুরে আসা হল। শুধু আমরা নয়—সকল রাজ্যের প্রতিনিধিরাই

রাজপ্রাসাদের তোরণ
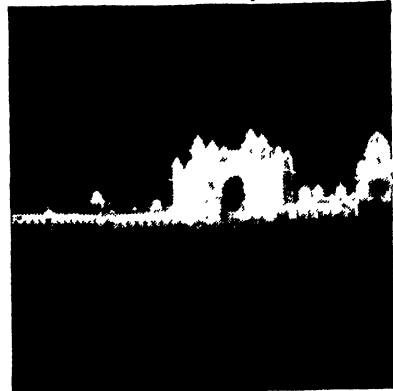
সমান উৎসাহী। হাতীর হাড়ের জিনিষ, চন্দন কাঠের মূর্ত্তি, আইভরি-খচিত আবলুসকাঠের ট্রে প্রভৃতি নানা দ্রব্য সংগ্রহ করা হল।

সাড়ে নটায় বিশেষ ট্রেণ যোগে মহীশূর ত্যাগ করা হল—ভদ্রাবতীর লোহার কারখানা ও গারসোপ্পা বা যোগ জলপ্রপাত এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। (ক্রমশঃ)

(চিত্র-নাট্য)

(পূর্বানুসরণ)

ফেড্ ইন্।

অতঃপর অনুমান তিন হপ্তা কাটিয়া গিয়াছে।

যদুনাথের লাইব্রেরী ঘর। নন্দা বৈকালিক চায়ের সাজসরঞ্জাম লইয়া ব্যস্ত। যদুনাথ চশ্‌মা পরিয়া দিবাকরের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছেন। দিবাকর তাঁহার চেয়ারের পাশে দণ্ডায়মান। আজ মাসপয়লা।

নন্দা এক পেয়ালা চা ঢালিয়া যদুনাথের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না; খাতা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

যদুনাথ: হিসেবে গোলমাল আছে!

নন্দা চমকিয়া উঠিল। দিবাকর যদুনাথের দিকে ঝুঁকিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল—

দিবাকর: গোলমাল। কিন্তু—

যদুনাথ: আলবৎ গোলমাল আছে। হয় ঠিক্ দিতে ভুল করেছ, নয় তো—। নন্দা, তুই হিসেব দেখেছিস?

নন্দা: (শঙ্কিত কণ্ঠে) না দাদু। দিবাকরবাবু কি সব ভণ্ডুল ক'রে ফেলেছেন?

যদুনাথ: ভণ্ডুল! একেবারে লণ্ডভণ্ড। (দিবাকরকে কড়াস্বরে) আজ বাইশ দিন হ'ল তুমি কাজ করছ। তুমি বলতে চাও এই বাইশ দিনে আটশ' টাকা খরচ হয়েছে!

দিবাকর: আজ্ঞে আটশ' টাকা ছয় আনা। বড্ড বেশী হয়েছে কি?

যদুনাথ হিসাবের খাতা টেবিলের উপর আছড়াইয়া গর্জন ছাড়িলেন—

যদুনাথ: চোর! ডাকাত!! ঐ ভুবনটা আস্ত ডাকাত ছিল। তার আমলে দু'হাজার টাকার কমে মাস কাটত না! উঃ, এক বছর ধ'রে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমার গলা কেটেছে! হতভাগা! পাজি! রাস্কেল!

নন্দা ও দিবাকর যুগপৎ আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

নন্দা: তাহলে এবার খরচ কম হয়েছে!

যদুনাথ: এতক্ষণ তাহলে বলছি কি? কিন্তু এত কম হ'ল কী ক'রে? তুমি কারুর বকেয়া ফেলে রাখোনি তো?

দিবাকর: আজ্ঞে এক পয়সা বকেয়া ফেলে রাখিনি।

যদুনাথ: হুঁ—ভুবনটাকে পেলে জেলে দিতাম। (দিবাকরের দিকে হাত বাড়াইয়া) দেখি তোমার হাত।

দিবাকর: হাত!

যদুনাথ: হ্যাঁ হ্যাঁ হাত, তোমার করকোষ্ঠি দেখব।

দিবাকরের ডান হাতটা টানিয়া লইয়া যদুনাথ দেখিতে লাগিলেন; নন্দা ও দিবাকর একবার সশঙ্ক দৃষ্টি বিনিময় করিল।

যদুনাথ: হুঁ, খাঁটি মেষ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলো কি? খুব্‌রি খুব্‌রি দাগ রয়েছে!

নন্দা: ওতে কি হয় দাদু?

যদুনাথ: কারাগার বাস। তুমি কখনও জেলে গেছ?

দিবাকর: জেলে! আজ্ঞে কখ্‌খনো না।—তবে একবার স্বদেশীর হিড়িকে পুলিস ধ'রে হাজতে রেখেছিল—

যদুনাথ: হুঁ—তাই হবে বোধ হয়। রেখাগুলো কিন্তু ভাল নয়।

তিনি সন্দিগ্ধ ভাবে রেখাগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা তাঁহার মন বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত করিবার জন্য বলিল—

নন্দা: দাদু, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

দিবাকরের হাত ছাড়িয়া যদুনাথ চায়ের বাটি টানিয়া লইলেন; কতকটা আত্মগতভাবেই বলিলেন—

যদুনাথ: ও রেখা যার হাতে আছে তাকে কখনও না কখনও কারাবাস করতেই হবে—

নন্দা: (হাল্কা সুরে) তা রেখাগুলো রবার দিয়ে ঘ'ষে মুছে ফেলা যায় না?

যদুনাথ: পাগলি! রবার দিয়ে কি কপালের লেখা মোছা যায়!

এই সময় মন্মথ প্রবেশ করিল। সামুদ্রিক গবেষণা চাপা পড়িল। নন্দা চা ঢালিয়া মন্মথকে দিল। এই অবকাশে দিবাকর হিসাবের খাতাটি লইয়া দ্বারের দিকে চলিতেছিল, যদুনাথ তাহাকে ডাকিলেন—

যদুনাথ: দিবাকর, তুমি চা খেলে না।

দিবাকর: আজ্ঞে আমি চা খাই না; অভ্যেস নেই।

যদুনাথ: না না, চায়ের অভ্যেস ভাল। একটা ছোট নেশা থাকলে বড় নেশার দিকে মন যায় না। টিকে নিলে যেমন বসন্ত হয় না, চা খেলে তেমনি হুইস্কি ব্রাণ্ডির খপ্পরে পড়বার ভয় থাকে না। নাও, আজ থেকে দু'বেলা চা খাবে।

নন্দা: আসুন দিবাকরবাবু, সাবধানের মার নেই। এই নিন।

দিবাকর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নন্দার হাত হইতে চায়ের পেয়ালা লইল—এই সময় মন্মথর দিকে তাহার নজর পড়িল। মন্মথর মুখ বিরক্তিপূর্ণ; ভৃত্যস্থানীয়ের সহিত এরূপ রসালাপ সে পছন্দ করে না। দিবাকর চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; প্রভু-পরিবারের সম্মুখে চা পান করিবার ধৃষ্টতা তাহার নাই।

মন্মথ বিরাগপূর্ণ নেত্রে নন্দাকে নিরীক্ষণ করিয়া যদুনাথের দিকে ফিরিল।

মন্মথ: দাদু, নন্দার বিয়ের কিছু করছ?

এই প্রশ্নের অন্তরালে যে একটা খোঁচা আছে তাহা অনুভব করিয়া নন্দার মুখ শক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে কিছু বলিবার পূর্বেই যদুনাথ বলিলেন—

যদুনাথ: নন্দার এখন বিয়ের যোগ নেই। ওর কুষ্ঠি দেখেছি, শুক্রের দশায় রাহুর অন্তর্দশা আরম্ভ হয়েছে। এখন তিন বছর বিয়ের যোগ নেই।

নন্দা: দাদু, দাদার বিয়ের কি করছ?

মন্মথ: আমি এখন বিয়ে করব না।

যদুনাথ: হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কী! আরও ক'টা মাস যাক।

মন্মথ: কিন্তু নন্দার বিয়ে একটু তাড়াতাড়ি হ'লেই ভাল হত।

নন্দা: দাদার বিয়ে তাড়াতাড়ি হ'লে ভাল হ'ত।

এই পরোক্ষ কথা কাটাকাটি বোধকরি আরও কিছুক্ষণ চলিত, কিন্তু এই সময় সেবক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সেবক: স্যাকরাবাবু এসেছে। পাঠিয়ে দেব?

যদুনাথ: কে—নবীন? হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দে।

চামড়ার ব্যাগ হাতে নবীন স্যাকরা প্রবেশ করিল। মধ্যবয়স্ক, মধ্যমাকৃতি, পুষ্টমধ্যদেশ; চোখে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চশমা। মাথা ঝুঁকাইয়া প্রণামপূর্বক নবীন ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল।

নবীন: নন্দা-দিদির লকেট-হার এনেছি।

নন্দা: (সহর্ষে) আমার লকেট হার!

ব্যাগ হইতে একটি ছোট কৌটা বাহির করিয়া নবীন যদুনাথের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। নীল মখমলের আসনে একটি সরু সোনার হার, তাহার মধ্যস্থলে হীরামুক্তাখচিত একটি পেণ্ডেণ্ট্।

নন্দা দাদুর পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল; যদুনাথ গহনাটি দেখিয়া নন্দার হাতে তুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন—

যদুনাথ: বাঃ, খাসা গড়েছ হে নবীন। এই নে নন্দা।

নন্দা কৌটাটি হাতে লইয়া কিছুক্ষণ আনন্দোজ্জ্বল চোখে চাহিয়া রহিল; তারপর মন্মথ যেখানে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া চা পান করিতেছিল সেইখানে ছুটিয়া গেল। ইতিপূর্বে দাদার সহিত যে বেশ একটু কথা-কথান্তর হইয়া গিয়াছে তাহা আর তাহার মনে রহিল না।

নন্দা: দাদা, দেখ দেখ, কী সুন্দর!

মন্মথ নূতন গহনাটি দেখিল; তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষার মতন একটা দাহ জ্বলিয়া উঠিল। আহা, এমনি একটি গহনা সে যদি লিলিকে দিতে পারিত তাহা হইলে তাহার মান থাকিত? সে শুষ্ক স্বরে বলিল—

মন্মথ: বেশ, ভাল।

মন্মথ ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নন্দা তখন ফিরিয়া আসিয়া যদুনাথের পায়ের ধুলা লইল।

যদুনাথ: বেঁচে থাক্। এখন যা, নিজের ঘরে গিয়ে গলায় প'রে ছাখ—

নন্দা চলিয়া গেলে যদুনাথ নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

যদুনাথ: নবীন, তোমার হিসেব এনেছ?

নবীন: আজ্ঞে এনেছি—

নবীন আবার ব্যাগ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

কাট্।

দ্বিতলে মন্মথর ঘর। মন্মথ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিরসমুখে সাজগোজ করিতেছে। নন্দার নূতন অলঙ্কারটি দেখিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে কল্পনায় ঐ অলঙ্কারটি লিলির কণ্ঠে শোভিত দেখিতেছে এবং মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতেছে। দাশু ও ফটিক লিলিকে নিত্য নূতন উপহার দিয়া থাকে, আর তাহার সে ক্ষমতা নাই। ছি ছি, লিলি হয়তো মনে করে, মন্মথ কৃপণ, ক্ষুদ্রমনা—

ওদিকে নন্দা নিজের ঘরে আসিয়া আয়নার সম্মুখে নূতন হারটি গলায় পরিয়াছিল এবং উৎফুল্ল মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল। তৃপ্তির একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে হারটি গলা হইতে খুলিয়া আবার কৌটার মধ্যে রাখিল। এই সময় দ্বারের নিকট হইতে সেবকের গলা আসিল—

সেবক: দিদিমণি, কর্তা তোমাকে একবার নীচে ডাকছেন।

নন্দা: যাই সেবক—

কৌটাটি পড়ার টেবিলের উপর রাখিয়া নন্দা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল।

মন্মথ নিজের ঘর হইতে সেবকের কথা ও নন্দার উত্তর শুনিয়াছিল। সে টাই বাঁধিতে বাঁধিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া উৎকর্ণ ভাবে শুনিতে লাগিল; তাহার চোখের দৃষ্টি উত্তেজনায় তীব্র হইয়া উঠিল।

বারান্দায় সেবক ও নন্দার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে মন্মথ চোরের মত দরজা খুলিয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিল। কেহ নাই! সে দ্রুত বারান্দা পার হইয়া নন্দার ঘরে প্রবেশ করিল।

ঠিক এই সময় দিবাকর নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে মন্মথকে নন্দার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখে নাই, কিন্তু সিঁড়ির দু'এক পা অগ্রসর হইতেই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, মন্মথ নন্দার ঘর হইতে বাহির হইয়া বিদ্যুদ্বেগে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দিবাকর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মন্মথ সম্ভবত দিবাকরকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু সে নন্দার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল কি জন্য? এবং এমন সন্দেহজনক ভাবে বাহির হইয়া আসিল কেন? নন্দা কি নিজের ঘরে আছে? ব্যাপারটা যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। দিবাকর সংশয়িত চিত্তে দাঁড়াইয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিল।

কাট্।

সিঁড়ির নিম্নতম সোপানে দাঁড়াইয়া নন্দা যদুনাথের সহিত কথা কহিতেছে। যদুনাথ বলিতেছেন—

যদুনাথ: বলছিলাম, আজ আর নূতন গয়নাটা প'রে কাজ নেই। কাল রবিবার, কাল প'রিস। কেমন?

নন্দা: আচ্ছা দাদু—

যদুনাথ: আর ছাখ, দিবাকর বোধ হয় ওপরে আছে, তাকে ব'লে দিস্ হিসেবের খাতায় যেন নোট ক'রে রাখে, সোমবার দিন ব্যাঙ্ক থেকে বারো শ' টাকা বের করতে হবে। নবীনকে আসতে বলেছি, যেন ভুল না হয়।

নন্দা: আচ্ছা দাদু—

সে আবার উপরে উঠিয়া গেল।

কাট্।

উপরের বারান্দায় পৌঁছিয়া নন্দা দেখিল, দিবাকর অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতেছে।

নন্দা: এ কি, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে যে!

দিবাকর: না, কিছু নয়।

নন্দা: শুনুন। দাদু বললেন, খাতায় নোট্ ক'রে রাখুন, সোমবারে ব্যাঙ্ক থেকে বারো শ' টাকা বার করতে হবে। যেন ভুল না হয়।

খাতা দিবাকরের সঙ্গেই ছিল, সে নোট্ করিয়া লইল।

দিবাকর: কি জন্যে টাকা বার করতে হবে তা কিছু বলেন নি?

নন্দা: স্যাকরাকে দিতে হবে।

দিবাকর: ও—(নোট করিয়া) স্যাকরাকে যখন টাকা দিতে হবে তখন নিশ্চয় গয়না এসেছে। এবং বাড়ীতে গয়না পরবার লোক যখন আপনি ছাড়া আর কেউ নেই তখন নিশ্চয় আপনার গয়না। কেমন?

নন্দা: (হাসিয়া) ঠিক ধরেছেন। আপনার দেখছি ডিটেক্‌টিভ হ'তে আর দেরী নেই। কী গয়না বলুন দেখি?

দিবাকর: তা জানিনা।

নন্দা: তবে আর কী ডিটেক্‌টিভ হলেন! আসুন দেখাচ্ছি। ভারি সুন্দর পেণ্ডেণ্ট হার।

নন্দা নিজের ঘরে প্রবেশ করিল; দিবাকর পিছন পিছন গেল।

নন্দা টেবিলের সম্মুখীন হইয়া দেখিল হারের বাক্স নাই। সে ক্ষণকাল অবুঝের মত চাহিয়া রহিল।

নন্দা: এ কি! কোথায় গেল?

দিবাকর: কী কোথায় গেল?

নন্দা: হারের কৌটো। টেবিলের ওপর রেখে এক মিনিটের জন্যে নীচে গিয়েছিলাম—

দিবাকরের মুখ গম্ভীর হইল। সে বুঝিতে পারিল হারের কৌটা কোথায় গিয়াছে।

দিবাকর: অন্য কোথাও রাখেন নি তো?

নন্দা: দ্রুত গিয়া ওয়ার্ডরোব খুলিয়া দেখিল।

নন্দা: না, এখানেও নেই।

সে ফিরিয়া আসিয়া দিবাকরের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার মুখ এই অল্পকালের মধ্যেই বিবর্ণ ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

নন্দা: কেউ নিয়েছে। নৈলে কোথায় যাবে!

দিবাকর: আপনি বলছেন—কেউ চুরি করেছে?

নন্দা: তা ছাড়া আর কী হতে পারে? কর্পূরের মতন উপে যেতে তো পারেনা!

দিবাকর একটু চুপ করিয়া রহিল; তাহার মুখে একটি অস্বচ্ছন্দ হাসি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

দিবাকর: বাড়ীতে জানা চোর এক আমিই আছি। সুতরাং আমাকে সন্দেহ করাই স্বাভাবিক।

নন্দা: আমি আপনাকে সন্দেহ করতে চাই না। কিন্তু আর তো কেউ নেই।—উঃ, আমি কত আশা করেছিলাম—! আমার সব আশা মিছে হয়ে গেল—

নন্দা হঠাৎ যেন ভাঙিয়া পড়িল; সে চেয়ারে বসিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল। দিবাকর ক্ষণকাল করুণচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

দিবাকর: আপনি যে আমাকে সন্দেহ করতে চান না সেজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আপনি কি করবেন?

নন্দা মুখ তুলিল।

নন্দা: কী করব?—একথা তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না; দাদুকে বলতে হবে। সব কথাই এখন দাদুকে বলতে হবে।

দিবাকর: সব কথা?

নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু ঝোঁক দিয়া বলিল—

নন্দা: হ্যাঁ, সব কথা। দাদুকে ঠকিয়েছিলাম তার ফল এখন পাচ্ছি। কোনও কথাই আর চেপে রাখা চলবে না দিবাকরবাবু।

নন্দা দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

দিবাকর: আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখবেন?

নন্দা: অনুরোধ!

দিবাকর: আজ কর্তাকে কিছু বলবেন না। যা হারিয়েছে তা যদি রাত্তিরের মধ্যে না পাওয়া যায় তখন যা হয় করবেন।

নন্দা তীক্ষ্ণ চক্ষে দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিল; একটু ইতস্তত করিল।

নন্দা: আচ্ছা বেশ। আজ রাত্তিরটা সময় দিলাম।

সে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল। দিবাকর একবার মাথা ঝুঁকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ওয়াইপ্।

কয়েক মিনিট অতীত হইয়াছে।

বাড়ী হইতে ফটকে যাইবার পথের ধারে একটা হাস্নুহেনার ঝোপের আড়ালে দিবাকর লুকাইয়া আছে এবং বাড়ীর সদর লক্ষ্য করিতেছে। তাহার চোখে শিকার প্রতীক্ষ' ব্যাধের দৃষ্টি।

সদর দরজা দিয়া মন্মথ বাহির হইয়া আসিল; একবার হাত দিয়া নিজের পকেট অনুভব করিল, তারপর দ্রুত পদে ফটকের দিকে চলিল।

দিবাকরের কাছাকাছি আসিতেই দিবাকর হঠাৎ একটি চীৎকার ছাড়িয়া ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং ছুটিয়া গিয়া মন্মথকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল।

দিবাকর: পালান পালান। সাপ! সাপ!!

মন্মথ: অ্যাঁ! সাপ!

দু'জনে জাপ্টা জাপ্টি করিয়া প্রায় পতনোন্মুখ হইল; তারপর এক সঙ্গে ফটকের দিকে ছুটিল। ফটকের বাহিরে আসিয়া মন্মথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে থামিল।

মন্মথ: কি সাপ?

দিবাকর: হাস্নুহেনার ঝাড়ের মধ্যে ছিল—ইয়া বড় কেউটে সাপ। আর একটু হ'লেই মেরেছিল ছোবল! যাক, আর ওদিকে যাবেন না। আমি সাপ মারার ব্যবস্থা করছি।

মন্মথ: কি আপদ!

মন্মথ আর একবার নিজের পকেট অনুভব করিয়া দেখিল, পকেটের জিনিষ পকেটেই আছে। সে তখন আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

ডিজল্ভ্। (ক্রমশঃ)

বার্গসঁ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

উপজ্ঞা (Intuition)

বার্গসঁর মতে বুদ্ধি-দ্বারা জগতের স্বরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বুদ্ধি সমগ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে। যে বৃত্তি দ্বারা সত্যের সাক্ষাৎলাভ হয়, তাহাকে বার্গসঁ Intuition (উপজ্ঞা) নাম দিয়াছেন। বিশ্বের জীবন প্রবাহের যে আমরা অংশভাক্, উপজ্ঞা-দ্বারাই তাহা আমরা জানিতে পারি।

কালের স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মধ্যে বহুদিন হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ কালকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অপরে কালকে বাস্তবের উপর মনের দেওয়া একটা "ছাপ" বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কালের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যাহা সত্য, যাহা নিত্য, তাহা কালাতীত। বার্গসঁ কালের দ্বিবিধ রূপের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটিকে তিনি গাণিতিক অথবা বৈজ্ঞানিক কাল বলিয়াছেন। বাহ্য জগতে এই কালের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। ইহা জড়বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধমাত্র। একটি জড় পদার্থের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথা বিবেচনা করা যাক্। জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়। ধরা যাক্ এক পাত্র জল তাপ-দ্বারা বাষ্পে পরিণত করিতে ৩০ মিনিট লাগে। এখন তাপ বৃদ্ধি করিয়া যদি ১৫ মিনিটে ঐ জলকে বাষ্পে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে এই সময়ের তারতম্যে জলের অথবা তদুদ্ভূত বাষ্পের প্রকৃতির কোনও ইতর বিশেষ হইবে না। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের গতির বেগ যদি অসীম গুণ বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে জল ও বাষ্প এই দুই অবস্থা যুগপৎ দৃষ্টি সম্মুখে উপস্থিত হইবে। জগৎ পলে পলে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন-গতির বেগ অসীমগুণ বর্দ্ধিত করিয়া যদি কোনও সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের দৃষ্টি-সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাদের পরিবর্ত্তন হইবে না। কোনও বস্তুর স্বরূপেরও বৈলক্ষণ্য হইবে না। সুতরাং বিজ্ঞানে যে কালের ধারণা আছে, তাহা বাহ্যজগতের অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহা বস্তুসকলের মধ্যে এক প্রকার সম্বন্ধ। আমাদের বুদ্ধি সকল দ্রব্য এক সঙ্গে গ্রহণ করিতে অসমর্থ। সেই জন্য একটির পর একটি করিয়া বস্তু বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয়। এই পরবর্ত্তিতা বুদ্ধির বস্তু-গ্রহণের একটা "প্রকার" মাত্র।

কালের দ্বিতীয় রূপকে বার্গসঁ Duration বা স্থিতিকাল নাম দিয়াছেন। Duration ও Elan vital অভিন্ন। প্রত্যেক জীব পরিবর্ত্তন-প্রবাহ মাত্র। আমাদের জ্ঞানও একটী প্রবাহ-মাত্র। একটির পর একটি বস্তু আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে উত্থিত হয় এবং অন্যকে স্থান দিয়া সরিয়া পড়ে। এই অভিজ্ঞতার প্রবাহ অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। এই প্রবাহকেই বার্গসঁ Duration বলিয়াছেন। এই Duration কালের ক্ষুদ্রতম অংশসকলের সমষ্টি নহে। ইহা অতীতের ভবিষ্যৎ-অভিমুখী অবিচ্ছেদ গতি। আমরা জীব, এই জন্য আমরাও Duration-প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত। যদি আমাদের অন্তরস্থ প্রত্যয়-প্রবাহের প্রতি গভীর মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে Durationএর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিতে পারিতাম। কিন্তু এই মনোযোগ বুদ্ধির যোগ নহে। বুদ্ধি-দ্বারা জীবন প্রবাহকে ধরিতে পারা যায় না। সেই প্রবাহের অনুভূতির জন্য প্রয়োজন এমন মনোযোগের, যাহা সহজাত-সংস্কারের ধর্ম্মযুক্ত। সংস্কারের মাধ্যমে আমরা পরমার্থের (reality) সহিত অভিন্নতা অনুভব করি। সংস্কারের মাধ্যমে আমরা জীবনপ্রবাহের মধ্যে-প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত এক হইয়া যাই বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রকৃতির সহজাত-সংস্কারমূলক যে অংশ দ্বারা আমরা Duration এর অব্যবহিত জ্ঞানলাভ করি, বার্গসঁ তাহার নাম দিয়াছেন Intuition। বার্গসঁ বলেন যে, সহজাত সংস্কার ও সমবেদনা এক। এই সমবেদনা যদি তাহার বিষয়ের বিস্তার করিতে এবং চিন্তা করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে প্রাণের ক্রিয়ার রহস্য আমাদের পরিজ্ঞাত হয়। আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন সহজাত সংস্কারই Intuition। সহজাত সংস্কার যখন স্বার্থ-সংস্পর্শহীন, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, এবং স্বকীয় বিষয়ের চিন্তা করিতে এবং সেই বিষয়ের অনির্দিষ্ট পরিমাণ বিস্তার করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার নাম Intuition। সহজাত সংস্কার বশে আমরা বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করি, কিন্তু কিভাবে কোন্ প্রণালীতে সেই কার্য্য আমরা সম্পন্ন করি, তাহা আমরা জানিতে পারি না। সেই সংস্কার অচেতন, নিজের সম্বন্ধে তাহার কোনও জ্ঞান নাই। যখন তাহা তাহার নির্দিষ্ট বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং অন্য বিষয়ে তাহার প্রয়োগ সম্ভবপর হয়, এবং যখন তাহা আপনার জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়, তখন তাহা Intuition পদবাচ্য হয়। কিন্তু কোন্ উপায়ে সহজাত সংস্কার Intuition এ পরিণত করা যায়, কিরূপে তাহার বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া তাহাকে প্রাণের প্রবাহের অব্যবহিত জ্ঞানলাভে নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয়, বার্গসঁ তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই।

বিভিন্ন ধ্বনির সমবায়ে সুর-সংগতির (Symphony) উদ্ভব হয়। বিভিন্ন বর্ণের যথাযথ সংস্থাপনে চিত্রের উৎপত্তি হয়। সুর-সংগতি কিন্তু কেবল বিভিন্ন ধ্বনির সমষ্টি নহে, তাহা একটি নূতন বস্তু, বিভিন্ন ধ্বনির সমবায় হইতে উদ্ভূত। চিত্রও কেবল বিভিন্ন বর্ণের সমবায় নহে। তাহাও বিভিন্ন বর্ণের সমবায় হইতে উদ্ভূত এক নূতন বস্তুর আবির্ভাব। সুর-সংগতি ও চিত্র এইভাবে দেখিলে অবিভাজ্য।

Intuition দ্বারাই সমগ্র সুর-সংগতিও চিত্রের অর্থ বুঝিতে পারা যায়। এই Intuition দ্বারাই আমরা পরমার্থের সমগ্র রূপের দৃষ্টিলাভ করি। যে সুর-সংগতি ও চিত্রের অর্থগ্রহণ করিবার জন্য Intuition এর প্রয়োজন, তাহাদের সৃষ্টির জন্য তাহার প্রয়োজন আরও অধিক। বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তরালে তাহার যে সত্যরূপ, তাহাই আর্টিষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশিত করেন। তাহার বিষয়ের প্রতি তাহার মনের যে সমবেদনা—যে "টান" (sympathy)—তাহার বলেই আর্টিষ্ট বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সত্যরূপ দেখিতে সক্ষম হন। Intuitionও এই প্রকার সমবেদনা। ইহার সাহায্যেই আমরা আমাদের জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হই। Intuition হইতে জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই সত্য জ্ঞান। তাহার বিরোধী সমস্ত বিশ্বাসই ভ্রান্ত।

জড়বস্তু ও বুদ্ধি

জগৎকে আমরা দেশে অবস্থিত নিরেট জড়বস্তুর সমষ্টি রূপে দেখিতে পাই। জগতের এই জ্ঞান আমরা বুদ্ধির নিকট প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমাদের এই দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি নহে, বিজ্ঞান সত্য জ্ঞান নহে। সত্য জ্ঞান দেওয়া বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। কেননা সে উদ্দেশ্যে বুদ্ধির উদ্ভব হয় নাই। বুদ্ধির সৃষ্টি হইয়াছে, কর্ম্মের প্রয়োজন-সাধনের জন্য। সত্য-আবিষ্কার তাহার উদ্দেশ্যও নয়, তাহার সাধ্যের আয়ত্তও নহে। বিরামহীন পরিবর্ত্তনের প্রবাহের মধ্যে স্থাপিত প্রাণ কর্ম্ম করিবে কি দিয়া? যে দিকে চায়, কিছুই স্থির নাই; যাহা ধরিতে হস্ত প্রসারিত করে, ধরিতে ধরিতে তাহা বিলীন হইয়া যায়, তাহার স্থানে নূতনের আবির্ভাব হয়। এ অবস্থায় কোন কর্ম্মই সম্ভবপর হয় না। কর্ম্মের পথে এই বাধা দূরীকরণের জন্য বুদ্ধির আবির্ভাব হইল; প্রাণ বুদ্ধির সৃষ্টি করিল। বুদ্ধি প্রবহমান পরিবর্ত্তনরাজির মূর্ত্তি নিশ্চল রূপে ধারণ করে; পরিবর্ত্তমান প্রকৃতিকে নিশ্চল রূপে দেখিতে পায়; যাহা বহিয়া যাইতেছে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভিন্ন নিরেট পিণ্ডের সৃষ্টি করে। অনন্তজগৎ ও নিরংশক প্রবাহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। বাহ্যজগতে যে সকল বস্তু আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখি, তাহারা বাস্তবিক ভিন্ন নহে। তাহাদের যে সকল সীমারেখা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। তাহারা সকলেই একত্র এক স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। আমাদের স্বকীয় প্রয়োজন সাধনের জন্য আমরা প্রবহমান পরমার্থের (Reality) উপরে খণ্ড খণ্ড রূপের আরোপ করিয়াছি। এই খণ্ড খণ্ড রূপ যে সত্য নহে, "গতি"র বিষয় আলোচনা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। গ্রীক দার্শনিক জেনোর উড়ন্ত তীর ইহার এক দৃষ্টান্ত। জেনো বলিয়াছিলেন তীরের যে বাস্তব কোনও গতি নাই, তাহা তীর ছুঁড়িবার পরে যে কোনও ক্ষণে তাহার অবস্থানের বিষয় বিবেচনা করিলে উপলব্ধি হইবে। সেই ক্ষণে সেই তীর হয় সেই স্থানে অবস্থান করিতেছে, অথবা অবস্থান করিতেছে না। যদি অবস্থান করিতেছে ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার গতি নাই বলিতে হইবে। আবার সেই বিন্দুতে যদি তখন তীরটি না থাকে, তবে তাহার অস্তিত্বই নাই। সুতরাং সেই ক্ষণে তীরটির গতি নাই। এইরূপে ইহার পরমুহূর্ত্তেও তাহার গতি নাই। সুতরাং তীরের কোনও সময়ই গতি নাই।

উইলিয়াম জেম্‌স্ এই প্রকার যুক্তির বলে কালেরও যে গতি নাই, তাহা দেখাইয়াছিলেন। একঘণ্টা সময়ের কথা ভাবুন। সমস্ত ঘণ্টাটি অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে, তাহার অর্দ্ধেক ত্রিশ মিনিটকে অতিবাহিত হইতে হইবে। এই অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে তাহার অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইবে। সেই অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে তাহারও অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যতই কম হউক না কেন, সমগ্র ঘণ্টাটি অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে কিছু সময় অনতিবাহিত থাকিয়াই যাইবে। সুতরাং সমগ্র ঘণ্টাটি কখনও সম্পূর্ণ অতিবাহিত হইতে পারে না। ইহা হইতে অনেকে বলিয়াছেন, যে গতির অস্তিত্ব নাই; পরিবর্ত্তন ও কালও অস্তিত্বহীন। কিন্তু বার্গসঁর মতে কাল, গতি ও পরিবর্ত্তনই একমাত্র সত্য। জেনো ও জেম্‌স্ যে যুক্তির বাধার উল্লেখ করিয়াছেন, বুদ্ধি-কর্ত্তৃক সমগ্রের বিভাগই তাহার কারণ। গতির প্রবাহকে—বিরামহীন গতিকে—বুদ্ধি খণ্ড খণ্ড করে; তাহাকে ক্ষণ ও বিন্দুতে বিভক্ত করে; সমগ্র অনবচ্ছিন্ন কালকে ঘণ্টা, অর্দ্ধ ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ডে বিভক্ত করে। কিন্তু এই বিভাগ সত্য নয়। সে বিভাগের অস্তিত্ব নাই, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়ার ফলে ভ্রান্ত মীমাংসা উদ্ভূত হয়। সমগ্র গতিও সমগ্র কাল বুদ্ধি ধারণ করিতে পারে না। তাই গতিকে বহু বিন্দুতে এবং কালকে বহুক্ষণে বিভক্ত করে। Cinematograph এর কাজও বুদ্ধির কাজ একরূপ। চলন্ত বস্তুর প্রতিক্ষণের রূপ Cinematographএ প্রতিবিম্বিত হয়। একদল সৈন্য যখন "মার্চ্চ" করিয়া যাইতেছে, তখন Cinematographএ তাহার প্রতিক্ষণের যে রূপ স্বতন্ত্রভাবে বাঁধা পড়ে, তাহা নিশ্চল। সেই সকল চিত্র পাশাপাশি রাখিলে তাহার মধ্যে জীবন্ত সৈন্যদলের চলন্তরূপ প্রকাশিত হইবে না। শ্রেণীবদ্ধ চিত্রের 'ফিলম্' যখন প্রদর্শকের যন্ত্রে স্থাপিত হয়, তখন সেই যন্ত্রের গতি তাহাতে সংক্রামিত হয়, তখন তাহাতে গতি-শীল সৈন্যদলের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধিতে নিরন্তর গতি-শীল জগৎ দেশে বিস্তৃত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু রূপে প্রতিভাত হয়। পরমার্থের যে রূপের সহিত আমাদের পরিচয় সংসাধিত হয়, উহা তাহার সত্য রূপ নহে। "জড়বস্তু যদি বিরামহীন পরিবর্ত্তনের প্রবাহ-রূপেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইত, তাহা হইলে আমাদের কোনও কর্ম্মেরই আমরা শেষ দেখিতে পাইতাম না। এক কর্ম্ম-শেষে কর্ম্মান্তর যাহাতে আরব্ধ হইতে পারে, সেই জন্য জড়বস্তুরও এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর-প্রাপ্তি আবশ্যক।" এই অবস্থান্তর প্রতিপলে সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু তাহা অস্থির—ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। এই জন্যই 'বুদ্ধি' প্রত্যেক অবস্থাকে স্থির ও নিশ্চলরূপে আমাদিগের নিকট উপস্থাপিত করে। কিন্তু বুদ্ধি এই উদ্দেশ্যে পরমার্থের বিরামহীন প্রবাহের মধ্যে যে সকল সীমারেখা স্থাপন করে, তাহা মিথ্যা। কোনও সীমারেখা পরমার্থের অভ্যন্তরে প্রকৃতপক্ষে নাই। বুদ্ধির এই ক্রিয়ার ফলেই আমরা পরমার্থকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নিরেট বস্তুর সমবায়রূপে দেখিতে পাই।

আমাদের বুদ্ধি জড়বাদী। জড়ের সহিত দ্বন্দ্বে প্রাণকে সাহায্য করিবার জন্যই "বুদ্ধি" অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বুদ্ধির সমস্ত প্রত্যয় (Concepts) এবং তাহার সমস্ত নিয়ম জড়বস্তু হইতে প্রাপ্ত। জড়ের মধ্যে নিয়মের রাজত্ব দেখিয়া বুদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেই নিয়ম-দ্বারা শাসিত বলিয়া মনে করে। আমাদের পরিবেশের সহিত আমাদের দেহের পূর্ণ উপযোগিতা-বিধানের জন্য বাহ্যবস্তু সকলের জ্ঞান আবশ্যক। এই জন্য নিরেট জড়ের সহিতই বুদ্ধির কারবার, বুদ্ধি সমস্ত ভবনকে (Becoming) নিশ্চল সত্তা (Being) রূপে, বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণীরূপে দেখে। বস্তু দলের সংযোজক সূত্রকে—যে কাল স্রোতঃ যাবতীয় বস্তুর প্রাণ স্বরূপ, তাহাকে বুদ্ধি দেখিতে পায় না। সিনেমা-চিত্রের ক্যামেরা যেমন গতিকে ধরিতে না পারিয়া চলন্ত বস্তুর প্রতিক্ষণের অবস্থাকে নিশ্চলরূপে ধারণ করে, তেমনি আমাদের বুদ্ধিও পরমার্থের (Reality) গতি ধরিতে অসমর্থ হইয়া, তাহাকে বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণীরূপে ধারণা করে। পরমার্থের অন্তরস্থ প্রাণের প্রেরণা তাহার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। আমরা জড় বস্তু দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার অন্তরস্থ শক্তিকে (Energy) দেখিতে পাই না। জড়কে জানি বলিয়া আমরা মনে করি, কিন্তু যখন পরমাণুর অন্তস্থলে "শক্তির" সন্ধান পাই, তখন আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি, আমাদের সমস্ত ধারণা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। ঊনবিংশশতাব্দীতে গণিত শাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছে, দৈশিক জ্যামিতির (geometry of Space) সহিত কাল ও গতির প্রত্যয়ের ব্যবহারের ফলেই তাহার সম্ভব হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই সন্দেহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যে যাহাকে নিশ্চিত বিজ্ঞান (Exact Science) বলা হয়, তাহা সত্যের নৈকট্য (approximation) প্রাপ্ত হইলেও হয়তো সম্পূর্ণ সত্য তাহাতে ধরা পড়ে নাই ; পরমার্থের নিশ্চেষ্টতাই (inertia) তাহাতে ধরা পড়িয়াছে, তাহার প্রাণ ধরা পড়ে নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রত্যয় সকল (concepts) চিন্তা-রাজ্যের অনুপযোগী। চিন্তা রাজ্যে তাহাদের প্রয়োগের ফলেই নিয়তিবাদ (determinism), যান্ত্রিকতাবাদ (mechanism) এবং জড়বাদের উদ্ভব হইয়াছে। এক মাইলের চিন্তা এবং অর্দ্ধ মাইলের চিন্তা, আমাদের নিকট উভয়ই সমান। এক নিমেষে আমাদের চিন্তা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে সমর্থ। আমাদের প্রত্যয়দিগকে দেশে সঞ্চরমান জড়কণা-রূপে চিন্তা করিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। তাহাদিগকে দেশে সীমা-বদ্ধরূপে কল্পনা করাও সম্ভবপর হয় না। প্রাণ এই সকল "নিরেট" প্রত্যয় (solid concepts) এড়াইয়া যায়—তাহাদের মধ্যে ধরা পড়ে না। প্রাণ কালাত্মক, দেশাত্মক নহে, পরিবর্তন-মূলক, স্থিতিমূলক নহে, গুণবাচক, পরিমাণবাচক নহে। অবিরাম সৃষ্টিই ইহার কাজ।

বুদ্ধি ও চিন্তা-দ্বারা যদি প্রাণের স্বরূপ বুঝিতে পারা না যায়, প্রাণের প্রবাহ যদি বুদ্ধিতে ধরা না পড়ে, তবে তাহা ধরিবার উপায় কি ? কিন্তু বুদ্ধিই তো জ্ঞানের একমাত্র উপায় নহে। মনের সমস্ত চিন্তা বিদূরিত করিয়া যদি আমাদের অন্তরতম সত্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, তখন আমরা কি দেখিতে পাই ? তখন জড় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, দৃষ্টিগোচর হয় আমাদের মন (Mind)। তখন দেশের সাক্ষাৎ পাই না, কালের গতি দেখিতে পাই। নিষ্ক্রিয়তা দেখিতে পাই না, দেখিতে পাই কর্ম্ম (action)। নিয়তি সেখানে নাই, আছে স্বাধীনতা। তখন প্রাণের প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয়। সে প্রবাহ প্রাণহীন ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থার শ্রেণী নহে—তাহা জীবন্ত প্রাণ-প্রবাহ। প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ মৃত ভেকের পদ-পরীক্ষা-কালে যাহা দেখিতে পান, ইহা তাহা নহে। ইহা অব্যবহিত জ্ঞান ; ইহাই উপজ্ঞা Intuition। পরিচিন্তন (Reflective thought) জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রূপ নহে। শোনা কথা অপেক্ষা অবশ্য ইহা উৎকৃষ্ট ; কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইতেছে বস্তুর অব্যবহিত জ্ঞান। Intuitionই অব্যবহিত জ্ঞান। জীবন-স্রোতের ধারে আমরা কাণ পাতিয়া থাকি এবং জীবন স্রোতের কলধ্বনি শুনিতে পাই। মনকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। বুদ্ধির বক্রপথে গিয়া আমরা মীমাংসা করিয়া বসি যে মস্তিষ্কের মধ্যে অণুদিগের নৃত্যই চিন্তা (thought) ; কিন্তু Intuition-বলে আমরা জীবনের মর্ম্মস্থল দেখিতে পাই।

কিন্তু বুদ্ধিকে এক প্রকার পীড়া বলিয়া গণ্য করিবার কারণ নাই। বুদ্ধি বিশ্বাস-ঘাতকও নহে। বুদ্ধির কারবার জড়বস্তুর সহিত, দেশে অবস্থিত বস্তুর সহিত, প্রাণ ও মনের দেশে প্রকাশের সহিত। সে কার্য্য বুদ্ধি ঠিক করিয়া যায়। Intuition আমাদিগকে দেয় প্রাণ ও মনের অব্যবহিত অনুভূতি ; বুদ্ধি তাহা দিতে পারে না।

চেষ্টা যাহার স্বভাব, যাহা আপনাকে বহির্দেশে এবং ঊর্দ্ধ দেশে প্রসারিত করে, তাহাই প্রাণ। ইহা জড়তার—নিশ্চেষ্টতার—বিপরীত। আকস্মিকতারও বিপরীত। এক লক্ষ্যাভিমুখে ইহার গতি। জড় ইহাকে অন্যদিকে—নিশ্চলতা ও মৃত্যুর দিকে—আকর্ষণ করে। প্রাণের বাহনের সহিত প্রতি পদে প্রাণকে সংগ্রাম করিতে হয়। সন্তান-উৎপাদন করিয়া প্রাণ মৃত্যুকে জয় করে বটে, কিন্তু সেই জয়ের জন্য তাহাকে তাহার প্রত্যেক দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, এবং প্রত্যেক দেহকে জড়তা ও ধ্বংসের হাতে সমর্পণ করিতে হয়। দণ্ডায়মান হইতেও তাহাকে জড়ের নিশ্চেষ্টতা জয় করিতে হয়। উদ্ভিদের মতো নিশ্চল না থাকিয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিবার জন্য তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয় এবং ক্লান্তি ভোগ করিতে হয়। যখনি সুযোগ ঘটে, সংবিদ্ সংস্কার, অভ্যাস এবং নিদ্রার যান্ত্রিকতায় শান্তির মধ্যে ডুবিয়া যায়।

যাত্রার প্রারম্ভে প্রাণ প্রায় জড়ের মতই নিশ্চেষ্ট ; এক স্থানে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে ; যেন সম্মুখে অগ্রসর হইতে ভয় পায়। অভিব্যক্তির এক পথে এই নিশ্চেষ্ট নিরাপত্তাই প্রাণের লক্ষ্য হইয়া আছে। লিলি ও ওক্ বৃক্ষ ইহার উদাহরণ। কিন্তু উদ্ভিদের এই নিশ্চলতায় প্রাণের আবেগ তৃপ্ত হয় নাই। চিরদিন প্রাণ নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতার দিকে ছুটিয়াছে ; কচ্ছপ ও কর্কটের কঠিন আবরণ পরিহার করিয়া পক্ষীর স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হইয়াছে। যাহারা অধিকতর বিপদ বরণ করিয়াছে, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছে। মানুষ তাহার শরীরে নূতন অঙ্গের উদ্ভাবন করে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সকল যন্ত্র প্রয়োজনকালে

ব্যবহার করে ; প্রয়োজন শেষ হইলে রাখিয়া দেয়। mastodon এবং megatheriun তাহাদের বিশাল দেহখানি সর্ব্বদা বহন করিয়া বেড়াইত। এই গুরুভার বহন করিতে হইত বলিয়া তাহারা পৃথিবীর প্রভুত্বলাভে সমর্থ হয় নাই। মানুষ তাহা করে নাই। যন্ত্রদ্বারা জীবনের যেমন সাহায্যও হয়, তেমনি বাধাও হয়।

সহজাত সংস্কার মনের যন্ত্র। দেহের অঙ্গ দেহের সহিত স্থায়ীভাবে সংযুক্ত বলিয়া, তাহাদিগকে বর্জন করা সম্ভবপর হয় না। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে যখন কোনও অঙ্গের প্রয়োজনের শেষ হয়, তখনও তাহা অনাবশ্যক ভারস্বরূপ দেহে লাগিয়া থাকে। সহজাত সংস্কারের প্রয়োজনও যখন শেষ হয়, তখন তাহা ভারস্বরূপ হয়। পরিবর্ত্তিত পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধানে সহজাত সংস্কার কোনওকাজে লাগে না। বর্ত্তমান কালের জীবনের জটিলতা-সমাধানে সহজাত সংস্কারের কোনও উপযোগিতাই নাই। সহজাত সংস্কার নিরাপত্তার বাহন, কিন্তু বুদ্ধি বিপন্মুখী, দুঃসাহসী, স্বাধীনতার যন্ত্র। জীবন যান্ত্রিকতাকে অবজ্ঞা করে। যখন কোনও জীব জড়ের মতো, যন্ত্রের মতো, ব্যবহার করে তখন আমাদের হাসি পায়। যখন রঙ্গক্ষেত্রে কোনও ভাঁড় (clown) আসিয়া যেখানে দেয়াল নাই, সেখানে দেয়ালের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া, তাহাতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে গিয়া ভূতলে পতিত হয়, অথবা আমাদের স্নেহভাজন কেহ কর্দমাক্ত পথে চলিতে গিয়া পড়িয়া যায়, তখন আমরা হাসিয়া উঠি কেন? মানুষের জড়ের মতো আচরণ আমাদিগের নিকট হাস্যজনক ও লজ্জা-জনক বলিয়া প্রতীত হয়। দর্শন-শাস্ত্রে মানুষকে যন্ত্রের মত বলিয়া বর্ণনা করা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর লজ্জা-জনক।

যাত্রাপথে প্রাণ তিন দিকে অগ্রসর হইয়াছে। একপথে উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় নিশ্চলতাপ্রাপ্ত হইয়া নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়পথে তাহার সাহস ও চেষ্টা সহজাত সংস্কারের মধ্যে জমাট বাঁধিয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। (যেমন পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার মধ্যে) তৃতীয় পথে মেরুদণ্ডী জীবে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া প্রাণ চিন্তার অনুসঙ্গী বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছে এবং তাহার সমস্ত স্বার্থ এবং আশা বুদ্ধির মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়াছে।

জড়বস্তু

বিরামহীন পরিবর্ত্তন-প্রবাহকে বুদ্ধিদেশে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু রূপে দেখিতে পায়। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বুদ্ধির কল্পনা-মাত্র নহে। ইহার বুদ্ধি-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। অনবরত সম্মুখগামী জীবন-প্রবাহের অতিরিক্ত অন্য একটি বস্তুর অস্তিত্বও আছে। এই বস্তু "জড়বস্তু", ইহার সহিত বুদ্ধির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই "জড়বস্তু"ও Elan Vital হইতে উদ্ভূত। ইহা Elan Vital এরই একটা রূপ। যে ক্রিয়ার ফলে Elan Vital হইতে বুদ্ধির উদ্ভব হয়, তাহারই ফলে সঙ্গে সঙ্গে "জড়ে"রও উদ্ভব হয়। উভয়েই Elan Vitalএর মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং বর্ত্তমানেও আছে। Elan Vitalএর এই রূপের স্বরূপ কি? Elan Vitalএর যে রূপকে বুদ্ধি জড়জগৎরূপে গ্রহণ করে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি ?

বার্গস বলিয়াছেন Elan Vital অন্তহীন সৃষ্টি-প্রেরণা। ইহা অবিরাম স্রোতে প্রবাহিত। কিন্তু এই প্রবাহ বাধাহীন নহে। কোনও একস্থানে প্রবাহ যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহার গতি পুরাংমুখী হয়। এই বিপরীতমুখী গতিই "জড়বস্তু"। তখনও গতির বিরাম হয় না, বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গতির দিক পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। প্রাণের গতি যে দিকে, তাহার বিপরীতমুখী গতিই 'জড়'। বার্গস হাউই বাজির সহিত প্রাণের উপমা দিয়াছেন। ঊর্দ্ধমুখী হাউই আকাশে উঠিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং ছাই হইয়া মাটিতে পড়ে। অগ্রগামী প্রাণের নির্ব্বাপিত অংশই "জড়"। বার্গস ঊর্দ্ধমুখী ঝরণার সহিতও প্রাণের উপমা দিয়াছেন। ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় ঝরণা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে, তাহার গতিবেগে জলকণা সকলের পতন বিলম্বিত হয়। কিন্তু অবশেষে জলকণাসকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। ঊর্দ্ধাভিমুখী জল-রেখা প্রাণের প্রতীক। ভূপতিত জলবিন্দুসকল সৃষ্টি-প্রবাহের পরিত্যক্ত অংশ—তাহারা জড়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সাজাহান

শ্রীসুধীর গুপ্ত

মৃত্যু দিল অমৃতের গুপ্ত-পথ খুলি',
কাল-তরঙ্গিনী-তীরে তাই রাজ্য ভুলি'
মর্ম্মরের 'মমতাজ' গড়িলে পূজারী ;
বিদেহী রূপের স্মৃতি, প্রেম অনাহারী
লভিল অতনু-ভাষা অমর মর্ম্মরে।
কত সিংহাসন এলো, গেলো তারপরে
আগ্রায় আগ্রহে ; জ্বলিল—নিভিল বাতি ;
দিবসের সূর্য্য-শিখা অমাবস্যা-রাতি
একাকার করি' দিল গাঢ় তমিস্রায় ;
ঘটনার ঘন-ঘটা পাণ্ডুর পাতায়
অনাদৃত ইতিহাসে মূক স্তূপাকার।
তুমি শুধু জেনেছিলে মানব-আত্মার
শাশ্বত সাধনা—সূক্ষ্ম-প্রেমের স্বরূপ ;
মর্ম্মর লভিল তাই মর্ম্মাতীত রূপ।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা

প্রভাকর

বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গসাহিত্যের নানা দিক দিয়া নানা উন্নতি হইলেও বাংলার নাট্য সাহিত্য আশানুরূপ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। পরিমাণের দিক দিয়া বিচার না করিয়া উহার উৎকর্ষের দিক বিবেচনা করিলেও দেখা যায়—উহা বাংলার পাঠকসমাজের চিত্তে কোনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। মহাকবি গিরিশচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে যে অপূর্ব্ব নাট্যাবলী সৃষ্টি করেন, সেগুলি অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। কবিত্ব শক্তিতে, বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে, লোক চরিত্র বিশ্লেষণে, ঘটনা-সংস্থানে ও ভাবসম্পদে ইহাদের তুলনা নাই। সেই জন্যই এই নাটকগুলি বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গিরিশচন্দ্রের পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত শক্তিশালী কেহই ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের সময়কাল পর্য্যন্ত এই ধারা অনেকটা অব্যাহত ছিল। ফলে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চও তাহার লোকরঞ্জন ক্ষমতা হারায় নাই। কিন্তু আজকাল যেন বাংলার রঙ্গমঞ্চ একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। যে সকল জনপ্রিয় নাট্যালয় একদা উৎসুক নাট্যামোদী-সমাগমে পরিপূর্ণ থাকিত, এখন তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও দর্শক আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইতেছে না। ইহার কারণ কি? কি জন্য রঙ্গমঞ্চের ন্যায় লোকশিক্ষা ও আনন্দ-পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের এরূপ অবনতি ঘটিল?

কেহ কেহ বলেন, গিরিশ ও তৎপরবর্ত্তী যুগে যেরূপ প্রতিভাশালী অভিনেতার সমাবেশ হইয়াছিল, সেরূপ আর অধুনা নাই; সেই জন্যই রঙ্গমঞ্চ প্রাণবন্ত অভিনয় দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছে না। কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অলোক-সামান্য প্রতিভা লইয়া সকল অভিনেতা জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু তাঁহার সমপর্য্যায়ভুক্ত অভিনেতা বর্ত্তমান যুগে নাই বলিয়া রঙ্গমঞ্চ একেবারে প্রাণহীন হইয়া যাইবে, একথাও মানিয়া লওয়া যায় না। এ যুগে যে সকল প্রতিভাবান অভিনেতা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা যে কোনও রঙ্গমঞ্চে প্রাণসঞ্চার করিতে পারেন। ক্ষমতার তারতম্য এখানে খুব বড় কথা নয়। আসল কথা এই যে, আধুনিক যুগে অভিনয়োপযোগী উচ্চশ্রেণীর নাটকের অভাবই রঙ্গমঞ্চের এই অবনতির প্রধান কারণ। সুদক্ষ নাট্যকার প্রণীত সুলিখিত নাটক না পাইলে কৃতী অভিনেতাগণ স্বীয় প্রতিভার সম্যক বিকাশসাধন করিতে বা দর্শকের প্রাণস্পর্শ করিতে পারেন না। ফলে, এইরূপ নাটক বেশীদিন চলিতে পারে না।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, বর্ত্তমান কালে পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর নাট্য-সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে না কেন? বঙ্গ সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হইলেও কি জন্য নাট্য সৃষ্টির দিক দিয়া এই সাহিত্য পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না? বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই প্রশ্নটি লইয়াই আলোচনা করিব।

প্রথমেই দেখা দরকার, জাতীয় জীবনের যে অবস্থা নাট্য-সাহিত্যের পরিপোষক, এখন তাহার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কি না। ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের যুগে নাট্য-সাহিত্য গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল। সে সময়ে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবন সম্পদে, শিল্পে, বাণিজ্যে ও সামরিক শক্তিতে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। নব নব দেশ আবিষ্কার ও অধিকারের ফলে জাতির দৃষ্টিরও প্রসার হইয়াছিল। এইরূপ নানা ঘটনাবহুল, সতেজ, সজীব প্রবল জীবনধারাকে যদি নাট্য-সৃষ্টির অনুকূল বলিয়া ধরা যায়, তবে আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দী যে সে দিক দিয়া নাট্য সৃষ্টির অনেকটা উপযোগী ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্যের ভাব-সংঘাতে রুদ্ধস্রোত জাতীয় জীবনে তখন নবজীবনের বিপুল প্লাবন আসিয়াছে। শিল্পে, সাহিত্যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে সেই প্রবল প্রবাহ নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। দৃষ্টির সংকীর্ণতা ঘুচিয়া যাওয়ায় জাতি তখন জগৎ ও জীবনকে উদার ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিবার ইঙ্গিত লাভ করিয়াছে। বাংলার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্বেল জীবন-স্রোত তখনকার নাট্য সাহিত্যে—বিশেষ করিয়া গিরিশ-নাট্যে—মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আধুনিক যুগে অন্য নানা দিক দিয়া বৈচিত্র্যের দাবী করিতে পারিলেও, নূতনত্বের স্পন্দন হারাইয়া ফেলিয়াছে। নূতন ভাবের সংঘাতে যে স্রোত একদিন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল, জাতির বিস্মিত চোখের সম্মুখে নূতন বিশ্ব উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল, জাতি আজ তাহা অনেকাংশে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে—এখন আর তাহার মধ্যে অসাধারণত্ব বা অভিনবত্ব কিছুই নাই। অবশ্য নানা ঘটনার ও নানা সমস্যায় ঘাত-প্রতিঘাত আজও জাতীয় জীবনে মাঝে মাঝে বিপুল আলোড়ন লইয়া আসে, কিন্তু বাংলা কথা-সাহিত্যের মধ্যে তাহা যেমন সুস্পষ্ট এবং সুষ্ঠুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে সেরূপ হয় নাই। আধুনিক নাটক যেন জাতীয় জীবন হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; ফলে, উহা আর ঐ জীবন সম্যকরূপে প্রতিফলিত করিতে পারিতেছে না। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন যে একেবারেই নাট্য-সৃষ্টির পরিপন্থী, এ কথা বলা চলে না; প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বাংলা নাটক কোনও কারণে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ বেদনার প্রকৃষ্ট বাহন হইতে পারিতেছে না।

কেহ কেহ এই অবস্থার জন্য আধুনিক চলচ্চিত্রকে দায়ী করেন। অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে নূতনতর আনন্দ ও শিক্ষার সন্ধান দিয়া চলচ্চিত্র রঙ্গমঞ্চের অনেক দর্শককে স্থানান্তরে আকৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রকৃত নাট্যামোদীগণ সু-অভিনীত উচ্চশ্রেণীর নাটক পাইলে কখনই চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিবেন না। চিত্র কখনই মানুষের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। রক্তমাংসের মানুষ—বিশেষতঃ জনপ্রিয় অভিনেতা—যখন মানবের অন্তরের ভাবকে জীবন্ত রূপ দান

করেন, দর্শকের মনে তাহার আবেদন চিত্রের ভাব-ব্যঞ্জনার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী—সে চিত্র নির্ব্বাকই হউক বা সবাকই হউক। প্রমাণ স্বরূপ ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চের কথা বলা যাইতে পারে। চলচ্চিত্রের বহুল প্রচলন সত্ত্বেও সেখানে রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়তা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উৎকৃষ্ট নাটক উচ্চশ্রেণীর অভিনেতার দ্বারা অভিনীত হইয়া এখনও সেখানে নাট্যামোদীদিগকে অজস্র আনন্দ বিতরণ করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বাংলা নাটক আপন অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার ফলেই চলচ্চিত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে নাই। তাহা না হইলে আধুনিক জগতের সর্ব্বত্রই বাংলা রঙ্গমঞ্চের ন্যায় শোচনীয় অবস্থা দেখা যাইত। তবে চলচ্চিত্রের দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদৌ কোনও ক্ষতি হয় নাই, এ কথাও বলা চলে না। চলচ্চিত্র যেটুকু ক্ষতি করিয়াছে, তাহা দর্শককে আকৃষ্ট করিয়া নহে, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃবর্গকে আকৃষ্ট করিয়া। উচ্চ বেতন, নূতনত্ব এবং অধিকতর যশের লোভে বাংলার প্রতিষ্ঠাবান অভিনেতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছায়াচিত্রে যোগদান করিয়াছেন। ফলে, রঙ্গমঞ্চে শক্তিশালী অভিনেতার অভাব ঘটিয়াছে। এইরূপ অভিনেতা না থাকিলে উচ্চশ্রেণীর নাটককে প্রাণবন্ত রূপ দান করা অসম্ভব। তাই, ক্ষমতা থাকিলেও হয়ত অনেক সাহিত্যিক উৎসাহের অভাবে উচ্চশ্রেণীর নাট্য-সৃষ্টি হইতে বিরত আছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ আশঙ্কা করা এখন অসঙ্গত নহে যে, উচ্চাঙ্গের নাটক লিখিত হইলে তাহাকে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা হয়ত ভাবসমৃদ্ধ জীবন্ত রূপ দান করিতে সক্ষম হইবেন না। তাহা ছাড়া, রঙ্গমঞ্চের বর্ত্তমান হীনপ্রভ অবস্থাও কোনও নাট্যকারকে উচ্চশ্রেণীর নাট্য-সৃষ্টিতে প্রলুব্ধ করিবার মত নহে। সাফল্যের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইলে কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক রচনার আয়াস স্বীকার করিবে? সেই জন্যই চলচ্চিত্রে অভিনয়োপযোগী নাট্য-সৃষ্টির দিকেই সাহিত্যিকগণের অধিক দৃষ্টি গিয়াছে এবং মৌলিক রচনা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দান করাই বেশি প্রচলিত হইয়াছে।

আমার মতে বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্যের উৎকর্ষের প্রধান অন্তরায় বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত। নাটকের আকার, গঠন-শিল্প ও বিষয়বস্তু প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদেশীয় নাট্যাদর্শ এ যুগে আমাদের সাহিত্যে সম্পূর্ণ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। আমাদের দেশীয় প্রাচীন নাট্যাদর্শ গিরিশচন্দ্রের হাতে যে পরিমার্জ্জিত রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে শেক্স্পীয়ারের প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও, তাহা বাংলার নিজস্ব ধারাটি হারায় নাই। তাই, অতি অনায়াসেই ঐ নাট্যাবলী বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। বাংলার প্রাণ-কেন্দ্রের সহিত নিগূঢ় সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিদেশী আদর্শকে গিরিশচন্দ্র ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন, যতটুকু নাট্য-শিল্পের উৎকর্ষের পক্ষে এবং পরিবর্ত্তিত সমাজ এবং পরিমার্জ্জিত-রুচি দর্শকের মনোরঞ্জনের পক্ষে আবশ্যক ছিল। সে গ্রহণকে অনুকরণ বলা যায় না—অর্জ্জন বলিতে হয়। কারণ, আলো-হাওয়া-রসে সেই আদর্শকে তিনি এমনভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন, যাহাতে তাহা একান্তই বাংলার নিজস্ব-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, বাংলার স্বকীয় সুর তাহাতে বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু অধুনা বিদেশীয় সাহিত্যের সহিত অতি-ঘনিষ্ঠতার ফলে বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবার দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া নাট্য-সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই সংঘর্ষ কি ফল প্রসব করিয়াছে, তাহাই আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব। যে সময় হইতে ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি ইউরোপীয় নাট্যকারগণের লেখার সহিত বাংলার পরিচয় ঘটিল, তখন হইতেই তাঁহাদের নাটকের ভাব, রূপ ও আদর্শ বাংলার নাট্য-সাহিত্যকে প্রভাবিত করিতে সুরু করিল। তবে গিরিশচন্দ্র যেমন অসামান্য প্রতিভাবলে বিদেশীয় উৎকৃষ্ট অংশটুকুকে বাংলার ধাতের অনুকূল করিয়া গড়িয়া লইয়াছিলেন, এ যুগে কিন্তু তাঁহার মত ক্ষমতার অভাবেই হউক বা অন্যকারণেই হউক, তেমনটি হইল না। আমার মনে হয় নাটক সম্বন্ধে নানারূপ বিরুদ্ধ আদর্শের একত্র সমাবেশে আমাদের আধুনিক নাট্য-শিল্পিগণ কতকটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন—কোনটি দেশ ও কালোপযোগী তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। নাটক নীতিমূলক হইবে কি বস্তুতান্ত্রিক হইবে, রূপক কি সমস্যামূলক হইবে, ঘটনা-বৈচিত্র কি ভাবসমৃদ্ধ হইবে, এইরূপ নানা সমস্যা আধুনিক নাট্যকারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ফলে, নাট্য সৃষ্টিক্ষেত্রে এখন পরীক্ষার যুগ চলিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার নাটকের আদর্শ ও গঠন লইয়া এখন কেবল পরীক্ষাই চলিতেছে। যেরূপ প্রতিভার অধিকারী হইলে নাট্যকার জাতির জীবনকে সমগ্রতার দৃষ্টিতে দেখিয়া নাটকে প্রতি-বিম্বিত করিতে পারেন, হয়ত সেরূপ প্রতিভা আজ নাট্য-সাহিত্যে নাই। তাই, অনেক স্থলেই অক্ষম হস্তের অপটু অনুকরণই নাট্যসৃষ্টির স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্যই নানা অভিনব প্রণালীতে নাটক রচিত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি জনসাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী আসনলাভ করিতে পারিতেছে না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব বিশ্লেষণ বা জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে কোনও কোনও আধুনিক নাট্যকার বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু জাতি ও তাহার চিরন্তন আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারার জন্য তাঁহাদের সেই সৃষ্টি স্থায়ী সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। বাস্তবিক কোনও নাটকই কেবলমাত্র চমকপ্রদ অভিনবত্বের বলে লোকের হৃদয় জয় করিতে পারে না। নাট্যকারকে তাহার জন্য জাতীয় জীবনধারার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইতে হইবে। নবাগত ভাব বা আদর্শকে সেই জীবনধারার সহিত এমনভাবে মিলাইয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং অধিকতর পুষ্টি ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। তবেই তাঁহার রচিত নাটক দেশের অন্তর স্পর্শ করিতে পারিবে। নতুবা, বিদেশীয়রচিত পদ্ধতির নিখুঁত অনুকরণ বিশেষ কোনও কাজে আসিবে না। তবে, ইহাও সত্য যে আপাততঃ সাফল্যের দাবী করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান পরীক্ষার যুগ একেবারে নিরর্থক নয়। আমার মনে হয়—বিভিন্ন আদর্শ-সংঘাতে নাট্য-সাহিত্যে এই যে বিপর্য্যয় চলিতেছে, আরও কিছুকাল চলিবার পর ইহা আমাদের দেশ ও কালোপযোগী একটি নূতন নাট্যাদর্শের জন্ম দিবে। এই আদর্শ এক দিক দিয়া যেমন দেশের মাটির সার ও রসে পুষ্ট, আর এক দিয়া তেমনই নব নব বিদেশীয় ভাব ও আদর্শের ধারাবর্ষণে স্নাত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। আধুনিক কালের সুসভ্য

ও সুশিক্ষিতের কাছে কথাটা যতই বিসদৃশ মনে হউক না কেন, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আজও আমাদের জাতীয় জীবনের মূল-ভিত্তি ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত কোনও প্রচেষ্টাই সার্থক হয় নাই। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের সম্বন্ধেই এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক যুগের আর্টপন্থীগণ সাহিত্যের সহিত নীতি ও ধর্ম্মের সংমিশ্রণ হয়ত পছন্দ করিবেন না। কিন্তু ইহা বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, যে সকল সাহিত্য কোনও কল্যাণময় উদার সত্যকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয় না, এদেশে তাহারা কখনই দীর্ঘায়ু হয় নাই। সত্য, শিব ও সুন্দর চিরদিনই আমাদের সাহিত্য-সাধনার আদর্শ। এই আদর্শ চ্যুতিই আংশিকভাবে বাংলা নাটকের নির্জীবতার কারণ। যতদিন আমাদের নাট্য-সাহিত্য একান্ত-ভাবে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছিল, ততদিন তাহা হইতে লোকে অজস্র আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক নাটক কোনও গভীর সার্ব্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহা অনেক-হাল্‌কাশ্রেণীর বা চমকপ্রদ ঘটনাসঙ্কুল, অথবা এমন কোনও সমস্যা লইয়া রচিত যাহার সহিত সাধারণ মনের কোনও নিবিড় সংযোগ নাই। আমাদের দেশের শাস্ত্র-পুরাণাদির অফুরন্ত ভাণ্ডারকে এদিক দিয়া যতটা কাজে লাগান যাইতে পারিত, ততটা করা হইতেছে না। সুষ্টিকুশল নাট্যকারের হস্তে পড়িলে পুরাণের উপাখ্যানগুলি যে কি বিচিত্র, কি অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহা গিরিশপ্রমুখ নাট্যকারগণ দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং নাট্য-সাহিত্যকে শিক্ষা ও আনন্দের শ্রেষ্ঠ বাহন করিয়া তুলিতে হইলে উহাকে আবার ধর্ম্ম ও নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পুরাণের উপাখ্যানগুলিকে নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে দেখিতে হইবে। সমগ্র জাতির কল্যাণকর ভাব ও আদর্শের সমবায়ে নাট্য-সৃষ্টি না হইলে উহা কখনই সর্ব্বজনপ্রিয় হইতে পারিবে না।

কলকাতার রাস্তাঘাট ও যানবাহন

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজকাল কলকাতার রাস্তায় যত যানবাহন চলাফেরা করে তার হিসেব দেখলে আমরা রাস্তায় বেরুলে বেশ সচেতন হয়ে চলব এ কথাটাই বার বার মনে হবে। আচ্ছা, হিসেবটা এবার দেখা যাক্। মোটর গাড়ী ৩১,৭৬৯, মোটর সাইকেল ৩০৯১, মোটর বাস ১১০৪, মোটর ট্যাক্সী ১২০৪, মোটর লরি ৯৯৯৯, ঘোড়ার গাড়ী ৬২২, রিক্সা ৬০০০, সাইকেল ও ভেণ্ডারের গাড়ী ২৩,৬৪৬, ট্রাম ৪৫০, আর অন্যান্য গাড়ী বিশেষ করে গরু-মোষের গাড়ী ১৫,৮৫৩। বছর বারো আগে (১৯৩৯ সালে) মোটর গাড়ী ১৭,০৪৩, মোটর সাইকেল ৭৩৭, মোটর বাস ৭০০, মোটর ট্যাক্সী ১০২৩, মোটর লরি ৬৬০০, ঘোড়ার গাড়ী ১০০০, রিক্সা ৩৭২৫, সাইকেল ও ভেণ্ডারের গাড়া ৩০০০, ট্রাম ৩৮৪—আর অন্যান্য গাড়ীর হিসেব রাখা হত বলে মনে হয় না। ১৯২২ সালে মোটর গাড়ী ৯৪৩৯, মোটর সাইকেল ২২৯৫, মোটর বাস ও মোটর ট্যাক্সী ৯৭০, মোটর লরি ৭৫৮, ঘোড়ার গাড়ী ১৮৯৮, রিক্সা ৭৯৩, সাইকেল ও ভেণ্ডারের গাড়ী ১৫০০, ট্রাম ২২২। ১৯১৩ সালে মোটর গাড়ী ৪৬১, মোটর সাইকেল ১৫৭, মোটর বাস ৫০, মোটর ট্যাক্সী ২১২, মোটর লরি ২৯।

এবার ১৫০ থেকে ২০০ বছর আগের পুরোন কলকাতার খবর নেওয়া যাক। সেকালে রাস্তাঘাটের অপ্রাচুর্য্যই ছিল এমন নয়, যে কয়টি রাস্তা ছিল সহরে তার অধিকাংশই ছিল কাঁচা রাস্তা। চলার মত করে রাখার ব্যবস্থা তো ছিলই না, কোন কোন রাস্তায় বন্য পশু ও ডাকাতের ভয় পর্য্যন্ত ছিল। সেকালে সহরের জন সংখ্যা ছিল কম, আর এক একটি পাড়া ছিল অন্যগুলো থেকে পৃথক। দু'পাড়ার মাঝে প্রায়ই বনজঙ্গল, মাঠ, না হয় খাল-বিল থাকত। যেসব যানবাহন সেকালে প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে পাল্কী আর ঘোড়ায়-টানা গাড়ীই প্রধান। পাল্কীগুলোর মাঝে কতকগুলো ছিল বেশ বড়, তাদের সাজগোজও ছিল দামী। এক একটা পাল্কীর দাম ৩।৪ হাজার টাকায় গিয়ে দাঁড়াত। পাল্কী চড়ে দূরে যাওয়ার ব্যবস্থাও সেকালে ছিল। এজন্যে কিছু দূরে দূরে পাল্কীবাহক পরিবর্ত্তন করা হত। কলকাতা থেকে বারাণসী যাওয়ার খরচ ছিল ৫০০৲ টাকা; পাটনা যাওয়ার খরচ ৪০০৲ টাকা। প্রতি দু' মাইল যাওয়ার খরচ ১ টাকা দু' আনার মত।

পাল্কীর পাশে দ্রুততর যান ছিল বলদ অথবা ঘোড়ায় টানা গাড়ী। রাস্তার অবস্থা যতই উন্নততর হতে লাগল ঘোড়ায় টানা গাড়ীর প্রচলন ততই চলল বেড়ে। সেকালে যেসব নানা ধরণের ঘোড়ার গাড়ী সহরের রাস্তায় দেখা যেত—তাদের ভেতর ছিল বগী গাড়ী, জিগ্, টমটম্, পাল্কী গাড়ী। বর্ত্তমানে যেটা বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট সেইখানে একটি আস্তাবল ছিল যেখানে ঘোড়া কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যেত। সারা দিনের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা যেত ১৬৲ থেকে ২৪৲ টাকায়। মাসিক ভাড়ার হিসেব হত দৈনিক ৬৲ থেকে ১০৲ টাকার হারে। ঘণ্টার হিসেবে প্রথম ঘণ্টার ভাড়া ছিল ৮৲ টাকার মত। ১৮২৫ সালে ঘোড়ার গাড়ীতে কলকাতার বাইরে ডাক নিয়ে যাওয়ার এক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হল। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার, কলকাতা থেকে ব্যারাকপুরে ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক এবং সেই সঙ্গে যাত্রী নেওয়ার ব্যবস্থা প্রথম কার্য্যকরী করা হয়।

কলকাতার বাইরে যাওয়ার প্রধান যানবাহন ছিল নৌকো। নৌকাতে যাতায়াতের বিপদও ছিল বহু—অনেক সময় ডাকাতরা নৌকা আক্রমণ করে যাত্রীদের ধন-সম্পত্তি, এমন কি প্রাণহরণ করতে পেছ-পা হত না। এত সব পথের বিপদ থাকা সত্ত্বেও নৌকোতে যাতায়াত করা ছাড়া আর কোনরূপ উপায় বর্ত্তমান ছিল না। সারাদিনের জন্য এক একটি নৌকার ভাড়া ছিল ২৲ থেকে ২।৹ টাকা। কলকাতা থেকে বারাণসী যাওয়ার প্রায় সাড়ে তিন মাস সময় আবশ্যক হত, আর ভাড়া ছিল ১৫০৲ টাকার মত।

১৮৯০ সালে কলকাতার রাস্তায় প্রথম মোটর গাড়ী দেখা যায়। সে-দৃশ্য কত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে আজ তা উপলব্ধি করা সহজ নয় মোটেই। সেকালে ঘোড়ায় টানা গাড়ীই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যান, তার গতির পরিমাপ ছিল ঘণ্টায় ৮ মাইলের মত।

১৯০১ সাল থেকে সহরের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে এসেছে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে। সেই সঙ্গে মোটর গাড়ীর সংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। গত মহাসমরের সময় এ সহরে যানবাহনের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়। কেবল তাই নয়, রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ী চালাবার হুজুগ এনে দেয় যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত গাড়ীগুলো। যুদ্ধের পর দেখা সেনা-বিভাগের বহু গাড়ী, বিশেষ করে জিপ্ ও লরি, সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে।

স্বাধীন হওয়ার প্রারম্ভে দেশ বিভাগের ফলে কলকাতার জন-সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছে ; আজ সহরে লোকের ভীড় লেগেছে। একে তো সহরের রাস্তাঘাট জনাকীর্ণ ; তায় রাস্তায় মোটর গাড়ীর লম্বা লম্বা লাইন। এ দু'কারণে কলকাতার রাস্তায় চলাফেরায় কত নূতন নূতন সমস্যার হয়েছে উদ্ভব।

১৯১০ সালে কলকাতায় প্রথম যানবাহন পুলিশ দেখা যায়। এরূপ পুলিশের সংখ্যা ছিল ২২৭ জন। আট বছর পরে ১০০০ জন যানবাহন-পুলিশ সহরের রাস্তার নিরাপত্তা সম্পাদন করবার জন্য নিযুক্ত হয়। আজও এ সংখ্যক পুলিশই কাজ করে যাচ্ছে যদিও সহরে লোক ও যান-বাহনের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

কলকাতার রাস্তায় যত রকমের যানবাহন প্রবাহমান, তার মধ্যে জনসাধারণের উপযোগী যানবাহন হল ট্রাম ও মোটর বাস। ১৮৭৩ সালে ঘোড়ায়-টানা ট্রাম গাড়ী কলকাতার রাস্তায় প্রথম চলতে সুরু করে। তবে মাসে মাসে লোকসানের অঙ্ক বেড়ে যাওয়ায় ট্রাম চালান বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর ১৮৮০ সালে বৌবাজারের রাস্তায় আবার ট্রাম চলতে আরম্ভ করে। দু'এক মাসের মধ্যে হেয়ার ষ্ট্রীটেও ট্রাম দেখা দেয়। এভাবে সহরের প্রধান প্রধান কয়েকটি রাস্তায় এ যানবাহনের চলাচল সুরু হয়ে যায়। ১৯০২ সালে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলতে থাকে। আজ কলকাতায় ৩৭ মাইলের বেশী রাস্তার উপর দিয়ে ট্রাম গাড়ীর লাইন পাতা হয়েছে। দৈনিক প্রায় লাখ দশেক লোক ট্রামের সাহায্যে চলাফেরা করে থাকে। ১০ থেকে ১২ হাজার কর্ম্মী জনসাধারণের এ' যান ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কত হাড়-ভাঙা খাটুনির সাহায্যে।

কলকাতায় ট্রাম চলাচল সম্ভব হওয়ার পেছনে রয়েছে কোম্পানী ও পৌর-প্রতিষ্ঠানের মাঝে এক চুক্তি। এ চুক্তির মিয়াদ ফুরিয়ে আসে ১৯৩৮ সালে ; তখন আরও সাত বছরের জন্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ান হয়। ১৯৪৫ সালে পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ট্রাম কোম্পানী গ্রহণ করবার এক সুযোগ উপস্থিত হয়। নানা কারণে সে সুযোগ পৌর-প্রতিষ্ঠান লাভ করতে সক্ষম হয় নি। ১৯৫২ সালে আবার চুক্তি বদলাবার সুযোগ আসত। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাঙলার সরকার অনেক বিচার বিবেচনা করার পর ট্রাম কোম্পানীকে বিশ বছরের জন্য কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।

বহুদিন হল কলকাতার প্রসারের সঙ্গে তাল রেখে ট্রাম গাড়ী চলাচলের কতগুলি নূতন পথ পাতার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছে। বর্ত্তমানে কলকাতায় জনসংখ্যা এত বেশী বেড়ে গিয়েছে যে শহরের আশে পাশে বসতির ব্যবস্থা না হলে ভীড়ের চাপে শহরের নানা জনহিতকর ব্যবস্থা আর আগের মত সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। লোক একমাত্র তখনই শহর ছেড়ে আশে পাশে বসবাস করতে রাজী হবে, যখন তারা দেখবে যে দূরে বাস করলেও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধে থাকায় শহরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠই আছে। সেদিক থেকে ট্রামের নূতন পথ গড়ার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রয়েছে ব্যারাকপুরের দিকে, দমদম বিমান-ঘাঁটির দিকে, মাণিকতলা, বেলিয়াঘাটা, নারিকেলডাঙা ধরে শহরের পুবপাশের খালের ওপারের অঞ্চলগুলিতে, গোবরা ঢাকুরিয়ার দিকে, বেহালা ছেড়ে আরও দক্ষিণে, টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়ার দিকে আর মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে।

এবারে কোম্পানী যখন বিশ বছরের মেয়াদে কলকাতায় ব্যবসা চালাবার অনুমতি পেল, মনে হয় শহরের রাস্তায় আরও অনেক নূতন গাড়ী চলতে সুরু করবে, আর নানা নূতন পথ গড়ে উঠবে শহরের নানা অংশে, এমন কি শহরের বাইরেও।

ট্রাম ছাড়া কলকাতার রাস্তায় আর যে সব যানবাহন রয়েছে তাদের মধ্যে মোটর বাসের কথা সবার আগে বলতে হয়। শহরের নানা অংশের মাঝে যোগাযোগ রক্ষায় এবং জনসাধারণকে সামান্য ভাড়ায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ায় বাসের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। তারপর, আবার যখন বাঁধা সময়ের মধ্যে এ যান চলাচল করে তখন প্রয়োজনীয়তা যেন বেড়েই যায়।

কলকাতায় এবং কলকাতা থেকে বাইরে যে সব বাস যাতায়াত করে তার মোট সংখ্যা ১০১৯টি। এদের মধ্যে বাস সিণ্ডিকেট পরিচালিত বাসের সংখ্যা ৪২৮, ব্যক্তিগত মালিকদের বাস ১৫৫ ; কলকাতার বাইরে যেসব বাস যাতায়াত করে তাদের সংখ্যা ২৮৬ ; সরকারী বাস ১৫০। প্রতিটি বাস দিনে ৮৫০ জন যাত্রী পারাপার করে, সেই হিসেবে ১০১৯টি বাস ৮৬,৬১৫০ জন যাত্রী দৈনিক বহন করে নিয়ে যায়।

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে সরকারী বাস প্রথম চালু হয়। প্রথমে ২৫টি গাড়ী রাস্তায় চলাফেরা সুরু করে। ক্রমে বাসের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২১টিতে। এদের মধ্যে ১৯৮টি একতলা, আর ২২টি দোতলা। তবে গড়পড়তায়

শ দেড়েক বাস প্রতিদিন রাস্তায় বেরোয়। ১৯৪৯-এবং '৫০ সালে সরকারী বাসে ৩ কোটি ২০ লাখ ও ৪ কোটি ৫০ লাখ যাত্রী যাতায়াত করেছে বলে হিসেব পাওয়া গিয়েছে।

১৯১৬ সাল নাগাদ সময়ে কলকাতায় বাস চলাচল আরম্ভ হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ যানবাহন চালনায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। ১৯২২ সাল নাগাদ বাসের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৫টিতে। তারপর সংঘের পরিচালনায় বাস চালানোর ব্যবস্থা হওয়ায় এ ব্যবসায়ে বেশ লাভ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

কলকাতার বর্দ্ধিত জনসংখ্যা এবং নানা দিকে বিস্তৃত আয়তনের কথা বিবেচনা করলে বর্ত্তমানে যে সংখ্যক ট্রামগাড়ী আর মোটর বাস শহরে রয়েছে তাদের সংখ্যা আরও অনেকগুণ বাড়ানো আবশ্যক। কেবল তাইই নয়, নানা নূতন পথে বাস ট্রাম চালাবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ইতিমধ্যে সরকারী বাসগুলো কিছু কিছু নূতন রাস্তায় চলতে সুরু করে দিয়েছে, তাতেও কোথাও ভীড়ের কমতি নেই। ট্যাক্সীর সংখ্যা বোধহয় না বাড়ালেও বর্ত্তমানে চলতে পারে। কারণ এ যান বড়লোকের উপযোগী, সাধারণ লোক এর ব্যবহার সচরাচর করতে পারে না। তারপর ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সার কথা বলতে গিয়ে এ কথাই বলতে হয় যে যখন শহরে মোটর গাড়ীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে তখন মন্থরগতি যানবাহনের সংখ্যা বাড়াবার প্রয়োজন কি? বিশেষ করে দ্রুত ও মন্থরগতি যানবাহন পাশাপাশি চলাতে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। অবিশ্যি স্বল্প দূরে যাওয়ার জন্য মন্থরগতি যানের ব্যবহার হতে পারে। তবে মন্থরগতি যান যত কমসংখ্যায় বড় শহরে এসে পড়ে ততই মঙ্গল।

কলকাতার যানবাহনের সমস্যা সরকার নিজেই লক্ষ্য করেছেন। বর্ত্তমানে সরকারী বাস রাস্তায় চলাফেরা আরম্ভ করে দিয়েছে, ভবিষ্যতে কলকাতার বাস সারভিস্ সম্পূর্ণ সরকারী করে ফেলবার প্রস্তাব ও রয়েছে। এছাড়া কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে লোকজনের যাতায়াত সম্পর্কে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী শহরকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করবে বলে নানা জল্পনা-কল্পনাও হয়েছে। এ রেলপথের উত্তর সীমা হবে দমদম, আর দক্ষিণ সীমা মাজেরহাট। এ রেলপথ মাটির উপরেই পাতা হবে। যে বিশেষজ্ঞরা এরূপ একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন তাঁদের মতে কলকাতার ভূগর্ভে রেলপথ নির্ম্মাণ করার কোন আবশ্যকতা নেই, তাছাড়া এ শহরের জমিতে ওরূপ কোন ব্যবস্থা করার অসুবিধে আছে অনেক। তবুও কলকাতায় ভূগর্ভস্থ রেলপথ তৈরীর উদ্দেশ্যে নানা প্রাথমিক ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর তাতে টাকাও বেশ কিছু ব্যয় হয়েছে।

যানবাহনের সঙ্গে রাস্তাঘাটের নিবিড় সম্বন্ধ বর্ত্তমান। বিশেষ করে কলকাতার মত শহরে নানা যানবাহনের উপযোগী রাস্তা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। যে রাস্তায় গরু-মোষের গাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত করে, আর যে রাস্তায় মোটর গাড়ী চলাফেরা করে এ দু'রাস্তার আকার-প্রকার হবে সম্পূর্ণ আলাদা। পীচ দিয়ে বাঁধান রাস্তায় গরু-মোষের গাড়ী চললে সে রাস্তার অবস্থা কিছুকাল বাদে যা হয়ে দাঁড়াবে—তা কল্পনা করা একেবারে অসম্ভব নয়। আবার পাথরের খণ্ড দিয়ে তৈরী রাস্তায় মোটর গাড়ী চললে সে গাড়ীর হাল যে কি হবে দু'দিন বাদে তাও অনুমান করা যেতে পারে।

দ্রুতগতি গাড়ী চলার প্রয়োজনে সড়ককে দু'ভাগে ভাগ করতে হবে, তার একভাগে গাড়ী যাবে—আর অন্য ভাগে গাড়ী আসবে। তারপর দু'টো রাস্তার মোড়গুলোতে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, বেশ সহজেই সব গাড়ী ঘুরে ফিরে যেতে পারে, সেজন্য এমন এক একটি "দ্বীপ" তৈরী করতে হবে যে "দ্বীপের" গা বেয়ে গাড়ী সহজেই কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয়ে চলতে পারবে। বর্ত্তমানে কলকাতার যানবাহন পুলিশ ও নানা জন-সমিতি, যেমন নিরপত্তা সমিতি (সেফ্‌টি ফার্ষ্ট এ্যাসোসিয়েসন), মোটরগাড়ীর মালিকদের সমিতি (অটোমোবাইল এ্যাসোসিয়েসন),—এঁরা শহরে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্যে রাস্তায় চলার নানা আইন প্রবর্ত্তন সম্ভব করেছেন। আজকাল মোড়ে মোড়ে পথচারীরা নিরাপদে (?) যাতে পথ পেরোতে পারে তা'র ব্যবস্থা হয়েছে। নীল-লাল আলো দেখাবার বন্দোবস্ত হয়েছে; এ আলো আবার কোন কোন স্থানে আপনা আপনিই জ্বলে আর নেভে। পথচারীদের রাস্তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে সজাগ করবার উদ্দেশ্যে প্রতিটি পার হওয়ার জায়গায় লোহার দাঁড়ের মাথায় বড় বড় গোল বল বসান হয়েছে। যেসব রাস্তায় লোক আর গাড়ীর ভীড় বেশী, সেখানে মোটরের হর্ণ-বাজান নিষিদ্ধ হয়েছে। কোন গাড়ী যাতে বেপরোয়াভাবে না চালান হয়, সেজন্য পুলিশ রয়েছে সজাগ। এতসব নিরাপত্তার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কেন যেন মনে হয় সব বিধি-নিষেধই গাড়ীর পথচলা সহজ করে দেওয়ার প্রয়োজনে হয়েছে; পথচারীর কোন সুবিধে এসবে নেই। তাছাড়া জনসাধারণকে পথচলার জন্য শিক্ষা দেবার বিশেষ কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা আজও প্রবর্ত্তিত হয়নি।

এবারে কলকাতার রাস্তাঘাট নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করা যাক। শহরের সেরা রাস্তা হচ্ছে চৌরঙ্গী; ইংরেজরা সুতোনুটিতে এসে বসবাস করবার বন্দোবস্ত করার সময়ে চিৎপুর রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত এক কাঁচা রাস্তা বড়িশে পর্য্যন্ত এগিয়ে ছিল। এ রাস্তা দিয়ে কালিঘাটের দেবতা দর্শন করতে হালিসহর ইত্যাদি স্থান থেকে লোকেরা প্রায়ই যাতায়াত করত। এজন্য এ রাস্তাটির নামকরণ হয়েছিল "কালিঘাটের পথ"। পরে, ক্রমে ক্রমে চৌরঙ্গীর চেহারা বদলাতে লাগল।

প্রথমে বর্ত্তমান ড্যালহাউসি পাড়ায় লালদীঘির আশেপাশে ইংরেজরা ঘরবাড়ী তৈরী করেছিল। পরে ১৭৭৩ সালে যখন ফোর্ট উইলিয়াম তৈরী হয়ে গিয়েছে আর বর্ত্তমানের ময়দানের সব জায়গাটি বনজঙ্গল শূন্য হয়েছে তখন ইংরেজ বাসিন্দারা ড্যালহাউসি পাড়া ছেড়ে চৌরঙ্গীর দিকে এগিয়ে এল। প্রশস্ত বাগান-ঘেরা বাড়ীতে বাস করতে লাগল। সেকালে বর্ত্তমানের পার্ক ষ্ট্রীট ছিল কবরখানার রাস্তা; এ অঞ্চলে চুরি ডাকাতির প্রাদুর্ভাব ছিল। পরে বাঙলার প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে তাঁর বাড়ী তৈরী করান এ রাস্তায়, সেই থেকে এ রাস্তার নামকরণ হয় পার্ক ষ্ট্রীট। পার্ক ষ্ট্রীটের পর আর একটি সেকালের রাস্তা ছিল বর্ত্তমানের থিয়েটার রোড।

সেকালে ড্যালহাউসি ও চৌরঙ্গী পাড়ার মাঝে ছিল একটা খাল;

এ খালটির জল গঙ্গা থেকে বেরিয়ে শহরের পুব দিকে-অবস্থিত নোনা হ্রদে গিয়ে পড়ত। বর্ত্তমানে ক্রীক রো নামে যে রাস্তা ধর্ম্মতলার পাশাপাশি রয়েছে এ রাস্তাই সেই খালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শহরের যে যে অংশে বাঙালীরা থাকতেন সেসব অঞ্চল হল বর্ত্তমানের চিৎপুর ও বড়বাজার।

সে সময় প্রায় সব রাস্তাই ছিল কাঁচা। খরচের অজুহাতে সেকালের রাস্তাঘাটের বিশেষ কোন উন্নতি-সাধন করা সম্ভব হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কোন কোন প্রধান শাসনকর্ত্তা নগরীর নানা উন্নতি-বিধানের পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেসব পরিকল্পনার কোন বাস্তব রূপ দেওয়া হয়নি ; কারণ সরকারের তহবিলে প্রয়োজনমত টাকা ছিল না। পরে সরকারের তত্ত্বাবধানে এক "লটারী" কমিটি স্থাপিত হল। "লটারী" কমিটির হাতে বেশ টাকা জমতে সুরু করে প্রায় গোড়া থেকেই। এ জমা টাকা দিয়ে শহরের রাস্তাঘাট মেরামত ও তৈরীর কাজের পরিকল্পনা করা ও সে-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করে তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এক বিশেষ সমিতির উপর। এ ভাবে প্রায় বিশ বছর কাল কলকাতায় কত নূতন রাস্তা খোলা হয়েছে, কত পুরোন রাস্তা মেরামত করা হয়েছে তার হিসেব করতে বসলে অনেক কথাই বলতে হয়। সহরের অনেক পুরোণ পচা পুকুর বন্ধ করে ফেলা হল, কত নূতন পুকুর খোঁড়া হল—আর হল আজ যাকে "টাউন হল" বলা হয় সে-বাড়ীটি তৈরী। এত সব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও শহর অস্বাস্থ্যকর ও আবর্জ্জনাময় রয়ে গেল, শহরের রাস্তাগুলো ভাঙাচোরা, পয়ঃপ্রণালীগুলো খোলা আর দুর্গন্ধময়, ঘর-বাড়িগুলো অপ্রশস্ত, আলো-বাতাস-হীন। বিশেষ করে বাঙালী পাড়ার দুর্দ্দশা চরমে পৌঁচেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শহর পৌর-প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা চলল। ক্রমে এ প্রতিষ্ঠান উঠল গড়ে তারপর ধীরে ধীরে শহরের নানা উন্নতি হতে সুরু করল। যে বছর কলকাতায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের অবস্থা সম্পূর্ণ হল সে বছরই (১৯১১) কলকাতা থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী উঠে গেল দিল্লীতে।

এতে কলকাতার নাম ডাক কমে এল সত্য, কিন্তু সারা দেশের উপর এ সহরের প্রভাব বিশেষ ক্ষুণ্ণ হল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে কলকাতায় প্রাধান্য বেশ বেড়েই চলল বছরের পর বছর। ক্রমে শিক্ষা কৃষ্টি ও নানা শিল্প ও চারুকলার প্রধান আবাসস্থল হয়ে দাঁড়াল কলকাতা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা ক্ষেত্রে কলকাতা বন্দরের নাম সবিশেষ পরিচিত হয়ে পড়ল।

এসব নানা কারণে কলকাতার লোকসংখ্যা ক্রমাগত বর্দ্ধিতায়তন হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে সহরের নানা উন্নতিও হতে লাগল। তারপর এলো মহাযুদ্ধ ; কলকাতা হয়ে দাঁড়াল যুদ্ধের এক প্রধান কেন্দ্র কত বিদেশী সৈন্য, শিল্পবিদ্, কলাবিদ্, পণ্ডিত, কর্ম্মী এসে জমা হল সহরে। আর ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে লোক এল কলকাতা যুদ্ধের কাজে। এরপর কত দৈবদুর্বিপাকের ঘূর্ণিপাকে দেশের ভাগ্যলক্ষ্মী শ্রীহীন হয়ে পড়লেন। তবুও কলকাতার জনসংখ্যা চলল বেড়ে, আর সহরের সেবায় পৌরপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব অনেক বেশী হয়ে দাঁড়াল। সেসব দায়িত্ব পালনে পৌরপ্রতিষ্ঠান অসমর্থ হয়ে পড়ল ক্রমে। আজ তার সামর্থ্যে বিশেষ কোন তারতম্য হয় নি। তাই, সহরের রাস্তাঘাট আজও অনুন্নত রয়ে গিয়েছে।

অপহৃতা

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

পুব আকাশে হাসল উষা ধরার বুকে স্বর্ণহার
তোদের নিশার অন্ত কি নাই, ঘুচ্‌বে না কি অন্ধকার ?
কর্মফলে ধর্ম গেল মর্মে শুধু রয় গাঁথি
পুত্র-পতি-মাতা-পিতার স্মৃতির ছবি দিনরাতি।
সৌভাগ্যের সিংহাসনে আসীন ছিলে গরবিনী,
হারেমের ওই হর্ম্যতলে লুটাও মাথা আজ মানিনী।
অলক মাঝে ফুলের বিলাস কোথায় গেল আজকে তোর ?
বদ্ধবেণী মুক্ত কেন, কাজল চোখে অশ্রুলোর ?

দ্রৌপদীর ঐ সহায় ছিল কৃষ্ণসখা রাজসভায়
ভ্রাতৃজায়ার বস্ত্রহরণ সফল কভু হয় নি হায় !
এখন কোথায় মুখ লুকালো সতীর শরণ নারায়ণ ?
যুক্ত করে স্মরণ করিস্ ভরসা তবু পায় না মন।
মান খোয়ালি যাদের হাতে হায় অভাগী ফিরবে না তা,
পাষাণ-কারায় বন্দিনী তুই মিছেই শুধু খুঁড়লি মাথা !
আজকে তোদের জগত্ মাঝে নাই ত কোন পরিচয়,
জীবনভরা সঞ্চিত মান শুধুই ধূলায় অপচয় ! !

নও কুমারী-বধূ-মাতা, নও ত তুমি বারবণিতা,
লৌহ-যবনিকা পিছে রইলে চির-অপহৃতা !!

তেরো

সেদিন বিকালবেলার জলসাটা বসেছিল হাসপাতালের প্রাঙ্গণে। চৈত্রের কয়েকদিন কেটে গেছে, এ সময়ে এ জায়গাটাই বসবার পক্ষে ভালো। তা ভিন্ন সকালে মৃন্ময় আশ্রম হাসপাতাল একটু করে দেখে গেছে মাত্র, কারুর সঙ্গে বিশেষ আলাপ-পরিচয় করতে পারে নি; কলের দিক থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরলে ওকে এখানেই নিয়ে এলেন বীরেন্দ্র সিং। পরিশ্রমী লোক, কাজ বোঝেও মনে হয়, উনি একটু আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন।

সুকুমার আর মৃন্ময়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আগে বীরেন্দ্র সিং এসে বসেছিলেন, তারপর যেমন যেমন সবাই আসতে লাগল, মৃন্ময়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। আলাপ বেশ জমে উঠল। প্রথমটা নূতন পরিচয়ের এলোমেলো কথাবার্ত্তা। তার মধ্যেই সাধারণভাবে লখ্‌মিনিয়ার বিষয়, তারপর প্রায় সবাই এসে গেলে যখন পরিচয়ের দিক দিয়ে নূতন কিছু রইল না বিশেষ, তখন শুধু লখ্‌মিনিয়ার আলোচনাই চলল। মৃন্ময় একটা নূতন প্রশ্ন তুলেছে, আর বিশেষ করে তার দিক দিয়ে প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত বলে প্রসঙ্গটা মতামতের মধ্যে বেশ জমে উঠল। ওর জিজ্ঞাসা, এমন একটি শান্তিপূর্ণ মনোরম জায়গায় বীরেন্দ্র সিং হাঙ্গাম এনে ফেললেন কেন? এসে পর্য্যন্ত ও এই কথাই ভাবছে—আর যতই দেখছে জায়গাটাকে—ততই বেদনার সঙ্গে প্রশ্নটা ওর মনে যেন জেঁকে বসছে। কেন প্রশ্নটা করলে ঠিক বলা যায় না, ইন্‌জিনিয়ার হলেও সত্যই বোধহয় ওর রস-চেতনাটাই বেশি প্রবল, ওর ভেতরের কবি-প্রকৃতি আঘাত পেয়ে থাকবে; কিম্বা হয়তো এটা নিতান্ত আধুনিক স্টাইল একটা—লোকের যা প্রত্যাশা তার ঠিক উল্টটি বলে বা ক'রে তাক লাগিয়ে দেওয়া—যার জন্তেই বোধহয় ইউরোপ-ফেরৎ হয়েও গলায় ফাঁপা চাদর সুদ্ধ অতিরিক্ত বাঙালী-পনার সাজগোজ ক'রে উপস্থিত হয়েছে সে। উত্তর দিলেন বীরেন্দ্র সিং-ই—কথায় কথায় ধর্মঘট, বস্তির নোংরামি, নেশাভাং—এই সবের ভয় তো?—তিনি ভেবে দেখেছেন; শিল্প যখন আধুনিক পদ্ধতিতে বাণিজ্য, তখনই তার ব্যভিচার; যেখানে তা নয়, পরন্তু যে টাকাটা ঢাললে—আর যারা তাদের উৎপাদন শক্তি দিয়ে সেই টাকাটাকে বাড়াবে—শিল্প-অনুষ্ঠানটা সেখানে এদের উভয়েরই সম্পত্তি, সেখানে এ ভয় তো থাকবার কথা নয়। থিয়োরীটা তাঁর নিজের নয়, দেশে দেশে পরীক্ষাও হচ্ছে এ নিয়ে, বীরেন্দ্র সিং সুধু তাঁর নিজের দেশে এ পরীক্ষাটা করতে চান। তাঁর লখ্‌মিনিয়া সুন্দর, সবার সমবেত চেষ্টায় আরও সুন্দর হয়ে উঠছে দিন দিন—তিনি জানেন কারুর ভয় যন্ত্রদানবে এ-সৌন্দর্য্য নষ্ট করবে; তাঁর কিন্তু বিশ্বাস, সুন্দর বলেই ভয় কম, যা সুন্দর তাই জয় করে। ঠিক এই স্বপ্নই কবি দেখেছিলেন শ্রীনিকেতনের মধ্যে। সে যে মাত্র কুটীরশিল্প নিয়ে, আধুনিক কল-কব্জা নিয়ে নয়, এতে কিছু আসে যায় না।

মৃন্ময় ঠিক তর্কের জন্ম তোলেনি প্রশ্নটা; আগেই বলা হয়েছে, নয় স্টাইল, নয় সত্যিই ওর একটা আশঙ্কা। এর পরে এই দিক ধরেই আলোচনাটা চললো।

বীরেন্দ্র সিং কিন্তু খানিকটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবার পর একটু স্তিমিত হয়ে গেলেন। তিনি দুজনের অনুপস্থিতিটা একটু বেশি করে অনুভব করছিলেন—মাস্টারমশাই আর সরমার। আসলে সুকুমার আর এরা দুজন উপস্থিত না থাকলে তিনি যেন বেশ উৎসাহ পান না; আজ যখন আশা হচ্ছে যে ঠিক এই ধরণের আর একজনকে পেলেন, তখন যতই ওঁদের দেরি হতে লাগল ততই যেন ওঁর মনটা ঝিমিয়ে যেতে লাগল, আলোচনার যোগ আছে, কিন্তু ক্রমেই যেন বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলেন।

ওঁদের দুজনের ক'দিন থেকে দেরি হচ্ছে, তার কারণও জানেন বীরেন্দ্র সিং। সরমার পড়াশুনা এখন সুকুমারের বিদ্যার গণ্ডীর বাইরে গিয়ে পড়েছে। আশ্রম-স্কুলের ছাত্রী-

বিভাগে ওর খানিকটা কাজ আছে, তারপর স্কুল বন্ধ হয়ে গেলেই ও মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর বাসায় চলে যায়, সেখানে পড়ে তাঁর কাছে। কি পড়ে, কোনও পরীক্ষার জন্য তোয়ের হচ্ছে কি এমনই জ্ঞানার্জ্জন, সেটা বোধহয় সঙ্কোচবশতই ভাঙেনি কারুর কাছে, মাস্টারমশাইকেও বলতে মানা করে দিয়েছে। তবে নিয়মিতভাবে পড়ছে এবং আজকের মতো এক এক দিন বেশি দেরিও হয়ে যায়। কিন্তু আজকের বৈঠকে একটু নূতনত্ব ছিল, এমন প্রসঙ্গটাও উঠল—যা নিয়ে আলোচনা করবার মাস্টারমশাই-ই সবচেয়ে বেশি অধিকারী, যতই সময় যাচ্ছে অভাবটা বেশি করে অনুভব করছেন বীরেন্দ্র সিং। সন্ধ্যা হয়ে এল; ক্রমে সেটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটু গাঢ় হয়ে উঠল। হাসপাতালে আলো জ্বলে উঠল। মিলের দিকেও জায়গায় জায়গায় বিদ্যুতের আলোয় রাত পর্য্যন্ত কাজ হয়, সেই আলো-গুলোও উঠল জ্বলে। ঝিলের ধারে লথ্মিনিয়ার যে নূতন রূপটা খুলবে রাত্রিসমাগমে, আকাশের সঙ্কীয়মান অন্ধকারে তার একটা আভাস উঠল ফুঠে।

এমন সময় সরমাকে সঙ্গে নিয়ে মাস্টারমশাই উপস্থিত হলেন, আসছেন সুকুমারের বাসার দিক থেকে। উনি আসতেই সবাই উঠে দাঁড়াল, উনি হাসতে হাসতে বেশ সহজ গতিতে গিয়ে একখানি চেয়ার দখল করলেন, ওঁর চেয়ারটাই বিশিষ্ট বলে সেটা খালিই থাকে; সরমা গিয়ে ওঁরই পাশে একখানিতে বসল।

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়টা সকালেই হয়ে গিয়েছিল, বীরেন্দ্র সিং মৃন্ময়ের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সরমার পানে হাতটা একটু বাড়িয়ে বললেন—এরই কথা সকালে হচ্ছিল মিস্টার চৌধুরী—সরমা, আমার মেয়ে বা ডাক্তারবাবুর স্ত্রী—যে ভাবেই পরিচয়টা বুঝতে চান···

মাস্টারমশাই গম্ভীর ভাবে দাড়িতে একবার হাতটা বুলিয়ে নিলেন, তারপর সবার উপর দৃষ্টিটা একবার বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"বাঃ, আর সবচেয়ে যার সঙ্গে সম্বন্ধটা ঘনিষ্ট সেই বাদ পড়ে গেল।"

হো-হো করে হেসে উঠলেন এবং তারই মধ্যে সরমার কাঁধে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মৃন্ময়ের পানে চেয়ে বললেন—"আর আমারও নাতনী মশাই!···বিয়ে, সেতো দুটো মন্তর পড়লেই হয়ে যায়···তার জন্যেই যে একজনের বেশি আপন হয়ে যাবে তা মানব কেন?"

মৃন্ময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সেই জন্যই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে যে উত্তরটা দিলে, এত অল্প পরিচয়ে বোধহয় সেটা দিত না, বললে—"সেটা কিন্তু না বললেও বুঝতে পেরেছি, যে-ভাবে মিসেস সেনকে দখলের মধ্যে রেখেছেন আপনি।"

হাসি চলল, এর গায়েই মাস্টারমশাইয়ের উত্তরটা সেটাকে দিলে আরও বাড়িয়ে, বললেন—"অথচ 'মিসেস সেন' ব'লে ডাক্তারের সঙ্গে সম্বন্ধটাকেই আপনি এখনও দিচ্ছেন বাড়িয়ে!"

মাস্টারমশাইয়ের ঠাট্টা যখন তখন চলে, লথ্মিনিয়ার এই যে গোষ্ঠিটি—এর মধ্যে সবার সঙ্গে সবার এমন একটা মুক্ত আত্মীয়তার ভাব আছে যে, সময়ে সময়ে উত্তর দিতেও বাধে না সরমার, আজ কিন্তু একেবারে নূতন লোকের সামনে বলে অতিরিক্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে—তার ওপর একেবারে বিয়ের উল্লেখটা পড়ল এসে—সে ঠিক যেন মাথা সোজা রাখতে পারছে না।

ক্রমে প্রসঙ্গান্তর এসে পড়ল, ঠাটা নিয়ে যে জড়তা সেটা কেটে গেল সরমার। কিন্তু অন্যধরণের একটা সঙ্কোচ এসে তাকে ক্রমে অভিভূত করে ফেললে—যতবারই কথাবার্তায় যোগ দেবার জন্যে চোখ তুললে—দেখে মৃন্ময় তার দিকে আছে চেয়ে। ওর পক্ষে এটা বোধ হয় সুবিধে হয়েছে এই জন্যে যে মাস্টারমশাই আসার সঙ্গে কথাবার্তা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, হাসির সরসতার মধ্যে দিয়ে আরও বৈচিত্র্য এসেছে, তাতে সবার মন এখন ঐদিকেই; দ্বিতীয়ত, অন্ধকারটাও আরও হয়ে উঠেছে ঘন। মোট কথা, সরমার আর সেদিন একরকম মুখ খোলাই হোল না।

একটু পরে এটা বীরেন্দ্র সিঙের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, প্রশ্ন করলেন—"তোমার শরীরটা কিছু খারাপ বোধ হচ্ছে না কি মা?"

সরমা বললে—"কৈ, তেমন কিছু না তো।"

মাস্টারমশাই চঞ্চল হয়ে উঠলেন একটু, বললেন—"তা হ'য়ে থাকবে, কিছু আশ্চর্য্য নয়; ফাগুন চোত—পরিবর্ত্তনের সময় তো। না, একটু খারাপ হ'য়ে থাকবে—কৈ, তুমি তো কিছু বলছ না আজকে···"

কথা কমে গেছে মৃন্ময়েরও; কিন্তু সেদিকে কারুর মনোযোগ যাবার আগেই সে সাবধান হয়ে গেল, বললে—"আমার শরীরটাও হঠাৎ যেন···"

"ঐ দেখো মিলিয়ে; উনি নতুন লোক তো, আগেই অ্যাফেকট্ করেছে।···আপনি তাহলে উঠুন···বীরেন্দ্র এঁকে নিয়ে যাও তুমি তাহলে।···তুমিও বাসায় যাও সরমা—স্কুমারের সঙ্গে। আমরা একটু না হয় বসি।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন—"আপনারাও উঠলেই পারতেন, অন্তত আপনি; ঠাণ্ডাটা পড়ে আসছে, দো-রসার সময়···"

"আমার জন্মে ভেবো না, আমি সিজ্‌নড্ (seasoned), ছিয়াত্তর পার হলাম, এখনও বাহাত্তরেও ধরতে পারেনি।···জিগ্যেস করো সরমাকে, প্রায় বলি কিনা যে আমার স্বাস্থ্যটা তোমরা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করো···"

স্কুমার উঠতে উঠতে বললে—"মাফ করবেন—ডাক্তারকে মুখ খুলতে হোল—তাহলে কিন্তু রাতারাতি আপনার বিদ্যেটা আয়ত্ত করে ফেলবার এই যে অমানুষিক চেষ্টা, এটা বন্ধ করতে হয় ওকে।"

ওঠবার মুখে এই যে আর একটা হাসি উঠল তাতে সরমা আবার সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। স্কুমার দুপা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"আপনারা তাহলে বসবেন, আমি ওঁকে পৌছে দিয়ে আসছি এখুনি।"

মাস্টারমশাই ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন—"না, না, ওর কাছ-ছাড়া হওয়া তোমার এখন মোটেই উচিত নয়···তাহলে আমায় গিয়ে বসতে হবে।···এঃ, এই ক'রেই তোমরা নিজের দাবি-দাওয়া পরের হাতে তুলে দাও।"

বর্ধিত হাসির মধ্যে এরা বিদায় নিলে। তার একটু পরেই সেদিনের বৈঠকও গেল ভেঙে।

চৌদ্দ

ঋতু পরিবর্তনের কথাটা যে উঠল এতে ভালো হোল মৃন্ময়ের পক্ষে, অসুস্থতার ভান ক'রে সরে থাকবার একটা সুযোগ পেলে।

সকালে রুমাকে দেখা পর্যন্ত তার সমস্ত দিনটা চিন্তায় কেটেছে। একা রুমাই চিন্তার পক্ষে যথেষ্ট, তার ওপর একটু পরেই দেখলে তার স্বামীকে, পরিচয়ও পেলে; সেই থেকে চিন্তা হয়ে উঠেছে আরও জটিল।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের চরিত্র গৌরব করবার মতো নয়, কিন্তু সে-রকম পরিবেশের মধ্যে পড়লে, স্বার্থের খাতিরে নিজের বৃত্তিগুলোকে সংযত ক'রে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতাটা তাদের থাকে। মৃন্ময় এই শ্রেণীর লোক। তার অনেকগুলা গুণ আছে—লেখাপড়া, অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, সর্ব্বোপরি চমৎকার একটি সামাজিক বোধ, যার জন্মে পাঁচজনের বৈঠকে সে যে শুধু মানানসই শুধু তাই নয়, অচিরেই নিজেকে অপরিহার্য্য ক'রে তোলবারও ক্ষমতাটা রাখে, ওর অভাবটা অনুভব করতে সবাই বাধ্য হয়।

কিন্তু বাইরে যাই হোক, এধরণের লোকের নিজের আভ্যন্তরিক জীবনটা সুখের হয় না। ক্রমাগতই নিজের খানিকটা প্রচ্ছন্ন ক'রে দিনের পর দিন কাটিয়ে যাওয়া তো আনন্দের নয়। এরা সুখী হয়, ভাগ্য যদি এদের এমন কোন পরিবেশের মধ্যে বসিয়ে দেয় যেখানে এই রকম প্রচ্ছন্নতার অন্তঃসলিলাই চলছে। তখন তারা আস্তে আস্তে পরিচয় ক'রে নেয়, আস্তে আস্তে এগোয়, তারপর এক হয়ে যায়, সুখে থাকে।

এসে প্রথম দিনে বীরেন্দ্রসিং আর স্কুমারের যে পরিচয় পেয়েছিল, তাতে ওর আশঙ্কা হয়েছিল বোধ হয় বরাবর সামলেই চলতে হবে ওকে। সকালের অভিজ্ঞতায় ও যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল, মনে হোল ভাগ্য ওকে অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যেই এনে বসিয়েছে। শুধু যে স্কুমার সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হোল তাই নয়, নিতান্ত গণিতের হিসাবেই ও বীরেন্দ্রসিংকেও এই দলে নিলে টেনে, স্কুমারের সঙ্গেই তাঁর দহরম-মহরম বেশি—তার পরিবারের রূপও এই, সুতরাং তারই আড়ালে বীরেন্দ্রসিঙের যে একটা ···ন চলছে না এটা কে বলবে?

কিন্তু তবুও এদের দুজনেরই সাক্ষাৎ ব্যবহারে, কথাবার্তায় যেন সন্দেহটা কাটিয়ে দেয়। মৃন্ময় ব্যবহার আর কথাবার্তার রূপ চেনে, কোথায় খাঁটি কোথায় মেকি সেটা বোঝে, সমস্তদিন কাজের মধ্যে, আলাপের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে রইল। তার বাকি রইল স্কুমারের এই নববিধ পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রীকে—বীরেন্দ্রসিঙের "মেয়েকে" দেখা। সমস্তদিন একটা তীব্র কৌতূহল নিয়ে কাটালে, বাড়ীতে যে আর কেউ নেই—শ্বশুর শাশুড়ী ননদ,

এমন কি সুকুমারের নিজের ছেলেপিলেও—এইটে কৌতূহলকে আরও উদ্‌গ্র ক'রে রাখলে।

হাসপাতালের প্রাঙ্গণে সরমা যখন এসে উপস্থিত হোল তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের পাশে খানিকটা ব্রীড়ানতা এই তরুণীকে আসতে দেখে মৃন্ময়ের কুৎসিত কৌতূহলটা একটা আঘাত পেলে। কিছু একটা ছিল ছবিটার মধ্যে—এই মুক্ত প্রাঙ্গণ আর ম্লান সন্ধ্যার সময়টা মিলিয়ে, যার জন্যে ওর সেই কুটিল অনুসন্ধিৎসা যেন সাহস না পেয়েই গুটিয়ে গেল।

এটা কিন্তু ক্ষণিক; সরমা একটু এগিয়ে আসতেই মৃন্ময়ের ভ্রূদুটি একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে ভেতরে এসে যখন বসেছে তখন মৃন্ময় খুব অন্যমনস্ক, ভালো হোল যে পরিচয় প্রসঙ্গে খানিকটা হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তার দিকে কারুর দৃষ্টি গেল না, নয়তো একজন সুন্দরী তরুণী আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার এই ভাবান্তরটা কারুর কারুর চোখে পড়তই। ঘনায়মান অন্ধকারটাও তাকে সাহায্য করলে।

এরপর সে নিজেকে সামলে নিলে। একটা সুবিধা এই হোল যে সরমা এসে বসেছে তার সামনাসামনি হ'য়ে, মৃন্ময়কে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হচ্ছে না। একটা অসুবিধেও কিন্তু এই—যে সরমা বসেছে হাসপাতালটা পেছনে করে, যার জন্যে তার মুখটা পড়ে গেছে ছায়ায়। শুধু তাই নয়, ওর দিকে চাইতে গেলেই হাসপাতালের বারান্দার আলোটা সুকুমারের চোখে পড়ে একটু ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। সরমার মুখের বাইরের রেখা ছাড়া বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু সে যাই হোক, যত অস্পষ্ট ভাবেই দেখা হোক, মৃন্ময়ের মনে হোল মুখটা যেন চেনা। এর পর থেকেই ও নিজের স্মৃতিকে আলোড়িত করতে লাগল—কবে, কোথায় কিভাবে দেখেছে? ভাবটা গোপন করার জন্যেই ও বেশি করে আলাপে যোগদান করবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ততই বেশি যেতে লাগল পেছিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত ও হয়ে দাঁড়াল প্রায় নীরব শ্রোতাই। প্রচ্ছন্নভাবে চেয়ে দেখে—তার কৌশলটা ওর রপ্ত, তারপর মুখ ঘুরিয়ে ভাবে। মুস্কিল হয়েছে—একটু একটু চলার ভঙ্গি আর আবছায়াভাবে মুখের ঘেরটামাত্র পেয়েছে দেখতে; যদি কথা বলে, কণ্ঠস্বর আর বলার ভঙ্গি মৃন্ময়ের স্মৃতিকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তা কইছে না। যে মানুষটা কথা কইছে, তার দিকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে থাকাও যায়, চেনবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সরমা যতবারেই কিছু বলবে মনে হয়েছে, মৃন্ময়ের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় গেছে থেমে; ওদিক থেকে কোন সাহায্যই পাচ্ছে না সে।

কিন্তু একটা মানুষ চেনা হওয়া বা না-হওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয়—যদি পূর্ব্বে দেখা থাকে, আলাপ পরিচয় করতে সুবিধা হয় একটু। মৃন্ময় যে অসুস্থতার ভান করে নিজের চিন্তা নিয়ে পড়ে আছে, তার কারণ ওর যেন মনে হোল যখনই সরমার সঙ্গে ওর চোখোচোখি হয়েছে, তার দৃষ্টিতে যেন একটা চাপা আতঙ্ক উঠেছে ফুটে। এটা কেন? অবশ্য এটাও স্পষ্টভাবে দেখা নয়, মুখটা কতকটা অন্ধকারে, তার ঠিক পেছনের আলোর ধাঁধানি, তবুও মৃন্ময়ের বেশ মনে হোল একটা আতঙ্কের ভাব ছিলই সরমার দৃষ্টিতে। যেন প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারে বেশি ছিল, তারপরে আরও বেশি, তারপরে আরও, মোট বোধ হয় বার পাঁচেক হয়েছিল চোখোচোখি।

কিছু না হোক, এটা তো ঠিক যে চোখোচোখি হবার জন্যই, কথা বলতে গিয়ে থেমে গেছে সরমা। তাই বা হবে কেন?

প্রাসাদের একপ্রান্তে নিরিবিলি ঘর; অসুস্থ বলে বীরেন্দ্র সিং একবার খোঁজ নিতে এলেন, দুচার মিনিট সেই যা একটু ব্যাঘাত হোল, তারপর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মৃন্ময় এই চিন্তা নিয়েই কাটালে। ওর যত গাণিতিক জ্ঞান, যত গাণিতিক সরঞ্জাম সব মনে মনে একত্র করে—সকাল থেকে সমস্ত অভিজ্ঞতা একত্র করে যেন একটা অঙ্কফল বের করবার চেষ্টা করছে—সেই বন্যহরিণী রুম্মা—বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা—বারান্দায় তাদের একটি ছেলে একটি মেয়ে, সুবেশ, সুসভ্য—সুকুমারকে মাঝখানে রেখে এদের সবার ওপর যে অনুগ্রহ দৃষ্টি তা বীরেন্দ্র সিঙেরই···সুকুমারও সেই অনুগ্রহে লালিত; সেটা যে অল্প নয় তা তার মোটরে ষ্টেটের মনোগ্রাম দেখে বুঝেছে মৃন্ময়।···তারপর আবার সন্ধ্যার এই নূতন অভিজ্ঞতা—বীরেন্দ্র সিঙের "মেয়ে" রুম্মা—তার জন্যে অনেকখানি তোয়েরই ছিল মৃন্ময়ের মন; কিন্তু সরমার দৃষ্টিতে আতঙ্ক কিসের? কেউ চিনেই ফেলে তো ভয়ের কি থাকতে পারে?

অঙ্কফল নির্ণয় করতে বাধাও দিচ্ছিল অনেক কিছু—প্রথমত সমস্ত লগ্‌মিনিয়ার আবহাওয়াটা—সবাইকে নিয়ে সবাইয়ের সঙ্গে যুক্ত সম্বন্ধ; পরস্পরের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত একটা বিরাট সংসার যেন—তারপর মাষ্টার মশাই, বিশেষ করে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তির মতো ওঁর বিরাট হাসি—তার কাছাকাছি অন্ধকারের কিছু যেন থাকতেই পারে না···মৃন্ময়ও তার সামনে এগুতে পারছে না, নিজের মনের অন্ধকার নিয়ে······

তারপর দিন আশ্রমের কাছে নিজের বাসায় আসবার কথা ছিল মৃন্ময়ের, কিন্তু অসুস্থতার জন্যই বীরেন্দ্র সিং আসতে দিলেন না, অনেক রাত পর্য্যন্ত জাগায় তার মুখে-চোখে অসুস্থতার প্রমাণ ছিলও কিছু কিছু। বাইরে এই, ভেতরে আবার নিজের মনে একটা গলদ রয়েছে বলে বেশি বলতেও পারলে না।

সেদিন কাজে বেরুতে দিলেন না বীরেন্দ্র সিং। বিকেলেও বেরুনো হোত না। বললে, ডাক্তারবাবুকে একটু দেখিয়ে দিলে হোত না?

বীরেন্দ্র সিং বললেন—"তাঁকেই ডেকে পাঠাচ্ছি; আপনার বেরিয়ে কাজ নেই।"

মৃন্ময় হেসে বললে—"শুনেছি ছেলেবেলায় আমার অসুখ হ'লে ছাড়তে চাইত না; সামান্য কিছু হলে বাড়াবাড়িও হয়ে উঠত। পরে আবিষ্কৃত হোল সেটা হোত বাবা আর মায়ের বেশি আব্দার। পাবার জন্যে। ওঁরা করতেন ছেলের যত্ন, রোগ ভাবতো এ বুঝি আমারই তোয়াজ হচ্ছে।···ভয় আঁকড়ে বসে না থেকে একটু আসিই না বেড়িয়ে, ফল ভালোই হবে।"

যার জন্য আসা, তার কিন্তু কোন সুবিধা হোল না। সেদিনও হাসপাতালের প্রাঙ্গণেই বৈঠক বসল। সুকুমার তখনও কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরোয় নি। ভালোই হোল, মৃন্ময় গিয়ে সেইখানেই করলে দেখা। তাতে সুবিধা এইটুকু হোল যে সুকুমারকে একটু টুকে পারলে—কাল এখানে চলে আসা সম্বন্ধে যেন সে ডা· আপত্তি কোন না তোলে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এল সুকুমারের সঙ্গেই, দেখে মাস্টার মশাই এসে গে· আজ অনেক আগেতেই যে, তার কারণ সরমা নেই; বললেন—স্কুলে এসেছিল, ওঁর কাছে পড়েছেও· তারপর মাথাটা একটু ধরেছে বলে সোজা বাস· গেছে চলে।

সেদিন বৈঠক বেশ জমল না। সুকুমারকে বীরেন্দ্র সিং তখনই উঠে গেলেন সরমাকে দেখতে। যারা রইল তাদের মধ্যে মৃন্ময়ই চেষ্টা করলে · জমিয়ে রাখবার, কেননা সেই মনে মনে বেশি · তার অঙ্ক পরিণতির দিকে আর এক ধাপ যেন এগিয়ে·

বীরেন্দ্র সিং একটু পরেই ফিরে এলেন, সঙ্গে সুকু· এল, চিন্তিতভাবে বললেন—"ওতো বলছে কিছু নয়, দেখি ঢুলাকে নিয়ে দিব্যি হুল্লোড় করছে···তাই ডাক্তারবাবু?···কিন্তু ও যদি এখন চিকিৎসার আমাদের দেখাবার জন্যে···"

সুকুমার বললে—"আমিও বলছি হয় নি চিকিৎসার দরকারই নেই কোন।"

মাস্টার মশাই একটু অধৈর্য্যভাবেই বলে উঠে· "আমি কিন্তু বলি একটু কিছু নিশ্চয় হয়েছেই; আ· দুজনের কথাই মিলে যাচ্ছে···"

ঢুলার সঙ্গে হুল্লোড়ের কথার পর মৃন্ময় আরও অন্য হয়ে উঠেছে; দাঁতে নখ খুঁটছিল, মাস্টার মশা· কথায় হুঁস হতেই সামলে নিয়ে বললে—"এটা তো ভোটের ব্যাপার নয়, ভোটের জোরে তাঁকে · খাওয়াতে পারা যাবে না।"

একটুখানি হাসি উঠে ও প্রসঙ্গটা বন্ধ হোল। ঠ· ভাবটা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই উঠে গেলেন।

(ক্রম·

মানুষের জাতি ও জাতি-প্রকৃতি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

পৃথিবীতে নানাজাতীয় যে-সব মানুষ দেখা যায়, তাদের দৈহিক গঠন—বর্ণ, মুখাকৃতি, নাসিকা, চক্ষু, চুল প্রভৃতির প্রভেদগুলি সহজে চোখে পড়ে। বর্ণ—শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ। নাক—কারু উন্নত, বাঁশীর মত সরু, কারু স্ফীত, বিস্তৃত, চ্যাপটা আকারের। চুলের বিভিন্নতা দেখা যায় অনেক রকমের—শনের মত পাট-করা সোজা গড়ানো চুল, কোঁকড়ানো চুল, হালকা ফুরফুরে চুল, কালো তামাটে বা সোনালি রং-এর। চোখ কারু আয়ত, কারু বা তির্যক—নানা বর্ণের। এই বিভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট প্রত্যেকটি জাতির নিজ নিজ বাসভূমি আছে, নানা জাতির লোক নানা ভাষায় কথা বলে। সমষ্টিগতভাবে তাদের জাতি নির্ণয় করা হয়, কখনো দেশ ও ভাষা অনুসারে, যেমন চীনা জাতি, ইংরাজ জাতি—আর কখনও আকৃতির বৈষম্যকে ভিত্তি করে' নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি মত নাম বলা হয়, মোঙ্গলীয় বা পীত জাতি, নিগ্রো জাতি, সেমেটিক বা ইহুদি জাতি, শ্বেত জাতি। ফলত দেখা যায় 'জাতি'-শব্দের অর্থ সর্বত্র এক নয়। কখনো এক অর্থে, কখনো অন্য অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করে' জাতি-বিষয়ে একটি কুহেলি-আবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে যা সুস্পষ্ট ধারণার পক্ষে বাধা জন্মায়। Race বা জাতির বিজ্ঞান-সম্মত সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হলে' দেশ বা ভাষাকে সরিয়ে দিয়ে সুধু আকৃতির প্রভেদের উপর দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখতে হবে। মানুষ দেশান্তরে যায়, এক ভাষা ছেড়ে অন্য ভাষা ধরে, কিন্তু যে-আকৃতি পেয়েছে সে পূর্ব-পুরুষ থেকে তার পরিবর্তন হয় না। একটি সমষ্টির অনুরূপ আকৃতি হলে, সেই লোকেরা যে একই পূর্ব-পুরুষের সন্তান, তা অনুমান করা শক্ত নয়। এরূপ সমান আকৃতি-বিশিষ্ট মানব-সমষ্টিকেই 'জাতি' নামে অভিহিত করা চলে। জাতির মূল, বংশ-ক্রম (heredity)। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কিছু-না-কিছু বৈষম্য (variation) প্রতি পুরুষে দেখা যায়। এই বৈষম্যগুলির ফুটে বেরুবার যদি অবাধ সুযোগ থাকতো তাহলে ব্যক্তিমাত্রের কারু সঙ্গে কারু আকৃতিগত মিল থাকতো না—কেন না ঘন ঘন বৈষম্য দেখা দিয়ে গোটা আকৃতিকে বদলে দিত। কিন্তু এই সব খুটি-নাটি পরিবর্তনের মধ্যে আকৃতির কতগুলি বিশেষ অংশ আছে, যা অপরিবর্তনীয়—পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত, বংশ-ক্রম যার সঙ্গে 'জাতি'র গাঁট-ছড়া বেঁধে দিয়েছে। বিবর্তনের চলন্ত কাঁটাকে বন্ধ করে' জাতি যেন সেই অপরিবর্তনীয় দানা-বাঁধা অংশগুলির প্রতিভূ-রূপে দণ্ডায়মান—যেন মানবীয় শোভাযাত্রার গতিশীল রঙীণ দৃশ্যগুলির প্রতি কটাক্ষ করে বলছে,—

> Men may come and men may go,
> I go on for ever,

কিন্তু গোল বাধে, আকৃতির কোন অংশগুলি বংশজ, সুতরাং অপরিবর্তনীয়, আর কতখানিই বা পরিবর্তনশীল, তাই নিয়ে। জন্মতত্ত্ব (Eugenics) বিষয়টির উপর প্রচুর রশ্মিপাত করেছে, যার ফলে জন্ম-রহস্যের অনেক ব্যাপার এখন আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে এসেছে। পশু পক্ষী উদ্ভিদ প্রভৃতিকে যেমন বাছাই করে প্রজনন সম্ভব হয়েছে, মানুষ নিয়ে সে-রকম পরীক্ষা চলে না বলে' মানুষের আকৃতি প্রকৃতির পার্থক্যগুলির কারণ সম্বন্ধে কোথাও-না-কোথাও একটু দ্বিধা থাকা বিচিত্র নয়। যেমন, বর্ণ, আকৃতির দৈর্ঘ্য প্রভৃতি সন্তান পিতা-মাতার কাছ থেকে পায়, এ-কথা স্বীকার্য—কিন্তু ওগুলির উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের কি কোন প্রভাব নেই? গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করলে বর্ণ কালো হয়। কসরত করলে শরীর বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান হয়। তেমনি এ ও দেখা গেছে, উপযুক্ত পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রভাবে ব্যক্তির দৈর্ঘ (Stature) বৃদ্ধিলাভ করেছে। যে-সব স্থানে জমি অনুর্বর, খাদ্য-শস্য প্রচুর জন্মে না, সেখানকার লোকদের দৈর্ঘ খাটো। আবার তারাই যখন স্বাস্থ্যকর উর্বর দেশে গিয়ে বসবাস করে, পুষ্টিকর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খেতে পায়, তখন দেখা যায় তাদের দৈর্ঘ বর্দ্ধিত হয়েছে। পরিবেশ ও খাদ্য যে দেহাকৃতির কিছু-কিছু পরিবর্তন করতে পারে, তার ভুল নেই। আবার অঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহারেও (use and disuse) আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশ বা অন্যান্য অবস্থার ফলে যে-সব পরিবর্তন হয়, তাদের বলা হয় 'অর্জিত গুণ' (acquired characters)। এইখানে প্রশ্ন ওঠে: এই সব অর্জিত গুণগ্রাম বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কি? ব্যায়ামের ফলে বলিষ্ঠ পিতার পুত্র কি উত্তরাধিকারসূত্রে সুস্থ সবল দেহ লাভ করে? পুষ্টিকর খাদ্যের প্রভাবে যে-ব্যক্তির দৈর্ঘ বৃদ্ধি পেয়েছে তার সন্তানেরা কি জন্মসূত্রে সেই মত দৈর্ঘের অধিকারী হয়? এ-বিষয় জীবন-তাত্ত্বিকদের (biologist) মধ্যে মতভেদ আছে। অনেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মত—অর্জিত গুণ ব্যক্তির নিজস্ব, পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না। এই মতেরই প্রসার অধিক, যদিও বিপরীত মতটিকেও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবে এ-কথা ঠিক যে অর্জিত গুণ দুচার পুরুষে বংশে সঞ্চারিত হয় না। দীর্ঘকাল বহুপুরুষ ধরে' একরকম আবেষ্টনের মধ্যে বসবাস করলে, আঙ্গিক পরিবর্তনগুলি স্থায়ী হয় কি না, তা-ই নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে।

অন্যান্য জীব-জন্তুর মত মানব-জাতীয় জীবের মধ্যেও যে উপজাতি ও শ্রেণীর (Species, sub species) উদ্ভব হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। আদি-মানব ও আধুনিক মানব (Homo sapiens) বিভিন্ন উপজাতির অন্তর্গত বলে' ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মানুষ (races of men) সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তারা সকলেই একই speciesএর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন উপজাতি বা

speciesএর মিশ্রণে সন্তান জন্মায় কদাচিত এবং শঙ্কর-জাতিরা প্রায়ই অনুর্বর। ভিন্ন জাতীয় মানুষের মিশ্রণ উর্বরতাকে নষ্ট করে না। এ-ছাড়া রক্তের পরীক্ষা (Blood test) সর্বজাতীয় মানবের উপজাতি (species) পর্য্যায় এক বলেই নির্দেশ দিয়েছে। ভিন্ন জাতীয় মানুষদের আকৃতির প্রভেদগুলি কতক বংশক্রম (heredity) এবং কতক প্রাকৃতিক পরিবেশ (environment) থেকে উৎপন্ন। উষ্ণ দেশে কেবল কৃষ্ণবর্ণ জাতি দেখা যায়। তাদের নাক চওড়া, চ্যাপ্টা। উত্তর ইউরোপের মানুষ শ্বেতাঙ্গ, নাক লম্বা, সরু, টিকালো। অনেকে বলে থাকেন, এ-সব পার্থক্য প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural selection) ফলে ঘটেছে। কৃষ্ণাঙ্গ না হলে বিষুব রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলের উত্তাপ বহন করা দুঃসাধ্য এবং চওড়া নাকের প্রয়োজন শ্বাস-যন্ত্রে অধিক পরিমাণ বাতাস গ্রহণের জন্য। পক্ষান্তরে অত্যধিক শীত-প্রধান স্থানের পক্ষে শ্বেতবর্ণই উপযোগী। শ্বেতাঙ্গের নাক সরু বাঁশীর মত এই জন্য যে, তার ভিতর দিয়ে শ্বাস নেবার সময় বাতাসের শীতলতা হ্রাস পায়। গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে শ্বেতাঙ্গের ও শীতপ্রধান স্থানে কৃষ্ণাঙ্গের উচ্ছেদ ঘটেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে। নিগ্রোদের ঘর্ম-স্রাবী গ্ল্যাণ্ডগুলির সংখ্যা অধিক—কারণ, তাপের জন্য তাদের অতিরিক্ত ঘর্মস্রাব হয়।

জাতি সম্বন্ধে এত-সব বলা সত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আকৃতিকে জাতির মানদণ্ডরূপে খাড়া করতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। চেহারা দেখে জাতি-নির্ণয় যদি সহজ হত, তাহলে বাঙালীকে দ্রাবীড় আর দ্রাবীড়কে বাঙালী বলে ভুল করা কখন সম্ভব নয়। বাঙালীর মধ্যে এমন লোক দেখা যায়, যার চেহারা পীত-জাতীয় চীনার মত। জাপানীরা পীত-বর্ণ মোঙ্গলীয় জাতি, কিন্তু তাদের মধ্যেও শ্বেত-জাতীয় আকৃতি বিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়, যাদের বলা হয়, আইনু (Ainu)। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে ভিন্নজাতীয় আকৃতির লোক দেখা যায়—যার একমাত্র কারণ, ভিন্নজাতীয় মানবের পরস্পর সংমিশ্রণ। এ-কথা সত্য, আকৃতির কোন কোন বৈশিষ্ট্য কোন কোন দেশের জাতির মধ্যে বেশী দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, এ-সব বৈশিষ্ট্যগুলি সেই জাতির মধ্যে অধিকতর ব্যাপকতা (high frequency) লাভ করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাপকতা বিবেচনা করেই মূল-জাতির আকৃতি নির্ণয় সম্ভব।

আজকের পৃথিবীতে 'অবিমিশ্র জাতি' (pure race) বলে কোন পদার্থ নেই তা একরকম সর্ববাদিসম্মত। নৃতাত্ত্বিকেরা জাতি নির্ণয় করেন শরীরের কয়েকটি লক্ষণ দেখে—যেমন মাথার আকার (head form), বর্ণ, নাকের গঠন, চুলের রং ও আকৃতি প্রভৃতি। এই লক্ষণগুলির বিভিন্ন সমাবেশ দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা মানব-জাতির ভিন্ন ভিন্ন 'টাইপ' তৈরি করেছেন। এই 'টাইপ'-গুলি সব কৃত্রিম—দেশ-ভেদে আকৃতি-বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাপকতা (frequency) দেখে, মনের মত করে গড়ে তোলা হয়েছে। টাইপ-মত মানুষ সর্বত্র বিরল, টাইপ-মত মানব-জাতির অস্তিত্বেরও প্রমাণ নেই। কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মে আকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির বিভাগ যে কত কঠিন তা দেখতে পাই আমরা, জন্তু-জগতে আকৃতি অনুসারে যখন শ্রেণী-বিভাগ করা হয়—যথা, Felis বিড়াল-জাতীয়, Leo সিংহ জাতীয়। বাঘের মাসী বিড়াল—এই চলিত কথাটির মধ্যে আকৃতির বিভিন্নতার সঙ্গে সাদৃশ্যেরও ইঙ্গিত আছে। প্রকৃতপক্ষে এদের আকৃতির প্রকৃতিগুলি একটি আর একটির উপর এমন ভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যে সেগুলিকে পৃথক করে শ্রেণীর সীমা-রেখা টানা সুকঠিন ব্যাপার। এই যদি হয় জীব-জন্তুর শ্রেণী-বিভাগের সমস্যা, মানুষের জাতি-বিভাগ তার চেয়ে শতগুণ জটিল—কেননা জন্তুরা স্বভাবত নিজ নিজ বাসভূমির আবেষ্টন ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না, আর মানুষ আদি-কাল থেকে ভবঘুরে, সেই কারণে মানুষের মধ্যে যত সংমিশ্রণ ঘটেছে, জন্তুর মধ্যে তত ঘটে নি। এক জাতির মানুষ অন্যত্র গিয়ে আর এক জাতীয় মানুষকে আক্রমণ করেছে, আবার তাদের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে তেমনই সহজে। ফলে, মানুষের জাতির মৌলিক আকৃতিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। নানারূপ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও নৃতাত্ত্বিকেরা কার্যকরীভাবে কতগুলি জাতি-শ্রেণীতে মানুষকে ভাগ করেছেন,—যেমন মেডিটারেনিয়ান জাতি, এলপাইন জাতি, নর্ডিক জাতি, আর্মানয়েড জাতি, মোঙ্গলীয় জাতি, নিগ্রিলো জাতি। জুলিয়ান হাকসলের মতে, এই সব জাতি-শ্রেণীকে race না বলে ethnic group বলা সঙ্গত।

মেডিটারেনিয়ান জাতিকে ইলিয়ট স্মিথ নাম দিয়েছেন, Brown Race। এই জাতির বর্ণ সাদা থেকে তামাটে পর্যন্ত হরেক-রকমের—চুল কালো, মগজ লম্বা থেকে মাঝারি এবং দৈর্ঘ মাঝারি। প্রাচীনকালে এই জাতি আফ্রিকার উত্তর ভাগ থেকে সুরু করে স্পেন, ফ্রান্স, বৃটেন, ইটালি প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই জাতির আফ্রিকাবাসীদের কেউ নাম দিয়েছেন হেমাইট (Hamite)। পূর্ব-অঞ্চলের হেমাইটদের সঙ্গে নিগ্রোদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রাচীন মিশরীয়েরা মেডিটারেনিয়ান জাতীয় মানুষ। আরব ইহুদি প্রভৃতি সেমাইট (semite)-দের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের হেমাইটদের সম্পর্ক ঘনিষ্ট— উভয়ই মেডিটারেনিয়ান জাতি থেকে উদ্ভূত। বৃটেন, ফ্রান্স ও ইটালির কেলটরা (Celt) ছিল এই জাতীয় মানুষ।

নর্ডিক জাতির মানুষ দীর্ঘাকৃতি, লালচে-সাদা রং, চক্ষু নীল বা ধূসর বর্ণের, ঢেউ-খেলা বা সোজা চুল—হলদে বা তাম্র বর্ণের, মাথার খুলি মাঝারি বা সরু লম্বা ধরণের। এই জাতীয় মানুষের বাস স্ক্যানডিনেভিয়া, উত্তর ইউরোপ ও বৃটেনে।

ইউরোপের পূর্বপ্রান্তের পর্বতাঞ্চল ও বলকান থেকে আরম্ভ করে হিমালয়ের উত্তর পর্যন্ত কতগুলি জাতি ছিল, যাদের নৃতাত্ত্বিক সার্গি 'ইউরেশিয়াটিক' নাম দিয়েছেন,তাদের মধ্যে প্রধান চারটি জাতি—এলপাইন পামির বা ইরানী, আরমেনয়েড ও ডাইনারিক (Illyrian) বলে অভিহিত। এলপাইন জাতি রাশিয়া থেকে মধ্য-ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের ও রাশিয়ার স্লাভেরা (slav) এই জাতীয়। এদের মাথার খুলি চওড়া, বাদামি বা কালো চুল, মোটা নাক, আকৃতি মাঝারি। পামির জাতীয়েরা পারস্য থেকে ম্যানচুরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত—লোমশ, ঈষৎ নীলাভ চক্ষু। ইতিহাসে এরা কোন প্রসিদ্ধিলাভ করে নি।

আরমেনয়েড্ জাতির মানুষ মধ্যমাকৃতি, মাংসল—নাসিকা উন্নত ও তীক্ষ্ণ। প্রাচীন হিটাইট (Hittite) এবং অনেক ইহুদির আকৃতি এই জাতীয়। ডিনারিক-টাইপের মানুষ ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের পর্বত-সমূহে ও পোল্যাণ্ডের দক্ষিণভাগে দেখা যায়। এরা দীর্ঘাকৃতি—মাথার খুলি চওড়া, চুল কালো, মুখ লম্বা, নাক সরু।

চীন, জাপান, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন, মানচুরিয়া—সমগ্র উত্তর এশিয়ায় মোঙ্গলিয়ান বা পীত জাতি ছড়ানো রয়েছে। আর, আফ্রিকা জুড়ে আছে কোঁকড়া-চুল, কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো জাতি।

জাতিগুলির আকৃতি ও ভৌগলিক বিস্তৃতির যে বিবরণ দেওয়া হল, মোটামুটি ধারণা করবার পক্ষে তাই বোধ করি যথেষ্ট। কিন্তু এই সঙ্গে কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা, যা অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, তাও দূর করা প্রয়োজন। আরব, ইহুদি প্রভৃতি জাতিদের 'সেমেটিক' জাতি বলা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আকৃতিমূলক সংজ্ঞা অনুসারে 'সেমেটিক' বলে কোন জাতি-নির্ণয় হয় নি। 'সেমাইট'-শব্দ ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক, জাতির নয়। সেমেটিক-ভাষা-ভাষী মানব-সমষ্টিকে এ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ইহুদিদের মধ্যে মেডিটারেনিয়ান, আরমেনয়েড প্রভৃতি অনেক জাতির আঙ্গিক লক্ষণ দেখা যায়। Ripley তাঁর Races of Europe গ্রন্থে বলেছেন, "The Jews are not a race, but only a people after all." আর একটি ভ্রান্ত ধারণা তথা-কথিত আর্য জাতি সম্বন্ধে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে আর্য-জাতি ও তাদের প্রতীক স্বস্তিকা-চিহ্ন নিয়ে জার্মানিতে তুমুল মাতামাতি হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের আর্য বলতেন, ভারতের উত্তরাংশের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা আর্যাবর্ত। ইরানীরাও নিজেদের আর্য-জাতি মনে করে দেশের নাম দিয়েছিলেন, 'ইরাণ' (Latin Ariana)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Max Muller 'আর্য'-শব্দটি প্রতীচির জনসমাজে প্রচলন করেন। তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, আর্য ভাষা-ভাষী ইন্দো-পারসিকেরা প্রাচীন আরিয়ানা জাতির বংশধর। সেই থেকেই আধুনিক জগত আর্যকে জাতির মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কোনদিন আর্য-জাতি কথাটি ব্যবহার করেন নি। তাঁরা যখন ম্যাকস-মূলরকে তাঁর ভ্রম বুঝিয়ে দিলেন, তিনি তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন ত্রুটি সংশোধন করতে। ১৮৮৮ সালে তিনি লিখেছিলেন, "Aryas are those who speak Aryan languages, whatever their colour, whatever their blood......To me an ethnologist who speaks of Aryan race, Aryan blood, Aryan eyes and hair is as great a sinner as a linguist who speaks of a dolichocephalic dictionary or a brachycephalic grammer."

মানব-জাতির জন্ম একাধিক স্থানে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে হয়েছিল, অথবা একই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষ, এ-সম্বন্ধে তথ্যের অভাবে নিশ্চয় করে' কোন কথা বলা যায় না। অনেকে মনে করেন একাধিক স্থানে বিভিন্ন জাতীয় মানুষের উৎপত্তি কোন আদি পুরুষ (Hominidae) থেকে হওয়া একান্ত অসম্ভব না হলেও, একই স্থানে তাদের জন্ম এবং সেখান থেকে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা যে অধিক, তার ভুল নেই। জুলিয়ান হাকস্‌লে বলেন, শীত-প্রধান ইউরোপ বা আমেরিকায় মানুষের জন্ম হয় নি, তা নিশ্চিত—কেন না যেরূপ পরিমিত উষ্ণতা Hominidae-র বসবাসের পক্ষে প্রয়োজন, তখনকার দিনে ইউরোপে সেরূপ অঞ্চলের বিশেষ অভাব ছিল। সে-জন্য তিনি মধ্য-এশিয়া ও আফ্রিকাকেই মানব-জাতির আদি জন্মস্থান বলে মনে করেন। মানুষ যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দেশ-দেশান্তরে স্বচ্ছন্দে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তা আমরা আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি। তাদের পূর্বপুরুষেরা যে স্থানীয় অধিবাসী ছিল, এরূপ সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কারণ আমেরিকায় আদি-মানবের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সমগ্র আমেরিকার আদি-বাসীরা এক জাতীয় এবং তাদের আকৃতিও বেশীর ভাগ এশিয়ার মোঙ্গলীয়দের মত। তাই, অনুমান করা হয়, তাদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থিত বেরিং প্রণালীর (Berring Strait) বরফ অতিক্রম করে' এশিয়া থেকে আমেরিকায় গিয়েছিল এবং পরবর্তী কোন কালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উভয় মহাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হবার ফলে তারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল।

জাতির আকৃতি যেমন বিভিন্ন, তেমনি জাতি-প্রকৃতিও ভিন্ন রকমের, এরূপ ধরণা অনেক লোকের মনে বদ্ধমূল। ইংরেজ জাতির অসাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধি, নর্ডিক জাতির অদম্য উৎসাহ, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অসামান্য মেধা, ধী-শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, যা বিজ্ঞানকে বিস্ময়ের বস্তু করে তুলেছে—এ-সব দেখে সত্যই মনে হয়, প্রাচ্য জাতির অলস মন্থর জীবনের কুলকুণ্ডলিনীর নাকে-জড়ানো ধর্মপ্রবণ চিত্তবৃত্তির সঙ্গে প্রতীচির জাতি প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। ইউরোপীয় জাতিরা তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির গর্ব করে, আর প্রাচী ধর্মকেই জীবনের সার বস্তুরূপে উপলব্ধি করে' ইউরোপের উৎকট বস্তুতন্ত্রকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। এই দুই রকমের বৈষম্যমূলক জাতি-গত মনোভাবকে উদ্দেশ করে'ই একদা রাডিয়ার্ড কিপলিং বলেছিলেন—East is East, West is West, and the twain shall never meet. প্রাচ্য জাতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপক জেমস্ কর্তৃক উদ্ধৃত একটি পত্রের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জনৈক তথ্যান্বেষী ইংরেজ কোন উচ্চ-পদস্থ তুর্কী কর্মচারীর কাছে সেখানকার নরনারীর সংখ্যা, আমদানি-রপ্তানি, স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে তুর্কী রাজপুরুষ লিখলেন,—"এ-সব সংখ্যা-নির্ণয় পণ্ডশ্রম মাত্র। হে আমার আত্মা, যে-বস্তুর সঙ্গে তোমার কোন সংস্রব নেই, তার সন্ধান তুমি কখনো ক'র না। শোন বন্ধু, ঈশ্বরে বিশ্বাসই একমাত্র জ্ঞান। তিনি জগত সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি-তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করে' তাঁর সমকক্ষ হবার ব্যর্থ চেষ্টা কেন ?" তুর্কী ভদ্রলোকের এই চিঠিখানায় যে নিশ্চেষ্ট নির্ভরশীলতা, বিশ্বাসীর অন্ধ আত্মসমর্পণ, নিরুদ্যম নিরুৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে, এই গুণগুলিকেই প্রাচীর জাতি-প্রকৃতি বলে ধরে নেওয়া

হয়েছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে—সত্যই যদি এরকমের নিস্তরঙ্গ অনুদ্বেগ মনোভাবই প্রাচীর জাতি-প্রকৃতি হয়, তা' হলে সেখানে মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, ইরাণী, ভারতীয় ও চৈন—এতগুলি প্রাচীন সভ্যতার সমুদ্ভব হল কেমন করে? সভ্যতার জন্ম ও বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা পরে দেখতে পাব যে, প্রাকৃতিক ও মানবীয় সংঘাতের প্রতিঘাত রূপে সভ্যতার বিকাশ, সভ্যতার ক্রম পরিণতির মধ্যে স্থৈর্য, জড়তা, আলস্যের অবকাশ নেই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীনদেশে সভ্যতার মান ইউরোপ অপেক্ষা উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রসিদ্ধ ভিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো সে কথা স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। যে অতুল ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি তিনি চীনের নগরগুলিতে দেখেছিলেন, এমন তিনি আর কোথাও দেখেন নি, কল্পনাও করতে পারেন নি। নর্ডিকদের জাতি-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব একজাতীয় ইউরোপীয়ানদের মজ্জাগত। কিন্তু রোমান সিজারদের সময়ে ল্যাটিন-জাতীয় ব্যক্তিরা বৃটন বা জার্মানদের বুদ্ধিবৃত্তি বা মেধায় নিশ্চয়ই নিজেদের সমকক্ষ মনে করতেন না। একজন লেখক বলেছেন, এই সব বর্বরজাতিরা (নর্ডিক) কি করেছে, যাতে মনে হতে পারে তারা কোন বড় কাজ করতে সক্ষম? আরিষ্টটলও এদের বুদ্ধিহীন ও কর্মে অপটু বলে মনে করতেন।

আকৃতি ও প্রকৃতি পায় মানুষ দুরকম উত্তরাধিকারসূত্রে—জীবন তত্ত্বের বংশ-গত উত্তরাধিকার (biological inheritance) এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (cultural inheritance)। জীবন তত্ত্বের বিধানমত দেহের আকৃতি বংশানুক্রমে সন্তানে বর্তে, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। মনের প্রকৃতি ও অভ্যাসগুলি মানুষ পায় সংস্কৃতির উত্তরাধিকাররূপে, সেগুলি সমাজের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সংযোগের ফল। সমাজ মানুষকে যে-সব বাঁধাবাঁধির ভিতর আটকে রেখেছে, আত্ম-প্রকাশের যে সব সুযোগ সুবিধা দিয়েছে বা দেয় নি—ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যে-সব রুচি বিশ্বাস সংস্কার দিয়ে ব্যক্তির মনকে প্রভাবান্বিত করে, জাতি-প্রকৃতি বলতে আমরা যা বুঝি, সেই জাতি প্রকৃতি ফুটে ওঠে প্রত্যেক ব্যক্তির সামাজিক বাঁধাবাঁধি, সুযোগ সুবিধা, রুচি বিশ্বাস, শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কারের ভিতর দিয়ে। জাতি-প্রকৃতি মানবিক পরিবেশের (human environment) প্রতিচ্ছবি। সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটলে, জাতি-প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু তা হলেও বলা যেতে পারে বটে—জাতিপ্রকৃতি বংশজ না হলেও, ব্যক্তির সমষ্টি নিয়ে যখন জাতি—তখন সকলজাতীয় ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি বা মেধা সমান না হলেই বুঝতে হবে, মস্তিষ্কের তারতম্য আছে। এক জাতীয় মানুষের মধ্যেও কেউ অত্যন্ত মেধাবী, কেউ বা অত্যন্ত নির্বোধ এবং এই প্রভেদ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে যা সচরাচর বংশজ উত্তরাধিকার বলেই ধরা হয়। শ্বেতজাতির মস্তিষ্ক অন্যান্য জাতি বিশেষত নিগ্রোদের অপেক্ষা আকার ও ওজনে বৃহত্তর হলেও, একথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় না যে আকার ও ওজন বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য ঘটায়। Eskimo দের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বৃহৎ এবং কোন কোন আদি-মানবের মাথায় মস্তিষ্কের পরিমাণ সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী। সম্ভবত বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভর করে ওজন ও আকার অপেক্ষা মস্তিষ্কের গঠন, স্নায়ুকোষ প্রভৃতির উপর। বিভিন্ন জাতির মস্তিষ্কের উপাদান, গঠন প্রভৃতি নিয়ে কোনরূপ মনস্তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হয়েছে, এমন কিছু জানা নেই। যে পর্যন্ত বিভিন্ন জাতির মস্তিষ্কের পরস্পর সম্বন্ধের সঙ্গে তাদের বুদ্ধিমত্তারও প্রভেদ নির্ণয় না হয়, সে পর্যন্ত বিজ্ঞান কখনও জাতীয় মনস্তত্ত্ব (racial psychology) বলে কোন পদার্থকেই মেনে নিতে পারে না। অবশ্য, আমেরিকায় সম্প্রতি বুদ্ধি-পরীক্ষা (Intelligence test) করে' নিগ্রোদের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্বেত-জাতির বুদ্ধিমত্তার তারতম্য নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। আজকাল বুদ্ধি পরীক্ষার ধুম পড়ে গেছে বটে, কিন্তু এই পরীক্ষায় ব্যক্তির সত্যিকার বুদ্ধিমত্তা আবিষ্কৃত হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আসলে বুদ্ধিমত্তা মনের ভিতরের জিনিস, কিন্তু তার উন্মেষ ও বিস্তার নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষার উপর। বুদ্ধিবৃত্তি—যা ভিতরের জিনিষ, সমাজের ও শিক্ষার প্রভাবকে বাদ দিয়ে নিছক বুদ্ধিবৃত্তিকে নাগাল পাওয়ার পদ্ধতি তথা-কথিত বুদ্ধি-পরীক্ষা এখনও আবিষ্কার করতে পারে নি। অল্প কথায় বলতে গেলে, মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির মধ্যে বংশজ উত্তরাধিকার কতখানি, তা নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই।

আমেরিকার নিগ্রোজাতি সম্বন্ধে বলা হয়, তারা ধর্মপ্রবণ ও সুগায়ক, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নি। শ্বেত-জাতির মধ্যে জিনিয়স্ বা তীক্ষ্ণ-ধী সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা যে নিগ্রো-জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী, তা হয়ত ঠিক। ফিশার বলেন, শ্বেতজাতি ও নিগ্রোদের মধ্যে প্রভেদ এইখানে, যদিও উভয় জাতির জনসাধারণের বুদ্ধি প্রায় সমান। কিন্তু এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, অনুন্নত সমাজে প্রতিভা-স্ফুরণের সুযোগ অল্প। নিগ্রোরা ক্রীতদাসের বংশধর, তাদের সমাজও একটি নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে—এই অবস্থাগুলি তাদের মনকে নিকৃষ্টতার অনুভূতি (inferiority complex) দিয়ে আচ্ছন্ন করে' বহুমুখী প্রতিভার অন্তরায় স্বরূপ হয়ে ওঠে নি, তা কে বলতে পারে?

পরিবেশের চাপে সমাজের ও সংস্কৃতির কিরূপ রূপান্তর ঘটে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিসমূহের অভ্যাস, সংস্কার ও চরিত্রের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, তার দুটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। পরিবেশ দুরকমের—প্রাকৃতিক ও মানবিক (physical and human environment)। মানুষ যে দেশে অবস্থান করে, সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থা—পাহাড় মরু বন নদী শৈত্য উষ্ণতা তার দেহ-মনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি জাতির সঙ্গে জাতির যুদ্ধবিগ্রহ ও মৈত্রী, অন্তর্বিদ্রোহ, শান্তি প্রভৃতির মধ্যে মানবিক পরিবেশকে উপলব্ধি করা যায়। প্রথমে প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা বলি। বহু শতাব্দী পূর্বে নরওয়ের ভাই-কিংরা (Vikings) নৌযোগে আতলান্তিকের কূলে নানা স্থানে অভিযান করতো। তখন একদল স্ক্যানডিনেভিয়ান আইসল্যাণ্ড দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। বর্তমান আইসল্যাণ্ডবাসীরা তাদের বংশধর। স্ক্যানডিনেভিয়া ও আইসল্যাণ্ড—উভয় দেশের অধিবাসীরা এক জাতীয় মানুষ—তা সত্ত্বেও তাদের সাংস্কৃতিক ও প্রকৃতিগত প্রভেদ এত বেশি যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার

কথা আজ কারো মনেও জাগে না। স্ক্যানডিনেভিয়া তার মৌলিক সভ্যতাকে হারিয়ে রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারী পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিল এবং আজ পৃথিবীর অন্যতম সুসভ্য দেশ বলে পরিগণিত। আইসল্যাণ্ডের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাচীন মহাকাব্যগুলি (Saga) থেকে। আবহমান কাল ধরে' নির্দয় প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তাদের সভ্যতা সহস্র বছরেও কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারে নি। স্পষ্ট বোঝা যায়, এর জন্য দায়ী, জাতীয় গুণ-ধর্ম নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশ। দ্বিতীয় কথা—মানবিক আবেষ্টন। প্রাচীন গ্রীক জাতির পূর্বপুরুষেরা যখন ক্রীটের উপর হানা দিয়ে তত্রত্য অধিবাসীদের উন্নত সভ্যতাকে (Minoan civilization) ধ্বংস করলে, উদ্বাস্তু ক্রীটবাসীরা এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে বসবাস করতে লাগলো বটে, কিন্তু তাদের কতিপয় নিকৃষ্ট ধরণের সভ্যতার সম্মুখীন হতে হল এবং সেই মানবিক সংঘাতের ফলে তারা তাদের মহান সংস্কৃতিকে হারিয়ে বসলো।

এই দুইটি উদাহরণ থেকে এ-কথা বেশ প্রতিপন্ন হয় যে জাতির প্রকৃতি বংশক্রমের উপর ততখানি নির্ভর করে না, যতখানি নির্ভর করে প্রাকৃতিক ও মানবিক অবস্থার উপর। নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা নিছক মূঢ়তা—পরজাতি-বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচায়ক। জাতির মাহাত্ম্য-কীর্তন সর্বপ্রথম সুরু করেন ফরাসী গ্রন্থকার গোবিনো (Gobineau)। এই ধুয়া ধরে' ম্যাডিসন গ্রান্ট্ তাঁর The passing of the Great Race বইখানিতে এই মতবাদ প্রকাশ করেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত নর্ডিক জাতির কাছে ঋণী। মনস্তাত্ত্বিক ম্যাকডাউলেনের মত পণ্ডিত ব্যক্তিও যখন এই মতের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ যীশুখৃষ্ট ও নেপোলিয়ানকে নর্ডিক জাতির মানুষ বলে প্রতিপন্ন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তখন বুঝতে হবে জাতি বিদ্বেষের মূল কত গভীরভাবে বিস্তৃত হয়েছে একজাতীয় ইউরোপীয়ানদের ভিতর। সৌভাগ্যক্রমে কোন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকই এই মতের সমর্থন করেন নি—আর জার্মান-বিজয়ী সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তি ও পরাক্রম দেখে, বহু ঘৃণিত শ্লাভ-জাতির কাছে নর্ডিক আত্মাভিমানকে যেন মাথা নত করতে হয়েছে।

ঋষি রাজনারায়ণ বসু

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস মুখে যে সমস্ত ক্ষাত্রতেজোদ্দীপ্ত মনীষিবৃন্দ আবির্ভূত হইয়া ঐ আন্দোলনের স্রোত ধারাকে শক্তিশালী, সুদূর প্রসারী ও অপ্রতিহত রাখিয়া গিয়াছিলেন—ঋষি রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় জননায়ক ও চিন্তানায়কদিগের অন্যতম। যে অভিনব উপায়ে ঋষি রাজনারায়ণ তৎকালীন আত্মবিস্মৃত ও প্রাচ্য ভাবধারায় আচ্ছন্ন জন-মনকে নব চেতনা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বহু শতাব্দীর পরাধীনতা-ক্লান্ত জাতিকে মুক্তিপথের অব্যর্থ সন্ধান দিয়াছিলেন, তাহা এদেশের জাতীয়তা সংগ্রামের ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ইং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর লোকপূজ্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ট সহকর্মী মহাত্মা নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের পুত্র। জগদ্বরেণ্য মনীষী শ্রীঅরবিন্দ হইলেন ঋষি রাজনারায়ণের দৌহিত্র।

প্রায় সাতবৎসরকাল বোড়াল গ্রামের সুমনোহর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাঁহার বাল্যজীবন গঠিত ও পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পরে ইংরাজী শিক্ষার জন্য তিনি বৌবাজারে 'শম্ভু-মাষ্টার' এর স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। তখন গ্রিফ্ সাহেব উক্ত স্কুলে পড়াইতেন। শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে কিছুকাল পড়িয়া তিনি ডেভিড্ হেয়ার্ স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। তখন ডেভিড্ হেয়ার স্কুলের নাম ছিল School Society's School. ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, নামান্তরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। তৎকালে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবগোপাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, নীলমাধব

ঋষি রাজনারায়ণ বসু

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ। কিন্তু রাজনারায়ণ ঐ অভূতপূর্ব্ব ও কীর্ত্তিবান্ ছাত্র সমাবেশের মধ্যেও অসাধারণ প্রতিভাবলে,

পাণ্ডিত্যে ও প্রবল সাহিত্যানুরাগে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিশটাকা করিয়া সিনিয়র স্কলারসিপ্‌ ও পরে চল্লিশ টাকা ছাত্র-বৃত্তি লাভ করেন।

সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া নানা জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন ও রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রায় দুই বৎসরকাল ইংরাজী অনুবাদকের কার্য্য করেন। তিনি কঠ, কেন, ঈশ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-গুলির যে সমস্ত তরজমা করিতেন উহা উচ্চপ্রশংসিত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইত।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে—এই সময় অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত যথা—মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি তাঁহার নিকট অল্প বিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন।

ঋষি রাজনারায়ণ বসু-স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন রত ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—পশ্চাতে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

তিনি মেদিনীপুর জেলাকেই তাঁহার আদর্শবাদ প্রচারের প্রধান কেন্দ্র নির্ব্বাচন করেন এবং ইং ১৮৫১ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ এই দীর্ঘ ষোল বৎসরকাল মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান-শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উক্ত জেলার শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তৎকালে তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও প্রচার পটুতায় সারা বাংলার জাতীয়-জীবনের উন্নতি সাধনের এক চমকপ্রদ সাড়া পড়িয়া যায়।

মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া—স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য তিনি ভাগলপুর, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, কনোজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং পরে ইং ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—এই সাতবৎসর কাল কলিকাতায় অবস্থান করেন—ও নানা গঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী হয়েন।

ঋষি রাজনারায়ণ—অতি দীর্ঘকাল যাবৎ আদি ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালক ও সভাপতি, শ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা, সুরাপান নিবারণী সভার প্রবর্ত্তক, জাতীয় গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভার উদ্যোক্তা, চৈত্র মেলা, নামান্তরে হিন্দু মেলার মন্ত্রদাতা, বৃদ্ধ হিন্দুর আশা নামক পুস্তক রচনা করিয়া মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপন, ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বহু অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন ও অপূর্ব্ব বাগ্মিতার দ্বারা তিনি আত্মবিস্মৃত জাতির মনে সম্বিৎ ফিরাইয়া আনেন এবং স্বাধীনতার জয়যাত্রার পথের নির্দ্দেশ দেন। ঋষি রাজনারায়ণকে বলা হইত "জাতীয়তা সংগ্রামের পিতামহ"।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া তিনি আমৃত্যু অর্থাৎ ইং ১৮৭৯ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেওঘরে অবস্থান করেন। তাঁহার অবস্থানের জন্যই দেওঘর এক পবিত্র তীর্থ স্থানে পরিণত হয় সেখানে তিনি "জ্যান্ত বুড়া শিব" নামে আখ্যাত হয়েন। এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ, কবি মানকুমারী, মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ—তাঁহাকে দর্শন

ঋষি রাজনারায়ণ বসু-স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-ফলক স্থাপনরত পশ্চিম বাংলার ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু

করিতে আসিতেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ঋষি রাজনারায়ণের এদেশে আবির্ভাব হইয়াছিল এক যুগ সন্ধিক্ষণে, এবং তিনি এদেশকে রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন—এক মহা ধর্ম্ম-বিপ্লব হইতে।

কবি নবকৃষ্ণ ঘোষ ঋষি রাজনারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ সন ১৩২১ সালে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—তাহার কতকাংশ এইরূপ—

হে ঋষি!

প্রাচীন নবীন যুগ সঙ্গমের কূলে—
স্নান করি উঠি মুক্ত সৈকত শেখরে
যে বিপ্লব দেখেছিলে সমাজের স্তরে॥
সাহিত্যে, শিক্ষায়, ধর্ম্মে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিবলে
আঁকিয়া সে স্মৃতি চিত্র যতনে বিরলে॥
বিমল রহস্য রাগে সুরঞ্জিত করে
উদার অন্তরে, ভক্তি অনুরাগ ভরে;
অর্পিয়াছ মাতৃভাষা চরণ কমলে॥
হে মনস্বী, কর্ম্মবীর কর্ম্মাত্মা সরল
স্বদেশ প্রেমিক তুমি সুহৃদ-বৎসল॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ঋষি রাজনারায়ণ সম্বন্ধে [লি]খিয়াছেন—

"ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল [ত]ন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না।

[বো]ড়াল গ্রামে ঋষি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি মন্দিরদর্শনে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট আগন্তুকগণ

[তখন]ই তাঁহার চুল দাড়ী প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাঁহার [অন্ত]রের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মত হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে [যে]ন ঢাকা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল।...রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, [ইংরেজ]ী বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ, কিন্তু অনভ্যাসের সমস্ত [বাধা] ঠেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে [থাকি]ত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে—হাত নাড়িয়া [আমাদে]র সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি
সহস্রটি মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি
সহস্র জীবন" * * *

[এ]ই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা—আমাদের দেশের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করার সামগ্রী সন্দেহ নাই"।

সুখের বিষয় বোড়াল গ্রামবাসী ও ঋষি রাজনারায়ণের বংশধরগণের উদ্যোগে তাঁহার জন্মস্থান বোড়াল গ্রামে তাঁহার এক উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। এই স্মৃতি-মন্দিরে এক বালিকা বিদ্যালয়, একটি পাঠাগার ও একটি মাতৃসদন স্থাপিত হইবে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু—উক্ত স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-ফলক স্থাপন করেন এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন, মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বোড়াল

স্মৃতি-মন্দিরের সম্মুখভাগ

গ্রামের কর্ম্মী-বৃন্দকে উৎসাহিত ও উক্ত স্মৃতি-মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যের সূচনা করেন।

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ঋষি রাজনারায়ণ স্মৃতি-রক্ষা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট জননায়কগণ ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

আশা করি দানশীল জনসাধারণের সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্যে এই প্রারব্ধ মহান্ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি অচিরে গড়িয়া উঠিবে এবং উহার দ্বারাই পশ্চিমবঙ্গে ঋষি রাজনারায়ণের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

ওলন্দাজের দেশে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

নেদারল্যাণ্ডসের বৈশিষ্ট্য সাগরের ও নদীর বাঁধে। বাঁধ বেঁধে জল সেচে ওলন্দাজ জমি জাগিয়েছে—এ কৃতিত্ব তার শ্লাঘনীয়। অটো-পোতে সহরের ভিতর দিয়ে জাইডার জীর মধ্যে পোতাশ্রয় দেখতে গিয়েছিলাম। জাহাজ-চালক সিন্ধীয়া কোম্পানীর একখানি জাহাজ দেখিয়ে বল্লে—আপনাদের জাহাজ। তখন তাদের কথা না কহিলে সৌজন্যে নিয়ম কানুন ক্ষুণ্ণ হয়। আমি তাদের ডিয়েক বা বাঁধের সুখ্যাতি করলাম, পবন-চক্রের চঞ্চল-চল পাখার যশ গান করলে আমার পৌত্রী। এক্ষেত্রে তার পাশের আসনের সুন্দরী, বিনা পরিচয়ে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা অবিধেয়, য়ুরোপের এ বিধি লঙ্ঘন করবার প্রেরণা পেলেন মনে।

ওয়ে হাউস্

বোধহয় তিনি কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী—কারণ স্বরে অবিসম্বাদিতার রেশ। ইংরাজিও স্পষ্ট। বল্লেন—জান ছোট একজন (লিটিল্ ওয়ান্) এদেশের প্রবচন? ভগবান জল সৃষ্টি করেছেন, জমি সৃষ্টি করেছে মানুষ।

অবশ্য আমি কূর্ম-অবতারের পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত না করে, বড় বাঁধে যাবার পথের তথ্য জেনে নিলাম। হোটেলে এসে পুত্রকে সমাচার দিলাম। গাড়ি চালাতে পাবে নতুন পরিবেশে বাঁধের ওপর, এই রকম একটা অবকাশের জন্য সে ছিল উৎসুক। বুঝলাম মানচিত্র এবং অন্যত্র সংগৃহীত প্রাণারাম সমাচারের যৌথ সহায়তায় আমাদের অটো-রথ যাবার বহুপূর্বে পুত্র জয়দেবের মনোরথ বাঁধের ওপর পরিভ্রমণ করেছে।

প্রাতঃরাশের পর আমরা জলের ধারে গেলাম। সেতু নাই। এক প্রকাণ্ড জাহাজ জটায়ুর মত আমাদের এবং অপর পাঁচজনের মোটর-রথ গ্রাস করলে; মিনিট দশ পরে পরপারে গাড়ি উদ্গার করলে। আমরা নাবাল জমির সুগঠিত রাজপথ দিয়ে উত্তর দিকে ছুটলাম। পথের দু'পাশে বাগান। টুলিপ প্রভৃতি ফুলের চাষ। পথের ধারে খালের উপর বাষ্পীয় জাহাজ, অটো-পোত এবং কোথাও পাল-তোলা জলযান চলাফেরা করছে। মাঠে ধেনু চরছে, বেশ পুষ্ট-দেহ হল্স্টিন্ গরু। আমি বহুবার বলেছি, য়ুরোপ গো-খাদকের দেশ, কিন্তু যতদিন গরু জীবিত থাকে, তার আদর-যত্ন মধুর। আমরা গো-পূজকের জাত। কিন্তু জীবিত গাভীর লাঞ্ছনা এদেশে হৃদয়-বিদারক। কলিকাতার পথের ধারে বাঁধা গরুর গায়ে গোময়, গোয়ালার লাঠির দাগ এবং চামড়ার অন্তরাল হ'তে উঁকি মারে প্রত্যেকটি হাড়। পাড়ার লোক গোয়ালার ভয়ে কিছু বলে না, নিচের কোটার পুলিশ ও মুন্সীপালের কর্মচারী উপরি লাভের চেষ্টায় মূক, বধির ও অন্ধ।

আমরা বাঁধের পথে সহরের মধ্যে পেলাম হূরন। Hoorn ইংরাজি Hornএর ওলন্দাজীরূপ। ও দেশের বহু শব্দ ঠাণ্ডা মাথায় বোঝবার চেষ্টা করলে বোঝা যায় তাদের জ্ঞাতিত্ব ইংরাজির সঙ্গে। যেমন Laang Street ইংরাজি Long Street, লম্বা পথ। কিন্তু অভিনেত্রী Tooneelspeelster, যৌথ Jointly—Gemeen schappelijik। আরও ভীষণ কোম্পানী—Maatschappij। অথচ Steamboat—বাষ্পপোত—Stoomboot। অতদূর যেতে হবে না। কলিকাতার ডচ্ ব্যাঙ্কের নাম চোয়াল-ভাঙ্গা Nederlanolsche Handel Maatschapij.

বুটের কথায় মনে পড়ে তাদের কাঠের জুতা ক্লম্পেন। ইয়র্কসায়ারের গ্রামে বহু মহিলার জুতার তলাটা কাঠের। তাদের বলে ক্লগ। এদের জুতা আগাগোড়া কাঠের।

আমস্টারডাম হ'তে হূর্ণ প্রায় ৬০ মাইল। সেথান থেকে উইনজেনও প্রায় ৬০ মাইল। উইনজেনে বাঁধের উপর উঠলাম। অপূর্ব ব্যাপার, পাকা বাঁধ—পাথর ও সিমেন্টে গাঁথা। একদিকে জাইডারজী সমুদ্র, তার ওপর বড় বড় জাহাজ চলছে, ছোট ছোট ঢেউ এসে লাগছে ডিয়েকে. প্রাচীরের গায়। উত্তরে উত্তর সাগর—নর্থ সি। বাঁধের ওপর থেকে দূরে দ্বীপ দেখা যায়। উত্তর সাগরের এই অংশের নাম—ওয়াডেনজী। Zee অবশ্য Sea শব্দের ওলন্দাজী চড়া গলায় আওয়াজ।

বাঁধের মাঝে মাঝে জাইডারজীর জল ছেঁচে ওয়াডেন উপসাগরে ফেলবার ব্যবস্থা। বহু মোটর গাড়ী জড় হয়েছিল বাঁধের ওপর ওয়েনজেনে। সেখানে একটা মীনার আছে। তার ওপর উঠে যাত্রীরা সবাই দেখে দুদিকের সাগরের অসমতল শোভা। নীচে ভোজনালয়। বহু দেশের লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। সবাই নিজের দেশের সুনাম রক্ষার জন্য সৌজন্য প্রকাশে তৎপর। অবশ্য পুরাণো দিনের মূক-বধির বিদ্যালয়ের অনুরূপ সঙ্কেত ভাষায় মনোভাব বিনিময় হ'ল। ইন্ডিয়ানো, ইন্দি, হিন্দু স্তানিয়া প্রভৃতি শব্দে আমাদের জাতি-নির্ণয় করেছে সবাই। কিন্তু ওদের মধ্যে কে সুইডেনের লোক, কে ডীনেমার, কে ইতালীয় বা কে ফরাসী তা পরিচয় যাত্রী নিজে দেয়। সবাই সাদা, সবারই পোষাক একরকম। আমেরিকান ও ইংরাজ চেনা যায় পরিচিত ভাষায়।

হলাণ্ডের এ অঞ্চলের পশ্চিমতম অন্তরীপ হেলডার হতে এই বাঁধ ছুটেছে, লীওয়ারডেন অবধি—মোট লম্বায় প্রায় শত মাইল। শেষোক্ত সহর হতে ফ্রিয়েজল্যাণ্ড প্রদেশের ভিতর দিয়ে আমস্টারডাম ফেরা যায়। অন্য পথে পড়ে, হেলডার, আলকমার, হারলাম প্রভৃতি সহর। এ পথে ছোট ছোট বাঁধ আছে, উত্তর সাগরের কিনারা দিয়ে ছুটেছে পথ। আমরা এ পথেই ফিরলাম।

অলকমার চীজের হাট। নদী না খাল ঠিক জানিনা। তার ওপর পুরাতন গির্জা বাড়িতে চীজের হাট। চীজ ও এক একটী চীজ্। মোটা গোল দেহ সাদা রাংতা মোড়া। সারা ডাচ্ রাজত্ব হতে হাটবারে গুলি সেথা এসে স্তূপীকৃত হয়। তার পর দরদস্তর চলে। শেষে যে দামে ক্রেতা ও বিক্রেতা হাত মেলাবে, সেই দামই হবে শেষ দাম। পানে ভূমিকম্প হলেও এদের হাত মেলানো কথার নড়চড় হয় না।

অলকমার বেশ সুদর্শন সহর। জলের ওপর অট্টালিকার প্রতিবিম্ব পড়ছে, এ দৃশ্য নগরকে সুশ্রী করে। তার পর অনেকগুলি গ্রাম, খাল.বিল পার হয়ে বার্জেন আন জি, অর্থাৎ বারজেন অন্ সি, পৌঁছে মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম।

আমস্টারডামে ফেরবার পথে আর একবার জাহাজে গাড়ি পার করে দিলে। মাত্র শিশুদের কেন, আমাদেরও বেশ ভাল লাগলো। সুখ হয় পুরাতনকে পেলে আবার নূতন অভিজ্ঞতা এলে।

আমস্টারডাম হলাণ্ডের শ্রম-শিল্পের কেন্দ্র। এখানে কাটা হীরার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি জগত জুড়ে। আস্টার কোম্পানীর কারখানা বিখ্যাত। ওরা গর্ব করে যে কোহিনুর হীরা সেই কারখানায় কাটাই ছাঁটাই হয়েছিল। এ-ছাড়া আরও যে কয়েকটি কারখানা আছে তাদের মধ্যে হেনস কস্টারের কর্মশালা জনপ্রিয়।

আমস্টার্ডামের বিশ্ব-বিদ্যালয় সতেরো শতকের। এ সহরে অনেকগুলি সংগ্রহশালা আছে, এবং অবশ্য পুরাতন গির্জা আছে কতকগুলি। তাদের মধ্যে উদি গির্জা ১৩০০ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত। গথিক স্থাপত্যের ধারায় নির্মিত নিউকার্ক ১৪০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। সতেরো শতকের আরও কয়েকটি গির্জা আছে।

হাগ আন্তর্জাতিক মিলন বৈঠকের শান্তিনী কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত। অবশ্য আজ আন্তর্জাতিক শালিস পরিহাসের কথা। কিন্তু এখানে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা বিদ্যমান। ম্যালেরিয়া, মুখিক, খাল, তিন জুড়ে যেমন সরিষাখালি—তেমনি বাঁধ, পবন-চক্র এবং শিল্প-সংরক্ষণ হল্যাণ্ডের প্রাণ। হাগের চিত্রশালার নাম মরিটস্‌হুইস্—Mauritshuis—হুইস বোধ হয় ইংরাজি হাউস, গৃহ। এর মাঝে বহু পুরাতন চিত্র আছে। ঘারমীরের ডেলফ টের চিত্র এখানে আছে। মিউনিসিপাল মিউজিয়মে অনেক চীনা-মাটির পাত্র আছে। এ ছাড়া দুটি সংগ্রহশালা আছে—আধুনিক যুগের ছবির। বাদ্য-যন্ত্রের একটি যাদুঘর আছে। পুরাতন মুদ্রার মিউজিয়ম আছে।

হাগের অন্য নাম ডেল হাগ, তথা গ্রেভেন হাগ। সহরের রাস্তা প্রশস্ত, অনেক দোকান সুতরাং লোকের ভিড়। হল্যাণ্ডে যত দু-চাকার গাড়ি চলে অমন কোথাও দেখি নি। আমস্টারডাম, হাগ, রটারডাম বাইসিকেলে পূর্ণ। ছুটির দিন সহরের বাহিরের পথে বহু লোক বাইসিকেল্ চড়ে ঘুরতে যায়। প্রত্যেক সহরগুলি চারিদিকে বাড়ছে। পূর্বে বলেছি ডাচরা বলে তারা গরীব, কিন্তু যুদ্ধের পর এদেশেই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক গৃহ-নির্মাণের ব্যবস্থা হচ্চে। আমার বিশ্বাস এসিয়ার জাভা সুমাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক লোপ ক'রে ওরা দক্ষিণ এসিয়ার অর্থ দেশে নিয়ে গিয়ে জমিতে ভিড় গাড়ছে। এ-কথা আমি আন্দাজ করছি পর্য্যটকের সবজান্তা ভাব নিয়ে। সংক্ষেপে পরের বিষয় সিদ্ধান্ত করবার ধৃষ্টতা টিম্বাকটু হ'তে পোপোক্যাটিপ্যাটেল অবধি সর্বত্র সুলভ।

বায়ু-চালিত একপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র। ইহার সাহায্যে শস্যক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়—হল্যাণ্ড

ডেল্‌ফ্‌ট্‌ সুন্দর সহর। হলাণ্ডের উদ্ধারকর্তা বীর রাজপুত্র উইলিয়ম ১৫৮১ সালে হত্যাকারীর অস্ত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। ১৫৭২ খৃঃ অব্দে তাঁকে মারতে এসেছিল এক গুপ্ত শত্রু। তাঁর এক বিশ্বাসী কুকুর শব্দ ক'রে তাঁকে সতর্ক করে, যার ফলে সে যাত্রায় উইলিয়ম রক্ষা পান। ডেল্‌ফটে তাঁর এক অশ্বসাদীবেশে মূর্ত্তি আছে—পিছনে সেই বিশ্বাসী কুকুর। মাথার উপর ঢাকা। তার চার কোণের চারটি স্তম্ভরূপে আছে—ন্যায়, স্বাধীনতা, বীরতা ও ধর্ম। গত মাসের ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ শিল্পী বারমীরের অঙ্কিত ডেলফ্‌টের এক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

হ্যাগ হ'তে রটারডাম বারো মাইল। সহর বড়। খুব জাহাজের ভিড়। সমুদ্র হ'তে সহর দূর নয়। মাস নদীর কূলে এই সহর অবস্থিত। মাসের সঙ্গে অপর একটি নদী মিশেছে। এইটিই প্রধান বন্দর। হুগ্‌স্টাট প্রধান রাস্তায় এক প্রাচীন গির্জা আছে।

সারিবদ্ধভাবে সাজানো বাষ্পীয় জলসেচ যন্ত্র—হল্যাণ্ড

বিলাতের মারসি টানেলের মতো এখানে এক নতুন সুরঙ্গ হয়েছে। ভারি সুন্দর, মসৃণ ও রোমান্টিক। উপর দিয়ে নদী বহে যাচ্ছে, কিন্তু বিজলী আলোকে আলোকিত প্রশস্ত সুরঙ্গ পথে আমাদের গাড়ি চলছিল অবশ্য বহু গাড়ির সঙ্গে। কারও মন তুষ্ট হল না—মাত্র একবার সে পথে বেলজিয়মের দিকে এগিয়ে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সুতরাং যাত্রা করে আবার আমাদের ফিরতে হল সেই সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে রটারডাম। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় ভোগ-স্পৃহা হ'তে উৎকণ্ঠাই অধিক ছিল মনে, অন্ততঃ আমার।

রটারডাম হ'তে ডাচ ও বেলজিয়ম সীমানা প্রায় ২৪ মাইল। সে দিন ৩১ আগষ্ট। আমরা ভিসা বা প্রবেশ পত্র করেছিলাম লণ্ডনে। ট্র্যাভলিঙ্‌ এজেন্ট বা পর্য্যটক সহায়কের দেওয়া রোজনামচায় ঐদিন আমাদের হলাণ্ড ছাড়বার এবং ব্রাসেল্‌সে হোটেল আস্তানায় নৈশ-ভোজের ও নিশিপালনের ব্যবস্থার পর্য্যটক-সহায়ক নির্দেশ ছিল। হোটেল নিয়োগ সমর-পল্লী এবং ভিসা করে। ডাচ্‌ সীমানা পার হ'লাম। বেলজিয়াম প্রবেশের পথে পুলিশ বহু সেলাম ক'রে, ফরাসী বলতে লাগল। ব্যাপার কি? তলিয়ে বুঝলাম ভিসার অক্ষরের রদবদল হয়ে—৩১-৫-১০ স্থলে হয়েছে—৩১-৭-৫১ বেলজিয়ম এক মাস থাকবার অনুমতি। সুতরাং প্রবেশ নিষেধ একত্রিশ আগষ্ট।

গগনে সূর্য্যদেব জোরে হাঁসছেন—বিদ্রূপের হাঁসি তাই গায়ে বেশ লাগছে। জঠরের মাঝেও উত্তাপ। হল্যাণ্ডের মুদ্রা গিলডেন্‌ বদলে বেলজিয়মের ফ্র্যাঙ্ক কেনা হয়েছে। হল্যাণ্ড লিখে দিয়েছে যে আমরা তার সীমানা পার হয়েছি। মাঠের কয়েক গজ জমীতে ত্রিশঙ্কুর মত কি কাল কাটাতে হবে?

দু পক্ষের কর্মচারীদের মাথায় বুদ্ধির ঢেউ খেললো। উভয় পক্ষেই ভারতবাসীর সহায়তা করতে প্রস্তুত কিন্তু আইন বজায় রেখে। হল্যাণ্ড বল্লে—আমরা সীমানা পারটা নাকচ করে দিচ্চি। বেলজিয়ম বল্লে—এখনি রটারডাম চলে যান। আমাদের কনসাল চারটে অবধি থাকবে। আমরা দুঃখিত। যান তো একজন যান। বাকী সব নিকটস্থ ভোজনালয়ে থাকুন।

সুতরাং আবার ব্রেডা—রটারডামের সুরঙ্গ—হুগ্‌ স্ট্রাট রাজপথ—বেলজিয়াম কনসালের অফিস। হাঃ অদৃষ্ট! অফিস বন্ধ—দু'টায় খুলবে। তখন তাইরে নাইরে নাইরে-না—গান গাওয়া ছাড়া উপায় কি? সন্নিকটে ভোজনালয়ে চিত্রিতা বাচ্ছা দুটিকে নিয়ে গেলেন। পুত্রের ইচ্ছা আমিও যাই, আমার ইচ্ছা পুত্রও যায়। কিন্তু দু'জনেই রহিলাম—কন্সালের অফিসের দ্বারে।

শেষে কনসাল এলেন—অর্থাৎ যিনি সই করতে পারেন। তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করলেন, সহি দিলেন ছাপ দিলেন এবং যে ফি দিতে হয় তা' নিলেন না—কারণ সে ফি একবার দেওয়া হ'য়েছে। তার পর সবাই মিলে হাসলাম। তিনি লণ্ডনের অফিসের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

ভদ্রলোক বল্লেন—এনভার্স দেখতে ভুলবেন না। এনভার্স মানে এনটোয়ার্প।

ভদ্রমহিলা টাইপযন্ত্র ছেড়ে বল্লেন—আর ওয়াটারলু?

ভদ্রলোক বল্লেন—আর ঘেণ্ট। আচ্ছা ওখানে কোন চিঠিপত্র দিব?

ধন্যবাদ। হোটেলওয়ালারা ও বিষয়ে সদা সাহায্য করে।

মনে গান গুমরে উঠলো—

—যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই

ভালয় ভালয় বিদায় দাও মা আলোয় আলোয় চলে যাই।

আলো যথেষ্ট। অপরাহ্নের আলোকে পুত্র আধ ঘণ্টায় আবার ২৪ মাইল পার হ'ল। সীমানার ঠিক আগের ওয়ারণ ছিউটে ভোজনের চেষ্টায় ঢুকলাম একটি সুসজ্জিত গ্রাম্য ভোজনালয়ে।

একটি টুকটুকে মেয়ে, বয়স আন্দাজ আঠারো, সযত্নে খেতে দিলে। কিন্তু লালীকে জিভ ভেঙ্গালে, তাকে চকলেট দিলে, শেষে ভুলিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। নয় তারা বাঙ্লা জানে, না হয় লালী ওলন্দাজী ভাষা জানে। কারণ তাদের গল্প এবং হাসির রোল আমাদের খাবার ঘরে আসছিল। শ্রীমতী লালীর বয়স দু'বছর দু'মাস।

ক্রমশঃ আর একটি সুন্দরী এলো।

—তোমরা দুই বোন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

প্রথম যুবতী বল্লে—মাপ করুন। এক মিনিট।

ছুটে অন্দর মহল থেকে এক ছবি আনলে। বল্লে—মাঝে আমাদের মা বাবা। আমরা নয় বোন, চার ভাই।

বুঝলাম হল্যাণ্ডে মা ষষ্ঠীর কৃপার অভাব নাই। মা বাবাকে বিশ্রামের জন্য ওরা ব্রেডায় পাঠিয়ে নিজেরা পান্থ ভোজনাগার চালাচ্ছে। বড় ভাই কলেজে রুটি তৈয়ারীর কৌশল শেখে রটারডামে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি এ ইতিহাস দিলাম ওলন্দাজের সরল সৌজন্য বোঝাবার জন্য। প্রথমটা আমার ভয় হয়েছিল। পণ্ডিতজি সুকর্ণের কর্ণে মন্ত্র দিয়ে ইন্দোনেশিয়া হতে তার অধিকার লুপ্ত করতে সহায়তা করেছেন—এ কথা ভেবে ওরা হয়তো ভারতবাসীকে শত্রু ভাববে। কিন্তু সর্বত্র আমরা যত্ন ও আদর পেয়েছি। আমি তাদের বহু ভদ্রলোকের কাছে বলেছি তাদের সৌজন্যের কথা। সুতরাং হিন্দু অকৃতজ্ঞ এ কথা কারও বলবার অবকাশ হবে না।

বেলা তিনটের সময় বেলজিয়মে প্রবেশ করলাম। প্রথমটা এক দেশ, এক জাত, এক সব। যেমন ভারত, আর পাকীস্তান। আজ আমাদের দুদেশের লোকের মধ্যে সদ্ভাব নাই। কিন্তু অচিরে দিন আসবে যখন আমরাও ডাচ্ ও বেলজিয়ের মতো ভিন্ন শাসনাধীনে থাকব কিন্তু পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখব, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও মিত্রতার পাশে বাঁধা থাকব।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার-এট-ল

(শ্রীমদ্ভাগবত হইতে)

(শ্রীশুক)

পরিধানে পীতবাস গলে বনফুল মালা,
আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়,
নব পদ্ম যুগ্ম নেত্র অরবিন্দ জিনি কান্তি
মার্জ্জিত কুন্তল মণিময়।
কে এল মোহন তনু কৃষ্ণপ্রিয় অনুচর
উদ্ধবে হেরিয়া সবিস্ময়ে,
ব্রজললনারা যত করে সবে বলাবলি
কে বা এল নন্দের আলয়ে?
অচ্যুতেরই বেশভূষা সে আকৃতি আভরণ;
এত বলি সে উত্তম শ্লোকে—
ঘিরিয়া দাঁড়াল সবে অধরে সলজ্জ হাসি
বিদ্যুৎ কটাক্ষ দীপ্ত চোখে।
রমাপতি প্রিয়দূত তাঁহারই সন্দেশবহ
জানি' তাঁরে বসাল যতনে,
সুধাল কুশল প্রশ্ন পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানিয়া
মহাশয়, ভর্ত্তৃ-প্রয়োজনে—
মাতা পিতা এ দোঁহার অভীষ্ট সাধন তরে
বুঝিলাম এই আগমন,
অন্যথায় ব্রজপুরে নাই কিছু স্মরণীয়
কিছু নাই তাঁর প্রয়োজন।
শুনিয়াছি মুনিগণ স্নেহহেতু বন্ধুদের
করিতে পারে না পরিত্যাগ,
অপরের মৈত্রী আশা সেতো শুধু স্বার্থহেতু
তার মাঝে নাই অনুরাগ।
পুরুষের নারী সহ মিত্রতা সে ক্ষণতরে,
পুষ্প সহ অলির মিত্রতা,
নিঃস্বে গণিকা ও ছাড়ে, প্রজা অপদার্থ নৃপে,
কৃতবিদ্য আচার্য্য-হৃদ্যতা!
দক্ষিণা লাভান্তে আর যজমানে কোন কাজ?
বীতফলবৃক্ষে ছাড়ে পাখী,
আহারান্তে অতিথিরা চলি যায় গৃহ ছাড়ি
চিহ্ন কিছু নাহি যায় রাখি!
মৃগ ছাড়ে দগ্ধারণ্য জার অনুগত পত্নী
ভোগ শেষে ছেড়ে যায় চলি',
বাক্য মন কায় সবই গোবিন্দে স'পেছে গোপী,
তিয়া তাই উঠিল উথলি:
উদ্ধবে হেরিয়া তারা শোকলাজ পরিহরি,
লৌকিকতা দিয়া বিসর্জ্জন,
বাল্য ও কিশোর গাথা গাহিয়া কাঁদিয়া ওঠে,
না পারে করিতে সম্বরণ!
কৃষ্ণ সঙ্গ ধ্যান করি' নেহারিয়া ভৃঙ্গ এক
দূত বুঝি এই মধুকর,
ভাবিয়া ভ্রমর-দূতে কহিল মধুর স্বরে
কোন গোপী কুপিত অন্তর:—

(পূর্বানুবৃত্তি)

সেই কর্কশকণ্ঠ পেচকটা চীৎকার করে' উঠল আবার। তারপর দেখতে পেলাম একটা রক্তাভ আলোয় অন্ধকার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, আর সে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওই শবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। তার নির্নিমেষ চক্ষু দুটি যেন জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ডের মতো জ্বলছে। ক্রমশ দেখলাম তার দেহ থেকে দেহহীন মুণ্ড, মুণ্ডহীন কবন্ধ, বিকটদশনা প্রেতিনী, সিংহবদন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, একচক্ষু পিশাচ, বহুবাহু দানব প্রভৃতি ভয়াবহ প্রাণী সকল নির্গত হতে লাগল। তাদের অট্টহাস্যে, অসংযত নৃত্যে, উদ্দাম কলরবে অন্ধকার শিউরে উঠতে লাগল বারম্বার। কর্কশকণ্ঠ পেচকটা উন্মাদের মতো চীৎকার করতে লাগল তাদের ছন্দ-তাল-হীন অনৈক্য তানের সঙ্গে সঙ্গে। কাপালিক কিন্তু নির্বিকার। ধীর স্থির ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলেন তিনি। মনে হল তিনি যেন অন্ধ এবং বধির, কিম্বা যেন একটা শবাসীন শব। এই ভীষণ দৃশ্যও অবলুপ্ত হয়ে গেল খানিকক্ষণ পরে। আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, পেচকটা নীরব হয়ে গেল। আমি বসে রইলাম চুপ করে'। নূতন ঘটনা ঘটল আবার একটু পরেই। প্রচণ্ড একটা গর্জ্জন হল, আবার রক্তাভ আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল অন্ধকার। দেখলাম বিরাট একটা সিংহ কাপালিকের দিকে চেয়ে আছে। ক্রমশঃ সেই সিংহের চতুর্দ্দিকে জুটল—ব্যাঘ্র, বৃক, শিবা, সারমেয়, তরক্ষুর দল। সবাই চীৎকার করতে লাগল। সেই চণ্ডালের শবদেহ থেকে আরও যে কত প্রাণী বার হতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। লক্ষ লক্ষ কীট, ভীষণদর্শন পতঙ্গ, রোমশ গুটি পোকা, আরও কত কি। কীট পতঙ্গের দল কাপালিকের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে' বেড়াতে লাগল, আর শ্বাপদকুল চীৎকার করতে লাগল তাঁর চতুর্দ্দিকে। কাপালিক কিন্তু বিচলিত হলেন না একটুও। নিস্পন্দ নীরব হয়ে বসে রইলেন। আবার সব মিলিয়ে গেল, আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারিদিকে। আমি আচ্ছন্নের মতো সেই বটবৃক্ষের একটি কোটরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিলাম। মনে হল কে যেন আমার কানে কানে বলতে লাগল—এইবার তুমি যাও, ওই কাপালিকের সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ধর, ওকে বিচলিত কর, তা না হলে দ্বার খুলে দিতে হবে ওকে, যে দ্বার আমি প্রাণপণে বন্ধ করে' রেখেছি, যে দ্বার আমি কিছুতে খুলব না, সেই দ্বারেও করাঘাত করছে, ওকে অন্যমনস্ক করতে না পারলে দ্বার খুলে দিতেই হবে। তুমি ওকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা কর, ওকে বেষ্টন কর, ওর মুখের কাছে ফণা বিস্তার করে' তর্জ্জন কর। আমিও প্রশ্ন করলাম—কে তুমি। উত্তর পেলাম, আমি প্রকৃতি। মানুষ আমার রহস্যলোকে ঢুকে সব তছনচ করে' দিতে চায়। সহজে আমি সেখানে ঢুকতে দিই না কাউকে। কিন্তু একাগ্রচিত্তে কেউ যদি ক্রমাগত আমার দ্বারে আঘাত করে' তাহলে আমাকে দ্বার খুলতেই হয়, নিরুপায় হয়ে খুলতে হয়। একমাত্র উপায় হচ্ছে ওদের অন্যমনস্ক করে' দেওয়া। এই লোকটা যে মুহূর্ত্তে ঘোর অমাবস্যা রাত্রে শ্মশানে এসে চণ্ডালের শবদেহের উপর সমাসীন হয়ে ধ্যানমগ্ন হতে পেরেছে, সেই মুহূর্ত্তেই ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। সেই মুহূর্ত্ত থেকে ওর করাঘাতে আমার রুদ্ধদ্বার ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হচ্ছে। তোমারই কীর্ত্তি ওই শবদেহ। ওই শবদেহ না পেলে ও এ শক্তির পরিচয় ও দিতে পারত না, তুমিই আমাকে এই বিপদে ফেলেছ, তুমিই এখন আমাকে উদ্ধার কর। আমি বললাম, বলেন তো ওকেও গিয়ে দংশন করি। দংশন করবামাত্র ওর মৃত্যু হবে, আপনিও নিরাপদ হবেন। প্রকৃতি আকুলকণ্ঠে বলে' উঠলেন, না, না, ওর মৃত্যু আমি চাই না, ওকে অন্যমনস্ক করতে চাই। ওকে এরকম

হীনভাবে হত্যা করে' ফেলা আমার লক্ষ্য নয়, আমি ওকে বাজিয়ে দেখতে চাই ওর দৌড়টা কতদূর, তুমি ওকে দংশন কোরো না, কেবল ভয় দেখাও। গভীর অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি কে, কোথায় আছেন, তাঁর আকৃতি কি রকম—কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে তিনি যদিও ওই কাপালিককে বিচলিত করবার বহুবিধ আয়োজন করছেন কিন্তু মনে মনে যেন উনি কাপালিককে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কাপালিক ওঁর রহস্যলোকে ঢুকে সব তছনচ করুক এতে যেন ওঁর আপত্তি নেই, উনি যেন কেবল সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন কাপালিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন কিনা এবং কতক্ষণে হবেন। আমি কোটর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে কাপালিকের দেহে সঞ্চরণ করে' বেড়ালাম কিছুক্ষণ। মনে হল যেন প্রস্তরের উপর সঞ্চরণ করে' বেড়াচ্ছি। কিন্তু একটু তফাত ছিল। প্রস্তর সাধারণত শীতল থাকে, কিন্তু কাপালিকের প্রস্তরবৎ দেহ ছিল উত্তপ্ত। আমি খানিকক্ষণ তাঁকে বেষ্টন করে' বার কয়েক তর্জ্জন করলাম। কিন্তু কোনই ফল হল না। কাপালিক নির্ব্বিকার হয়ে বসে রইলেন। আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না, কাপালিকের উত্তপ্ত দেহ ক্রমশ এত উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে আমাকে নেবে পড়তে হল! তারপর আবার ঘনিয়ে এল নিবিড় অন্ধকার। আমি আবার ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকলাম আমার কোটরের মধ্যে। কতক্ষণ যে বসেছিলাম তা জানি না, হঠাৎ একটা তীব্র আলোকে সচকিত হয়ে দেখলাম যে সেই শবের মুণ্ডটা জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। তার মস্তকের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে যেন আলোর ফোয়ারা উঠছে। তারপর সবিস্ময়ে দেখলাম সে যেন হাসছে, তার চোখ দুটো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো নড়ছে। মনে হল কাপালিককে সম্বোধন করে' কি যেন বলছে সে। কি বলছে তা শুনতে পেলাম না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখলাম এক বিরাট পেচকে আরোহণ করে', এক অপরূপ রূপসী আবির্ভূত হলেন। তিনি কাপালিককে সম্বোধন করে' যা বললেন তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি। তিনি বললেন, তপস্বি, তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, এইবার বর গ্রহণ কর, কঠোর তপস্যা থেকে নিরত হও। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনরত্ন এখনই তোমার কাছে এসে স্তূপীকৃত হবে, তোমার তপস্যার পুরস্কার স্বরূপ তুমি সেগুলি গ্রহণ কর। আর তপস্যা কোরো না। আমি লক্ষ্মী, আমি তোমাকে বরদান করছি, আর তোমার তপস্যা করবার প্রয়োজন নেই। এই বলে' লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করলেন। শবমুণ্ডের জ্যোতিও অন্তর্হিত হল। কিন্তু পরক্ষণেই আর এক রকম অদ্ভুত আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চতুর্দ্দিক। সেই আলোকে দেখলাম কাপালিকের চতুর্দ্দিকে মণি-মাণিক্য হীরা-মুক্তা স্বর্ণ-রৌপ্য স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে, আর প্রত্যেক স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক একটি রূপসী। তারাও যেন প্রত্যেকেই এক একটি রত্ন। তারা প্রত্যেকেই কাপালিককে অনুনয় করতে লাগল, হে তপস্বি, এবার তুমি তপস্যা থেকে নিরত হও, আমাদের গ্রহণ কর। কাপালিক কিন্তু নির্ব্বিকার, অচঞ্চল। মনে হল এসব কিছুই যেন তাঁকে স্পর্শ করছে না। অনেকক্ষণ অনুনয়-বিনয় করে' রূপসীরা যখন দেখলেন যে কোন ফল হচ্ছে না, তখন তাঁরা একে একে অন্তর্দ্ধান করলেন ওই শবদেহের মধ্যে। ওই সব মণি-মুক্তা হীরা-মাণিক্য স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপও বিলীন হয়ে গেল ওই শবদেহেই। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। সেই দিন থেকেই আমি জানি যে শব মৃত নয়, তা অনন্ত সম্ভাবনার আকর।"

চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল, "আপনার কাহিনী খুবই মনোজ্ঞ। শব এবং কাপালিকের পরিণাম শেষ পর্য্যন্ত কি হল?"

"শেষ পর্য্যন্ত কি হল, তা আমি দেখতে পারি নি। কারণ একটু পরেই দেখলাম গরুড়ে চড়ে' স্বয়ং বিষ্ণু এসে হাজির হলেন। গরুড় আমাদের চিরশত্রু, তাই আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। অন্ধকারে আত্ম-গোপন করে' সে স্থান ত্যাগ করতে হল আমাকে। কিন্তু সেই দিনই আমি বুঝেছিলাম যে মৃত দেহ অনন্ত সম্ভাবনাময়। এই শবটি খুবই অসাধারণ মনে হচ্ছে, আসুন আমরা দেখি এর মধ্যে কি আছে। আমি যদি কাপালিকের মতো তপস্বী হতাম তাহলে শবারূঢ় হয়ে তপস্যা করতাম এবং খুব সম্ভবত আমার তপস্যা প্রভাবে পিতামহকে টেনেও আনতে পারতাম। কিন্তু সে শক্তি আমার নেই, আমি বস্তুতান্ত্রিক লোক, আমি শবকে

ছিন্ন ভিন্ন করে দেখতে চাই পিতামহের কোনও সন্ধান এতে পাওয়া যায় কি না।"

চার্বাক কিছুক্ষণ স্মিতমুখে কালকূটের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমার মনে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। যদি অনুমতি দেন সেটি ব্যক্ত করি।"

"অবশ্য ব্যক্ত করুন। এর জন্যে অনুমতির প্রয়োজন কি।"

"প্রয়োজন এই জন্য যে প্রশ্নটি হয়তো আপনার কোনও গোপন অহঙ্কার বা বেদনাকে ক্ষুব্ধ করে' তুলতে পারে। আমিও বস্তুতান্ত্রিক লোক, আমিও একটা বিশেষ কারণে পিতামহ ব্রহ্মার সন্ধানে বেরিয়েছি এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকজনক ব্যাপার হচ্ছে যে উক্ত কারণটি আমার কাছেই স্পষ্ট ছিল না এতক্ষণ, এখনই একটু আগে স্পষ্ট হয়েছে তা। সেই জন্যে মনে হচ্ছে যে আপনিও হয়তো অনুরূপ কোনও কারণবশত এই দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন—"

"আপনার কি মনে হয়েছে বলুন"

"আচ্ছা, আপনার এই অভিযান কি কোনও নারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?"

কালকূটের মুখমণ্ডলে বিস্ময় পরিস্ফুট হইল।

"এ কথা আপনার কেন মনে হচ্ছে বলুন তো"

"মনে হচ্ছে, কারণ আমি নিজে একটি নারী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছি"

"তাই না কি! যদি আপত্তি না থাকে আপনার কাহিনীটি আর একটু বিশদ করুন"

"আসুন, তাহলে উপবেশন করা যাক"

বিরাটকায় ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শবদেহের পার্শ্বে তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন। চার্বাক বলিল, "সুরঙ্গমা নাম্নী এক নর্তকীর রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে আমি কিছুকাল থেকে তার হৃদয় জয় করবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। হৃদয় জয় কথাটি কবিদের অনুকরণে আমি ব্যবহার করলাম বটে, কিন্তু আমার ধারণা 'হৃদয় জয়' না বলে' 'হৃদয়-ক্রয়' বা হৃদয়-অর্জন বললে ব্যাপারটি আরও সত্যভাবে ব্যক্ত হয়। কারণ উপযুক্ত মূল্য না দিলে কোন পুরুষ বা রমণীর হৃদয় অধিকার করা যায় না। সাধারণত অর্থমূল্যেই নর বা নারীর হৃদয় বিক্রীত বা বিজিত হয়ে থাকে, কিন্তু সুরঙ্গমার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। সুরঙ্গমা রাজ-নর্তকী, কুমার সুন্দরানন্দের প্রিয়তমা রক্ষিতা, অর্থের তার কোনও অভাব নেই। কুমার সুন্দরানন্দ তাকে বসনে-ভূষণে মণি-মাণিক্যে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছেন যে ও সবে তার আর রুচি নেই। রুচি থাকলেও কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি পারতাম না। সুতরাং আমি যে মূল্য দিয়ে তার হৃদয় ক্রয় করবার প্রয়াস পেতে লাগলাম তা যদিও উজ্জ্বল বসন-ভূষণ মণিমাণিক্যের চেয়ে অধিকতর মহার্ঘ, কিন্তু তা বসন-ভূষণ মণিমাণিক্যের মতো স্থূল বস্তু নয়, তা সূক্ষ্ম চিন্তার বৈশিষ্ট্যে বুদ্ধির প্রাখর্য্যে দ্যুতিমান। অর্থাৎ আমি আবেদন জানিয়েছিলাম তার বুদ্ধির কাছে। তাকে বলেছিলাম, 'সুন্দরানন্দ ভালবাসছে তোমার দেহটাকে তোমাকে নয়, তোমার বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা সম্বন্ধে সে উদাসীন, তাই তোমাকে সে যে সব উপহার দিয়েছে তা দেহ-সজ্জারই উপকরণ, তোমার প্রদীপ্ত বুদ্ধিকে প্রদীপ্ততর করতে পারে এমন কিছুই সে দেয় নি। আমি তোমাকে তাই দিতে চাই। তোমার নবোদ্ভিন্ন যৌবন সম্বন্ধে আমি কম সচেতন নই, কিন্তু তোমার নবোদ্ভিন্ন যৌবনই যে তুমি নও তা-ও আমি জানি। আমি এ-ও জানি যে তোমার যৌবন চিরস্থায়ী নয়, ওর গতি অধোমুখী, কিন্তু তোমার বুদ্ধি ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে যদি সম্যক উপায়ে তাকে লালন কর। তোমার যৌবন যখন থাকবে না তখন তোমার ওই উজ্জ্বল বুদ্ধিই শ্রীমণ্ডিত করবে তোমার দেহকে নবরূপে, তখন যে আভরণে সে মহিমান্বিত হবে তা কোনও স্বর্ণকারের বিপনিজাত অলঙ্কার নয়, কোনও সুন্দরানন্দের মূল্যের অপেক্ষায় তা পরহস্তগত হয়ে থাকবে না, তা তোমার অন্তরোৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রভা, তা কোনও দিন মলিন হবে না। আমি তোমার সেই অন্তরতম সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই, তারই কাছে আনতে চাই আমার অর্ঘ্যভার। আমি চাই আমার দর্শনে তুমি যেমন অপরূপ হয়েছ, তোমার দর্শনেও আমি যেন তোমার কাছে তেমনি অপরূপ হয়ে উঠি। শুধু আমি কেন, তোমার মানবী প্রকৃতি প্রত্যেক সমর্থ মানবকেই নূতন মহিমায় প্রত্যক্ষ করুক, নির্ব্বাচন করুক, আহ্বান করুক। সুন্দরানন্দের কারাগারে তুমি বন্দিনী হয়ে থাকবে কেন?' আমার এই বক্তৃতায় সুরঙ্গমার নয়নে বিদ্যুৎবহ্নি বিচ্ছুরিত হল। গ্রীবাভঙ্গী

করে' সে বললে—'মহর্ষি চার্ব্বাক, প্রথমেই আপনার একটা ভ্রম অপনোদন করে' দিতে চাই। সুন্দরানন্দের ঐশ্বর্য্য দেখে আমি মুগ্ধ হই নি, আমি মুগ্ধ হয়েছি তার শৌর্য্যে। ভল্লের এক আঘাতে তাকে বিশাল ব্যাঘ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি, তার সুনিক্ষিপ্ত খড়্গে ভীষণ খড়্গীকে নিপতিত হতে দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি তার উদারতা, নারীর প্রতি তার সৌজন্য। সে শক্তিমান সভ্য পুরুষ, ধনবান পশুমাত্র নয়।' তার এ কথা শুনে তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম, 'আমার ভ্রম অপনোদিত হল। শুধু তাই নয় আমি শুনে আনন্দিত হলাম যে কুমার সুন্দরানন্দের যে শক্তি তোমাকে আকৃষ্ট করেছে তা কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিই নয়, তা মানসিক উৎকর্ষ। কিন্তু সুন্দরানন্দ কি তোমার মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন? তোমার লীলায়িত নৃত্যছন্দের নেপথ্যে যে শিল্পী নব নব সৃষ্টি-স্বপ্নে ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হচ্ছে তাকে কি সুন্দরানন্দ পূজা করে? না, সে তোমার দেহটা নিয়েই বিভোর কেবল? হয়তো সে শিল্পী-সুরঙ্গমার সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু সুরঙ্গমার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে তা কি সে জানে? সে সব সম্ভাবনাকে মূর্ত্ত করবার চেষ্টা করেছে সে কি কখনও? সে নর্ত্তকী সুরঙ্গমার দেহ-ছন্দকে উপভোগ করতেই অভ্যস্ত, তার মধ্যে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিককে দেখ্তে সে কি প্রস্তুত আছে? আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, প্রথমে অবশ্য তোমার দেহ দেখেই। কিন্তু আমি তোমার সমগ্রতাকেও সম্পূর্ণভাবে দেখতে চাই, জানিয়ে দিতে চাই সেই সুরঙ্গমাকে যাকে কেউ কখনও দেখে নি'। আমার কথা শুনে সুরঙ্গমা বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে লীলাভরে হেসে বললে—'আমি কিন্তু জাগতে চাই না মহর্ষি। কুমার সুন্দরানন্দের নিকট যখন আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম তখন আমাকে তাঁর কুলদেবতা চতুরাননের সম্মুখে শপথ করতে হয়েছিল যে সুন্দরানন্দ ছাড়া আর কোনও পুরুষের দিকে আমি চাইব না। সে শপথ যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে আর জেগে লাভ কি বলুন'। সুরঙ্গমার মুখে যদিও এই ভাষা ফুটল কিন্তু তার অপাঙ্গদৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটল তা অন্যরকম। আমি বললাম, 'দেখ সুরঙ্গমা, সুন্দরানন্দের পূর্ব্বপুরুষরা প্রস্তরনির্ম্মিত চতুরানন মূর্ত্তির মধ্যে নিজেদের অন্ধ কুসংস্কারকেই মূর্ত্ত করে' রেখে গেছেন। তার সম্মুখে যদি কোনও শপথ করেই থাক—তাহলে সে শপথ রক্ষা করবার যে বিশেষ একটা যুক্তিযুক্ত দায়িত্ব আছে তোমার তা আমি মনে করি না। প্রস্তরনির্ম্মিত চতুরাননের সম্মুখে শপথ করারই বা কি বিশেষ মূল্য থাকতে পারে? তবে শপথটাকেই যদি তুমি মূল্যবান মনে করে' তার মর্য্যাদা দিতে চাও সে স্বতন্ত্র কথা। চতুরানন, পঞ্চানন বা ষড়ানানের সঙ্গে শপথকে জড়িত করছ কেন। তোমার শপথ তোমারই শপথ, তা রক্ষা করা না করা তোমারই ইচ্ছা। তুমি স্বাধীন মানুষ একথা তো কোন সময়ই ভুলে যাওয়া উচিত নয় সুরঙ্গমা'। সুরঙ্গমা বললে—'আপনি হয়তো চতুরাননকে বিশ্বাস করেন না, আমি কিন্তু করি। আমি বিশ্বাস করি তিনি সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁর সম্মুখে যে শপথ আমি করেছি তা ভঙ্গ করলে অপরাধ হবে আমার এবং সে অপরাধের জন্য আমাকে শাস্তি-ভোগও করতে হবে, ইহজন্মে বা পরজন্মে'। আমি বললাম—'তুমি যদি সাধারণ কোনও নারী হ'তে তাহলে তোমার কথায় আমি বিস্মিত হতাম না, নদীস্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডকে দেখে যেমন বিস্মিত হই না। কিন্তু শিলাখণ্ডকে ভাসতে দেখলে বিস্ময় হয় বই কি! তুমি যা বললে তা মনে হচ্ছে নারীসুলভ ছলনামাত্র। চতুরানন-বিশিষ্ট কোনও অদ্ভুত ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এটা তো অসম্ভবই; কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসম্ভব তুমি সেটা সত্যিসত্যি বিশ্বাস কর এই ধারণাটা। সুতরাং ও ধারণাকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না।' সুরঙ্গমা সুমধুর হেসে বললে, 'আমি কিন্তু সত্যই চতুরাননের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আপনি কি প্রমাণ করে' দিতে পারেন যে চতুরানন নেই?' আমাকে তখন বলতে হল, 'নিশ্চয় পারি। কিন্তু সে প্রমাণ যদি তুমি সংগ্রহ করতে চাও তাহলে আমার কুটিরে তোমাকে আসতে হবে। তা কি তুমি পারবে? সুন্দরানন্দের বিলাসকক্ষের বাইরে যাবার স্বাধীনতা কি তোমার আছে? যদি থাকে এস, আমি তোমার ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার চেষ্টা করব।' তারপর থেকে সুরঙ্গমা প্রায়ই আমার কাছে আসত, তার সঙ্গে অনেক শাস্ত্র অনেক বিজ্ঞান আলোচনা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে আমি বিশ্বাস করাতে পারিনি যে চতুরানন নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সুরঙ্গমা সুন্দরানন্দের সঙ্গে মৃগয়া-অভিযানে চলে গেল মধ্যপ্রদেশের এক অরণ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রবেশ করলাম চিন্তার অরণ্যে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম যে ব্রহ্মার অনস্তিত্ব আমি প্রমাণ করবই। তারপর থেকে কিন্তু যা যা ঘটছে তা অভূতপূর্ব্ব।'

(ক্রমশঃ)

খাদ্যশস্যের অভাব—

শ্রী আর, কে, পাতিল ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া তিনি গোয়ালিয়রে বলিয়াছেন (১৬ই কার্ত্তিক), সরকারের চেষ্টা থাকিলেও আজ অবস্থা আশাপ্রদ নহে—১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষ খাদ্যশস্য সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে না—এখনও অনেক বৎসরে তাহা হইবে না। কোন্ প্রমাণে নির্ভর করিয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন—১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পরে ভারত রাষ্ট্র আর বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিবে না, তাহা তিনি বলেন নাই; তবে প্রতিপন্ন হইয়াছে—তাঁহার সে উক্তি "নিশার স্বপন সম" অসার। পাতিল বলেন—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তবে পাঁচবৎসর পরে ভারত রাষ্ট্রকে আর বর্ত্তমান সময়ের মত অধিক খাদ্যশস্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। অর্থাৎ পরবশ্যতা কমিবে—এই পর্য্যন্ত।

ইহার কারণ কি? রুশিয়ায় যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারত রাষ্ট্রে তাহা অসম্ভব হইবে কেন? ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ায় কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন শতকরা ৪৮ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল; ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার তুলনায় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন শতকরা ৫৮ ভাগ অধিক হইয়াছিল।

ভারত রাষ্ট্রে তাহা না হইবার কারণ কি?

খাদ্য-মন্ত্রী মিষ্টার মুন্সীর মতে—ভারতরাষ্ট্রের ৩৬ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীকে পুষ্টিকর আহার্য্য দিতে ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য প্রয়োজন, আর সে স্থলে আমাদিগের উৎপাদন—৪ কোটি ৫০ লক্ষ টন। যদি এই হিসাব নির্ভরযোগ্য হয় অর্থাৎ মিথ্যা না হয়—তবে ৪ বৎসরে উৎপাদন ৬০ লক্ষ টন বর্দ্ধিত না হইবার কারণ কি? অথচ বলা হইতেছে—

(১) সরকারের চেষ্টায় চাষের জমীর বিস্তার সাধিত হইতেছে এবং

(২) কৃষির উৎপাদন বর্দ্ধিত হইতেছে।

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবে ত তাহা প্রতিফলিত হয় না!

পশ্চিম বঙ্গে অন্নাভাব—সরকারের প্রচার বিভাগ কেবলই নানা স্থানে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, অপুষ্টিকর বা অপূর্ণ আহারজনিত মৃত্যু অনাহারে মৃত্যু নহে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সচিব প্রদেশে দুর্ভিক্ষ স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেও বিহারের সচিবরা তাহা করেন নাই। তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ মনে করেন বিহারের দুর্ভিক্ষ অতিরঞ্জিত (over-dramatised) করিয়া রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রদেশ ভারত রাষ্ট্র হইতে প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য পাইয়াছেন। মাদ্রাজের প্রধান-সচিব মাদ্রাজ প্রদেশের জন্য অধিক চাউল চাহিলে প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে চাউল না দিয়া উপদেশ দিয়াছেন—বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে আর অধিক চাউল আমদানী করা সম্ভব হইবে না; কারণ, ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন, তথায় এ বার ধানের ফসল আশানুরূপ হয় নাই। অবশ্য ব্রহ্মের অবস্থা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা এই সংবাদে বিস্মিত হইবেন না; কারণ, ব্রহ্মের যে সরকারের সহিত ভারত সরকার চুক্তি করিয়াছেন, সে দেশের অনেক অংশ আর সেই সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে—কম্যুনিষ্টদিগের দ্বারা অধিকৃত। আর এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, গত বৎসর পণ্ডিত নেহরুর অবিমৃশ্যকারিতাহেতু ব্রহ্ম সরকার দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল, ভারত রাষ্ট্র লইবে না বিশ্বাস করিয়া, অন্যকে বিক্রয় করিয়াছেন—তাহা রাখিলে ভারত রাষ্ট্রকে আজ আমেরিকার নিকট হইতে গম ক্রয় করিয়া ২৫ কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত না।

পণ্ডিত জওহরলাল সদুপদেশ দিয়াছেন—

"অভিজ্ঞতা-ফলে আমাদিগকে শিখিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে আমাদিগকে খাদ্য সম্বন্ধে অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। * * আমরা দীর্ঘকাল অবাস্তব জগতে বাস করিতে পারি না—প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।"

অবাস্তববিলাসী ব্যতীত আর কেহই মনে করিতে পারে না যে, একটি প্রদেশের সকল লোক রাতারাতি তাহাদিগের খাদ্যপরিবর্ত্তন করিতে পারে। যাহারা পুরুষানুক্রমে যে খাদ্যে অভ্যস্ত তাহারা সহসা খাদ্যান্তর গ্রহণ করিলে পীড়িত হয়—মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও পারে। বাঙ্গালায় ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তাহার পরে কথা—যদি লোক ভাত না খাইয়া অন্য কিছু খায়, ভারত সরকার কি গম যোগাইতে পারিবেন? গল্প আছে, দেশের

লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে শুনিয়া নবাবনন্দিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"রুটী যখন পায় না, তখন তাহারা পোলাও খায় না কেন?" দেশে কি চাউলের অভাব হইলেও গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য আছে যে, চাউলের পরিবর্ত্তে সে সকল ব্যবহৃত হইলে আর খাদ্যাভাব থাকিবে না? ভারত রাষ্ট্র যে এখনও কিছুকাল খাদ্যসম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে না, মিষ্টার পাতিলের সেই আশঙ্কা প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। যদি সেই আশঙ্কা সত্য হয়, তবে ত বিদেশ হইতে বহু ব্যয়ে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে। তবে কি পণ্ডিত নেহরু বলিতে চাহেন, বিদেশ হইতে (এমন কি ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতেও অধিক অর্থ দিয়া) গম আনা যায়, কিন্তু চাউল আনা যায় না? সে কথা তিনি স্পষ্ট বলিতে কুণ্ঠিত বা অসম্মত কেন? আর পশ্চিমবঙ্গে যে আশু ধান্যের জমীতেও পাট চাষ করান হইতেছে, তাহা ভারত সরকার কিরূপে—বর্ত্তমান অবস্থায়—সমর্থন করিতে পারেন? ধান চাষ বাড়ানই কি সরকারের কর্ত্তব্য নহে? মানুষের বাঁচিবার প্রয়োজন কি উপেক্ষণীয়? তাহাতে কি মানুষের অধিকার নাই?

পণ্ডিত নেহরু যে সকল কথা বলেন, সে সকলের গুরুত্ব তিনি স্বয়ং অনুভব করেন কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

গুজরাটে দুর্ভিক্ষ—

শ্রীদীনকর রাও দেশাই বোম্বাই প্রদেশের সরবরাহ সচিব। তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—গুজরাটে যেরূপ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, তাঁহার ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি কখন সেরূপ দুর্ভিক্ষ বোম্বাই প্রদেশে দেখেন নাই। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ অপেক্ষাও ভয়াবহ। গুজরাটের ৩০ লক্ষ গবাদি পশু রক্ষা আজ বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগকে স্বল্পাহারে জীবিত রাখিতে হইবে ও যে খড় প্রয়োজন তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র আছে—সেও বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানে পশুখাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিলে পাওয়া যাইতে পারে। ভারত সরকার কিছু খড় দিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বোম্বাই সরকার পাম্পের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থা করিয়া নদীকূলে পশুখাদ্য উৎপাদন করিবেন। তাহার আয়োজন হইতেছে।

দেশাই মহাশয় ৪০ বৎসরের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ১৯০০ খৃষ্টাব্দে গুজরাটে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে এই সব সমস্যারই উদ্ভব হইয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষের সময় দেশবিদেশের সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য কলিকাতায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী যে সভা হয়, লর্ড কার্জ্জন তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সেই দুর্ভিক্ষে সাহায্যার্থ জার্ম্মানী হইতে কৈশর ৫ লক্ষ "মার্ক" পাঠাইয়াছিলেন।

সেই দুর্ভিক্ষে ভারত সরকার এক কোটি ৫ হাজার টাকা খয়রাতি সাহায্যে ব্যয় করেন এবং তদ্ভিন্ন কৃষক প্রভৃতিকে যে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অর্দ্ধাংশ আদায় হয় নাই। ১৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা খাজনা মকুব করা হয়। ইহা ব্যতীত সামন্ত রাষ্ট্রকেও ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। সে দুর্ভিক্ষে সরকারকে ৬ কোটি লোকের জীবনরক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

প্রথমে মানুষের জীবন রক্ষার চেষ্টায় গবাদি পশু রক্ষা সম্বন্ধে সরকার অবহিত হইতে পারেন নাই। ফলে পশু মরিতে থাকে। তখন বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর লর্ড নর্থকোট ও তাঁহার পত্নী সে বিষয়ে চেষ্টিত হয়েন। প্রথমে ছারোদী নামক স্থানে পশুক্ষেত্র করিয়া কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার উৎকৃষ্ট পশুগুলি সংগ্রহ করিতে থাকেন। তখন ৩টি মাত্র ষণ্ড রক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। ক্রমে ৩ শত গাভী সংগৃহীত হয়। তাহার পরে অন্যান্য স্থানেও পশুক্ষেত্র স্থাপিত করা হয় এবং সেইরূপে ৯ হাজার গবাদি পশু রক্ষা করা হইয়াছিল। লর্ড নর্থকোটের এই কার্য্য বিশেষরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল।

সেবারও ভারতের দুর্ব্বৎসর। কারণ, তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার ক্ষতি তখনও পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

জুলাই মাসের দারুণ উত্তাপে লর্ড কার্জ্জন স্বয়ং গুজরাটে অবস্থা ও ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নানা সাহায্যদানকেন্দ্রে গমন করেন; তখন কোন কোন কেন্দ্রে বিসূচিকায় লোক মরিতেছে। তিনি রৌদ্র, বৃষ্টি, ব্যাধি কিছুতেই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হইয়া সাহায্যদান-কেন্দ্র ও চিকিৎসাগার পরিদর্শন করিয়া ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত যে বহু সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবককে সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করাইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

বিহারের দুর্ভিক্ষকালে লর্ড নর্থব্রুক বলিয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে না দিতে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি, ভারত সরকার তাহা মনে রাখিবেন। শ্রীদীনকর রাও দেশাই বিপদের সম্ভাবনা ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন ভারত সরকারকে ও বোম্বাই সরকারকে এক-যোগে লোককে রক্ষা করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে—চেষ্টা করিতে হইবে, যেন এক জন লোকও অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় এবং গুজরাটে গৃহপালিত পশুসম্পদ ক্ষুণ্ণ না হয়।

উদ্বাস্তু-সমস্যা—

"কুপারস ক্যাম্প" উদ্বাস্তুকেন্দ্র রাণাঘাটে অবস্থিত—কলিকাতা হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা—প্রদেশ বিভাগের পর—পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিবার আরম্ভ হইতেই এই কেন্দ্রে সরকার উদ্বাস্তুদিগকে স্থান দিয়া আসিয়াছেন। এই ক্যাম্পেই যাইয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কোন নারীর প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, উদ্বাস্তুদিগের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় নহে! এই কেন্দ্রে বর্ত্তমানে ৩০ হাজার উদ্বাস্তু আছেন। কিছুদিন হইতে এই স্থানে শৃগাল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর উপদ্রব দেখা দিয়াছে—৫০ জনেরও অধিক লোককে শৃগাল দংশন করিয়াছে; সম্প্রতি আবার কোন নেকড়ে বাঘ বা ঐরূপ কোন জন্তুর আবির্ভাব হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে ৪টি শিশু নিহত হয়। গত ৩রা নভেম্বর দেড় বৎসরের একটি শিশু যখন তাহার মাতার নিকট ঘুমাইতেছিল, তখন পশুটি তাহাকে লইয়া যায়। তখন প্রত্যুষ। শিশুর চীৎকারে জাগরিত হইয়া তাহার পিতামাতা কয় জন প্রতিবেশীর সঙ্গে শিশুর সন্ধানে যাইয়া দেখেন,

প্রায় ৫ শত গজ দূরে একটি বৃক্ষের মূলে মৃত শিশুর ছিন্ন বিছিন্ন দেহ পড়িয়া আছে। সেই দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া শিশুর পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন ; মাতা যেন বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়াছেন।

এক মাস হইতে শৃগালের উপদ্রব চলিলেও কেন্দ্রের সরকারী কর্ম্মচারীরা কেবল ঘোষণা করিয়াছেন—কেহ শৃগাল মারিয়া বা ধরিয়া আনিলে ৫ টাকা হিসাবে পুরস্কার পাইবে। মহকুমা কর্ম্মচারী হইতে পুনর্ব্বসতি কমিশনার পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সংবাদ জানান হইয়াছে। কিন্তু ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রতীকারের কোন ব্যবস্থার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, গভর্ণর পরিবর্ত্তনের জন্য সরকার পক্ষ ব্যস্ত ছিলেন, অথবা পুনর্ব্বসতি বিভাগ—কংগ্রেসের কার্য্যে পশ্চিমবঙ্গে অনুপস্থিত প্রধান-সচিবের অনুপস্থিতিতে কিছু করিতে দ্বিধানুভব করিয়াছেন। উদ্বাস্তুদিগের ৭টি পল্লীর প্রত্যেক পল্লী হইতে ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক রাত্রিতে পাহারা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য এই স্বেচ্ছাসেবকগণের আগ্নেয়াস্ত্র নাই।

স্বেচ্ছাসেবকদিগকে কার্য্যরত জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। কারণ, ঈশপের উপকথায় যথার্থই বলা হইয়াছে, মানুষ যখন আপনার কাজ আপনি করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তখনই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়—নহিলে নহে।

অল্পদিন পূর্ব্বে নদীয়ার তাহেরপুরে যে উদ্বাস্তু সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে ঐ কথা বার বার আমরা মনে করিয়াছি। তাহেরপুরে সরকার যে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রায় ৩০ হাজার লোক আছেন। চাষের জমী নাই—জীবিকার্জ্জনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই ; লোক মৃত্যুর সম্মুখীন। কিন্তু তাহেরপুর বীরনগর ষ্টেশন হইতে মাত্র দেড় মাইল পথ। সেই দেড় মাইল রাস্তা স্থানে স্থানে কর্দ্দমে দুর্গম। আয়োজনকারীরা "মাইক" প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ৩০ হাজার অধিবাসীর এক শত তরুণ যদি ঝুড়ী কোদালী লইয়া ঐ সকল স্থানে দুই ঝুড়ী করিয়া মাটী ফেলিতেন, তবে তাঁহাদিগের যেমন—নিমন্ত্রিতদিগেরও তেমনই গতায়াত কষ্টসাধ্য হইত না। তাঁহারা কি স্মরণ করেন না—যাহারা আপনারা কাজ করে, ভগবান তাহাদিগের সহায় হ'ন?

সরকারের নিকট হইতে দাবী আদায় করিতে হইলেও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন। সে কথা ভুলিলে চলিবে না।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগন্তুকদিগের সংখ্যা আবার বিবর্দ্ধিত হইতেছে। সরকারের ব্যবস্থার ত্রুটি সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্বাস্তুরা যদি পরস্পরকে সাহায্য করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতিসাধনের উপায় না করেন, তবে কিছুই হইবে না।

এই সম্পর্কে কেহ কেহ আর একটি কথা বলিয়া থাকেন। পঞ্জাবের যে অংশ পাকিস্তানে তাহা হইতে যে শিখ ও হিন্দুরা পলাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববাসভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া—তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গত্যাগী হিন্দুরা অনেকেই তাহা করেন নাই ; যতক্ষণ তাঁহারা তাহা না করিতেছেন, ততদিন তাঁহারা যে ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক তাহা কিরূপে বলা যায়? পরন্তু দেখা যাইতেছে, তাঁহারা ভারত রাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করিয়াও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করিতেছেন—তাঁহারা পাকিস্তানের সম্পত্তির জন্য রাজস্ব, খাজনা, ট্যাক্স পাঠাইতেছেন। ইহার উপায় কি? পূর্ব্ববঙ্গত্যাগীরা যদি একযোগে ভারত সরকারকে বলেন, তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সরকার তাহা বিনিময়ের বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করুন—তবে ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের সহিত সে বিষয়ে একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করিতে পারেন। তাহা না হইলে ভারত সরকার কি করিতে পারেন?

একান্ত পরিতাপের বিষয়, এমন অভিযোগও শুনা যায় যে, কোন কোন লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন! এই অভিযোগ যদি ভিত্তিহীন হয়, তবে আমরা বিশেষ প্রীত হইব। কিন্তু এমন অভিযোগ যে উঠিতে পারে, তাহাও দুঃখের বিষয়। যদি কোন ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য অপাত্রে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে উদ্বাস্তুরা তাহা সরকারকে জানাইয়া দিয়া রাষ্ট্রের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যপালন করেন না কেন?

উদ্বাস্তুদিগকে সমবায়প্রথায় ক্ষেত্র, কারখানা, দোকান প্রভৃতি পরিচালিত করিতে হইবে। কেবল সরকারী সাহায্যে নির্ভর করিলে চলিবে না। সেরূপ সাহায্য স্থায়ী হইতে পারে না—সরকারের ভাণ্ডারও অফুরন্ত নহে। চাকরীর সংখ্যাও অসীম নহে।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষামাগা নৈব চ নৈব চ॥"

উদ্যোগীরাই লক্ষ্মী লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গবাসীর সহিত উদ্বাস্তুদিগের যে অপ্রীতি উদ্ভূত হইতেছে, তাহাও দুঃখের বিষয়।

ওয়ার্লন্ড ব্যাঙ্কে ভারতের ঋণ—

ভারত সরকার রেলপথ বিস্তার, "পতিত" জমী আবাদযোগ্যকরণ ও দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণ—এই তিন বাবদে "ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের" নিকট হইতে ৩৫ কোটি টাকা ঋণ লইয়াছেন। তাঁহারা আবার ঋণ চাহিতেছেন। সেই জন্য ব্যাঙ্ক অবস্থা পরীক্ষার জন্য কয়জন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিদেশ হইতে যে টাকা প্রয়োজন মনে করেন, তাহার পরিমাণ—৬৭০ কোটি টাকা। ইহার কতকাংশ বৃটেনের নিকট ভারতের প্রাপ্য টাকা হইতে পাওয়া যাইবে, কলম্বো ব্যবস্থায় ভারত কিছু টাকা বিদেশ হইতে সাহায্য হিসাবে পাইবে, আমেরিকাকে গমের জন্য যে ঋণ শোধ করিতে হইবে, তাহার জন্য সঞ্চিত অর্থও ঐ কার্য্যে প্রযুক্ত করা যাইবে। সে সব বাদ দিলে, ভারত সরকারকে ২০০ কোটি টাকা ঋণ বিদেশ হইতে লইয়া কাজ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কত টাকা ব্যাঙ্ক দিবেন, তাহা পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত ব্যক্তিদিগের মতের উপর নির্ভর করিবে।

কিরূপ সর্তে ব্যাঙ্ক ঋণ দিবেন, তাহাও তাঁহাদিগের মন্তব্যে স্থির হইবে। এইরূপে যে ঋণ পুঞ্জীভূত হইবে, তাহা কত দিনে—কিরূপে শোধ করা সম্ভব হইবে, বলা যায় না। মানুষের অনেক পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। ভারত সরকারের কোন কোন পরিকল্পনাও যে ব্যর্থ হইবে না, এমন মনে করা যায় না। পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু ঋণ শোধ করিতে হইবে। পরিকল্পনার জন্য বিদেশে ঋণ করিয়া মিশরের খদিব ইস্‌মাইল মিশরকে কিরূপ বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যে ভারত সরকারের কর্ত্তব্য তাহা তাঁহাদিগের স্মরণ করা প্রয়োজন। নহিলে ভবিষ্যতে ভারত রাষ্ট্রকে "পরদাসখতে"—সমুদায় দিতে হইতে পারে। রুশিয়া ও চীন পরের উপর নির্ভর না করিয়াই দেশের উন্নতিসাধন করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে অনাহারে মৃত্যু—

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের যে অভাব সরকার নিবারণ করিতে পারেন নাই, তাহাতে মানুষের অনাহারে মৃত্যু ঘটা অসম্ভব নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, কোথাও কাহারও অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলেই সরকারের প্রচার বিভাগ তাহার প্রতিবাদ করেন। সে প্রতিবাদের মূল্য কি তাহা দেখাইবার জন্য আমরা সম্প্রতি-সংঘটিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। গত ৭ই নভেম্বর সংবাদপত্রে এক সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হয় যে, বর্দ্ধমান হিন্দু মহাসভা যে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, বর্দ্ধমান লালদীঘীতে নারায়ণচন্দ্র শীলের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে সরকারের অনুসন্ধানে তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। নারায়ণচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া বড়নীলপুরে পুনর্ব্বসতির জন্য গিয়াছিল। বর্দ্ধমান সহরে নাপিতের কাজ করিয়া সে ভাল আয় করিত। সে সরকারের পুনর্ব্বসতি ঋণও পাইয়াছিল। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ারোধে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বর্দ্ধমান হিন্দু মহাসভার সম্পাদক সরকারী বিবৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ক্ষৌরকারের কাজ করিয়া নারায়ণ ভাল উপার্জ্জন করিত, এ কথা মিথ্যা। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাহাকে সরকার জমী কিনিবার জন্য ৭৫ টাকা দেন এবং ৫ই মে সে বাড়ি করিবার ঋণের প্রথম কিস্তি ৩ শত টাকা পায়। যদিও সে ৭৫ টাকা মাত্র পাইয়াছিল, তথাপি তাহাকে এক শত ১০ টাকা দিয়া জমী কিনিতে হইয়াছিল। বিক্রয় কোবালায় ইহাই দেখা যায়। ৩ শত টাকা পাইয়া সে গৃহ নির্ম্মাণে প্রায় ২শত টাকা ব্যয় করে এবং গৃহ-নির্ম্মাণ ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাইলে পরিশোধ করিবে বলিয়া ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছিল। কিন্তু সরকার ঋণদান বন্ধ করায় সে অসহায় হইয়া পড়ে। ব্যবসার জন্য ঋণ দেওয়া ত পরের কথা সে গৃহ নির্ম্মাণ ঋণের দ্বিতীয় কিস্তিও পায় নাই। সেই অবস্থায় আর কেহই তাহাকে ঋণ দেয় নাই এবং সে ও তাহার পরিজনগণ দিনান্তে একবার আহারের সংস্থান করিতে পারিত না। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া এক জন লোক তাহাকে একখানি পুরাতন ক্ষুর ও একটি পুরাতন কাঁচি দিয়া "জাত ব্যবসা" করিতে বলেন এবং সে ২২শে সেপ্টেম্বর ঐ দুইটি শান দিবার জন্য বর্দ্ধমান সহরে আসে। ফিরিবার সময় সে কুণ্ডুপুকুরের নিকট অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। সেই সংবাদ প্রায় মধ্যরাত্রিতে পাইয়া হিন্দু মহাসভার সম্পাদক ঘটনাস্থলে যাইয়া দেখেন, সে সংজ্ঞাশূন্য। তিনি তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর রোগী বহিবার গাড়ী আনিতে দেন। কিন্তু যান ঘটনাস্থলে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা সন্ধানের পরে তিনি তাহার বিধবাকে ও দ্বাদশবর্ষবয়স্ক পুত্রকে সংবাদ দিতে পারেন। তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা তাহাদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। তাঁহার চেষ্টায় শব বিনা-ব্যয়ে দাহের ব্যবস্থা হয়। ৬ই অক্টোবর সদর সার্কেল অফিসার হিন্দু মহাসভার সম্পাদকের নিকট সংবাদ লইলে তাঁহার কথায় অফিসার নারায়ণের বিধবা ও পুত্রকে ১০ টাকা খয়রাতি দান করেন। তাহাদিগকে কোন উদ্বাস্তুকেন্দ্রে লইবার জন্য জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ২৬শে অক্টোবর ডেপুটী রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনারকে লিখেন :—

"দিন কয়েক অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিধবাকে ২০ সপ্তাহের বিশেষ খয়রাতি দান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার নাবালক পুত্র ব্যতীত তাহাকে ভরণপোষণ দিবার কেহই নাই।"

ইহার পরেও কি সরকার বলিতে পারেন—অনাহারই নারায়ণের মৃত্যুর কারণ নহে?

সরকারী বিবৃতির সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভার সম্পাদক যাহা বলিয়াছেন, তাহার পরে কি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারের প্রচার বিভাগের বিবৃতি সমর্থন করিতে পারিবেন? তিনিই যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি মিথ্যা বলিয়া—তিনি যে সরকারের চাকরীয়া সেই সরকারকে নারায়ণের অনাহারে মৃত্যুর দায়িত্ব-মুক্ত করিতে পারিবেন?

মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের ফল—

ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন পার্লামেন্টের সম্মতি পর্য্যন্ত না লইয়া বৃটেনের মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিয়াছিলেন, তখনই অনেকে তাঁহার সেই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ভারত রাষ্ট্র মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করিলেও পাকিস্তান কিন্তু তাহা করে নাই এবং সেই জন্য সে পাট তুলা বিক্রয় করিয়া যেমন লাভবান হইয়াছে, ভারত রাষ্ট্রকে তেমনই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্র বহুবার বলিয়াছিল বটে, পাকিস্তানের মুদ্রা-মূল্য সে কখনই স্বীকার করিয়া লইবে না, কিন্তু শেষে তাহাকে তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে এবং তাহাতে রাষ্ট্রের সম্ভ্রমহানি হইয়াছে। ডক্টর শাট জার্ম্মানীর অর্থনীতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ। সম্প্রতি তিনি প্রাচীর কয়টি স্থান দেখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপথে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। তথায় তিনি বলিয়াছেন—

কোন রাষ্ট্রের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করা কোনমতেই সমর্থিত হইতে পারে না।

তিনি বলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন বৃটেনের ও ভারতের মুদ্রা-মূল্য

হ্রাস করা হয়, তখন তাঁহার সহিত ভারত সরকারের কয় জন কর্মচারীর দেখা হয়। তাঁহারা ভারত রাষ্ট্রের মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের যে কারণ দিয়াছিলেন, তাহা সন্তোষজনক নহে। তিনি মত প্রকাশ করেন, যখন দেশে স্বাভাবিক কারণে মুদ্রা-মূল্য হ্রাস হইতেছে বুঝা যায়, তখন দেশের অর্থনীতির পরিবর্তন করিয়া মুদ্রা-মূল্য স্থির রাখাই কর্তব্য—মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করা অসঙ্গত।

ভারত সরকার যে আমেরিকা ও পাকিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্র হইতে খাদ্য-শস্য, কলকব্জা, পাট, তূলা প্রভৃতি আমদানীতে ও ঐ সকল রাষ্ট্রে চট, লৌহ, কয়লা প্রভৃতি রপ্তানীতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহার অন্যতম প্রধান কারণ—মুদ্রামূল্য হ্রাস করা।

গত ১২ই নভেম্বর দিল্লীতে ডক্টর শাট তাঁহার মত ব্যক্ত করার পরেই—১৩ই নভেম্বর ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী দেশমুখ মহাশয় বোম্বাই সহরে তাঁহার সরকারের কাজ সমর্থন করেন। তিনি বলেন—সমগ্র জগতের অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়—ভারত সরকারের অর্থনীতিক নীতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অর্থাৎ ভারত সরকার যে মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত।

কিন্তু ১৪ই নভেম্বর যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হইতে ৩ টাকা ৮ আনা করেন, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, দেশমুখ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন কি না সন্দেহ। কারণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই ব্যাঙ্কের সুদের হার বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ও তাহার পরে কখনই ব্যাঙ্কসমূহ হইতে বর্ত্তমানে যত টাকা ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তত টাকা গৃহীত হয় নাই। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ৫৮৬ কোটি টাকা ঋণ গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রা-স্ফীতিই প্রতিপন্ন হয়। পশ্চিম য়ুরোপে কোন কোন দেশ মুদ্রা নীতির জন্য ব্যাঙ্কের সুদের হার বর্দ্ধিত করিয়াছে। ঐ বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে, গত ১৭ই অক্টোবর সুদ বর্দ্ধিত করা স্থির হয় এবং তাহারও পূর্ব্বে, আগষ্ট মাসে, অর্থ-মন্ত্রীর সম্মতি লইয়া ঐ প্রস্তাব ব্যাঙ্কের বোর্ডে উপস্থাপিত করা স্থির হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিন মাসেরও অধিক পূর্ব্বে অর্থ-মন্ত্রী বুঝিতে পারিয়াছিলেন—ভারত সরকারের অর্থনীতির ফলে যে অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রতীকার করা প্রয়োজন এবং প্রতীকারের জন্যই তিনি ব্যাঙ্কের সুদের হার বৃদ্ধিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং আজ যে তিনি ডক্টর শাটের উক্তির প্রতিবাদে বলিতেছেন, তাঁহার সরকারের অর্থনীতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাতে বলিতে হয়, তাঁহার কথার সহিত তাঁহার কাজের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব নহে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক—

বহুদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার কৃষকের দুর্দ্দশা দেখাইয়া কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে দুর্দ্দশার অবসান হয় নাই—হয়ত তাহা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ধান্যে বা পাটে তাহার লাভ কোথায়? প্রথমে ধানের কথাই ধরা যাউক। প্রতি বিঘায় ধান চাষের ব্যয়:—

লাঙ্গল (৪ খানা, ৪ টাকা হিসাবে)	১৬ টাকা
নিড়ান ও রোয়া (৮ জন শ্রমিক, ২ টাকা ৮ আনা হিসাবে)	২০ „
ধানকাটা শ্রমিক (৩ জন, ২ টাকা ৮ আনা হিসাবে)	৭।০ „
ধান তুলা ও ঝাড়া শ্রমিক (৪ জন, ২ টাকা ৮ আনা হিসাবে)	১০ „
বীজ ধান (১০ সের—১২ টাকা মণ দরে)	৩ „
শ্রমিকদিগের জলপানি	১০ „
মোট	৬৬।০ টাকা

আয়—

ধান গড় ৬ মণ হিসাবে (১২ টাকা মণ দরে)	৭২ টাকা
খড় (১২ পণ)	১২ „
মোট	৮৪ টাকা

এই ৮৪ টাকার মধ্যে অর্দ্ধেক জমীর মালিক জোতদারের ; প্রজার ভাগ অবশিষ্ট ৪২ টাকা। সুতরাং প্রজার লোকশান—২৪ টাকা ৮ আনা।

জোতদারকে যদি সার (খৈল) দিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে বিঘায় ৩ মণ অধিক ধান উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাতেও প্রজার খরচ উঠে না। জোতদার জমীদারকে ৪ হইতে ৫ টাকা মাত্র খাজনা হিসাবে দিয়া থাকে। সুতরাং জোতদারের প্রাপ্য অনায়াসে কমান যায় এবং তাহা না হইলে প্রজা নিরুপায়। "তে-ভাগা" প্রথা, বোধ হয়, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও সুন্দরবনের কতকাংশ ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই। তাহাতে প্রজার কিছু সুবিধা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মধ্যস্বত্ব-ভোগীরাই প্রকৃত লাভবান হইতেছে এবং তাহাদিগের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি যে unearned incriment তাহা বলা বাহুল্য।

ইহার পরে পাট। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সরকার পশ্চিমবঙ্গে—খাদ্যাভাব প্রবল হইলেও—আশুধান্যের জমীতে পাটের চাষ করাইতেছেন। কিন্তু পাটেই বা প্রজার লাভ কি? প্রতি বিঘায় পাট চাষের ব্যয়:—

লাঙ্গল (৪ খানা, ৪ টাকা হিসাবে)	১৬ টাকা
নিড়ান (২ বার ৮ জন শ্রমিক, ২ টাকা ৮ আনা হিসাবে)	২০ „
পাটকাটাই শ্রমিক (৪ জন, ২ টাকা ৮ আনা হিসাবে)	১০ „
ঝাড়াই ও পচান শ্রমিক (৫ জন, ৩ টাকা হিসাবে)	১৫ „
পাটকাচা শ্রমিক (৫ জন, ৩ টাকা হিসাবে)	১৫ „
পাট শুকান শ্রমিক (২ জন, ২ টাকা হিসাবে)	৪ „
শ্রমিকদিগের জলপানি	১২।০ „
বীজ	৪ „
মোট	৯৬।০ টাকা

আয়—

সরকারের নির্দিষ্ট ৩২ টাকা মণ হইলেও কৃষক পায় ২৮ টাকা।

৫ মণ (গড় উৎপন্ন ৫ মণ—কোথাও ৮, কোথাও ৬, কোথাও ৪, কোথাও ২ মণ) ১৪০ টাকা

ইহার অর্দ্ধেক ৭০ টাকা জোতদারের, অবশিষ্ট ৭০ টাকা কৃষকের। সুতরাং কৃষকের লোকশান—২৬ টাকা ৮ আনা।

এই স্থলেও মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারের লাভ অতিরিক্ত—প্রজার লোকশান। অথচ ধানের চাষে খাদ্যোপকরণ বাড়িয়া থাকে, পাটে কলের উদরপূর্ত্তি হয়।

ধানের মূল্য বাড়াইলে জনগণের ক্লেশ, পাটের মূল্য বৃদ্ধিতে পাটের চাহিদা হ্রাস।

এই অবস্থা যে ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা কি সরকার করিবেন?

বলা বাহুল্য, চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-বন্দোবস্ত ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের বন্দোবস্ত হইতে ভিন্নরূপ এবং নিম্ন স্বত্বের বাহুল্যও অধিক হইয়াছে। কংগ্রেস যেমন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেও পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সে প্রতিশ্রুতি প্রয়োগে উদাসীন, তেমনই জমীদারীপ্রথার বিলোপসাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়াও পশ্চিমবঙ্গে তাহা করিতে আগ্রহের অভাব দেখাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সচিবসঙ্ঘে জমীদারের অভাব নাই এবং আগামী নির্ব্বাচনে যাঁহাদিগকে কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন বা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তালিকায় এমন অনেক জমীদারের নাম দেখা যায়—যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধিতাই করিয়া আসিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহাদিগের বংশের রীতি। পশ্চিমবঙ্গের একজন জমীদার সচিব বলিয়াছিলেন, জমীদারীপ্রথার বিলোপ করিতে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক বাধা আছে। সুতরাং "রহু ধৈর্য্যং"। কিন্তু ধান্যের ও পাটের চাষে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতেই বুঝা যায়, মধ্যস্বত্বের জন্য কৃষক কেবলই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং কৃষি ঋণ এরূপ বিবৰ্দ্ধিত হইতেছে যে, তাহার ভারেই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা। তাহা আসন্নও হইতে পারে। জমীদার প্রভৃতিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে কি না এবং দেওয়া হইলে কি হারে দেওয়া হইবে—সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে এ বিষয়ে আর মতভেদ থাকিতে পারে না যে, সরকারের সহিত কৃষকের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ না হইলে সরকার ও কৃষক উভয়েরই ক্ষতি—লাভ কেবল মধ্যবর্ত্তীদিগের। ভূমিরাজস্ব স্থিতিস্থাপক হওয়াও সরকারের পক্ষে প্রয়োজন। এখনও যদি সরকার তাহা না বুঝেন, তবে সরকারের পক্ষে আপনার ও জনগণের আর্থিক অবস্থার কোনরূপ উন্নতিসাধন সম্ভব হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের জনমত কি অরণ্যে রোদন হইবে?

উদ্বাস্তু শিবিরে অভিযোগ—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু হিন্দুদিগের পশ্চিমবঙ্গে আগমন নিবৃত্ত হয় নাই; পরন্তু বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। বোধ হয়, পূর্ব্ববঙ্গে অন্নকষ্ট তাহার অন্যতম কারণ। উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন কার্য্য যে সহজসাধ্য নহে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবস্থা ত্রুটি-শূন্য করিতে পারিতেছেন না। ইহা দুঃখের বিষয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন উদ্বাস্তু বাসস্থান হইতে বহু নরনারী অভিযোগ-প্রতীকারকল্পে কলিকাতায় আসিয়া প্রধান-সচিবের গৃহের সম্মুখে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহাদিগের কয়জনকে হাসপাতালে লইতে হইয়াছিল। তাঁহাদিগের দাবী যে কতকাংশে পূর্ণ করা হইয়াছে, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, দাবী অযৌক্তিক ছিল না। যদি তাহাই হয়, তবে জিজ্ঞাস্য—কেন সে সকল অভিযোগের কারণ ঘটিয়াছিল?

সরকার কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে পাটগুদামে বহু উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন! পাটগুদাম যে মানুষের বাসযোগ্য নহে—স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক তাহা যদি সরকারের কর্ম্মচারীরা না জানেন এবং স্থান পরিদর্শন করিয়াও বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। এই গুদামে শিশুমৃত্যুর আধিক্য সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদিতে আলোচনা হইতে থাকিলেও সরকার সহজে সে বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই! শুনা যায়, আলোচনা প্রবল হইয়া উঠিলে পুনর্ব্বাসন বিভাগের কমিশনার সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে এক বিবৃতি—সংবাদপত্রে প্রকাশ জন্য দিয়া তাহা আবার প্রত্যাহৃত করেন। তাহার পরে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায় ৫ই নভেম্বর হইতে ১৮ই নভেম্বর এই ১৪ দিনে ঐ শিবিরে মোট ১৯৫জনের মৃত্যু হয় এবং মৃতদিগের মধ্যে ১২৪জন শিশু—

নভেম্বর	প্রাপ্ত বয়স্ক	শিশু
৫	২	৫
৬	৫	৮
৭	৮	১১
৮	৩	৪
৯	৭	১২
১০	৪	১২
১১	৫	৮
১২	৫	৯
১৩	৬	১৬
১৪	৪	১৬
১৫	১০	৬
১৬	৪	৯
১৭	৩	৫
১৮	৫	৩
	৭১	১২৪

সরকার পক্ষের কৈফিয়ৎ, মৃতদিগের শতকরা ৮৩ জন খুলনা হইতে অনাহারে পীড়িত অবস্থায় আসিয়াছিল।

কিন্তু শিশুপালন সংসদের সম্পাদক ডক্টর মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস শিবির পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—গুদামঘরে প্রবেশ করিলে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। ইহা কি সরকারী কর্ম্মচারীরা অস্বীকার করিতে পারিবেন?

সরকার পক্ষের কথা—আগন্তুকরা অনাহার-পীড়িত অবস্থায় নৌকায় হাসনাবাদে আসে এবং তাহাদিগকে তথা হইতে শিবিরে আনিতে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়! এখন তথায় একটি শিবির স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে খাদ্যোপকরণ প্রদান করা হয়—তাহার পরে তাহাদিগকে গন্তব্যস্থানে প্রেরণের পূর্ব্বে প্রায় দেড় মাস দ্বিতীয় শিবিরে রাখা হয়।

সুতরাং স্বীকার করা হইয়াছে :—

(১) আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হাসনাবাদ হইতে আগতদিগের জন্য সরকার ব্যবস্থা করেন নাই ;

(২) এখনও তথায় খাদ্যের জন্য কাঁচা উপকরণ মাত্র দেওয়া হয় ;

(৩) দ্বিতীয় শিবিরে আনিয়া তাহাদিগকে কোথায় পাঠান হইবে তাহা স্থির করিতে দেড় মাস কাটিয়া যায়।

এই স্বীকৃতিতেই সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি সপ্রকাশ। ইহার জন্য দায়ী কে ?

মাত্র ১৪ দিনে একটিমাত্র উদ্বাস্তু শিবিরে ১২৪টি শিশুর মৃত্যুর যে কৈফিয়ৎ পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় সরকার দিয়াছেন, তাহাতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে (বিহারে) বিদেশী সরকারের কার্য্য মনে পড়ে। সেই সময় বিদেশী সরকার স্থির করিয়াছিলেন—যেন অনাহারে এক জন লোকও মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। সেই সময় চম্পারণে তিতুরিয়ায় একটি ঘটনার সংবাদ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশিত হয়—সংবাদদাতা তথায় এক শীর্ণকায়া তরুণীর মৃতদেহ পথিপার্শ্বে দেখিয়াছিলেন। সেই সংবাদ প্রকাশিত হইতেই ২৯শে মে তারিখে পাটনার কমিশনারের নিকট বাঙ্গালা সরকার কৈফিয়ৎ তলব করেন। কৈফিয়তে বলা হয়, মৃতা স্থানীয় লোক ছিল না—ত্রিহুতে রামনগর হইতে আসিয়া মৃত্যুর দিন সকালে তিতুরিয়ায় সাহায্যদান কেন্দ্রে রন্ধনকরা খাদ্য খাইয়াছিল। তাহার অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কেন যে তাহাকে ঐ খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না—তাহার অবস্থা বিবেচনা করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য ছিল।—

"How it was that the distributor for cooked food did not notice that she required special attendance and looking after I cannot say ; he certainly ought to have done so."

দেখা যাইতেছে, বিদেশী সরকার—দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়—এক জন দেশীয় সম্বন্ধে যে ব্যাকুলতা দেখাইয়াছিলেন, স্বদেশী সরকার তাহা দেখাইতে পারেন নাই।

বলা হইয়াছে, অনেকে আমাশয়ে মরিয়াছে। আমাশয় আহারের অভাবেরও দোষে হয়। জিজ্ঞাস্য—যাহারা আমাশয়ে ভুগিয়াছিল, তাহাদিগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা কি করা হইয়াছিল ? আর তাহাদিগকে কি আবশ্যক পথ্য প্রদান করা হইয়াছিল ? সে বিষয়ে সরকারী বিবৃতি নির্ব্বাক।

অভিযোগ—একে ত গুদামে আলোকের ও বাতাসের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ তাহাতে আবার ঐ গুদামেই রন্ধনের ব্যবস্থা থাকায় ও অসংখ্য কেরোসিনের আলোকে ধূম সঞ্চিত হইয়া থাকে—বাহির হইতে পারে না। তাহাতে সুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিরও শ্বাসকষ্ট হয়—শিশুর তাহাতে মৃত্যু অনিবার্য্য।

এই অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে মনে পড়ে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর একশত মোপলা দণ্ডিতকে মালবাহী কামরার ভিতর হইতে যখন বেলারীতে পাঠান হয়, তখন তাহাদিগের মধ্যে ৭০ জনের শ্বাসরোধে মৃত্যু হইয়াছিল। তখন দেশে যে বিক্ষোভ লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। আজ কাশীপুরে উদ্বাস্তু শিবিরে পরিণত পাটগুদামের ব্যাপারের জন্য দায়ী কে ? কে বা কাহারা পাটগুদামে মানুষের বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাঁহারা সেজন্য কি কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিবেন ? যে ব্যবস্থা মানুষের স্বাস্থ্যের সহায় না হইয়া মৃত্যুর কারণ হয়, সে ব্যবস্থা কি কারণে—কাহার নির্ব্বুদ্ধিতায়, অযোগ্যতায় বা স্বার্থের জন্য হয়, তাহা সরকারের বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। দেশের লোকের এ বিষয় জানিবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

সাগরে মৎস্য—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাগরে মৎস্য আহরণ-চেষ্টার কিছু আলোচনা গতবার করিয়াছি। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ব্লিজ' পত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক কাজের সংবাদ প্রকাশ করেন। কোন সরকারী কর্ম্মচারীর চাউল সম্বন্ধীয় বে-আইনী কাজের সংবাদ ঐ পত্রে প্রকাশের পরে সরকার তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হ'ন। ঐ পত্র পশ্চিমবঙ্গে সরকারের গভীর জলে মাছ ধরিবার চেষ্টা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

(১) পাঁচ লক্ষাধিক টাকায় ক্রীত ডেনিশ মাছধরা জাহাজ ('সাগরিকা' ও 'বরুণা') এত পুরাতন যে, তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ সংস্কার প্রয়োজন হয়।

(২) সম্প্রতি ২খানি জাহাজই ১৬ দিন অচল ছিল।

(৩) ২রা অক্টোবর ২খানি জাহাজে মোট ৪শত মণ মাছ আসিয়াছিল। তাহাতে জাহাজের ঠাণ্ডা ঘরের বরফের ব্যয়-সঙ্কুলান হয় না।

(৪) কলিকাতার বাজারে মাছের দাম ৮০ হইতে ১১০ টাকা মণ হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে মাছ ১৫ টাকা মণ দরে কিনিয়া বেচিবার একচেটিয়া অধিকার দিয়াছেন।

(৫) ঐ প্রতিষ্ঠান কি দামে মাছ বিক্রয় করেন মৎস বিভাগের সচিব তাহা জানিতে চাহিলে—দেখা যায়, তাঁহারা ৫০ হইতে ৬০ টাকা মণ দরে ঐ মাছ বিক্রয় করেন। কিন্তু বলা হইয়াছে, ঐ প্রতিষ্ঠান অযথা লাভ করেন না।

(৬) ডেনিশ নাবিকদিগের এক জনের বেতন গভর্ণরের বেতন অপেক্ষাও অধিক। নাবিকরা যে ভারতীয়দিগকে গভীর জলে মাছ ধরায় কৌশল শিখাইয়া দিবেন কথা ছিল, তাহাতে তাঁহারা অক্ষম হইয়াছেন। এ বার তাঁহাদিগের ৩ জনকে বিদায় দেওয়া হইতেছে।

(৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন, ডিরেক্টারকে নূতন ব্যবস্থা করিতে জাপানে পাঠাইতেছেন। তিনি জাপানে যাইয়া বলিবেন—

> "আমি ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
> এসেছি তোমারই দেশে।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টারকে জাপান হইতে জাহাজ ও বিশেষজ্ঞ ধীবর সংগ্রহ চেষ্টার জন্য জাপানে পাঠাইতেছেন ; তবে সে ডেনিশ পরীক্ষার অসাফল্যের জন্য নহে। ডেনিশ জাহাজ ও নাবিকরা যাহা করিয়াছেন তাহাতে "আবিষ্কৃত"

হইয়াছে—সাগরে মৎস্য আছে! সে বিষয়ে আরও পরীক্ষা ও অনুসন্ধান প্রয়োজন। সেই জন্য জাপানে কর্ম্মচারী প্রেরণ করা হইতেছে। ইহাতে মনে হয়—ইহার পর আমেরিকায়, চীনে, অষ্ট্রেলিয়ায়, রুশিয়ায়, হনুলুলুতে লোক পাঠান হইবে। কারণ, তাহা না হইলে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যখন জানা আছে, জাপানী জাহাজ বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত আসিয়া মাছ ধরিয়া লইয়া যায়, তখন কি প্রথমে জাপানের দ্বারস্থ হইলেই ভাল হইত না? দরিদ্র দেশের অর্থের অপব্যয় অপরাধ। সে কথা একবার ভারত-সচিব লর্ড মর্লি, ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।

বোম্বাই সরকার কিন্তু একখানি জাপানী মাছধরা জাহাজকে বোম্বাইএ ও সৌরাষ্ট্রে সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য নিম্নলিখিত সর্ত্তে অনুমতি দিয়াছেন:—

(১) ঐ জাহাজ ৮ মাস কাল প্রতিদিন বোম্বাই সহরে ৫টন মাছ সরবরাহ করিবে;

(২) ঐ সময়ের মধ্যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত ১২জন শিক্ষার্থীকে জাপানী জাহাজে সমুদ্রে মাছধরার কৌশল শিক্ষা দিবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি বোম্বাই সরকারের ব্যবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না বা তাহা জানেন না?

পশ্চিমবঙ্গের লোকের বিশ্বাস, কাঁথীতে সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের চেষ্টা ও ডেনিশ জাহাজে সেই কাজ করার চেষ্টা উভয়ই ব্যর্থ হইয়াছে এবং চেষ্টায় কেবল পশ্চিমবঙ্গের নিরন্ন লোকের বহু অর্থ জলে গিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ছলে বলে কৌশলে হিন্দু বিতাড়ন সমভাবেই চলিতেছে। গত ১৪ই নভেম্বর পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলের নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাশ বলিয়াছিলেন, তিনি যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে—বহু সংখ্যক মুসলমান উদ্বাস্তু সুভড্যা গ্রামের ৬০টি হিন্দু পরিবারকে "অত্যন্ত অমানুষিকভাবে"—বলপূর্ব্বক তাহাদিগের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। কালীগঞ্জ থানার এলাকায় জিনারদি, পুরুলিয়া—ব্রাহ্মণগাঁও থানার এলাকায় মেয়রপুর—ফতুল্লা থানার এলাকায় হরিহরপাড়া গ্রাম হইতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দাশ মহাশয় বলিয়াছেন, "কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীর ও পুলিসের সাহায্যেই এই সকল উদ্বাস্তু (হিন্দু গৃহে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, পাকিস্তান যে সকল উদ্বাস্তু মুসলমানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হিন্দু গৃহ অধিকার করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গ হইতে পাকিস্তানে গিয়াছে; সুতরাং—

(১) তাহাদিগের পশ্চিমবঙ্গে ত্যক্ত সম্পত্তি কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার "কৌতী ফেরারী" বলিয়া অধিকার করিয়াছেন? না—যদি তাহারা ফিরিয়া আসে এই আশায় রক্ষা করিতেছেন?

(২) ঐ সকল "উদ্বাস্তু" পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে "রেশান কার্ড" পাইতেছে ও পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকের অধিকারে ব্যবসাদি করিতেছে—সরকারী কাজ ও ঠিকা পাইতেছে?

(৩) ইহারা যদি পশ্চিমবঙ্গে থাকে, তবে কি পঞ্চম বাহিনীর কাজ করিতে পারে না?

অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সচিব বলিয়াছেন—বসন্তবাবু যাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন; পরন্তু (কাশীপুর ক্যাম্পের ব্যবস্থার মত ব্যবস্থাহেতু) যে সকল হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছে, তাহারা যাহাতে তাহাদিগের ত্যক্ত গৃহ ও সম্পত্তি শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া পায়, পাকিস্তান সরকার সেই চেষ্টাই করিতেছেন।

তবে ভারত সরকারের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস বলিয়াছেন—

(১) কিছুদিন হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে গ্রামে হিন্দুগৃহ বলপূর্ব্বক অধিকারের সংবাদ ভারত সরকার পাইতেছেন।

(২) পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যাগত হিন্দুদিগের ত্যক্ত সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্তিই সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে—তাহার উপর যদি আবার এইরূপ উপদ্রব ঘটে, তবে তথায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে বিপদের সম্ভাবনাই প্রবল হইবে।

(৩) ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী, ঢাকাস্থ ডেপুটী হাই কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সকল বিষয়ে পাকিস্তান সরকারকে ও পূর্ব্ববঙ্গ সরকারকে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু উত্তর পাওয়া যায় নাই।

পাকিস্তান সরকার যখন ভারত সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পত্র উত্তরদানেরও অযোগ্য মনে করেন, তখনও কি ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা করিবেন—পাকিস্তান সরকার দিল্লী চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন এবং হিন্দুর পক্ষে পাকিস্তানে বাস নিরাপদ হইবে?

আমাদিগের মনে হয়, পাকিস্তান হিন্দুবিতাড়ন নীতি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছে এবং যে সকল হিন্দু বাধ্য হইয়া পাকিস্তানে থাকিবে, তাহাদিগের পক্ষে ধর্ম্মান্তরিত হওয়া ব্যতীত উপায় থাকিবে না। তাহারা ধর্ম্মান্তরিত হইলেই যে পাকিস্তানীরা তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তুল্যাধিকার দিবে, ইহাও মনে করিবার কারণ নাই।

সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আরও হিন্দু ভারতরাষ্ট্রে আসিবেন, ইহাই মনে করিয়া ভারতরাষ্ট্রকে—প্রতিশ্রুতি মত—তাঁহাদিগের ভারতরাষ্ট্রে পুনর্ব্বসতির আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে কাজ যত বিলম্বিত হইবে পুনর্ব্বাসন-সমস্যা ততই জটিল হইয়া উঠিবে এবং লোকের কষ্টও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

নালন্দা গবেষণাগার—

বৌদ্ধযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আলোচনাকেন্দ্র নালন্দায় সরকার মগধ গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। এই শিক্ষাগারে পালী ও প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপনা হইবে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের ও দর্শনের আলোচনা হইবে। গত ২০শে নভেম্বর (১৯৫১ খৃঃ) এই কার্য্যের শুভারম্ভে—ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকলকে মগধের পূর্ব্বগৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই

বক্তৃতায় তিনি নালন্দার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ইতিহাস আমরা প্রধানতঃ চীন হইতে আগত পরিব্রাজক ও ছাত্রদিগের লিখিত বিবরণ হইতে পাই তাহা বিবৃত করিয়াছেন। সে বিবরণ মনোজ্ঞ।' বিহারের শিক্ষা-সচিব আচার্য্য বদ্রীনাথ বর্ম্মা সরকারের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন—বিহারে তিনটি পবিত্র স্থানে বিহার সরকার সংস্কৃত, পালী ও প্রাকৃত—ভাষাত্রয়ের শিক্ষা ও সেই সকল ভাষায় লিখিত বিষয়ের গবেষণা করিবার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং সেই কেন্দ্রত্রয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করা হইবে। যাহারা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লাভ করিয়াছে, তাহারাই উচ্চশিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয়ে আসিতে পারিবে। পরে এই বিদ্যালয়ে বৌদ্ধযুগে প্রচলিত এশিয়ার অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইবে, যথা—তিব্বতী, সিংহলী, চীনা, বর্ম্মী ও শ্যামদেশীয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ছাত্রদিগকে হিন্দী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছাও বিহার সরকারের আছে।

বিহার সরকার যে পরিকল্পনা আজ করিতেছেন, বিদেশী শাসনে অজস্র বাধার মধ্যেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই পরিকল্পনা করিয়াছিল এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ও ব্যবস্থায় সেই পরিকল্পনা যথাসম্ভব কার্য্যে পরিণত করাও হইয়াছিল। কেন সে পরিকল্পনা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নাই, তাহার আলোচনার স্থান আমাদিগের নাই।

আমরা বিহার সরকারের উদ্যমের গুরুত্ব অস্বীকার করি না। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে দুইটি কথা স্বতঃই মনে হয়—

(১) একদিকে আমাদিগের ছাত্ররা পরীক্ষার মান খর্ব্ব করিবার দাবী করিতেছে, আর একদিকে আমাদিগের তরুণরা "উচ্চ শিক্ষা" লাভের জন্য বিদেশে যাইতেছে—দেশের বহু অর্থ বিদেশে ব্যয় করিতে হইতেছে। কিন্তু বিদেশী ছাত্ররা এ দেশে "উচ্চ শিক্ষা" লাভের জন্য আসে না। এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। সে দিকে সরকারের মনোযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না।

(২) দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির গুরুত্ব অসাধারণ হইলেও বর্ত্তমানে এ দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজন অধিক। সেইজন্য প্রথমে বিজ্ঞান মানুষের কাজে প্রযুক্ত করিবার জন্য যে শিক্ষা তাহার প্রবর্তন প্রয়োজন।

বিদেশ হইতে যাঁহারা যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের লব্ধ শিক্ষা সুপ্রযুক্ত করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে না। একজন ছাত্র বিদেশে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ ও গবেষণা করিয়া এ দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন; আশা ছিল, এ দেশে সরকার তাঁহার অভিজ্ঞতার ও পরীক্ষার সম্যক সদ্ব্যবহার করিবেন এবং তাহার ফলে দেশ উপকৃত হইবে। কিন্তু দেশে ফিরিয়া তিনি দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যে মোটা বেতনে চাকরী লইয়াছেন। বিদেশে যাঁহারা তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দামোদর জলনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় তিনি খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে কি গবেষণা করিতেছেন এবং সে পরিকল্পনার তিনি কি জানেন? ইংরেজের আমলে বহু ছাত্র বিদেশে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া সে শিক্ষা প্রয়োগের উপায় পাইত না—ইংরেজ সরকার বিদেশে কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া ঘটী-চোরের বিচার করিতে দিতেন। জাতীয় সরকারও কি তাহাই করিবেন?

শিক্ষা-সমস্যার সমাধান কি এইরূপে হইবে?

নির্ব্বাচন—

দীর্ঘকাল পরে এবং ভারতরাষ্ট্রের নূতন শাসন-ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদসমূহের সদস্য-নির্ব্বাচন হইবে। ইহা ভারত-রাষ্ট্রে নূতন ব্যাপার এবং ইহার গুরুত্ব অসাধারণ। প্রায় প্রত্যেক নির্ব্বাচন কেন্দ্রেই বহু নির্ব্বাচনপ্রার্থী দেখা যাইতেছে। ইংরেজ যখন ক্ষমতা ত্যাগ করে, তখন কংগ্রেসকে সে ক্ষমতা দিয়া গিয়াছিল—অবশ্য সে তাহার মূল্য হিসাবে দেশকে খণ্ডিত—দুর্ব্বল করিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সকল কেন্দ্রেই প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন—কেবল তাহাই নহে—যিনি একাধারে ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস নির্ব্বাচনে বহু অর্থ ব্যয় করিবেন। কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী যে সর্ব্বত্র উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি কেন যে সে সকল কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। এদিকে কংগ্রেসাতিরিক্ত রাজনীতিক দলগুলি নির্ব্বাচনের ব্যাপারেও একযোগে কাজ করিতে পারিতেছেন না—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ বর্জ্জন করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য বহুলোক প্রত্যেক কেন্দ্রে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন এবং—

There has been a startling increase in the number of "patriots" whose exploits had been so far unobserved and whose merits had been hitherto unrevealed.

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিতেছেন, নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে যেন ব্যক্তিগত আক্রমণ না হয়; অথচ তিনি একাধিক লোককে "সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট" বলিতে দ্বিধানুভব করিতেছেন না!

যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রেই মতান্তর মনান্তরের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে এবং দেশের বিপদেও একযোগে কাজ করিবার প্রয়োজনে অবজ্ঞাত হইয়া দেশের অনিষ্ট-সাধন করিবে। তাহা একান্ত অনভিপ্রেত।

বিমান দুর্ঘটনা—

গত ২১শে নভেম্বর (৫ই অগ্রহায়ণ) দমদম বিমান ঘাঁটী হইতে মাত্র ১৫০০ গজ দূরে নাগপুর হইতে কলিকাতায় আগমনকালে একখানি বিমান ভূপতিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। তাহাতে আরোহী লইয়া ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। যাত্রীদিগের মধ্যে তিন জন সাংবাদিক ছিলেন:—

(১) নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সঙ্ঘের সভাপতি দেশবন্ধু গুপ্ত;

(২) পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের সহকারী সম্পাদক লজপত রায় ;

(৩) বোম্বাইএর 'ফ্রি প্রেস জার্নালের' মিষ্টার স্যামুয়েল।

ইঁহারা নিখিল-ভারত সম্পাদক সঙ্ঘের কার্য্যে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। এই দুর্ঘটনা সমগ্র দেশে শোকের উদ্ভব করিয়াছে। দেশবন্ধু গুপ্ত দিল্লী হইতে পার্লামেন্টে নির্ব্বাচনজন্য কংগ্রেসের মনোনয়ন না পাওয়ায় যে পত্র ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে তাঁহার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন সে পত্রও তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার অভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছেন। দেশবন্ধু গুপ্ত সাংবাদিক ও রাজনীতিকরূপে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা হইতেছে। সে সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলা সঙ্গত নহে। আমরা আশা করি, অনুসন্ধানফলে—যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থাবলম্বনের উপায় করা সম্ভব হইবে। বিমানের ব্যবহার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে। যাহাতে বিমান দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র—

ক আগষ্ট মাসে কাশ্মীরে গণপরিষদে সদস্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পাকিস্তানের চররা নির্ব্বাচন পণ্ড করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, শেখ আবদুল্লাকে হরণ করিয়া পাকিস্তানে লইয়া যাইবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। বিমানচালককে উৎকোচে বশীভূত করিয়া শেখ আবদুল্লাকে দিল্লীগমনপথে পাকিস্তানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে ; কারণ, বিমানচালক মদ্যপান করিয়া সকল কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল। সংবাদটি উপন্যাসের আখ্যানবস্তুর মত বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই।

ভারতের অকল্যাণকামী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রভাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর হইতে আক্রমণকারী পাকিস্তানীদিগকে বিতাড়িত না করিয়া জাতিসঙ্ঘের দ্বারস্থ হইয়া যে ভুল করিয়াছেন, তাহার ফল বিষময় হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে যদি আন্তর্জ্জাতিক মধ্যস্থতার প্রয়োজন না হইয়া থাকে, তবে কাশ্মীরের ব্যাপারে তাহা হইবার কারণ কি ?

যে সময় পাকিস্তানীরা সমগ্র কাশ্মীর অধিকার করিবার আয়োজন করিতেছিল, তখন যদি মুসলমানপ্রধান কাশ্মীরে গণমত গৃহীত হইত, তবে যে গণমত কাশ্মীরের ভারতভুক্তিই সমর্থন করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পরে—পাকিস্তানের প্রচারকার্য্যের ফলে—কি হইবে বলা যায় না এবং তাহা চিন্তা করিয়া কাশ্মীরের হিন্দুরা আতঙ্কিত হইতেছেন—হয়ত তাঁহাদিগের পক্ষে কাশ্মীরে বাস অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কাশ্মীর যখন ভারতভুক্ত হইতে চাহিয়াছিল, তখনই কাশ্মীর হইতে অনধিকারপ্রবেশকারী পাকিস্তানীদিগকে বিতাড়িত করা ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে অসঙ্গত হইত না। পণ্ডিত জওহরলালের আন্তর্জ্জাতিকতাপ্রীতি তাহা করিতে দেয় নাই।

জাতিসঙ্ঘে কাশ্মীর-সমস্যা—

জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধি ডক্টর ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গত ১৮ই অক্টোবর যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার পরে জাতিসঙ্ঘের নির্ব্বিঘ্নতা পরিষদ কাশ্মীর সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে কাশ্মীরের অবস্থা "ন যযৌ ন তস্থৌ" রহিয়া গেল—It is a conclusion in which nothing is concluded. প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান যে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করিতে কৃতসঙ্কল্প, অস্ত্রত্যাগের ব্যবস্থা রক্ষা করিবেন, কাশ্মীর গণভোটে কোন রাষ্ট্রভুক্ত হইবে তাহা স্থির করিবে এবং জাতিসঙ্ঘের ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তাহাতে পরিষদ বিশেষ আনন্দিত। যাহাতে উভয় পক্ষ জম্মু ও কাশ্মীর হইতে সামরিক ব্যবস্থা অপসারিত করেন, সেজন্য জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিকে চেষ্টা করিতে ও উভয় পক্ষকে মীমাংসায় আগ্রহশীল হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাশ্মীর-সমস্যা যেমন ছিল, তেমনই রহিল। অর্থাৎ কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান অধিকার করিয়া আছে—যাহাতে তাহার প্রবেশ অনধিকার প্রবেশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—সে অংশ পাকিস্তানের অধিকৃতই রহিল! জম্মু ও কাশ্মীর হইতে ভারত রাষ্ট্রের সেনাবল অপসারিত করা হইবে বটে, কিন্তু পাকিস্তানের অধিকৃত অংশ পাকিস্তানের অধিকারমুক্ত করা হইবে না। ইহাই কি নিরপেক্ষতার নিদর্শন? এই ব্যবস্থায় কি ভারত রাষ্ট্র—বহু অর্থ ও জীবন ব্যয় করিবার পরে সম্মত হইবে? এই ব্যবস্থার জন্য কি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিদেশীর মধ্যস্থতাপ্রীতি ও যাহাকে inferiority complex বলে তাহ দায়ী নহে? যে অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ভারত রাষ্ট্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হারাইয়াছে, সেই অবিমৃষ্যকারিতা কি আবার ভারতের কাশ্মীর হারাইবার কারণ হইবে? কাশ্মীরের গণপরিষদের মত কি তবে একান্ত গুরুত্বহীন ও উপেক্ষণীয়?

কোরিয়া ও পারস্য—

কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা মন্থর গতিতে চলিতেছে—মীমাংসার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তাহাতে মনে হয়, এক পক্ষের আন্তরিকতায় অপর পক্ষের সন্দেহের কারণ আছে এবং যতদিন সে সন্দেহ দূর না হইবে, ততদিন প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কোরিয়ার গৃহ-বিবাদে অন্যান্য দেশের হস্তক্ষেপ যে কোরিয়া অপমানজনক মনে করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে মনোভাব লইয়া ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের সহিত বিবাদে—পাকিস্তান কাশ্মীরে প্রবেশ করিলেও—জাতি সঙ্ঘের মধ্যস্থতা চাহিয়া বিব্রত হইয়াছেন, কোরিয়া সে মনোভাবের অনুশীলন করে নাই। কোরিয়ার ব্যাপারে বিদেশীদিগের হস্তক্ষেপ তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের উপলক্ষ হইবে, ইহাই অনেকে মনে করিয়াছিলেন। তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহা যে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অন্যতম কারণ হইতে পারে না—এমনও বলা যায় না।

পারস্য তাহার তৈলসম্পদ জাতীয়করণের চেষ্টায় স্বীয় স্বার্থে আঘাত

লাগায় বৃটেন উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে পারস্যকে আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। কারণ, এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ যেরূপ জটিল অবস্থার উদ্ভব করিবে, তাহাতে কোন কোন রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। কারণ, সে যুদ্ধে বহু দেশই জড়িত হইবে এবং তাহার ফল অনিশ্চিত। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের সাম্রাজ্যের স্বপ্ন শেষ হইয়াছে; এখন তাহার আত্মরক্ষার জন্য শান্তিতে থাকিয়া আপনার সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করাই প্রয়োজন। সে অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যে বিপজ্জনক তাহা সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলেরও বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

মিশর—

মিশরে এখন অশান্তি প্রবল। ইংরেজ বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ-কালে যেমন ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত—দুর্ব্বল করিয়া গিয়াছে—"ভাল পারি না মন্দ পারি"—তেমনই বোধ হয় সুদানকে স্বতন্ত্র করিয়া মিশরকে দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা করিতেছে। মিশরে বৃটেনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন—সুয়েজ খালে। সেই খালের নিকটেই এখন হাঙ্গামা সময় সময় খণ্ড-যুদ্ধে পরিণত হইতেছে। মিশরীরা জাতীয়তার স্বাদ পাইয়াছে—জগলুল পাশা প্রমুখ নায়কদিগের ত্যাগ এতদিনে সার্থক হইতেছে। সুতরাং এখন যে মিশর আর বিদেশীর প্রভুত্ব সহ্য করিবে, এমন মনে করা অসঙ্গত। সে আজ অনেক দিনের কথা—লর্ড ডাফরিন বলিয়াছিলেন, মিশরের কৃষক সম্প্রদায় নবভাবে প্রভাবিত হইতেছে। জাতির শক্তির উৎস যে স্তরে সে স্তরে যখন নবজাগরণ দেখা দেয়, তখন জাতি আর পরবশ্যতা স্বীকার করিতে পারে না। মিশর যে ভারতের সহানুভূতি চাহিতেছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ এম-এ, পি-এচডি, এফ-এন-আই

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নির্বাচিত কয়েকটি বিদ্যায়তনে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যাঁহারা বিজ্ঞানে গবেষণাদি করিবেন, তাঁহাদিগকে ইংরাজি, ফরাসী ও জার্মান শিক্ষা করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত ইতালীয়, রাশিয়ান, চৈনিক ও জাপানী ভাষার শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

হিন্দীভাষা শিক্ষা সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যস্ততার কোনই আবশ্যকতা নাই। ইংরাজির স্থান অধিকার করিতে হিন্দীর বহু বিলম্ব আছে। আমাদের প্রাদেশিক সকল প্রকার কাজই বাংলাভাষাতেই চলিবে। আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যাপারে মাত্র হিন্দীর প্রয়োজন হইতে পারে। তাহারও এখন বহু বিলম্ব। সুতরাং এখন বিদ্যালয়ে বা বিদ্যায়তনে (স্কুলে বা কলেজে) আবশ্যিক পাঠ্যরূপে হিন্দীকে গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বর্তমানে বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত শেখান হয়, তাহাই যথেষ্ট, তাহার উপর আর একটি ভাষা চাপাইয়া দিবার কোনই সার্থকতা নাই। ইহা যে শুধু কোমলমতি ছাত্রগণের পক্ষে একটা বিষম ভাররূপে অনুভূত হইবে তাহা নহে, ইহা দ্বারা হিন্দীভাষার প্রতি একটা অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। সাধারণ দুচারটা কাজ চালাইবার মত হিন্দী, যেমন, গাড়ী বোলাও, পানি লে আও, ইত্যাদি, আমরা চাকর, কুলি, রিক্‌সওয়ালা প্রভৃতির কাছেই তো শিখিতেছি। দেবনাগরী অক্ষরও সংস্কৃত পড়িতে গিয়াই শিখিতেছি। সুতরাং, যদি কখনও কাহারও হিন্দী শিখিবার নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা শিখিতে বেশি অসুবিধা হইবে না। বিশুদ্ধ হিন্দী শিখিবার প্রয়োজনীয়তা আপাততঃ খুবই কম। বর্তমানে বিদ্যালয়ে হিন্দী শিখাইবার কোন ব্যবস্থা নিতান্ত অনাবশ্যক। বিদ্যায়তনে (College) বরং একজন হিন্দী-শিক্ষক নিযুক্ত হইতে পারেন। কোন পরীক্ষায়ই এখন হিন্দী আবশ্যিকভাবে থাকিবে না। তবে কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে ফরাসী, জার্মান প্রভৃতির মত হিন্দীও শিক্ষা করিতে পারিবে।

এই উপলক্ষে সাধারণ ভাবে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। বহুদিন হইতেই আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তির মনে কেমন একটা আত্মজিঘাংসা (Suicidal Mania) জাগিয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের কেহ কেহ কিছুদিন যাবৎ রোমান হরফ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। টাইপরাইটিং-এর সুবিধা হইবে, ইহাই নাকি রোমান হরফ অবলম্বন করিবার প্রধান কারণ। অন্য ভাষাভাষীরা বাংলা সহজে পড়িতে পারিবে, ইহাও অন্যতম কারণ। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক প্রযোজিত এবং লাইনো যন্ত্রে ব্যবহৃত টাইপ দ্বারা টাইপরাইটারের কাজ খুব সুষ্ঠুভাবেই চলিতে পারে। আর অন্য ভাষাভাষীরা যদি বাংলাই শিখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বাংলা অক্ষরগুলিও শিখিতে হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের সুন্দর, বিজ্ঞানসম্মত, সম্পূর্ণ, সুসংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত, কণ্ঠস্বর-অনুমত বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া অপরিণত, অবৈজ্ঞানিক, অসম্পূর্ণ, অসঙ্গত, অতি-আদিম (Primitive) আধ-আধ বর্ণমালা গ্রহণ হীরক ফেলিয়া কাচ গ্রহণ অপেক্ষাও নিন্দনীয়। এতটুকু একটা গ্রীস-দেশ, যাহার বর্ণমালা হইতেই ইংরাজি বর্ণমালা উদ্ভূত, সে দেশও নিজ বর্ণমালা পরিত্যাগ করে নাই।

পাঠ্যপুস্তকাদি এবং সংবাদপত্রাদি মৌলিক গ্রীক বর্ণমালাতেই লিখিত ও মুদ্রিত হয়। শুধু বৈদেশিক বা বাণিজ্যবিষয়ক ব্যাপারে ইংরাজি, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা ও অক্ষর ব্যবহৃত হয়। বহু যুগের বহু পরিচর্য্যার ফলে আমাদের দেহ মন তো বিকারগ্রস্ত হইয়াছেই, তাহার উপর আবার কেহ কেহ মাতৃভাষাটিকে স্বহস্তে নিধন করিয়া চতুর্বর্গলাভের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পরাধীনতার চাপে আমাদের বহু সৎপ্রবৃত্তি যেমন দমিত ছিল, তেমনি অনেকগুলি অসঙ্গত বাসনা ও কল্পনা দমিত ছিল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সদাকাঙ্ক্ষা ও সৎপ্রবৃত্তির সহিত কতকগুলি বিসদৃশ আকাঙ্ক্ষাও আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক ও সাংঘাতিক প্রবৃত্তি হইতেছে বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আক্রমণ। রাষ্ট্রভাষার প্রেমে পাগল হইয়া আমাদের মাতৃভাষাকে হত্যা করিবার একটা উৎকট অস্বাভাবিক প্রেরণা বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। রোমান হরফের ভূত ক্রমশ মস্তিষ্ক হইতে অপসৃত হইতেছে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার প্রতি উৎকট প্রেম যেন পাইয়া বসিতেছে। ইংরাজি রাষ্ট্রভাষা দুইশত বৎসরে যাহা করিতে পারে নাই, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা দুই বৎসরেই তাহা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা নাকি হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে। কিন্তু ইংরাজি অক্ষরে তো হয় নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য তো চিরদিনই ইংরাজি রাষ্ট্রভাষার পরাধীনতার মধ্যেই বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বা সেক্স্পীয়রের রচনা ইংরাজেরা বাংলা বা চীনা অক্ষরে মুদ্রিত করেন নাই কেন? অতি ক্ষুদ্র ঐতিহ্যহীন তুরস্কের উদাহরণই জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। বাংলার সহিত তুরস্কের তুলনা হয় না।

হিন্দী শিক্ষার আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না। প্রয়োজনমত এই ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে, যেমন আমরা ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকি। এজন্য এখন হইতেই বিদ্যালয়ে হিন্দিকে অবশ্য-পঠনীয় করিয়া কোমলমতি বালক বালিকাগণের স্কন্ধে একসঙ্গে চারটি ভাষা শিক্ষার ভার চাপাইয়া দেওয়া উচিত হইবে না। ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত কঠিন। ইহার জন্য বহু শ্রম ও বহু সাধনা আবশ্যক।

এ কথা কখনই ভুলিলে চলিবে না যে বাংলা ভাষার উপরেই আমাদের বাঙ্গালীত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। বাংলা ভাষা ত্যাগ করিয়া আমরা বাঙ্গালী নামে পরিচয় দিতে পারি না। ফরাসী জাতি যে ফরাসী, তাহার কারণ তাহাদের ভাষা ফরাসী। তাহারা যদি বিবিধ প্রকার সুযোগ সুবিধার কাল্পনিক মোহে বিভ্রান্ত হইয়া ইতালীয় ভাষা গ্রহণ করিয়া বসে, তাহা হইলে ফরাসীরা আর ফরাসী থাকিবে না। ইংরাজি ও ফরাসী ভাষার মধ্যে অসংখ্য শব্দের বিনিময় হইয়াছে, বেলজিয়মের ভাষা ও ফরাসী ভাষার মধ্যে অসংখ্য প্রকার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তথাপি ঐ সকল দেশের কোন ভাষা অপর কোন ভাষাকে গ্রাস করে নাই বা অপর কোন ভাষার নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই। বাংলা দেশের শিলিগুড়ি ষ্টেশনের নাম-ফলক হইতে বাংলা অক্ষর নাকি বিলুপ্ত করা হইয়াছে। এতখানি বিশ্বপ্রেম প্রকটিত না হইলেই বোধ হয় ভাল হইত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বাঙালীর সম্পর্ক মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক। কতকগুলি কাল্পনিক সুবিধার মিথ্যা মোহে প্রলুব্ধ হইয়া পাড়ার কোন একটি মহিলাকে আনিয়া মাতার স্থানে বসানো যায় না।

বিদ্যায়তন (College) ও বিদ্যালয়সমূহের জন্য মোট ব্যয়ের আনুমানিক অঙ্ক দেওয়া সহজ নহে। বাস্তব অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহা নির্ধারণ করিতে হইবে। শিক্ষক বা অধ্যাপকগণের বেতনাদি সম্পর্কে যথাসাধ্য উদার মনোভাব লইয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা বিস্তার। যেমন করিয়া হউক, এই লক্ষ্য উপলব্ধি করিতে হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বহু মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন হেলায় ফেলায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আমাদিগের সন্তান-সন্ততিদিগকে আরো বহু বৎসর তেমনি হেলায় ফেলায় শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

আমাদের উদ্দেশ্য অশিক্ষা নদী পার হওয়া। বহুমূল্য সুসজ্জিত আধুনিক ষ্টীমার আপাতত জুটিবে না। আমাদিগকে নৌকায়, ডিঙায়, ভেলায় অথবা শুধু সাঁতরাইয়াই এই নদী পার হইতে হইবে।

যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা, যে ত্যাগ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার পশ্চাতে ছিল, তাহাই এখন চালিতে হইবে শিক্ষাবিস্তারের জন্য, মানুষকে মানুষ করিবার জন্য। আর্থিক বা অন্য কোন বাধা মানিলে চলিবে না।

শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় প্রয়োজন, তাহার জন্য জনসাধারণকে যত্নবান্ হইতে হইবে। এজন্য প্রয়োজন হইলে একটি শিক্ষা-কর (Education Tax) বসান যাইতে পারে। একটি সহজ ও কার্যকরী ব্যবস্থা সম্পর্কে বলিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা হাওড়ার পুলের উপর দিয়া অথবা শিয়ালদহ ষ্টেশন দিয়া কলিকাতায় আসেন বা কলিকাতা হইতে বাহিরে যান, এবং যাঁহারা ট্রামে ও বাসে ভ্রমণ করেন প্রত্যহ, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে সামান্য একটি কর আদায় করা যাইতে পারে। যাহারা দৈনন্দিন যাত্রী (daily passenger) তাঁহাদের নিকট হইতে মাসে একবার কর আদায় করা যাইতে পারে। ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির ন্যায়, এই সামান্য ব্যয় কাহারও তেমন গায়ে লাগিবে না। অতি সত্বরই গা-সহা হইয়া যাইবে। অর্থের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আশ্বস্ত হইলে, জনসাধারণ ইহাতে কোন আপত্তি করিবে না। শিক্ষার জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য বাংলা প্রদেশ আত্মনির্ভরশীল হইলে, ইহার আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বাড়িবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পক্ষে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা একান্ত প্রয়োজন।

সাময়িক প্রয়োজনে বা অপ্রত্যাশিত বিপদে আপদে ঋণ করা অপরিহার্য হইতে পারে। কিন্তু ঋণগ্রহণ মোটের উপর খুব ভাল নহে। শেক্স্পীয়রের অনুকরণে বলা যাইতে পারে, the quality of borrowing is twice cursed; it curseth him that gives and him that takes. ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে অত্যধিক ঋণগ্রহণ-প্রিয়তার সুদূরপ্রসারী বিষময় ফল আছে। ইহার পরিণামে আত্মবিক্রয় ও আত্মলুপ্তি পর্যন্ত ঘটিতে পারে। ঋণ যদি লইতেই হয় তবে স্বপ্রদেশীয় জনসাধারণের নিকট হইতে লওয়াই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

উপরিলিখিত উপায়ে একটি শিক্ষাকরের ব্যবস্থা হইলে বার্ষিক যদি তিন কোটি টাকা আয় হয়, তাহা হইলে এই তিন কোটি টাকা এইরূপে ব্যয় করা যাইতে পারে :—বিশ্ববিদ্যালয় (এক বা একাধিক),.৭৫ লক্ষ ; বিদ্যায়তন (college) সমূহ, ১ কোটি ; অন্যান্য technological প্রতিষ্ঠান, ৫০ লক্ষ ; বিদ্যালয়সমূহ, ৭৫ লক্ষ। অবশ্য এই সকল আয় ও ব্যয় বর্তমানে শিক্ষার জন্য যে আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে, তাহার উপর অতিরিক্ত আয়ব্যয়রূপে গণ্য করিতে হইবে। যদি উক্ত উপায়ে তিন কোটি টাকার কম আয় হয়, তাহা হইলে তদনুপাতে উক্ত বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের হ্রাস হইবে।

আমি যে কথাগুলি লিখিলাম, এগুলি আমার কল্পনা। জাতির মনে যখন কর্মপ্রেরণা জাগে, তখন সে স্বপ্ন দেখে। তারপর আসে কল্পনার রাশি। কল্পনার মেঘলোক হইতেই সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রাণবারি বর্ষিত হয়।

আমার এই কল্পনাগুলি বর্তমান বা অতীত কোন পরিকল্পনার সমালোচনা নহে।

প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও বিবিধপ্রকার বিদ্যালয়-পঙ্কজ ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই পঙ্কজবন, জ্ঞানমধু-আহরণরত বাংলার লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকা-কিশোর-কিশোরী-যুবক-যুবতী-অলিকুলের কলগুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, এই স্বপ্নই তো দেখিতেছি। কবে এই স্বপ্ন সফল হইবে, ভবিতব্যই জানেন।

ছাত্রদিগের এবং শিক্ষাব্রতীগণের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের আদর্শ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নবীন ও প্রাচীন বহু প্রকার জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতে করিতে ছাত্রজীবন অগ্রসর হইতে থাকে। কি ছাত্রজীবনে, কি পরবর্তী জীবনে, ইহাদের সকল সাধনা, সকল কর্মপ্রচেষ্টা যাহাতে শুচিশুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক থাকে, সেদিকে সকলেরই সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বাংলার ইতিহাসে এমন একদিন ছিল, যখন কপি-কড়াইশুটি-আনারসের ঝুড়ি, ইঙ্গবঙ্গ হোটেলে খানাপিনা, যৌবনবতী নারীর নৃত্য-গীতাদি প্রভৃতি বিবিধপ্রকার মনোহর উপঢৌকন কর্মকুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে পরিগণিত হইত এবং এতদ্বারা কখনও কখনও রায়সাহেবাদি উপাধিলাভও হইত। এই কলঙ্কিত যুগ অতীত হইয়া আজ স্বাধীনতার সুনির্মল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। চরিত্র ও কর্মকুশলতার মূল্য আজ সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি স্তরে ছাত্রকে ও শিক্ষককে পূর্বতন হীন মনোবৃত্তি হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে হইবে।

পরাধীনতার আর একটি গ্লানি আমাদিগকে ক্রমশ মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এক সময়ে অনেকেই মনে করিতেন, ডিপ্লোমেসিই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। পরস্বাপহরণের বিবিধ কৌশল দ্বারাই সমগ্র পৃথিবীর সর্বপ্রকার মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করা যাইবে, এই ধারণা গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মানুষের মনকে মোহিত করিয়াছিল। আমরাও সেই মোহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ছিলাম না। কিন্তু সেই ডিপ্লোমেসি বা সেই এফিসিয়েন্স ভারতের অন্তর্নিহিত মনীষা কখনও একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমরা চাই বিদ্যাসাগরের প্রতিভা, বঙ্কিমের প্রতিভা, বিবেকানন্দের প্রতিভা। ঘিয়ের ব্যবসায়ে এক মাসে লক্ষপতি হইবার প্রতিভা বা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া ও ফেল করাইয়া এক বৎসরে কোটিপতি হইবার প্রতিভা ভারতের প্রতিভা নয়।

পরাধীনতার যুগে একদিকে ডিপ্লোমেসির মোহ, অপর দিকে শঠ, ধূর্ত, নীচ, স্বার্থান্বেষী, মিথ্যাবাদী, কুচক্রী চাটুকারদিগের সম্মোহন প্রভাব, উভয়ে মিলিয়া বহু হিতৈষী সমাজসেবীর নিজের এবং নিজের কর্মিগোষ্ঠীর সর্ব কর্ম কলুষিত করিয়াছে এবং তাহাদের খ্যাতির সমাধি রচনা করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের কৈশোর ও যৌবনের বিকাশোন্মুখ মনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে সরল বলিষ্ঠ সত্যের আদর্শ, ডিপ্লোমেসির নয়। আমাদের ছাত্রসমাজ ও আমাদের শিক্ষাব্রতী সমাজকে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কলহ ও মতবাদ হইতে দূরে থাকিয়া, সর্বতোভাবে নিজেদের মন স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখিয়া, সরলতা ও সত্যের পথে নিজ কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হইতে হইবে, ইহাই যেন আমাদের মনের একান্ত আশা, কামনা ও লক্ষ্য হয়। মনুষ্যত্ব গঠনের বিরাট কর্তব্য যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, সকল প্রকার কর্মীর তুলনায় তাঁহাদের দায়িত্ব অধিক। তাঁহাদের চিন্তা, তাঁহাদের কল্পনা, তাঁহাদের কায ও তাঁহাদের সৃষ্টিই কালক্রমে সমগ্র জাতির প্রাণশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে।

ভুল সকলেরই হয়। আমাদেরও হইবে। ভুল করিতে করিতেই মানুষ জীবনের প্রতিপদে অগ্রসর হয়। ভুল সরল ও নিঃস্বার্থ হইলে এবং ভুল বুঝিতে পারিলে তাহা সংশোধন করিবার মত সাধুতা ও মনোবল থাকিলে ভুলই সত্যের পথ দেখাইয়া দেয়।

মাও সে তুং

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ধূমকেতুর মতোই মাও সে তুংএর আবির্ভাব। কিছুদিন আগেও যার নাম জানতো এমন লোকের সংখ্যা ছিল অতি বিরল, আজ সেই ব্যক্তিই পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে; সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; সবচেয়ে আলোচ্য ব্যক্তি আজ চীনের নব নায়ক মাও সে তুং, ভারতবর্ষও যার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারছে না।

এতো অল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতি ও নিজের দেশে জনপ্রিয়তার এতো উচ্চশিখরে আর কেউ উঠতে পেরেছে বলে জানা নেই ইতিহাসে। মাত্র তিন বছর আগেও যে ব্যক্তি উত্তর-পশ্চিম চীনের এক দুর্গম পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে দিন যাপন করতো, কোনদিন অর্দ্ধাশনে কোনদিন বা অনশনে, আজ সেই লোকই চীনের অবিসম্বাদিত নেতা, পৃথিবীর ভীতি ও বিস্ময়।

তিন বছর আগেও মাও সে তুং ছিলেন এক পলাতক রাজবিদ্রোহী। জেনারেলিসিমো চ্যাং কাই শেকের সৈন্যরা তুং-এর শৈশবের আবাসস্থল ও কর্মকেন্দ্র ইয়েনান্ দখল করে নিয়েছিল এবং চ্যাং-এর সদম্ভ ঘোষণা শোনা গিয়েছিল,—"এইবার তুং-এর দলের শেষ।"

কিন্তু ইতিহাস তার বিপরীত কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করেছে। কোথায় চ্যাং-কাইশেক? সমগ্র চীন আজ মাও সে তুংকে বরণ করে নিয়েছে। চীনের মরাগাঙে জোয়ার এসেছে। শ্রদ্ধা ও সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসন আজ মাও সে তুংএর করতলগত। কিছুদিন আগে মসকো-তে ষ্টালিনের ৭০তম জন্মদিবসে ষ্টালিনের ডানপাশে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনটি তারই জন্যে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল।

এই অসাধারণ মানুষটার প্রথম জীবনের ইতিহাস জানবার জন্যে আগ্রহ বোধ করা বিচিত্র নয়; কিন্তু জানা যায় অতি সামান্যই, হুনান নগরে এক চাষার ঘরে তাঁর জন্ম। শিশুকাল থেকেই তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ছিল একটা চাপা বিদ্রোহের ভাব। যখন তাঁর সাত বছর বয়স তখন তাঁর বাবা তাঁকে ক্ষেতখামারের কাজে নিযুক্ত করলেন, কিন্তু মাও সে তুং সে কাজে রাজী হলেন না, প্রকাশ্যেই বাপের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। তাঁর এই অবাধ্যতা দেখে পড়শিরা অবাক হল। ছেলে হয়ে বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! কনফুসিয়াসের আদর্শের এত বড় অপমান বিস্ময়কর বৈকি! কিছুদিন পরে মাও সে তুং স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। পিতা ভাবলেন, লেখাপড়া শিখে ছেলে তাঁর এইবার মানুষ হবে; কিন্তু সেখানেও শিক্ষকরা তাঁকে বাগ মানাতে পারলেন না। ধরা-বাঁধা লেখাপড়ায় মাও সে তুংএর মন নেই, অঙ্ক? চীনের পুরাতন সাহিত্য? নীরস ও নিরর্থক। তুং সেদিকে ঘেঁষলেন না। একমাত্র ইতিহাস তাঁর সারা মন আকৃষ্ট করল।

১৮ বছর বয়সে তুং ডাঃ সান ইয়াটসেনের বিদ্রোহে যোগ দিলেন একাজ্ঞনে; এবং কিছুদিন পরেই চাংসার নর্ম্মাল স্কুলে পড়বার সময় তিনি তাঁর প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করলেন। অসম ছিল তাঁর সাহস। অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি। চ্যাং কাইশেকের এক কুখ্যাত প্রদেশপালের পলায়ন পর সৈন্যরা তুংএর স্কুলটিকে আত্মরক্ষার ঘাঁটী করবার উদ্দেশ্যে স্কুলে হানা দিলে। শিক্ষকরা দিলেন চম্পট, তাদের সঙ্গে অধিকাংশ ছাত্ররাও। তুং তখন স্কুলের যোয়ান যোয়ান গোঁয়াড়দের নিয়ে এক দল গঠন করলেন। তারা স্কুলের প্রবেশ পথে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি দিয়ে বেড়া রচনা করলে এবং কয়েকজন ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান সৈন্যদের বেকায়দা করে তাদের বন্দুক ও কার্ত্তুজ কেড়ে নিলে, তারপর চলল রীতিমতো লড়াই। স্কুলের ভিতর থেকে তুং এর দল গুলি চালাতে লাগল। উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যরা হটে গেল। প্রথম যুদ্ধেই তুং জয়লাভ করলেন।

* * *

তিনখানা বই মাও সে তুংএর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং তাঁর বর্ত্তমান জীবনকে গঠন করেছে। কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার, কটস্কি প্রণীত শ্রেণীযুদ্ধ এবং কিরকাপ রচিত সোস্তালিজমের ইতিহাস। ১৯২১ সালে মার্কসীয় মতবাদের এই নূতন ভক্ত সাংহাই সহরে এক গুপ্ত সভায় অপর এগারোজন সদস্যের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে চীনা সাম্যবাদী দলের পত্তন করলেন। কিছুদিন পরে নিজের জন্ম-প্রদেশে ফিরে এসে তিনি চাংসা বিভাগীয় কেন্দ্র স্থাপনা করলেন, এবং নিজে হলেন তার কর্ম্ম সচীব।

কিন্তু তখনো তুং এর প্রতিপত্তি তেমন বিস্তার লাভ করেনি। তখনো তাঁর অনুগামীর দল ছিল নগণ্য। সে সময় দলের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন মস্কো ফেরৎ লিলিসান্। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লিলিসানের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। বিভিন্ন সহরের শ্রমিক সংঘগুলি নির্বিচারে লিলিসান্‌কে মান্য করতো। তারাই ছিল তাঁর শক্তি ও প্রভাবের মূল।

কিন্তু তুংএর লক্ষ্য ছিল ভিন্নতর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজনৈতিক সংহতির মূলে চীনা মজুরেরাই হল আসল শক্তি। তিনি গ্রামে গ্রামে তাদের মধ্যে কাজ করতে লাগলেন, তাদের নূতন আদর্শে গ'ড়ে তুলতে লাগলেন, নূতন প্রেরণায় তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন।

কালক্রমে লিলিসান্ পিছিয়ে যেতে লাগলেন এবং ১৯৩১ সালে প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে মস্কো চলে গেলেন। তারপর তিন বছর ধরে চলল চ্যাং কাইশেকের সৈন্যদের সঙ্গে তুং-এর দলের লড়াই। তুং এবং তাঁর প্রধান সহকর্ম্মী জেনারেল চুটে প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। সেই জীবন মরণ সংগ্রামে বারবার আশ্চর্য্য সাহস ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। অবশেষে ১৯৩৪ সালে মাও সে তুং বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে তাঁর দলের লোকদের ৬০০০ মাইল দূরবর্ত্তী

ইয়েসান্ সহরে স্থানান্তরিত করলেম। নিরাপদ হলেন নিজে, নিরাপদ করলেন দলের সবাইকে। সেই দেশ বিখ্যাত আলোড়নে কারুর আর জানতে বাকি রইল না চীনা সাম্যবাদের প্রকৃত নেতা কে?

* * *

নিজের দলে সৈন্য সংগ্রহ করার কাজে মাও সে তুং বিলক্ষণ দূর-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণতঃ সৈনিক হয় সমাজের নীচুস্তরের মানুষ। চাষীরা তাদের ভয় করে, ঘৃণা করে, অবিশ্বাস করে, সহরবাসীরা তাদের বরদাস্ত করতে চায় না। সম্মান বা শ্রদ্ধা কেউ করে না তাদের তুংএর সৈন্যরা ভিন্ন আদর্শে গঠিত। "জনসাধারণের সেবাই তাদের ধর্ম্ম।" এছাড়া তাদের অন্য কোন নীতি নেই। তুং-এর সৈন্যগণ সেই আদর্শকে মেনে নিয়েছে। সৈন্যদের জীবন পরিচালিত করবার জন্যে তিনি আটটি নীতির প্রবর্ত্তন করেছেন। মিষ্টভাষী হবে, ন্যায্য দাম দিয়ে জিনিস কিনবে, ধার নিলে তা শোধ করবে, ক্ষতি করলে তা পূরণ করবে, মারধোর বা গালাগালি করবে না, শস্যের ক্ষতি করবে না, স্ত্রীলোকের পিছু নেবে না, যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে না।

ধীরে ধীরে চ্যাং কাইশেকের অপদার্থ, আদর্শভ্রষ্ট এবং কলুষপূর্ণ রাজত্বের অবসান হল। তুংএর বিদ্রোহের কাছে চ্যাংএর সৈন্যরা সর্ব্বক্ষেত্রে পর্য্যুদস্ত হল। চ্যাংএর সৈন্যরা যেখানে সেখানে পরাজয়ের গ্লানি, হতাশা আর বিশৃঙ্খলা। তুংএর কবলে যে সব স্থান একের পর এক আসতে লাগল, সে সব স্থানে শৃঙ্খলা নিয়ম, শান্তি আর প্রাচুর্য্যের প্রত্যাশা দেখা দিল। অতএব তুংএর জয়ের পথ প্রশস্ততর হতে বিলম্ব ঘটল না।

* * *

পাহাড়ের গুহা থেকে বেরিয়ে মাও সে তুং আজ দেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এতদিন পরে লোকে ভাল ক'রে তাঁকে দেখবার অবকাশ পেয়েছে। চীনাদের তুলনায় তিনি যথেষ্ট দীর্ঘাকৃতি ;প্রায় ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। ঈষৎ আনতভঙ্গী। সাজ পোষাকে অযত্নবান। চমৎকার স্বাস্থ্য।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিবৃত্তকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, তিনি চারবার বিবাহ করেছেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করেছিলেন তাঁর পিতা। দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন, এক পিকিং অধ্যাপকের সাম্যবাদী মেয়ে। হুনানের সাম্যবাদী বিরুদ্ধ প্রদেশপাল মেয়েটিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান হয় ; তার বেশী কিছু জানা নেই ; তাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে তাঁর চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী নাম হল ল্যান পিং। মেয়েটী আগে ছিল অভিনেত্রী। উভয়ের একটী আট বছরের মেয়ে আছে।

নির্জ্জীব রণবিক্ষত ও পরিশ্রান্ত চীনারা আজ মাও সে তুংএর নেতৃত্বে নবজীবনের সন্ধান লাভ করেছে। পেয়েছে নবতম উজ্জীবন-মন্ত্র। তাই আজ চীনের সহরে নানা স্থানে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, সেই সব অনুষ্ঠানের আরম্ভে ও শেষে স্বতঃ উৎসারিত সহস্র কণ্ঠে বিঘোষিত হয় "মাও সে তুংএর জয়।"

উজানীর কবি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

যেথায় কুনুর তীর্থ রচেছে অজয়-সঙ্গ লভি',
সেথা আশ্রম রচি করে তপ রসের তাপস কবি।
অজয়ের কল তানে
নিতি কেঁদুলীর কান্তকোমল পদাবলী শোনে কানে।

নানুরের ঘাটে রামী রজকিনী আজিও কাপড় কাচে,
তালে তালে তার ধ্বনি সে কবির কর্ণকুহরে নাচে।
বর্ষে বর্ষে বর্ষা বন্যা হানে,
কবির দুয়ারে প্রেমের বন্যা ভাবের বন্যা আনে।

ডাক দিয়ে যায় অনন্তপানে ফেন তরঙ্গ কুল,
সে ডাক শুনিতে কবির হয়না ভুল।
চারিদিকে শ্যাম তরুলতাগুলি র'চে শান্তির ছায়া,
কবির নয়নে ঘনাইয়া আনে বৃন্দাবনের মায়া।

লোচন তাহার তৃতীয় লোচন করিয়াছে বিমোচন,
চণ্ডীর কৃপা করিয়াছে তার চিত্তেরে বিশোচন,
যবে তরঙ্গ তুরঙ্গ কুল বহি আনে রাজরথ,
আগুলিয়া তার পথ,

শীর্ণ পাণিটি তুলি ঋষি-কবি কয়,
আশ্রম-মৃগ বধ করিও না, এ তব বধ্য নয়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দেবকী সেন এক মুহূর্ত্তে যেন পঙ্গু হইয়া গেল। স্থির দৃষ্টি—কিন্তু সে দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে যেন কিছু বলিতে চাহিল কিন্তু গলা দিয়া শুধু একটা জড়িত স্বর—জান্তব কণ্ঠধ্বনির মতই ভাষাহীন; শুধু স্বর—বেদনার্ত্ত—বিস্ময় বিমূঢ়।

ওই মেয়েটিই তাহার হারানো বোন সুমিত্রা। সুমিত্রার কোলে একটি শিশু, বোরখার আবরণের মধ্যে পরম যত্নে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, পাছে এই আবরণের জন্য কাঁদে, চীৎকার করে—সেই জন্য সে তাহাকে স্তনপান করাইতেছে। সুমিত্রার মুখ দিয়াও আর কথা সরিল না, সেও এক মুহূর্ত্তে পঙ্গু হইয়া গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, জিভ আড়ষ্ট হইয়া গেল। তবে যাহা বলিবার ছিল তাহা অগোচর রহিল না; যদিও বা এতটুকু সন্দেহ থাকিত তাহা নিরসন করিয়া দিল একটি ছ' সাত বছরের ছেলে; সে তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আম্মা!

দেবকী সেন স্থির দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে অনর্গল ধারায়। অপরিসীম আতঙ্কের ছায়াও পড়িয়াছে সে মুখে। কিন্তু কই—নিষ্ঠুর আত্মগ্লানি বা আত্মার অনির্ব্বাণ চিতাবহ্নিতে দহনের চিহ্ন কোথায়? ওই আতঙ্ক এবং চোখের জলের অন্তরালে যে মুখখানি—সে মুখ এক মায়ের মুখ। যে মা মাতৃত্ব গৌরবে—মাতৃত্ব সুখে পরিতৃপ্ত সেই মায়ের মুখ! আর ওই বড় ছেলেটির মুখে ফৈজুল্লার মুখের প্রতিবিম্ব!

মিনিট খানেক সময়—যেন সুদীর্ঘ একটা কাল বলিয়া মনে হইতেছিল।

অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দে স্তব্ধ এই ক্ষণটি চকিত হইয়া মুখর হইয়া উঠিল, কদর্য্য হইয়া উঠিল, হিংস্র উল্লাসে প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

বন্দুক ছুঁড়িল ফৈজুল্লা।

সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মানুষ সে, তাহার রক্তে একটু যুদ্ধবিগ্রহের রক্তপাতের ধারা আছে। দুশো বছরও হয় নাই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ আহম্মদ শা আবদালীর লুণ্ঠন ও অবাধ হত্যাকাণ্ডের কালে—লড়াই করিয়া মাশুল দিয়া, নির্য্যাতন ভোগ করিয়া বাঁচিয়াছে, একশো বছরও হয় নাই—সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাহারা মারামারি কাটাকাটি করিয়াছে। তাহার উপর ফৈজুল্লা বাংলা দেশে আসিয়া রুগ্নিধর্ম্মী কালো বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তাহার নীল রক্ত ও গৌরবর্ণের আভিজাত্য-বোধের অহঙ্কারে এবং প্রচুর সম্পদ অর্জ্জনের অহঙ্কারে—স্বভাবের দিক দিয়া অত্যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এদেশের মানুষের সঙ্গে তাহার ভ্রাতৃত্ব বোধের প্রীতিটা একান্ত ভাবেই মৌখিক। শুধু দল ভারী করিবার একটা ছল মাত্র। সকলের হোক বা না-হোক—ফৈজুল্লার প্রকৃতিটা একান্তভাবে এই। ভারতবর্ষের যে অভিজাত মুসলীম সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে তাহাদের সাম্রাজ্য বলিয়া মনে করে—এবং ইংরেজ চলিয়া গেলে—ভারতবর্ষকে ঠিক সেই পুরাতন বাদশাহী মুলুক হিসাবে চায়—সে তাহাদেরই অন্যতম। এতগুলি হিন্দু আক্রমণকারীর সম্মুখে ভয়ও যে তাহার হয় নাই এমন নয়। এই ভয় এবং এই হিন্দুদের সম্মুখে তাহারই পত্নীর এই সকাতর—অশ্রুসজল বিনীত ভাব—তাহাকে ক্রুদ্ধ করিয়াও তুলিল। ভয় এবং ক্রোধ দুই মিলিয়া তাহাকে করিয়া তুলিল অধীর, সে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্যের মত—কিসে কি হইবে বিবেচনা করিল না—বন্দুকটা তুলিয়া ধরিয়া ফায়ার করিয়া বসিল।

ফায়ার সে করিল—দেবকী সেনকে লক্ষ্য করিয়া;

কিন্তু হাত তাহার কাঁপিয়া গেল। একটা সমবেত জনতার সম্মুখে সে একা, বীর্য্য এবং সাহস তাহার যতখানিই হোক —ভয় এক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক। হাত কাঁপিল তাহার ভয়ে, তাহার ফলেই বুলেট সোজা বুকে না বিঁধিয়া বাঁ কাঁধে গিয়া বিঁধিল, সে পড়িয়া গেল।

সুমিত্রা চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সে চীৎকার ঢাকা পড়িয়া গেল—প্রচণ্ডতর হিংস্র আর একটা চীৎকারে। সে চীৎকার গভীর অরণ্যে অন্ধকার রাত্রে আহত বাঘের চীৎকার যে না-শুনিয়াছে সে অনুমান করিতে পারিবে না। তাহার পর যে কি হইল—কেমন করিয়া হইল—সে কেহ বুঝিতে পারিল না। ওই চীৎকার দিয়া উঠিল রামভল্লা, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত হইল—কতকগুলা ইট। ফৈজুল্লা আবার বন্দুক তুলিল—কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বুকে আসিয়া পড়িল একটা আধখানা ইঁট—সে টলিয়া গেল—বন্দুকটা খসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া পড়িল—রামভল্লা। হাতের লাঠীখানা অন্ধকার রাত্রের মশালের আলোতে একবার বিদ্যুৎ চমকের মত চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ফৈজুল্লা পড়িয়া গেল। মাথাটা তাহার দু ফাঁক হইয়া গিয়াছে।

উন্মত্ত জনতা ছুটিয়া চলিল, সম্মুখেই ফৈজুল্লার বাড়ীর পিছনের দরজা। আহত দেবকী সেন চীৎকার করিয়া উঠিল—না—না—। না!

এক্ষেত্রে ওই না কথার কোন মূল্য নাই।

লুণ্ঠন-লোলুপ জনতা খোলা দুয়ার দিয়া ঢুকিয়া পড়িল। নৈশ অন্ধকার কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতরে আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান নরনারী চীৎকার করিয়া উঠিল।

* * *

ওদিকে শহরের পশ্চিম প্রান্তে আরও এক জায়গায় বীভৎস কাণ্ড চলিয়াছিল। সে ওই পতিতা পল্লীতে। পল্লীটার ঠিক পিছনের দিকে একটি মুসলমান পল্লী। পতিতা পল্লীকে দূরে রাখিয়া—হিন্দু পল্লী খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া সুরু হইয়াছে। হিন্দুরা এখানে ওই ব্যবধান ভূমিতে দাঁড়াইয়া ঘাঁটী গাড়িয়াছে। সেইখানেই তাহারা দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে ওই দেহব্যবসায়িনী পল্লীটায় আগুন ধরাইয়া—ঘরে ঘরে হানা দিয়া একটা বীভৎস তাণ্ডব সুরু হইয়া গিয়াছে। কতকগুলা মেয়ে হাতজোড় করিয়া বলিয়াছে—যেখানে লইয়া যাইবে চল, যাহা বলিবে —সেই আদেশই মানিয়া লইব, আমাদের প্রাণে মারিয়ো না। কতকগুলি মেয়ে কোন রকমে ঘর দুয়ার ফেলিয়া পলাইয়া গিয়া রেলওয়ে ইয়ার্ডে মালগাড়ীগুলার তলায় আশ্রয় লইয়াছে। লাইনের স্লিপারের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

পল্লীটার প্রান্তে নলিনের ঘর। তাহার পুতুল গড়িবার ও পোড়াইবার আস্তানা। ঘরখানিকে সে সাজাইয়া গুছাইয়া, সামনেটা নিজের হাতে মাটি দিয়া লেপিয়া রঙ দিয়া মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল, খানিকটা জায়গায় ফুলের গাছ পুঁতিয়াছিল। নলিনের ঘরখানা জ্বলিতেছে। ধোঁয়ার মধ্যে মানুষ পোড়ার গন্ধ উঠিতেছে। নলিন উহারই মধ্যে পুড়িতেছে।

প্রথম আক্রমণ হইয়াছিল নলিনের উপর। কেহ তখন ভাবিতেও পারে নাই যে এমনটা হইবে। কলিকাতায় ষোলই আগষ্ট ডাইরেক্ট এ্যাকশনের মত—ঠিক ওই পদ্ধতিতে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিল ফৈজুল্লা। ময়ূরাক্ষীর ওপার হইতে—এদিকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে একটা সংকেত অনুযায়ী রাত্রিকালে ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা ছিল। কিন্তু সে কল্পনা অনুযায়ী কাজ হয় নাই। অকস্মাৎ বাজারে সামান্য ঝগড়া ঝাঁটি উপলক্ষ করিয়া একজন মুসলমান মাংস বিক্রেতা একজন হিন্দু খরিদ্দারকে ছুরি মারিয়াই ব্যাপারটা সুরু করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে কয়েকটা আরও ছুরির আঘাত হইল। জন-চারেক মুসলমানও ডাণ্ডার আঘাত এবং ছুরি খাইল। ইহার পরেই রাত্রির প্রথম প্রহরেই ফৈজুল্লার নিজের পল্লীর মুসলমানেরা তাহাদের পল্লীরও ওপাশে অবস্থিত হিন্দু পল্লীটিতে আগুন ধরাইয়া খুন করিয়া হাঙ্গামা সুরু করিয়া দিল। ওদিকে এই পতিতা পল্লীতেও অতর্কিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নলিন তখন ষ্টেশনের ধারে তাহার গ্রীন কেবিনে—দোকানে বসিয়াছিল। ওদিকে আগুন দেখিয়া—সে কেবিন বন্ধ করিয়া ছুটিয়া গেল। তখন হিন্দু পল্লীর প্রান্তে হিন্দুরা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু অগ্রসর হইতেছে না; ওই হতভাগিনীগুলার জন্য তাগিদও নাই, আর

পাড়াটায় এমন ভাবে একপ্রান্ত হইতে আরেক প্রান্তে আগুন ধরাইয়াছে যে যাইতেও ভরসা হয় না।

নলিন কয়েক মুহূর্ত্ত হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে অকস্মাৎ উন্মাদের মত ছুটিবার উদ্যোগ করিল। তাহার পুতুল—তাহার পুতুল গড়িবার ছাঁচ—তাহার তুলি, রঙ, খোদাইয়ের যন্ত্র, গড়িবার যন্ত্র, জীবনের সাধনার সব-সব-সব যে ওইখানে!

কে একজন চীৎকার করিয়া ডাকিল—এই এই কে?

নলিন চীৎকার করিয়া উত্তর দিল—আমার ঘর। আমার পুতুল—আমার সর্ব্বস্ব।

—নলিন! নলে!

—না-না-না!

দেখিতে দেখিতে সে ওই জলন্ত পল্লীটার গলিপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। জলন্ত ঘরগুলির মধ্যে গলি পথ। ছোট ছোট খুপরি-ঘর। ঘরের মধ্যে নারী কণ্ঠের চীৎকার—ও বর্ব্বর মানুষের বীভৎস উল্লাসধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। একটা খোলা জায়গায় একটা তরুণী হতভাগিনীর উপর একজন পুরুষ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। জন কয়েক সেই পাশব দৃশ্য দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছে। নলিনের কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, সে ছুটিয়া গিয়া নিজের বাড়ীতে ঢুকিল। ঘরের দরজা ভাঙা, ভিতরের সমস্ত কিছু বিপর্য্যস্ত, সব তছনছ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

হঠাৎ পিছন হইতে জন দুই তিন আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

অরুণার মুখের আদল লইয়া সে দেবী মূর্ত্তি গড়িয়াছিল—সে কথা তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। সেই হইতে দরবারী সেখ দারোগার উপর গুলি চলিয়াছিল তাহাও তাহাদের মনে আছে। নলিনের সে সব মনে পড়িল না। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করলি?

একজন ছুরি বাহির করিল—শালা হারামী!

নলিন সভয়ে চোখ বুজিল।

একজন বলিল—আগে শালার মুখে থুক্ দে। দে!

মুহূর্ত্তে—এই কথাটিতে নলিনের কি হইয়া গেল। একটা বিদ্যুত প্রবাহে সে যেন জলন্ত চকিত হইয়া উঠিল। এক ঝটকায় হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরের ঘরটার কোন হইতে একখানা খাঁড়া লইয়া দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—আয়।

দুয়ারের ফাঁকে—খাঁড়া খানা ঝলকিয়া উঠিল।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল আক্রমণ-কারীরা। এমন ক্ষেত্রে প্রবেশ করা আর নিজের মুণ্ড দেওয়া এক কথা। চারিদিকের মধ্যে আর জানালা বা দরজা নাই।

একজন বলিল—বেরিয়ে আয়—কথা দিচ্ছি জানে তোকে মারব না।

নলিন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—শুধু-তু জাত দে!

নলিন আবার হাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মশালের আলোয় দরজার ওপাশটা আলোয় আলোময় হইয়া গেল। একজন বাহিরে গিয়া মশাল ধরাইয়া লইয়া আসিয়াছে।

—বেরিয়ে আয়। নইলে পুড়িয়ে মারব।

নলিন ভীরু—মুখচোরা নলিন বোধ হয় পাগল হইয়া গিয়াছে। তবুও আলোকিত দুয়ারের সম্মুখে—খাঁড়াখানা লইয়া বাতাস কোপাইতেছে, মশালের আলোয় বাহির হইতে—আরও ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে, আর শোনা যাইতেছে—তাহার অট্টহাসি। হা—হা। হা—হা—হা!

লোকে বলে—নলিন পিতৃপরিচয়হীন; সেই অপবাদে সে জাতিহীন; পতিতের আশ্রয় বৈষ্ণবধর্ম্মে আশ্রয় লইয়া—সে একপাশে চিরদিন পড়িয়া আছে। এখানে আসিয়া পতিতাদের পাড়ার একপ্রান্তে ঘর বাঁধিয়াছে।

—দে তবে—আগুন।

আগুন ধরিয়া উঠিল; একেবারে এ দিক হইতে ও দিক!

সেই আগুনের ধোঁয়ায়-মানুষের মাংস মেদ মজ্জা দহনের গন্ধ উঠিতেছে। ওদিকে রেল লাইনের দিক হইতে সমবেত চীৎকার আগাইয়া আসিতেছে। হিন্দু কুলীর দল।

—কালী মায়ী কি জয়!

(ক্রমশ)

প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র শিল্প ও তাহাদের বর্ত্তমান সমস্যা

শ্রীস্বরাজকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ .

ক্ষুদ্র শিল্পের রক্ষণ, পরিবর্দ্ধন ও তাহাদের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সকল সভ্যদেশই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য বর্ত্তমান তাহা সাধারণতঃ অনেকেই লক্ষ্য না করিয়া উভয়েই একরূপ বা এক পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণ করিলে নিম্ন লিখিত পার্থক্য দাঁড়ায় ;—

কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প

(ক) কুটীর শিল্পে এক বা একাধিক পরিবারের শ্রম, বিক্রয় ক্ষমতা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং লব্ধ লাভ সেই পরিবারই ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্প কোনও বিশিষ্ট পরিবার বা গোষ্ঠীর শ্রমের উপর নির্ভর না করিয়া বৃহৎ শিল্পের ন্যায় সাধারণ শ্রমিকের সহায়তায় চালিত হয় এবং লব্ধ লাভ বা লোকসানের কোনও অংশ শ্রমিক বিশেষকে বহন বা গ্রহণ করিতে হয় না।

(খ) কুটীর শিল্পে সাধারণতঃ মাল বিক্রয় খরচ (Selling Expense) নাই বলিলেই চলে তাহার কারণ যে সামান্য মাল তৈয়ারী হয় তাহার অধিকাংশই অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া কারুকলার উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে শিল্পীকে উৎসাহিত বা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই খরিদকর্ত্তা মাল ব্যবহার করিয়া থাকেন ; কাজেই তৈয়ারী মালের প্রয়োজনীয়তার তুলনায়, মালের মূল্য অনেক বেশী এবং পাইকারী ও খুচরা মূল্যের মধ্যে এতো পার্থক্য অন্য কোনও শিল্পে বা ব্যবসায় পরিলক্ষিত হয় না।

(গ) কুটীর শিল্পে বংশপরম্পরায় শিল্পী যে দক্ষতা লাভ করে তাহাই ব্যবসার প্রধান অংশ কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যক্তিগত দক্ষতা বা দক্ষকারী শ্রম সাহায্য অধিকাংশক্ষেত্রেই বিরল কাজেই প্রারম্ভিক লোকসান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী।

প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র শিল্প

সাধারণতঃ এই শ্রেণীর শিল্প ১০,০০০৲ টাকা হইতে ৫০,০০০৲ টাকা মূলধনসহ ব্যবসা আরম্ভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রারম্ভিক পরীক্ষামূলক সকল খরচ বাদে (অর্থাৎ মাল বিক্রয়ার্থ যথোচিত বাজার নিরূপণ, বাজার চাহিদা অনুযায়ী মালের মান (Standard) স্থিরীকরণ, গবেষণামূলক ও দৈব ক্ষয় ক্ষতি ইত্যাদিতে) ও শিল্পগঠনকারী অবশ্য ব্যয়িত-মূলধন যাহার মূল্য অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে কোনও দিনই ফেরৎ পাওয়া যাইবে না (অর্থাৎ ট্রেড মার্ক রেজিষ্টারী খরচ, শিল্প সমিতিবদ্ধকারী খরচ, ব্লক ডিজাইন ইত্যাদি ইত্যাদি) এই সকল ব্যয়ান্তে যে স্বল্প মূলধন অবশিষ্ট থাকে তাহা কোনওরূপে ব্যবসা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার অনুকূল হয় না এবং ক্রমে এই ব্যবসা যখন কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া একটা ক্ষুদ্র ব্যবসা গণ্ডীতে পরিচিত হইবার সুযোগ পায় তখন আর্থিক অনটন হেতু "ধার ক্রয় নিয়মের" অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হয় এবং পরিশেষে নিম্নবর্ণিত সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয় :—

(ক) ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মাল সরবরাহকারী, সময় মত টাকা আদায় না করিতে পারে কিংবা একেবারেই না পাইতে পারে বিবেচনা বা আশঙ্কা করিয়া মালের দর বর্দ্ধিত করে।

(খ) যদি মালের দর বর্দ্ধিত না হয় তবে সরবরাহকৃত মাল নিম্নস্তরের অবশ্যই হইবে (উপরোক্ত আশঙ্কা হেতু)

(গ) ক্ষুদ্র মালের বিষয় (Piece goods) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই,— হয় সংখ্যায় কম হইবে, নতুবা নিম্নস্তরের মালের সহিত মিশ্রিত হইবে।

স্বল্প ব্যাঙ্কিং প্রচলন ও অর্থ প্রেরণ অসুবিধা

আধুনিক ব্যবসাজগতে ব্যাঙ্ক আর্থিক লেন দেনে মেরুদণ্ড স্বরূপ। ব্যাঙ্কিং প্রচলনের অপ্রতুলতা হেতু ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলিই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। যে সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক এদেশে বর্ত্তমান তাহাদের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কোনও সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারে না—কাজেই এই সকল ক্ষুদ্র ব্যবসা মেরুদণ্ডহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত মহাযুদ্ধের সময় যে সকল ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারা সকলেই কারবার গুটাইয়াছে।

যে বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি আজও বর্ত্তমান এবং আশা করা যায় তাহারা বর্ত্তমান থাকিবে ও তাহাদের অধিকাংশেরই মফঃস্বল অঞ্চলে কোনও শাখা নাই কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে মফঃস্বলের সহিত ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ। কাজেই ব্যাঙ্ক হইতে কোনও সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রেরণের মাধ্যম হিসাবেও কোনও সহায়তা আশা করা যায় না।

(ক) বৃহৎ নগরগুলিতে বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসকল নাগরিকদিগকে বিজ্ঞাপন মারফৎ কোনও বিশিষ্ট মার্কাযুক্ত মাল খরিদ করিতে শিক্ষিত বা আকৃষ্ট করে এবং ক্রমে সেই মার্কা বাজারে প্রচলিত হয় ও চাহিদা লাভ করে।

(খ) বৃহৎ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎ বৃহৎ নগর হইতে মফঃস্বলের বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার সুযোগ পায় —কাজেই তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধিদিগকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিলা সহর ব্যতীত মহকুমা সহর কিংবা তন্নিম্ন সহরগুলিতে সর্ব্বদা পাঠায় না এবং মাল বিক্রয়ার্থ পাঠানো হইলেও বৎসরে দুইবারের অধিক পাঠানো হয় না।

(গ) বৃহৎ সহরগুলির বিখ্যাত ব্যবসায়ীরা নূতন কিংবা অপ্রচলিত মাল প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে না। ঐ সকল ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ সহজ ও অধিক বিক্রয়ী মালের ব্যবসায় আগ্রহান্বিত।

(ঘ) বৃহৎ ব্যবসায়ীদিগকে আবার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে মাল সরবরাহ করা সম্ভব নয়। কারণ অধিক সংখ্যক মালে—অধিক অর্থের প্রয়োজন, কাজেই স্বল্প মূলধন তাহাদের সহযোগিতার সর্ব্বদাই অন্তরায়।

সুতরাং উপরোক্ত কারণগুলি হইতেই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মফঃস্বল ব্যতীত মাল বিক্রয়ের স্থান নাই। ঐ সকল স্থানে ব্যবসায়ের জন্য যানবাহনের অপ্রতুলতা, শারীরিক ক্লেশ ইত্যাদি সহ্য করিয়া কাজ করিতে হয়! ঐ সকল স্থানে কেবলমাত্র ব্যবসায়ীদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও অশেষ শারীরিক কষ্ট ব্যবসাসূত্র রক্ষা করে।

মফঃস্বল হইতে ব্যাঙ্ক ব্যতীত বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রেরণের একমাত্র মাধ্যম—পোষ্ট অফিস। পোষ্ট অফিস মারফৎ অর্থ প্রেরণ অধিক অর্থব্যয় সাপেক্ষ। পোষ্ট অফিস মারফৎ অর্থ প্রেরণের যে কয়প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে তন্মধ্যে মণি অডার ও ইনসিওর অধিক জনপ্রিয়; কিন্তু যে হারে প্রেরককে প্রেরণ কমিশন বহন করিতে হয়—তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অর্থ প্রেরণের সময়ই সম্ভব। ব্যাঙ্ক কমিশন ও পোষ্টেল কমিশনের মধ্যে যদি তুলনামূলক কোনও হিসাব নেওয়া যায় তবে পার্থক্য দাঁড়ায় ১·২৫% এবং এই কমিশন হার ব্যবসা ক্ষেত্রে অত্যধিক।

নিজস্ব প্রতিনিধির মাল বিক্রয়ার্থ মালসহ স্থানে স্থানে উপস্থিতি ও অতিরিক্ত বিক্রয় খরচ

ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের স্থির উন্নতির জন্য সাধারণতঃ তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধিদের মালসহ বিক্রয়ার্থ মফঃস্বলে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ ঐ সকল প্রতিষ্ঠান কোনও ক্রমেই কোনও অর্ডারী মাল কোনও ব্যবসায়ী দ্বারা অস্বীকৃত হইলে (Refusal of orders) যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অস্বীকৃত মাল বিক্রয় হইলে তদনুরূপ লাভবান হইত কিনা সন্দেহ। কোনও মাল অস্বীকৃত হইলে "অস্বীকৃতি" অন্ততঃ ১ মাসের পূর্ব্বে স্থির হয় না। এই ১ মাসের গুদাম ভাড়া ইত্যাদি বহনকারী যান প্রতিষ্ঠানকে দিয়া তবে প্রথানুযায়ী মাল ছাড় করিতে হয়---কাজেই প্রথমতঃ অযথা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রেরিত মাল কিছুটা খারাপ হইবেই। তৃতীয়তঃ যদি বহনকারী যান প্রতিষ্ঠানের (Carrying Company) রসিদ (অর্থাৎ R/R অথবা BL) বিনামূল্যে সেই ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকা আদায় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় (কয়েকটী ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যাপার) এবং অনেক সময় অর্থ একেবারেই পাওয়া যায় না। চতুর্থতঃ যদি প্রেরকের কোনও প্রতিনিধি ব্যবসায়ীর নিকট উপস্থিত হইয়াও সেই ব্যবসায়ী দ্বারা মাল ছাড় না করাইতে পারে তবে প্রেরিত মালের মূল্য বাজারে অনেক কমিয়া যাইতে বাধ্য হয় (অবশ্য সর্ব্বদাই মালের মূল্য চাহিদার উপর নির্ভর করে)। যদি চাহিদা আশানুরূপ না থাকে তবে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ধারণা করেন যে প্রেরক বিপদগ্রস্ত কাজেই অধিক লাভের আশায় অল্প মূল্য দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এ হেন অবস্থায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেই নিজস্বলোক মারফৎ নগদ মূল্যে মাল বিক্রয়ের পক্ষপাতি।

তৈয়ারী মালের মান ব্যতিক্রম ও মজুরী কম

পূর্ব্বে বর্ণিত কারণ অনুযায়ী এরূপ ক্ষুদ্র শিল্প কোনও এক সময়ে "ধার ক্রয়ের" (credit purchase system) নিয়মানুবর্তী হয় এবং সাধারণতঃ সরবরাহকৃত মালের মান ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কাচা মালের মান ব্যতিক্রম পরিশেষে তৈয়ারী মালের মান নিম্ন করিয়া থাকে। কাজেই দেখা যায় এই সকল শিল্পের তৈয়ারী মালের মান ব্যতিক্রম স্বেচ্ছাকৃত নহে—বাধ্যতামূলক।

অর্থাভাবে কিংবা সময় মত তৈয়ারী মালের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমদানী অভাবে অনেক সময় "ধার ক্রয়ের" নিয়মানুবর্তী হইয়াও অনেক ক্ষেত্রে মহাজনের পাওনা অর্থ সময়মত পরিশোধ না করিতে পারায় সর্ব্বদা সরবরাহ অব্যাহত থাকে না। যে সময় শিল্প কাচা মালের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করে তখনও মজুরদের যথারীতি মজুরী দিয়া কাযোবহাল রাখিতে হয়; যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈনিক হিসাবে মজুর নিয়োজিত হয় তথাপি একত্রে সকল মজুর হাত ছাড়া মঙ্গলপ্রদ নয়। সুতরাং মজুরী ক্ষত্র বৎসরের একাংশ লাভ লোকসানের খতিয়ানে কম বেশী পাত করে না।

কাচা মালের দর সাধারণতঃ একরূপ থাকে না এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার দরের অদল বদল হইয়া থাকে। কিন্তু কাঁচামালের দরবৃদ্ধি পাইলেও এই সকল শিল্প তদনুযায়ী তৈয়ারী মালের মূল্য বৃদ্ধি করিতে সাহসী হয় না তাহার এক মাত্র কারণ—কোনও কারণে কোনও প্রকার ব্যবসায়ের দুর্যোগ সহ্য করিবার ইহাদের ক্ষমতা কম।

আত্মঘাতী নীতি

এরূপ ক্ষুদ্র শিল্পের অনেক পরিচালক ব্যবসাকে অন্য দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করিয়া অনেক সময় যে আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) পরিচালকের সাধারণ ধারণা এই—যেহেতু যথারীতি বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহার ক্রেতাকে তাহার তৈয়ারী মাল ক্রয়ের জন্য শিক্ষিত করিতে পারিতেছেন না সেজন্য যদি কোনও পাইকারী ব্যবসায়ীকে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় তবে তিনি তাহার মাল বিক্রয়ের সহায়ক হইবেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও পাইকারী ব্যবসায়ীকে অতিরিক্ত সুবিধা দিতে যাইয়া তৈয়ারী মূল্যের চেয়েও কম দরে মাল বিক্রয়ের সাহস করিয়া থাকেন। এই অসৎ সাহসের তাহার যুক্তি, যে কোনওরূপে মালের প্রচলন হইলে ইচ্ছামত মূল্যবৃদ্ধি করিলে ভবিষ্যতে এই লোকসান উঠিয়া আসিবে। কিন্তু মাল প্রচলন হইতে যে সময়ের প্রয়োজন তৎপূর্ব্বেই পরিচালককে তাহার কারবার অর্থের অভাবে উঠাইতে হয়। অথবা, যদি বা পরিচালক কিছুটা মালের প্রচলন হইয়াছে মনে করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করিতে কিংবা পূর্ব্বে ব্যবসায়ীকে যে সকল সুযোগ সুবিধা দিয়াছিল তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন তখন সেই পাইকারী ব্যবসায়ী—অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া, হয় সেই মাল স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ে অন্তরায় হন, নতুবা বহুল প্রচলিত মালের প্রতি পুনরায় আকৃষ্ট হন।

কাজেই পাইকারী ব্যবসায়ী তাহার কোনও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার না করিয়া কাজ চালাইয়া যান এবং পরিচালক তাহার অদুরদর্শিতার জন্য যে লোস্‌কান দিয়াছেন তাহা পূরণ করিতে বহু সময় অতিবাহিত করেন।

(গ) তৈয়ারী খরচের (cost of production) কম মূল্যে মাল বিক্রয়ের "অযৌক্তিকে প্রতিযোগিতা" নামাকরণ করা যাইতে পারে। ইহাতে সাধারণতঃ কেহই উপকৃত হইতে পারেন না। অনেক সময় প্রতিযোগী মনোভাব নিয়া বাজারে মাল বিক্রয় চাহিদাই নষ্ট করা হয় এবং এরূপ অযৌক্তিক প্রতিযোগিতা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

পরিবহন অসুবিধা

বর্ত্তমানে এই সকল ক্ষুদ্র শিল্প পরিবহন অসুবিধার জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই বিশাল দেশের আসাম প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটী জেলা যথা :—জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, কুচবিহার ও দিনাজপুর প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। পাকিস্তানের মধ্য দিয়া যদিও রেলপথ বর্ত্তমান কিন্তু মাল প্রেরণের কোনও থ্রু বুকিং ব্যবস্থা না থাকায় আসামের সহিত অধুনা স্থাপিত প্রশংসনীয় "আসাম রেল লিঙ্ক" রেলপথ ব্যতীত একমাত্র যোগ সূত্র ষ্টীমার কোম্পানীগুলি রক্ষা করিতেছে। অতিরিক্ত মাল প্রেরণ চাহিদা মিটাইতে আসাম রেল লিঙ্ক বর্ত্তমান অবস্থায় অসমর্থ—কাজেই আসাম ও বিচ্ছিন্ন পশ্চিমবঙ্গের জেলা সমূহের স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী পণ্য দ্রব্য বহন আশা সুদূরপরাহত সুতরাং যোগ সূত্রের একমাত্র অবলম্বন ষ্টীমার কোম্পানীগুলি। অতিরিক্ত মাল প্রেরণ অনুমতির চাহিদার জন্য পালা অনুসারে ষ্টীমার কোম্পানী হইতে প্রেরণ অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু ষ্টীমারগুলি উপরোক্ত স্থানে যাইতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া যায় সেজন্য পূর্ব্বেই স্থল শুল্ক বিভাগীয় অনুমতি সহ ষ্টীমার কোম্পানীর নিকট হইতে পুনরায় প্রেরণ অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। স্থল শুল্ক বিভাগীয় ও ষ্টীমার কোম্পানীর অনুমতি গ্রহণান্তে মাল প্রেরণ করিতে ন্যূনকল্পে ৩ সপ্তাহ হইতে ৫ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সময় ব্যয় হইয়া থাকে। এতো অতিরিক্ত সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ক্ষুদ্র শিল্পগুলির পক্ষে সম্ভবপর নয় কাজেই অতিরিক্ত ব্যয় ভার বহন করিয়াও বিমানযোগে মাল পাঠাইতে বাধ্য হয়। ষ্টীমার ও বিমানযোগে প্রেরিত মালের মন করা গড় পড়তা তুলনামূলক পার্থক্য ১০।১২৲ টাকা।

বৃহৎ শিল্পের এই পরিবহন সমস্যা এতো কঠিন নয়। বৃহৎ শিল্প যেহেতু অধিক অর্থ অধিক সময়ের জন্য নিয়োগ করিয়া স্থিরভাবে পরিকল্পনানুযায়ী—অল্পব্যয়ে সমস্যা সমাধান করিতে পারিতেছে।

প্রস্তাব (Suggestions)

এই সকল অসুবিধা কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত কোনও একটী ক্ষুদ্র শিল্পের বণিক মিলনী (Trade union অথবা Chamber of commerce) বহুল পরিমাণে দূরীকরণে সমর্থ। গভর্ণমেণ্ট হয় আইন দ্বারা না হয় কোনও বিশেষ ক্ষমতাবলে এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পকে প্রয়োজনানুরূপ বাৎসরিক চাঁদা দিয়া এই অনুমোদিত মিলনীর সভ্য হইতে নির্দ্দেশ দিবেন। গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশের জন্য আমার আমন্ত্রনের উদ্দেশ্য যে পাওনা মামলাগুলির (claim cases) নিষ্পত্তির (agreed settlement) জন্য গভর্ণমেণ্ট মনোনীত কয়েকজন সদস্যের এই মিলনী বা চেম্বারের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য হওয়া প্রয়োজন। কাজেই এই কার্য্যকরী সমিতির যদি কোনও গভর্ণমেণ্ট সদস্য না থাকেন তবে এই সকল নিষ্পত্তি মামলায় যথারীতি অব্যবস্থা চলিতে থাকিবে। ক্ষুদ্র শিল্পের এই সকল মামলা একটী গুরুতর সমস্যা। উপযুক্ত লোকাভাব ও অর্থাভাব সর্ব্বদাই এই সকল ব্যবসার ভিত্তিতে আঘাত করিতেছে তদুপরি কোনও পাওনা মামলার দুশ্চিন্তা পরিচালকের নিকট অসহনীয় কাজেই যাহাতে সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিন্ত মনে ক্ষুদ্র শিল্প তাহার অভাব অভিযোগ উপযুক্ত সদস্যের নিকট বিবৃত করিয়া পাওনা অর্থ আশু লাভ করিতে পারে তাহার দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যখন সকল ক্ষুদ্র শিল্পগুলি প্রস্তাবিত চেম্বারের যথারীতি সভ্য হইবেন তখন সকল সদস্য অন্ততঃ পাঁচ জন সদস্যকে কার্য্যকরী সমিতির সভ্য হিসাবে মনোনয়ন করিবেন ও গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত অফিসগুলি হইতে ন্যূনকল্পে একজন করিয়া সভ্য মনোনয়ন করিবেন :—

(১) রেলওয়ে বিভাগ হইতে একজন
(২) বিক্রয় কর " " "
(৩) আয় কর " " "
(৪) ডাক " " "

ও নিম্নলিখিত বেসরকারী অফিস হইতে একজন করিয়া মোট ৪ জন।

(১) ষ্টীমার কোম্পানীর একজন
(২) এরোপ্লেন " "
(৩) ইনসিওরেন্স বা বীমা কোম্পানীর একজন
(৪) ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসন (clearing Banks Association) হইতে একজন।

—মোট সদস্য সংখ্যা ১০ জন। এই সমিতি মাসে অন্ততঃ একবার মিলিত হইবে। এই কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মনোনয়ন করিবেন কিন্তু কোনও বিষয়ের মীমাংসা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা নিরূপিত হইবে।

ইহাতে এরূপ আশা করা যায় যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি তাহাদের বক্তব্য যথারীতি যথার্থ ব্যক্তি বিশেষের নিকট ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইবে ও এভাবে গভর্ণমেণ্ট কিংবা বে-সরকারী অফিস সমূহের পাওনা মামলা নিষ্পত্তির জন্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অনিশ্চিয়তার মধ্যে কালক্ষেপ করিতে হইবে না। অনেকক্ষেত্রে ইহাই পরিলক্ষিত হয় যে অপরিমিত লোক হেতু কিংবা সাময়িক অজ্ঞতার জন্য এই শিল্প আইনের হস্তে গুরু দণ্ডলাভ করিয়া থাকে কিন্তু শিল্পের অবস্থা বা পরিনাম যে কি হইবে তাহার প্রতি দৃকপাত করা হয় না।

বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও তাহাদের সহজভাবে অর্থ নিয়োজন আবশ্যক

আমি পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি বর্ণনা করিবার সময় কি ভাবে এই সকল শিল্পে ব্যবসায়ের মূলধন ভীষণ ভাবে কুজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা বুঝাইতে

চেষ্টা করিয়াছি। কাজেই এই ভীষণ দৈন্য অবস্থা হইতে কি ভাবে নিয়োক্তরূপে এই সকল শিল্পকে বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি সাময়িক কিছু অর্থ আগাম দিয়া তাহাদের কার্য্যকরী মূলধনের সহায়তা করিতে পারে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) ক্ষুদ্র শিল্পের মিলনীর কিংবা চেম্বারের সুপারিশ মত কোনও মনোনীত ব্যাঙ্ক সভ্য শিল্পকে অতি অল্প সময়ের জন্য অর্থ আগাম সুবিধা দিতে পারেন। বৃহৎ ব্যাঙ্ক শিল্পের ব্যবসা রীতি বা পদ্ধতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া কোনও ক্রমেই পূর্ব্ব বৎসরের বার্ষিক বিক্রয়ের গড় হিসাব করিয়া মাসিক বিক্রয়ের ½ অংশের অধিক আগাম দিবেন না। প্রথম অবস্থাতে এই আগাম অর্থ কেবলমাত্র ৪৫ দিনের জন্য প্রদত্ত হইবে।

(খ) কোনও শিল্পকে অর্থ আগাম দিবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক বিশেষ ন্যূনকল্পে উক্ত শিল্পের ব্যবসাপদ্ধতি বিশেষ রূপে বিচার করিবার জন্য ছয়মাস সময় পাইবেন। ছয়মাস অন্তে যদি শিল্পের ব্যবসাপদ্ধতি আশানুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তবেই শিল্প আগাম অর্থ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(গ) অর্থ আগামকালে ব্যাঙ্ক শিল্পের পূর্ব্ব পরিচয় ও ব্যবসার অর্থ লেনদেনের হিসাব, পরিচালকের কার্য্যপদ্ধতি বিচার করিয়াই কোনও জামিন ব্যতীত সৎবিশ্বাসে অর্থ আগাম করিবেন। আগাম অর্থ প্রতি তিন মাস অন্তর শিল্প বিশেষ সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। যদি কোনও কারণবশতঃ শিল্প বিশেষ নিয়মানুযায়ী তিন মাস অন্তর অর্থ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হয়, ব্যাঙ্ক যথারীতি ক্ষুদ্র শিল্পের কার্য্যকরী সমিতি সমীপে এই বিষয় ব্যক্ত করিবেন। কার্য্যকরী সমিতির রায়ের পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক কোনও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না। কার্য্যকরী সমিতি অবশ্যই এই বিষয়ে তাহাদের নিরপেক্ষ অভিমত, অভিযোগ প্রাপ্তির তিন সপ্তাহের মধ্যেই জ্ঞাত করাইতে বাধ্য থাকিবেন। কার্য্যকরী সমিতি অনুসন্ধানান্তে যদি নিশ্চিত রূপে বিশ্বাসী হন যে কোনও অপরিকল্পিত দুর্ঘটনা, কিংবা অন্য কোনও কারণবশতঃ (যাহা পরিচালকের ক্ষমতা বহির্ভূত) সাময়িক ভাবে অর্থ অবরুদ্ধ হইয়াছে তখন কার্য্যকরী সমিতি ব্যাঙ্ক বিশেষকে কিছু সময়ের জন্য অনুরোধ করিতে পারেন এবং (সেই সময় কোনও ক্রমেই ১৫ দিনের কম নহে ও ১ মাসের ঊর্দ্ধে নহে) সময়ান্তে শিল্প বিশেষ আগাম অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ডাক বিভাগীয় অর্থ প্রেরণ ব্যবস্থা, তাহাদের অসুবিধা এবং তাহাদের আশু উন্নয়ন আবশ্যক

এ দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অপ্রতুল তাহা প্রায় প্রবাদবাক্যরূপ। জন-অর্থ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে ব্যাঙ্কের পর ডাক ও তার বিভাগ একটী প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। কেন ক্ষুদ্র শিল্পগুলি মফঃস্বলে মাল বিক্রয়ের পক্ষপাতী তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে কাজেই ব্যাঙ্ক অভাবে ঐ সকল স্থান হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রেরণের একমাত্র মধ্যম ডাকবিভাগ। মণি অর্ডার, ইনসিওরেন্স উভয়ই ব্যয় সাপেক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা। উপরোক্ত দুইটী নিয়ম ব্যতীত পোষ্টেল অর্ডার (Postal Order) মারফৎও অর্থ প্রেরণ সম্ভব কিন্তু প্রথমতঃ যে সকল স্থান আমাদের আলোচ্য বিষয় সেই সকল স্থানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পোষ্টেল অর্ডার বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হয় না, দ্বিতীয়তঃ শতকরা কমিশন হার ৷৷৵০ এবং অধিক অর্থ প্রেরকের কোনও অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয় না। কাজেই সহজসাধ্য ব্যবস্থা মণি অর্ডার। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে সাহায্য করিতে পারেন :—

(১) মণি অর্ডার কমিশন কেবলমাত্র রেজিষ্টার্ড ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক কমিশনের অনুরূপ আদায় করা হইবে (শতকরা ৵০ হইতে ।৵০ ন্যূনকল্পে ৷৷০ কমিশন হিসাবে সকলেরই দেয়)

(২) যে ঘাটতি ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অর্থ প্রেরণের জন্য হইবে তাহা শিল্পগুলির নিকট হইতে অধিকাংশই অগ্রিম বাৎসরিক লাইসেন্স ফি বাবদ আদায় করা যাইবে (যেরূপ বিজনেস্ রিপ্লাই কার্ড ও এনভেলোপের, পোষ্ট বক্স ও টেলিগ্রাফিক এড্রেস ইত্যাদি ইত্যাদি)।

নৌ-বীমা, প্রেরিত মালের বিলম্বিত উপস্থিতি এবং তাহাদের সাময়িক আংশিক অর্থ দ্বারা পাওনা অর্থ নিষ্পত্তি।

এই সকল শিল্পের প্রেরিত মাল (বিশেষতঃ এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া গমনকারী মাল, বিমানযোগে প্রেরিত মাল) নৌ বীমা দ্বারা দায়াবদ্ধ করার একান্ত প্রয়োজন। স্থির ও ক্রম উন্নতির জন্য এই সকল শিল্পের কোনওরূপেই কোনও দায় বহন করা বাঞ্ছনীয় নহে কাজেই প্রত্যেক প্রেরিত মাল না পৌঁছায়, চুরির, কিংবা বিমান সংঘর্ষের দরুণ সকল দায় বীমাদ্বারা আবদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। কোনও কারণে অর্থ যদি অবরুদ্ধ হয় তবে বীমা কোম্পানী তাহার সকল দায় বহন করিয়া শিল্পের আশু বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে নচেৎ এই অবরুদ্ধতা, মজুরদের জন্য বৃথা মজুরী ক্ষয়ে, অর্জ্জিত সুনামের হানী ও মাল সরবরাহ-কারীদের নিকট অনাস্থা আনয়ন করে। নৌ-বীমার "অপ্রত্যার্পণ" (Non-delivery) সংজ্ঞা এই ভাবে বিচার করিতে হইবে যে মাল প্রেরণের (৪৫ দিনের মধ্যে যদি প্রেরিত মাল ষ্টীমার যোগে হয়, ২১ দিনের মধ্যে যদি পার্শেল ট্রেণে হয়, ৩০ দিনে যদি গুড্‌স্ ট্রেণে হয় এবং ৭ দিনে যদি বিমান যোগে হয়) পর গন্তব্যপথে পৌঁছিবার সাধারণ সময় অতিক্রম করার পর বীমাকারী শিল্প বীমা কোম্পানীর নিকট ঊর্দ্ধ সংখ্যায় বীমাকৃত অর্থের অর্দ্ধ অর্থ সাময়িক সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিবার অধিকারী হইবেন এবং বীমা কোম্পানী যথারীতি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া (ঊর্দ্ধ পক্ষে ৭ দিনের মধ্যে) সেই আংশিক দায় মিটাইবার ২১ দিন পর মাল যদি যথারীতি গন্তব্যস্থানে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে তবে এই আংশিক অর্থ একত্রে মাল ছাড় করার ৭ দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে বীমাকারী শিল্প বাধ্য থাকিবেন। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে সাকুল্য অর্থ প্রত্যার্পিত না হয় তবে উক্ত অর্থের উপর শতকরা ১২½% হিসাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বহন করিয়া ১½ মাসের মধ্যে অবশ্যই শোধ করিতে হইবে। উক্ত সময়ান্তে যদি সম্পূর্ণ অর্থ প্রত্যার্পিত না হয় তবে বীমা

কোম্পানী কার্য্যকরী সমিতির অনুমতী ব্যতীতই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। তবে কোনও মনোমালিন্যের সালিস হিসাবে কার্য্যকরী সমিতির সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে।

পরিদর্শনকারী উপ-সংসদ

ক্ষুদ্র শিল্পের কার্য্যকরী সমিতি হইতে ন্যূনকল্পে তিনজন, ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৫ (পাঁচ) জন সভ্য পরিদর্শনকারী সভ্য হিসাবে মনোনীত হইবেন। এই সভ্যেরা যে কোনও শিল্প পরিদর্শন কার্য্যপ্রণালী সংশোধন, নিরপত্তামূলক পরামর্শ এবং প্রয়োজনানুসারে যে সকল সৎপরামর্শ বা সহায়তা করা সভ্যেরা স্থির মনে করেন তাহা কার্য্যে রূপান্তরিত করার অধিকারী থাকিবেন। পরিদর্শনকারী সভ্যদের মধ্যে

(১) একজন অবশ্যই দক্ষ হিসাবপরীক্ষক (Chartered Accountant) হইবেন।

(২) একজন অবশ্যই দক্ষ কারীকর (Qualified Technician) হইবেন।

(৩) একজন অবশ্যই মাল বিক্রয় সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন।

পরিসমাপ্তি

পরিশেষে আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে উপরোক্ত সকল বাধা কেবলমাত্র গভর্ণমেন্ট সহযোগীতায় অবশ্যই দুরীকরণ সম্ভব। যদি কোনও আইন দ্বারা কিংবা বিশেষ ক্ষমতা বলে এই শিল্পগুলিকে রক্ষা না করা হয় তবে যে জাতীয় অর্থ বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে তাহা রোধ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইবে। আমি এই প্রবন্ধে জনসাধারণের আরও সুষ্ঠু অভিমত, পরামর্শ বা সমালোচনার জন্য সানন্দে আমন্ত্রণ জানাইতেছি। আমার বিশেষ আমন্ত্রণ সংবাদ সেবী ও সংবাদ সম্পাদকের উদ্দেশ্যেই—এবং আশাকরি ও স্থির বিশ্বাস পোষণ করি যে তাঁহাদের সবল কণ্ঠে যে অশেষ দুর্গতির ছায়া শিল্পের সম্মুখে ক্রমে ক্রমে গাঢ় রেখাপাত করিতেছে তাহা ঘোষিত হইবে ও তাঁহাদের পূর্ণ সহযোগীতা ও সহানুভূতিতে রেখা ম্লানতর হইয়া জাতীয় সম্পদ রক্ষায় সহায়তা করিবে।

মনের কথাটি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

যদি কোনও দিন সন্ধ্যা বেলায় তোমারে একেলা পাই
নির্জ্জন পথে, ধারে কাছে কেহ নাই,—
অথবা নিরালা ঘরের একটি কোণে
কেহ কোথা নাই,—মুখোমুখী দুইজনে,
চঞ্চল মন, চঞ্চল দু'নয়ন
সারা অন্তরে উদ্দাম আলোড়ন
এ উহার পানে চেয়ে থাকে,—তবু কথা জোয়ায় না মুখে
না-বলা কথার যম-যন্ত্রণা বুকে ;
ঠিক সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তে একেলা তোমার সনে
হাতে হাত রাখি মনের কথাটি বলিব সংগোপনে।

যদি কোনও দিন মনে পড়ে যায় অলস দু'পর বেলা
এতদিন বৃথা মন নিয়ে তুমি করিয়াছ ছেলে-খেলা,
ভাল লাগেনাক বিনিয়ে বিনিয়ে কথা
যারা এসেছিল তারা ত বুঝেনি তোমার প্রাণের ব্যথা,
সোহাগে আদরে রেখেছিল শুধু করেনিক সমাদর
ভোগবতী নদী খর-তরঙ্গে অবগাহনের পর
তারা আনপথে চলে গেছে কবে, তোমারে গোপন করি,
যদি বুঝে থাক এমনিত হয়,—ফোটাফুল যায় ঝরি।
বিরল ভবনে প্রেতছায়াসম তাহাদের স্মৃতিগুলি
তোমার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে যদি হয়ে গিয়ে থাকে ধূলি,—
দিবা-স্বপ্নের ক্ষণমাধুর্য্যে মধুর মদিরাবেশে
দেখিবে দুয়ারে দূরের বন্ধু নীরবে দাঁড়াল হেসে।

তুমি ত জানো না কোন সে বন্ধু, তোমারই পথের ধারে
পথ চলিবার অছিলায় কেন আসিয়াছে বারে বারে ;
তুমি চলে গেছ পায়ের চিহ্ন পড়েছে ধূলার 'পরে
খোলা জানালায় সন্ধ্যার দীপে ছায়া পড়িয়াছে ঘরে,
তোমার মনের আলোকে সেদিন উজ্জ্বল দীপশিখা
আমার মনের পাতায় পাতায় লিখিল প্রণয়-লিখা।
ফুল-উৎসবে উতলা রজনী আকাশের নিদ নাহি,
দখিনা পবনে জাগে শিহরণ ; তোমার প্রসাদ চাহি'
দূর হ'তে আমি বাজাইয়া বাঁশী ব্যাকুল করেছি রাতে
আজি এ প্রাণের গীত-মূর্চ্ছনা মূর্চ্ছিত বেদনাতে।
আজি মনে হয় উৎসব শেষে নিতান্ত তুমি একা,
তাইত এলাম দুয়ারে তোমার যদি পাই তব দেখা ;
নিরালায় শুধু মনের কথাটি বলে যাব কানে কানে,
যুগ কেটে গেছে ইহারি লাগিয়া চিরঅশান্ত প্রাণে।

শিল্পগুরু পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধানে

অসিতকুমার হালদার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　শিল্পী—বিশ্বরাজ [illegible]

দেশের পূজার বেদির 'পরে
　　বর্ণ-তুলির কবি
জ্বালিয়ে আলো দিকবিদিকে
　　কোথায় গেলে চলি—
দিব্যলোকের অঙ্গনেতে
　　সেথায় আছেন রবি
গেলে কি হায় হ'ল সময়
　　রঙ ফলাবে বলি ?
নিত্য হেথায় আসবে যাবে
　　রাষ্ট্রপতির দল
খুদ-কুঁড়োটি থাকবেনাতো
　　তাদের কিছু বাকি,
তোমার আঁকন স্বপন-গড়া
　　রত্ন সমুজ্জ্বল
দেশের হাতে রইল বাঁধা
　　সকল কালের রাখি।
কাজ তো তোমার ফুরোয়নিক'
　　তোমার কাজের বিধি
পথ দেখাবে পথিক জনে
　　কল্পলোকের পথে,
স্বচ্ছ হৃদয় পায় যদি সে
তোমার রসের নিধি
পাবেই পাবে অন্তরেতে
　　ছুটবে আলোর রথে,—
রূপক রূপের হদিস পাবে
জীবন মধুরতর
ভাবের ভাষা বর্ণে পাবে
　　রেখায় রেখায় ভরি,
দেশের দশের পূজার রবে প্রফুল্ল অন্তর
　　দেখবে যারে চিত্ত পটে
　　　　রাখবে চিত্রে ধরি।
ধরার সুধার সোয়াদ তব রাখলে জীবন দিয়া
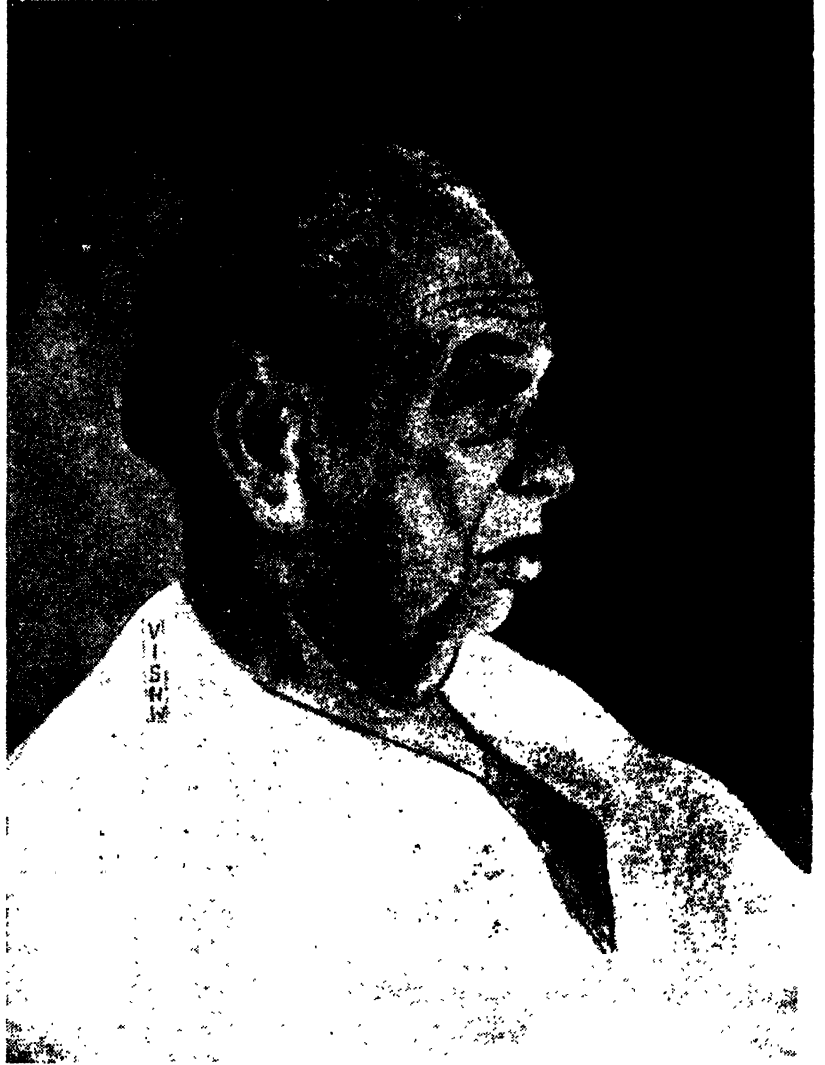
রেখায় লেখায় রঙীন দীপে
　　জগৎ মাঝে জ্বালি,
দেবতা, এখন গেলে কোথায় কাহার বাণী নিয়া
নিত্য যেথায় বাজান বাঁশী—মধুর বনমালী !

কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের দৃঢ়তা—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ৪০জন খ্যাতনামা কর্ম্মী নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করায় তাঁহাদের ৫ বৎসরের জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু যাঁহারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া ও নির্বাচন ব্যাপারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ এই দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করায় কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের নিয়মানুবর্ত্তিতাই প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব নহে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী প্রথম দিনে (৫ই ডিসেম্বর) মাত্র ৪০জন প্রধান কর্ম্মীর সম্পর্কে ব্যবস্থা করিয়াছেন—পরে অন্যান্য যে সকল কর্ম্মী ঐরূপ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস যে জীবন্ত আছে, তাহাও প্রমাণ পাইবে। নির্বাচনের পূর্বেই সকল বিরোধী কর্ম্মীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জনে দেশবন্ধুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা—

গত ২৫শে নভেম্বর চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার প্রধান কার্য্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের এক আবক্ষ মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের যানবাহন মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন যে কারখানার শতকরা ৯৫ ভাগ যন্ত্র বসানো হইয়াছে—১৯৫৪ সালে ১২০খানি এঞ্জিন ও ৫০টি বয়লার প্রস্তুত হইয়া বাহির হইবে। পূর্বে বিলাত হইতে রেলের এঞ্জিন ও বহু সরঞ্জাম আমদানী করা হইত—এই কারখানায় আর ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ভারতের প্রয়োজনীয় সকল রেল-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইবে। বাংলার অন্যতম সুসন্তান দেশবন্ধু দাশের নামের সহিত এই কারখানা অঞ্চলের নাম সংযুক্ত হওয়ায় দেশবাসী আনন্দিত হইবেন এবং দেশবন্ধুর মূর্তি ঐ অঞ্চলের কর্মীদের সর্বদা প্রেরণা দান করিবে।

রাষ্ট্র ধর্ম-হীন নহে—

গত ২৫শে নভেম্বর মাদ্রাজের কোট্টায়ামে এক জন-সভায় কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—ভারত রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ হইলেও ধর্মহীন নহে। ভারত-বাসী সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা সম্মান করে—কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্র অধিক সম্মান দেয় না। পরস্পর সম্মান ও সহন-শীলতার মধ্য দিয়াই ভারত রাষ্ট্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভারত-সম্রাট অশোকও এই ধর্মই রক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা যদি প্রত্যেকে অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা সম্মান করি, তবে সকলেই ধর্মপ্রাণ হইয়া উন্নতির ও সাম্যের পথে অগ্রসর হইব। ভারত রাষ্ট্রের ধর্ম-ভাব সম্বন্ধে লোক যেন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে।

পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা—

ঢাকা হইতে খবর আসিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে প্রায়ই নিষ্প্রদীপের মহড়া চলিতেছে। সেখানে আর্থিক দুরবস্থা অত্যন্ত অধিক—পাটের দর ও চাহিদা ক্রমান্বয়ে কমিয়া যাইতেছে—ফলে পাট চাষীদের উদ্বেগ ও দুঃখের অন্ত নাই। পাটের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দেওয়ার দাবীও রক্ষিত হয় নাই। সেখানে নিষ্প্রদীপ করিয়া যুদ্ধের কথা বলিয়া লোককে সকল প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে বলা হইতেছে—ইহা সত্যই যুদ্ধের পূর্বাভাস কিনা বুঝা যাইতেছে না। ওদিকে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গ প্রায়ই আক্রান্ত হইতেছে। ইহা যে সরকারী পুলিসবাহিনী কর্তৃক বা তাহাদের সহিত সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহার

লিখিত প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই করা হয় নাই। ইহার ফলেও লোক ক্রমে আতঙ্কগ্রস্ত হইবে—সীমান্তে লোকের পক্ষে বাস করা ভীতিজনক হইবে। ইহার প্রতীকারের উপায়—চিন্তার বিষয়।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের মিশন—

ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃক প্রেরিত হিন্দু সংস্কৃতি প্রচারক দলের কর্ম্মী ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ গত ২৮শে আগষ্ট ত্রিনিদাদ হইতে বিমান ডাকে জানাইয়াছেন—"আমরা গত ৮ মাসে ত্রিনিদাদের প্রায় ৩২টি সহরে ঘুরিয়া প্রচার করিয়াছি। মোট ৩৬১টি জনসভা, ১৪৯টি বৈদিক যজ্ঞ, ১১৩টি ভক্তগৃহে পূজা, আরতি ও বক্তৃতা, এবং ১১টি বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মিলন হইয়াছিল। হাজার হাজার হিন্দু খৃষ্টান আচার ও ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল—তাহারা পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। একজন বিখ্যাত নিগ্রো নেতা ও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনী চিকিৎসক আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সংঘ হইতে এখানে গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত, বৈদিক, প্রার্থনা, তুলসী-দাসের রামায়ণ, সত্যনারায়ণ ব্রত কথা প্রভৃতি পুস্তক বিনামূল্যে বহু সংখ্যায় বিতরণ করা হইয়াছে। ৮টি সহরে নূতন মন্দির ও ৫টি হিন্দী পাঠশালা খোলা হইয়াছে। স্বামী পূর্ণানন্দ এখানে থাকিবেন, তিনি সংগঠন ও প্রচার কার্য্যে সুদক্ষ। এইবার আমরা দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটীশ গিয়ানা ও ওলন্দাজ গিয়ানায় যাইব। সেখানের কাজ শেষ করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে।" ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃটীশ গিয়ানার জর্জ টাউন হইতে রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—"বৃটীশ গিয়ানা একটি বিরাট প্রদেশ, কিন্তু বসতি খুব কম। স্বর্ণখনি ও চিনির চাষের জন্য বিখ্যাত। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে চিনির কলের শ্রমিক হিসাবে এখানে ভারতীয়গণ আসে—এখানকার ৪ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১লক্ষ ২০ হাজার হিন্দু—আর ১লক্ষ ৬৮ হাজার ভারতীয়। হিন্দুরা অত্যন্ত গরীব। হিন্দুরা হিন্দী ভাষা জানে ও ধর্মপ্রাণ। বিমান ঘাঁটি হইতে জর্জ টাউন সহর ১১ মাইল—৩২খানি মোটরের একটি শোভাযাত্রা করিয়া আমাদের সহরে আনা হয়। সহরে পৌছিবামাত্র রেডিও হইতে আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানানো হয় ও শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলিতে ফটো দিয়া প্রথম পাতায় খবর ছাপা হইয়াছে। পথে শোভাযাত্রা দর্শনকারী জনগণ ৪।৫ স্থানে আমাদের গাড়ী থামাইয়া পুষ্প বৃষ্টি করিয়াছে ও মালা দিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত পথের ধারে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও নমস্তে বলিয়াছে। ত্রিনিদাদের হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলেও তাহারা ভারতীয় রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছে, এখানে

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাংস্কৃতিক মিশনের অন্যতম সদস্য ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ ও দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ টি-ই-বাক

তাহা হয় নাই। এখানে ৪ মাস থাকিয়া আমরা ওলন্দাজ অধিকৃত সুরিনাম প্রদেশে যাইব, সেখানে ৬০।৬৫ হাজার হিন্দু আছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর গভর্ণর হলে সম্বর্দ্ধনা হইল, ১৬ই সেপ্টেম্বর টাউন হলে সম্বর্দ্ধনা হইবে। ৪জন আসিয়াছিলাম—একজন দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, একজন ত্রিনিদাদে রহিলেন—কাজেই এখন ২জনকে সব কাজ করিতে হইবে।" ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ হইতে এই যে বিরাট কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ-

ভাবে সম্পাদন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন—আমাদের বিশ্বাস ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীদের সাহায্যে সংঘ-কর্তৃপক্ষ এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে শেষ করিতে সমর্থ হইবেন।

অমরাবতীতে (মধ্য প্রদেশ) দুর্গাপূজা—

অমরাবতী প্রবাসী বাঙ্গালীদের উদ্যোগে এ বৎসর তথায় খুব ধূমধামের সহিত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বেরারের ইতিহাসে ইহাই সেখানে প্রথম দুর্গাপূজা। পাঁচদিনব্যাপী উৎসব হয় এবং দশমীর দিন দীর্ঘ শোভাযাত্রাসহ স্থানীয় পুষ্করিণীতে দেবী প্রতিমা

অমরাবতীর দুর্গোৎসব

বিসর্জন করা হয়। মধ্যপ্রদেশের আয়কর মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপি, কে, দেশমুখ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই পূজায় বাঙ্গালা দেশ হইতে ঢাক (বাজনা) আনান হইয়াছিল। এই বাদ্যযন্ত্রটি এখানে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া ইহা স্থানীয় সকলকে বিশেষভাবে আনন্দ দিয়াছে। বাঙ্গালীদের সংখ্যা এখানে খুবই সামান্য—মাত্র ১৮।১৯ ঘর। তাঁহাদের সকলের এই মিলিত উদ্যম ও প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

কবি দীনেশ দাসের সম্বর্দ্ধনা—

গত ২১শে অক্টোবর তারিখে হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর হাটতলায় এক সাহিত্য-সভায় কান্তে-কবি দীনেশ দাসকে সম্বর্ধিত করা হয়। রামচন্দ্রপুরের পাশেই কাইসাঙ্গড়া গ্রামে দীনেশবাবুর পৈতৃক বাসভূমি। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসুবোধমোহন ঘোষ। স্থানীয় কর্মী ও সাহিত্যিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এই সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বসিরহাটে আংশিক বরাদ্দ ব্যবস্থা—

যে সকল স্থানে ধান উৎপন্ন হয়, যে সকল স্থানে রেশনিং বা খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা নাই—বর্তমান অনটনের জন্য যে সকল স্থানে শুধু চিনি ও আটা বা গম দিবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু গত কয়মাস ধরিয়া চাউলের মূল্য সর্বত্র অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সর্বত্র রেশনিং প্রথা প্রচলনের দাবী করা হইতেছে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর হইতে সেজন্য বসির হাটে আংশিক বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ফলে প্রতি সপ্তাহে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ককে দেড় সের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ককে ১সের করিয়া তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য দেওয়া হইবে। ইহার ফলে লোকের অভাব কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইবে আশা করা যায়। সর্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে বর্তমান সময়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে ধান্য সংগ্রহ করা সম্ভবও

হইবে না। খাদ্য সমস্যা মানুষকে এক অধিক বিব্রত করিয়াছে এবং অব্যবস্থার ফলে তাহা এরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে সত্বর তাহার প্রতীকার না করা হইলে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

নূতন রাজ্যপাল ও ইংরাজি শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গের নূতন রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত ২৬শে নভেম্বর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১তম সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা হইতে ইংরাজিকে বাদ দেওয়ার কথা চলিয়াছে; এই ব্যবস্থা আদৌ ভাল হইবে না। ইংরাজি বর্তমানে সমগ্র জগতের লোকের ভাষা হইয়াছে—ইংরাজির মারফতে সারা বিশ্বের সহিত আমরা সংযোগ রক্ষা করিতে পারিব। বক্তৃতার শেষে তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রণালীর প্রশংসা করেন ও দেশের সর্বত্র যাহাতে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়, সে জন্য আবেদন জানান। ইংরাজি শিক্ষাও যাহাতে সর্বত্র প্রচলিত ও অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্য তিনি সকলকে মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় গত ৫০ বৎসর কাল শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী আছেন—কাজেই এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

উত্তর প্রদেশে খাদ্য সঙ্কট—

গত ২ বৎসর উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে শস্য উৎপাদন ভাল না হওয়ায় দেড় কোটিরও অধিক লোক খাদ্য সঙ্কটে পড়িয়াছে। ৯ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন হইত—এবার মাত্র ৩ লক্ষ টন খাদ্য পাওয়া যাইবে। বালিয়া, গোণ্ডা, বস্তি, গোরক্ষপুর, দেওরিয়া, আজমগড় জেলা এবং গাজিপুরের অর্দ্ধাংশে খাদ্য সঙ্কট অত্যাধিক হইয়াছে। আজমগড়ের কতকগুলি অংশে গত ৪ বৎসর বৃষ্টিপাত হয় নাই। উত্তর প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট এই খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক বন্দুক চালনা প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধি—

ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিক বন্দুক চালনা প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ কলিকাতা রাইফেল ক্লাব হইতে শ্রীনৃপেন সরকার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। এই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় এই প্রকার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলেন। কানডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রবীণ দক্ষ বন্দুক চালনাকারীদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইনি কয়েকটী বিষয়ে শতকরা ১০০ পয়েণ্ট অর্জ্জন করায় সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পূর্ব্বে

আন্তর্জাতিক রাইফেল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় (বাঙালী) প্রতিনিধি শ্রীনৃপেন সরকার

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও জার্ম্মানীর রাইফেল ক্লাব সমূহে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন।

আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত—

শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন আই-সি-এস গত ২২শে নভেম্বর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯২২ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের কাজ করার পর ১৯৫০ সালে তিনি ইটালীর রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মার্কিণে রাষ্ট্রদূতের পদত্যাগ করায় শ্রী সেন সেই পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল

ওয়াসিংটনে রাষ্ট্রদূতাবাসের সচিব ছিলেন। তাঁহার এই নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত ১৯শে নভেম্বর হইতে শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ধর্মাধিকরণের আদিম বিভাগের স্থায়ী নিবন্ধক (রেজিষ্ট্রার) পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি গত ২০শে এপ্রিল হইতে অস্থায়ীভাবে ঐ পদে কাজ করিতেছিলেন। বৃটীশ শাসনের সময়ে পদটি শ্বেতাঙ্গ এটর্নীদিগের একচেটিয়া ছিল। শচীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের সহিত

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকল পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৯২৫ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল হন ও ১৯২৯ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার পদ লাভ করেন। ক্রমে তিনি ডেপুটী রেজিষ্ট্রার, এসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টার ও রেফারি, ইন্‌সল্‌ভেন্সি রেজিষ্ট্রার এবং মাষ্টার ও অফিসিয়াল রেফারী হইয়াছেন। ইনি নানা জন-প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংযুক্ত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটের অন্যতম বিভাগীয় সভাপতি। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েসন, বয় স্কাউট এসোসিয়েসন, অটো-মোবাইল এসোসিয়েসন, বেঙ্গল রেষ্টনিং এসোসিয়েসন প্রভৃতির সহিতও ইনি সংশ্লিষ্ট। ইনি অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রায় বাহাদুর ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। আমরা তাঁহার এই পদপ্রাপ্তিতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

স্তোত্ররত্নম্—

'আনন্দ বাজার পত্রিকা' সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি বহু অনুসন্ধানের পর শ্রীযামুনাচার্য্য বিরচিত স্তোত্ররত্নম্ নামক এক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ৬৫টি শ্লোক ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এই স্তোত্রে ভক্তিরসের যে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়াছে জগতে তাহার তুলনা দুর্লভ। বাঙ্গালা দেশে এই অপূর্ব অধ্যাত্ম সম্পদের প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া চপলাকান্তবাবু সুধীবৃন্দের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। স্তোত্ররত্নম্ রচয়িতা যামুন মুনি ৯৩৫ খৃষ্টাব্দে মাদুরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন—ইনি জগদ্‌গুরু নামে পরিচিত ছিলেন। ৩১ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে বাস করেন ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রখ্যাত রামানুজাচার্য্য যামুন মুনির পৌত্রী-পুত্রও তাঁহার শিষ্য। সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"বাক্য ও মনের অতীত অথচ বাক্য ও মনের আশ্রয় যে মহৎ সত্তার অপূর্ব উপলব্ধি এই স্তোত্রের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ তাঁহারই উদ্দেশ্যে আমার শেষ প্রণতি।" পুস্তকখানির মূল্য মাত্র বারো আনা।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—

বাঙ্গলার প্রবীণ ও খ্যাতনামা কবি শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর গত পূজার ছুটীতে বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর দারুণ ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন জানিয়া সকলে আনন্দিত হইবেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

কলিকাতার পথের সংস্কার—

গত মহাযুদ্ধের সময় মিলিটারী গাড়ী যাতায়াতের ফলে কলিকাতার বহু রাস্তা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেগুলি মেরামতের জন্য সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগ কলিকাতা কর্পোরেশনকে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ক্ষতির তুলনায় এই টাকার পরিমাণ অত্যন্ত কম। বর্তমানে সকল দ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে—কাজেই দেড় লক্ষ টাকায় কলিকাতার বিশেষ লাভ হইবে না।

পুনরায় দুর্ভিক্ষ—

গত ৩রা ডিসেম্বর পুনরায় এক জন সভায় মিঃ আবদুল সবুর এম-এল-এ বলিয়াছেন যে পুনরায় দুর্ভিক্ষের ফলে সম্প্রতি ৮।১০ হাজার লোক অনাহারে মারা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার পাঞ্জাবের ২ লক্ষ বন্যাপীড়িতদের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ১২ লক্ষ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সম্বন্ধে উদাসীন। যে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানকার বহু লোক ভারত রাষ্ট্রের সহিত ব্যবসা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত—তাহাদের সে উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হওয়ায় অবস্থা ভীষণ হইয়াছে। ঐ অঞ্চল হইতে শুধু কাঠ, মাদুর, ঝাঁটার কাঠি প্রভৃতি প্রভৃত পরিমাণে ভারত-রাষ্ট্রে আসিত। সে সকল জিনিষ এখন আর বিক্রয় হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগ—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ তিনখানি নূতন চিত্র প্রস্তুত করিয়া সম্প্রতি কলিকাতার সাংবাদিকদিগকে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়া দেখাইয়াছিলেন। (১) আমরা মরব না (২) সাঁওতাল জীবন ও (৩) আমরা চাষ করি আনন্দে। প্রথমটিতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কার্য্য, দ্বিতীয়টিতে সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থা ও তৃতীয়টিতে কৃষি-উন্নয়ন ব্যবস্থা দেখানো হইয়াছে। এই সকল চিত্র মফঃস্বলে সর্বত্র দেখানো হইলে লোক কার্য্যে উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করিবে। সিনেমা শুধু আনন্দ দান না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে শিক্ষাপ্রদ হয়, এই ভাবে তাহার ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন।

মানসিক ব্যাধি পরীক্ষা—

গত ২রা অক্টোবর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে একটি নূতন যন্ত্র স্থাপন করিয়া মানসিক ব্যাধি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৬ হাজার টাকায় ঐ যন্ত্র ক্রয় করিয়া ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে তাহা বসানো হইয়াছে। বাহিরের রোগীর পরীক্ষার জন্য ১০০ টাকা ফি ধার্য্য হইয়াছে। হাসপাতালের ভিতরের রোগীদের ৩২ ও ১২ টাকা ফি দিতে হইবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য—

কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য

তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করিবেন। ঐতিহাসিক উইলসন ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন ও মিঃ লং ১৭৪৮ হইতে ১৭৬০ সাল পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস প্রস্তুত করেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ১৭২২ হইতে ১৭৪৮ সালের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবেন। আমরা তাঁহার জয়-যাত্রা কামনা করি।

ক্যান্সার হাসপাতালে দান—

স্বর্গত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পত্নী শ্রীযুক্ত তরুলতা ঘোষ তাঁহার স্বামীর পুণ্য স্মৃতিতে কলিকাতা ক্যান্সার হাসপাতালে সম্প্রতি ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ঐ টাকা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দেওয়া হইয়াছে—তিনি ডাঃ সুবোধ মিত্র মারফত ব্যয়ের ব্যবস্থা করিবেন। মহিলার দান প্রশংসনীয়।

যামিনীভূষণ যক্ষ্মা হাসপাতাল—

১৩২৮ বঙ্গাব্দে কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় যে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা এখন একটি বৃহৎ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উহার একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল পাতিপুকুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার প্রসার-সাধন জন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এককালীন ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং সেই টাকায় হাসপাতাল সংলগ্ন জমী ক্রয়ের জন্য উহা সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মজুমদার যক্ষ্মা হাসপাতালে তাঁহার পরলোকগত পুত্রের নামে একটি নূতন গৃহ প্রায় ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই গৃহে ৩০টি রোগীর স্থান হইতে পারিবে। গত ১৭ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই নূতন গৃহের উদ্বোধন করিয়াছেন। জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতে পারে না।

প্রদেশপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় "দেবব্রত ব্লকের" উদ্বোধনকালে বক্তৃতা করিতেছেন

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের যক্ষ্মা-হাসপাতালে নূতন 'দেবব্রত ব্লক'

নূতন পাক মন্ত্রিসভা—

খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন—(১) সর্দার আবদার রব নিস্তার (পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্ণর ছিলেন)—শিল্পমন্ত্রী (২) খাজা নাজিমুদ্দীন—প্রধান মন্ত্রী ও দেশরক্ষাসচিব (৩) চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ—পররাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য-সম্পর্ক (৪) খাজা সাহাবুদ্দীন—আন্তদেশিক, প্রচার ও সংবাদ (৫) চৌধুরী মহম্মদ আলি—অর্থ (৬) মিঃ ফজলর রহমন—শিক্ষা, অর্থনীতি, বাণিজ্য (৭) পীরজাদা আবদাস সত্তর—খাদ্য, কৃষি, আইন (৮) সর্দার বাহাদুর খাঁ—যোগাযোগ (৯) মিঃ এম-এ গুরমুনি—কাশ্মীর রক্ষা (১০) ডাঃ এ এম মালিক, পূর্ত, স্বাস্থ্য, শ্রম। অপর তিন জনকে ষ্টেট মন্ত্রী ((১) ডাঃ মহম্মদ হোসেন, (২) ডাঃ আই-এস কোরেশী ও (৩) মিঃ আজিবুদ্দীন আহম্মদ) এবং মিঃ গিয়াসুদ্দীন পাঠানকে ডেপুটী মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

শোক-সংবাদ

পরলোকে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ—

ভারত বরেণ্য শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ৫ই ডিসেম্বর বুধবার রাত্রি সাড়ে ১০টার সময় তাঁহার বরাহ-নগরস্থ বাসভবন 'গুপ্ত নিবাসে' ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ঐ দিন বিকাল পর্য্যন্ত তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন—সন্ধ্যায় তাঁহার শরীর খারাপ হয় ও রাত্রি ১০টায় তিনি সংজ্ঞাহীন হন। তাঁহার ২ পুত্র অলকেন্দ্র ও অরুণেন্দ্র পিতার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন—২ কন্যা উমারাণী ও সুরূপা পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। কনিষ্ঠ পুত্র মানীন্দ্র বার্ণপুরে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতার প্রিন্স দ্বারকানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৭১ সালে জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহার জন্ম হয়। অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ, পিতা গণেন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ সকলেই শিল্পী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে অবনীন্দ্রনাথ শিল্প চর্চায় মন দেন ও পরে সেজন্য অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং ১৯১৩ সালে সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন। তিনি বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও কলাবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগও যথেষ্টই ছিল। তিনি শিশুদের উপযোগী বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। শকুন্তলা, রাজকাহিনী, ভূতযন্ত্রী প্রভৃতি পুস্তক বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার অঙ্কিত অনবদ্য চিত্রগুলির মধ্যে অভিসারিকা (১৮৯২), শাহজাহানের মৃত্যু (১৯০০), বুদ্ধ ও সুজাতা (১৯০১), কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত বিভিন্ন চিত্র (১৯০১—১৯০৩), বিরহী যক্ষ (১৯০৪), কালিদাসের ঋতু সংহারে বর্ণিত গ্রীষ্মের চিত্র (১৯০৫), কচ ও দেবযানী (১৯০৮), ওমর খৈয়াম (১৯০৯), বাঁশীর ডাক (১৯১০), দেবদাসী (১৯১২), পুষ্পরাধা (১৯১২), যমুনা পুলিনে শ্রীরাধা (১৯১৩), মুসৌরী পাহাড় (১৯১৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথের সর্বপ্রধান দান—তিনি চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে নবযুগের প্রবর্তক এবং বহু শিষ্য তৈয়ার করিয়া সমগ্র ভারতে চিত্র-শিল্পের প্রসারে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে বিশ্বভারতী গঠনে মনোযোগী ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশ্বভারতীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি বিলাসে সময় অতিবাহিত না করিয়া নানা কল্যাণকর কার্য্যে সর্বদা নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতেন। তাঁহার সহৃদয় ও সুমধুর ব্যবহার সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। পরিণত বয়স হইলেও তাঁহার পরলোক গমনে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার কল্যাণ কামনা করি ও তাঁহার পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

পরলোকে রাণী সরোজিনী দেবী—

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ কাশিমবাজারের রাজা আশুতোষ নাথ রায়ের বিধবা রাণী সরোজিনী দেবী ৭০ বৎসর বয়সে লোকান্তরিতা হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ পরলোকগত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ছিলেন। বিধবা হইয়া তিনি হিন্দু বিধবার শাস্ত্রীয় আচার—নানা ব্রত পালন, তীর্থদর্শন ও দান ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। তুলাদান, অন্নমেরু, ভূমিদান প্রভৃতি ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত সমিতি রাণী অন্নকোশীর কীর্ত্তি টোলের সমগ্র ব্যয় বহন করেন এবং তাহাতে একটি বেদ বিভাগযুক্ত করিয়া বাঙ্গালায় বেদাধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতিতে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও দানশীলা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা কমলারঞ্জন রায় ও একমাত্র কন্যা কৃষ্ণনগরের মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

পরলোকে সাধনচন্দ্র রায়—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খ্যাতনামা এঞ্জিনিয়ার সাধনচন্দ্র রায় গত ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে ৯টায় তাঁহার গড়িয়াহাট রোডস্থ বাসভবনে ৭১ বৎসর বয়সে হৃদযন্ত্রের

ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু শিল্প ও ব্যবসায়ের সহিত সারাজীবন সংশ্লিষ্ট থাকিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছেন। এক সময়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ও একমাত্র কন্যা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী এবং শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া—

খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা ও চিত্র পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া গত ২৯শে নভেম্বর বিকাল ৪টার সময় তাঁহার

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ফটো—রূপমঞ্চ

কলিকাতার বাসভবনে ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আসাম গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৯২৪ সালে বি এস-সি পাশ করিয়া তিনি ইউরোপ ভ্রমণে গমন করেন ও ফরাসী দেশে থাকিয়া চিত্র-পরিচালন বিদ্যা শিক্ষা করেন। শ্রীদেবকী বসুর অধীনে তিনি চিত্র পরিচালন ও অভিনয় আরম্ভ করেন ও পরে নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। শরৎচন্দ্রের দেবদাস চিত্রে তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি পায় ও পরে তিনি বহু চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। তিনি আসাম ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে রাজনীতি করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে বহু দিন শিক্ষা বিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভাল বিলিয়াড ও টেনিস খেলিতে পারিতেন। গত গ্রীষ্মকালে তিনি দীর্ঘকাল ইউরোপে থাকিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার অকাল বিয়োগে ভারতের চিত্র ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনা—

গত ২১শে নভেম্বর বুধবার সকাল ৮টার সময় কলিকাতা দমদম বিমান ঘাঁটির অনতিদূরে একটি যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনার ফলে বিমানের ৪ জন কর্মচারীসহ ১৬ জন যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। একমাত্র যাত্রী শ্রীকে-এম-মেহতা জীবিত ছিলেন—আহত অবস্থায় তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। নিহতদের মধ্যে
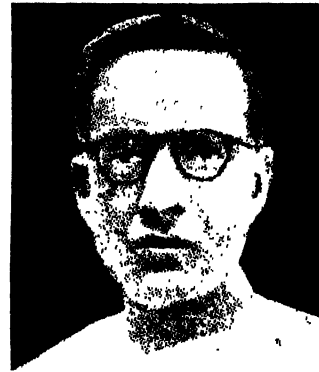
লালা দেশবন্ধু গুপ্ত

১ জন ছিলেন মহিলা। নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি লালা দেশবন্ধু গুপ্ত ও অন্যতম সহকারী সম্পাদক লজপৎ রাস ঐ বিমানে ছিলেন। একটি গাছের সহিত ধাক্কা লাগিয়া বিমানটি একটি বাঁশবনের মধ্যে পড়িয়া যায় ও বিমানের পেট্রল ট্যাঙ্ক জলিয়া সকলে পুড়িয়া যান। লালা দেশবন্ধু গুপ্ত দিল্লীর সুবিখ্যাত সংবাদপত্র প্রকাশক ও কংগ্রেস কর্মী। তিনি ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বহু বৎসর তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৩৬ সালে পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫০ সালে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। লালা দেশবন্ধু বহু গুণের অধিকারী ছিলেন এবং সে জন্য বহুজন কর্তৃক সমাদৃত হইতেন। তাঁহার ও অন্যান্য যাত্রীদের এই আকস্মিক মৃত্যুতে দেশের সর্বত্র শোকপ্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

গুটেনবর্গ ফুটবল দল ঃ

সুইডেনের স্থানীয় লীগ প্রতিযোগিতার তৃতীয় স্থান অধিকারী গুটেনবর্গ ফুটবল দল ক'লকাতার তিনটি দলের সঙ্গে ফুটবল খেলেছে। প্রথম খেলায় গুটেনবর্গ ২-০ গোলে এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলকে হারিয়ে দেয়। এই দিনের খেলায় প্রথমদিকে মোহনবাগান দলের গোল করা উচিত ছিল। দু'টি গোলের মধ্যে প্রথম গোলটি গোলরক্ষক ব্যানার্জির ভুলে হয়েছে। অবিশ্যি গোল বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই তিনি গোল থেকে অনেক এগিয়ে যান; ফাঁকা গোলে বলটি ঢুকে। প্রথম দিন সুইডিস দলের খেলা চোখে পড়েনি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন কিন্তু দলটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের খেলে দর্শকদের মুগ্ধ করে, প্রথম দিনের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ বলতে পারেন। দ্বিতীয় খেলায় ০-১ গোলে এবছরের আই এফ এ শীল্ড এবং ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে হেরে যায়। এ হার তাদের অগৌরবের হয়নি। গোলটি নিতান্ত ভাগ্যদোষে অপ্রত্যাশিতভাবে গোলরক্ষকের ত্রুটিতে হাত থেকে ফস্কে গোলে ঢুকে যায়। এদিনের প্রথমার্দ্ধে সুইডিস বিপক্ষ দলের তুলনায় ভাল খেলে কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের থেকে উন্নত খেলে। পোষ্টের আশপাশে ইস্টবেঙ্গল দলের যে কয়েকটা ভাল সট বিপথে গিয়ে নষ্ট হয়েছে তা থেকে গোল হ'লে খুবই দর্শনীয় হ'ত। তৃতীয় খেলা আই এফ এ একাদশ দলের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র যায়। এদিন ঘটক তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে না পারায় গোল হয়েছে। নিরপেক্ষভাবে আই এফ-এ দল গঠন করা হ'লে জয়লাভের যথেষ্ট আশা ছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে দু'জন খেলোয়াড় বদলে দেওয়াতে খেলার মোড়ই ঘুরে যায়। ফুটবল খেলায় যে তিনটি ফলাফল অবধারিত অর্থাৎ জয়, হার এবং ড্র—তা সুইডিস দলের খেলায় হয়েছে; এ ঘটনাটি একদিক থেকে লক্ষ্য করার বিষয় সন্দেহ নেই।

সুইডিস দলের খেলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করার আগে তাদের খেলোয়াড়দের অটুট স্বাস্থ্য এবং ফুটবল খেলার উপযোগী গঠনসৌষ্ঠব লক্ষ্য করার মত। আমরা এদিক থেকে অনেক পিছনে আছি। সুইডিসরা 'third back system'এ ফুটবল খেলে। তাদের পাশ আমাদের থেকে নিখুঁত, বল আদান প্রদানে খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়াও উন্নত, বুট পায়ে তাদের বল ড্রিবল করার কৌশলও কার্য্যকরী এবং দর্শনীয়। বুট পায়ে কত উন্নত ধরণের ড্রিবল করা যায় তার নিদর্শন সুইডিসরা আমাদের দেখিয়ে গেছে। কিন্তু তারা অহেতু বল ড্রিবল ক'রে বিপক্ষ দলকে আত্মরক্ষায় সুবিধা ক'রে দেয় না; যতটুকু দরকার ঠিক ততখানি পথই বল ড্রিবল ক'রে দলের খেলোয়াড়কে বল পাশ করে। দর্শকদের হাততালিতে ভুলে দলের সর্ব্বনাশ ডাকে না। দেহের দৈর্ঘ্য মাথা দিয়ে বল আদান-প্রদানে তাদের অন্যতম সহায়ক। নিজ দলের গোলের মুখেও তারা গোলরক্ষককে বল পাশ দেয় তা কি মাটিতে কি মাটি ছেড়ে। প্রথম দু' একটা দেখে অনেকে ভেবেছিলেন ঠিকমত বল মারতে না পারায় এরকম ঘটেছে। গোলরক্ষক খুবই সজাগ; গোলরক্ষককে এভাবে বল পাশ করার উদ্দেশ্য গোলরক্ষককে দিয়ে নিজ দলের ফাঁকা খেলোয়াড়কে হাত দিয়ে ছুঁড়ে বল দেওয়া; কারণ তার পক্ষেই মাঠের অনেকখানি স্থানের খেলোয়াড়দের

জন ডি রবার্টসন (এমসিসি)—ষ্ট্রোক খেলোয়াড়

নাইজেল হাওয়ার্ড (এমসিসি) ক্যাপটেন—ব্যাটসম্যান

অবস্থান লক্ষ্য রাখা সম্ভব। খেলায় এত গুণ থাকা সত্ত্বেও সুইডিস দলের খেলায় একটা বড় দুর্ব্বলতা—আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের গোলের মুখে তীব্রবেগে সট না করতে পারা। এ অক্ষমতা আমাদের খেলার থেকে তাদের বেশী। তারা সুন্দর আদান-প্রদান ক'রে পেনাল্টি সীমানার মধ্যে যে সব বল নষ্ট করেছে তার একাংশ পেলে মেওয়ালালের মত সেণ্টার ফরওয়ার্ড আগুন ছুটিয়ে দিতে পারে। রক্ষণভাগ তাদের খুবই শক্তিশালী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৯ সালে হেলসিংবর্গ সুইডিস দলের সঙ্গে মোহনবাগান খেলা ড্র করে এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব হেরে যায়। এবার ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয়ে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধই নেয়নি ভারতীয় দলের মান রেখেছে।

জাপানী হকিদলের ভারত সফর ঃ

হকি খেলা অনুশীলনের উদ্দেশ্যে জাপান থেকে যে হকি দলটি ভারত সফরে এসেছে তারা প্রায় সফর শেষ ক'রে এসেছে। ক'লকাতায় তারা দুটো খেলেছে। পশ্চিম বাংলা ৫-১ গোলে তাদের হারিয়ে দেয় এবং ভারতবর্ষ প্রথম টেষ্ট খেলায় ১-০ গোলে জাপানকে হারায়। টেষ্টে জাপান প্রথম দিনের থেকে অনেক ভাল খেলা দেখায়। টেষ্টে ভারতীয় দলের তুলনায় পশ্চিম বাংলা দলের খেলা ভাল হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পশ্চিম বাংলা গোল করার বহু সুযোগ পেয়েও গোল করেনি, খেলায় তেমন আর আগ্রহ ছিল না। ভারত সফরে এ পর্য্যন্ত জাপানী দলের খেলার ফলাফল: ক'লকাতা—পশ্চিম বাংলা ৫-১ গোল, ১ম টেষ্ট—ভারতবর্ষ—৬-০; এলাহাবাদ—এলাহাবাদ জেলা ৫-০, লক্ষ্ণৌ—২য় টেষ্ট ভারতবর্ষ ৬-০; দিল্লী—সার্ভিসেস ২-১, ৩য় টেষ্ট—ভারতবর্ষ ৫-১; আগ্রা—আগ্রা একাদশ ৬-১; পাঞ্জাব—পূর্ব্ব পাঞ্জাব ২-১, ৪র্থ টেষ্ট ভারতবর্ষ ৪-১; ভূপাল—ফিরোজপুর জেলা একাদশ ২-০; বোম্বাই—বোম্বাই প্রদেশ ১-০, ৫ম টেষ্ট ভারতবর্ষ ৪-০ গোলে জয়ী হয়েছে। জাপান কোন খেলায় জয়ী বা খেলা ড্র করতে পারেনি। ৫টি টেষ্টে ভারতবর্ষ ২৫টি গোল দিয়ে ২টি গোল খেয়েছে। ভারত সফরে জাপানের দু'টি

ওয়াটকিন্স (এম‌সিসি) খ্যাটা ব্যাটসম্যান ও বোলার

ফ্র্যাঙ্ক এ লসন (এমসিসি)—ষ্ট্রোক খেলোয়াড়

খেলা এখনও বাকি। হকি খেলা সম্পর্কে ভারতবর্ষের পক্ষে বড় সুবিধা, হকি ভারতবর্ষের জাতীয় খেলা। জাপানে হকি খেলা তেমন প্রসার লাভ করেনি। আন্তর্জাতিক খেলাধূলায় অনেক বিষয়ে জাপানের সুনাম আছে যা একমাত্র হকি ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন বিষয়ে নেই। জাপানীদের অনুকরণ ক্ষমতা অদ্ভুত সুতরাং তারা যদি হকি খেলার উপর গুরুত্ব দেয় তাহলে নিকট ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় হকি খেলার মান পূর্ব্বের থেকে অনেক নিম্নগামী হয়েছে সুতরাং আমাদেরও এদিকে সজাগ হওয়া প্রয়োজন।

রোভার্স কাপ ফুটবল ঃ

১৯৫০ সালের ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী হায়দ্রাবাদ পুলিশ ২-০ গোলে মাদ্রাজের উইমকো স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে উপর্যুপরি দু'বার রোভার্স কাপ পেয়েছে। সেমি-ফাইনালে হায়দ্রাবাদ ২-০ গোলে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া কালচার লীগ দলকে হারায়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে উইমকো ১-০ গোলে ক'লকাতার এরিয়ান্স ক্লাবকে হারায়। এ বছরের সব থেকে উল্লেখযোগ্য এরিয়ান্স দলের খেলা। তারা তৃতীয় এবং চতুর্থ রাউণ্ডে মোট ৯ বার খেলে সেমি-ফাইনালে যায়। দ্বিতীয় রাউণ্ডে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ৪ দিন এবং রেভার্স দলের সঙ্গে ৩ দিন খেলা ড্র রাখে। একই ফুটবল খেলায় এত অধিকবার ড্র করার রেকর্ড বোধ হয় এ দেশের অন্য কোন দলের নেই। চতুর্থ রাউণ্ডে মাদ্রাজের উইমকো স্পোর্টস ক্লাব দুর্দ্ধর্ষ ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে এক অভাবনীয় ব্যাপার করে বসে। ইষ্টবেঙ্গল দলের ব্যাকে নাম করা খেলোয়াড় রুডিয়াস এবং হাফ-ব্যাকে লতিফ এবং সৈয়দ যোগদান করেও শেষ পর্য্যন্ত মান রক্ষা করতে পারেন নি। অনেকের মতে, নতুন খেলোয়াড় দল-ভুক্ত করায় 'team sprit' নষ্ট হয়ে এ অঘটন ব্যাপার ঘটেছে। একই বছরে ভারতবর্ষের তিনটি নাম করা প্রতিযোগিতা আই-এফ-এ শীল্ড, ডুরাণ্ড এবং রোভার্স কাপ জয় লাভের রেকর্ড করার সুবর্ণ সুযোগ ইষ্টবেঙ্গল দলের এবার নষ্ট হ'ল।
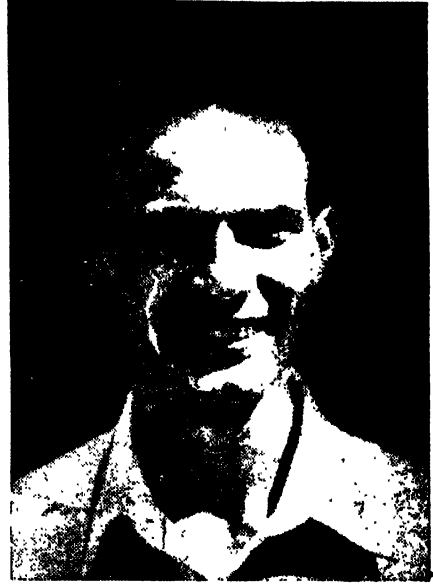
অষ্ট্রেলিয়া-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ঃ

১ম টেষ্ট : ব্রিসবেন, নভেঃ ৯, ১০, ১২ ও ১৩। অষ্ট্রেলিয়ার ৩ উইকেটে জয়লাভ।

ম্যালকম হিলটন (এমসিসি) স্যাটা শ্লো বোলার

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২১৬ (গডাড ৪৫ , লিণ্ডওয়াল ৬২ রাণে ৪ উইঃ) ও ২৪৫ (উইকস ৭০, গোমেজ ৫৫ ; রিং ৮০ রাণে ৬ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২২৬ (লিণ্ডওয়াল ৬১ ; ভ্যালেনটাইন ৯৯ রাণে ৫ উইঃ) ও ২৩৬ (৭ উইঃ ; মরিস ৪৮, জি হোল নট আউট ৪৫, হার্ভে ৪২ ; রামাধিন ৯০ রাণে ৫ উইঃ)

২য় টেষ্ট : **ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ** ৩৬২ (ক্রিশ্চিয়ানী ৭৬, ওরেল ৬৪, ওয়ালকট ৬০, গোমেজ ৫৪ লিণ্ডওয়াল ৬৬ রানে ৪ উইঃ) ও ২৯০ (গডাড নট আউট ৫৭, উইকস ৫৬ ; মিলার ৫০ ও জনসন ৭৮ রানে ৩ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৫১৭ (হ্যাসেট ১৩২, মিলার ১২৯, রিং ৬৫ ; ভ্যালেনটাইন ১১১ রানে ৪, জোন্স ৬৮ রানে ৩ উইঃ) ও ১৩৭ (৩ উইঃ। আর্চার ৪৭, হ্যাসেট নট আউট ৪৬)। অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়লাভ করে।

ইংলণ্ড-ভারতবর্ষ ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম ভারতবর্ষের প্রথম টেষ্টের অমীমাংসিত ফলাফল ভারতীয় দলের খেলা সম্পর্কে যথেষ্ট নৈরাশ্যের কারণ। শেষ পর্য্যন্ত খেলাটা ড্র করার কৃতিত্ব ইংলণ্ডের। এ টেষ্ট খেলার আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষ ১০টা টেষ্টম্যাচ খেলে একটাতেও জিততে পারেনি ; ইংলণ্ডের পক্ষে জয় ৪, খেলা ড্র যায় ৬টা। প্রথমতঃ এবার ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতীয়দলে অনেক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যাটসম্যান আছেন, বোলিংয়ের দিক থেকে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের থেকে মোটেই দুর্ব্বল নয়। দিল্লীর ফিরোজাসা কোটলা মাঠের উইকেট ব্যাটসম্যানদের রান তোলার পক্ষে যেমন পরম সহায়ক তেমনি বোলারদের কাছে দুর্গম বন্ধুর পথ। এমনি এ উইকেটের মহিমা! কিন্তু ভারতীয় দল প্রথম দিনের ৫½ ঘণ্টার খেলায় ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানে ফেলে দিয়ে এক অভাবনীয় কৃতিত্ব লাভ করে। লেগ-স্পিন বোলার সিন্ধের বলে ৬টা উইকেট পড়ে ৯১ রানে। গত পাচ বছর ভারতীয় দলের পক্ষে কোন টেষ্ট খেলাতে সিন্ধে যোগ দেননি সুতরাং দীর্ঘকাল অবসর গ্রহণের পর তাঁর এ সাফল্য প্রশংসনীয়। উইকেট-কিপার যোশী ষ্টাম্পে এবং লুফে চারজনকে আউট করেন। মানকড়ের বলে ৫৩ রানে ৩ জন আউট হয়। বিশেষ ক'রে অধিকারী এবং পঙ্কজ রায় কড়া ফিল্ডিং ক'রে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন।

দ্বিতীয় দিন ৫½ ঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষের ২ উইকেটে ১৮৬ রান দাঁড়ায়। ভারতীয় দলের মত শক্তিশালী ব্যাটসম্যানদের এই অল্প রানের মধ্যে আটকে রাখাটাই মস্ত লাভ। এ তাদের কৃতিত্ব নয়, কারণ মার্চ্চেণ্ট এবং হাজারের উইকেট কামড়ে খেলার দরুণই কম রান ওঠে। এ দু'জন নামকরা খেলোয়াড়ের জুটি বেশ মিলে গেলেও চা খাওয়ার পর দেড় ঘণ্টার খেলায় মাত্র ৩৩ রান যোগ হয়। তৃতীয় দিনেও সেই আগের দিনের মত উইকেট আঁকড়ে খেলা, যেন তাঁরা এক দারুণ ভাঙ্গণের মুখে খেলছেন কোন রকমে সময়টা কাটিয়ে দিয়ে দলকে এ যাত্রা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। দর্শকদের চোখে সে কি পীড়াদায়ক খেলা! লাঞ্চের সময় ২ উইকেটে দলের রান ২৭৪, দু'জনের খেলায় মাত্র ৯৮ রান। ৭১ রানে ভারতবর্ষ এগিয়ে যায়। মার্চ্চেণ্ট নিজস্ব ১৫৪ রান ক'রে দলের ২৭৫ রানের মাথায় আউট হ'ন। ৩য় উইকেটে মার্চ্চেণ্ট-হাজারের জুটিতে ভারতীয় টেষ্টে যে কোন উইকেটের রেকর্ড পার্টনারসিপ ২১১ ওঠে। মার্চ্চেণ্ট যেমন অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতীয় টেষ্ট খেলায় হাজারের ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ ১৪৫ রানের রেকর্ড ভাঙ্গলেন তেমনি হাজারে মার্চ্চেণ্টের রেকর্ডও ভেঙ্গে পুনরায়

রয় টাটারসল (এমসিসি) অফ-ব্রেক বোলার

সিরিল জে পোল (এমসিসি) স্থাটা ব্যাটসম্যান

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করলেন। লাঞ্চের পর ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের খেলায় মার্চেন্ট, ফাদকার, মানকড় এবং মোদী এই ক'জনের উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৫৪ রানে, এ দিকে দলের মোট রান ৩২৮, মোট উইকেট পড়েছে ৬টা। ৭ম উইকেটে অধিকারী-হাজারের জুটিতে ঐ দিনের শেষ পর্য্যন্ত ৯০ রান ওঠে। এই খেলাটুকুই যা দর্শকদের উপভোগ্য হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ৪১৮ রান ওঠে। হাজারে ১৬৪ এবং অধিকারী ৩৮ রান করে নট আউট থাকেন। আগের দিনের থেকে কিছুটা বেশী রান উঠলেও ৫½ ঘণ্টার খেলায় শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের পক্ষে ২৩২ গৌরবের হয়নি। ভারতবর্ষ ২১৫ রান এবং হাতে ৪টে উইকেট নিয়ে এগিয়ে থাকে। ব্যাটিংয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা কিন্তু উইকেটের এ সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। ইংলণ্ডের মারাত্মক বোলিং কিম্বা কড়া ফিল্ডিংয়ের জন্যে ভারতীয় দলের রান সংখ্যা কম ওঠেনি, কম উঠেছে ব্যক্তিগত সাফল্যের উপর দৃষ্টি রেখে খেলতে গিয়ে। ফলে দলগত ও ব্যক্তিগত রেকর্ড হয়েছে কিন্তু অপরদিকে তা দলের জয়লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল খেলার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই পুরো দু'দিন ব্যাট ক'রে ৬ উইকেটে ৪১৮ রান তুলে।

চতুর্থ দিনের খেলার আগে অধিনায়ক হাজারে পূর্ব্ব দিনের ৬ উইকেটে ৪১৮ রানের উপর ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড ক'রে ইংলণ্ডকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে ছেড়ে দেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ৩ উইকেটে ২০২ রান ওঠে। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতবর্ষের ফিল্ডিং প্রথম ইনিংসের ধারে কাছে যায়নি। ভারতীয় ক্রিকেট খেলার সেই মজ্জাগত ত্রুটি—ক্যাচ মাটিতে ফেলে দেওয়া, বল ধরতে না পেরে বিপক্ষদলের হয়ে রান তুলে দেওয়া। চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে মোট জড়িয়ে পাঁচটা সোজা ক্যাচ মাটিতে পড়তে দিয়ে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের বাঁচিয়ে দিয়েছে। উইকেট-কিপার যোশী আগের ইনিংসে যেমন ভাল খেলেছিলেন তেমনি খারাপ দ্বিতীয় ইনিংসে। যোশী মোদীকে নিয়েই মাঠের মধ্যে বিদ্রূপ এবং হাসি-ঠাট্টা বেশী পড়ে যায় কিন্তু তিনি দলের আরও কয়েকজনের থেকে খুব খারাপ ফিল্ডিং

করেননি। বিদ্রূপের পরিবর্ত্তে প্রশংসা পেয়েছিলেন দু'জন পঙ্কোজ রায় এবং ফাদকার। মানকড় ৫৮ রানে ৪টে এবং সিন্ধে ১৬২ রানে ২টো উইকেট পান। সিন্ধের বলেই বেশী ক্যাচ মাটিতে পড়েছে নচেৎ তাঁর উইকেট ৬টা দাঁড়াতো।

পঞ্চমদিনের নির্দ্দিষ্ট সময়েও ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস শেষ হ'ল না, ৬টা উইকেটে ৩৬৮ রান উঠলো। হাতে ৪টে উইকেট নিয়ে ভারতবর্ষের থেকে ১৫৩ রানে এগিয়ে রইলো। সময়াভাবে শেষ পর্য্যন্ত খেলাটা অমীমাংসিত রইলো। ইংলণ্ডের ওয়াটকিন্স দলের পক্ষে প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী নট আউট ১৩৮ রান করলেন। ওয়াটকিন্স এবং কারের জুটিতে শতাধিক রান ইংলণ্ডকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

ইংলণ্ড ঃ ২০৩ (রবার্টসন ৫০ ; সিন্ধে ৯১ রানে ৬, মানকড় ৫৩ রানে ৩ উইকেট) ও **৩৬৮** (৬ উইকেট। ওয়াটকিন্স ১৩৮ নট আউট, কার ৭৬, লসন ৬৮ ; মানকড় ৫৮ রানে ৪, সিন্ধে ১৬২ রানে ২)।

ভারতবর্ষ ঃ ৪১৮ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ ; মার্চ্চেন্ট ১৫৪, হাজারে ১৬৪ নট আউট)।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত নাটক "পথিক"—২।০
রমাপদ চৌধুরী প্রণীত গল্প গ্রন্থ "অভিসার রঙ্গনটী"—২।০
অমূল্যচন্দ্র সেন প্রণীত "রাজগৃহ ও নালন্দা"—১৮০
শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত প্রণীত নাটক "পলাশীর পরে"—১॥০
যতীন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত "ব্রহ্ম ও আত্মাশক্তি"—
১ম—১।০, ২য়—৪॥০
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মোহন ও রক্তধারা"—২৲,
"জলদস্যু স্বপন"—২৲
ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "ছন্দে শকুন্তলা"—২৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীকান্ত" (২য়) (১৩শ সং)—৩৲,
"ছবি" (১০ম সং)—১॥০, "মেজদিদি" (১৫শ সং)—১॥০,
"অনুরাধা-সতী ও পরেশ" (৭ম সং)—১।০, "বৈকুণ্ঠের উইল" (১০ম সং)—১॥০, "দেবদাস" (১৫শ সং)—২৲,
"বিরাজ বৌ" (উপন্যাস—২২শ সং)—২৲
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ঐতিহাসিক জীবনী
"সিরাজদ্দৌলা" (১০ম সং)—৬৲
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "সহধর্ম্মিণী"—২৲
শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা প্রণীত "জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর"—৮০

বিজ্ঞপ্তি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নিষ্কৃতি" পশ্চিম বঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড কর্তৃক আগামী ১৯৫৪ সালের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য অন্যতম বাংলা দ্রুত-পঠন হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে। আশা করি, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উক্ত পুস্তকখানি তাঁহাদের বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করিয়া পরলোকগত মহান্ সাহিত্যিকের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করিবেন।

নিবেদক

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে অর্ঘ্যদান

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মাঘ—১৩৫৮

দ্বিতীয় খণ্ড	উনচত্বারিংশ বর্ষ	দ্বিতীয় সংখ্যা

নাদ ও সঙ্গীত

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভারতীয় সঙ্গীত, নাদ বা নাদব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য সঙ্গীতও কি নাদকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতকারগণ সকল সঙ্গীতের মূলে, যে নাদতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ অর্ব্বাচীন সভ্য দেশে, কখনও সম্ভবপর হয় নাই। মিশর বা গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশের সংস্কৃতিতে, সঙ্গীতের উর্দ্ধতর স্তরের কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।

ভারত সঙ্গীতের আচার্য্যগণ সঙ্গীতকে বলিয়াছেন "নাদবেদ"। হিন্দুস্থানের ধ্রুপদকারও গাহিয়াছেন, "নাদবেদ সুর সঙ্গত আওয়ে, যব কর্ত্তা করম করে তব কছু পাওয়ে।" এই নাদবেদ কবে ও কোথায় প্রথম উৎপন্ন হইল? আমরা দেখিয়া থাকি যে, সামবেদই সঙ্গীত-প্রধান ও সঙ্গীতের প্রথম উৎস। বেদোত্তর পৌরাণিক সঙ্গীতও বেদেরই অঙ্গস্বরূপ। গান্ধর্ব্ববেদ শব্দটি পৌরাণিক যুগের কথা। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদের ন্যায় গান্ধর্ব্ববেদও পৌরাণিক যুগে বেদের অঙ্গরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু সামগান হইতেই গান্ধর্ব্বগীতের উৎপত্তি। সপ্ত স্বরের প্রথম ভেদ সামবেদের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বরের সপ্তরূপ হইতেই পাওয়া যায়। তৎপর পৌরাণিক যুগের মার্গ সঙ্গীতে বা গান্ধর্ব্বগীতে রাগের বিকাশ ও সঙ্গীতের উৎকর্ষ দেখা গেলেও সামগানকেই সঙ্গীতের আদি গুরুরূপে সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাই সঙ্গীতরত্নাকর বলিয়াছেন "সামবেদাৎ ইদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ" অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রহ্মা গীতশাস্ত্র সংগ্রহ করেন। কিন্তু বেদ মুখ্যতঃ শব্দশাস্ত্র, শব্দব্রহ্ম, গান এই শব্দকেই অনুরঞ্জিত করিয়াছে। নাদতত্ত্ব বা ধ্বনিতত্ত্ব বেদে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয় নাই— বেদশাস্ত্রে, বেদবানীতে, উহার প্রথম উন্মেষমাত্র পরিলক্ষিত

হয়। ওঁকার বা প্রণব বেদের প্রধান ও কেন্দ্রীয় মন্ত্র। ওঁকারের শব্দরূপ বেদের সাধনায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ওঁকার উচ্চারণের স্বর ও ছন্দ সামগায়কগণ বিশেষরূপেই আয়ত্ত করেন। তথাপি এই মন্ত্রের শব্দরূপ বা বর্ণরূপের দিকেই বৈদিক সভ্যতার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পক্ষান্তরে গান্ধর্ব্ববেদ প্রধানতঃ শব্দের বর্ণাত্মক নহে, ধ্বন্যাত্মক দিকেই অভিনিবেশ প্রদান করিয়াছে। শব্দের বর্ণাত্মক অভিব্যক্তি যদি হয় "মন্ত্র", তবে তাহার ধ্বন্যাত্মক অভিব্যক্তিকেই আমরা "গীত" বলিতে পারি। সামবেদে যে গীতের সূচনা, গান্ধর্ব্ববেদে তাহার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই। সামবেদীয় সপ্ত স্বরের বর্ণনা ঋকপ্রাতিশাখ্য প্রভৃতি বৈদিক ভাষ্যগ্রন্থে পাওয়া যায়—কিন্তু সপ্তস্বর তিন গ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা, বাইশ শ্রুতি, বিভিন্ন গ্রাম-রাগ, এবং রাগ-রাগিণীর বর্ণনা কোনো বৈদিক গ্রন্থেই নাই। পৌরাণিক গ্রন্থোল্লিখিত গান্ধর্ব্ববেদে এ সকলের বিশদ বর্ণনা আমরা লাভ করি।

এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করা উচিত হইবে, যে পৌরাণিক সাধনা ও সংস্কৃতির মূল, শুধু বেদ নহে। পৌরাণিক সাধনা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেদাতিরিক্ত তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব পুরাণে যথেষ্ট পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয়। তন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। মাহেঞ্জদারোর আবিষ্কারের পর, অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে তান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল সূত্র, মাহেঞ্জদারোর সভ্যতা হইতে প্রাপ্ত। তথাকার মূর্ত্তি ও বিগ্রহ সকলের সহিত তান্ত্রিক দেববিগ্রহের সাদৃশ্য রহিয়াছে। মাহেঞ্জদারোর সভ্যতা প্রাকবৈদিক অথবা উত্তর বৈদিক, তাহা নিয়াও অনেক বাদানুবাদ ও গবেষণা চলিতেছে। দ্রাবীড়িয় সভ্যতার চিহ্ন সকলের সহিত মাহেঞ্জদারোর সভ্যতার বাহ্যরূপের যথেষ্ট সাম্য পরিদৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন মাহেঞ্জদারো ও দ্রাবীড়িয় সভ্যতা ভূমধ্যসাগরকূল হইতে বৈদিক যুগের পূর্ব্বেই প্রবেশ করে। আর্য্য অভিযানের সময় ঐ সভ্যতার সহিত আর্য্যজাতির সবিশেষ সংঘর্ষ হয়। উহার তান্ত্রিক সভ্যতা এবং পরে সংঘর্ষের পরিবর্ত্তে আদান-প্রদানক্রমে আর্য্য সভ্যতার সহিত উহার এক কার্য্যকরী সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এইরূপই ধারণা। কিন্তু প্রাচ্য মনীষিগণ সকলে এই ধারণা পোষণ করেন না। অন্ততঃ ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যের দিকই সকল বিরোধ বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করিয়া আজিও বিরাজমান রহিয়াছে। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাই লিখিয়াছেন—"There remains, behind all variations, a unity of physical as well as of cultural type throughout India." (The secret of the Veda Chap. IV). অর্থাৎ "সকল বৈচিত্র্যের পিছনে, সারা ভারতে, এক জাতিগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্যই অবস্থিত রহিয়াছে।" তিনি আরো লিখিয়াছেন—"The sober truth, the Vedanta, Purana, Tantra, the philosophical & the great Indian religions do go back in their source to Vedic origins", (The secret of the Veda Chap. I.) অর্থাৎ গভীর সত্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন সম্প্রদায়সকল ও ভারতীয় মহান ধর্ম্মসমূহ, এই সকলেরই উৎপত্তিস্থল হইতেছে বেদ।"

একথা সত্য যে, বেদ হইতে তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বেশ সুপরিস্ফুট; কিন্তু তন্ত্রের উৎপত্তিস্থল যে বেদ তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। বিশেষতঃ ভারতীয় তন্ত্রে বেদের প্রভাব স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়। মিশরীয় বা চৈনিক তান্ত্রিক সংস্কৃতি হইতে ভারত তন্ত্র কিছু কিছু সম্পদ আহরণ করিলেও ভারতীয় তন্ত্র, ভারতীয়ই এবং যাহা কিছু ভারতীয় সে সকলের মূলে বেদের সত্যই নিহিত আছে।

যাহা হৌক, এ সব সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতি বৈদিক যুগের অবসানে পৌরাণিক সভ্যতাকালে বৈদিক ও তান্ত্রিক দুইটি ধারায় অগ্রসর হইয়াছিল। এই দুই ধারার মূল উৎস আদি বেদ ঋকবেদ, কিন্তু পরবর্ত্তীযুগে ঋকবেদের পর, যজুঃ সাম ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ধারা ধরিয়া একটি বেদানুগত পৌরাণিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। অপরদিকে ঋকবেদের অপর একটি রূপান্তর অথর্ব্ববেদ ধরিয়া শৈব-শাক্ত, তান্ত্রিক ধর্ম্ম ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির উৎপত্তি হইল। তান্ত্রিক সাধনানুগত কতকগুলি পুরাণও রচিত হইল। আমরা দুই ধারারই আদি উৎস ঋকবেদ হইতে প্রাপ্ত হই। এই দুই ধারার প্রভেদ দেশগত বা জাতিগত নহে—সংস্কৃতির দুই বিচ্ছিন্ন দিক অনুসরণ করিয়াই এই উভয় ধারা অগ্রসর হইয়াছে। বৈদিক ধারা হইতেছে চৈতন্যের ধারা আর

তান্ত্রিক ধারা হইতেছে শক্তির ধারা। দেবীসূক্ত হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। •চৈতন্যের সহিত শক্তির বিরোধ হইতেই পারে না কিন্তু এতদুভয়ের বৈশিষ্ট্য অবশ্য স্বীকার্য্য। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ তাই লিখিয়াছেন—"The vedic & Tantric cults & practices rested upon the recognition of the basic rhythm....the two cults were, as it were, the two wings of the same Mystic Bird." (The Rigvedic culture —forward). অর্থাৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই সংস্কৃতি ও সাধনার ভিত্তিতে একই ছন্দ দেখা যায়—এই দুইটি যেন একই রহস্যপূর্ণ বিহগের দুইটি পক্ষ।" পরবর্ত্তী যুগে বৈদিক সাধনা সংস্কৃতি ভগবান বিষ্ণু ও বৈষ্ণবভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে তান্ত্রিক সংস্কৃতি মহেশ্বর ও শক্তিকে নিয়াই উদ্ভূত ও পরিবর্দ্ধিত। শৈবদর্শন, ঔমাপতশাস্ত্র প্রভৃতি তান্ত্রিকশাস্ত্রের সাধ্যসাধনা শিব ও শক্তিকেই পুরোভাগে আনয়ন করিয়াছে। এইভাবে, আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই বৈষ্ণব এবং শৈবশাক্ত এই দ্বিবিধ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। সঙ্গীতশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও ইহার সম্যক উদাহরণ আমরা পাইয়া থাকি। সঙ্গীতশাস্ত্রের বৈদিক অংশ আমরা সামবেদ, বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, নারদীয়-শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিয়া থাকি। গান্ধর্ব্ববেদের উল্লেখ ও শিক্ষা বিভিন্ন পুরাণ ও নারদীয় শিক্ষা, ভরতনাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। গান্ধর্ব্ববেদ ব্রহ্মার সৃষ্ট এবং সামবেদ হইতে গৃহীত একথারও উল্লেখ আছে। ব্রহ্মার সৃষ্ট সকল শাস্ত্রের স্থিতি, বিষ্ণুদেবেরই আশ্রয়ে সম্ভব হইয়াছে। ব্রাহ্মসংস্কৃতিই পরে বৈষ্ণব আকার ধারণ করিয়াছে। তান্ত্রিক ধারা বা শৈবশাক্ত ধারার বিশিষ্ট প্রকাশ আমরা পৌরাণিক যুগে দেবী ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই, কিন্তু ইহার প্রকৃষ্ট উৎকর্ষ ঐতিহাসিকযুগে হিন্দুসভ্যতার দ্বিতীয় অভ্যুত্থানকালেই পূর্ণরূপে দেখা যায়। সম্রাট বিক্রমাদিত্য ও কবি কালিদাসের সমকালীন সংস্কৃতি তান্ত্রিকযুগের অমর গরিমা বহন করিয়া আনিয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রেরও তখন যথেষ্ট উন্নত অবস্থা। পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে যে সঙ্গীতপদ্ধতির বৃহৎ বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা যে হিন্দু রাজত্বের চূড়ান্ত গৌরবপূর্ণ যুগের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সঙ্গীতরত্নাকরে সামবেদ ও বৈদিক সংস্কৃতির উল্লেখ থাকিলেও, তান্ত্রিক দর্শন ও সাধনার উপরই উহা প্রতিষ্ঠিত। তান্ত্রিক ঔমাপত দর্শন অনুযায়ী বিশ্বসৃষ্টির বর্ণনা, সৃষ্টির সহিত স্বরের সম্বন্ধ, নাদতত্ত্ব, মানবদেহে নাদের বিবিধ বিকাশ, সপ্তচক্র ও সপ্তস্বর, এই সকলই সঙ্গীতরত্নাকরে বিশদ ও বিস্তৃতভাবে লিখিত রহিয়াছে। আর এ সবই তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন—

সচ্চিদানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীৎ শক্তি স্ততো নাদঃ নাদাৎ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥

"সারদাতিলক"

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের বিভবস্বরূপ সগুণ পরমেশ্বর হইতে শক্তির আবির্ভাব হয়; শক্তি হইতে নাদ ও নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়। সৃষ্টির আদিতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম বা পরাসংবিৎ চিরবিরাজিত। সগুণ শিব ও শক্তিরূপে তাঁহারই আত্মপ্রকাশ। শক্তির প্রথম স্পন্দনকেই নাদ বলা হয়। বিশ্বের কারণাবস্থারও ঊর্দ্ধে এই নাদএর স্পন্দনে বিন্দুরূপী ঘনীভূত সত্তার উৎপত্তি। নাদ হইতেছে, বিশাল সর্ব্বব্যাপী স্পন্দধ্বনি - আর বিন্দুতে সেই বিশালতা কেন্দ্রীভূত হইয়া ব্যক্তভাব ধারণ করিয়াছে। নাদ-বিন্দু হইতেই আবার ওঁকারের উদ্ভব। ওঁকারই নাদের কারণ-জগতস্থ সুস্পষ্ট সুব্যক্ত ধ্বনি। পরব্রহ্মের প্রথম স্পন্দন আদি শক্তিরই কাজ। আর স্পন্দন যেখানে, নাদ বা ধ্বনি সেখানে থাকিতেই এ কথা বুঝিতে আমাদের বেগ পাইতে হয় না। ধ্বনি ব্যতীত স্পন্দন বা গতি কোথায়? পরাপ্রকৃতি বা পরাশক্তির প্রথম গতিতেও তাই মানবীয় ধারণার অতীত কোনো পরাধ্বনি বা পরানাদ থাকবেই। এই ধ্বনি প্রথম নাদ ও তৎসহ বিন্দুরূপে আবির্ভূত বা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রজ্ঞানের বৃহৎ বিশালতার মাঝে ও বিজ্ঞানের জ্ঞানঘনস্বরূপে, এই পরাগতি বা পরানাদ ও পরবিন্দুর সম্যক স্ফুরণ। ইহা অরবিন্দের ভাষায় Supramental বা অতিমানসিক অবস্থায় শ্রুতিগোচর হইতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতরত্নাকরও গাহিয়াছেন—

চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং বিবৃতং জগদাত্মনা।
নাদব্রহ্ম তদানন্দম অদ্বিতীয়মুপাস্মহে ॥

অর্থাৎ সর্ব্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ, আত্মরূপে জগতে প্রকাশিত, আনন্দরূপী, নাদব্রহ্মের আমরা উপাসনা করি। নাদ যেহেতু শক্তির প্রথম স্পন্দন, তাই ইহা হইতেই জগতের সৃষ্টি, ইহা চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বপদার্থের মূল চৈতন্য-স্বরূপ। কেননা প্রকাশিত চৈতন্যই নাদের স্বরূপ। এই চৈতন্যের গতিই পরনাদ বা পরাধ্বনিরূপে পরাশ্রুতির গোচর হইয়া থাকে।

তন্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রে, নাদ বা ধ্বনির চারিপ্রকার অবস্থা বিবৃত রহিয়াছে, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। তুরীয়, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল, সৃষ্টির এই চারি অবস্থার সহিত ও শক্তির তদনুযায়ী চারিরূপ স্পন্দনের সহিত ধ্বনিরও চারি অবস্থা বা চারি রূপ, আগমসম্মত সিদ্ধান্ত। পরানাদই Supramental, তুরীয় বা অতিমানস। পরানাদ ও নাদসঙ্গত পরবিন্দু হইতে প্রথম কারণরূপী ওঁকারের উৎপত্তি হইল। মানবপ্রকৃতি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে এই ওঁকার-ধ্বনি সম্বন্ধ কর্ণের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। আবার এই ধ্বনি যে স্তরের শক্তি-স্পন্দন সূচিত করে সেই শক্তি মায়াচ্ছন্ন বা অজ্ঞানপূর্ণ নহে। প্রাজ্ঞস্বভাব বিশিষ্ট কারণ-জগতের এই গতিধ্বনি দৃকশক্তি-সম্পন্ন অর্থাৎ ইহার মধ্যে সর্ব্বদর্শী এক অপার্থিক দৃষ্টিশক্তি নিহিত রহিয়াছে। তাই এই কারণধ্বনিকে "পশ্যন্তী" ধ্বনি বলা হয়। প্রণবের অবিস্থিতি অরবিন্দের তত্ত্ববিচারে Overmental বা অধিমানসিক অবস্থায়। অনেকে ইহাকেই Oversoul শব্দে অভিহিত করেন। থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় ইহাকেই Monad বা "প্রত্যগাত্মা"রূপে বর্ণন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববিৎ Sir John Woodroffe প্রণবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"Om is practically taken as an approximate natural name of the initial creative action" অর্থাৎ ওঁকারকে কার্য্যতঃ সৃষ্টিমুখী প্রকৃতিগতির স্বাভাবিক নাম বলা যাইতে পারে।" এই আদি প্রণবরূপী স্বরঝংকারকে অনাহত ধ্বনিও বলা হইয়া থাকে—কেননা প্রণবধ্বনি দুইটি শক্তিতরঙ্গের সংঘাত হইতে সৃষ্ট নহে। যেহেতু ইহা কারণধ্বনি তাই ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। Sir John Woodroffe লিখিয়াছেন—"Causal stress is self produced & not caused by the striking of one thing against another", (Garland of letters) অর্থাৎ কারণ শব্দ স্বজাত, উহা এক পদার্থের সহিত অন্যের অভিঘাত হইতে উৎপন্ন নহে। প্রণবধ্বনিকে এজন্যই অনাহতধ্বনি বলা হইয়া থাকে। সঙ্গীতরত্নাকরও বলিতেছেন, "আহতোহনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।" অর্থাৎ নাদ আহত ও অনাহত এই দুই প্রকার। আহতনাদ বা আহতধ্বনি দুইটি পদার্থের সংঘাতের ফলে উৎপন্ন। যেমন গীতধ্বনি, কণ্ঠযন্ত্র ও বায়ুর সংঘাতের ফল এবং বীণাধ্বনি বা মৃদঙ্গনিনাদ অঙ্গুলি ও যন্ত্রের সংযোগে বা তাড়নায় সঞ্জাত। কিন্তু পশ্যন্তী ধ্বনিরূপ প্রণব আঘাতজাত নয় তাই ইহা অনাহত। এই অনাহত প্রণব হইতে স্থূল আহতধ্বনি উৎপন্ন হইবার পথে নাদ বা ধ্বনির অপর একটি অবস্থা আছে—তাহাকে মধ্যমা ধ্বনি বলা হয়। পশ্যন্তী বা প্রণবে ধ্বনি ও সুরের বিচিত্র বিকাশ নাই; উহা হইতেছে সমরসাত্মক অধিমানসিক এক অবিচ্ছিন্ন নিনাদ। তাই ধ্রুপদকারগণ ওঁকারের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "প্রথম নাদ বোল, গমক আকার" বা "আদি প্রণবরূপ ঝংকার।" কিন্তু এই একসুর বিশিষ্ট প্রণব হইতেই বহু সুর ও বহু রাগেরও সৃষ্টি। এই সৃষ্টির বিকাশ হয়, অধিমানসিক স্তরের পরে প্রথমতঃ আত্মলোকে। ইহা যেন কল্পলোকের স্বর্গীয় সৃষ্টি। সুর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, রাগ প্রভৃতি সুরের বিবিধ বিকাশ, আমরা গোড়াতে আত্মায় ও হৃদয়ে অনুভব করি। পরে প্রাকৃত মানসিক প্রাণজ বা কামজ কল্পনায় তাহার ক্রমবিকাশ হয়। আবার মানসিক ও কামিক সৃষ্টির পরেই বাহ্যস্থূল সৃষ্টি সম্ভবপর। মানুষ প্রতি কথা বলিবার পূর্ব্বে, গোড়াতে অজ্ঞাতসারে তাহা কল্পনা করিয়া, প্রাণে অনুভব করিয়া তাহার পর মুখে উচ্চারণ করে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। প্রথমতঃ গায়ক কল্পনার মধ্যে স্বরলহরীর ভাবনাময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া তৎপর তাহার কণ্ঠগত স্বরূপ প্রকাশ করেন। যন্ত্রীগণ সুরের আভ্যন্তরিক রূপই পরে যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে ফুটাইয়া তোলেন। মানসিক ও কামরূপী সৃষ্টির পরই প্রত্যেক স্থূল সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়া ওঠে। আত্মা হইতে জগতও ক্রমে মানস ও প্রাণের ক্ষেত্রে বিকশিত সূক্ষ্ম কল্পনাময়ী ধ্বনিকেই মধ্যমাধ্বনি বলা হয়। সর্ব্বশেষে

স্থূলে অভিব্যক্ত স্থূল কর্ণগোচর ধ্বনিকে বৈখরী ধ্বনি বলা হয়। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, ধ্বনি চারি প্রকার—(১) পরা (Supramental, অতিমানস্বিক, নাদ বিন্দু-গঠিত), (২) পশ্যন্তী, (Overmental, অধিমানসিক, দৃকশক্তিযুক্ত প্রত্যগাত্মজ), (৩) মধ্যমা (Psychic, mental, vital, আত্মজ, মানসজ ও কামজ), (৪) বৈখরী (Physical sound, স্থূল শ্রবণযোগ্য ধ্বনি)।

মধ্যমাধ্বনি হইতেই আমরা পূর্ণরূপ সঙ্গীতের পরিচয় পাইয়া থাকি। পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতের একটা দিক শাশ্বত বা সনাতন ও অপরদিকে নিত্য নব নব বিকাশের ক্ষেত্র। সপ্তস্বরকে আমরা শাশ্বত বলিতে পারি। সপ্তসংখ্যা, জগতের বহু সত্যেরই প্রতীক—যেমন সপ্ত লোক, সপ্ত রশ্মি, সপ্ত ঋষি, সপ্ত সিন্ধু, প্রভৃতি। মূর্চ্ছনা, ঠাট, শ্রুতি প্রভৃতির যতই বৈচিত্র্য থাকুক সপ্ত স্বরের বা স্বরক্রমের সপ্ত যতির স্বীকৃতি প্রতি দেশেরই সঙ্গীত শাস্ত্রে আমরা দেখিয়া থাকি। তাহার পর স্বরের শ্রুতিগত রূপভেদে বিভিন্ন Scale বা ঠাট অথবা মূর্চ্ছনার প্রয়োগে বিভিন্ন মৌলিক রাগের গঠন হয়। কতকগুলি মৌলিক রাগ বিভিন্ন নামে প্রতি দেশেই ব্যবহৃত—যেমন হিন্দুস্থানে যাহা ভৈরবরাগ বলিয়া খ্যাত, দাক্ষিণাত্যে তাহাই মায়া-মালবগৌড় এবং পাশ্চাত্যে তাহা হইতেই Minor Scale গঠিত। হিন্দুস্থানী শুদ্ধ ঠাটের রাগ, শুদ্ধ-বিলাবল, দাক্ষিণাত্যে সংকরাভরণ, পাশ্চাত্যে তাহাই Major Scale; এ সব মৌলিক স্বরবিন্যাস বা মূল শুদ্ধ রাগ চির-দিনই ছিল ও থাকিবে। মানবহৃদয়ের প্রধান প্রধান রস ও বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তন অবস্থা সকল এই সব রাগে অভিব্যক্ত হয়। যেমন ভৈরব রাগ শান্তরসাত্বক এবং প্রভাতকালীন প্রশান্তি এই রাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভৈরব রাগের ইহাই অনন্তকালের আবেদন। মানবাত্মার সনাতন যে সকল ভাববিকাশ, তাহাই মূলরাগসমূহে প্রকাশিত হয়। এই সকল রাগ অবলম্বন করিয়াই মার্গ-সঙ্গীত বা গান্ধর্ব্বসঙ্গীত বিকশিত হইয়াছে। এগুলি সাময়িক বা কৃত্রিম নহে—এ সকল মানবস্বভাব ও বিশ্বপ্রকৃতির সুচির সামঞ্জস্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সকল মূল রাগকে বিমিশ্রিত করিয়া অনেক রাগাঙ্গ, উপরাগ রচিত হয়। তাহা ছাড়া প্রতি দেশেরই জনপ্রিয় বিবিধ সুর রহিয়াছে। জনচিত্তরঞ্জক সে সব সুরে বিরচিত রাগকে দেশীরাগ বলা হয়—এই সকলকে সংকীর্ণ রাগ বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। গ্রাম্যসঙ্গীত বা বহু মিশ্রিত সঙ্গীতকে লোকসঙ্গীত বলিতে পারি। দেশীরাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন-শীল। এ সকলকে বৈয়াকরণিক বিধানে শাশ্বত সঙ্গীতের কোঠায় আবদ্ধ করা চলে না। মানব চিত্ত ও প্রাণের দেশকালানুযায়ী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, দেশীসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য ও স্বাভাবিক। এই পরিবর্ত্তনের গতিরোধ করা অসাধ্য ও সেই চেষ্টাও সঙ্গীতের উন্নতির পক্ষে পরিপন্থী। আমরা ইহাই দেখি, যে শাস্ত্রে যে সকল রাগ মার্গসঙ্গীতের অন্তর্গত, যাহা গ্রামরাগ বা জাতিরাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ সে সকল রাগের কোনও মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। প্রকাশবৈচিত্র্য ও রীতিরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু দেশীরাগসমূহের মৌলিক অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহাই সঙ্গীতের স্বাস্থ্যের চিহ্ন। মার্গরাগ সকলের ভাব ও রূপ মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা ও অধ্যাত্ম-প্রকৃতিরই সুব্যক্ত প্রকাশ। আত্মার সহিত পরমাত্মার চিরন্তন যোগেরই ভাবনা ও রূপ নিয়া এই সব রাগারবিন্দ হৃদয়ের সরোবরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের মন ও প্রাণ কিন্তু বিচিত্র পরিবর্ত্তনশীল ভাবপুষ্পের শোভা বর্দ্ধন করিয়া বিচিত্র রূপে ও গন্ধে বিকশিত হইয়া ওঠে; আজ যাহার একরূপ বাহার, পরদিন তাহা ঝরিয়া যায়, অন্য প্রকারের বাহার জীবনবৃন্তে পরিশোভিত হয়। বিকাশশীল মানবাধারে নিত্যনূতন যে সব ভাব ও রূপের সৃষ্টি হয়, সেগুলি মন ও প্রাণের রূপসৃষ্টি—সুরের মধ্যেও সেই সৃষ্টিরই প্রকাশ। দেশীরাগ যদি মানসসৃষ্টির নিদর্শন হয়, তবে লোকসঙ্গীত, কাব্যসঙ্গীত প্রভৃতিকে প্রাণজ বা কামজ সৃষ্টি বলিয়া বর্ণন করিতে পারি। সহজ কথায়, সঙ্গীতের ত্রিবিধ রূপ—অধ্যাত্মরূপ, মানসরূপ ও কামজরূপ। মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও প্রগতির পথে কোনওরূপই উপেক্ষণীয় নহে। শাশ্বত ভাগবত ও অধ্যাত্ম-রাগরূপের শ্রেষ্ঠ আসন, মানসিক সংস্কৃতিসূচক স্বরছন্দেরও রাগের অনুরূপ সম্মান এবং লোকসঙ্গীত গ্রাম্যসঙ্গীত ও অন্যান্য লঘুসঙ্গীতের, প্রাণজ কামজ আবেদনের সার্ব্বজনীন ভোগাধিকার। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের পূর্ণ বিকাশেই মানবের পূর্ণ প্রগতি ও সার্থকতা। মানবীয় সকল সৃষ্টিরই এই চতুর্মুখী গতি আছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

দুঃস্বপ্ন (২)

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মদীয় দুঃস্বপ্ন (১) দৃষ্ট সাহিত্যিক সাহিত্যিকা ও নটনটী-গণের ফুটবল খেলার বিবরণী পাঠ করিয়া অনেকে হিটলার সাক্ষাতের বিবরণী জানিতে কৌতূহলী হইয়াছেন; কিন্তু আমি তাহা বলিতে ইচ্ছুক নহি—প্রথমতঃ তাহা পনর বৎসর আগেকার কথা, দ্বিতীয়তঃ সে জার্ম্মানী ও হিটলার কেহই নাই এবং বাংলার মত জার্ম্মানীও দ্বিধা বিদীর্ণ! সম্প্রতি তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাই বলিতেছি—

কাপড় আমার একখানি, রবিবারে সাবানকাচা করিয়া চলে। বাড়ীতে ছেঁড়া কাপড় একখানি পরি। সেদিন আফিস্ হইতে যাইয়া দেখি গৃহিণী সেখানি পিন্ধন করিয়াছেন। আমিও ক্লান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম—আমার কাপড়খানিই পরেছ এখন আমি কি পরি?

গৃহিণী ঘর হইতে তিনখানি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শাড়ী বাহির করিয়া কহিলেন—এর কোনখানা প'রব? তুমি কি ন্যাংটো হ'য়ে থাকতে বল—

—সায়া ত আছে, তার উপর ও পরা চলে, তাছাড়া বাড়ীর ভিতর না হয় ন্যাংটো হয়েই রইলে, ওয়াড় মশারী না হয় প'রলে কিন্তু আমি আফিসে ত ন্যাংটো হ'য়ে যেতে পারিনে?

গৃহিণী ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—কি কপালই করেছিলাম। ন্যাংটো হ'য়ে ধেই ধেই করতে হবে। এত-লোকে কাপড় পায় তুমি পাও না?

—বাজারে কাপড় নেই—

—না নেই—তাঁতের কাপড়ও নেই—

—এখন ১৬৲।১৭৲ টাকা দিয়ে কাপড় কিন্‌বে বল,—অন্ন চলেনা যার—

—না খেয়ে তবু থাকা যায় তাই বলে ন্যাংটো হ'য়ে—ছিছি কি ভাগ্যই করেছিলাম—

—বচসা ক্রমশঃ গুরুতর হইল,—উদারা মুদারা হইতে তারায় উঠিল। রাত্রে অর্দ্ধাহার করিয়া শয়ন করিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে করিতে ভাবিলাম—নশ্বর জগত, এই যে এত শ্রম, এত কষ্ট এ কেহই বুঝিল না। কেহই আহা বলিল না, তবে এ ভূতের ব্যাগার দিয়া লাভ কি? পর-কালের কাজ করিলেও ত মুক্তি হইত। কেবল দাও—দাও, আমার কথা কেহ ভাবিল না—মনে হইল হরিদ্বার চলিয়া যাই। হিমালয়ের কোন নিভৃত গুহায় বসিয়া আমলকী হরিতকী প্রভৃতি খাইয়া কঠোর তপস্যা করি…

ঘুম অবশ্য আসিল—কিন্তু উত্তেজনাটা তখনও যায় নাই। হিমালয়ে যাইবার রোক্‌টা তখনও রহিয়া গিয়াছে।

হিমালয়ে গিয়াছি—

পার্ব্বত্য অটবী সমাচ্ছন্ন বন্ধুর পথ বহিয়া চলিয়াছি,—হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়াইয়া দেখিলাম সামনে ত্রিভুজাকৃতি রক্তিম ভারতের মানচিত্র পড়িয়া রহিয়াছে। চলিয়াছি—হাতে আমাদের বাড়ীর ঠোস্ খাওয়া ঘটি, একখানা বড় চিমটি এবং পরণে ছেঁড়া ওয়াড়ের নেংটি।

চলিতেছি—চলিতেছি—ক্রমাগত—দূরে তুষারাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গ, পার্ব্বত্য ঝরণা পাদদেশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—বহু নিম্নে।

অকস্মাৎ দেখি একটা গুহা। গুহাদ্বারে একজোড়া খড়ম্—সেখানে দাঁড়াইলাম। ভিতর হইতে কে যেন ডাকিল—আও বেটা (রাষ্ট্র ভাষা)।

স্বর শুনিয়া শিশির ভাদুড়ীর "কার কণ্ঠ স্বর" মনে হইল—বহু পুরাতন পরিচিত। বুঝিলাম ভগবান কৃপা করিয়া উপযুক্ত গুরু মিলাইয়াছেন। এইবার যদি পরকালের কাজ করিতে পারি। আমি সভয়ে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম স্তিমিত আলোকে যোগাসনে ঋষিকল্প সাধক বসিয়া। সত্যিকার গুরু হইবার উপযুক্ত—কারণ তাঁহার ছেঁড়া ওয়াড়েরও প্রয়োজন হয় নাই। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পা জড়াইয়া ধরিলাম—প্রভু, আমার পরকালের গতি কর প্রভু—বাবা—আমাকে পথ দেখাও—

সৌম্য শান্ত প্রভুর দাড়ি নাভি পর্য্যন্ত লম্বমান, তিনি চক্ষুরুন্মিলন করিয়া কহিলেন—ঠারো বেটা—

আমি তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলাম। তিনি সহাস্যে কহিলেন—খা লেও—হাত পাতিয়া লইলাম—একটা অচেনা ফল। ভোজনান্তে ক্ষুধা-তৃষ্ণা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ বাদে তিনি সহাস্যে কহিলেন—কাপড় নিয়ে বৌএর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিস্ বেটা, তোরে কি পথ দেখাবো—মোহ বন্ধন কাটেনি—

—কেটেছে প্রভু,—আমার চাকুরী করে ভারতবর্ষে কেউই আর সংসার ধর্ম্ম করবে না বাবা। সকলেরই মোহ-বন্ধন কেটে গেছে,—ভবিষ্যতে কেউ আর বিবাহ করতেও সাহস পাবে না—

—ঠিক বেটা ঠিক,—তোমারা সরকার ত উহি শিক্ষা দেতা হায় (বাংলা, রাষ্ট্র ভাষা) মোহ-বন্ধন সব বেমালুম কাট যায়েগা—

—হ্যাঁ বাবা,—আমায় শিষ্য করে নিন বাবা—

—পরিবার লেড়কা,—

—চুলোয় যাক্,—আমায় ভগবান-প্রাপ্তির পথ দিন—

—ঠারো বেটা, ঠারো—

—অকস্মাৎ প্রভু ববম্‌বম্ গালবাদ্য করিলেন এবং ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে—আশ্চর্য্য! তাঁহার গোঁফ-দাড়ি সব ঝরিয়া পড়িয়া গেল এবং সামান্য একটু গোঁফ মাত্র রহিয়া গেল। অপূর্ব্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল—স্তিমিত আলোকে সবিস্ময়ে দেখিলাম স্বয়ং হিটলার যোগাসনে বসিয়া—

আমি পুনরায় প্রণাম করিয়া কহিলাম—হিটলার বাবা—আজও বেঁচে আছেন?

—হ্যাঁ,—জিতা রহ বেটা।

—আপনি আমাদের রাষ্ট্রভাষা বেশ শিখে নিয়েছেন দেখছি।

—হাঁ বাংলাও হাম থোড়া শিখেছি। সুভাষবাবুকা সাৎ একসাৎ হাম রবীন্দ্রনাথ পঁড়া হাঁয়—বিদ্যাপতিকা গানা কিয়া হ্যায়—

কিছুক্ষণ বাদে হিটলার বাবা হাসিয়া পরিষ্কার বাংলায় কহিলেন—ঘরে যাও—তাতে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে—সাধনার পথ বড় কঠিন। ভারতবর্ষে তোমরা আর এক বছর বাস করলেই ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে, কাজেই শুধু শুধু এ সাধন-মার্গে কেন?

—সকলেই মুক্তি পাবে হিটলার বাবা!

—না, মধ্যবিত্ত লেখাপড়া জানা যারাই তারা মুক্তি পাবে—রইবে পড়ে শুধু বণিক ও কিছু কিছু চাষী-মজুর—

—প্রভু, আপনি যুদ্ধে হেরে এসেছেন, আর আমি জীবন-যুদ্ধে হেরে এসেছি এখানে, তবে আমায় কেন বঞ্চনা করছেন?

হিটলার-বাবার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি পাশের ঝুলি হইতে ছোট কলিকা বাহির করিয়া ধীরে ধীরে তাহা প্রস্তত করিলেন এবং তাহা হইতে উদগ্র ধুমরাশি পান করিয়া কহিলেন—শোনো,—আমি যুদ্ধে হারিনি, কাইজারও হারেন নি,—আমাদের হারিয়ে দিয়েছে—

ভীত হইয়া কহিলাম—হ্যাঁ বাবা!

—কাইজার যুদ্ধে হারলে কেন জানো? আমি জু বিতাড়ন যজ্ঞ করলাম কেন জানো?

—আজ্ঞে না,—অত পড়বার সময় কোথা—৭টা ৪২এ বেরোতুম, আর ৬টা ১২য় আসতুম—

—শোনো, যখন আমরা ইংরেজ আর ফরাসীকে কোণ-ঠাসা করে নিয়ে এসেছি '১৭ সালে তখন ঐ জু-রা একটা ডিমের দাম তুলে দিলে দশ মার্ক, কালোবাজার এমন ভাবে চালালে যে কাইজার হেরে গেলেন,—তাদের জন্যেই জার্মানী হারলো। তাই আমি জু-নিধন যজ্ঞ করে আবার যুদ্ধ করলাম। তোমাদের দেশে যেমন আজ চিনি, কাল নুন, পরশু কাপড়, তরশু পাট তারা লোপাট ক'রছে—তুমি ত সেই জন্যেই মশারী পরে এসেছ বাবা—

—এর থেকে মুক্তি কি বাবা—

হিটলার বাবা আর একবার দম দিয়া ধুম্ররাশি নির্গত করিয়া কহিলেন—গেষ্টাপো গেষ্টাপো—

—সেটা কি বাবা!

—শৃণু—লোক সব ক্ষেপেই আছে, গেষ্টাপোর মত গুপ্তার দৃষ্টি কর' যাতে নব দম্পতির প্রেমালাপ পর্য্যন্ত গোপন না থাকে—তারপর ছারপোকার মত ধর আর মারো—

আমি বলিলাম—ঠিক বাবা ঠিক,—দেশের রক্ত খেয়ে পেট মোটা করছে যারা তারা ত ছারপোকা—তা আপনি চলুন বাবা। কল্কি অবতারের মত নেমে একবার দেখিয়ে দিন—

বাবা হিটলার কহিলেন—না, আর ইচ্ছে করে না—যখন ষ্ট্যালিনগ্রাডই দখল করতে পারি নি—

—কিন্তু বাবা ওরা টাকা ছড়িয়ে লোক ক্ষেপিয়ে দেবে—

বাবা আবার হাসিলেন—রাতারাতি সব ব্যাঙ্ক বরফ করে সব টাকা কেড়ে নিয়ে নাও,—তারপর সব সমান। আইন পাশ করো—মৃত্যুদণ্ড, কারণ তারা বিশ্বাসঘাতক, দেশের চেয়ে টাকাকে জু্দের মত ভালবাসে। তারপর চালাও গুলি—সাফ করে দাও—

—কিন্তু—

—কিন্তু নেহি বেটা,—তালি দিয়ে ফুটবল খেলা চলে না। জহর ত কেবল তালি দিচ্ছে আর ফেঁসে যাচ্ছে—নতুন দরকার—

—আমরা ?

—'আরে, তোমরাইত দেশের সব—বিপ্লব করেছ তোমরা, জেলে গেছ তোমরা, মরেছ তোমরা আর মাতব্বরী করছে কারা ? ধনীরা নাচাচ্ছে আর সরকার মশায় নাচ্ছেন,—তোমরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছ—ঘ্যেৎ কাপুরুষ—

—আমি ক্ষুদ্র বাবা, আপনি চলুন একবার যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন। অন্ততঃ যাতে ধুতি শাড়ী কিনতে পাই।

—পাবে না। তোমরা পাট যখন বেচবে তখন কনট্রোল ৩৫৲ টাকা, ধনীরা যখন মিলকে বেচবে তখন ১০০৲— তোমরা ছাইখাবে—যাও দূর হও—

আমি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম—ও সব যাক্ বাবা—মুক্তির পথ দেখাও।

—যা, দেশে যা—না খেয়ে মরবি, মুক্তি আপনিই হবে।

আমি পা ধরিয়া পড়িয়া রহিলাম। বাবাজী পুনরায় দম দিয়া রুক্ষ কণ্ঠে কহিলেন—শোন্, তুই যে জমির খাজনা দিস্ একশ' টাকা, সেই জমির খাজনা সরকার পায় আট আনা। এটা কি বিধান ? সরকারের টাকা কোথায় ? সব জমি সরকারের খাস্-খাজনা, সব সরকারের, ব্যবসা সব সরকারের—ব্যস্। বানাও এ্যাটম্ বম্, হাইড্রোজেন বম্, অক্সিজেন বম্,—মারো—ধরো—

—কা'কে মারবো বাবা !

—যাকে খুশী, অন্যের সঙ্গে না পারো, নিজেরা নিজেরা লাগো—তোমরা সেটা ত পারবে। চিকিচ্ছের বিধান আর রাজনীতির বিধান এক নয়—

—বাবা একটু স্পষ্ট করে বলুন—বেদ বেদান্ত কিছুই জানি না,—আমি মহামূর্খ—

—চিকিচ্ছের চাই ধীরতা, সাবধানতা, আর রাজনীতিতে চাই সাহস, শৌর্য্য ও ক্ষিপ্রতা। হাটে মাঠে বক্তৃতায় লাউডস্পীকারে সর্ব্বদা শোনাও এক কথা—দেশের লোক এক হ'য়ে যাও—ছারপোকা ধর আর মারো—

বাবাজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—হিণ্ডেনবুর্গ ভেবেছিলেন আমি নির্ব্বাচনে পারবো না,—এমন রাইফেলের গুতো লাগালুম যে কেউ বিপক্ষেই দাঁড়ালে না—হ্যাঁ বটে,—

—বাবা ! ছারপোকা মারতে ব'লছেন কিন্তু আমাদের দেশে যে সব ছারপোকা ! মারবে কে ?

—কেন তোমরা যারা ন্যাংটা, তোমাদের আবার ছারপোকার ভয়টা কি ? কাপড় জামাত নেই যে তাই বেয়ে উঠবে—

—হ্যাঁ বাবা কিন্তু অন্নবস্ত্রহীন দেশে আর ফিরবো না.—আর ঘরের মাঝে দিবারাত্রি যে শাস্তি তা'তে আর সংসার ধর্ম্মের ইচ্ছা আমার নেই। আমায় সাধন মার্গ চিনিয়ে দিন প্রভু—

বাবাজী পুনরায় কল্কি সাজিয়া লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—অকস্মাৎ চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—ষ্টর্মট্রুপ—ঝটিকা বাহিনী—

—সে কি বাবা !

—ঝটিকা বাহিনী আর মিলিটারী মিলে দেশকে ট্রাক্টর দিয়ে সমভূমি ক'রে গম লাগিয়ে দাও—ভাজো আর রুটি খাও—

—রুটি খেলে আমার আমাশা হয় বাবা,—চা'লের ব্যবস্থা করুন।

—গম ধান ঢ্যাড়স যা খুশী লাগাও—খাও—চষো—খাও—

—বাবা ভেতো বাঙালী,—অত শত পারিনে—আমেরিকা গম দিলে খাই নইলে উপোস করি। তামাকে

সোনা করার একটা মন্তর শিখিয়ে দাও বাবা, যাতে সংক্ষেপে জীবনটা চলে যায়।

তামা ত সোনা হয় না। তামার খাদ বাদ দিলে সোনা খাঁটি হয়—জু তাড়িয়ে আমি খাঁটি সোনা করে দিলাম, ষ্ট্যালিন ভায়া বুর্জোয়া তাড়িয়ে সোনা ক'রেছে। তোমরা ছারপোকা তাড়াও—

—আপনি চলুন বাবা! আমরা ছেলেমানুষ অত কি পারি—

—পারিস্ না, তবে এসেছিস্ কেন পাজি—দূর হ—

—আজ্ঞে, তামাকে সোনা করার একটা মন্তর—

—তবে রে! হিটলার বাবা রুখিয়া উঠিয়া চিমটি বাহির করিলেন এবং উদ্যত চিমটি হাতে করিয়া কহিলেন—দূর হ—নইলে পেট ফুটো করে দেব—

—দাও বাবা, এ পেট ফুটো করে, খিদেটা মরে যাক্—

—তবে রে!—চিমটি উঠাইয়া প্রহারোদ্যত হইলেন—ভয়ে চমকাইয়া উঠিলাম—

ঘর্ ঘর্—সেলাই কল চলিতেছে। কহিলাম, এত সকালে কি সেলাই কর—

গৃহিণী সহাস্যে কহিলেন—এই গ্যাখো, শাড়ীর পাশ ছেঁড়ে। তাই দু'খানার পাশ কেটে ফেলে জুড়ে নিলাম—কেমন হ'য়েছে?

—সুন্দর—নতুন কাপড় একেবারে!

—ধুতি মাঝে ছেড়ে, মাঝখানটা কেটে তোমারও একটা করে দেব—

—বেশ বেশ—

কাঁচা লঙ্কা ও পান্তাভাত খাইয়া ৭টা-৪২ ধরিব। গৃহিণী সহাস্য মুখে কহিলেন—আমার জন্যে একটা হাফ্ প্যাণ্ট এনো—তাতেই আমার হবে।

চোখ দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল—এই সীতার মত সহিষ্ণু প্রেমময়ী গৃহিণীকে আমি বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়াছি! হাফ্ প্যাণ্ট পরিলে কি চমৎকারই না মানাইবে এই সীতাকে?

সাহিত্যে কলিকাতা

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

(১)

রবীন্দ্রনাথ যখন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে মোগল-পাঠান সাম্রাজ্যের ন্যায় ইংরেজের অনল-নিঃশ্বসী রথও একদিন নিঃশেষিত-বাষ্পবেগ হইয়া অচল হইবে ও ইহার চক্রনির্ঘোষ মহাশূন্যতায় বিলীন হইবে, তখন তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যে এত শীঘ্র সত্য হইবে তাহা হয়ত আমরা কেহই কল্পনা করি নাই। তথাপি সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় ইহার মধ্যেও খানিকটা ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ইংরেজের সাম্রাজ্য শেষ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের চিত্তের উপর ইহার প্রভাব হয়ত চিরন্তন হইয়াই থাকিবে। যে দ্রুতগামী রথ অনল-উদ্গারণ করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিজিগীষু প্রেরণায় ধাবিত হইয়াছিল, তাহার উদ্ধত গতিবেগ স্তব্ধ হইয়াছে; কিন্তু এই উদ্গীরিত অগ্নিশিখা হইতে দুই একটী উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ আমাদের চিত্তাকাশে উদ্ভাসিত শাশ্বত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতি আমাদের ভাবরাজ্যে যে আলোক জ্বালিয়াছে তাহার দীপ্তি ইংরেজের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইবার পরও অনির্ব্বাণ থাকিবে। আর শুধু ভাবরাজ্যে নয়, বস্তুরাজ্যেও কোন কোন ব্যাপারে ইংরেজের দান অবিস্মরণীয়।

এই ভাব-তাৎপর্য্যপূর্ণ বস্তুপুঞ্জের মধ্যে কলিকাতা মহানগরীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এক হিসাবে কলিকাতা ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার চক্রনেমি হইতে ঠিকরাইয়া পড়া মণিখণ্ড; আর এক হিসাবে ইহা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত বাঙ্গালীর মানস-অভিযানের শক্তিকেন্দ্র; সর্ব্বক্ষেত্রে প্রসারিত বাঙ্গালী মনীষার আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আধার। কলিকাতার ভৌগোলিক ও ব্যবসায়-বাণিজ্যাত্মক সত্তার ঊর্দ্ধে ইহার একটী সাংস্কৃতিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহা শাসনযন্ত্রের ভিত্তিভূমি রূপে উদ্ভূত ও ক্রমশঃ বাণিজ্যলক্ষ্মীর সুবর্ণময় পাদপীঠে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে লৌকিক প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়া সারস্বত সাধনার তীর্থক্ষেত্রে উন্নীত হইয়াছে। আধুনিক যুগের সাহিত্যে কলিকাতার যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই সাহিত্যের প্রকৃতি স্থিরীকরণ ও প্রসারে কলিকাতার কি প্রভাব তাহারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে যখন ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড সাম্রাজ্য শাসনের রাজদণ্ডে পরিণত হইল ও বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল তখন হইতে বাঙ্গালীর চিত্তে এক নূতন, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অনুভূতির বিদ্যুৎদীপ্তি খেলিয়া গেল। এই নূতন রাজধানী ঠিক পুরাতন রাজধানীর আদর্শ অনুবর্ত্তনে গড়িয়া উঠে নাই। কোন ব্যক্তিগত রাজার বিজয়-গৌরব, কোন নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য-দীপ্তি ইহার মানসপরিকল্পনা ও দেহসৌষ্ঠবে প্রতিফলিত হয় নাই। ইহার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের উৎস, নূতন ভাবসংঘাতে উদ্বেলিত, বাণিজ্যের আকর্ষণে পরিচিত গণ্ডীর বন্ধনমুক্ত ও নূতন দিঙ্মণ্ডলের প্রতি প্রসারিত-দৃষ্টি মানবচিত্ত। যে অগণিত ও ক্রমবর্দ্ধমান জনসংঘ অখ্যাত পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া এই নূতন রাজধানীর আশ্রয় গ্রহণ করিল, ইহার পথে-ঘাটে, গোলায়-গঞ্জে, ইহার পূজা পার্ব্বণ উৎসব ক্ষেত্রে, ইহার কবির লড়াইএর আসরে ও শোভাযাত্রা সমারোহে নিবিড় জনাকীর্ণতায় আপনাদিগকে পরিব্যাপ্ত করিল, তাহারা ঠিক বাঙ্গালীর পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যের নিশ্চেষ্ট অনুবর্ত্তনের দৃষ্টান্তস্থল ছিল না। তাহাদের চক্ষে এক অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন, তাহাদের চক্ষে এক নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা, তাহাদের চিত্তে এক অনির্দ্দেশ আকুতি, তাহাদের অন্তরে কৌতূহলের এক অভিনব বিস্ময় ও প্রাণ স্পন্দনের এক দুরন্ত আবেগ। একত্রীভূত সহস্র সহস্র ব্যক্তির সম্মিলিত প্রাণ-হিল্লোল তাহাদিগকে জোয়ারের উচ্ছ্বাসের ন্যায় আত্মকেন্দ্রিকতার তটাশ্রয় হইতে ছিনাইয়া লইয়া এক বৃহত্তর জীবন তরঙ্গের মধ্যস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিল। গ্রামাজীবনে যে প্রাণ-প্রবাহ স্তিমিত-মন্থর গতিতে অভ্যস্ত কর্ম্মের চক্রাবর্ত্তনে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল, নাগরিক পরিবেশে তাহা শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া অভ্যাসের পৌনঃপুনিকতাকে বহুদূরে ফেলিয়া রাখিয়া এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের উদ্দেশে উধাও হইল। এমন কি বৈষয়িকতার ক্ষেত্রেও এই নূতন সজীবতা আত্মপ্রকাশ করিল। ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট ও তাহার বাণিজ্য বৃদ্ধির সহায়ক বাঙ্গালী বেনিয়াগোষ্ঠির রক্তধারায় মধ্যযুগীয় শ্রীমন্ত সদাগরের সমুদ্র অভিযানের দুঃসাহসিকতার লুপ্তস্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল। পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকের বিপুল অনুমেয় সমৃদ্ধির ভুক্তাবশিষ্ট নিজ ভাণ্ডারজাত করিতে করিতে দেশ-বিদেশের খবর, সুদূরের আহ্বান তাহাদের কানে পৌঁছিতে লাগিল ও তাহাদের মনের পালে বেগবান বায়ুসংস্পর্শজনিত স্ফীতির সঞ্চার করিল। এমন কি ইংরেজ প্রভুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে, তাহার অদ্ভুত রীতিনীতি ও দুর্ব্বোধ্য মেজাজের সহিত খাপ খাওয়াইতে, হাস্যজনক চীনবাজারী ইংরেজীর সাহায্যে তাহার রহস্যঘেরা অন্তরলোকের অন্ধকারে প্রথম শংকিত পদক্ষেপ করিতে তাহাদের মানসশক্তির এক নূতন অনুশীলন ঘটিল। এই উন্মেষিত কৌতূহল ও উত্তেজিত কল্পনা-প্রসারের প্রতিবেশে কলিকাতা মহানগরী ভূগোল ছাড়িয়া মনোরাজ্যের সৃষ্টিলোকে উন্নীত হইল ও নবযুগের সাহিত্যিক প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিল।

এক কথায় বলিতে গেলে কলিকাতার প্রতিষ্ঠার অর্থ বাঙ্গালীর ভাবকেন্দ্রের গ্রাম্যজীবন হইতে নাগরিক জীবনে অপসরণ। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ইতিহাসে আরও নগর ছিল। গৌড়, সপ্তগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের—এই সমস্ত নগর কোন না কোন সময়ে বাংলা দেশের রাজধানীর গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল। সুদূর ইতিহাসের কথা বাদ দিলেও অপেক্ষাকৃত অল্পদিন পূর্ব্বের যে অতীত তাহাতেও সাধারণ লোকের উপর নাগরিক জীবনের কোন প্রভাব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। নগর জীবনের সাংস্কৃতিক রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল কোন রাজধানীকে অবলম্বন করিয়া নয়, কোন ছোট খাট শহরের বিদ্যোৎসাহী সামন্তরাজ বা শাসন-কর্ত্তাকে কেন্দ্র করিয়া। বিক্রমাদিত্য সভার নবরত্ন ইতিহাস ছাড়াইয়া কিম্বদন্তীর ধূম্রলোকে বিলীন হইয়াছে। দিল্লীতে আকবর শাহের আমলে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও সাম্রাজ্য প্রসারের ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা মানস-সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়; রাজসভার মণিমাণিক্যদীপ্তির মধ্যে মানসদিব্যবিভার বিচ্ছুরণ কিছুটা অনুভূত হয়। কিন্তু মোটের উপর ইহা সত্য যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও সাংস্কৃতিক কৌলীন্য ঠিক সমকেন্দ্রিক ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে মুর্শিদাবাদ যখন বাংলার রাজধানী, তখন একটা সামান্য সামন্তরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আবাসস্থল কৃষ্ণনগর দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির নিয়ামক ছিল। কলিকাতায় প্রথম এই উভয়বিধ শ্রেষ্ঠত্বের সম্মিলন ঘটিল। কৃষ্ণনগরের নাগরিকত্ব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিগত রুচিপ্রসূত এবং তাঁহার রাজসভায় ভারতচন্দ্রের আকস্মিক উপস্থিতি ও একটী কাব্যামোদী সভাসদমণ্ডলীর অবস্থানের পরোক্ষ ফল মাত্র। কলিকাতার নাগরিকত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণ-সম্ভূত; ইহা অকস্মাৎ-উচ্ছ্বসিত প্রাণবেগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনিবার্য্য বিকাশ। কোন পদস্থ ব্যক্তির খেয়াল-খুশী বা জীর্ণ সুপ্রাচীন পদ্ধতির অলস রোমন্থনের উপর নির্ভর না করিয়া রাজধানীর উপচীয়মান কায়াপরিধির মধ্যে যে বিপুল কর্ম্মোদ্যমের বৈদ্যুতী শক্তি সঞ্চিত হইতেছিল, অভিনব অভিজ্ঞতার মন্থন দণ্ডে আলোড়িত চিত্তের গহন তলদেশ হইতে যে নবীন ভাবের উগ্র মদিরা ফেনাইয়া উঠিতেছিল তাহারই প্রত্যক্ষ প্রেরণা হইতে এই নব নাগরিকতার উদ্ভব। রবীন্দ্রনাথের 'নগর লক্ষ্মী' কবিতায় ইহারই মোহিনী, চিত্তবিভ্রমকারিণী শক্তির জয়গান করা হইয়াছে। এই নূতন ভাবসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া লক্ষ কণ্ঠের মিলিত কলকোলাহল কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া, জনতার সংক্রামক উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ এই নব আবির্ভাবকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইল।

(২)

কলিকাতা মহানগরীর দেহায়তনে প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিলম্ব হইল না। প্রথম যুগের সাহিত্য সৃষ্টি—শিক্ষা ও সাংবাদিকতা এই উভয় শাখার মাধ্যমে প্রবাহিত হইল। আঠার শ' খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সহিত ভারত শাসন কার্য্যে নিযুক্ত তরুণ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বাংলাভাষা শিক্ষা দিবার যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল, তাহা ক্রমশঃ শাসন প্রয়োজনের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দেশীয় জনসাধারণের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রসারিত হইল। ইংরেজ ও দেশী লোকের সহযোগিতায় এই শিক্ষা-সাহিত্য ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিল। একদিকে যেমন রামরাম বসু,

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার সিভিলিয়ান-শিক্ষার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন, অপর দিকে তেমনি কেরী, মার্শমান, হলডে প্রভৃতি বিলাতী-পণ্ডিতেরা দেশী লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান—প্রচারমূলক বিবিধ সাহিত্য রচনা করিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা প্রচার-প্রচেষ্টার মধ্যে কলিকাতার কেন্দ্রাকর্ষিনী-শক্তির প্রভাব লক্ষিত হয়। কলিকাতার বিপুল জনসংঘ কেন্দ্রীভূত না হইলে, বহু লোকের নিশ্বাস বায়ুতে ইহার আকাশ বাতাস সরগরম না হইলে শিক্ষা বিস্তারের এই ব্যাপক প্রচেষ্টাও সুপরিকল্পিত বিবিধ আবশ্যকতা সম্বন্ধে সমাজ-চেতনা জাগ্রত হইত না। পল্লী-অঞ্চলের আকস্মিক বদান্যতাপুষ্ট টোল-পাঠশালার শিথিল কার্য্যক্রম ও শীর্ণ প্রেরণা মহানগরীর আব-হাওয়ায় এক অভাবিতপূর্ব্ব প্রাণশক্তি ও সুনির্দ্দিষ্ট সুশৃঙ্খল নীতির তাৎপর্য্য-গৌরব লাভ করিল—সহস্র হস্তের সকল আকর্ষণে জড়াভ্যাসের-কর্দ্দম প্রোথিত, লক্ষ্যহীনতায় শ্লথগতি জীর্ণ রথখানি আবার পূর্ণবেগে এক দুর্দ্দম বিজিগীষার বাহন ও প্রতীকরূপে সম্মুখপানে ধাবিত হইল। এইরূপে কলিকাতায় সঞ্চিত উচ্ছল প্রাণশক্তি শিক্ষার শুষ্কখাতে আবার নূতন গাঙ্গের জোয়ার সঞ্চারিত করিল।

শিক্ষার চেয়েও সাংবাদিকতার মধ্যেই নগর প্রভাব বেশী অনুভূত হয়। বৃহৎ বনস্পতি শীর্ষে দূরযাত্রী পাখীর ন্যায় মহানগরীর সুদূর-প্রসারী কৌতূহল ও মতবাদক্ষুব্ধ জীবনবাদের চূড়ায় সাংবাদিকতা নিজ উচ্চ নীড় রচনা করে। পল্লীজীবনে সংবাদ চলাচল করিত আকস্মিকতার আশ্রয়ে, বায়ুচালিত মেঘের লীলা-চপল তির্য্যক্ ভঙ্গীতে, অন্ধ সংস্কারের বিকৃতিতে, জনরবের অতিরঞ্জন ও সহস্রজিহ্ব বিভিন্নতায়। শহরে সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইল এই আদিম, অসংস্কৃত প্রবৃত্তির খানিকটা মার্জ্জিত ও সুসংবদ্ধ সংস্করণকে ভিত্তি করিয়া। প্রথম যুগের সম্পাদক জনরবের উদ্ভট, আজগুবি সংবাদ পরিবেশনকে নিয়মিত কর্ম্মসূচীর মধ্যে ফেলিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে বুলবুলের লড়াই, কবির আসর, উৎসবের সমারোহ, সভাসমিতিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সহযোগিতা প্রভৃতি যে সমস্ত কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিত তাহারই কতকটা নির্ভরযোগ্য যাচাই-করা বিবরণ সংবাদপত্র-প্রকাশের প্রথম প্রেরণা জোগাইল। মোট কথা, মহানগরীর "জনসংঘাত মদিরা"র প্রথম ফেনোচ্ছ্বাস সাংবাদিকতার রঙীন বোতলে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। অবশ্য শীঘ্রই সুরার সহিত অপেক্ষাকৃত সারবান খাদ্যও মিশ্রিত হইল। সমাজ সংস্কার, ধর্ম্ম মতের বিতর্কমূলক আলোচনা, রুচিবিকারের প্রতিষেধক নির্দ্দেশ, বিশুদ্ধসাহিত্য—এই সমস্তই সংবাদপত্রের বিষয়সূচীর সহিত সন্নিবিষ্ট হইল। কিন্তু এই সমস্তই আসিয়াছে এক বৃহৎ, সংঘবদ্ধ সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজনকে উপলক্ষ করিয়া, উহার মানসক্ষুধা মিটাইবার আয়োজনের অংশরূপে। সুতরাং সংবাদপত্রের আবির্ভাব ও ক্রম-পরিণতির ইতিহাস মহানগরীর জীবনযাত্রার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট।

(৩)

এই নূতন যুগের প্রতীকরূপে আমরা সমাজের দুইক্ষেত্রে দুইজন ব্যক্তির উল্লেখ করিতে পারি—প্রথম, রাজনীতিক্ষেত্রে মহারাজ নন্দকুমার, সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়। যে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, বৈদেশিক শাসনের স্বেচ্ছাচার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও উহার প্রতিবিধিৎসা প্রায় দেড় শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধের পুষ্টিসাধন ও তাহার শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব শক্তির উদ্বোধন করিয়াছে, মহারাজ নন্দকুমারই তাহার প্রথম দৃষ্টান্তস্থল। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা মুসলমান শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা সোজাসুজি ক্ষাত্র শক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন; শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগই তাঁহাদের একমাত্র অস্ত্র ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর দেশবাসীর অসন্তোষ ও প্রতিকার স্পৃহা যে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও শাসনতন্ত্র সম্মত আন্দোলনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে, সেই বিপদসঙ্কুল ও সেযুগে গৌরবহীন পথের প্রথম পথিক মহারাজ নন্দকুমার। বিদেশী দ্বারা সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র দেশবাসীর দুর্ব্বল হস্তে কুশাসন হইতে আত্মরক্ষার যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব উপায় তুলিয়া দিয়াছিল, মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের শাসন-পরিষদে ব্যক্তিগত দলাদলি ও বিদ্বেষের সুযোগ লইয়া সর্ব্বপ্রথম তাহার বাস্তবপ্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছিল ও নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এই প্রচেষ্টার বিপদসংকুল দুঃসাহসিকতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে তাহারই অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র আহরণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার যে অসাধারণ মৌলিকতা ও মনস্বিতা তাহার গৌরব তাঁহার নিঃসংশয়ে প্রাপ্য। দুঃখের বিষয় রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রষ্টা হিসাবে নন্দকুমারের যে কৃতিত্ব, ইতিহাস এ পর্য্যন্ত তাহার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেয় নাই। কিন্তু নাগরিক-জীবনের একটা অভূতপূর্ব্ব বিকাশ যে তাঁহাতে মূর্ত্ত হইয়াছিল এই সত্য স্বীকার করিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

যুগপ্রতিনিধিরূপে রামমোহন রায় আমাদের এত সুপরিচিত যে তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। তাঁহার যুক্তিমূলক ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার সহিত আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের দার্শনিক মতবিচার-পদ্ধতির তুলনা করিলেই তাঁহার উপর নাগরিক জীবনের প্রভাব সুপরিস্ফুট হইবে। রামমোহন নাগরিক জীবন যাপন না করিলে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সহিত তর্কযুদ্ধে তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইত না; তাঁহার যুক্তিপ্রয়োগের রীতি ও প্রকাশভঙ্গী একটা বৃহত্তর নাগরিক-গোষ্ঠীকে স্ব-মতাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়মিত হইয়াছিল। এই নগর জীবনের আবেষ্টনী। শিক্ষিত নাগরিক সম্প্রদায়ের রুচি ও মনোবৃত্তি তাঁহার বিচার-পদ্ধতির বিশিষ্টরূপ ও প্রতিপক্ষের আপত্তি-খণ্ডনের বিশেষ কৌশলটি নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। তাছাড়া নাগরিক-জীবনের সভ্যতা ও শিষ্টাচারের বিশেষ আদর্শ, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাত্রার অভিনব ছন্দ রামমোহন রায়ের মধ্যেই প্রথম পরিপূর্ণভাবে মূর্ত্ত হয়। নাগরিক ও গ্রাম্যজীবনের আদর্শ-পার্থক্য বহুদিন হইতেই কাব্যে স্বীকৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদে নাগর ও গোঁয়ারের আচরণ-বৈষম্য রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রাচীনযুগেও ঐ শব্দ দুইটীর বাচ্যার্থের মধ্যে ব্যঙ্গার্থ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহাদের অর্থসংকোচ বা অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। 'নাগর' অর্থে প্রণয়কলাচতুর

ও 'গোঁয়ার' অর্থে সভ্যভব্যতাহীন রুক্ষ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। আধুনিক যুগে নূতন শহরগুলি গড়িয়া ওঠার পরও গ্রাম্যজীবনে শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের ফলে নাগরিক ও গ্রাম্যলোকের অর্থের আবার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এখন নাগরিকের ব্যবহারাভিজ্ঞতাজাত চিত্ত প্রকর্ষের মধ্যে নাগরালির স্থান খুব গৌণ এবং গ্রাম্য জীবনের সহিত খানিকটা অশ্রদ্ধার ভাব জড়িত থাকিলেও ইহা গোঁয়ার্ত্তুমির সহিত ঠিক সমার্থবাচক নহে।

কলিকাতায় যে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার আদবকায়দা ও সামাজিকতার আদর্শ যে কিরূপ বিভিন্ন প্রভাবে গড়িয়া উঠিল তাহার আলোচনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথমতঃ ইহার ভিত্তি রচিত হয় পল্লীর বিখ্যাত সমাজকেন্দ্রগুলির অভিজাত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণের অনুসরণে। ঐতিহ্যহীন কলিকাতা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই প্রাচীন ঐতিহ্যের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। মফঃস্বলের বড় বড় ভূস্বামী যখন কলিকাতাবাসী হইলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের জমিদারীর আয়ের সংগে সংগে সাবেক চালচলন, ক্রিয়াকাণ্ড, দোল-দুর্গোৎসব, বিলাস-ব্যসন, দান-ধ্যান, আতিথেয়তা, শৈষ্টাচারের ধারাটিও এই নব-প্রবাসস্থানে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। নয়ানজোড়ের বাবু রিক্ত বিত্ত হইয়াও সাবেক রীতি বজায় রাখিবার জন্য সুগন্ধি অম্বুরি তামাকের ধূম্ররেপাটি অবিচল করিলেন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে আয়োজনহীন ভোজের নিমন্ত্রণের পূর্ব্বাভাস দিতে কার্পণ্য করিলেন না। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার যে সমস্ত পুরাতন বাসিন্দা ইংরেজের স্ফীতকায় বাণিজ্য-সম্পদের কণামাত্র আহরণ করিয়া হঠাৎ রাতারাতি বড়মানুষ ও সমাজ-নেতা হইয়া উঠিলেন তাহারাও তাহাদের নবলব্ধ ঐশ্বর্য্যের খানিকটা দীপ্তি, নবার্জ্জিত শক্তি-সামর্থ্যের খানিকটা তেজ, অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার খানিকটা গৌরব ও ইংরেজ ঘেঁসা শিক্ষাদীক্ষা ও বিলাস-ব্যসনের খানিকটা চাকচিক্য ও উদার প্রসারশীলতা এই নূতন সামাজিক আদর্শের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিলেন। বংশ কৌলীন্যের সহিত কাঞ্চন কৌলীন্য মিশিয়া জমিদারীচালের স্থিতিশীলতার সহিত ইংরেজ মুন্সী বেনিয়ার মর্য্যাদালব্ধী প্রগতিশীলতার সংমিশ্রণে এক সংকর-সভ্যতার উদ্ভব হইল। আর তৃতীয়তঃ পল্লীগ্রাম হইতে অবিরলস্রোতে প্রবাহিত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভাগ্যান্বেষীর বাহিনী এই সংকর-সভ্যতার ঘোলাজলে অবগাহন করিয়া নাগরিক জীবনের উচ্ছৃঙ্খল অনিশ্চয়তা ও আদর্শ-বিভ্রান্তিকে আরও ঘোরাল করিয়া তুলিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ প্রসাদ পুষ্ট বড়মানুষদের মো-সাহেবী দলে ভর্ত্তি হইয়া সওদাগরী অফিসগুলিতে চাকরীর উমেদার দাঁড়াইল। বাঙ্গালীর কুখ্যাত চাকরী-প্রিয়তার অপবাদের ভিত্তি রচনা করিল। আর যে স্বল্পসংখ্যক দৃঢ়চেতা যুবক আত্মোন্নতির ও জ্ঞানার্জ্জনের একান্ত সংকল্প লইয়া এই মহানগরীর জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িল তাহারা নানা তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া, নানা তটে প্রহত হইয়া, নানা অপথ-বিপথের গোলোক-ধাঁধাঁর মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যের বন্দরে নিজ জীবন তরণীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। এক নূতন সমন্বয়ের তোরণদ্বারে নবীন বাংলার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিল। মহানগরীর আকর্ষণ বাঙ্গালী প্রতিভার দুই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—মধুসূদন ও ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁহাদের অখ্যাত পল্লীগৃহ হইতে শহরের বিপুল উত্তেজনাময় প্রতিবেশে টানিয়া আনিয়াছিল। মধুসূদন ধনীর দুলাল, আসেন পাল্কীতে চাপিয়া; দরিদ্র সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র আসেন মাইল গণিতে গণিতে দীর্ঘপথ পায় হাঁটিয়া। কিন্তু এই মায়াপুরী এই দুই আগন্তুক বালকের জীবনে যে প্রতিভার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিল তাহার দীপ্ত আলোকে উহাদের বাহ্যবৈষম্য কোথায় বিলুপ্ত, অন্তর্হিত হইল।

কলিকাতার সামাজিকতার যে নূতন আদর্শ ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইল পল্লীর আদর্শ হইতে তাহা অনেকাংশে পৃথক ও ভবিষ্যৎ সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনে তাহার প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পল্লীগ্রামের চালচলনের ভঙ্গী—ইহার স্বল্পপরিচয়ে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিবার প্রবণতা, অতি কৌতূহল, সময় সময় স্পষ্টভাষণের রুক্ষতা, ক্ষেত্র ও সম্পর্ক বিশেষে বিনয়, স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভক্তির আতিশয্য, ইতর-স্থূল রসিকতা—শহরের সংক্ষিপ্ত, পরিমিত, সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য বর্জ্জিত ও কতকটা কৃত্রিম ও আত্মগোপন-তৎপর শিষ্টাচার রীতিতে রূপান্তরিত হইল। সমাজ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে মূল্যান্তর ঘটিয়া গেল। শহরে সভ্যতার একটা প্রধান ফল হইল সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রাধান্য। অবশ্য নিঃসম্পর্কীয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য প্রতি সভ্য সমাজেরই একটী সুকুমার প্রীতি স্নিগ্ধ বিকাশ। আমাদের প্রাচীন কাব্যে সখী ও সুহৃদের জন্য একটী সম্মানজনক ও প্রয়োজনীয় আসন নির্দ্দিষ্ট আছে, যদিও এই সৌহার্দ্দ্যটি মুখ্যত নায়ক নায়িকার জীবন ও রাজসভাতেই সীমাবদ্ধ। আমাদের পঞ্চতন্ত্র—হিতোপদেশ মিত্রতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—পারাবত চিত্রগ্রীবেরও বন্ধু আছে, লঘুপতনক বায়স ও সুবুদ্ধি মৃগ—কিন্তু ইহাদের বন্ধুত্ব উপকার-প্রত্যুপকারের সুনির্দ্দিষ্ট নীতিবন্ধনে আবদ্ধ। কলিকাতার সমাজে যে বন্ধুত্ব উন্মেষিত হইল তাহা আরও সূক্ষ্ম ও অন্তরঙ্গ প্রকৃতির—তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ে পরস্পরের সমপ্রাণতা; অন্তরের ভাব বিনিময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। শীঘ্রই এই নূতন সম্পর্কের সুকুমার ভাবাবেদন ও দুর্নিবার আকর্ষণ, এক দাম্পত্য ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সম্পর্ককে অতিক্রম করিয়া গেল ও মানবিক চিত্তবৃত্তির আত্মপ্রকাশের এক অভিনব পথ রচনা করিল। শহরের সমাজে, বিদ্যামন্দিরে, সভাসমিতিতে দেশ-হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে নূতন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগে, আপিসের সহকর্ম্মিত্বে যে পরিবার বহির্ভূত, বিশাল মেলামেশার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইল, বন্ধুত্বের বীজ সেই ক্ষেত্রেই উপ্ত হইল। সমাজ শৃঙ্খলা ও পরিবার প্রীতি পল্লীগ্রামের অবদান; শহরে এই প্রাচীন বন্ধনমুক্ত মনুষ্য হৃদয় গুলি নানা নূতন সংঘ-প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে, নানা বিচিত্র, মৌলিক সম্বন্ধের প্রেরণায়, নানা নবোন্মেষিত বৃত্তির স্ফুরণে নব নব সমবায়ে গ্রথিত হইয়াছে। মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত সওয়া শত বৎসর বন্ধুপ্রীতির ও সহমর্ম্মিতার এই স্নিগ্ধ অনাবিলধারা সমাজ হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়া ইহার বিষয়-নির্ব্বাচন ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আধুনিক উপন্যাসে যে বন্ধুত্ব আমাদের

পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে নানা জটিলতার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, যাহার অকপট স্বচ্ছতার মধ্যে গোপন বিরোধের টানাটানি আমাদের জীবনের স্রোতকে আবর্ত্তসংকুল করিয়াছে, যাহার বিপরীত—ভাবমিশ্র দুর্বোধ্যতা আমাদের হৃদয় রহস্তের একটা নূতন দিককে উদ্ঘাটিত করিয়াছে, তাহার মূল উৎস এই মহানগরীর জীবন যাত্রার নবোদ্ভিন্ন ভাবাদর্শ।

(২)

কলিকাতা নগরী শীঘ্রই সাহিত্যের প্রতিবেশ হইতে উহার বিষয় বস্তুর পর্বে উন্নীত হইল। কলিকাতাকে অবলম্বন করিয়া লিখিত প্রাথম গ্রন্থ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রীঃ অঃ)। এই গ্রন্থে নাগরিক ও পল্লীবাসীর সংসারের ভিতর দিয়া, কলিকাতা নগরী বাঙ্গালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে নানাবিধ নূতন সমস্তার সৃষ্টি করিতেছিল তাহারই সরস আলোচনা আছে। শহর ও পল্লীগ্রামের রীতিনীতি ও সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে যে ইতিমধ্যেই একটা ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে এই গ্রন্থে তাহারই প্রমাণ মিলে। কলিকাতার বড় মানুষের আশ্রিত বাৎসল্য, পণ্ডিত প্রতিপালন, শাস্ত্রচর্চা আহার-বিহার ও আদবকায়দা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের অনুকরণ, মো-সাহেব পরিবৃত হইয়া আত্মপ্রশংসা শ্রবণ ইত্যাদি দোষগুণ সমষ্টি—নবাগত পল্লীবাসীর বিস্ময় ও বিরাগ উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে ও সহরবাসী যথাসম্ভব তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিয়া সহরের জীবনযাত্রার সত্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতাবাসীরা প্রচুর পরিমাণে যাবনিক শব্দ প্রয়োগে অভ্যস্ত, এই অভিযোগের উত্তরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত বৈদেশিক শব্দ সমষ্টির একটী কৌতূহলোদ্দীপক তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অনেক বৈদেশিক শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ নাই ও উহারা বাংলা ভাষার সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া গিয়াছে এই যুক্তিতে পল্লীবাসীর দৃষ্টিতে এই নিন্দনীয় অভ্যাসের সমর্থন করা হইয়াছে। বৈদেশিক শব্দ সম্ভারের মধ্যে ইংরেজী শব্দের সংখ্যা সামান্য, আরবী-পারসীর পরিমাণই বেশী। সুতরাং এই অভিযোগটি ঠিক পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রসূত বলিয়া মনে হয় না; দীর্ঘদিন হইতে প্রচলিত প্রথা পল্লীবাসীর বিস্ময়ের হেতু কেন হইবে তাহাও বোঝা যায় না। মনে হয় যে সহরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আইন আদালত ঘটিত কাজের জন্য ও অবাঙ্গালী সমাজের অবস্থিতির জন্য এইরূপ বৈদেশী শব্দ মিশ্রিত ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্র ও উপলক্ষ পল্লীগ্রামের সহিত তুলনায় অনেক ব্যাপকতর ছিল। কলিকাতা ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় নগরীর মর্য্যাদাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মুখরোচক অধ্যায় হইল কলিকাতায় দলাদলি সম্বন্ধে আলোচনা বিষয়ক। দলাদলি বাঙ্গালী সমাজের সনাতন বৈশিষ্ট্য; কিন্তু সহরের আবহাওয়ায় ইহার নূতন নূতন প্রকরণ ভেদের সৃষ্টি হইল। বোধহয় প্রাক্-ইংরেজ যুগে গ্রাম্য-দলাদলির প্রকৃতি ও প্রসার বর্ত্তমান যুগ হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তখন এক একটা দলপতির প্রভাব সমস্ত অঞ্চলের উপর পরিব্যাপ্ত ছিল। এক অঞ্চলের লোকের সহিত অপর অঞ্চলের লোকের ক্রিয়া করে বৈবাহিক সম্পর্ক ও নিমন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যাপারে মতদ্বৈধ ছিল। কিন্তু অঞ্চলের মধ্যে দলপতির প্রভাব অবিসংবাদিত ছিল। মনে হয় যে বৃহত্তর দলের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদল তখনও গজাইয়া উঠিয়া সমস্ত সমাজ সংহতিকে অন্তর্জীর্ণ ও বিধ্বস্ত করে নাই। কলিকাতায়ও প্রথম প্রথম এই আঞ্চলিক ঐতিহ্যই প্রচলিত ছিল—রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি সমাজ নেতারা শহরের একটা বিরাট অংশেরই সামাজিক অধিনায়কত্ব করিতেন। কিন্তু তথাপি কলিকাতায় আগন্তুকের চিরপ্রবহমান অভ্যাগম, বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া স্বার্থ সংঘাত ও সামাজিক মতবাদের প্রগতিশীলতা এবং পাশ্চাত্যানুবর্ত্তনের মাত্রাভেদ লইয়া এই দলবিরোধ ক্রমশঃ তীব্রতর আকার ধারণ করিল ও নিজ অন্তঃসঞ্চিত বাষ্পের উত্তাপে ফাটিয়া ক্ষুদ্রতর বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষে শহরে দলাদলির এই উৎকট ও অস্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে খানিকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়া মোটেই বিচিত্র নহে। যে নিস্তরঙ্গ খালনদীর জলে খেয়া নৌকার নিশ্চিন্ত পারাপার দেখিয়াছে সে যদি হঠাৎ গঙ্গাসাগরের দিগন্ত বিস্তৃত মোহানার তরঙ্গক্ষুব্ধ নদীতে পাড়ি জমাইতে মাঝিমাল্লার ক্ষেপণ কৌশল ও নৌকার স্রোত তাড়িত তির্যক্ গতি পর্য্যবেক্ষণ করে, তবে সে তাহার পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কোন সৌসাদৃশ্য খুঁজিয়া পায় না। সেইরূপ সহরের বিরাট কর্মোত্তম চঞ্চল, সংঘাতক্ষুব্ধ প্রতিবেশে পাড়াগাঁয়ের সুপরিচিত দলাদলি যে অপরিচিত মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইল, যে নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহাতে পল্লীবাসী যে খানিকটা বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া পড়িবে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যাহা হউক গ্রন্থে দলপতির যে চিত্র অংকিত হইয়াছে তাহাতে তাহার প্রভাব মোটামুটি সমাজ কল্যাণের অনুকূল, বিশেষত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হিতকারী বলিয়াই মনে হয়।

কলিকাতায় প্রবর্ত্তমান নূতন শিক্ষারীতি ও অভিযাত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাভিমানের ছদ্ম আড়ম্বরও পল্লীবাসীর বিস্ময় জাগাইয়াছে। অনেক ধনীব্যক্তি সন্তানদের দেশীয় বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না করিয়া কেন কেবল একটু অঙ্ক শেখান ও অনেকের গৃহে আলমারীভরা বই কোনকালে পঠিত না হইয়া কেবল গৃহসজ্জার উপকরণ স্বরূপ কেন ব্যবহৃত হয়, ভাল ভাল সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের কেন কাটতি হয় না, গ্রামবাসী এই সম্বন্ধে সংশয় নিরসনের জন্য প্রশ্ন করিয়াছে। মনে হয় ভবানীচরণের তীক্ষ্ণ চক্ষু এই অভিনব প্রকৃতি বিপর্য্যয়ের মধ্যে নূতন ব্যঙ্গের উপাদান প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাহা হউক নাগরিকের যে উত্তর তাহাতে শহরে বড় লোকের কার্য্যের সমর্থন হইয়াছে। বই ব্যবহার হউক আর না-ই হউক, ইহা কেনার মধ্যে খানিকটা সৎ-প্রবৃত্তি আছে ইহার আটপৌরে ব্যবহার না হইলেও পোষাকী ব্যবহার হইতে পারে। আর বইএর কাটতি হয় না ইহার উত্তরে বলা যায় যে বই প্রকৃত বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির নিকট ছাড়া অন্য কোথায়ও সমাদর পাইতে পারে না। এই গ্রন্থের মধ্যে যে তর্কশক্তি ও বাস্তব পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখা যায় তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কলিকাতা যে বাঙ্গালীর মনীষাকে জাগ্রত করিতেছে, ইহার প্রয়োগের নূতন নূতন ক্ষেত্র যোগাইতেছে ইহার নব বিকাশের আয়োজন করিতেছে। এক বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে পক্ষ বিস্তারের প্রেরণা দিতেছে তাহা এই প্রথম গ্রন্থ হইতেই অনুমান করা যায়। এই ক্ষুদ্র সূচনা হইতে আধুনিকযুগের অভাবনীয় পরিণতি পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মনীষার অগ্রগতির সর্বস্তরের উপর কলিকাতার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে মুদ্রাঙ্কিত।

ভাগবতীয় কৃষ্ণ চরিত্র

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব

ভাগবতে কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একই। সকল হিন্দু শাস্ত্রেই এই একই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ঋকবেদীয় পুরুষসূক্তে যাহা বলা হইয়াছে চণ্ডীর পৌরাণিক দেবী সূক্তে (চণ্ডীতে—নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ বলিয়া যে স্তোত্র আরম্ভ হইয়াছে), গীতার অর্জ্জুনকৃত বিশ্বরূপ স্তোত্রে, ভাগবতের অক্রূরকৃত কৃষ্ণ স্তোত্রে এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ স্তোত্রে সেই একই ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্রেও সেই কথা। মহাভারতের শিব সহস্র নাম স্তোত্র ও বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রের নামগুলির অর্থ ধ্যান করিলে সেই একই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ পাওয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর ব্রহ্মবিদ্যা

আমি মহাপ্রভুর পৃষ্ঠপোষিত ব্রহ্মবিদ্যার অচিন্ত্যভেদাভেদাখ্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমর্থক। শঙ্কর মায়াবাদ বুঝি না। ঈশ্বর মূর্ত্ত না অমূর্ত্ত। মহাপ্রভু বলেন তিনি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। তাহার প্রধান যুক্তি হইতেছে যে ঈশ্বর মূর্ত্ত হইতে পারেন না বলিলে তাহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় অপবাদ আসে। যখন তিনি সর্ব্বশক্তিমান তখন তিনি বিগ্রহধারীও হইতে পারেন আবার অমূর্ত্তও হইতে পারেন।

এই মতের পোষক আমি একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবতারণা করিতেছি। আমার ধারণা ইহা অন্যত্র ব্যক্ত হয় নাই। জল পদার্থটি মূর্ত্ত না অমূর্ত্ত। সকলেই বলিবে জল মূর্ত্ত তরল পদার্থ। উহা যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকৃতি গ্রহণ করে। শৈত্যযোগে এই জল তুষার মূর্ত্তি ধারণ করে। তুষার কোমল তুলার মত হিম পদার্থ। আরও শৈত্যের প্রভাবে জল হিম শিলা বা বরফে পরিণত হয়। আবার তাপসংযোগে জল দৃশ্য বিন্দুবৎ কুয়াসা বা মেঘে পরিণত হয়। আরও তাপে জলের আর কোনও মূর্ত্তিই দেখা যায় না। এই যে আমি গৃহে বসিয়া লিখিতেছি—যাহার আয়তন প্রায় ২০০০ ঘনফুট তাহাতে এই বর্ষাকালে তিন চার তোলা জল বায়ুমণ্ডলের সহ মিশিয়া রহিয়াছে ; খুব শুষ্ক শীতের দিবস ঘরে হয়ত দুচার বিন্দু জল থাকে। রাসায়নিক উপায়ে ঐ জলের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় এবং উহাকে ধরা পর্য্যন্ত যায়।

জলের কিন্তু আর একটি রূপ আছে। জলের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিত করিলে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুই বায়ুতে (গ্যাস—gas) পরিণত হয়। দুই বায়ুই পাশাপাশি অমূর্ত্ত ভাবে অবস্থান করে। এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা উহাদের মিলিত করিয়া পুনরায় জলে পরিণত করা যায়।

জলের আর এক মূর্ত্তিও বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করেন। উগ্র তাপ বা বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া (splitting of atom) প্রোটন, ইলেকট্রন প্রভৃতির অতি সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত করা যায়।

ইহাই মহাপ্রভুর ব্রহ্মের পরিণাম বাদ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম (রূপহীন ব্রহ্ম) এই দৃশ্যমান বিশ্বে পরিণত হইলেন—ইহাই শাস্ত্রের বিরাট, হিরণ্যগর্ভ বা বিশ্বরূপ। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ (শ্রুতি)। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশ ব্যাপিয়াও অবস্থান করিতেছেন—স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং (পুরুষ সূক্ত)—ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরপি সর্ব্বতো ব্যাপ্যাবস্থিত (সায়নভাষ্য)।

ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্পর্ক

মুণ্ডকোপনিষদের শ্লোক :—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥

যথা সুদীপ্ত পাবক হইতে সহস্র সহস্র সরূপ বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় সেইরূপ অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় ও তাহাতেই লীন হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবকে চিৎকণা বলিয়াছেন।

ব্রহ্মবিদের লক্ষণ

ভাগবত ও গীতায় ব্রহ্মবিদের একই লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ভয়হীন। তিনি সমদৃক। তাহা হইতে কেহ ভীত হয় না তিনি কাহা হইতেও ভীত হন না।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ভাগবত ।১১।২।৪৫।

যিনি সকল ভূতের মধ্যে নিজের ও ব্রহ্মের (ভগবানের) ভাব দর্শন করেন এবং ভূত সকলকে নিজের আত্মায় ও ভগবানে দর্শন করেন তিনি ভাগবতোত্তম।

যিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করেন, তাহার ভক্তগণের সহিত মৈত্রী করেন এবং মূর্খগণের প্রতি কৃপা বা উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। ঐ ৪৬ শ্লোক।

আর যিনি হরির মূর্ত্তিকেই পূজা করেন, তাহার ভক্ত বা অন্যকে করেন না তিনি অধম ভক্ত। ঐ ৪৭।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ।১১ স্ক।২ অ।৪১ শ্লো।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতির্যুক্ত পদার্থ সকল, নদী, সমুদ্র, দিকসকল, বৃক্ষাদি এবং সকল ভূতকে হরির শরীর ভাবিয়া অনন্য ভাবে প্রণাম করিবে।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। গীতা।

বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল ইহাদের সকলের প্রতিই ব্রহ্মজ্ঞ সমদর্শী হয়েন।

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
ভাগবত।১১ স্ক।২৮ অ।১ শ্লো।

ব্রহ্মবিৎ পরের স্বভাব ও কর্ম্ম প্রশংসাও করেন না নিন্দাও করেন না। প্রকৃতি ও পুরুষের সহ এই বিশ্ব এক আত্মাতেই অবস্থিত ভাবিয়া তিনি ঐরূপ করেন।

যোগৈশ্বর্য্য

ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে অনেক যোগৈশ্বর্য্যের বর্ণনা আছে। আমাদের পরবর্ত্তী বিষয় বুঝিবার উপযোগী দুইটি দৃষ্টান্ত তুলিলাম।

কর্দ্দম প্রজাপতিকে ব্রহ্মা আদেশ দিলেন তুমি প্রজাসৃষ্টি কর। ঋষি বহুবর্ষ উৎকৃষ্ট প্রজাসৃষ্টিমানসে তপস্যা করিলেন। বৈবস্বত মনু তাঁহার কন্যা দেবহূতিকে লইয়া ঋষির সমীপে আসিয়া তাঁহাকে সেই কন্যা বিবাহ করিতে বলিলেন। ঋষি সেই রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরে তাহার তুষ্টির জন্য যোগবলে এক বিচিত্র রথ ও অন্যান্য বিলাসোপকরণ সকল সৃষ্টি করিলেন। দিব্য সরিৎ, সরোবর, বিচিত্র গৃহ সকল, নানা মহার্ঘ আভরণ ও বস্ত্রাদি ও বহু কর্ম্মকরী দাসী দেবহূতির জন্য যোগবলে নির্ম্মিত হইল। তাঁহার গর্ভে ভগবানের অবতার কপিলদেবের জন্ম হইল। পুত্র জন্মাইবার পর কর্দ্দম ঋষির সংসারিক কর্ম্ম শেষ হইল। তিনি মোক্ষার্থ সংসার ত্যাগ করিলেন। কপিলদেব পরে নিজ মাতা দেবহূতিকে ভক্তিযুক্ত সাংখ্যযোগ জ্ঞান উপদেশ করিলেন। কপিল দেবহূতি সংবাদ ভাগবতের এক অপূর্ব্ব আলোচনা।

দ্বিতীয়। ঋচিক ঋষি মহারাজা গাধির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিলেন। বরকে বিসদৃশ ভাবিয়া (সম্ভবত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবারই উদ্দেশ্যে) রাজা এক অদ্ভুত প্রস্তাব করিলেন। আমার কন্যার শুল্কের জন্য এক সহস্র অশ্ব দিতে হইবে—যাহাদের একটি কর্ণ শ্যাম বর্ণ এবং সমস্ত শরীর চন্দ্রবর্ণ। ঋষি বরুণের উপাসনা করিয়া সেই সকল অশ্ব আনিয়া রাজাকে দিলেন এবং সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন। সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি ঋষি জন্মিলেন। ভগবদবতার পরশুরাম জমদগ্নির পুত্র।

ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব (পুরাণমতে)

বঙ্কিম পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পৌরাণিক গবেষণা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (কৃষ্ণ চরিত্র)—তাঁহাদের এ কথা অগ্রাহ্য যে পরাধীন দুর্ব্বল হিন্দুজাতি কোনকালে সভ্য ছিল এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন।...তাঁহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব্ব করিতে নিযুক্ত। ঐ সময়ের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আর একটা ভ্রান্তজ্ঞানের কারণ তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই। ঐ সকল পণ্ডিত বাল্যকাল হইতে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী। ঈশ্বর ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ছয় দিন সৃষ্টি কার্য্যের ফলে তিনি ক্লান্ত হইয়া রবিবারের দিন বিশ্রাম করেন—Sabbath day। এই জগৎ সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ। মানুষই সৃষ্টির কেন্দ্র। অন্য প্রাণীদের আত্মা—soul নাই। এই সকল কথা বর্ত্তমান যুগের কোনও শিক্ষিত লোক বিশ্বাস করেন না। বর্ত্তমান ভূ-বিদ্যা বলে কোটী কোটী বৎসর হইল পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। প্রাণী-বিদ্যা বলে মানুষও লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে জন্মিয়াছে।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা সৃষ্ট হইয়াছে ও বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এবং কোন সভ্যতার সময় মানুষের শক্তি হয়ত কোনও অদ্ভুত জ্ঞানের প্রভাবে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

পুরাণকারগণ সৃষ্টির এই সুপ্রাচীনত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষই যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠবস্তু তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। অন্য জগতেও মানুষ বা তদপেক্ষা উন্নততর জীব থাকিতে পারে তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরাণ সঙ্কলন করিয়া সনাতনকে যে সৃষ্টির বিশালত্ব ও ঈশ্বরের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য ও শক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার একটু এখানে বলিব।

চৈতন্য চরিতামৃত। মধ্য লীলা। ২০ পরিচ্ছেদ হইতে।

সর্ব্বতত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডেরগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
এহোমহৎস্রষ্টাপুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার লোম কূপে ধাম॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু-আসে যায়।
পুরুষ নিঃশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়।
পুনরপি নিঃশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়া পর॥

* * * *

সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একেক মূর্ত্যে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা।

ঈশ্বরের শক্তি যে কত অদ্ভুত তাহার একটি কথা। আমাদের যুবা-বস্থায় বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহু হিসাব করিয়া ঠিক করিলেন দিন দিন সূর্য্যমণ্ডলের তাপ ক্ষয় হইতেছে। এইভাবে তাপ ক্ষয় হওয়াতে সূর্য্যমণ্ডল দিন দিন ছোট হইয়া যাইতেছে। এবং কালে ইহা তাপহীন শীতল পিণ্ডে পরিণত হইবে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এক প্রলয় নামক প্রবন্ধ বক্তৃতা করিলেন। সূর্য্য শীতল হইবার বহু পূর্ব্বেই এই পৃথিবী লোকবাসের অনুপযুক্ত হইবে। অর্থাৎ পৃথিবী জনশূন্য হইবে। আমার এক কল্পনাপ্রবণ বন্ধু এই শুনিয়া কয় রাত্র দুর্ভাবনায় ঘুমাইতেই পারেন নাই।

রেডিয়ো অ্যাকটিভ (radio active) মূল পদার্থের আবিষ্কার হওয়ার পর হইতে জানা গিয়াছে যে এই সকল পদার্থের শক্তির ক্ষয় হয় না। অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলস্থ radioactive পদার্থ সমূহ জগতে বহু বর্ষ তাপ ও আলোক দিয়াও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না।

গ্রাম-ভারত

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষের সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক। এই সভ্যতা একদিন সারা পৃথিবীকে সত্যের পথে চলিবার নিশানা দিয়াছে। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে ঢেউ আসিয়া ভারতের সমুদ্রতটে ধাক্কা দিয়াছিল, তাহাই একদিন পূর্ণ পরাক্রমে ভারতের গ্রাম্য জীবনকে ধ্বংস করিয়া আমাদের হতভাগ্যের বেশ ধারণ করাইয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। যে গ্রামের কৃষি একদিন দেশের মানুষকে খাওয়াইয়া বিদেশের ক্ষুধা নিবারণ করিবার সামর্থ্য ধরিত, আজ সেই গ্রামের মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতেছে বিদেশী খাদ্যে! যে-গ্রামের হাজার হাজার শিল্পী একদিন অফুরন্ত শিল্প-সম্ভারে দেশ-বিদেশের হাটে পসরা সাজাইত, সেই গ্রামের শিল্পীরা আজ বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও বেকার জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে! সেই গ্রামের কোটী কোটী মানুষকে আজ লজ্জা নিবারণের জন্য সকীতোদর পুঁজিপতিদের সহরকেন্দ্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পানে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে হইতেছে!

গ্রামের একদা স্বয়ং সম্পূর্ণ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা মানুষের অচেতনতা ও অজ্ঞানতার সুযোগে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং গ্রাম-ভারতকে করুণতম দুর্দশার পঙ্কে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছে। গ্রাম সম্পর্কে সহরবাসী মানুষের ও ভাববিলাসী সাহিত্যিকের মনে যে স্বপ্নময় ছবি বাঁচিয়া থাকে, তাহা আজ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রামের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। দারিদ্র্যের নগ্ন মূর্তি গ্রাম-ভারতের জীর্ণ দেহে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বৈশাখের রুদ্র রূপের মাঝে রৌদ্রতপ্ত নিষ্করুণ মাটির বুকে এই নগ্নতা আরো প্রকট হইয়া উঠে। মুখে-চোখে শত মালিন্যের ছাপ আঁকিয়া দারিদ্র্য-রাক্ষসীর ভয়প্রদ নৃত্য যিনি স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন নাই, কয়েকটি কালির আখরে তাহা বোঝানো সম্ভবপর কিনা জানিনা।

গ্রামের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির উত্থান-পতনের সঙ্গে গ্রাম্য অর্থনীতির অগ্রগমনের প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু কৃষির সর্বপ্রকার অনুকূল ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উন্নতি তো হয়ই নাই। দেশে দেহের সরু সরু শিরা-উপশিরার মত শত শত নদীনালায় জলস্রোত বহিত, মাটিকে করিত শস্য শ্যামলা, যাতায়াত ও বাণিজ্যের ছিল অবাধ সুযোগ-সুবিধা। দৃষ্টি না দিবার জন্য, পুঁজিগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় রেলপথ তৈয়ারীর ফলে অধিকাংশ নদীর গতি ও স্রোত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, নদীনালার বুক মজিয়া গিয়াছে, সেচ ও চলাচলের সহজ পথ শেষ হইয়া গিয়াছে। দেশে সার নাই, সার-সংরক্ষণের প্রথাও বিলুপ্ত হইয়াছে। জমির ফসল কমিয়াছে, উৎপাদনের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে। চাষীর ঘরের পাশে যে হাজার হাজার গ্রাম্য শিল্পী কুটীরে কুটীরে বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত, তাহা আর নাই। বিদেশী শিল্পের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গ্রাম্য কুটীর শিল্পীর কারু সৃষ্টির কুশলী হস্তের উপর আঘাত হানিয়াছে, আমরা কৃত্রিম চাকচিক্যে ভুলিয়া দেশীয় গ্রাম শিল্পকে অবজ্ঞা করিয়াছি; ফলে কুটীর শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মুষ্টিমেয় ধনিক ও পুঁজিপতির স্বার্থে পরিচালিত কয়েকটি বৃহৎ শিল্প দেশের জনসংখ্যার সামান্য অংশ মাত্রের রোজগারের পথ প্রশস্ত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু কুটীর শিল্পের সমস্ত সম্ভাবনা ধ্বংস হওয়ার ফলে জমির উপর চাপ বাড়িয়াছে গ্রাম্য অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কোটী কোটী গ্রামিক মানুষকে চরম দারিদ্র্যের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

বিদেশী শাসকের কলমের খোঁচায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিতে যে পরগাছা জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কৃষি-অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ। আজ হয়তো জমিদারের সে দাপট, অত্যাচার ও শোষণ নাই, কিন্তু একদিন এই জমিদারী-পদ্ধতিই কৃষি-ব্যবস্থার সমূহ সর্বনাশ করিয়া দিয়াছে। জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ ও শোষণ বজায় রাখিবার যে সব কুকীর্তি ও অত্যাচারের অবৈধ সমাবেশ একদিন ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে সেচ ও কৃষিব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতি আসিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদারী প্রথার অবৈধ মিলনের স্বাভাবিক ফলস্বরূপ যে সুদখোর মহাজন শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা গ্রামের সর্বশ্রেণীর মানুষকে দারিদ্র্যের গভীর গহ্বরে নামাইয়া দিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিপতি, জমিদার ও মহাজন যে-ভাবে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া তাহাকে শোষণ করিয়া অস্থিচর্মসার করিয়া দিয়াছে, তাহা দরদী মন লইয়া চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়!

একদিন গ্রামে ছিল প্রচুর খাদ্য, প্রচুর আনন্দ ও সহজ নির্বিরোধী জীবনযাত্রা। সুখী গ্রাম জীবনের কোলাহলে মানুষ ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাহা আর নাই। দারিদ্র্যের নিত্যসঙ্গী স্বাস্থ্যহীনতা গ্রামের বুকে জাঁকিয়া বসিয়া আছে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি মানুষ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুস্থ নীরোগ মানুষ আজ প্রদর্শনীর উপযোগী জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামে দিন দিন নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। কিন্তু তদনুযায়ী প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থার অভাব গ্রাম-জীবনের সর্বাংশে পরিস্ফুট। এক এক সময় ঝড়ের মত মহামারী আসে, আর হাজারে হাজারে মানুষ মরে। পথ্য নাই, চিকিৎসার অভাব, বৈজ্ঞানিক প্রথায় ব্যাপক অভিযানের পরিকল্পনাও নাই। পেটজোড়া প্লীহার ভারে পঙ্গু মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। এই মানুষই উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে বলিষ্ঠ ও সবল হইয়া উঠিত, দুর্দশার সমাধানের সুষ্ঠু পথ খুঁজিতে পারিত, নিজেদের পায়ে ভর দিয়া বাঁচিবার উপায় অনুসন্ধান

করিত। কিন্তু শিক্ষার আশীর্বাদের স্বল্পতম ভাগ পাইয়া গ্রাম-জননী তাঁহার সন্তানদের কতটুকু 'মানুষ' করিতে পারিবেন? উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রামের ছাত্রকে সহরে ছুটিতে হইবে কেন? গ্রামের ছাত্র গ্রামে বসিয়া বিদ্যার্জন করিতে পারিবে না—ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কী থাকিতে পারে? দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যাহারা ধারক ও বাহক, সেই মধ্যবিত্ত সমাজের গ্রামের মাটির বুকে সত্যিকারের কোনো স্থান নাই। জীবিকার্জনের কোনো সুযোগ না থাকায়, গ্রামের মাটির প্রাণরস হইতে বঞ্চিত গ্রাম্য সমাজের এই অংশটিকে নাগরিক কৃত্রিম সভ্যতার নিকট গ্রামীণ সত্তাকে বিক্রয় করিয়া আসিতে হয়। এ ট্রেজেডিও দুর্বিসহ! গ্রামের শতকরা ৭০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। বেশী জমির মালিক কৃষক হয়তো বর্তমানে চিত্তসংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু ছোট চাষী ও ক্ষেত মজুরদের দুর্দশার অন্ত নাই।

প্রাকৃতির সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্ক যতই তফাৎ হইয়া যাইতেছে, ততই তাহার বঞ্চনা বাড়িতেছে। মাটীতে ফসল নাই, গাছে ফল নাই, গরুর বাঁটে দুধ নাই। অস্থিসার গরুর মুখে খাবার তুলিয়া দিবার শক্তি অর্ধাহারী মানুষ হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রতিদানে কচি শিশুর বাঁচিবার মত দুধটুকুও আজ সে পাইতেছে না। মাটী আজ যেন প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৃক্ষ ও অরণ্য হইতে বঞ্চিত। মাটীর বুকে ঘাসের অপ্রাচুর্য; বৃক্ষের সমারোহ আর মানুষকে আশ্রয়দান করে না। লতাগুল্মে ফুল ফোটে না, গাছে গাছে ফল ধরে না! প্রাকৃতির এই সম্পদ হইতে মানুষ হইয়াছে বঞ্চিত। গ্রামের রান্নাঘরে খনির অভ্যন্তর হইতে কয়লা আমদানী না করিলে রন্ধনকার্য আজ অসমাপ্ত থাকিবে। প্রকৃতির পরিহাসেও দরিদ্র মানুষ বিপন্ন।

এই তো গ্রামের একদিকের ছবি। অপর দিক মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির, হৃদয় ও মনের ছবির ব্যর্থ করুণ কাহিনীতে ভরা। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের কূট কৌশলে দেশের গ্রামীন শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ অপহৃত, বিনষ্ট। যেখানে মূল অর্থনীতি বিধ্বস্ত, সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইবে, ইহা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। গ্রামের মানুষের মধ্যে নাই হৃদয়ের সম্পর্ক, স্বার্থবুদ্ধির বিষাক্ত ধোঁয়ায় তাহা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে; পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায়ের মনোভাব একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। ঝগড়া বিবাদ, দলাদলি, নোংরামি, ষড়যন্ত্র, পশুপ্রকৃতির সমস্ত প্রকার বহিঃপ্রকাশ গ্রামের মানুষকে আজ কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়! মনুষ্যত্বের আলোকশিখা নির্বাপিত! শঠ, দুশ্চরিত্র, মাতাল, জুয়াচোর, স্বার্থপরায়ণ, শোষণকারী, চোরাবাজারী, নৈতিক আদর্শহীন, কুটিল ও দুর্নীতিপরায়ণ কিছু ব্যক্তি অনগ্রসর সমাজের মাথায় বসিয়া দুর্দশা ও সর্বনাশের অন্ধকারে গ্রামকে ঠেলিয়া দিয়া পশুজীবন যাপন করিতে বাধ্য করিতেছে। লোভ ও অতিলাভের নেশায় গ্রামলক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়া আজ মানুষ আপন স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যস্ত। ভদ্র মোড়লের দল শোষণের পথ অব্যাহত রাখার জন্য মিথ্যা জুয়াচুরির পাপ বাড়াইয়া চলে, মদ তাড়ির আসর খোলে, গ্রামের বুকে বসিয়া নৈতিক অনাচারের স্রোত বহাইয়া অর্থের লোভ দেখাইয়া নারীর শুচিতা নষ্ট করে, মানুষকে সর্বহারা করিয়া চুরি-ডাকাতির মুখে ঠেলিয়া দেয়, নেশা ও করুণার ছিটেফোঁটা ছড়াইয়া অশিক্ষিত মানুষের সমর্থন আদায় করে,—আবার 'পাপমুক্তি'র জন্য শোষণের পয়সাই দান করে, গঙ্গাস্নান করে, ধর্মের ও শাস্ত্রের শ্লোক আওড়াইয়া সমাজের বিধান দেয়, গ্রামের একমাত্র নেতা বলিয়া নিজেদের ঢাক পিটাইয়া বেড়ায়। সমাজের কৃত্রিম জাতিভেদের সুযোগে মানুষে মানুষে হানাহানি সৃষ্টি করে, অস্পৃশ্যতার ব্যবধান বাড়াইয়া দেয়, মানুষের মনের নারায়ণকে গলা টিপিয়া হত্যা করে। অজ্ঞতা ও কু-সংস্কারপূর্ণ গ্রাম-জীবন যেন অহিফেনের নেশায় ঘুমাইয়া আছে, আর রক্তশোষক বাদুড়ের মত কিছু স্বার্থপরায়ণ লোক তাহাদের শোষণ করিয়া চলিয়াছে। নৈতিক জীবনের শেষ হইয়াছে, সরল জীবনযাত্রা নাই, বলিষ্ঠ মনোভাব নিষ্পিষ্ট!

বর্তমান যুগের নগর-সভ্যতাও গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গ্রামের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ভাবধারাকে শুকাইয়া দিয়াছে। দেশের পাঁচ লক্ষাধিক গ্রামের সম্পদ শোষণ করিয়া শহর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গ্রামের বুকের রক্তে স্ফীত করিয়া ধনীকে আরো ধনী করিতেছে, দরিদ্র হইয়া যাইতেছে দরিদ্রতর। দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় জমিলে যে তাহা সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্য ও অনিয়মের লক্ষণ, তাহা যে মৃত্যুর দিকে পদক্ষেপন,—তাহা ভাবিবার মত সুস্থ মস্তিষ্ক কল্যাণব্রতীর অভাব আজ প্রতি পদে অনুভূত হইতেছে। ভারতের গ্রামীণ সভ্যতা, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিবার মত সর্বত্যাগী যাত্রীদল কোথায়? শহরের রাজনৈতিক দলাদলি ও কচাকচির বিষাক্ত আবহাওয়ায় গ্রামের এই দুঃখ-বেদনার কথা সকলেই ভুলিতে বসিয়াছে।

এই আমাদের গ্রাম, এই তাহার সুখ দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, নির্যাতন ও শোষণের এক টুকরা ছবি। এই গ্রামকে দুর্দশার অতল গহবর হইতে আলোকের পথে লইয়া আসিবার দায়িত্ব কাহারো একার নহে, একার দ্বারা সম্ভব নহে—না সরকারের, না কর্মীর, না গ্রামবাসীর। দেশ স্বাধীন হইলেও এই চিন্তার ধারা এখনো শিক্ষিত মানুষের মনে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। শহরের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরাগের কোন সার্থকতা নাই। শহর ও গ্রামের কৃত্রিম বিভেদের কথা মনপ্রাণ দিয়া বুঝিতে হইবে; দেহের স্বাস্থ্য যে সর্বাঙ্গে সহজ রক্ত-চলাচলের উপর, শুধু মাথায় রক্ত জমিলে যে তাহা ব্যাধির লক্ষণ,—তাহা হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হইবে। শহরমুখী মনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রামমুখী করিয়া তুলিতে হইবে; গ্রামের মাটি, ধূলা, বৃক্ষ, অরণ্য, নদীনালা, জলকাদাকে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিতে হইবে। বুঝিতে হইবে গ্রামের সর্ববিধ সমস্যার সমাধানই গ্রামসেবার মূল কথা। ভালো করিব, কল্যাণ করিব এবং কিছু করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিব—ইহা গ্রামসেবার পথ নহে। গ্রামের সামগ্রিক রূপ কী হইবে,—রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কীভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছাইবে, তাহা যতদিন না গ্রামিক মানুষের চিন্তায় সুস্পষ্ট ছাপ দিতে পারিবে, ততদিন বাহির হইতে, উচ্চাসন হইতে ভালো করিবার চেষ্টা করিয়া কোনো বৈপ্লবিক সমাধান করিতে পারা যাইবে না। তাই গ্রামের অবহেলিত মানুষকে আপন ভাবিয়া শিক্ষার কৃত্রিম আভিজাত্য ভুলিতে হইবে; মাঠে মাঠে, কুটিরে কুটিরে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রমের মাধ্যমে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, তাহাদের শ্রমের পূর্ণ মর্যাদা দিয়া তাহাদের পাশে আসিয়া আপনজনের গৌরবে দাঁড়াইতে হইবে। গ্রামের মানুষ হিসাবে সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার অর্জনের ক্ষমতা যে তাহাদের হস্তেই ন্যস্ত, সেই ডাক দিবার সময় আসিয়াছে। নিজেদের বাঁচের দ্বারা, আপন শক্তির সংঘবদ্ধতায়, দুর্বলতা ও হীনতাবোধের যে খোলস অন্তরের সত্তাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে, সেই খোলস খুলিয়া ফেলিয়া এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইবে। গ্রামের সর্বসাধারণের মনে এই স্বাধিকারবোধ জাগ্রত করিয়া স্বয়ংস্বাধীন গ্রাম-গঠনের স্বপ্ন লইয়া পথ চলিব, গ্রামের সকলকে লইয়া কর্মের মধুচক্র রচনা করিব, সুসংহত চিন্তাধারাকে গ্রামের মাটির বুকে বাস্তব রূপ দান করিব—ইহাই আজিকার দিনে সবাকার সংকল্প হোক।

(চিত্র-নাট্য)

(পূর্বানুসরণ)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। লিলির ঘরে নৃত্য গীত চলিতেছে। দাশু পিয়ানো বাজাইতেছে ; লিলি নাচিতেছে। ফটিক ঘরের এক কোণে বসিয়া নৃত্যের তালে তালে তুড়ি দিতেছে ; অন্য কোণে মন্মথ বসিয়া অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে। লিলি নাচিতে নাচিতে গাহিতেছে—

লিলি : আমার কল্পনাতে চল্‌ছে জাল-বোনা
মনের ওপর রঙের আল্‌পনা।
আমরা দু'জন বাঁধব সুখনীড়
অজানা কোন্ গিরি-নদীর তীর
রইব দূরে—কারুর কথা মান্‌ব না !
কল্পনাতে চল্‌ছে জাল-বোনা।—
মোদের ছোট্ট খেলা-ঘর
খেলব মোরা নতুন বধূ-বর
সোনার স্বপন প্রেমের স্বপন ভাঙব না !
কল্পনাতে চল্‌ছে জাল-বোনা।—
ডাক্‌বে ময়ূর মোদের আঙিনায়
নাচবে হরিণ তরুণ ভঙ্গিমায়
মোরা দেখব শুধু ভুলেও তাদের বাঁধব না !
কল্পনাতে চল্‌ছে জাল-বোনা !

নাচগান সমে আসিয়া থামিলে লিলি মন্মথর সম্মুখে গিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইল। মন্মথ উঠিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিল।

লিলি : কেমন লাগল মন্মথ বাবু ?

মন্মথ : কি বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।—আপনার জন্যে সামান্য উপহার এনেছি, তাই দিয়ে মনের ভাব বোঝাবার চেষ্টা করি।—

মন্মথ পকেট হইতে মখ্‌মলের কৌটাটি বাহির করিল। দাশু ও ফটিক উপহারের নামে কাছে আসিয়া জুটিল ; মন্মথ বেশ একটু আড়ম্বরের সহিত বাক্সটি খুলিয়া লিলির সম্মুখে ধরিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। বাক্স শূন্য, হার নাই ! মন্মথ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া রহিল।

মন্মথ। অ্যাঁ—কোথায় গেল !

সে ক্ষিপ্রহস্তে দুই পকেট খুঁজিয়া দেখিল কিন্তু কিছু পাইল না। তাহার মুখ পাংশু হইয়া গেল।

মন্মথ : নিশ্চয় কেউ আমার পকেট মেরেছে—

দাশু ও ফটিক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। লিলির অধরেও একটা চাপা হাসি খেলিয়া গেল।

লিলি : কি ছিল মন্মথবাবু ?

মন্মথ। জড়োয়া পেণ্ডেণ্ট হার। বাড়ী থেকে যখন বেরিয়েছি তখনও ছিল—অ্যাঁ !

দিবাকরের সর্পভীতির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তবে কি—তবে কি—? মন্মথ ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

লিলি। তবে বোধহয় রাস্তায় কোথাও পড়ে গেছে। কী আর হবে ? যা গেছে তার জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। আসুন মন্মথবাবু, এক গ্লাস সরবৎ খান।—ওরে কে আছিস !

মন্মথ মোহগ্রস্তের ন্যায় বসিয়া রহিল ; দাশু ও ফটিক শিস্ দিতে দিতে ঘরের অন্যদিকে চলিয়া গেল। হঠাৎ মন্মথ লাফাইয়া উঠিল ; তাহার মুখ চোখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে।

মন্মথ। বুঝেছি কে নিয়েছে ! ও ছাড়া আর কেউ নয়। দেখে নেব—আজ দেখে নেব আমি !

সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। বাকী তিনজন জিজ্ঞাসুনেত্রে পরস্পরের পানে চাহিল।

ফটিক: ব্যাপার কি ?

দাশু: (হাত উল্টাইয়া) বুঝলাম না।

ডিজল্‌ভ্।

নন্দা তাহার ঘরে আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসিয়াছিল; কিন্তু পড়ায় তাহার মন বসিতেছিল না। তাহার মুখখানি বিবর্ন ও উৎকণ্ঠিত।

কিছুক্ষণ বই নাড়াচাড়া করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিল, দিবাকরের ঘরের দরজা ভেজানো রহিয়াছে। সে সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকার, ভিতরে কেহ নাই। নন্দার উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়া গেল। কোথায় গেল দিবাকর ? তবে কি তাহাকে মিথ্যা স্তোক দিয়া পলায়ন করিয়াছে ? নন্দা নীচে নামিয়া চলিল!

কাট্।

হল্ ঘরের ঘড়িতে রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। নন্দা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে দেখিল মন্মথ সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। মন্মথর মুখ ক্রোধে বিবর্ণ; সে একবার কট্‌মট্ চক্ষে চারিদিকে তাকাইয়া লাইব্রেরী ঘরের দিকে চলিল।

লাইব্রেরীতে যদুনাথ বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন; মন্মথ বুনো মোষের মত প্রবেশ করিতেই তিনি বই হইতে মুখ তুলিলেন।

যাদুনাথ: মন্মথ! আজ দেখছি ন'টার আগেই ফিরেছ! কি হয়েছে ?

মন্মথ: দাদু, তুমি ঐ দিবাকরটাকে তাড়িয়ে দাও।

যদুনাথ চশ্‌মা খুলিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিলেন।

যদুনাথ: দিবাকরকে তাড়িয়ে দেব! কেন, কি করেছে সে ?

মন্মথ: (থমকিয়া) সে—তাকে আমার পছন্দ হয় না।

যদুনাথ: পছন্দ হয় না! কিন্তু কেন ? একটা কারণ থাকা চাই তো! আমি তো দেখেছি সে ভারি ভাল ছেলে, কাজের ছেলে। ভুবনটা ছিল চোর। দিবাকর আসার পর সংসার খরচ অর্দ্ধেক ক'মে গেছে, তা জানো ?

মন্মথ: কিন্তু ও ভাল লোক নয়, ভারি বজ্জাৎ—

যদুনাথ: বজ্জাৎ! কোনও প্রমাণ পেয়েচ ?

মন্মথ। প্রমাণ আবার কি! আমি জানি ও ভারি বদ্ লোক।

যদুনাথ ভ্রূকুঞ্চন করিয়া সরোষে মাথা নাড়িলেন।

যদুনাথ: ছি মন্মথ! যার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই তাকে তুমি বজ্জাৎ বলতে পার না। তুমি যদি দেখাতে পারো যে দিবাকর কোনও অন্যায় কাজ করেছে, আমি এই দণ্ডে তাকে বিদেয় ক'রে দেব। কিন্তু বিনা অপরাধে বাড়ীর কুকুর বেরালকেও আমি তাড়াব না। এ তোমার কি রকম স্বভাব হচ্ছে ? তুমি তাকে পছন্দ কর না ব'লে তার অন্ন মারতে চাও ?

মন্মথ মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর দিল না।

যদুনাথ: যাও। আর যেন এরকম কথা আমাকে শুনতে না হয়। ন্যায়বান হবার চেষ্টা কর মন্মথ। নিজের চাকর বাকরের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে এ কথা ভুলে যেও না।

মন্মথ মুখ কালীবর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। দ্বারের বাহিরে পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া নন্দা সমস্তই শুনিয়াছিল; মন্মথ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলে সেও সংশয় মন্থর পদে উপরে চলিল।

কাট্।

উপরে মন্মথ নিজের দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল; দেখিল দিবাকর পিছনে হাত দিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার শান্ত মুখে একটু মোলায়েম হাসি।

দিবাকর: দরজাটা বন্ধ ক'রে দিন!

দরজা বন্ধ করিয়া মন্মথ প্রজ্বলিত চক্ষে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মন্মথ: ইউ! তুমি আমার ঘরে কি করছ ?

দিবাকর: কিছু না, এই ছবিখানা দেখছিলাম।

পিছন হইতে হাত বাহির করিয়া দিবাকর লিলির ফটোখানা মন্মথর চোখের সামনে ধরিল। মন্মথ ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল, তারপর এক ঝাপটায় ছবিটা কাড়িয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

মন্মথ। ইউ স্কাউণ্ড্রেল্! বেরোও আমার ঘর থেকে। গেট্ আউট্।

দিবাকর: বেরুচ্ছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে দু' একটা কথা বলতে চাই। মন্মথবাবু, আপনি যে স্ত্রীলোকের ফটো যত্ন করে দেরাজে লুকিয়ে রেখেছেন তার আসল পরিচয় বোধহয় জানেন না—

মন্মথ: চোপ্‌রাও উল্লুক! চোর কোথাকার!

বাহিরে বারান্দায় এই সময় নন্দা নিজের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; মন্মথর উগ্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে দিবাকরের মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। সে একটু ভ্রূ তুলিয়া বলিল—

দিবাকর: চোর! আপনি আমাকে চোর বলছেন!

কেন? আমি আপনার পকেট থেকে এই জিনিসটা তুলে নিয়েছিলাম ব'লে?

দিবাকর পকেট হইতে হারটি লইয়া আঙুলের ডগায় তুলিয়া ধরিল। এবারও মন্মথ ঝাপটা মারিয়া হারটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। ঠিক সময়ে দিবাকর হাত সরাইয়া লইল।

মন্মথ। তুমি—তুমি!—

দিবাকর: (হার পকেটে রাখিয়া) হ্যাঁ, এ হার আমি আপনার পকেট থেকে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এ হার আপনার পকেটে গেল কি ক'রে মন্মথবাবু? নন্দা দেবীর হার পকেটে নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

মন্মথ: সে খবরে তোমার দরকার নেই, পাজি রাস্কেল কোথাকার! আমি যাচ্ছি দাদুকে বলতে যে তুমি আমার পকেট মেরেছ!

দিবাকর: বেশ তো, চলুন না আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আপনার যা বলবার আপনি বলবেন, আমার বক্তব্য আমি বলব। আপনার বোনের নতুন গয়না নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, জানতে পারলে কর্তা খুব খুশী হবেন। চলুন তাহলে, আর দেরী ক'রে কাজ নেই।

মন্মথ একটা চেয়ারে জবুথবু হইয়া বসিয়া পড়িল; তাহার আর যুদ্ধস্পৃহা রহিল না। ক্লান্তকণ্ঠে বলিল—

মন্মথ: যাও—যাও আমার সামনে থেকে—

দ্বারের বাহিরে নন্দা প্রায় হতজ্ঞান হইয়া শুনিতেছিল। কে চোর তাহা বুঝিতে তাহার বাকী ছিল না।

দিবাকর: মন্মথবাবু, আপনি কোন্ পথে চলেছেন তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? নিজের বোনের গয়না চুরি ক'রে আজ আপনি এক অপদার্থ স্ত্রীলোককে দিতে যাচ্ছিলেন। আপনি জানেন না, আপনার মত অনেক লোকের সর্বনাশ করেছে লিলি—এই তার পেশা—

মন্মথর ক্ষাত্রতেজ আর একবার চাগাড় দিয়া উঠিল।

মন্মথ: দ্যাখো, ভাল হবে না বলছি—

দিবাকর: আমি কর্তাকে সব কথাই বলে দিতে পারি। শুনে তিনি সম্ভবত আপনাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবেন। কিন্তু আমি তা চাই না। এখনও সামলে যান, মন্মথবাবু, নৈলে আপনার ইহকাল পরকাল সব যাবে, লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারবেন না।

মন্মথ: যাও তুমি—

দিবাকর: যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন।

সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই নন্দার সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। কোনও কথা হইল না; দিবাকর ঘাড় নীচু করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নন্দা লজ্জা-লাঞ্ছিত মুখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে দিবাকরের অনুসরণ করিল।

দিবাকর ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, নন্দা আস্তে আস্তে টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। দিবাকর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। তারপর দিবাকর গম্ভীর মুখে হারটি পকেট হইতে বাহির করিয়া নন্দার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল।

নন্দা হারের পানে ফিরিয়াও চাহিল না। কাতর চক্ষু দিবাকরের পানে তুলিয়া ম্রিয়মান কণ্ঠে বলিল—

নন্দা: দিবাকরবাবু, কি ব'লে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব?

দিবাকর। ক্ষমা চাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না, নন্দা দেবী। কিন্তু আশা করি, এর পর আপনার দাদুকে আর কিছু বলবার দরকার হবে না।

নন্দা: (অবরুদ্ধ স্বরে) দাদুকে কী বলব! দাদা আমার হার চুরি করেছিল এই কথা দাদুকে বলব! উঃ, দিবাকরবাবু, সত্যি বলছি আপনাকে, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। শেষে দাদা এই করলে!

দিবাকর: মন্মথবাবুকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায়না। উনি বড় অসৎ সঙ্গে পড়েছেন।

নন্দা: এখন বুঝতে পারছি দাদা কিসে এত খরচ করে। কিন্তু যাক ও কথা। দিবাকরবাবু, আপনাকে অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

দিবাকর: ক্ষমা করবার কিছু নেই, নন্দা দেবী। আমাকে সন্দেহ ক'রে কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে।

নন্দা: (শঙ্কিত কণ্ঠে) যেতে হবে!

দিবাকর: হ্যাঁ, আমি চাকরি ছেড়ে চ'লে যেতে চাই। দেখুন, আমি যতদিন এ বাড়ীতে থাকব, আপনার সন্দেহ যাবে না; আমি চোর একথা আপনি ভুলতে পারবেন না। তার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল।

নন্দা: আর কখনও আমি আপনাকে অবিশ্বাস করব না।

দিবাকর: (ম্লান হাসিয়া) এখন তাই মনে হচ্ছে বটে কিন্তু এর পরে যখনই বাড়ীতে কিছু ঘটবে, আপনি আমাকে সন্দেহ করবেন। আপনি এক দণ্ড প্রাণে শান্তি পাবেন না। তার কী দরকার? আপনার অশান্তি আর বাড়াবো না।

নন্দার চক্ষু সহসা অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নন্দা: আপনি এখনও আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি, তাই চ'লে যেতে চাইছেন।

দিবাকর: না, সেজন্যে নয়। আপনার অশান্তির কথা ভেবেই আমি—

নন্দা: আমার অশান্তির কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।

দিবাকর: আপনি আমার জন্যে যা করেছেন—

নন্দা: আমি আপনার জন্যে যা করেছি তার জন্যে যদি আপনার এতটুকু কৃতজ্ঞতা থাকে তাহলে আপনি চ'লে যেতে পাবেন না।

দিবাকর ক্ষণেক নীরব রহিল।

দিবাকর: এই যদি আপনার হুকুম হয়—

নন্দা: হ্যাঁ, এই আমার হুকুম।

নন্দা দ্রুতপদে দ্বারের পানে চলিল। পিছন হইতে দিবাকর ডাকিয়া বলিল—

দিবাকর: আপনার হার ফেলে যাচ্চেন।

নন্দা কিন্তু দাঁড়াইল না।

ডিজল্‌ভ্‌।

চন্দ্রহীন রাত্রি। নন্দার ঘরে ক্ষীণ নৈশ দীপ জ্বলিতেছে। নন্দা এখনও শয়ন করে নাই, জানালায় দাঁড়াইয়া নক্ষত্র খচিত অন্ধকারের পানে চাহিয়া আছে। আজ সে নিজের মনের কথা জানিতে পারিয়াছে; দিবাকরের প্রতি তাহার মনের ভাব শুধুই করুণা ও সহানুভূতি নয়।

তাহার চোখদুটি তারায় তারায় সঞ্চরণ করিতেছে। তারপর তাহার কণ্ঠ হইতে মৃদু বিগলিত সঙ্গীত বাহির হইয়া আসিল—

নন্দা: দু'জনে কইব কথা কানে কানে—কানে কানে—
যেন তা কেউ না জানে কেউ না জানে।
যে কথা যায়না ধরা যায়না ছোঁয়া
তাহারি বেদন রবে গোপন প্রাণে।
দু'জনে কইব কথা—।
যদি রই দূরে দূরে—দূরে দূরে—
তুমি রও পথের পাশে, আমি রই গৃহচূড়ে
তবুও ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যালোকে
দু'জনে কইব কথা চোখে চোখে।
দু'জনে কইব কথা—।
যদি বা দেখা না পাই হারাই দিশা
নয়নে নেমে আসে অন্ধ নিশা
তখনও ক্ষণে ক্ষণে—ক্ষণে ক্ষণে—
দু'জনে কইব কথা মনে মনে।
দু'জনে কইব কথা—।

কোনও অশরীরী যদি জানালার বাহিরে উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত, নন্দার জানালার পাশে আর একটি জানালায় একজন বিনিদ্র শ্রোতা দাঁড়াইয়া আছে ও তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছে।

ডিজল্‌ভ।

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে। দিবাকর আপন শয্যায় শয়ন করিয়া নিষ্পলক নেত্রে শূন্যে চাহিয়া আছে। ভোগবতীর ন্যায় কোন্ অন্তর্গূঢ় পথে তাহার চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায়না।

নীচে হল্‌ঘরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল। রাত্রির স্তব্ধতায় তাহার আওয়াজ উপরে ভাসিয়া আসিল।

দিবাকর বিছানায় উঠিয়া বসিল। বস্ত্রাদি সম্বরণ করিয়া খাট হইতে নামিল এবং নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইল।

বারান্দা পার হইয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। এই সময় নন্দার ঘরের দ্বার অল্প একটু খুলিয়া গেল। নন্দা মুখ বাড়াইয়া ক্ষণেক সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মুখ আবার সংশয়ের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

নন্দা বাহির হইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত গেল, নীচে উঁকি মারিল; তারপর দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দিবাকর ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার হাতে কি একটা রহিয়াছে, অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না।

দিবাকর লঘুপদে নন্দার দ্বারের সম্মুখ দিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইবে এমন সময় নন্দার দ্বার সহসা খুলিয়া গেল। দিবাকর থতমত খাইয়া হাত পিছনে লুকাইল।

নন্দা ইসারা করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, খাটো গলায় বলিল—

নন্দা: কোথায় গিয়েছিলেন?

দিবাকর: নীচে। একটু দরকার ছিল।

নন্দা: এত রাত্রে—কী দরকার?

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

নন্দা: আপনার হাতে ও কি? লুকোচ্ছেন কেন?

দিবাকর: একখানা বই।

নন্দা: বই!! কী বই? দেখি—

একটু ইতস্তত করিয়া দিবাকর বইখানি নন্দার হাতে দিল। নন্দা বই চোখের কাছে আনিয়া শিরোনামা পড়িয়া অবাক হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী, বাংলা অনুবাদ।

নন্দা: মহাত্মা গান্ধীর আত্ম-জীবনী! এ বই—?

নন্দা উৎফুল্ল বিস্ময়ে দিবাকরের পানে চাহিল। দিবাকর একটু নীরব থাকিয়া ধরা ধরা গলায় বলিল—

দিবাকর: পড়ব। মহাপুরুষদের জীবনী আমার মতন পথহারাকে পথ দেখাবার জন্যেই তো লেখা হয়েছে।

নন্দার হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া টলমল্ করিতে লাগিল। সে বইখানি দিবাকরের হাতে ফিরাইয়া দিল। মহাপুরুষের পূত জীবন-চরিত্রের উপর তাহাদের হাতে হাত মিলিত হইল।

ফেড আউট্।

(ক্রমশঃ)

বার্গসঁ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বাধীন ইচ্ছা

ব্যক্তির জীবনে আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন অবস্থার সমাবেশ—একটির পরে একটি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমগ্র জীবন এইরূপ বিভিন্ন অবস্থার সমষ্টিরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ব্যক্তির জীবন একটি বিচ্ছেদহীন অবিভাজ্য প্রবাহ। এইভাবে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে ব্যক্তির জীবন স্বাধীনরূপে প্রতীত হয়। কোনও একটি বিশেষ কর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিলে, তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী "অভিপ্রায়ের" (motive), অথবা তাহার পরিবেশ অথবা শারীরিক অবস্থার ফল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পরিপাক-শক্তির শর্কতা হইলে রুক্ষ "মেজাজের" উৎপত্তি হয়; এখানে স্বাধীন ইচ্ছা নাই। কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যখন কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন কর্ত্তার অভিপ্রায়ই তাহার কর্ম্মের কারণ। সুতরাং সে স্থলেও ইচ্ছা সেই অভিপ্রায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে অভিপ্রায় অথবা কামনা মানুষের মনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়, তাহা দ্বারাই তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহা সত্য। কিন্তু সমগ্র জীবন হইতে কর্ম্ম-বিশেষকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা সত্য দৃষ্টি নহে। সত্য দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবন্ত সৃজন শক্তি, এবং নূতন সৃষ্টি করাই তাহার স্বভাব। সৃষ্টিকার্য্যই স্বাধীন ইচ্ছা। বুদ্ধির দৃষ্টিতে সৎপদার্থ (Really) নিতির অধীন বলিয়া প্রতীত হইলেও, আমরা অন্তরে আমাদিগকে স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস Intuition হইতে উদ্ভূত। Intuition এ আমাদের সমগ্র জীবন এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয়। যখন একসঙ্গে সমগ্র জীবনের উপর দৃষ্টি পতিত হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে সৃষ্টি-ক্রিয়াই জীবন, এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি করিবার স্বাধীনতা আমাদের আছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, নিরবচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহই যদি সৎ-পদার্থ হয়, তাহা হইলে এই প্রবাহের উৎপত্তি হয় কোথায়? কোন্ উৎস হইতে এই প্রবাহের আরম্ভ? এই প্রবাহের উৎপত্তির পূর্ব্বে কি ছিল, যাহা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে? যদি কিছু না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে শূন্য হইতে কিরূপে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইল? বার্গসঁ বলেন, এই প্রশ্নের কোনও অবকাশ নাই? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবার কোনও হেতুই নাই। আমাদের বুদ্ধিতে "সতের" বিপরীত "অসতের" প্রত্যয়, "সর্ব্বের" প্রত্যয়ের বিপরীত "শূন্যের" প্রত্যয় (void)। সুতরাং "সৎ" যদি না থাকে, তবে সেখানে "অসৎ" থাকিবে, সর্ব্ব যদি না থাকে, শূন্য থাকিবে, আমাদের বুদ্ধিতে ইহাই প্রতীত হয়। কিন্তু "অসৎ" (nothing) একটা অস্তিত্ব-হীন প্রত্যয়। অসতের কোনও ধারণা করা অসম্ভব। কেননা "অসতের" চিন্তাও এক প্রকার চিন্তা; যখন নিজের বিনাশের কল্পনা করা যায়, তখনও আমি আমার কল্পনার ব্যবহার করিতেছি, এ জ্ঞান থাকে। যখন বলি "এখানে কিছুই নাই", তখন যে আমি কিছু না (nothing) বলিয়া কোনও কিছু প্রত্যক্ষ করি তাহা নহে। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর। আমি যাহা খুঁজিয়াছিলাম, যাহা দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই, ইহাই "এখানে কিছু নাই"—ইহার অর্থ। সুতরাং "কিছু না"র চিন্তা হইতেছে যাহার সহিত আমি পরিচিত, এইরূপ কিছুর অভাবের চিন্তা। Elan vitalই যখন সৎপদার্থ তখন তাহার অভাব অর্থ-শূন্যমাত্র নহে, তাহার অর্থ অন্য কিছুর অস্তিত্ব। "Elan vital এর উৎপত্তিস্থল

কি ?" এই প্রশ্নে Elan vital এর আবির্ভাবের পূর্ব্বে এক "অভাবের" অস্তিত্ব, এবং সেই অভাব হইতে Elan vital এর আবির্ভাব স্বীকার করা হয়। এই অভাব একটা ন্যায়ের ফাঁকি অথবা মিথ্যা কল্পনা (fiction) মাত্র। সুতরাং উপরোক্ত প্রশ্নের কোনও অবকাশ নাই। এই প্রশ্ন দার্শনিকগণ তুলিয়াছেন বলিয়াই সৎকে এক এবং সনাতন বলিয়া মনে করা হইয়াছে, এবং পরিবর্ত্তনকে মায়া বলা হইয়াছে। যে বাস্তবের সহিত আমরা পরিচিত তাহার যদি অভাব হয়, তাহা হইলে কিছুরই অস্তিত্ব থাকিবে না, এই বিশ্বাস, এবং অভাব অথবা অবস্তু (nothing) হইতে কিরূপ ভাবের অথবা বস্তুর আবির্ভাব হয়, তাহা বুঝিবার অক্ষমতা—এই দুই কারণবশতঃ দার্শনিকেরা মনে করিয়াছেন, যে যে বাস্তবের সহিত তাঁহারা পরিচিত তাহা সনাতন, অনন্তকাল ধরিয়া তাহা বর্ত্তমান আছে, এবং তাহার কোনও পরিবর্ত্তন অথবা পরিণাম হয় নাই। সুতরাং পরিবর্ত্তনকে মায়া-বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, এবং পরিবর্ত্তন-রাজির তলদেশে বুদ্ধিগ্রাহ্য অপরিণামী নিত্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু "অভাব" এর প্রত্যয়ই যে ভ্রান্তিমূলক, ইহা যখনি বোধগম্য হয়, তখনই বাস্তব সত্তা যে পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহা বোধগম্য হয়।

এই নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ-প্রবাহই ঈশ্বর। প্রাণ ও ঈশ্বর অভিন্ন। কিন্তু এই ঈশ্বর অসীম নহেন, সসীম। তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন। জড়-দ্বারা ঈশ্বর অবচ্ছিন্ন। জড়ের নিশ্চেষ্টতা পরাভূত করিয়া তাঁহাকে ধীর-পদে অগ্রসর হইতে হয়। তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। জ্ঞান এবং সংবিদের অভিমুখে ধীরে ধীরে হাতড়াইতে হাতড়াইতে তাঁহাকে চলিতে হয়। ক্রমশঃ অধিকতর আলোকের অভিমুখে তাঁহার গতি। তিনি সম্পূর্ণ কিছু নহেন, তিনি অফুরন্ত জীবন—অফুরন্ত কর্ম্ম। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা। সৃষ্টি কোনও গুহ্য ব্যাপার নহে। যখনই আমরা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করি, তখনি সৃষ্টি করি ; যখন সচেতন ভাবে আমাদের করণীয় কর্ম্ম বাছিয়া লই, এবং আমাদের জীবন কি ভাবে পরিচালিত করিব, তাহার কল্পনা করি, তখনি আমরা সৃষ্টি-ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। আমাদের জীবন-সংগ্রাম, আমাদের দুঃখ কষ্ট, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরাজয়, বলীয়ান ও মহীয়ান হইবার জন্য ব্যাকুলতা—সকলই Elan vital এর প্রবাহ হইতে উদ্ভূত। যে জড় প্রাণের প্রধান শত্রু একদিন আসিতে পারে, যখন প্রাণ তাহাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিতে এবং মৃত্যুর পাশ হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হইবে। প্রাণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। গত এক সহস্র বৎসরের মধ্যে প্রাণ যাহা করিতে পারিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার শক্তিকে সীমাবদ্ধ কল্পনা করা যায় না। "এই গ্রহে জন্তুগণ তাহাদের স্থান করিয়া লইয়াছে, মানুষ জন্তুদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে এবং সমগ্র (জীবিত ও মৃত) মানবজাতি রূপ বিশাল বাহিনী আমাদের প্রত্যেকের পার্শ্বে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে দ্রুত অভিযানে প্রবল বেগে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বপ্রকার বাধা, এমন কি হয়তো মৃত্যুকে পর্য্যন্ত, পরাভূত করিতেছে।"

সমালোচনা

বার্গসঁ অনবদ্য রচনা শৈলী অধিকারী ছিলেন। তাঁহার উপমার সৌন্দর্য্যে এবং বর্ণনার মাধুর্য্যে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। উপমা এবং উদাহরণের বাহুল্যে অনেক সময় তাঁহার অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। বিশেষ সতর্ক না থাকিলে, তাঁহার রচনা-চাতুর্য্যের এবং উপমার সৌন্দর্য্যের প্রভাবে পাঠকের বিচার-শক্তি বিমূঢ় হইবার আশঙ্কা আছে।

বার্গসঁ উপজ্ঞাকে বুদ্ধির উপরে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু উপজ্ঞা হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা ব্যক্তিগত জ্ঞান, সুতরাং তাহার বিষয়গত সত্যতা-সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না। তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার কোনও উপায়ও নাই।

বার্গসঁ ডারুইনের অভিব্যক্তি বাদের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ডারুইনের যুগের সহিত বার্গসঁর যে সম্বন্ধ, ভলটেয়ারের যুগের সহিত ক্যাণ্টের সম্বন্ধ সেইরূপ ছিল। বেকন এবং দেকার্ত্ত হইতে যে যুক্তিবাদের আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলে লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল। ক্যাণ্ট এই অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধির প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন। ডারুইন নিজে যদিও নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তথাপি তাঁহার অভিব্যক্তিবাদে জগতের সৃষ্টি এবং স্থিতিতে ঈশ্বরের কোনও স্থান না থাকায়, তাঁহার মত ধর্ম্ম বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। হারবার্ট স্পেন্সার প্রকাশ্যভাবেই জগতের কারণকে অজ্ঞেয় বলিয়াছিলেন। ইহার ফলে জড়বাদ ও নাস্তিকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বার্গসঁ এই জড়বাদকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জড়বাদের সমালোচনার সন্তোষজনক উত্তর কেহই এখন পর্য্যন্ত দিতে সমর্থ হন নাই।

বার্গসঁর মতে Elan vital-প্রবাহের বিপরীত গতিই জড়বস্তু। গতির এই বৈপরীত্য উদ্ভূত হয় প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে। কিন্তু এই বাধা আসে কোথা হইতে ? Elan vital নিজে আপনাকে বাধা দেয়, বলিলে কোনও ব্যাখ্যাই হয় না। সুতরাং এই বাধার জন্য দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। প্রাণ-প্রবাহ বৈচিত্র্যহীন নহে, তাহার মধ্যে কেবল পরিবর্ত্তন ভিন্ন আরও কিছু আছে, স্বীকার করিতে হয়। তাহা যদি না করা যায়, প্রাণ প্রবাহের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্যই নাই, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি আমাদিগকে বৈচিত্র্যের জ্ঞান দেয় কেন, তাহার কি কোনও কারণই নাই ? যখন সমস্ত প্রাণ-প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বুদ্ধি একটি সর্পের মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত করে, তখন তাহা-দ্বারা আমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ? যখন কোনও তস্কর পলায়ন করিবার অভিপ্রায়ে নয়টার গাড়ী ধরিবার জন্য অপহৃত দ্রব্য সহ ষ্টেশনে উপস্থিত হয়, তখন গাড়ীর ঠিক সময়ে ছাড়া তাহার উদ্দেশ্যের অনুকূল, কিন্তু যে পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিবার জন্য যাত্রা করিয়া নটার পূর্ব্বে ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারে নাই, তাহার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল। অথচ গাড়ী যে সময়ে [illegible]

হয়, বুদ্ধি প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, এবং বাস্তবের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আছে ; বাস্তবের মধ্যে বৈচিত্র্যও আছে। তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয়, যে জড়ের বৈচিত্র্য—তাহার আকার, কাঠিন্য প্রভৃতি সকলই মায়া, এবং বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে এই ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। বার্গসঁও বলিয়াছেন যে অন্য কোনও ভাবে আমরা চিন্তা করিতে পারি না বলিয়াই বাস্তব সত্তা আমাদের নিকট দেশে বিস্তৃত নীরেট বস্তুরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু যাহা তরল প্রবাহমাত্র, তাহাকে কঠিন ও স্থাণুরূপে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার কারণ যদি সেই তরল প্রবাহের মধ্যে না থাকে, তবে বুদ্ধির মধ্যেই এই ভ্রান্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। বুদ্ধির উপর তাহা হইলে কোন বিষয়ের সত্য জ্ঞানের জন্য নির্ভর করা যায় না। বার্গসঁর দর্শন তাঁহার কুশাগ্রধার বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। সুতরাং বার্গসঁর দর্শনকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা বাস্তব সত্তার রূপ যে বিকৃত হয়, তাহাও স্বীকার করা যায় না।

বার্গসঁ সচেতন সংস্কারকে,—যে সংস্কারের সহিত তাহার জ্ঞান যুক্ত আছে, তাহাকে—উপজ্ঞা বলিয়াছেন। এই উপজ্ঞা তাহার উদ্দেশ্যের বিষয় অবগত এবং তাহার বিস্তার-সাধনে সমর্থ। সংস্কার বলিতে বার্গসঁ ইতর জন্তুদিগের সংস্কারই বুঝিয়াছেন। ইতর জন্তুতে এই সংস্কার মানুষের মধ্যে যতটা, তাহা অপেক্ষা অধিকতর বিকশিত। সচেতন সংস্কার অর্থে বুদ্ধিমিশ্রিত সংস্কার। সুতরাং বার্গসঁর উপজ্ঞার মধ্যে সংস্কার এবং বুদ্ধি উভয়ই আছে। বুদ্ধিকে স্বীয় অঙ্গীভূত না করিয়া উপজ্ঞা যে আমাদিগকে তত্ত্ব-জ্ঞান দিতে পারে না, বার্গসঁ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। উপজ্ঞা-সঞ্জীবিত বুদ্ধি অথবা বুদ্ধিশাসিত উপজ্ঞার আলোকেই কেবল সত্যের স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। বার্গসঁর মতে ইতর জন্তু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে ইতর জন্তুর মধ্যে উপজ্ঞার বিকাশ এবং মানুষের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ সাধিত হইয়াছে। এই জন্যে মানুষের মধ্যে উপজ্ঞা দুর্ব্বল, এবং তাহার প্রকাশ ক্ষণিক। ইতর জন্তুতে উপজ্ঞা স্থায়ী, এবং তাহাদের সকল কর্ম্মই উপজ্ঞা-সঞ্জাত। কিন্তু অনেক মনোবৈজ্ঞানিক ইতর জন্তু ও মানুষের অবচেতন মনকে স্বরূপতঃ একপ্রকার বলিয়াছেন। ইতর জন্তুর সহজাত সংস্কার অবচেতন মনেরই প্রথম প্রকাশ এবং এই অবচেতন মন মানুষে অধিকতর সম্পন্ন এবং বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত। অভিব্যক্তির প্রগতিমার্গে মানুষের ইতর জীবের উর্দ্ধে স্থিতিই উভয়ের অবচেতন মনের পার্থক্যের হেতু। বার্গসঁ মানুষকে "অভিব্যক্তির সফলতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের মধ্যে Elan vital জড়ের যান্ত্রিক শক্তি পরাভূত করিয়া স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে অভিব্যক্তির যে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, ইতর জন্তুগণ তাহার ফল। কিন্তু যে উপজ্ঞাকে বার্গসঁ সত্যের পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইতর জন্তুতে তাহা পূর্ণতর পরিমাণে বর্ত্তমান। মানুষের মধ্যে তাহা নিতান্তই দুর্ব্বল। যে জন্তুদিগকে বার্গসঁ অভিব্যক্তির নিষ্ফল প্রচেষ্টার ফল বলিয়াছেন, তাহারাই সত্যের আবিষ্কারে তাহা হইলে অধিকতর সমর্থ বলিতে হয়। মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বলিবার কোনও কারণ থাকে না। মানুষের মধ্যে যে স্বল্প পরিমাণ উপজ্ঞা এখনও আছে, অভিব্যক্তির প্রগতির সহিত তাহা বিলুপ্ত হইবে, এবং ইতর জন্তু ভিন্ন পরমার্থিক সত্য কাহারও নিকট তখন প্রকাশিত হইবে না। এই ইতর জন্তুগণও অভিব্যক্তির নিষ্ফলতার ফল বলিয়া একদিন তাহারাও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তখন পরমার্থিক সত্যের জ্ঞানও লুপ্ত হইবে। অভিব্যক্তির কি শোচনীয় পরিণাম !

সমাপ্ত

প্রতীক্ষা

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

সুদূর প্রাণের নীহারিকালোক হ'তে
ম্লান-চেতনার ছায়াপথখানি বেয়ে
চরণচিহ্ন তারায় তারায় এঁকে
জীবন-গগনে যদি আসে কোনো নেয়ে,
সেই আশা লয়ে সন্ধ্যার বাতায়নে
প্রদীপের মত দীপ্ত শিখায় জ্বলি,
সেই কামনায় কদম তরুর মত
রোমাঞ্চ ফুলে রচি চির অঞ্জলি।

আলোক হাসির তরঙ্গ পারাবারে
গভীরতা ভেঙ্গে পাড়ি দিয়ে বহুদূর
শত জনমের সাহানার ঝঙ্কারে
যদি ভেসে আসে প্রভাত জাগানো সুর,
সেই আশা লয়ে পথচলা কোলাহলে
শবরীর মত পেতে আছি দুটী কান ;
হৃদয় বীণায় তার বেঁধে বসে আছি
আঘাতে জাগাতে মহাজগতের গান।

ভারতের দক্ষিণে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মহীশূর থেকে ভদ্রাবতীর দূরত্ব ১৮০ মাইল। ভোর ছটায় যখন ঘুম ভাঙল দেখি ট্রেণ ভদ্রাবতী ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রত্যেক কামরার সামনে গরম জলের বাল্‌তি এবং চা নিয়ে হাজির। ষ্টেশনের প্লাটফরম থেকে—শ্রীযুক্ত রামানুজম (ভদ্রাবতী কারখানার অধ্যক্ষ) মেগাফোন যোগে সেদিনের কার্য্যক্রম আমাদের জানিয়ে দিলেন। গাড়ীতে প্রাতরাশ শেষ করে মোটর বাসে আরোহণ করা হ'ল।

ভদ্রাবতীর পুরানো সহর রেল লাইনের এক পাশে, লোহার কারখানা রেল লাইনের অপর পাশে। ভদ্রাবতীর লোহার কারখানা মহীশূর সরকারের প্রতিষ্ঠান। লোহার কারখানায় কয়লার প্রয়োজন খুব বেশী কিন্তু এখানে খনিজ কয়লা না থাকায়—কাঠ থেকে কয়লা তৈরী করে—

হীরাভাস্‌গর বাঁধ

সেই কয়লা ইস্পাত নির্ম্মাণের কাজে লাগান হয়। কাঠ কয়লায় তৈরী ইস্পাতের প্রকৃতি ও গুণ উচ্চ শ্রেণীর।

সমস্ত সকাল কেটে গেল লোহার কারখানা পরিদর্শনে। দুপুরে স্থানীয় টেকনিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে—ট্রেণে ফিরে আসা হল—বিশ্রামের জন্য। দু ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার পরিদর্শন—সিমেণ্ট ও কাগজের কল। প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহী যাঁরা—তাঁরা ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সেচের বাঁধ দেখতে গেলেন।

সিমেণ্ট এবং কাগজের কল দুটী সরকারী প্রতিষ্ঠান নয় তবে এদুটী আংশিকভাবে সরকারী সাহায্য পায় ও সরকারী নির্দ্দেশাধীন। পরিদর্শনের পর কাগজের কলের কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রতিনিধিকে তাঁদের তৈরী কাগজের প্যাড, খাম, বিবরণী ও বিভিন্ন জাতীয় কাগজের নমুনায় একটী বাঁধানো বই উপহার দিলেন।

কাগজের কলের কর্ত্তৃপক্ষ বিকালে চা পানের ব্যবস্থা করেছিলেন—ভদ্রাবতী নদীর কুলে একটী বাঁধানো চত্বরে। স্থান ও পরিবেশ খুবই মনোরম।

সন্ধ্যায় ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রাঙ্গণে—স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা—লাঠিখেলা যৌগিক ব্যায়াম নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। তারপর সেই প্রাঙ্গণেই নৈশভোজন শেষ করে রাত্রি প্রায় পৌনে এগারোটায় ট্রেণে এসে ওঠা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শয্যা গ্রহণ ও নিদ্রা।

পরদিন প্রাতে তালগুপ্পা—ভদ্রাবতী থেকে মাত্র ৭০ মাইলের দূরত্ব। প্রাতঃকালীন ব্যবস্থা ভদ্রাবতীরই মতো—প্রাতঃ ভোজন করা হল ষ্টেশন প্রাঙ্গণের এক বিরাট গুদাম ঘরে। প্রাতঃভোজনের উপকরণাদি উচ্চশ্রেণীর।

প্রথম পরিদর্শন করা হল—"হীরাভাস্‌গর" বাঁধ। ষ্টেশন হতে প্রায়

কারাগলের বাঁধ

দশ মাইল দক্ষিণে। বাঁধটী "এনে হোল" ও সারাবতী নদীর সঙ্গম স্থলে। বাঁধটীর উচ্চতা ১০৪ ফুট—সব শুদ্ধ লম্বায় ৩৮৭০ ফুট, বাঁধটীর জলাশয়ের আয়তন ২৫০,০০০ লক্ষ ঘন ফুট। এই বিরাট জলাধার থেকে—বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জল বার মাস সরবরাহ করা হয়। হীরা ভাসগর বাঁধ থেকে—যোগ প্রপাত ১৩ মাইল উত্তরে। একেবারে মহীশূর রাজ্যের সীমানায়—তারপরই বোম্বাই রাজ্য। পথে পড়ে কারাগলের ছোট বাঁধ—এখান থেকে নদীটীকে দু'ভাগ করে দেওয়া হয়েছে—একভাগ বাঁধানো খালে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের দিকে গিয়েছে—অন্যভাগ নদীর স্বাভাবিক স্রোত, যা আর কিছুদূর গিয়ে যোগ জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছে।

যোগপ্রপাতের অবস্থানটী ভারী সুন্দর। দুই ধারে পাহাড়, মধ্যে গভীর খাদ, মহীশূর রাজ্যের পাহাড়ের ওপর থেকে একলাফে জলধারা ৮৩০ ফুট তলায় খাদে গিয়ে পড়েছে। বোম্বাই রাজ্যের সীমানায় ভ্রমণ-

কারীদের জন্য একটী বাংলো আছে কিন্তু জলপ্রপাতের দৃশ্য ভাল দেখায় মহীশূর রাজ্যের সীমানার বাংলো থেকে। বাংলোটী জলপ্রপাতের ঠিক সামনে—যোগপ্রপাতের চারটী ধারা—প্রত্যেকটীর ভঙ্গী ও নাম বিভিন্ন—প্রথমটীর নাম রাজা, দ্বিতীয়টীর নাম মেঘনাদ বা Roarer, তৃতীয়টীর নাম—হাউই বা Rocket এবং চতুর্থটীর নাম তন্বী বা La Dame Blanche.

এক বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে এই জলপ্রপাতের ধারা অতি ক্ষীণ, এই জলধারা নিয়ন্ত্রণ করা হয় কারাগল বাঁধ বা এনিকাট থেকে। আমাদের পরিদর্শন উপলক্ষে—জলধারার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত বাংলোর হাতায় বসে যোগপ্রপাত সম্বন্ধে নানা খুচরো খবর সংগ্রহ করা হল। কয়েকজন উৎসাহ ভরে যোগপ্রপাতের অবতরণ স্থলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কিন্তু অবশেষে সিঁড়ির সংখ্যা ও অবস্থা লক্ষ্য করে, মনের আবেগ সংবরণ করাই শ্রেয় বোধ করলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঘন্টা খানেক বিশ্রাম—তারপর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন। প্রথমে দেখা গেল, নালী থেকে জল ৪টী ৭২ ইঞ্চি মাপের

যোগ-প্রপাত

পাইপের সাহায্যে পাঠান হচ্ছে—এই পাইপগুলি থেকে আবার কয়েকটী ছোট মাপের পাইপ যোগ করা হয়েছে। সব চেয়ে ছোটটীর মাপ ৪০ ইঞ্চি। পাইপগুলি সোজা ১২৫০ ফুট তলায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের টার-বাইনের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। দুটী ট্রলি লাইনও ঢালুভাবে নীচে চলে গেছে—তারের দড়ির প্রান্তে ট্রলি গাড়ী বাঁধা—লোকজন তার সাহায্যে ওঠা নামা করে। ট্রলিতে নেমে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটী পরিদর্শন করলাম। মহীশূর রাজ্যের বিদ্যুৎ-বিভাগের প্রধান যন্ত্রবিদ্ শ্রীহায়াৎ নিজে উপস্থিত থেকে এই কেন্দ্রটীর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানালেন।

শুনে খুব আনন্দ হল যে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রাদির অনেক অংশ ভদ্রাবতী লোহার কারখানায় নির্ম্মিত। বিদেশী যন্ত্র নির্ম্মাতাদের নিকট বিভিন্ন অংশ সর্ব্ব নিম্ন মূল্যে ক্রয় করে, সেগুলিকে নিজেরা যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করে, শুধু যে দেশের বহু লক্ষ টাকার সাশ্রয় করেছেন তা নয় এখানকার যন্ত্রবিদেরাও নিজেদের বুদ্ধি বৃত্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করেছেন।

এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ১২০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনাটীকে কার্য্যকরী করতে মোট খরচ হয়েছিল ৮ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা। এই বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রটী ভারতীয় যন্ত্র-বিদের গৌরব স্থল। বর্ত্তমানে এই বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রটীর নামকরণ হয়েছে—"মহাত্মা গান্ধী"র নামে।

সন্ধ্যার অল্পপূর্ব্বে বাংলোয় ফিরে এসে নৈশ ভোজন সমাপ্ত করা হল। ভোজনের সঙ্গে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। সমস্ত ব্যবস্থা এত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে এর জন্য মহীশূর কেন্দ্রের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীহায়াত ও নারায়ণ রাও এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

রাত আটটায় স্পেশাল ট্রেণ তালগুপ্পা ষ্টেশন থেকে যাত্রা করল যাতে ভোর ছটার মধ্যে বাঙ্গালোর ষ্টেশনে উপস্থিত হতে পারে। বাঙ্গালোর

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জলের পাইপ

প্লাট ফরমে নেমেই সাক্ষাৎ হল—টমাস্ কুক কোম্পানীর প্রতিনিধির সঙ্গে, হাতে এরোপ্লেনের টিকিট।

মহীশূরের বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা "Air-India" অপিসে উপস্থিত হয়ে সেখানে স্নানাদি সেরে নিলাম। তারপর তাঁদের Busয়ে আটটার সময় বাঙ্গালোর হাওয়াই আড্ডায় গিয়ে পৌঁছলাম।

বাঙ্গালোর হাওয়াই আড্ডাটী মাঝারি রকমের হলেও অনেকগুলি হাওয়াই জাহাজের তৎপরতা এখানে দেখা গেল। সওয়া ৯টায় একখানি প্লেন মাদ্রাজ থেকে এসে দাঁড়াল। সেটীতেই আমাদের চড়তে হবে। বাঙ্গালোর থেকে ত্রিবান্দ্রম ৩ ঘন্টায় যাওয়া যায়। পথে কইমবাটোর ও কোচিনে পনের মিনিটের জন্য অবতরণ করা হয়। বন্ধুদের ভিতর কয়েক-জন এই প্রথম এরোপ্লেনে চড়লেন—ফলে তাঁদের ভিতর সামান্য একটু মানসিক চাঞ্চল্য দেখা গেল—মাত্র একজন সেই চাঞ্চল্য দমন না করতে পেরে সাময়িকভাবে একটু অসুস্থ বোধ করেছিলেন। বারোটায় ত্রিবান্দ্রমের

সমুদ্র তীরে অবতরণ করা গেল। হাওয়াই আড্ডায় নেমে প্রথমেই সাক্ষাৎ হল—এখানকার হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্সের শ্রীযুক্ত রামস্বামীর সঙ্গে। মাদ্রাজের চিঠি মতো তিনি আমাদের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত। আমাদের কর্ম্মসূচীতে সেইদিনই কন্যা কুমারিকায় উপস্থিত হবার কথা—আরব সাগরে সূর্য্যাস্ত দেখার জন্য শ্রীযুক্ত রামস্বামীকে আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ করতে বললেন—সহরে পৌঁছে সব ব্যবস্থা করা যাবে।

হাওয়াই আড্ডা থেকে সহর তিন মাইল পথ। পথের ধারে খালে প্রচুর নৌকা—নারিকেল ও নারিকেল বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন পণ্যে ভর্ত্তি। সহরে প্রশস্ত পথের সংখ্যা খুব বেশী নয় কিন্তু পথঘাট সুপরিচ্ছন্ন। সহরে চলাফেরার জন্য বাসের ব্যবস্থা আছে—এমন কি কলকাতার নতুন সরকারী দু'তলা বাসের মতো দু'খানি দোতলা বাসও চোখে পড়ল। ত্রিবান্দ্রমে কয়েকটী ভাল হোটেল আছে—শ্রীযুক্ত রামস্বামী আমাদের জন্য "ম্যাসকট্" হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। হোটেলে পৌঁছেই—মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করা হল। ইতিমধ্যে টেলিফোন সাহায্যে কন্যা-

নামবার ট্রলি গাড়ি

কুমারিকার হোটেলে—আমাদের জন্য ব্যবস্থা করা হল। ম্যাসকট হোটেলের একটী ঘরে আমাদের জিনিষপত্র রেখে বেলা সওয়া তিনটায় দু'খানি মোটরের সাহায্যে কন্যাকুমারিকা উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া গেল।

পিচ্ মোড়া পথ—কখনও উঁচু কখনো নীচু—দুপাশে ঘন নারিকেল ও কদলী বন—বেশ মনোরম। ৬৬ মাইল পথ অতিক্রম করে যখন সমুদ্রতীরে পৌঁছলাম তখন বেলা ৫টা। বিলিতি কটেজ ধাঁচের দুতলা বাড়ীতে "কেপ হোটেল"। ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বিজলী আলো ও পাখার ব্যবস্থা আছে কিন্তু শোনা গেল এ ব্যবস্থা এখনও চালু হয় নি—মাসখানেক বাদে ভারতের প্রেসিডেন্ট এসে বিজলী বাতির উদ্বোধন করবেন। ব্যাপারটা হাস্যকর সন্দেহ নেই—এতে স্বতই সন্দেহ হয়—প্রেসিডেন্টের এ ছাড়া আর কাজ কি?

হোটেলের প্রাঙ্গণ থেকে সূর্য্যাস্ত দেখা গেল—কন্যাকুমারিকা ভারতের দক্ষিণতম স্থান—তিনটী সাগরের মিলন ক্ষেত্র—বঙ্গোপসাগর, ভারত সাগর ও আরব সাগর। সমুদ্রের ধারে পাথরের স্তূপ—সমুদ্র স্নানে বিপদ আছে; হাঙরের উপদ্রব। হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ এই জন্য একটী বাঁধানো স্নান কুণ্ড করেছেন—প্রায় ১০০ ফুট লম্বা এবং ৩০ ফুট চওড়া। কুণ্ডটী একদিকে ৫০ ফুট অপর দিকে ৮ ফুট গভীর। সমুদ্রের সঙ্গে নালীর সাহায্যে যোগ আছে। আমরা কয়েকজন এই কুণ্ডে স্নান করতে নামলাম। কুণ্ডস্নানের জন্য হোটেল কর্ত্তৃপক্ষ আট আনা হিসাবে দাম নেন।

সন্ধ্যায় মন্দিরে উপস্থিত হওয়া গেল। মন্দিরের চারপাশে উঁচু প্রাচীর। রাত্রের অন্ধকারে অসংখ্য প্রদীপের আলোকে মন্দিরের অভ্যন্তর রহস্যময় হয়ে উঠেছে। দেবীর মূর্ত্তি অতি সহজেই দর্শন করা গেল। পূজারী আমাদের গায়ে শান্তিজল ও হাতে পূজার মালা দিলেন। দাক্ষিণাত্যের মন্দির সম্বন্ধে নানা প্রকারের বিধিনিষেধের কথা শোনা গিয়েছিল। কার্য্যে দেখা গেল সেগুলি বিশেষ কিছু নয়।

রাত্রে পথে আলো না থাকায় তাড়াতাড়ি ফেরা হল—তখন রাত আটটা। হোটেলটী বিলাতি কেতায় সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

কন্যাকুমারিকার সমুদ্র

সাড়ে আটটায় ডিনার—ভারতীয় ও বিলাতী দুই প্রকারের ভোজ্যই পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে মামা—নিরামিষ ভোজী। হোটেলের বয়কে একথা বলায় দেখা গেল তাঁর জন্য পরোটা ও কপির তরকারীর ব্যবস্থা হয়েছে। ডিনারের ভোজ্যের পরিমাণ প্রচুর এবং প্রকৃতি উৎকৃষ্ট, গুরু-ভোজনের অবশ্যম্ভাবী ফল—অচিরে শয্যাগ্রহণ। পরদিন প্রাতে সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখার বাসনাও অবশ্য ছিল।

ভোরের আলোয় সকলে জেগে উঠল—কিন্তু সূর্য্যোদয় পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল না—আকাশ মেঘলা। নিরুৎসাহ না হয়ে সকলে কন্যাকুমারিকার ঘাটে স্নান করতে যাওয়া হল। চমৎকার ঘাটটী—স্বাভাবিক ভাবে পাহাড়ের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা—সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে—ঘাটটীর পরিসর এবং গভীরতা অল্প। সামান্য কিছুদূরে একজোড়া পাহাড় মাথা জাগিয়ে আছে—দ্বীপের মতো। শোনা গেল স্বামী

পনেরো

তারপর দিন মৃন্ময় একটা কাজের ছুতো ক'রে সকালবেলাই কলের দিকে বেরিয়ে গেল, সেখানে কাজের অজুহাতে কাটালেও অনেকক্ষণ—এ সবই যাতে অসুস্থতার কথা না উঠে, আবার আটকে না যায়; ওর বাসায় এসে পড়াটা বড় বেশি দরকার হয়ে পড়েছে। অধৈর্য্যের জন্য একটা সন্দেহও মনে উঠেছে—মাথা ব্যথার নাম ক'রে যেমন এল না সরমা, একটা বড় কিছুর নাম ক'রে চিকিৎসার জন্য টপ ক'রে সরেও তো পড়তে পারে এখান থেকে। স্বামী ডাক্তার, কিন্তু সেও তো সাহায্যই করবে।···তার আগে ওকে চিনে ফেলা দরকার, চিনতে হলে কাছে থেকে ওকে চারিদিক দিয়ে যাচাই করতে হবে—চেহারা, হাবভাব, কণ্ঠস্বর আরও অনেক কিছু; দিনের মধ্যে কখন এক আধবার বৈঠকের দশজনের ভিড়ের মধ্যে দেখা হবে না-হবে—সে ভরসায় থাকলে চলবে না।

অফিস থেকে ফিরে একটু জিরিয়ে জলযোগ করেই সে বেরিয়ে পড়ল। এখানে সব বন্দোবস্তই ঠিক। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি সৌখিন্ ছিলেন, বিলাতী কায়দায় বাড়িটা সাজানো, বাগানটিও বেশ পরিচ্ছন্ন। ভদ্রলোকের তরিতরকারির সখ ছিল, তার জন্যেও একটা মালী আছে আলাদা। এদিকে একজন পাচক আছে, একটা চাকর, তার নিজের আরদালিটাও বাসায়ই থাকবে; এদের জন্যে আউট-হাউসও রয়েছে।

একবার মোটামুটি দেখা ছিল, এখন ঘুরে ফিরে বেশ ভালো ক'রে দেখেশুনে নিতে, চাকর-বাকরদের নির্দেশ দিতে খানিকটা সময় গেল। আসবাবগুলার সংস্থানের খানিকটা রদ-বদল করলে; পড়ার সখ আছে, বৈঠকখানার পাশে একটা লাইব্রেরীর ঘর ঠিক করে ফেললে।

এইভাবে সন্ধ্যা প্রায় উৎরে গেল। খবর নিয়েছে হাসপাতালে সবাই এসে গেছেন, মাঝে মাঝে মাস্টার-মশাইয়ের হাসির তরঙ্গও আসছে ভেসে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বললে—ঠিক করলে সেটুকু খেয়ে নিয়ে যাবে যদি ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা থাকে ব'সে। একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'রে জেনেছে সরমা আসে নি, শুনে পর্যন্ত আর তার ওদিকে যাবার তেমন উৎসাহও নেই। যেটুকু বা আছে, ক্লান্তির মধ্যে চিন্তার মধ্যে সেটুকুও যাচ্ছে কমে। অন্তত চায়ের একটু চাড়া না দিয়ে নিলে সুবিধে হবে না।

চা খেতে খেতে ওদিকে আবার উৎসাহটা এল আরও কমে, কিন্তু চিন্তায় এল একটা শক্তি। একটা যে গলদ আছে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই মৃন্ময়ের; মেয়েটা ক্রমাগতই তাকে পরিহার করে চলেছে। সেই হয়েছে ভাবনা, ও যে সত্যটা উদ্ঘাটন করবে, তার জন্য দেখা পাওয়া চাই তো। আজকের চান্সটাও নষ্ট হোল··· সময় তো যাচ্ছে চলে, ওদিকে ওদের দুজনের প্ল্যান কি কে জানে?

জিজ্ঞাসা করলে—"ঠাকুর, চা আর আছে কি?"

ঠাকুরেরা শুধু মনিবের জন্যই চা করে না।···তখনও শেষ করে নি, তাড়াতাড়ি এনে হাজির করলে।

দ্বিতীয় কাপটা খেতে খেতে মাথাটা আরও পরিষ্কার হোল, মনে পড়ল ভিজিটের কথা, বিলাতী কায়দায় তারই আগে গিয়ে দেখা করা দরকার।

···এখনই উঠবে?···পাদুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মৃন্ময় জোর করেই তাদের সংযত করলে—না এখন নয়, রাত্রে নয়, কে জানে কি ভাবে আড়াল বেছে নিয়ে, আলোর দিকে পিঠ ক'রে বসবে, অসুস্থতার ভান চলছেই, হয় তো বসবার ঘরে বেরুবেই না, বেরুলেও অতিথির সামনে নীরব বা স্বল্পবাক থাকতে বাধা নেই; হয়তো মৃন্ময়কেই বাধ্য করাবে বলতে—"আপনি অসুস্থ, একটু আরাম করুন গিয়ে···ডিসটার্ব ক'রে ভুলই করলাম।"

তার চেয়ে কাল সকালে, স্পষ্ট দিনের আলোকে, একেবারে সম্মুখে রণ···যখন নূতন অজুহাত সৃষ্টি করবার

অবসর হয়নি সরমার—সমস্ত দিন কি ক'রে এড়িয়ে চলবে তার প্ল্যানও গড়া হয়ে ওঠেনি।

তারপর সম্মুখে গিয়ে রণের কি কি কৌশল বিস্তার করবে মনে মনে ঠিক করছে এমন সময়, যেন তার বাড়ির চৌহদ্দির অল্প একটু দুরেই মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠের বিরাট হাসি হিল্লোলিত হ'য়ে উঠল। বেশ একটু বিরক্তই হোল মৃন্ময়, তারপর সে-ভাবটা সামলে নিয়ে, চায়ের সরঞ্জামগুলো সরাতে বলে যতক্ষণে বেরিয়ে আসবে ততক্ষণে কয়েক জোড়া জুতার খট-খট-খস-খসানের সঙ্গে সমস্ত দলটি বারান্দায় এসে উঠেছে। বীরেন্দ্র সিং, সুকুমার, মাস্টার-মশাই, সরমা, আরও কে একজন।

সবার আগে মাস্টারমশাই, তাঁর মুখে হাসির জেরটা লেগে রয়েছে তখনও। তাঁর পাশেই সরমা, সেও একটা হাসিকে সংযত করবার জন্যে ঠোঁট দুটো একটু চেপে রয়েছে; একেবারে সামনে থাকার জন্যে বারান্দার আলোটা, তার সঙ্গে পরদা টেনে দেওয়ায়, ঘরের আলোটাও সোজা তার মুখের ওপর এসে পড়েছে।

সরমা হাসিটাকে একটু স্পষ্ট করে কপালে জোড়হাত তুলে বললে—"নমস্কার।"

মৃন্ময় একেবারে থতমত খেয়ে গিয়েছিল, ভুলটাতে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কারটা সেরে বললে—"আসুন।" ওদের হাত তোলবারও আগে সবাইকে নমস্কার ক'রে অভ্যর্থনা করলে।

কথাও আগে আরম্ভ করলে সরমাই, বললে—"আমি এসেছি বলতে আজকে রাত্তিরে আমাদের ওখানেই যা জোটে দুটি খেতে হবে।"

—খুব সপ্রতিভ, সেদিন যে-সরমা সন্ধ্যার অন্ধকার খুঁজছিল, সবার আড়াল খুঁজছিল বলে মনে হচ্ছিল মৃন্ময়ের, আজ সে যেন সবাইকে আড়াল করেই মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পরিচয়ের নারীসুলভ একটা ব্রীড়া আছে, কিন্তু জড়তা নেই। একটু হাসিমুখ ক'রে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

মৃন্ময় আমতা আমতা করে বললে—"আপনি অসুস্থ··· আজ হাঙ্গাম না করলেই পারতেন···এমনই তো আপনাদের ভরসাতেই···"

সরমা উত্তর করলে—"অসুস্থ, সে-হেতু সামান্য একটু মাথা ধরাকে বাড়িয়ে বলবার লোক আছেন আমার দিকে—দাদু, বুবুয়া।···গুরুজন বলে ওঁদের কথা মেনে নিলেও হাঙ্গাম তো কিছু করছি না, যা জোটে খাবেন।"

মাস্টারমশাই ভেতরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন—"এসো, বসা যাক···আমি করেছিলাম বারণ, কিন্তু শুনলে না। আর সত্যিও, আপনি এই প্রথম দিন এলেন আমাদের পাড়ায়, বেবন্দোবস্ত—পাশেই হিন্দুর মেয়ের গৃহস্থালি—পারে না তো নিজের মুখে গ্রাস তুলতে।"

সরমা একটু রাগের অভিনয় করে বললে—"থামুন দাদু, আবার আপনি বাড়াচ্ছেন, আরও যেটুকু অনুরোধ ওঁকে করবার আছে···শুধু প্রথম দিন বলেই বা কেন?···

তারপর সুকুমারের পানে চেয়ে বললে—"তুমিই বলোনা।"

সুকুমার বললে—"হ্যাঁ, সরমা বলছিল—এখন কয়েক দিন আমাদের ওখানেই ব্যবস্থা হোক, তারপর আপনার ঠাকুরটা ট্রেন্‌ড্ হয়ে গেলে···"

বীরেন্দ্রসিং তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"কেন, ঠাকুরটা তো এক্‌স্‌পার্ট!···না, আপনাদের আতিথ্য নেন তাতে আপত্তি করছি না, কিন্তু আমার রাখা ঠাকুর···"

সরমা ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে চাইলে, বললে—বুবুয়া, আপনি এই বাসার জন্য ঐ এক ঠাকুর বাধা রেখে দিয়েছেন! ভেবেছেন এক্‌স্‌পার্ট বলে পাঞ্জাবী এলে তাকে যেমন রুটি মাংস রেঁধে খাওয়াবে—বাঙালী এলে তেমনি শুক্ত-ঘণ্ট রেঁধে দেবে, আবার মাদ্রাজী এলে ঠিক তেমনি করেই লঙ্কা-তেঁতুলের চিন্তাপাণ্ডু না কি বলে·····"

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে অন্য সবাইও হো-হো করে হেসে উঠলেন, তার মধ্যেই এগিয়ে গিয়ে এক একটা আসন নিয়ে বসলেন।

কিন্তু মেলামেশার এত বড় সুযোগ মৃন্ময় কি ভেবে প্রত্যাখ্যানই করলে, অবশ্য খুব বিনয়ের সহিতই। বললে—"সে যাযাবর, পৃথিবী ঘুরে এসে লখ্‌মিনিয়ার পাচককে ভয় করলে তার চলবে না। আরও তর্ক-বিতর্কের পর একটা রফা হোল, তার পাচক আগে থাকতেই গিয়ে রোজ সরমার কাছ থেকে রাঁধবার ফিরিস্তি নিয়ে আসবে, পদ্ধতিটাও আসবে জেনে; শুধু সে ঠিক তোয়ের হচ্ছে

কিনা মেলাবার জন্যে ততদিন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে মৃন্ময়কে সরমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে।

এ কথাবার্ত্তাগুলো হোল—ঘুরে ফিরে বাসার ঘর-দোর, আসবাবপত্র, নূতন করে সাজানোর স্টাইল—এই সব দেখতে দেখতে তর্ক হচ্ছে, মন্তব্য হচ্ছে, মাঝে মাঝে হাসি উঠছে। এরপর কিন্তু সরমার ঠিক এই ভাবটা রইল না। সে বাড়ির গৃহিণী, সেই হিসাবে নিমন্ত্রণ করাটা তারই ছিল দরকার, সেটুকু সেরে সে যেন নিজের জায়গাটিতে ফিরে গেল। অবশ্য সেদিনকার মতো সঙ্কোচের কিছুই নেই, সামনেই মাস্টারমশাইয়ের পাশে স্পষ্ট ভঙ্গিতে রইল বসে; আলাপ আলোচনায় যোগ দিলে, মুক্তকণ্ঠে হাসলেও যেখানে হাসবার, তবে এখন আর সবতাতেই সেরকম অগ্রণী হয়ে নয়। গল্প জমে উঠল, বোঝা গেল চলবে খানিকক্ষণ। বোধহয় সেইটে আন্দাজ করেই সরমা এক সময় দাঁড়িয়ে উঠল, বললে—"আমায় তাহলে যদি যেতে দেন···ওদিকে আবার······"

বীরেন্দ্রসিং বিস্মিত হয়ে বললেন—"বাঃ, উঠলে যে! বোস, নৈলে উনি ভাববেন বুঝি যা-জোটে—তাই খেতে বলে শেষে সত্যিই হাঙ্গাম করতে চললে।"

মাস্টারমশাই বললেন—"হ্যাঁ, কথায় অবিশ্বাস হ'লে আবার ভাববেন এই লোকেরই নেমতন্ন তো, যাওয়াটা উচিত হবে কি না—কী আছে অদৃষ্টে······"

প্রচণ্ড যে হাসিটা উঠলো তাতে সরমা রাঙাই হয়ে উঠল এবার, মৃন্ময়ই তাকে উদ্ধার করলে, বললে—"না, আপনি যান, শুধু ঠাকুর-চাকরের হাতে ছেড়ে দিলে যে ধরণের হাঙ্গামটা বাঁধতে পারে তার জন্যে আমি প্রস্তুত নই।"

মাস্টারমশাই, বীরেন্দ্রসিংকে নিয়ে আরও জন দশেকের নেমন্তন্ন ছিল। সেখানেও জমাট মজলিস, খাবার আগে, খাবার সময়, খাবার পরও খানিকটা। সরমা এসে বসল অবশ্য শেষ কান্টায়। ওদিকে তদারক করতে, পরিবেশনে সাহায্য করতে লেগে গেল। ঘোরাফেরা করতে হচ্ছে, ব্যস্ত, কিন্তু স্বচ্ছন্দগতি; তার মধ্যে কথাও হচ্ছে, নূতন অতিথি বলে মৃন্ময়ের সঙ্গেই বেশি, অল্প আহারের জন্যে অনুযোগ, এটা-ওটা খেতে অনুরোধ—মোটকথা প্রথম দেখা হওয়া থেকে গভীর রাত্রে বিদায় নেওয়া পর্য্যন্ত সবরকমেই তাকে দেখবার সুযোগ হোল, মৃন্ময়ের মনে হোল—সরমা যেন ইচ্ছে করেই দিলে সুযোগ—কথায়-বার্ত্তায়, হাসিতে, গাম্ভীর্য্যে, গতি-ভঙ্গিতে; তাকে চিনে নেবার কিছু লুকিয়ে রাখলে না সরমা।

কিন্তু আজই যেন তাকে সবচেয়ে কম দেখা হোল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে সেই কথাই ভাবছিল মৃন্ময়।

সে ভাবছিল সম্মুখরণে নামবে, কাল সকালেই; কিন্তু তার আগেই এমন উগ্র স্পষ্টতায় সরমা নিজেই তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল যে মৃন্ময়ের চোখ দুটো যেন দিলে ধাঁধিয়ে একেবারে। তাই হয়েছে, ও যখন কথা কয়েছে—মৃন্ময় তখন ভালো করে মুখের উপর চোখ রেখে দেখতেই পারে নি আজ; ও যখন তার দিকে চেয়ে হেসেছে, একটা তিরস্কারেই যেন তার নিজের হাসি এসেছে স্তিমিত হয়ে; এমন কি যখন সুবিধাও ছিল দেখবার—সরমার দৃষ্টি ছিল যখন অন্যদিকে, সে যখন কাজের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বেড়িয়েছে, তখনও আজ কি একটা অদম্য সঙ্কোচে মৃন্ময় মুখ তুলে চাইতে পারেনি তার দিকে।

অদ্ভুত মনে হচ্ছে মৃন্ময়ের। সমস্তটাই যদি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ সরমা যদি সত্যই ছিল অসুস্থ, তারপরে সুস্থ হয়ে তার এই সহজ, নিঃসন্দিগ্ধ রূপ, তাহলে আলাদা কথা। যদি তা না হয়, সমস্তটাই যদি সরমার ইচ্ছাকৃত, সম্মুখরণের সন্দেহ ক'রে নিজেই আগে-ভাগে এসে সম্মুখরণ দেওয়া, তাহলে সত্যই বিস্ময়কর। তার সম্বন্ধে মন শতগুণ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। চিন্তার ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য—যেন সরমার হাত থেকেই মুক্তি পাবার জন্য, মৃন্ময় এক সময় উঠল, ড্রয়ারের মধ্যে থেকে একটি সুরার বোতল বের ক'রে গেলাসে খানিকটা ঢেলে পান ক'রে ফেললে। এখানে এই প্রথম; পরিবেশ না বুঝে একেবারে বন্ধ রাখার ক্ষমতা ওর আছে।

পেলে সরমার হাত থেকে মুক্তি—তার জায়গায় যে রঙিণ একটি আলো চিন্তার চারিদিকে উঠল ফুটে তার মাঝখানটিতে এসে দাঁড়াল অন্ধকারময়ী রুগ্মা।

ষোল

এর পর একটা দীর্ঘ বিরতি গেল এই লুকোচুরি খেলায়।

হঠাৎ এমন একটা বিপদ এসে পড়ল যাতে মনে হোল বস্তি আর কল নিয়ে সমস্ত কলোনিটা দেবে ভাসিয়ে।

ওপরের কৃত্রিম নূতন হ্রদটা, যেটা নিচের হ্রদের প্রায় তিনগুণ, সেটা জলে প্রায় কাণায় কাণায় হয়ে উঠেছে পাহাড়ে হঠাৎ কয়েকটা বৃষ্টিতে। এমনি এটা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, কেননা সেচের দিকের সব ব্যবস্থা না হয়ে ওঠায় ইচ্ছামতো জল নিকাষের কোন উপায় নেই এখন। এখানে পাঞ্জাবী ইন্‌জিনিয়ারের একটু ভুল ছিল, কিন্তু কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে বলে মৃন্ময় আর কিছু করতে পারলে না। তা' ভিন্ন একবার সমস্ত কাজটা হয়ে গেলে, দুদিক দিয়ে জল নিকাষের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আর ভয়ও থাকবে না। দিবারাত্রি কাজ চালিয়ে সেই চেষ্টাই হচ্ছিল। এই সময়, এই অসময়েও হঠাৎ পাহাড়ে কয়েক ঝোঁক দমকা বৃষ্টি হয়ে জলটা হঠাৎ গেল অতিরিক্ত বেড়ে।

এটা, সুকুমারের ওখানে যেদিন নিমন্ত্রণ ছিল তার দু'দিন পরের কথা। এইতেই চিন্তার চাপটা রুম্মা-সরমার দিক থেকে একেবারে এদিকে সরে এসেছিল, তার ওপর তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা খবরে মৃন্ময়ের মাথা গেল একেবারে ঘুরে।

সমস্তদিন ওদিকে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বাসায় এসে চা খেয়ে এইমাত্র বেরিয়েছে, হাসপাতালে যাবে, রুম্মার মেয়ে তুলার সঙ্গে দেখা হোল। একটি কালো প্রজাপতি যেন স্কুলের মাঠে খেলতে গিয়েছিল, সেই খেলারই জের শরীরে মেখে কখনও চলতে চলতে কখনও নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরছে। ভালো লাগল বলে একটা কিছু কথা কইবার জন্যেই মৃন্ময় প্রশ্ন করলে—"তোর রাঙা মা, রাঙা বাবা কোথায় রে তুলা? বাসাতেই?"

তুলা নাচের ঝোঁকেই থেমে গিয়ে হঠাৎ হাততালি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো বুকে জড়ো করে একটু ঝুঁকে কাৎ হয়ে বললে—"হু', বাড়িতেই।"

থাকবার তো কথা নয়। তবু কি মনে হতে প্রশ্ন করলে—"ঠিক জানিস?"

তুলা ইতিমধ্যে একটা চক্কর দিয়ে দিয়েছে, "হুঁ।"—বলে ঘাড়টা একটু বেশি কাৎ করলে।

অগ্রাহ্য করে এগিয়েই যাচ্ছিল, হঠাৎ খেয়াল হোল, আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে তো সরমা। থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলে—"অসুখ করেনি তো?"

"না, অসুখ কেন করবে?"

মৃন্ময় এ খবরটা গ্রাহ্য করলে না, ছেলেমানুষ অসুখের বোঝে কি? অনেকগুলা কথা মনে গেল, তার জন্যে সরমাকে আর একবার অসুস্থতার মধ্যে যাচাই করবার লোভটা হয়ে উঠল প্রবল। বললে—"চল্, তোদের বাসা হয়েই যাই!"

বাইরে থেকে সাড়া-শব্দ না পেয়ে অসুস্থতারই সন্দেহ ক'রে একেবারে ভেতরে গিয়ে উঠল। তুলা বৈঠকখানা পেরুতে পেরুতেই উৎসাহভরে বলে উঠল—"রাঙামা, দেখো কাকে নিয়ে এসেছি!" রান্নাঘরের দিক থেকে উত্তর এল —"যাই, বস।"

"আপনি বসবেন ততক্ষণ; হ্যাঁ তো? আমি মুখে-হাতে সাবান দিয়ে আসছি।"

কথাগুলো বলে হাতটা ছেড়ে দিয়ে তুলা বাথরুমের দিকে ছুটে গেল। এরা যে নেই এতক্ষণে টের পেয়েছে মৃন্ময়, তুলা হয় খেলতে যাবার সময় দুজনকে দেখে গিয়েছিল, সেই ধারণাতেই কথাটা বলেছে, না হয় টেনে নিয়ে আসবার আনন্দেই এনেছে টেনে। রান্নাঘরের দিক থেকে উত্তর যে এল তাও সরমার নয়, রুম্মার।· ফিরে আসবে, ততক্ষণে রুম্মা এক রকম ছুটতে ছুটতে উঠান পেরিয়ে রকে উঠেছে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—"আপনি! আমি ভাবলাম ···কেউ কেউ এসে পড়েন তো কখনও কখনও?"···

উত্তর দিতে মৃন্ময়ের একটু দেরি হোল, কথাগুলা যেন গলায় আটকে গেছে।···"বললেতোমার মেয়ে আমায়—ধরে নিয়ে এল, বললে ওঁরা আছেন।"

"দেখুন তো!"—বলে রুম্মা বিস্ময়ে গালে দুটো আঙুল চেপে ধরলে, তারপর হাঁক দিলে—"তুলা!"

মৃন্ময় হেসে বললে—"তাতে হয়েছে কি? ভুল করেছে—খেলতে যাবার সময় সে দেখে গিয়েছিল তাঁরা আছেন, সেইটেই মনে ছিল বোধ হয়?

রুম্মা রাগতভাবেই মুখটা ভার করে বললে—"ভুলের একটা সীমা থাকা চাই তো···মিছিমিছি টেনে আনা আপনাকে কষ্ট দিয়ে···"

এবারেও একটুখানি বিলম্ব হোল উত্তরটা দিতে মৃন্ময়ের,

তারপর কতকটা যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"কষ্ট আর কি, ওর ভুলে আমার বরং লাভই হোল একটা···"

আবার একটু বিরতি দিয়ে রুম্মার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেললে, তারপরই বললে—"মানে···আমি ভেবেছিলাম তাহলে সরমা দেবী বোধ হয় অসুস্থই হয়ে পড়ে থাকবেন আবার; বাড়িতে রয়েছেন···তা—তাহ'লে নয়···মনটা হালকা হোল। আচ্ছা, আমি যাই।"

যেতে যেতে আবার ঘুরে বললে—"তুমি ওঁকে কিছু বোলনা যেন···আমার অনুরোধ।"

হালকা পেগের গোলাপী নেশার মতো মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।···'লাভের' অর্থটা রুম্মা কি ধরতে পারলে? ···পেরেছে নিশ্চয়; ওর মুখে-চোখে বুদ্ধির দীপ্তি; কিন্তু সে দীপ্তির অন্তরালে আছে কি তাতো বোঝা গেল না।··· একটা কথা ঠিক, আবার ফিরে যখন ডুলাকে কিছু না বলতে অনুরোধ করলে তখন দেখে—রুম্মা তার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে ছিল—স্থির দৃষ্টিতে···

সেই বিহ্বল, শান্ত, বন্য হরিণীর দৃষ্টিতে কি ছিল—রাগ কি অনুরাগ, চিন্তা করতে করতে অলসচরণে হাসপাতালের দিকে খানিকটা এগিয়েছে, এমন সময় পেছনে খানিকটা দূরে ত্রস্ত কণ্ঠস্বর কানে গেল—"হুজুর! ··বড়া সাহেব! ইঞ্জিনিয়ার সাহেব"!

মৃন্ময় ঘুরে দাঁড়াল। জন চারেক লোক প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এসেছে, হাঁপাচ্ছে, কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে, তারই মধ্যে জড়াজড়ি ক'রে যা জানালে তার মর্মার্থ এই যে সর্বনাশ হয়েছে, সামনের বড় বাঁধটায় দু' জায়গায় চিড় খেয়ে গিয়ে তাই দিয়ে তরওয়ালের মতো পাৎলা জলের ধারা ছিট্‌কে আসছে।

"সে কি! আমি যে এখুনি সব তদারক ক'রে আসছি!" —বলতে বলতেই মৃন্ময় বাসার দিকে পা চালিয়ে দিলে। যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে ওদের মধ্যে তিনজনকে তুলে নিলে, একজনকে হাসপাতালে গিয়ে বীরেন্দ্রসিংকে খবর দিতে বলে একেবারেই জোরে মোটর চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

গিয়ে দেখলে সত্যই সর্বনাশের উপক্রম। নূতন কলোনির দিকটায়—যে দিকটায় কল আর বস্তি—বাঁধের গায়ে দুটো মিহি ফাটলের মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণ ধারায় জল বেরিয়ে নিচে পড়ছে। বাঁধের নিচেই একটা সরু জমির ফালি বাঁধের সমান্তরালে এ-মুড়ো ও-মুড়ো চলে গেছে—কোথাও দশবারো হাত, কোথাও আবার বিশ-বাইশ হাত চওড়া, এরই একজায়গায় হাইড্রো-ইলেকট্রিকের ঘরটা, তারপরেই খানিকটা নিচে ছোট ঝিলটা।

বিপদটা এমনিই গুরুতর। আড়াইতলা, তিনতলা উঁচু বাঁধের পেছনে বিরাট জলরাশির চাপ, তাও তিনটে নদীতে অল্পসময়ের মধ্যে জলটা এনে ফেলায় বাঁধের গায়ে তার জোরটা হয়েছে আকস্মিক। এর ওপর ফাটল দুটো ধরেছে বড় খারাপ জায়গায়, নিচের ঝিল থেকে বাঁ দিকে বাঁধটা যে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে তারই দু'জায়গায়; ঠিক এর নিচে, সামনেই পড়েছে কাপড়ের কল আর শ্রমিক বস্তিটা। ফাটল দুটোর মধ্যে তফাৎ প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত। অর্থাৎ বাঁধ যদি ভেঙে উলটে পড়েতো ওপর থেকে যে প্রচণ্ড জলের তোড় নামবে, তাতে কল বস্তি সব ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ করে দেবে।

মৃন্ময় এসে দেখলে চেঁচামেচি খানিকটা হোলেও বিপদের গুরুত্বটা লোকে ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে নি। প্রথমেই সে একজন লোককে বস্তির দিকে আর একজনকে কলের দিকে পাঠিয়ে দিলে, বস্তি খালি করিয়ে ফেলতে আর কল যা ফিট্ হয়েছে তার যতটা সম্ভব খুলে সরিয়ে ফেলতে। তারপর সে নিজে টর্চ নিয়ে জনদুয়েক সহকারীকে সঙ্গে করে বাঁধের ওপর উঠল। বীরেন্দ্র সিং, সুকুমার, মাষ্টারমশাই প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে করে মোটরে এসে যখন পৌছুলেন, দেখেন তিনজনে বাঁধের অর্দ্ধেকটা চলে গেছে, মৃন্ময়ের হাত থেকেই টর্চের আলো বাঁধের গা বুলিয়ে এগিয়ে চলেছে। এঁরা উঠতে যেতেই মেট গোছের কয়েকজন সামনে এসে হাত জোড় ক'রে জানালে—বড়সাহেব কাউকে উঠতে বারণ ক'রে গেছেন। বীরেন্দ্র সিং, সুকুমার তবুও পা বাড়াতে যাচ্ছিল, মাষ্টার মশাইয়ের কথায় নিরস্ত হোল। সমস্ত বাঁধটা ভালো ক'রে তদারক ক'রে ফিরতে মৃন্ময়ের প্রায় ঘণ্টা খানেকের কাছাকাছি দেরি হোল। বললে আর কোথাও ফাটল নেই, বাঁধের ফটকটাও পুরোপুরি খুলিয়ে দিয়ে এসেছে, কিন্তু জলের চাপ এত বেশি যে তা দিয়ে জল যা বেরুচ্ছে তাতে কিছু হাল্কা হবার আগেই সর্বনাশটা ঘটে যেতে পারে।

কিছু করবার নেই। বাঁধের একেবারে শেষে পাহাড়ের বিস্তীর্ণ তলদেশে এঁরা সবাই বসে আছেন। জ্যোৎস্না রাত্রি, বাঁ দিকে হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি, যতদূর দৃষ্টি যায় চিক চিক করছে; সামনেই দীর্ঘ পাথরের বাঁধটা একটা বিরাট অজগরের মতো তার পা চেপে আছে পড়ে, তারই গা ভেদ্ ক'রে হাত পঞ্চাশ ঘাটের মধ্যে দুটি জলের ধারা উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিচে পড়ছে—রূপার পাতে গড়া দুখানি যেন ঘূর্ণমান চক্র, জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে।···অথচ এই নিতান্ত নিরীহ দৃশ্যপটের পেছনেই রয়েছে একটা বিরাট অঘটন, যে কোন মুহূর্ত্তেই তা পড়তে পারে এসে।

কিছু করবার নেই বলে সবাই একরকম চুপ করে আছেন। নিচে, খানিকটা দূরে দুরাশ্রুত একটা কোলাহল, বস্তির লোকেরা টাঁইনাড়া করছে। রাত খানিকটা এগুতে বাজারের দিক থেকেও কিছু কিছু লোক এল ব্যাপারটা দেখতে—খবরটা সেখানে ছড়িয়েছে; বিশেষ কিছু দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে চলে গেল।

মৃন্ময় বাইরে বাইরে অত্যন্ত স্থির, তার মানে ভেতরটা অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওর অধস্তন অফিসাররা সবাই এসেছে, তাদের সঙ্গে করে ও আরও একবার বাঁধটা ঘুরে এল ফাটল পর্য্যন্ত, একজন কুলির মেটকে দিয়েছে সমস্তটা পায়চারি করতে। ফাটলের কাছ থেকে ঘুরে এসে বীরেন্দ্রসিংকে বললে—"থলে চাই আমার, যত বেশি হয়।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন—"থলে? বাঁধের সিমেন্টের গুলো সব লটে বিক্রি হয়ে গেছে, লখমিনিয়া থেকে বেরিয়ে গেছে।···বালির বস্তা ফেলবেন?"

"এখনও ঠিক করিনি, তবে তোয়ের থাকতে হবে। বাঁধের কাজে থলে গুলোর কথা শুনেছি এদের কাছে। তবু বাজারেও একবার পাঠান্ লোক, এদিকে কলে, বস্তিতেও দেখুক, বাড়ি ঘর তোয়ের করতে পরে যা সিমেন্ট এসেছে তার থলেগুলো থাকতে পারে।"

তারপর যে কথাটা সবার মনেই উদয় হয়ে থাকতে পারে, অথচ ভদ্রতার খাতিরে বলতে পারছেন না, তার উত্তরটাও নিজে হ'তে দিলে, বললে—"বস্তি থেকে থলে আনবার কথা এতক্ষণ বলিনি তার কারণ ওদের আগে বাসা খালি ক'রে সরে যাওয়া দরকার ছিল। এবার পাঠান লোক ওদিকেও।"

আর একবার ঘুরে এসে বললে—"বস্তাগুলো সমস্ত রাত ভ'রে ঠিক করে রাখুক। রাত্তিরে ফেলা চলবে না, তার একটা কারণ চাঁদ আসছে ডুবে, ফাটলের মধ্যেকার অংশটিতে কি রকম জোর আছে, এর ওপর ভিড় করা চলবে কিনা তাও রাত্তিরে বোঝা যাচ্ছে না। দিনে ফেলবার একটা কারণ, ফেলবার আগে ভেতর দিকে ফাটলের অবস্থাটা দেখা একবার বিশেষ দরকার;—সেটা যদি বাইরের দিকের চেয়ে খুব বেশি হয় তো অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

বীরেন্দ্র সিং প্রশ্ন করলেন—"কি ব্যবস্থা?"

উত্তরটাতে সামান্য যে দেরি হোল, তাতে বোঝা গেল ইচ্ছে করেই যেন আসল কথাটা লুকুলে মৃন্ময়, বললে—"কয়েকটা অলটারনেটিভ্ ভাবছি; কিন্তু এখনও ঠিক করি নি।"

হাতঘড়িটা দেখে বললে—"কিন্তু আপনারা আর কষ্ট করছেন কেন? রাত দশটা হয়ে গেছে, আমায় থাকতে হবে সমস্ত রাত। আপনারা যান, যতদূর দেখছি রাত্রে বিপদের সম্ভাবনা নেই।"

সুকুমারের দিকে চেয়ে বললে—"আপনি গিয়ে আমার খাবারটা পাঠিয়ে দেবেন মিস্টার সেন।"

আরও দু'একবার পেড়াপিড়ী করতে ওঁরা গেলেন, কিন্তু সে শুধু মাস্টারমশাই যাতে যান। আহারাদি তাড়াতাড়ি সেরে সুকুমার ও বীরেন্দ্র সিং দুজনেই আবার ফিরে এলেন।

রাত্রিটা নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল। (ক্রমশঃ)
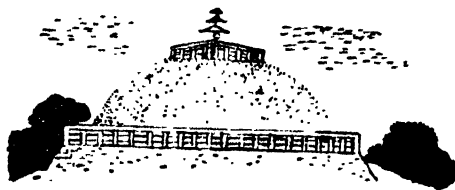
কাশ্মীরে শ্রীঅমরনাথ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেমন পূজার সময় একমাস ছুটী হয়, কাশ্মীরে তেমনি অমরনাথের তীর্থযাত্রা উপলক্ষে প্রায় একমাস ছুটী হয়ে থাকে। বাংলাদেশে দুর্গোৎসব যেমন জাতীয় উৎসব, কাশ্মীরে শ্রীঅমরনাথের মেলাও তেমনি জাতীয় উৎসব বলেই সাধারণের নিকট গৃহিত। এই অমরনাথজীর মেলা হয় প্রতি বৎসর রাখী-পূর্ণিমা বা ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে, এ বৎসর (১৯৫১) সেই তিথি পড়েছিল ১৭ই আগষ্ট তারিখে। মেলায় যোগদান করার উদ্দেশ্যে আমার কলেজ থেকে তিন সপ্তাহের ছুটী মঞ্জুর করিয়ে কল্‌কাতা থেকে রওনা দিয়েছিলুম ৩রা আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যার পাঞ্জাব মেলে। ৫ই আগষ্ট বেলা সাড়ে এগারটায় অমৃতসর ষ্টেসনে এসে পৌঁছাই।

কিন্তু যাওয়ার পূর্ব্বেও পরিশ্রম বড় কম করতে হয় নি। জম্মু এবং কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তার নাম Visitors' Bureau। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে সেই বুরোর ডিরেক্টারের কাছে চিঠি লিখে যাত্রা সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ অবগত হই। তাঁরা বলে দিলেন যে, যাত্রার পূর্ব্বে যাত্রিকে নিজের প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে কাশ্মীরে প্রবেশ করার অনুমতি পত্র অর্থাৎ "Permit to enter Kashmir" নিতে হবে। পূর্ব্বে এ নিয়ম ছিল না, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই এই নতুন নিয়ম হয়েছে। সেই নিয়ম অনুসারে গিয়ে হাজির হলুম কল্‌কাতার সরকারী দপ্তরখানা, Writers' Buildings-এ। শুনলাম, কাশ্মীর পারমিট পাসপোর্ট অফিস থেকে দেওয়া হয় না, এটা দেওয়া হয় বাংলা সরকারের Home Department থেকে। অতঃপর স্বরাষ্ট্র বিভাগের দপ্তর থেকে ছাপানো ফর্ম্ম নিয়ে গমনেচ্ছুক প্রত্যেকের নামে নামে দু'খানি করে ফর্ম্মে নাম, বয়স, ঠিকানা-আদি বহুরকম ঠিকুজী কোষ্ঠী লিপিবদ্ধ করে তলায় তাদের দিয়ে নাম সই করিয়ে উক্ত দপ্তরখানায় গিয়ে সেখান থেকে ওগুলোকে Forward করিয়ে ছুটে গেলুম লর্ড সিংহ রোডে পুলিসের ডিটেক্টিভ্ ডিপার্টমেণ্টে। সেখানে ওগুলো জমা দিয়ে ও নানারকম জেরার উত্তর দিয়ে ফিরে এলুম বাড়ীতে। তারপর যে থানার এলাকায় আমি বাস করি, সেই থানা থেকে পাড়ায় অনুসন্ধান করে কর্ত্তারা যখন বুঝলেন যে, আমি এবং আমার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী এবং শিশুপুত্র কোন রকম বিপজ্জনক উদ্দেশ্য নিয়ে কাশ্মীরে যেতে চাইছি না, তখন তাঁরা অনুকূল রিপোর্ট দিলেন আমাদের সম্বন্ধে। সেই রিপোর্টের ওপোর নির্ভর করে দিন পনেরো পরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং আমাদের Specimen Signature সম্বলিত এক একটি পারমিট পাওয়া গেল। এই সব পারমিট-গুলি হাতে এসে মিললো ১লা আগষ্ট বুধবার। তারপর মালপত্র বেঁধে নিয়ে রওনা হয়েছিলুম শুক্রবার সন্ধ্যায় এবং অমৃতসর পৌঁছাই রবিবার দুপুরে।

অমৃতসরের ষ্টেশনে দুপুরে স্নান সমাপন করে কিছু ফল, মিঠাই এবং লস্যি (ঘোলের সরবৎ) পান করে পুনরায় পাঠানকোটের ট্রেনে উঠ্‌লুম এবং বেলা বিকাল নাগাদ পাঠানকোটে পৌঁছাই।

পাঠানকোট পাঞ্জাবের একটি ছোট সহর। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা ও মন্দির এবং হোটেল আছে। এই পাঠানকোট পর্য্যন্তই ট্রেন চলে এবং পাঠানকোটের থেকেই মোটরে করে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে পৌছতে হয়। দূরত্ব ২৬৭ মাইল। ভারত থেকে পাকীস্থান ভাগ হয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে কাশ্মীর যাওয়ার রাস্তা ছিল রাওয়ালপিণ্ডি-মুরীর পথে কিম্বা তক্ষশিলা-হাভলিয়েনের পথ দিয়ে। বর্ত্তমানে এইগুলি সমস্তই পাকীস্থানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পাঠানকোট-জম্মুর পথ দিয়েই মোটর যাতায়াত সুরু হয়েছে, আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক, কাজেই আমাদের এই পথই অবলম্বন করতে হোল।

পাঠানকোটে এসে এক ধর্ম্মশালায় ওঠা গেল। মোট-পুঁটলী খুলে হাঁড়ী বাল্‌তী বার করে কাঠ সংগ্রহ করে গৃহিণী ভাত রাঁধবার কাজে লেগে গেলেন, আর আমি গেলুম, কাশ্মীরে যাওয়ার বাহন, অর্থাৎ মোটর গাড়ীর সন্ধান করতে। খোঁজ করে দেখলুম, এখান থেকে প্রথমতঃ কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের ডাকবিভাগের বাস ওরফে Mail Bus ছাড়ে, আর যায় সরকারের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি টুরিষ্ট বাস্ এবং তৃতীয়তঃ অনেকগুলি প্রাইভেট বাস্। Visitor's Bureau-র চিঠিতে দেখেছিলুম, টুরিষ্ট বাসে প্রত্যেকের জন্য মাথা পিছু ভাড়া লাগে ২৫৲ টাকা, ওখানে গিয়ে শুনলুম, সেই ভাড়া কমে গিয়ে হয়ে গেছে ২০৲ টাকা। মেইল্ বাসেও মাথা পিছু ভাড়া ২০৲ টাকা, আর প্রাইভেট বাসের কিছুই ঠিক নেই। একজন বাস্-মালিক বল্লেন ১৬৲ টাকা, তারপর যখন শুনলেন আমরা সাড়ে তিনজন আছি, অর্থাৎ তিনজন বয়স্ক এবং একজন বারো বছরের কম, তখন বল্লেন মাথা পিছু ১৫৲ টাকা লাগবে; শেষে দরাদরি করে বল্লেন, সাড়ে তিনজনের মোট ৫০৲ টাকা লাগবে। অপর এক মালিক দৌড়ে এসে বল্লে "বাবুসাব, আমি ৪৫৲ টাকায় সাড়ে তিনজনকে নিয়ে যাবো!" কিন্তু বাসের চেহারা এবং বসবার ব্যবস্থা দেখে বুঝলুম, এগুলো সুবিধের নয়। দু'দিনের যাত্রা, ২৬৭ মাইলের দৌড়, কয়েকটা টাকা বেশী দিয়ে টুরিষ্ট বাসেই যাওয়া ভালো, অতএব ঠিক করলুম, টুরিষ্ট বাসেই যাবো।

পরদিন অর্থাৎ সোমবার ৬ই আগষ্ট ভোর-ভোর উঠে রান্না খাওয়া সেরে নিয়ে মোট্ পুঁটলী বেঁধে পাঠানকোট রেল ষ্টেশনের দিকে রওনা দিলুম। ষ্টেশনের গায়েই কাশ্মীর সরকারের Visitors' Bureau-র অফিস। সেই অফিস থেকেই টুরিষ্ট বাস ছাড়ে। ৭০ টাকা দিয়ে সাড়ে তিনখানা সিট নিট নিলুম। এই অফিসটি Visitors' Bureau-র একজন সহকারী ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ভদ্রলোক মুসলমান,

তরুণ এবং প্রিয়ভাষী। তিনি বল্লেন, "আপনারা কেন ধর্ম্মশালায় উঠতে গেলেন, আমার এই অফিসেই ত কাল রাত্রে থাকতে পারতেন। এখানে কল পায়খানার ভালো বন্দোবস্ত রয়েছে, ইলেকট্রিক আলো, পাখা রয়েছে, ঐ বারান্দায় রান্না করে খেতে পারতেন, ইত্যাদি।" বল্লুম, "ভুল হয়ে গেছে, আমি ত ঐ সব জানতাম না। তা যাক্। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।" সহধর্ম্মিনী এই সব শুনে করুণনেত্রে ইলেকট্রিক পাখাটার দিকে দেখ্তে লাগলেন, কারণ পূর্ব্ব রাত্রে ধর্ম্মশালায় গরমের জন্য বড়ই কষ্ট হয়েছিল। এখানকার গরম কলকাতার তুলনায় যে কত বেশী এবং কত কষ্টকর সেটা নিজের গায়ের চামড়া দিয়ে অনুভব না করলে শুধু বিবরণ দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। দুদিন ট্রেণ ভ্রমণের পরেও গরমের জ্বালায় ঘুমুতে পারি নি, এইটুকু বল্লেই বোধ হয় উত্তাপের মাত্রাটা অনুমান করার অসুবিধে হবে না।

সোমবার বেলা দশটার সময় পাঠানকোট থেকে টুরিষ্ট বাসে ওঠা গেল। বাসের মাথায় রইলো আমাদের মালপত্তর, আর ভেতরে রইলুম আমরা ২১জন আরোহী। এর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই হলেম অমরনাথের যাত্রী, কেউ বোম্বাই থেকে, কেউ জয়পুর থেকে, দু'জন ত্রিবাঙ্কুরের, আর বাংলা দেশ থেকে মাত্র আমরাই ছিলুম।

ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর বাস গিয়ে দাঁড়ালো একটা আড্ডায়।

সেখানে customs-এর লোকেরা এক ছাপানো ফর্ম্মে বড় একটা বিবৃতি (declar it on) লিখিয়ে নিলে, বাক্স বিছানা খুলে দেখে নিলে আমরা কোন শুল্কযোগ্য মাল ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কি না, ইত্যাদি। এই সব করে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সেখান থেকে রওনা দিলুম, দিয়ে পুনরায় ঘণ্টাখানেক পরে আর এক জায়গায় গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। সেখানকার অফিসাররা আমাদের কাশ্মীরে প্রবেশ করবার অনুমতিপত্রগুলো ভালো করে দেখে, লোক হিসেব করে আবার গাড়ী ছাড়লো। বেলা তিনটা নাগাদ আমাদের বাস এসে থামলো জম্মুতে ডাকবাংলোর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে। এখানে গাড়ী দাঁড়াবে এক ঘণ্টা।

রোদ্দুরের তাপ যেমন অসহ্য, গরমও তেমনি প্রচণ্ড। জম্মুর উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১,০০০ ফিট্। সহরটি আংশিক সমতল, আংশিক উঁচু নীচু। এখানে কাশ্মীর রাজাদের তৈরী গত একশ দেড়শ বছরের পুরাতন পাঁচটি মন্দির আছে। ঐ গুলিতে রাম সীতা, স্ফটিকনির্ম্মিত মহাদেব, মহাকালী ইত্যাদি সব মূর্ত্তি আছে। দুইটি মন্দিরে রাজাদের বৃহদাকার মর্ম্মর মূর্ত্তিও স্থাপিত আছে। এ ছাড়া বিলাতী কায়দায় কতকগুলি কেতা-দুরস্ত হোটেল ও দোকান আছে। জম্মু সহর ও জম্মু প্রদেশ হিন্দুপ্রধান; এখানে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা বর্ত্তমানে শতকরা প্রায় ৯৯ জন। এখানকার ডাক-বাংলোয় কেক এবং দুগ্ধ পান করে পুনরায় বাসে উঠে রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ কুদ্ নামক এক স্থানে এসে উপস্থিত হওয়া গেল।

কুদ্ জায়গাটি নিতান্তই একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ীয়া গ্রাম। জম্মু থেকে এর দূরত্ব ৬৭ মাইল, এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,৭০০ ফিট উঁচু। জম্মু-শ্রীনগর রোডের উপর এই কুদ্ গ্রামে পাশাপাশি গোটা পনর হোটেল, যাত্রীনিবাস এবং একটি ডাকবাংলো আছে। রাত্রিবাসের জন্যই এই স্থানের প্রয়োজন। কুদ্ গ্রামটি দিনের আলোকে নিদ্রিত থাকে, সন্ধ্যার পর থেকেই সেখানে কেরোসিনের আলো চতুর্দ্দিকে জ্বলতে থাকে। হোটেলে ভিড় হয়, নানারূপ অজ্ঞাত যাত্রীর বিচিত্র কোলাহলে স্থানটি মুখরিত হয়ে ওঠে। এক একখানা বাস আসে, আর হোটেলওয়ালারা খরিদ্দার ডাকাডাকি করে, ঘরভাড়া দেয়, লোহার চেয়ারে বসিয়ে নড়বড়ে টেবিলের ওপোর ফুল্কা রুটী, ভাত, বিরিয়ানী ইত্যাদি যোগান দেয়। এখানেও বেশ গরম, লোকেরা অনেকেই সারাদিনের বাস-ভ্রমণের কষ্ট লাঘব করার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ঝরণায় স্নান করে খোলা বারান্দায় খাটিয়ার ওপোর ঘুমায়। কুদ্‌টাও জম্মুপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ হিন্দুপ্রধান। ৬ই আগষ্ট সোমবার আমরা কুদ্-এই রাত্রিযাপন করেছিলুম।

৭ই মঙ্গলবার ভোর বেলায় কুদের হোটেলে বারান্দায় বেরিয়ে অল্প অল্প শীত করতে লাগ্‌লো। এই প্রথম একটু ঠাণ্ডা পেলুম। তাও সে ঠাণ্ডা আমাদের কলকাতায় আগষ্ট মাসে বৃষ্টি পড়লে যেমন হয় তেমনি ধারা, তার বেশী কিছু নয়। মোটরে হর্ণ বাজতে লাগলো। প্রাতঃকৃত্য সেরে হোটেল থেকে দু'খানা করে রুটী, খাজুর নামক হিন্দুস্থানী মেঠাই এবং আগের দিনের বাসি দুধ খেয়ে যে যাঁর বাসগাড়ীতে পূর্ব্ব সিটে গিয়ে বসা গেল। মালপত্তর পূর্ব্বের ন্যায় বাক্স বিছানায় আবদ্ধ হয়ে বাসের ছাতে গিয়ে উঠ্‌লো। কুদ্ থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ১৩৪ মাইল। গাড়ী ঠিকমত চল্‌লে বিকাল নাগাদ শ্রীনগর পৌঁছানো যায়।

কুদের পর কয়েক মাইল এগিয়ে লোহার সাঁকো দিয়া চিনাব নদী পার হওয়া গেল। তার পর পাহাড়ের চড়াই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাস উঠ্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু বাস্ যত চলে, তার তুলনায় থামতেও বড় কম হয় না। রাস্তা ভাল বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় সরু, দুখানা গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে না; অথচ সোমবারের যাত্রায় যত মিলিটারী লরীর শ্রেণী (convoy) আমাদের পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, আজ মঙ্গলবারেও সেই পরিমাণই চলেছে, কিন্তু প্রভেদ এই যে, মঙ্গলবারে যে রাস্তা দিয়ে চলেছি সে রাস্তায় কনভয় পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না, অতএব আমাদের দাঁড়িয়ে যেতে হয় পাহাড়ের গা ঘেঁষে, আর ৬০।৭০।৮০ খানা মিলিটারী লরী আস্তে আস্তে আমাদের পাশ কাটিয়ে যেতে সময় নেয় প্রায় পনর-বিশ মিনিট। এ ছাড়া রাস্তায় চড়াই উৎরাই বড় বেশী। প্রায়ই সরকারী Caution Board লাগানো আছে, তাতে ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে "Khatra Ahista Chalao" (খৎরা, আস্তে চালাও)। বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ আমরা বিখ্যাত বাণিহাল গিরি-শ্রেণীর সামনে এসে উপস্থিত হলুম। বাণিহাল পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১২,০০০ ফিট, কিন্তু বাসের রাস্তাটি ৯,০০০ ফিট উপরে উঠে পাহাড়টিকে এফোঁড় ওফোঁড় করা এক টানেলের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে। এই বাণিহাল টানেলটি প্রায় এক মাইল আন্দাজ লম্বা। এই বাণিহাল গিরিশ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় কাশ্মীর ও জম্মু এই দুটি প্রদেশকে যেন ভাগ করে রেখেছে। বাণিহালের এদিকে অর্থাৎ জম্মু

অঞ্চলে সমস্তই শুষ্ক, রুক্ষ এবং উদ্ভিদ বিরল, কিন্তু টানেল-পার হয়ে ওপারে গিয়েই দেখি, গাছ-পালায় সমস্ত গিরিরাজ্য স্নিগ্ধ ও শ্যামায়মান। পাহাড়ের অপর পিঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মন্ত্রবলে সমস্ত আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। বাণিহালের অল্প দূর থেকেই কিছু কিছু ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল, বাণিহালের অপর পারেও তেমনি সামান্য ঠাণ্ডা ছিল। পথের পাশে খাদের মধ্যে মাঝে মাঝে পাইন গাছের জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে নীচে মেঘরাজ্য, অন্যপাশে উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণা নামছে; কোথাও অল্প পরিমাণ জল যেন নালা দিয়ে পড়ছে, আর কোথায় বেগবতী ঝরণা ফেণা হয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ভেঙ্গে চুরে পাহাড়কে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করতে করতে ছুটে আসছে। এমনি করে আমরা খাস্ কাশ্মীর প্রদেশে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

বাণিহাল থেকে বেশ খানিকটা নেমে এসে ডাইনে রাস্তা চলে গেল বেরিনাগ নামক স্থানে। এখান থেকে বেরিনাগ মাত্র ৭ মাইল। এই বেরিনাগে কয়েকটি পাহাড়ের ঝরণা একত্র হয়ে ঝিলাম নদীর উৎপত্তি হয়েছে এবং এই উৎপত্তিস্থলে একটি সুন্দর শিবমন্দির আছে। বেরিনাগ ডাইনে রেখে আরও খানিকটা এগিয়ে পথের পাশের মাইল ষ্টোনে যখন দেখা গেল শ্রীনগর আর চল্লিশ মাইল, তখন থেকেই রাস্তা বেশ সমতল ও সোজা হয়ে গেল। দু'পাশে ছোট বড় গ্রাম, ফুল ফলের বাগান, মধ্যে মধ্যে সমতল অনুর্ব্বর ক্ষেত্র। দূরে দিগন্তে উঁচু উঁচু শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়। ভৌগলিকরা বলেন, কাশ্মীর উপত্যকা কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে একটি পাহাড় ঘেরা বিরাট হ্রদ ছিল। সেই হ্রদের অধিকাংশ শুকিয়ে গিয়ে কাশ্মীর উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। জায়গাটা দেখ্‌লে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই আর থাকে না। এখানকার মাটী এত মোলায়েম এবং কাঁকর-শূন্য যে, মনে হয় এটা সবই সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের হ্রদের তলাকার পলিমাটী, এবং এখানকার ডাল হ্রদ, উলার হ্রদ, মানসবল হ্রদ সেই প্রাচীন বিরাট্ হ্রদেরই অবশিষ্টাংশ মাত্র। হ্রদের তলাকার পলিমাটিতেই এখানকার ক্ষেত্রগুলি গঠিত বলে এদেশ এত উর্ব্বর, এখানকার বাগানগুলি ফল ফুলে এত সমৃদ্ধ।

সমতল ক্ষেত্রে রাস্তা এসে পড়ার পর খানাবল নামক স্থানের পাশ দিয়ে মোটর বাসটি চলে গেল। এখান থেকে ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে, সেই রাস্তাটি মার্ত্তণ্ড হয়ে পহেলগাঁও-এর দিকে চলে গিয়েছে। অমরনাথের জন্য আমাদের যাত্রা হবে এদিক দিয়েই, কিন্তু এখান থেকে কোন গাড়ী পাওয়া যায় না বলেই যাত্রীদের সকলকেই প্রথম যেতে হয় শ্রীনগর। এখান থেকে বাস্ বদলী করে পহেলগাঁও যাওয়ার বাসের বন্দোবস্ত যে করা যায় না, তা নয়, কিন্তু কাশ্মীর সরকার সমস্ত যাত্রীকেই শ্রীনগরে নিয়ে যেতে চান, কারণ তা না হলে বাণিজ্যের সুবিধা ত হবে না। বোধ হয় সেই জন্যই সমস্ত যাত্রীকে আগে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর আরও কিছুদূর এগিয়ে ডাইনে ক্যান্টনমেন্টের রাস্তা ছেড়ে আমরা শ্রীনগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে বাঁয়ে ঝিলাম নদী ও ডাইনে শঙ্করাচার্য্যের পাহাড় ছেড়ে এসে পৌঁছলাম শ্রীনগর জেনারেল পোষ্ট অফিসের ধারে। খানাবলের পর থেকে প্রায়ই পথের দুধারে মিলিটারী তাঁবু দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যান্টন্‌মেণ্ট এলাকার পর খাস শ্রীনগর সহরে আর মিলিটারীর তেমন ভিড় দেখা গেল না। পাকীস্থানের সঙ্গে যুদ্ধের পাঁয়তাড়া এত বেশীভাবে এই সময়টায় চল্‌ছিল এবং সারা ভারত জুড়ে খবরের কাগজে সেই সব বিবরণ এমনি ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল যে, বাংলা সরকার কাশ্মীর যাওয়ার জন্য এ বৎসর প্রায় ৮০০ পারমিট দিলেও প্রাণভয়ে যাত্রীরা বড় কেউ যায় নি, মাত্র ১৫।২০ জন যাত্রী এ বছর বাংলা থেকে কাশ্মীর গিয়েছিল এবং শ্রীনগরে এসে শুনলাম যে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর যাত্রীর সংখ্যা দশভাগের একভাগ মাত্র হয়েছে। এজন্য এ বছর কাশ্মীরের সমস্ত ব্যবসাদার, হাউসবোট-ওয়ালা, হোটেলওয়ালা সকলেই খরিদ্দারের অভাব বিশেষ ভাবে বোধ করেছে। ফলে সবই সস্তা হয়েছিল এবং ক্যান্‌ভাসারের অত্যাচার যাত্রীদের বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে হয়েছে।

শ্রীনগর জি পি ও-তে বাস দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় জন পঞ্চাশেক হাউসবোটওয়ালা তাদের হাউসবোটের ফটো নিয়ে এসে যুগপৎ আমাদের আক্রমণ করলে। সকলেই বলে বাবু, আমার বোটখানা দেখবেন চলুন, এমন ভালো বোট আর হয় না। মিনিট পনর ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বাসখানা আবার ছাড়লো এবং আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাশ্মীরের বিখ্যাত মীরা কদলের পাশে টুরিষ্ট বাসের ডিপোয় এসে পৌঁছাল, বেলা তখন হবে সাড়ে চারটা।

দুদিন বাস চড়ার পর শ্রান্ত দেহে শ্রীনগরে মীরাকদলে বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই এককুড়ি হাউসবোটওয়ালা, এক ডজন হোটেলওয়ালা দশ পনেরো জন অমরনাথের পাণ্ডা সকলে একসঙ্গে আমাদের মত নিরীহ যাত্রীদের ছেঁকে ধরলে। এর মধ্যে দু'চারজন বে-রসিক ফেরিওয়ালা তাদের পণ্যসম্ভার কেনবার জন্য পীড়াপিড়ীও সুরু করলে, আর মাল নিয়ে আমাদের অজ্ঞাত অনিশ্চিত যে কোন জায়গায় টেনে নিয়ে ফেলবার জন্য দু'তিন গণ্ডা কুলি এমন টানা-ছেঁড়া সুরু করলে, যে মনে হোল দু'একটা বাক্স বিছানা বুঝি বা উধাও হয়েই যায়। ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করার পর শেষে ঠিক করলুম কাশ্মীর হিন্দু হোটেলে গিয়ে উঠবো, এবং সেইখানেই যাওয়া গেল। এই হোটেলটি মীরাকদলের ওপোরে ঝিলাম নদীতে প্রথম সেতুর পাশে তিনখানি হাউসবোট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ হোটেল বটে, কিন্তু পাকা বাড়ীতে নয়, হাউসবোটে। এতে করে হোটেলেও থাকা হোল, অথচ হাউসবোটের আস্বাদও পাওয়া গেল। মঙ্গলবার ৭ই আগষ্ট ঝিলাম নদীতে হাউসবোটের ওপোর রাত্রিযাপন করা গেল। (ক্রমশঃ)

রঙিন শাড়ী

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

প্রবন্ধের নাম 'রঙিন শাড়ী' দেখে অনেকেই ভাববেন রাসায়নিক ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাসের শেষে নভেল লেখার বাতিকে পেয়ে বসল নাকি? প্রারম্ভেই বলে রাখি যে সেরূপ কোনও উচ্চাভিলাষ আমার নেই। রঙিন্ শাড়ীর মধ্যেও আমি রাসায়নিক শিল্পের কথাই ভাবছি। পথে ঘাটে ট্রামে বাসে ট্রেনে অ্যারোপ্লেনে সর্বত্রই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আজকাল আমাদের স্ত্রীজাতির পরিধেয়ে রামধনুর বর্ণচ্ছটা খেলে যাচ্ছে দেখতে পাই। এতে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও সাধারণ লোক আমাদের মনে খুশীর আমেজ উঁকি দিয়ে যায়; কিন্তু প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি এতে মনে মনে ব্যথিত না হয়ে থাকতে পারেন না। সম্ভ্রান্তা রমণীর রঙিন বসনাঞ্চল থেকে যে বারিবিন্দু বিগলিত হয় উহা দেশমাতৃকার অশ্রুবিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বৈষ্ণব কবি যখন—"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর" ব'লে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন তখন তাতে কারো এরূপ বিক্ষুব্ধ হবার কারণ ঘটে নি; যেহেতু তৎকালে নীল শাড়ীর ঐ নীল রং প্রস্তুত হত আমাদের দেশেরই উদ্ভিজ্জ থেকে। সে যুগে মঞ্জিষ্ঠা ও লাক্ষা থেকে প্রস্তুত হত লাল রং, কুসুম ও শিউলীফুল এবং কাঁঠাল প্রভৃতি কাঠ থেকে তৈরি হত পীত রং আর গৈরিকের জন্য গিরিমাটির ত অপ্রতুলতা ছিল না কোনও স্থানেই। কিন্তু আজ যে 'রামধনু আঁকা' বাস-বিন্যাসে ভারতীয় কামিনীকুল ভূষিতা হচ্ছেন তার জন্য প্রাণে অপরিসীম ক্ষোভ ও দুঃখের সঞ্চার হয়; যেহেতু ঐ রামধনু রঙের পেছনে গরীব ভারতের কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর সাগর পারে চলে যাচ্ছে। অনেকেই জানেন ১৮৯০-৯৫ সালেও প্রতি বৎসর পাঁচ কোটি টাকার ওপর নীল ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে চালান যেত। কিন্তু জার্মান রাসায়নিকগণ বহু বৎসরের গবেষণায় সিদ্ধ মনোরথ হ'য়ে যখন কারখানাতে ভুরি পরিমাণে বিশুদ্ধ নীল উৎপাদন আরম্ভ করলেন তখন ভারতের এই নীলের চাষ গেল উঠে এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদেরও একটি মস্ত বড় লাভজনক ব্যবসায় গেল মাটি হয়ে। অবশ্য এর বিশ পঁচিশ বছর আগেই জার্মান রাসায়নিকগণের সাধনায় ফরাসীদেশের মঞ্জিষ্ঠার চাষ নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রান্স মঞ্জিষ্ঠার চাষে প্রতিবৎসর প্রায় এক কোটি টাকা লাভ করত। প্রথিতযশা জার্মান অধ্যাপক বেয়ারের গবেষণাগারে ১৮৬৮ সালে তাঁর কৃতী ছাত্রদ্বয় গ্রেবে ও লিবেরমান আলিজারিন বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে অ্যানথ্রাসিন নামক পদার্থের সন্ধান পান। অ্যানথ্রাসিন পাওয়া যায় আলকাতরা থেকে—এবং ইতিপূর্বে ইহা নিতান্ত অকেজো বলেই পরিগণিত ছিল। অধ্যাপক বেয়ার অ্যানথ্রাসিন থেকে শীঘ্রই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যালিজারিন প্রস্তুত করলেন। এই স্বনামধন্য গবেষক লিবেরমানের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে। কারণ ইনি বার্লিনের অধ্যাপক থাকাকালে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহোদয় ১৯১২-১৩ সালে এঁর ছাত্র ছিলেন।

যাক এখন অ্যালিজারিনের কথায় আসা যাক। অধ্যাপক বেয়ার গবেষণাগারে আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত অ্যানথ্রাসিন থেকে অ্যালিজারিন তৈরির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বন্ধু হাইনরিখ কারো রাইন নদী তীরে অবস্থিত লুড্‌ভিগসহাফেনের বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফাব্রিক নামক কারখানায় উহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও তথ্যানুসন্ধানী রসায়নবিদ্‌গণের গবেষণা-অনুরাগ ও জ্ঞানের গভীরতা ছিল যেরূপ অনন্যসাধারণ ওদের কারখানার রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়রদের কর্মতৎপরতা এবং দক্ষতাও ছিল সমভাবে অপরিসীম। অ্যালিজারিণ প্রস্তুত ব্যপদেশে তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬৮ সালে অ্যালিজারিণের রাসায়নিক প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত হয় আর তার দুই বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৭০ সালের মে মাসেই রসায়নাগারে প্রস্তুত কৃত্রিম অ্যালিজারিনের উৎপাদন কিরূপ বৃদ্ধি পেয়েছিল নিম্নের তালিকা থেকেই তা স্পষ্ট বুঝা যাবে—

সন	অ্যালিজারিন উৎপাদন
১৮৭১	১৫ হাজার কিলোগ্রাম (১ কিলোগ্রাম=১ সের)
১৮৭২	৫০ হাজার "
১৮৭৩	১ লক্ষ "
১৮৭৭	৭ লক্ষ ৫০ হাজার "
১৯০২	২০ লক্ষ কিলোগ্রাম

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিজারিনের দাম কিরূপ কমে গিয়েছিল তাহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

১৮৭০	২০০ মার্ক প্রতি কিলোগ্রামের মূল্য
১৮৭২	১২০ " "
১৮৭৮	২৩ " "

অনেকেই জানেন ১ মার্ক সচরাচর আমাদের এক টাকার সমান।

জানা যায় ১৮৮১ সালে মাত্র এক বৎসরেই বাডিশে কোম্পানী এক-মাত্র অ্যালিজারিন বিক্রী করেই দেড় কোটি টাকা থোক লাভ করেন। ফলতঃ কেমিক্যাল কারখানা কাকে বলে এবং 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ' কথাটির অর্থ কি তা আমরা এ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারি। অ্যালিজারিনের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক রকমের মূল্যবান্ রঞ্জন পদার্থ এবং পরিশেষে নীলও ঐ কারখানা থেকে কত কোটি টাকার যে উৎপন্ন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জার্মানির আরও দুইটি এইরূপ বিরাট আয়তনের রাসায়নিক কারখানায় অবিরাম গতিতে রঞ্জন পদার্থ উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল—মহাকবি গ্যেটের জন্মস্থান ফ্রাঙ্কফুর্টের অদূরবর্তী মাইন নদীতীরস্থ হোয়েকস্টে মাইস্টার লুসিয়াস ব্রুয়েনিং কোম্পানীতে এবং কোলনের সন্নিকটস্থ লিভারকুজেনে

অবস্থিত বেয়ার কারখানায়। তিন বৎসর আগে অন্যান্য বহু কারখানার সঙ্গে এ তিনটি কারখানাও দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। জার্মানির এই সব কারখানার বিরাট আয়তন ও বিশাল উৎপাদনশক্তি দেখে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইংরেজেরা সারা পৃথিবী দোহন করে যত অর্থ ঘরে নিয়ে যেতে না পারত জার্মানি ঘরে বসে কেবলমাত্র মাথার জোরেই তুচ্ছ পাথুরে কয়লা থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ উৎপাদন করে দেশের সচ্ছলতা সম্পাদন করত। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ইংরেজেরাও তাদের প্রয়োজনের শতকরা ৯০ ভাগ রঞ্জন পদার্থই জার্মানি থেকে আমদানি করত। ফলতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণই ছিল জার্মানির এই বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক শিল্পজাত সামগ্রীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের মূলে কুঠারাঘাত করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংরেজ ও মার্কিনগণ পূর্ণ উদ্যমে রঞ্জন শিল্প স্থাপন ও প্রসারের প্রতি মনোযোগ দেয়। এ সময় ইংলণ্ডের অনেকগুলি রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান একত্র মিলিত হয়ে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রিজ নামক বিরাট শিল্পসমবায় গড়ে তোলে। জার্মানিও যুদ্ধের তাল সামলিয়ে নিয়েই ১৯২৬ সালে ই. গে. ফারবেন ইনডুষ্ট্রি নামে শিল্প সংঘ স্থাপন করে। পূর্বোক্ত কারখানাগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি বৃহৎ রাসায়নিক কারখানা এই সঙ্গে যোগ দেয়। বলা বাহুল্য, জার্মানির এই নবগঠিত সুবিশাল শিল্পসমবায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইংরেজ ও মার্কিণ রাসায়নিক শিল্পপতিগণ চোখে সরসের ফুল দেখতে আরম্ভ করল। সুতরাং সত্য কথা বলতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলেও জার্মানির এই অসামান্য শিল্পোন্নতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই মিত্রপক্ষের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ইংরেজ মার্কিণ রুশ ফরাসীর তাঁবেদারিতে শক্তিহীন জার্মানি আজ আর বিশ্বের বাজারে তাদের রাসায়নিক দ্রব্য সম্ভার সরাসরি আনতে পারছে না। তাই ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে পাছে তাদের ব্যবসায়ের ব্যাঘাত ঘটে তাই আগে থেকেই তারা সাবধানতা অবলম্বন করছে। গবেষণাগার ও কারখানা নূতন করে ভারত ভূমিতে স্থাপনের জন্য তারা যারপর নাই তৎপর হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি তাদের একটি বৃহৎ গবেষণাগার উদ্বোধনের খবর সকলেই পেয়েছেন। ভারতবর্ষে রঞ্জন পদার্থ প্রস্তুত করবার কাঁচামাল পাথুরে কয়লার অফুরন্ত ভাণ্ডার বিদ্যমান, দেশে মাথাওয়ালা বিজ্ঞানী এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারেরও অভাব নেই—বিত্তশালী শিল্পপতির সংখ্যাও আমাদের নিতান্ত নগণ্য নয়—কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও দেশে এই অশেষ কল্যাণপ্রসূ রাসায়নিক শিল্প কেন যে গড়ে উঠছে না তা ভেবে পাই না। দেশে রঞ্জন শিল্প প্রতিষ্ঠায় আর একটি উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা এই যে, যুদ্ধোপকরণ বিস্ফোরক পদার্থ তৈরিরও ইহা মস্ত বড় সহায়। কামারশালে কাস্তে কোদালি তৈরি হলেও প্রয়োজনমত তাতে যেমন বর্শা, বল্লম, এমন কি তরবারি পর্য্যন্ত তৈরি করা যেতে পারে রঞ্জনশিল্পের কারখানাতেও সেইরূপ স্বল্পায়াসেই নানা প্রকারের বিস্ফোরক জাতীয় মারণাস্ত্র তৈরি করা সম্ভবপর। আর রঞ্জন শিল্পের সঙ্গে আধুনিক ঔষধ পত্র, গন্ধ দ্রব্যাদির প্রস্তুতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু আজ দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ক'জন একথা ভেবে দেখছেন বা এর প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন? তাই বিদেশী কারখানাগুলি আজ এদেশে জেঁকে বসবার আয়োজন করছে। এরা গবর্ণমেন্ট ও দেশবাসীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টাই বেশী করবে। এদেশে কারখানা স্থাপনের ভাঁওতায় তাদের দেশের উৎপন্ন রঞ্জন পদার্থ এবং ঔষধাদি এনেই তারা এদেশ ছেয়ে ফেলবে; ফলে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দাঁড়াতে পারবে না। কেহ নতুন করে এই জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাহসও আর পাবে না। গরীব দেশের অজস্র অর্থব্যয়ে যে সব ছাত্র উচ্চতর বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং অধিগত করবে—তারা তাদের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা দেশের গঠনমূলক কাজ করবার সুযোগও পাবে না। বিদেশী কোম্পানিগুলির দালালি করে বা তাদের বিক্রয় ও প্রচার বিভাগের বড়বাবুর পদ নিয়ে মোটা মাহিনায় তাদের দিন গুজরান করতে হবে। ভবিষ্যতে রাজ পরিবর্তনের ফলে আমাদের চোখ ফুটলেও বিদেশী কোম্পানিগুলিকে আর স্থানচ্যুত করা সহজ হবে না—এখন মিশর ও পারস্যে যা ঘটছে তারই পুনরভিনয় হবে মাত্র।

তাই বলি, রঙিন শাড়ীর পেছনে যে আগুন আজ ধূমায়িত হয়ে উঠছে সময়ে সাবধান না হলে সারাভারতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আশা আকাঙ্ক্ষা সে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। ভারতকে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির জন্য চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হবে। শিল্পবাণিজ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা ব্যতিরেকে সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ হয় না। অনেক প্রকার 'বর্জন'ই ত আমরা সফল করে তুলেছি, আর মেয়েরাই এতে বেশী অংশ গ্রহণ করেছেন। যাঁদের স্বামীপুত্র সহোদর একছটাক রংও তৈরি করতে পারেন না—সেই মা লক্ষ্মীদের রঙিন শাড়ীর প্রতি এত মোহ কেন? আজ তাঁরা সম্মিলিতভাবে রঙিন বস্ত্র বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করুন। পুণ্যশ্লোকা পাঞ্চালীর ন্যায় তাঁরা পণ করুন, ভারত যতদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রঞ্জনশিল্প প্রতিষ্ঠিত করতে না পারছে ততদিন তাঁরা পদ্মিনী নারীর আদর্শে শুদ্ধ ধবল বস্ত্র পরিধান করেই তৃপ্ত থাকবেন। বিবেকানন্দ প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের পুণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলার মা বোনেরা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন বলেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

ভেনিস

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

এক পল্লী হতে অন্য পল্লী যেতে হ'লে, নৌকা চাই, প্রাচীন সহর প্রাসাদে পূর্ণ, আশে পাশে নীল সমুদ্র, ভেনিসের এ বর্ণনা শিশুকালের ছাত্রাবস্থা হতেই মানুষের কল্পনাকে সক্রিয় করে, মনের পটে চিত্র আঁকে। তারপর ধীরে ধীরে যেমন বিদ্যা বাড়ে, জ্ঞানের আলো মনের সেই ছবিতে রঙ ফলিয়ে, ভেনিসের নব নব রূপ উদ্বুদ্ধ করে। বান এলে বলি, গ্রামটা যেন ভেনিস হয়ে গেছে—কলিকাতার রাজপথে বৃষ্টির জল দাঁড়ালে ছেলেবেলা রসিকতা করে বলতাম ভেনিসে বাস করছি। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়রের মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস এবং বায়রণের চাইল্ড হেরল্ডের কবিতার ভিতর দিয়ে মনগড়া চিত্রে তুলি বুলিয়ে বিজ্ঞতা তাকে কাটছাট করেছে, পরিণতি দিয়েছে। তাই আমার চিরদিনের সাধ ছিল ভেনিস দেখবার। সে সাধ পূর্ণ হ'ল গত ২৬শে শ্রাবণ শ্রীকৃষ্ণের শুভ ঝুলনযাত্রার দিন। প্রথম দর্শনেই মনের পটের ছবির কতকটা রদ-বদল হ'ল।

বিমোহিত হলাম পৌছবার পথের নির্মাণ-কুশলতায়, সৌন্দর্য্যে এবং চিত্তাকর্ষক শৃঙ্খলায়। আমরা সারা পরিবার মোটরে ঘুরছিলাম। ভেনিসে এলাম ফ্লরেন্স থেকে। সে সহর হতে বোলোনা অবধি এট্রস্কান আপি-নাইনের উপর দিয়ে রাস্তা। ফুটাপাশ গিরিবর্ত্ম প্রায় তিন হাজার ফুট উঠে আবার গড়ানে পথে অল্প নেমে রতিওসা গিরিপথে তিন হাজার একশো পঁচাত্তর ফুট উঠতে হয়েছিল। উপরের মাইল কতক রাস্তা ছাড়া সারা পথ ম্যাকাডাম পীচ বিছানো। কিন্তু দৃশ্য অপূর্ব—আমাদের দার্জিলিঙের পথের মত সবুজ গাছ আর পাহাড়ী ফুলে ভরা। মাঝে মাঝে গ্রাম—প্রতি গ্রামে এক একটি গির্জা। তা ছাড়া মাঝে মাঝে ছোট ছোট মন্দিরে ক্রুশে ঝোলা যীশু-মূর্ত্তি—মুখ প্রীতি-ভরা; শ্রীমুখে নিজের ক্লিষ্ট দেহের বা লাঞ্ছনার কোনো রেখা নাই। এমন মূর্তি ফ্রান্স এবং ইটালী এমন কি পশ্চিম জার্মাণীর পথের শোভা। শিল্প-শোভার নিদর্শন ইটালীর প্রতি কুটীরে বিদ্যমান। কিন্তু বড় বড় সহর মার্কিনী দৃশ্য-কটু গগন-চুম্বী সৌধের মোহে বংশগত শিল্পানুরাগে বীতরাগ।

বোলোনা থেকে পাডুয়ার পথের দুদিকে বাংলা দেশের মত শস্য-ক্ষেত্র; দুপাশে নদী নালা এবং গ্রাম। কিন্তু পথ নির্দোষ, পীচ্ ঢালা। পথের দু'ধারে উচ্চ করবী ও অন্য গাছের ছায়া। ইতালীর করবী প্রকাণ্ড গাছ—শ্বেত, পীত এবং উভয়ের মিশ্রিত রঙের ফুলে ভরা। আমাদের মৃচ্ছকটিকে করবীর উল্লেখ আছে, সুতরাং আমাদের রক্ত ও শ্বেত করবীও প্রাচীন। কিন্তু আমাদের সকল পৈতৃক
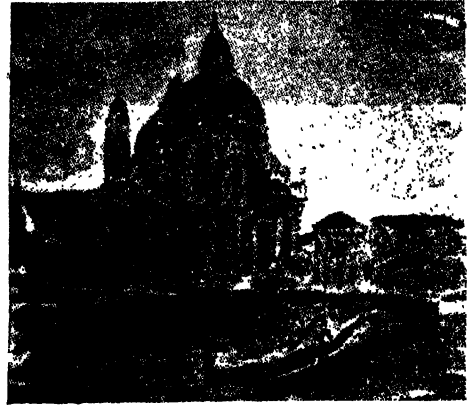
ডেল্লা সালুট গির্জা

সম্পত্তির মত আজ সে অযত্নে খর্ব। ইতালীর ওলিয়াণ্ড্রো ভূমধ্য-সাগরের কুল হতে সর্বত্র দেখলাম। আমাদের দেশের বাবুল গাছের মত করবী রাজপথের দুদিকে দর্শকের উপভোগ্য পথ-রক্ষী।

শেষে এক বিশ মাইল বিস্তৃত অটোস্ট্রাডায় পৌছিলাম। ইতালীর এপথে মাশুল লাগে। অন্যত্র বহু পথে মাশুল লাগে না। সে পথে কেবল মোটর যেতে পারে। অন্য গাড়ি এমন কি পথচারীরও প্রবেশ নিষেধ। য়ুরোপের সব দেশে স্থানে স্থানে এমন পথ আছে। ইতালী এদের বলে অটোস্ট্রাডা, সুইজারলাণ্ড বলে অটোস্ত্রাস্ আর জার্মাণী

অটো বলে আরও বলে বহন। ইংলণ্ডের বাহিরে হাওয়া-গাড়িকে কেহ মোটর বলে না, বলে—অটোমোবিল সংক্ষেপে—অটো। পেট্রোলকে বলে—বেন্‌জিন।

ভদ্রলোক ভারতানুরক্ত। টেগোর এবং গান্ধীর উল্লেখ ক'রে য়ুরোপ সৌজন্য প্রকাশ করে ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পেলে। তাঁদের এবং নেহরুর কথার শেষে উঠলো অটোমোবিলের কথা। ভদ্রলোক হেসে বল্লেন—ও এক মেশানো কথা। অটো গ্রীক্ আপনাদের আত্ম—সেল্‌ভ নিজে। কিন্তু মোবিল ল্যাটিন মোবের ধাতু হ'তে হয়েছে মানে, চলে। নিজে চলে।

সেণ্ট মার্ক ঘাট

প্যাডুয়া

ভাবলাম ঐ রকম একটা কিছু না বলতে পারলে ভারতবর্ষের নাম ডুববে। কাজেই বল্লাম—আপনার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। আমার মনে হয় আপনাদের বহন যার মানে রাস্তা, আমাদের বহন যার মানে বহা বা বহে যাওয়া যেমন নদী, তার অনুরূপ।

ভদ্রলোক একটু ভেবে বল্লেন—হ'তে পারে। এ বিষয়ে আমি চিন্তা করিনি। ভারতবর্ষ পণ্ডিতের দেশ।

তাঁর মুখের শেষ হাসিটুকু মেলাবার পূর্বেই ডঙ্ক দিয়ে বিদায় নিলাম। তখনও ভদ্রলোকের ভারতের পাণ্ডিত্যে সন্দেহ হয় নি। 'ডঙ্ক, থ্যাঙ্ক যে পাশ্চাত্যের সৌজন্যের ডঙ্কা একথা বলবার সাহস হল না। যাক্।
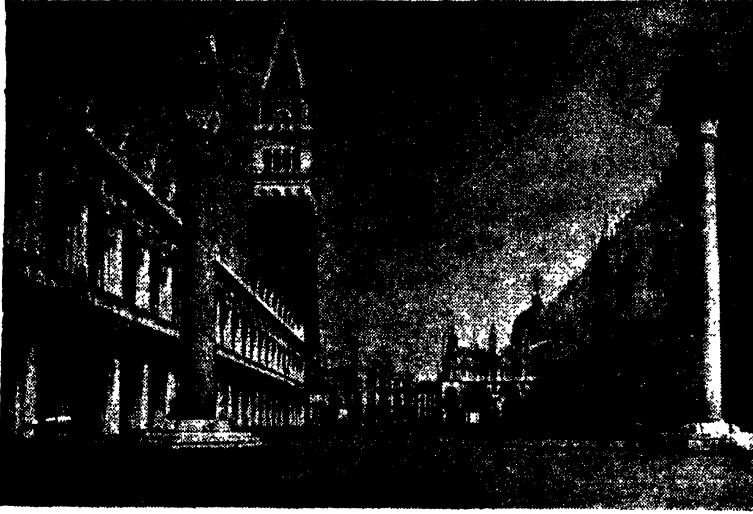
অটোমোবিল সম্বন্ধে একটা গল্প এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও, না বলে থাকতে পারছি না। বড় বড় চুল এক অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পেলাম জার্মাণীর কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বলছিলাম অটোস্ত্রাচার কথা। এগুলি হয় সোজা চওড়া রাজপথ ফেরোকনক্রীটের। চারখানি গাড়ি যেতে পারে। এক এক দিকে দুখানি। বিলিয়ার্ড টেবিলে যেমন গোলা

গড়ায়, ভাগ্যবানের ঘরে যেমন স্বর্ণ মুদ্রা গড়িয়ে আসে, তেমনি অবাধে গাড়ি গড়িয়ে গেল অটো-পথে। চালক পুত্র। কোনো গাড়ি আগে যেতে দেবে না—এমন দুর্বুদ্ধি তার নাই, একথা বলতে পারি না। কাজেই পঁচিশ মিনিটে সেই সুগম্য দশ ক্রোশ পথ শেষ করলাম। কিন্তু তারপর মন যে আনন্দ চঞ্চলতার আবেগে বেগবান হ'ল তা অপূর্ব।

গিয়ে পড়লাম সমুদ্রের উপর। তরঙ্গায়িত সমুদ্র নয়, চঞ্চল সাগর নয়—লেগুন। সাগরের লবণাম্বু ভরা হ্রদ। লোকও তার নাম করে না। তার পূর্ত্তকার্য্য যে বিশেষ কিছু না একথা শুনলাম, হোটেলের এক আমেরিকার ভ্রমণকারিণীর মুখে।

ভেনিসের মস্ত মার্ক গির্জার চাতালে বসে মহিলার সঙ্গে রোমাঞ্চকর স্থানের তালিকা মেলাচ্ছিলাম।

আমি বল্লাম—পোলটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আমাদের দেশে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের যে সেতু আছে সে এত বড় নয়। আর সেটা খোলা সাগরের প্রণালীর ওপর। এটি যেন উপবনের সরোবরের উপরের সেতু। মনোরম।
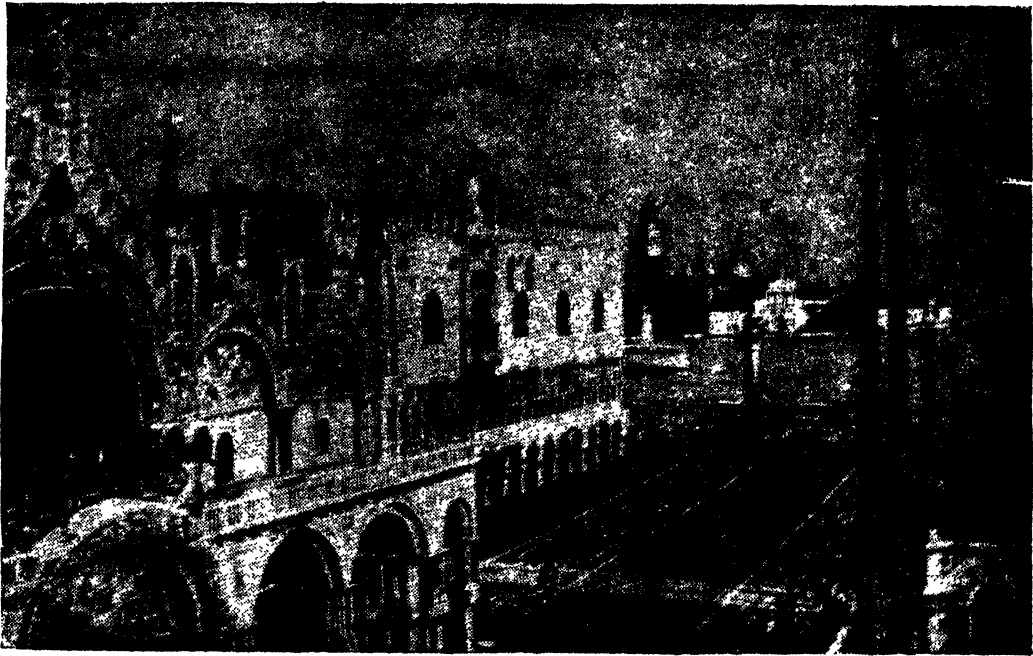
সেন্ট মার্ক

ভেনিস সাগরের জল-ভরা তিন দিক ঘেরা স্থির বারি-সঞ্চয়। তার ওপর পুল সাড়ে পাঁচ মাইল লম্বা, ১৮০ ফুট প্রস্থ। চমৎকার দৃঢ় গাঁথুনী—২৬৭টি থাম অবস্থিত ২২৫টি খিলানের উপর নির্মিত এ সেতু। উপরে কেরো কনক্রিট। এটিও অটো-পথের মত মুশোলিনী যুগে তৈরি।

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। মার্কিনী ও ইংরাজের কাছে মুশোলিনীর নাম ভূতের কাছে রামনামের বা সেকালের কুলবধূর কাছে ভাসুরের নামের মত—অস্পৃশ্য। আজ এদের সখ্যতার হেকায় পড়ে ইটালীর

তিনি এক মত হলেন। বল্লেন—আপনি সিঙ্গাপুর আর জহরের সংযোজক সেতু দেখেছেন? ক্ষমা করবেন।

শেষ ভিক্ষা তাঁর চুরুট হ'তে ভেনিসের হাওয়ায় ওড়া স্ফুলিঙ্গের দুর্ব্যবহারের জন্য।

টেনিস-খেলা হাতে আমার বৃদ্ধ স্কন্ধে একটা থাবড়া মেরে আগুন নিভিয়ে তিনি বল্লেন—তবে সেটা ছোট।

আমি বল্লাম—হ্যাঁ সে সাঁকো আমি দেখেছি গত যুদ্ধের পূর্বে। বোধ হয় আমাদের কলিকাতার সেতু তার অপেক্ষা বড় এর সাথে তার তুলনা হয় না। মশোলিনীর এ কীর্ত্তি—

—কার কীর্ত্তি ?

—মুশোলিনীর।

বদ্‌লে গেল মতটা। মহিলা বল্লেন—এটা এমন কিছু নয়। আমাদের দেশের এতো অতি সাধারণ সেতুর মত। ওঃ! সেই টল্‌টক্‌ আবার কাজ শিখলে কোথা ?

আমার নাতিনীদ্বয় শমিতা ও লালী কিন্তু বিমল আনন্দ ভোগ করেছিল সে সেতুর উপর। পিছন হতে লালী চেঁচাচ্ছিল—নদীর মা। নদীর মা। শমিতা বল্‌ছিল—সমুদ্দুরের ওপর পোল। কি আশ্চর্য্য।

আমি লালীকে বহুবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে সমুদ্র নদীর শ্বশুর বাড়ি—ঝরণার ওপর তুষার-ক্ষেত্র নদীর জননী। কিন্তু তার মাতৃ-ভক্তি এতো প্রবল যে সে তার মার শেখানো আখ্যা দেয় সমুদ্র দেখলেই। তার বয়স মাত্র দু'বছর।

তার পর আরও রোমান্স। গাড়ি এসে পৌঁছিল এক দ্বীপে। গাড়ি আর যেতে পারে না—ওপারে ভেনিস। এ সুগঠিত সহরতলীতে গাড়ির ভিড়, লোকের ভিড়, ঘাটে গণ্ডোলা নৌকার ভিড়। হৈ হৈ কাণ্ড!

গাড়ি সেইখানে ছেড়ে যেতে হয়। এক ভীমদর্শন মার্কিনী ছাঁদে গড়া প্রকাণ্ড সৌধ—অঙ্গে কবিতার ছোঁয়াছ নাই, বর্ণে শিল্পের আমেজ নাই। অবশ্য পূর্ত্ত-বিজ্ঞান, অঙ্ক-শাস্ত্র প্রভৃতির মানস পুত্র এ অট্টালিকা। এর ইতালী ভাষায় নাম—অটো রেমিস্‌সা। বহু গাড়ি ইনি উদরসাৎ করেন। কিন্তু সংখ্যা ঠিক স্মরণ হ'চ্চে না—এক এক তলায় অন্ততঃ পচিশখানি গাড়ি থাকে। ময়াল সাপের মত দুটি পথ-কুণ্ডলী এই দশতলাকে সংযুক্ত করেছে—একটি ওঠ্‌বার পথ, একটি নামবার পথ। দৈনিক ভাড়া বেশী নয়—তবে ঠিক কত সে কথা ভুলে গেছি, যেহেতু ওসব তুচ্ছ কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল পুত্রের উপর।

সেই ঘাটের চাতাল থেকে দেখা যায় অপরূপ দৃশ্য। প্রত্যেক সৌধে কিছু না কিছু শিল্পের নিদর্শন আছে—সেণ্ট বা পাপী, সুন্দরী বা রাক্ষসীর। বাড়িগুলা যেন জল থেকে ফুঁড়ে উঠেছে, স্বচ্ছ জলে তাদের প্রতিবিম্ব ক্রীড়াশীল—জলে চলছে গণ্ডোলা, বড় নৌকা, অটো-নৌকা ও জাহাজ।

এক সুন্দর বেশধারী—ফরসা সার্ট, রঙীন টাই—জিজ্ঞাসা করলে—সিনর হোটেল লুনা? গুপ্টা?

সে গণ্ডোলা-চালক, আমাদের জীর্ণ-বাস পাঁচু মাঝির ইতালীয় সংস্করণ। গুপ্টা পরিচয় গুপ্ত রাখতে পারলাম না। বসলাম গণ্ডোলায়। বহু দিনের সখ। বাসনা জমাট বেঁধে যে বিচিত্র চিত্র এঁকেছিল—সে ছবি দেখলাম। ভালো লাগল, স্ফূর্ত্তি হল। বাড়িগুলার ভিতর কত ভাঙ্গা মনোরথের জমাটি আবর্জনা আছে, কত প্রেম আছে, বিরহ আছে, খালের জলে কত নিরাশার ও বেদনার অশ্রু মিশে আছে, সে সব ভাবনাকে আত্ম-প্রকাশ করবার অবকাশ দিলাম না। নিজেরও দুর্দশার কথা থাক। সঙ্গে পুত্র, পুত্রবধূ দেবকন্যা নাতিনীরা, সামনে চঞ্চল জলের তরল স্রোত চতুর্দিকে শিল্পের নিদর্শন। আবার কি?

পরে বুঝলাম গ্র্যাণ্ডক্যানেলটি ইংরাজি অক্ষর S এর মত বেঁকে বেড়ে আছে সহরটিকে। সেটি শতদ্বীপে অবস্থিত। ছোট ছোট ১৪৬টি খাল সেই দ্বীপপুঞ্জকে একতার যোগে বেঁধেছে। তারা রাজপথ। অটো বাসের বদলে চলে অটো বোট। রিক্‌স বা গাড়ির বদলে চলে গণ্ডোলা। গো-শকট বা মোটর লরীর বদলে বড় নৌকায় মাল চলাচল করে।

হোটেল লুনা ঠিক্‌ প্রসিদ্ধ গির্জা সেণ্ট মার্কের অঙ্গনের বাহিরে। তাড়াতাড়ি মালপত্র রেখে সন্ধ্যার পূর্বে গোধূলিতে আমরা দেখলাম সেণ্ট মার্কের অপূর্ব মনোহর রূপ। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের মতো সেণ্ট মার্কের ঘাট যাত্রীপূর্ণ। তবে—যাক্‌ আত্ম-নিন্দা আত্ম-ঘাত।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধকল্যাণ—তেতালা

বাঙ্গালা খ্যাল

তব গলে পর আজি গেঁথেছি গানের মালা,
ও গলে মালা তুলিলে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা।
তোমার রূপ হেরে হরষে ভাসিছে হিয়া,
শুধু ফুল চাও যদি দিব তানের ডালা॥

গীত-সম্রাট শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। স্বরলিপি—গীত-সরস্বতী* শ্রীমতী ভক্তি ভট্টাচার্য্য

{ সা সা সন্‌া সধ্‌া | সা ন্‌া রা সা | সন্‌া রা গা পা | রা গা রা সা } |
ত ব গ০ লে০ প র আ জি গেঁ থে ছি গা নে র মা লা

পা গা গা পা | হ্মা ধা পা পা | রা গা পা রা | গা গা রা সা ||
ও গ লে মা লা তু লি লে জু ড়া বে প্রা ণে র জ্বা লা

{ পা গা গা গা | পা হ্মা ধা পা | হ্মা ধা না র্রা | না ধা পহ্মা গা }
তো ০ মা র রূ প হে রে হ র ষে ভা সি ছে হি০ য়া

র্গা র্গা র্রা র্সা | র্রর্সা নর্সা ধা পা | হ্মা ধা না -া | ধপা হ্মপা পা গা |
শু ধু ফু ল চা০ ০ও য দি দি ব তা ০ নে০ ০ ০ র

তান

১। নরা গপা ধনা র্সর্রা | র্সনা ধপা হ্মগা রসা |
আ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২। র্রর্রা র্সনা ধপা হ্মপা | ননা ধপা হ্মগা রপা |

৩। নরা গরা হ্মগা গহ্মা | ধপা নধা র্সনা র্রর্সা |

র্গর্রা র্সনা ধপা হ্মপা | ধপা রগা রসা নসা |

* এ বৎসর "রামশরণ কলেজে" শ্রীমতী ভক্তি ভট্টাচার্য্য গানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উপাধি পাইয়াছেন।

—কার কীর্ত্তি ?

—মুশোলিনীর।

বদ্‌লে গেল মতটা। মহিলা বল্লেন—এটা এমন কিছু নয়। আমাদের দেশের এতো অতি সাধারণ সেতুর মত। ওঃ! সেই টল্‌টক্ আবার কাজ শিখলে কোথা ?

আমার নাতিনীদ্বয় শমিতা ও লালী কিন্তু বিমল আনন্দ ভোগ করেছিল সে সেতুর উপর। পিছন হতে লালী চেঁচাচ্ছিল—নদীর মা। নদীর মা। শমিতা বল্‌ছিল—সমুদ্দুরের ওপর পোল। কি আশ্চর্য্য।

আমি লালীকে বহুবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে সমুদ্র নদীর শ্বশুর বাড়ি—ঝরণার ওপর তুষার-ক্ষেত্র নদীর জননী। কিন্তু তার মাতৃ-ভক্তি এতো প্রবল যে সে তার মার শেখানো আখ্যা দেয় সমুদ্র দেখলেই। তার বয়স মাত্র দু'বছর।

তার পর আরও রোমান্স। গাড়ি এসে পৌছিল এক দ্বীপে। গাড়ি আর যেতে পারে না—ওপারে ভেনিস। এ সুগঠিত সহরতলীতে গাড়ির ভিড়, লোকের ভিড়, ঘাটে গণ্ডোলা নৌকার ভিড়। হৈ হৈ কাণ্ড!

গাড়ি সেইখানে ছেড়ে যেতে হয়। এক ভীমদর্শন মার্কিনী ছাঁদে গড়া প্রকাণ্ড সৌধ—অঙ্গে কবিতার ছোঁয়াচ নাই, বর্ণে শিল্পের আমেজ নাই। অবশ্য পূর্ত্ত-বিজ্ঞান, অঙ্ক-শাস্ত্র প্রভৃতির মানস পুত্র এ অট্টালিকা। এর ইতালী ভাষায় নাম—অটো রেমিস্‌সা। বহু গাড়ি ইনি উদরসাৎ করেন। কিন্তু সংখ্যা ঠিক স্মরণ হ'চ্ছে না—এক এক তলায় অন্ততঃ পঁচিশখানি গাড়ি থাকে। ময়াল সাপের মত দুটি পথ-কুণ্ডলী এই দশতলাকে সংযুক্ত করেছে—একটি ওঠ্‌বার পথ, একটি নামবার পথ। দৈনিক ভাড়া বেশী নয়—তবে ঠিক কত সে কথা ভুলে গেছি, যেহেতু ওসব তুচ্ছ কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল পুত্রের উপর।

সেই ঘাটের চাতাল থেকে দেখা যায় অপরূপ দৃশ্য। প্রত্যেক সৌধে কিছু না কিছু শিল্পের নিদর্শন আছে—সেণ্ট বা পাপী, সুন্দরী বা রাক্ষসীর। বাড়িগুলা যেন জল থেকে ফুঁড়ে উঠেছে, স্বচ্ছ জলে তাদের প্রতিবিম্ব ক্রীড়াশীল—জলে চলছে গণ্ডোলা, বড় নৌকা, অটো-নৌকা ও জাহাজ।

এক সুন্দর বেশধারী—ফরসা সার্ট, রঙীন টাই—জিজ্ঞাসা করলে—সিনর হোটেল লুনা ? গুপ্টা ?

সে গণ্ডোলা-চালক, আমাদের জীর্ণ-বাস পাঁচু মাঝির ইতালীয় সংস্করণ। গুপ্টা পরিচয় গুপ্ত রাখতে পারলাম না। বসলাম গণ্ডোলায়। বহু দিনের সখ। বাসনা জমাট বেঁধে যে বিচিত্র চিত্র এঁকেছিল—সে ছবি দেখলাম। ভালো লাগল, স্ফূর্ত্তি হল। বাড়িগুলার ভিতর কত ভাঙ্গা মনোরথের জমাটি আবর্জনা আছে, কত প্রেম আছে, বিরহ আছে, খালের জলে কত নিরাশার ও বেদনার অশ্রু মিশে আছে, সে সব ভাবনাকে আত্ম-প্রকাশ করবার অবকাশ দিলাম না। নিজেরও দুর্দশার কথা থাক। সঙ্গে পুত্র, পুত্রবধূ দেবকন্যা নাতিনীরা, সামনে চঞ্চল জলের তরল স্রোত চতুর্দিকে শিল্পের নিদর্শন। আবার কি ?

পরে বুঝলাম গ্র্যাণ্ডক্যানেলটি ইংরাজি অক্ষর S এর মত বেঁকে বেড়ে আছে সহরটিকে। সেটি শতদ্বীপে অবস্থিত। ছোট ছোট ১৪৬টি খাল সেই দ্বীপপুঞ্জকে একতার যোগে বেঁধেছে। তারা রাজপথ। অটো বাসের বদলে চলে অটো বোট। রিক্স বা গাড়ির বদলে চলে গণ্ডোলা। গো-শকট বা মোটর লরীর বদলে বড় নৌকায় মাল চলাচল করে।

হোটেল লুনা ঠিক্ প্রসিদ্ধ গির্জ্জা সেণ্ট মার্কের অঙ্গনের বাহিরে। তাড়াতাড়ি মালপত্র রেখে সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোধুলিতে আমরা দেখলাম সেণ্ট মার্কের অপূর্ব্ব মনোহর রূপ। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের মতো সেণ্ট মার্কের ঘাট যাত্রীপূর্ণ। তবে—যাক্ আত্ম-নিন্দা আত্ম-ঘাত।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধকল্যাণ—তেতালা

বাঙ্গালা খ্যাল

তব গলে পর আজি গেঁথেছি গানের মালা,
ও গলে মালা দুলিলে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা।
তোমার রূপ হেরে হরষে ভাসিছে হিয়া,
শুধু ফুল চাও যদি দিব তানের ডালা॥

গীত-সম্রাট শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। স্বরলিপি—গীত-সরস্বতী* শ্রীমতী ভক্তি ভট্টাচার্য্য

{ সা সা সন্ সধ্ | সা ন্ রা সা | সন্ রা গা পা | রা গা রা সা } |
তব গ ০ লে ০ প র আ জি গেঁ থে ছি গা নে র মা লা

০ ১ ২´ ৩
পা গা গা পা | হ্মা ধা পা পা | রা গা পা রা | গা গা রা সা ||
ও গ লে মা লা দু লি লে জু ড়া বে প্রা ণে র জ্বা লা

০ ১ ২´
{ পা গা গা গা | পা হ্মা ধা পা | হ্মা ধা না র্রা | না ধা পহ্মা গা }
তো ০ মা র রূ প হে রে হ র ষে ভা সি ছে হি ০ য়া

০ ১ ২´
র্গা র্গা র্রা র্সা | র্রর্সা নর্সা ধা পা | হ্মা ধা না -া | ধপা হ্মপা পা গা |
শু ধু ফু ল চা০ ০ও য দি দি ব তা ০ নে০ ০ ০ র

তান

২´ ৩
১। নরা গপা ধনা র্সর্রা | র্সনা ধপা হ্মগা রসা |

২। র্রর্রা র্সনা ধপা হ্মপা | ননা ধপা হ্মগা রপা |

০ ১
৩। নরা গরা হ্মগা গহ্মা | ধপা নধা র্সনা র্রর্সা |

২´ ৩
র্গর্রা র্সনা ধপা হ্মপা | ধপা রগা রসা নসা |

* এ বৎসর "রামশরণ কলেজে" শ্রীমতী ভক্তি ভট্টাচার্য্য গানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উপাধি পাইয়াছেন।

অন্তরার চাল

৪। গা পঙ্কা ধপা র্সা | -া -া -া -া | নর্রা র্গা র্রা র্সা | নর্রা র্সনা ধপা জ্ঞগা |
আ ০ ০ . ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বাঁট

৫। ননা নপা স্কধা পজ্ঞা | গঙ্কা পরা গগা রসা |
তব গলে পর আজি গেথে ছি গা নের মালা

ধ্না রগা স্কধা নর্রা | নধা পঙ্কা রগা রসা
ও গ লে মা লা ছ লিলে জুড়া বে প্রা ণের জ্বালা

বেহালা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কণ্ড প্রোকেসে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম—হঠাৎ একটা কিউরিয়ো-দোকানের সামনে দাঁড়ালুম। ঢুকলুম দোকানের মধ্যে। নানা টুকি-টাকির মধ্যে দেখলুম একখানি বেহালা ···ভালো জাতের বেহালা। দোকানের মালিক মাদাম মাশোরা। মাদামকে বললুম—তোমরা বাজনাও রাখো ···বাঃ! এ-বেহালা বিক্রীর জন্য রেখেছো···না, বাজাও?···

মাদামের কিশোরী মেয়ে···মাদামকে সাহায্য করে দোকান-চালাবার কাজে।···মেয়ে একটু দূরে ছিল দাঁড়িয়ে ···একটা পাথরের মূর্ত্তির গায়ের ধূলো ঝাড়ছিল।

আমার কথায় মাদাম বললে—বিক্রী করবো। বেহালা বাজাবো, তার অবসর কোথায়?

জিজ্ঞাসা করলুম—এ বেহালার দাম?

মাদাম বললে—আমি কিনেছি চারশো ফ্রাঁ-দামে।

চমকে উঠলুম! বললুম—পাগল! এ বেহালা বারো ফ্রাঁ-দামে বাজারে বহুৎ মেলে।

আমার কথায় মাদামের দুচোখ হলো সজল। মনে হলো, কুমীরের চোখে জল—গল্পে শুনেছি···তাই বোধ হয়! শিকার ধরবার ফাঁদ!

একটা নিশ্বাস ফেলে মাদাম বললে—এ বেহালার ইতিহাস আছে, মশায়।

—কি ইতিহাস, শুনতে পাই?

আস্তিনের খুঁটে চোখের জল মুছে মাদাম বললে—সে কথা মনে হলে আজো আমার বুকখানা কাঁটার ঘায়ে টনটনিয়ে ওঠে যেন! শীতকাল। সকাল হয়েছে···আমার দুটি মেয়ে—জুডিথা আর বেরেকা। ব্রেক-ফাষ্ট সেরে স্কুলে গেছে···আমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছি···ঝাড়-পুঁছ করছি। এ'-সব ঝাড়পুঁছের কাজ আমি কাকেও করতে দিই না··· অসাবধানে কোন্‌টা ভাঙবে—কোনটার কি খশে পড়বে! হঠাৎ একটি মেয়ে এলো দোকানে···ভিখিরীদের মেয়ে··· কিন্তু কি রূপ! আহা! তার হাতে একখানা বেহালা···ঐ বেহালা বাজিয়ে বললে ভিক্ষা করে! আমার কাছে হাত পাতলো। আমি কিন্তু ভিখিরীকে কক্‌খনো ভিক্ষে দিই না। কুড়েমির প্রশ্রয়! হাত রয়েছে, পা রয়েছে···খেটে

খা—ভিক্ষে কি! আমি বললুম—না, ভিক্ষা পাবে না এখানে! মেয়েটি আমার কথা শুনে কেঁদে ফেললো।

মেয়েটি বললে—বাড়ীতে আমার রোগা মা...তার জন্য কিছু যা হোক কিনতে হবে। আমি বেহালা বাজিয়ে বাসে বাসে ভিক্ষে করি...দশটা বাজলে বাসে লোকজনের ভিড় হয়। বেহালা শুনে কেউ দেয়—কেউ দেয় না। এখন এত সকালে ভিক্ষে মিলবে না—তাই এখানে এসেছি।

আমি বললুম—না, ভিক্ষে পাবে না। তখন মেয়েটি বললে—বেশ, ভিক্ষে না দাও...আমার এই বেহালাটি রেখে আমাকে কুড়িটা স্যু ধার দাও...দুপুরবেলা আমি এসে এ ধার শোধ করে দিয়ে আমার বেহালা নিয়ে যাবো।...এ বেহালা হলো আমার ঠাকুর্দ্দার...সখের জিনিষ...দুনিয়ার রাজ্য পেলেও এ বেহালা আমি হাতছাড়া করবো না। তা আমাকে যত দুঃখ পেতে হয়, সহ্য করবো, তবু এ বেহালা খোয়াতে পারবো না। কি আমার মনে হলো... বেহালাটা রেখে দিলুম মেয়েটাকে কুড়ি স্যু ধার!

বাধা দিয়ে আমি বললুম—কিন্তু মাদাম, তুমি যে বললে, এর জন্য তোমাকে দিতে হয়েছে চারশো ফ্রাঁ!

মাদাম বিরক্ত হলো। বললে—আঃ, শুনুন সব!... তার পর বেলা এগারোটার সময় এক বড় খদ্দের এলো দোকানে এটা-ওটা দেখে তিনি কিনলেন। তার পর তাঁর নজর পড়লো ঐ বেহালাটায়...মস্ত মাতব্বর লোক... বেহালা দেখে তিনি বললেন—আরে, বাহবা—এ যে ভারী বোনেদী বেহালা দেখছি। খাঁটী ট্রাডিভেরিয়স বেহালা। শুনে আমি অবাক! তিনি বললেন—এটা বেচবে? আমি পাঁচশো ফ্রাঁ দেবো দাম।

দাম শুনে আমার বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো! বটে! ভিখিরী মেয়ের বেহালা...তার এত দাম! আমি বললুম— কিন্তু এ আমার জিনিষ নয়, মশাই...একজন বড় বাজিয়ে এ বেহালা আমার কাছে রেখে গেছে...বলে গেছে— তার ঠাকুর্দ্দা এ বেহালা বাজাতো। এই বেহালা বাঁধা রেখে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা সে ধার নিয়ে গেছে। আপনি কিনতে চান—বেশ, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

আমার কথায় ভদ্রলোকের কী আকুতি! আমাকে বললেন—এটি আমাকে কিনিয়ে দাও...পাঁচশো ফ্রাঁ দাম আমি দেবো। আর তা যদি পারো...তোমাকে সেজন্য আলাদা কমিশন দেবো আমি নগদ দুশো ফ্রাঁ।...তাহলে আমার পড়বে সবশুদ্ধ পয়ত্রিশ শ...তাতে কি! এ বেহালা বেচে আমি বহুৎ টাকা লাভ করতে পারবো। আমি বললুম—বেশ, তাহলে আপনি বিকেলে আজ আমার দোকানে আসবেন। আমি ব্যবস্থা করে রাখবো।

ভদ্রলোক বিকেলে আসবেন বলে চলে গেলেন।... তার পর বেলা বারোটার সময় সেই ভিখিরী মেয়েটা এসে হাজির...কুড়িটি স্যু এনেছে...এসে আমাকে বললে—এই নিন আপনার স্যু...আমার বেহালা আমাকে দিন।

আমার মাথায় তখন লাভের অঙ্ক উঠছে ফেঁপে...ফুলে! ভাবলুম, পাঁচশো ফ্রাঁ দাম আর দুশো আলাদা কমিশান... মেয়েটাকে কেন অত টাকা দি? নিজেই কিনে নিয়ে রাখবো। মেয়েটাকে বললুম—শোনো, তোমার এ বেহালা এক ভদ্রলোক কিনতে চেয়েছেন...নগদ তিনশো ফ্রাঁ দাম দেবে।

বাধা দিয়ে মাদামকে বললুম—ভুল করছো মাদাম...তুমি বললে, সে ভদ্রলোক পাঁচশো ফ্রাঁ দামে কিনতে চেয়েছিলেন!

—উঁহুঁ—ভুল নয়। শুনুন না। মেয়েটাকে সে কথা বলবো কেন? আমার লাভ দেখবো যে! সে ভদ্রলোক দেবে পাঁচশো ফ্রাঁ...তা থেকে মেয়েটাকে দেবো তিনশো... আর বাকী দুশো, এবং আমার কমিশন দুশো—আমি পাবো! ফাঁকতালে আমার হবে চারশো ফ্রাঁ লাভ! তাই মেয়েটাকে...

আমি বললুম—বুঝেছি। তার পর?

মাদাম বললে—মেয়েটি রাজী হয় না। আমি অনেক বোঝাই, লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলো না...ব্যাচো। ভিক্ষে করতে হবে না—রোগা মাতার চিকিৎসা হবে—পথ্য হবে—এমন খদ্দের ছাড়তে নেই। মেয়েটা রাজী হলো শেষে চারশো ফ্রাঁ নিয়ে বেহালা ছাড়তে... দিলুম তখুনি তার হাতে চারশো ফ্রাঁ গুণে। দাম নিয়ে মেয়েটা চলে গেল। আমি ভাবলুম...কতক্ষণ বিকেলে খদ্দের এসে আমাকে দেবে সাতশো...পাঁচশো ফ্রাঁ বেহালার দরুণ আর দুশো আমার কমিশন! বেহালাটিকে ঝেড়ে-ঝুড়ে যত্ন করে তুলে রাখলুম।

আমি বললুম—তার পর?

মাদামের দুচোখে জল। মাদাম বললে—বলেন কি! ফক্কিকারী...ভদ্রলোক আর এলো না...চোর...জোচ্চোর... ফন্দীবাজ...মেয়েটাকে ভিখিরী সাজিয়ে বেহালা দিয়ে পাঠানো...তার পর নিজেই এসে আর কি ধাপ্পা দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে চারশো ফ্রাঁ নিলে ঠকিয়ে। কাকেও এ কথা বলবার নয় মশাই...আপনি কথা পাড়লেন, তাই আপনাকে বললুম। উচিত সাজা হয়েছে আমার...যেমন লোভ করেছিলুম...তেমনি হাতে হাতে তার ফল।

ভক্তাবতার

শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য

একদিন বসন্তের অপরাহ্নকালে উড়িষ্যাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্র অন্তঃপুরে পালঙ্কে বিশ্রামে আছেন। তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত মনে হইতেছে। কিঙ্করীগণ চামর দুলাইতেছে, কেহ বা বীণা বাজাইতেছে। মহারাজের তখনো রাজবেশ—মস্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেওয়া গেরুয়া পরিধেয় বস্ত্রের সাধারণ পাগড়ী।

কী যেন ভাবিয়া মহারাজা উঠিলেন। সোপানশ্রেণী বাহিয়া প্রাসাদের ছাদে আলিসার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, একজন কিঙ্করীও পশ্চাতে আসিয়াছে। তপন দূরে সমুদ্রে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল এবং তীরে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাস্ত যোগে নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। মহারাজ কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইতে, চক্ষে অশ্রু আসিল। তিনি একমাত্র পাগড়ী ভিন্ন, রাজবেশ খুলিয়া দাসীর হাতে দিয়া নীচে নামিলেন। অলিন্দ, সোপানশ্রেণী, প্রাঙ্গণ ইত্যাদি পার হইয়া মহারাজ কোথায় যেন চলিলেন। সহচরী কিঙ্করীর ইঙ্গিতে দুইজন ভীমকায় সশস্ত্র প্রহরী পিছনে চলিল। তিনি প্রধান তোরণ অতিক্রম করিয়া উদ্যান-বাটিকায় ঢুকিলেন। পশ্চাতে, প্রহরীদের লক্ষ্য করিয়া ইসারায় চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন এবং জলযন্ত্রের নিকটে একটী স্ফটিকস্তম্ভের গায়ে হেলিয়া বসিলেন। দূর হইতে কীর্ত্তনের সুর তখনো ভাসিয়া আসিতেছে।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র ভাবে ভক্তিতে তন্ময়। রামানন্দ রায় আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—'মহারাজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন! মহাপ্রভু বলেন, আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ—যুবরাজের সহিত মিলনেই আপনার প্রার্থনা সিদ্ধ হবে। অতএব মহারাজের আদেশ হলে, আমি যুবরাজকে সঙ্গে করে মহাপ্রভুর সকাশে চলি।'

প্রতাপরুদ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া আবেগের সহিত রামানন্দের একখানা হাত ধরিয়া বুকের উপর লইলেন। নয়নে তাঁহার অশ্রু। রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—'রায়, আর ভৃত্য নও তুমি—আমারো উচ্চে! আমায় তোমার বন্ধু কোরে নাও—তোমার অভিরুচি অনুসারে আমায় পরিচালনা কর?'

পরদিন প্রভাতে, শ্যামবর্ণ ও কিশোর বয়স্ক যুবরাজকে রামানন্দ নিজ হাতে সাজাইলেন—পায়ে নূপুর, পীতবসন, গলে ফুলমালা ও চূড়ায় শিখীপুচ্ছ, ঠিক শ্রীকৃষ্ণের গোপবেশ। যুবরাজকে লইয়া মহাপ্রভু-সমীপে চলিলেন।

কাশীমিশ্রের উদ্যানবাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদ (স্বরূপ, শ্রীবাস, গদাধর, জগদানন্দ, হরিদাস, গোবিন্দ ও সার্বভৌম) বসিয়া ছিলেন। নেপথ্য হইতে নূপুরধ্বনি শুনিয়া তাঁহার ভাবোদ্রেক হইল। রামানন্দের গলার কীর্ত্তনও শুনা গেল। রামানন্দ যুবরাজকে অগ্রে করিয়া গাহিতে গাহিতে আসিলেন।

"পহিল হি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভাব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জনি॥
না খোঁজলুঁ দূতী না খোঁজলুঁ আন।
দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগে তুহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধনরুদ্রগজাধিপমান।
রামানন্দ রায় কবি ভান॥"

মহাপ্রভু মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভাবাবেগে ডাকিয়া উঠিলেন—'রায়, রায়, রায়, হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে!—'

রামানন্দ করযোড়ে বলিলেন—'মহাপ্রভু, আপনার সম্মুখে একবার দৃষ্টিপাত ভিক্ষা করি!'

মহাপ্রভু সম্মুখে তাকাইলেন এবং 'চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রে আমার' বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া যুবরাজকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎক্ষণাৎ যুবরাজও স্পর্শাবেশে ঢলিয়া পড়িলেন। রামানন্দ উভয়কে ধরিয়া ফেলিলেন এবং সহাস্তে বলিলেন—'ইনি যুবরাজ।'

মহাপ্রভু মুহূর্ত্তে সংযতচিত্ত হইয়া যুবরাজের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—'মতি রস্তু শ্রীকৃষ্ণে! আজ হতে তুমি আমার অন্যতম ভক্ত।'

ওদিকে মহারাজ গজপতি রাজসভায় বসিয়াছেন—উদ্বিগ্নচিত্ত। দূত আসিয়া জানাইতেছে—মহারাজ, পাঠানসৈন্য রেমুণা হইতে চারিযোজন দূরে শিবির গাড়িয়াছে।

প্রতাপরুদ্র অবজ্ঞাভরে বলিলেন—'রেমুণার সীমান্তে আমাদের বাহিনীও প্রস্তুত।'

পট্টনায়ক বা প্রধান সেনাপতি গোপীনাথ রায় বলিলেন—'কিন্তু মুসলমান সৈন্য দুর্দ্ধর্ষ! গৌড়ের নবাব হুসেনশাহ্ নাকি মুলতান ও কান্দাহার হতে বাছাবাছা বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছে।'

প্রতাপরুদ্র বলিলেন—'মুসলমান যোদ্ধাগণ ধর্মের আনুগত্যে প্রাণ দিতে পারলে, আমাদের বীরগণও স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ রক্ষায় প্রাণ উৎসর্গ করতে পারবে না কেন?'

মহাপাত্র হরিচন্দন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—'বিশেষ গুপ্তচরমুখে

সংবাদ, বঙ্গে ও গৌড়ে আমাদের নিযুক্ত বহু গুপ্তচরকে নবাব উৎকোচে বশীভূত করেছেন।'

প্রতাপরুদ্র বিরক্তভাবে বলিলেন—'ধর্ম আমার একার নয়—উড়িষ্যা আমার একার নয়। আপনারা আপন আপন কর্ত্তব্যবোধে কর্ম করে চলুন?'

মহাপাত্র বলিলেন—'মহারাজকে আজ এত উদাসীন দেখা যায় কেন!'

প্রতাপরুদ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'হরিচন্দন, তুমি আমার শুধু মহাপাত্র নও—বাল্যবন্ধুও। আমার অন্তর অনুমান কর!'

সহসা শ্রীকৃষ্ণবেণী যুবরাজ ছুটিয়া আসিয়া মহারাজের কোলে পড়িলেন। তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়াই আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিঙ্করীগণ মহারাজের শুশ্রূষার জন্য অগ্রসর হইল। এই অবসরে গোপীনাথ, মহাপাত্রকে কী যেন ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

পট্টনায়ক ও মহাপাত্র একটু অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোপীনাথ বলিলেন—'মহারাজের এ কাপুরুষতা সহ্য করা যায় না!'

হরিচন্দন হাসিয়া বলিলেন—'ধর্ম্মের জন্য পৌরুষহীনতাও ভাল।'

গোপীনাথ বলিলেন—'যে সময় মুসলমানদের ভীষণ গ্রাস থেকে উড়িষ্যাকে রক্ষা করতে রাশি রাশি অর্থ ও জনবল উৎসর্গ করা প্রয়োজন, সে সময়ে এই ঔদাসীন্য শোভা পায় কি মহাপাত্র মহাশয়? মহারাজ স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতির যূপকাষ্ঠে কোটি কোটি প্রজার ধন-প্রাণ বলি দিতে পারেন না।'

হরিচন্দন আবার হাসিয়া বলিলেন—'যিনি সকল বিশ্বসংসারের সার, তিনিই যে এখন শ্রীপুরুষোত্তমধামে।—'

গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করেন—'তিনিই যে বিশ্বের সার, তার প্রমাণ?'

মহাপাত্র হরিচন্দন সহজভাবে উত্তর দেন—'তার প্রমাণ, রাজপণ্ডিত সার্বভৌম ও সামন্তরাজ রামানন্দ রায়।'

একদিন রামানন্দের স্ত্রী শুদ্ধাচারে যখন গৃহদেবতামন্দিরে পূজার আয়োজন করিতেছেন, রামানন্দ মন্দিরের অলিন্দসোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

স্ত্রী, স্বামীকে না চেনার ভাণ করিয়া ডাকিলেন—'কে, কে ওখানে?'

রামানন্দ সকৌতুকে উত্তর দেন—'আমি গো আমি।'

'কে তুমি, চিনছি না তো!' বলিতে বলিতে তাঁহার স্ত্রী উঠিয়া আসিয়া মন্দির দ্বারে দাঁড়াইলেন এবং বহুক্ষণ চিনিতে চেষ্টার অভিনয় করিয়া হাসিয়া বলিলেন—'ও, তুমি!......তা কেমন কোরে চিনবো? বিদ্যানগরে থাকতে, তুমি ছিলে রাজা—আমি রাজরাণী। কত অলঙ্কার—সাজ সজ্জা, কত দাসী। আমি তো আজো প্রায় তেমনি আছি, আর তুমি ভেক্ নিয়ে তিলক্ ফোঁটা কেটে বৈরেগীঠাকুর হয়েছো—চিনবো কেমন কোরে!'

রামানন্দ হাসি চাপিয়া বলিলেন—'কিন্তু ভিক্ষা নেব, ভিক্ষা দাও!'

রামানন্দের স্ত্রী অনুসন্ধানের ছল করিয়া কহিলেন—'বৈরেগীঠাকুরের ঝুলি কই? ভিক্ষে দেবো কোথায়?'

রামানন্দ অঞ্জলিবদ্ধ বাহু প্রসারিত করিয়া বলিলেন—'এই হাতে, এই হাতে তোমার সকল বিলাস-বিভূষণ ভিক্ষা দাও! বিবাহের সময় যে হৃদয় তোমায় দান করেছিলাম, বিদ্যানগরের কর্মচঞ্চল জীবনের বিলাসোৎসবে যে প্রেমের বহু জয়ন্তী সাধা হয়েছে, আজ দ্বিগুণ কোরে তোমার হৃদয়-ভরা প্রেম নিয়ে আমায় ভিক্ষা দাও? আর সে সবের পরিবর্ত্তে আমি তোমায় প্রভুর চরণধূলি দান করছি।' বলিতে বলিতে গ্রন্থি খুলিয়া স্বীয় মস্তকে প্রভুপদরজঃ দান করিলেন।

তন্মুহূর্ত্তে, স্ত্রী শিহরিত হইয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িতে পড়িতে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন—'কী জ্যোতি, চারিদিকে আলোর ঢেউ উঠলো! ওগো, আমার সব নাও! এত আনন্দ,—কোথায় এমন আনন্দ পাবো, সেই পথে আমায় নিয়ে চল?

সেদিন সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্তা বৃদ্ধ ভবানন্দ রায় একটী থলি হাতে কাছারী হইতে আসিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, ডাকিলেন—'বৌমা, বৌমা এস তো মা!'

রামানন্দের স্ত্রী তুলসীবেদীমূলে বসিয়া মালাজপ করিতেছিলেন। মালা হাতে উঠিয়া আসিলেন।

ভবানন্দ বলিলেন—'টাকার থলিটা সিন্দুকে রাখ তো মা? দশশত কাঞ্চন তঙ্কা আছে।'

রামানন্দের স্ত্রী বলিলেন—'তঙ্কা আমি ছোঁব না, বাবা। আপনি রাখুন।'

ভবানন্দ সবিস্ময়ে বলিলেন—'তঙ্কা কে না ছুঁতে চায় মা! তুমিও কি রামার মতো বিরাগী হলে? রামা অমন কোরে কর্ণাটের রাজত্বটা ছেড়ে দিলে।—মাসে লক্ষ তঙ্কা আয় হত। এই বৃদ্ধ বয়স অবধি আমি যা তঙ্কা ডাকছি, আর, এই কচি বয়সে তোমাকে সংসার বিরাগী সাজালে রামা! স্ত্রীলোক বাড়ীর লক্ষ্মী, লোকে তাকেই সোনা মাণিক দিয়ে সাজিয়ে থাকে।

রামানন্দের স্ত্রী বলিলেন—'সোনা মাণিক তো স্ত্রীলোকের স্বামী নয়, বাবা। আমাদের স্বামী, পুরুষ। আর পুরুষদের স্বামী, ধন সম্পত্তি বা সোনা মাণিক।' এই সময় বাণীনাথ আসিয়া দাঁড়াইলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'ঠাকুরপো'কে দিন বাবা।'

ভবানন্দ, পুত্র বাণীনাথের হাতে থলিটী দিয়া প্রস্থান করিলে, বাণীনাথ বলিল—'বৌদি, আসুন? আমরা দু'জনে ভাগ কোরে নেই।' সে হাসিল।

রামানন্দের স্ত্রীও হাসিলেন, বলিলেন—'আমার ওতে কাজ নেই। তোমাদের দুটী ঠাকুরপোর দুটী সুন্দরী বৌ যখন আনবো, ভাগ কোরে দিও'খন?'

বাণীনাথ সকৌতুকে প্রশ্ন করিল—'আর, তখন আপনি কী নিয়ে থাকবেন বৌদি?'

রামানন্দের স্ত্রী উত্তর দেন—'আমার অভাব! তখন আমি তোমাদের ঝগড়া মেটানো নিয়ে থাকবো।'

প্রত্যূষে রায়বাড়ীর উদ্যানে উষা ও রমা ফুল তুলিতেছে। বড় বোন উষা একটা ছোট গাছে চড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে আঁচল ভরিয়া ফুল তোলে। রমা নীচে মাটিতে থাকিয়া সাজিতে ফুল তুলিতেছে, মাঝে মাঝে অনুরোধ করিতেছে—'চুপ কর্ না দিদি? ওরা কেউ আসবে' খুনি!

এই সময় বাণীনাথ ঝোপের মধ্য হইতে লাফাইয়া বাহির হইয়া আসিয়া রমার হাত দুটী চাপিয়া ধরিল—'তবে রে, তোমরাই চোর !'

রমা 'দিদি, দিদি' করিয়া নাকে কাঁদিয়া উঠিল—উমা শাখার ফাঁক হইতে উঁকি দিয়া শাসাইল—'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি? নির্জ্জনে মেয়েমানুষের হাত ধরতে লজ্জা করে না ? ছাড়। এখনি মৌচাক ভেঙে গায় ছুঁড়ে মারব।'

অপ্রতিভ বাণীনাথ হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'তাই ত বলি, রোজ রোজ ফুল চুরি যায় কেন !'

উমা গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—'ফুল থাকলেই লোকে নেয়। তুমি মালি নাকি, যে ধরতে এসেছো ?'

বাণীনাথ রোষ ভরে দাঁড়াইল—'আমায় মালি বল ?'—

'মালি বলে নি। আমি শুনেছি, ও মালিক বলেছে,—না কি উমা !' বলিতে বলিতে হাস্যবদন পট্টনায়ক গোপীনাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন—পরিধানে নাগরিক বেশ।

গোপীনাথ ও উমার মধ্যে চোখে চোখে কী যেন হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বাণীনাথ কৈশোর সুলভ চাপল্যে বলিল—'বুঝেছি ! তোমার বৌ হবে কিনা, তাই ত ওর দিক হয়ে বল্লে।'

গোপীনাথ প্রত্যুত্তর দিলেন—'আর, রমা তোর বউ হবে না বুঝি !'

গোপীনাথ ও উমা উদ্যানের নিভৃত স্থানে, মনোরম কুঞ্জবেদিতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন গোপীনাথ প্রথমে কথা কহিলেন—'পুরুষ কী চায়, জানো উমা ? সুন্দরী, কিশোরী, বিদ্যাবতী একটী স্ত্রী। মুখ তার সর্ব্বক্ষণ হাসিতে ভরা থাকবে, কণ্ঠস্বরটী হবে কোকিলের মতো মধুর—পৃথিবী তার চলার পথে কোমল হয়ে উঠবে।......মেয়ে, তার দেবতা মহাদেবের পূজা কোরে প্রার্থনা জানায়—ভাবী স্বামীটি তার স্বাস্থ্যবান, রূপবান হবে। বিদ্যা-বুদ্ধি তার থাকবে প্রচুর।' একটু থামিয়া বলিলেন—'কিন্তু যৌতুকের হিসাব যেখানে গৌন হওয়া উচিত, কার্য্যক্ষেত্রে সেইটেই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে !'

উমা সাশ্চর্য্যে বলিল—'কথাটে কী, বুঝলুম না !'

'পরে আপনা হতেই বুঝবে' বলিয়া গোপীনাথ কুঞ্জের অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

বিস্মিতা উমা স্থির হইয়া থাকিল—চক্ষু তাহার ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইল। এক অঞ্জলি পুষ্প লইয়া ললাটে স্পর্শ করিয়া অর্ঘ দিল—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, জগন্নাথ !'

ভবানন্দ রায়ের কাছারীতে উমা-রমার বৃদ্ধ পিতা কন্যাদায় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। আলোচনা চলিবার কালে ভবানন্দ রায় বলিলেন—'পনের টাকা যদি সংগ্রহ করতে না পারেন, আমারই নিকট সম্পত্তি বন্ধক রেখে কর্জ্জ নেবেন। জগন্নাথ জীর দিব্য—আপনাকে আমি নিরাশ করতে পারব না।'

* * * *

রথযাত্রা আসিল। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। রথ চলিতেছে এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু রথের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া চলিতেছেন। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতেছেন, কখনও মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে পার্ষদভক্তগণ—স্বরূপ, শ্রীবাস, গদাধর, জগদানন্দ, হরিদাস ও রামানন্দ প্রভৃতি হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন। স্বরূপ এক ধুয়া ধরিয়াছেন—'সেই ত পরাণনাথ পাইনু। যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র, মহাপাত্র হরিচন্দনসহ একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। নাচিতে নাচিতে শ্রীবাস, মহাপাত্র মহাশয়কে কয়েকবার ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন, তথাপি তিনি কিছু সম্মুখে আসিয়া পড়িলে, শ্রীবাস তাঁহার পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া সরাইয়া দিলেন। মহাপাত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'ঠাকুরের কী স্পর্দ্ধা দেখলেন, মহারাজ ! এত প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত হয় না।'

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—'ভক্তের করাঘাত পেয়েছ তুমি, ভাগ্য তোমার অনুকূল হরিচন্দন। ভক্তের চরণাঘাত পেলে, আমি যে ধন্য হই।'

উমা রমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে এই বলিতে বলিতে—'সাগরে ডুবে মরব দু'বোনে, তবু আমাদের বাবাকে রায়বাড়ির নিকট অপমানিত হতে দেবো না।'

রমা বলিল—'আগামী জন্মে নারী হয়ে জন্মাবো না।'

উমা বলিল—'নারী হতে দোষ নেই। তবে, ভালোবাসা কারও নেবো না—দেবোও না কারুকে'। রমা বাণীনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাণীনাথ বলিল—'তুমি আমার কাছে এসো না, রমা ? এখনি বৌদি দেখলে, ঠাট্টা করবেন !'

রমা দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—'আসতে আমারো লজ্জা করছে। কিন্তু দিদি একটা কথা তোমাকে বলতে বলেছে। আর কখনো যদি কোন মেয়েকে ভালোবাসো, তার বাপের টাকার খবর নিয়ে যেন ভালোবেসো ?'

রমা প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, বাণীনাথ বাধা দিল—'কথাটার মানে না বুঝিয়ে চলে যাচ্ছ যে ?'

রমা ফিরিয়া বলিল—'এই কথা বলতেই এসেছি, বলেই জন্মের মত বিদায় হচ্ছি। ঐ কথাই চিরদিন তোমার মনে যেন আঘাত করে।'

বাণীনাথ আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—'আমি নির্দ্দোষ রমা। আমায় কোন অভিশাপ দিও না !' ওদিকে উমা, সামরিক বেশধারী গোপীনাথের নিকট গিয়া বলিল,—'বাগানে, তোমার সেদিনকার হেঁয়ালির অর্থ বুঝেছি এবার। অবলা সরলা মেয়েমানুষকে সজ্ঞানে প্রবঞ্চনা কোরে খুব আত্মপ্রসাদ পাও—না ?'

গোপীনাথ অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন—'উমা, তুমি বোধ হয় শুনে থাকবে,—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ?—নারীজাতিও বীরভোগ্যা। দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য যে লোক যুদ্ধে প্রাণ দিতে যাচ্ছে, তার তুষ্টির বা মনের পুষ্টির জন্য, কয়েকটী মাত্র নারী প্রবঞ্চিতাই বা হলো—ক্ষতি কি ?'

উমা সংযতভাবে বলিল—'যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে বীরের যে ক্ষত, তা কোন দিন সারলেও, দাগ বর্ত্তমান থাকে। নারী মাধুর্য্যে এই অতি হেয় বস্তুটা যদি কোনদিন, কোন মুহূর্ত্তের তরে তোমার মনের কোণে চিহ্ন কেটে থাকে

তোমার সদস্ত পৌরুষে সে ক্ষত আচ্ছন্ন করলেও, দাগ যেন তোমায় আতঙ্কিত-করে !'

গোপীনাথ 'ফুঃ' দিয়া তাচ্ছিল্যভরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

সন্ধ্যায় সমুদ্রতটে বসিয়া রামানন্দ ভজন গাহিতেছিলেন। সম্মুখ দিয়া দুইটী স্ত্রী মূর্ত্তিকে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দ্রুত যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন—'মেয়ে-লোকরা, নির্জনে আঁধারে কোথায় যাও গো ?'

উভকণ্ঠ হইতে উত্তর আসিল—সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে।

'ষাট্, ঝাঁপ দেবে কেন ! দাঁড়াও গো দাঁড়াও ? তোমরা যে আমার মেয়ে হও।' বলিতে বলিতে রামানন্দ তাহাদের প্রতি চলিলেন।

উমার হাত টানিয়া রমা বাধা দিল—'দিদি, মিষ্টি কোরে কে ঐ ডাকছে, শোন্ ?'

রামানন্দ আসিয়া তাহাদের চিনিলেন। রমা কাঁদিয়া বলিল—'আপনি আমাদের বাধা দিলেন, মরব না।'

উমা বাধা দিয়া বলিল—'কিন্তু আমরা আর থাকতে চাইনে ও নিষ্ঠুর সমাজে।'

রামানন্দ রায় স্নেহমাখা কণ্ঠে আবেদন জানাইলেন—'তবু যে বাড়ী ফিরে যেতে হবে মা ! স্বয়ং ভগবান যিনি, তিনি এসেছেন নীলাচলে। আশ্রয়ের অভাব ? কমললোচনের দৃষ্টি দিয়েই তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।'

গভীর রজনী। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিদ্রা যাইতেছেন, পদতলে সেবক গোবিন্দ শুইয়া আছে। গৃহদ্বারে উন্মুক্ত। বাহিরে পুষ্পিত প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্নালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং কোকিল পাপিয়ার তানের সহিত দেবদাসীদের সঙ্গীত শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে ভাসিয়া আসিতেছে—

'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
নকুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥'

(গীতগোবিন্দ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিদ্রা ছুটিল, তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভাবাবেশে ছুটিয়া চলিলেন। পথে কত কাঁটাঝোপে, কত খালে, কত ইট পাথরে আছড়িয়া পড়িলেন, অঙ্গে ক্ষত হইল—ভ্রূক্ষেপ নাই।

গোবিন্দ জাগিয়া উঠিয়া, মহাপ্রভুকে না দেখিয়া খুঁজিতে বাহির হইল। তখনও দেবদাসীদের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী॥'

(গীতগোবিন্দ)

গোবিন্দ দূর হইতে লক্ষ্য করিল, মহাপ্রভু মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। সে ছুটিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর পদযুগল জড়াইয়া পড়িল। বলিল—'ও দেবদাসীরা গাইছে, প্রভু !'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল—স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'বড় উপযুক্তকালে বাধা দিলে, গোবিন্দ। নারীদর্শন ঘটলে, আমার প্রাণান্ত হত।'

উমা ও রমা শ্রীজগন্নাথমন্দিরে দেবদাসীদের দলভুক্তা হইয়াছে। প্রতি সন্ধ্যায় রামানন্দ স্বয়ং, নির্জ্জন উদ্যানে তাহাদের অঙ্গ সজ্জাদি করিয়া নৃত্যগীত শিক্ষা দেন, এবং তাহারা প্রতি নিশীথে শ্রীমন্দিরে পৃথকভাবে নৃত্যগীত করিয়া থাকে। এমনি একদিন সন্ধ্যায়, রামানন্দ রায় উমা ও রমার অঙ্গ সজ্জাদি সমাপন করিয়া নৃত্যগীত শিখাইতেছেন ও তাহারা অনুকরণ করিতেছে। রামানন্দ নৃত্যচ্ছন্দে স্বরচিত পদ গাহেন।

'মঞ্জুতর গুঞ্জরলি কুঞ্জরতি ভীষণম্।
মন্দমক দক্ষরণ গন্ধকৃত দূষণম্॥'

রমা বাধা দিয়া বলিল—'লোচনদাসকৃত সেই ভাবানুবাদটাও আগে শেখান !'

মহারাজ গজপতির নিকট হইতে পত্র লইয়া দূত আসিল—গোপীনাথের অদ্যই যুদ্ধক্ষেত্রে রেমুণায় যাইতে হইবে। আজ্ঞানুসারে গোপীনাথ যুদ্ধসজ্জা করিলেন। রামানন্দের স্ত্রী আসিয়া তাঁহার ললাটে রক্তচন্দনের তিলক আঁকিয়া দিলেন। পিতা ও মাতৃজায়াকে প্রণাম করতঃ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। এক বিরাট সেনাবাহিনী তাঁহার নেতৃত্বে রেমুণা যাত্রা করিল।

গভীর রজনীতে, সুসজ্জিতা দেবদাসী উমা ও রমা নৃত্যসহ গাহিতেছে—

"গুঞ্জ অলি পুঞ্জবত কুঞ্জমন মাতিয়া।
মত্ত পিক দত্তরবে ফাটে মধু ছাতিয়া॥
বল্লীযুত মল্লীফুল গন্ধসহ মারুতা।
কুঞ্জকলি শৃঙ্গ-অলি বৃন্দকাড় নৃত্যতা॥
সখি, মন্দ মধু ভাতিয়া।
কান্ত বিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহ বাঁচিয়া॥
ভস্মতনু পুষ্পধনু সঙ্গরন পূরিয়া।
অঙ্গ মধু ভঙ্গ কর প্রাণ যাকু ফাটিয়া॥"—লোচনদাস।

পট্টনায়ক গোপীনাথ, অশ্বারোহণে চারিজন অনুচর ও বাহকসহ শিবিকা একখানি লইয়া নির্জন রাজপথ বাহিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্দেশে উপস্থিত হইলেন। ক্লীব প্রহরীগণ উৎকোচে বশীভূত হইয়া সিংহদ্বার ছাড়িয়া দিল।

নৃত্যগীতান্তে উমা রমা ফিরিতেছে। রমার নূপুর খুলিয়া গেলে, উমা বাঁধিতে বসিল। গোপীনাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—'উমা, রমা, তোমাদের আমি নিয়ে যেতে এলেম। বাইরে পাল্কী অপেক্ষা করছে।'

উমা ও রমা উভয়েই অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। গোপীনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'আমি, তোমার গোপীনাথ। রেমুণার যুদ্ধ জয় কোরে, গোপনে তোমাদের নিতে এসেছি। তুমি আমার হৃদয়লক্ষ্মী ; আর রমা, বাণীনাথের।'

উমা গোপনে একটু হাসিল, প্রকাশ্যে বলিল—'আপনি এ অন্যায় করেছেন। এসময় এ মন্দিরে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, এতে আপনার প্রাণদণ্ডের আশঙ্কা আছে।'

গোপীনাথ নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন—'আছে, তা আমিও জানি।'

'জানেন, তবে আসা কেন?' অদূরে, কিশোরকণ্ঠে কে প্রশ্ন করিল। সকলের বিস্ময় জন্মাইয়া যুবরাজ আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গোপীনাথ বলিলেন—'যুবরাজ, এবার উল্টে প্রশ্ন করা অসঙ্গত হবে না, আপনি কেন এসেছেন?'

যুবরাজ নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলেন—'নারীভাবে শ্রীপুরুষোত্তমের নিভৃতারাধনার জন্য আমি প্রায়ই এসে থাকি। উপস্থিত ক্ষেত্রে, আপনারই জন্য স্ত্রীবেশ ত্যাগ কোরে আসতে হলো।'

গোপীনাথ সকৌতুকে বলিলেন—'ঐ জন্য ত আমিও স্ত্রীবেশ ছেড়ে এলেম। যাক্, এখন বিচার করা চলবে, রাজদণ্ড কার কার পাওয়া উচিত?'

যুবরাজ অপ্রতিভ হইলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'ধূর্ত্তের নিকট পরাজয় মানতে হল। এখন আপনার মনকে সংযত কোরে, আমার সঙ্গে বাইরে যেতে আদেশ করছি?'

একদিন গজাধিপ প্রতাপরুদ্র ভবানন্দরায়কে সভায় ডাকাইয়া বলিলেন—'এই সংবতের অন্তে দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি রাজকোষে জমা দেবার কথা, আপনি অন্যথা করেছেন কেন?'

ভবানন্দ একটা সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিলেন—'এ বৎসর অজন্মা হওয়ার জন্য প্রজারা কর দিতে পারে নাই। প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করে কর সংগ্রহের কোন নিয়ম নেই, মহারাজের রাজত্বে!'

মহারাজ গজপতি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—'ভুল কথা। আপনার পুত্র গোপীনাথের নামে রাজমহীন্দ্রার যে পত্তনী দেওয়া আছে, শুনেছি, তা হতে আপনি এ বৎসর কর আদায় করেছেন প্রজাপীড়ন করেই। পাঠানদের সহিত যুদ্ধের বিপুল ব্যয় বহন করতে হচ্ছে, আপনি এ সঙ্কটে বহু রাজ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।'

ভবানন্দ রায় অপ্রস্তুত হইয়া অনুনয় করিলেন—'সত্য বলছি মহারাজ, দুই লক্ষ কাহণ কৌড়ি একযোগে জমা দেবার সামর্থ্য আমার উপস্থিত নেই। আমাদের কয়েকটা উত্তম আরবী অশ্ব আছে, মহারাজ ইচ্ছা করলে তা দিয়ে করভার লাঘব করতে পারেন!'

মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাহাতে সম্মত হইয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য যুবরাজকে আজ্ঞা দিলেন।

ভবানন্দ রায়ের অশ্বশালায় গোপীনাথ, যুবরাজকে দ্বাদশটী আরবী অশ্ব দেখাইয়া ফিরিতেছেন। যুবরাজ এদিক ওদিক ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া অশ্ব দেখিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন—'এই অশ্বের পা মোটা। এটার কান ছোট। এটার ঘাড় তেমন লম্বা নয়।' ইত্যাদি ইত্যাদি। গোপীনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'সেজন্য আমার অশ্বের মূল্য হ্রাস করা চলে না? অশ্বগুলি ত ঘাড় তুলে এদিক ওদিক চায় না।'

যুবরাজ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিলেন। মনে হইল, কথাটা তাঁহার অন্তরে বাজিয়াছে। একদল রাজসৈন্য আসিয়া ভবানন্দ রায়ের ভবন ঘিরিয়া রহিল। বৃদ্ধ ভবানন্দ ভয়ে শয্যা লইলেন। গোপীনাথ গোপনে পলায়ন করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়া নিরাশ হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন পার্বত্যপথে একা গোপীনাথ অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। পরিচ্ছদ, সাধারণ নাগরিকের ন্যায়। পশ্চাৎদিক হইতে আগত অশ্বপদধ্বনি সমূহ তাঁহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল—তিনি নামিলেন, এবং অশ্বের পিঠে কশাঘাত করিয়া তাহাকে সম্মুখের দিকে ছুটাইয়া দিলেন। মাথায় বড় পাগড়ী বাঁধিয়া ও গায়ে কাপড় জড়াইয়া বৃদ্ধ সাজিলেন। নগ্নপদে, যষ্টি হাতে ধীরে ধীরে আবার নগরাভিমুখী হইলেন। অশ্বারোহী সৈন্যগণ সেই পথে আসিয়া গোপীনাথের সন্ধান জানিতে চাহিলে, তিনি দূর পাহাড়ের পথে হাত বাড়াইয়া দেখাইলেন—মুখে বলিলেন না। অশ্বারোহীগণ, নির্দিষ্ট পথে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

রাজগুরু কাশীমিশ্রের বাটীতে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসকুঠীরে পিঁড়ায় বসিয়া প্রদীপালোকে পুঁথি লিখিতেছেন রামানন্দ। মহাপ্রভু সপার্ষদ, শ্রীজগন্নাথদেবের আরতি দর্শনে গিয়াছিলেন।

গোপীনাথ সাধারণ বেশে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ডাকিলেন—'দাদা, মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে এসেছি।'

রামানন্দ মুখ তুলিয়া গোপীনাথকে কষ্টে চিনিলেন, বলিলেন—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তায় বিশ্বাস কর না, তাঁর শ্রীচরণাশ্রয়ের যোগ্য নও তুমি। তিনি মন্দির হতে ফিরবার আগেই সত্বর প্রস্থান কর?'

গোপীনাথ করুণকণ্ঠে বলিলেন—'বিপদের কাণ্ডারী তিনি, পাপীতাপীর আশ্রয় তিনি। আর আমায় কি নিরাশ হয়ে শেষে বন্দী হতে হবে? দাদা!'

রামানন্দ লেখনী ফেলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—'পাপী তুমি, লম্পট তুমি, প্রবঞ্চক তুমি। তোমার বহু পাপ-কাহিনী মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হয়েছে। ও পাপময় দেহ নিয়ে, তাঁকে দর্শন দিয়ে কলঙ্কিত করতে পাবে না তুমি?'

গোপীনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন—'যুবরাজের নিকট গুরুতর অপরাধের দায়ে আমার প্রাণদণ্ড হতে পারে!'

রামানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন—'হয়, হবে—ক্ষতি কি! এজন্মে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপরাশির খণ্ডন হলে, পরজন্মে মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়লাভ সুগম হবে।'

রামানন্দ আবার পুঁথি লিখিতে বসিলেন—গোপীনাথ কারাগারে গিয়া প্রহরীদের নিকট শৃঙ্খল মাগিয়া পরিলেন।

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

কিহে রামানন্দ, বৈষ্ণব হয়ে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল কেন?" বলিতে বলিতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আসিয়া দাঁড়াইলেন। রামানন্দ মুখ তুলিয়া দেখিয়া একটু হাসিলেন মাত্র।

স্বরূপ, রামানন্দ, গদাধর, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, ও কাশীমিশ্র প্রভৃতি

ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। স্বরূপ কহিলেন—'রামানন্দ আপনার পরম ভক্ত। রায়পরিবারেরও বিপদকালে, আপনার কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করি আমরা।'

মহাপাত্র হরিচন্দন এইকালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ও প্রার্থনা কেন শুনি স্বরূপ? সন্ন্যাসী আমি, পাঁচগণ্ডার অধিকারী নই, রায়গোষ্ঠির অনুকূলে দুইলক্ষ কাহন আমি কেমন কোরে মহারাজের নিকট ভিক্ষা করব?'

কাশীমিশ্র আবার অনুনয় করিলেন—'ভবানন্দ রায় ও তিন পুত্র বন্দী হয়ে আছেন নিজ ভবনে। গোপীনাথকে আজ চাঙ্গে ফেলা হবে। রক্ষার কী উপায়!—

শ্রীমন্মহাপ্রভু দুই কর্ণে আঙুল দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'রাধাগোবিন্দ, রাধাগোবিন্দ! বিষয়ীলোকে রাজকর আত্মসাৎ কোরে স্ফূর্তি লুটবে, আমি তাদের দায়ে মহারাজের কৃপা ভিক্ষা করব? না স্বরূপ, নীলাচলে আমার আর থাকা হবে না, আজই আমায় আলালনাথে নিয়ে চল? সেখানে আমি বিষয়ীলোকদের সংস্রব থেকে দূরে থাকবো।'

কাশীমিশ্র, মহাপাত্র হরিচন্দনের প্রতি কী যেন ইঙ্গিত করিতেই, তিনি প্রস্থান করতঃ নির্জনে মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে বলিলেন—'রায় পরিবার মহাপ্রভুর ভক্তগোষ্ঠি। কর আদায়ের অন্যরূপ ব্যবস্থা কোরে, দণ্ডদান স্থগিত করতে ইচ্ছা করুন, মহারাজ!—কী জানি, মহাপ্রভুর কোপে পড়বেন!'

মহারাজ গজপতি বলিলেন—'মহাপ্রভুর ভক্তগণ আমার পরম শ্রদ্ধার বস্তু। যুবরাজকে আমার আদেশ জানান্, রায়পরিবারের সকলকে মুক্তি দেওয়া হোক এবং ভবানন্দকে সময় দেওয়া হোক, যতদিনে তিনি রাজকর শোধ দিতে পারেন।'

বধ্যভূমিতে গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ানো হইয়াছে অর্থাৎ একজন ঘাতক, শৃঙ্খলিত গোপীনাথকে লইয়া উচ্চ মঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মঞ্চের চতুষ্পার্শে ছোটবড় বহু খড়্গ ও বর্শা খাড়া হইয়া সজ্জিত আছে—বন্দীকে অস্ত্রের উপর ঠেলিয়া হত্যা করা হইবে।

নির্ভয়চিত্ত গোপীনাথ করযোড়ে—অন্তিমপ্রার্থনা করিতেছেন—'হে ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভু, আমি তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার অনন্ত পাপ-কলঙ্কিত দেহ মন তোমার আশ্রয় পেলে না। প্রাণকে দণ্ড দিয়ে আমার সকল কলঙ্ক দূর হোক। পরজন্মে, ও শ্রীচরণাশ্রয় প্রত্যাশী রইলাম।'

এমন সময় দেখা গেল যুবরাজ তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া সেইদিকে আসিতেছেন এবং হাত তুলিয়া চীৎকার করিতেছেন—'রক্ষ? রক্ষ?'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলালনাথ যাত্রা। অগ্রে, স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ খোল মন্দিরা বাজাইয়া কীর্ত্তন গাহিয়া চলিতেছেন। পশ্চাতে, গদাধর ও জগদানন্দ পুঁথিপত্র লইয়াছেন। তৎপশ্চাতে গোবিন্দ, মহাপ্রভুর জলপাত্র, ঝুলি, এবং ছিন্নকন্থা প্রভৃতি বহন করিয়া যাইতেছে। আর সকলের মধ্যস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন।

পুরীধাম অতিক্রম করিলে, পশ্চাতে তিনখানি অশ্বচালিত যান আসিয়া থামিল। প্রথম ও দ্বিতীয় খানি হইতে কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য এবং তৃতীয়খানি হইতে ভবানন্দ, গোপীনাথ ও বাণীনাথ বাহির হইয়া সকলে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

মহারাজ গজপতি মহাপ্রভুর পদতলে লুটাইয়া বলিলেন—'শ্রীভগবানকে আমরা নীলাচল পরিত্যাগ করতে দেবো না।' দেখাদেখি, অবশিষ্ট সকলেই রাজপথে বিলুণ্ঠিত হইয়া পথ রোধ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'আর উপায় কি?—স্বরূপ, নীলাচলচন্দ্র আকর্ষণ করেছেন!'

গান

শ্রীরমেন চৌধুরী

পথ চেয়ে প্রিয়া রবে না আমার আশে
　　　　শুক্লা মাধবী রাতে,
আমি জানি তব নয়ন সজল নয়
　　　　বিরহের বেদনাতে!
　গাঁথনি তো জানি বকুলের দুটি মালা,
　কনক প্রদীপে গৃহ-কোণ নয় আলা,
আঁধার ভুবনে বাধার দুয়ার খুলি
　　　　দেখা হবে মোর সাথে।

হতাশায় ভরা আজিকে ধরণীতল
　　　　জনে জনে অসহায়,
সন্ধ্যার মেঘ আরক্ত হোলো ওই—
　　　　হাহাকার শোনা যায়!
　ঘরের বাহিরে বন্ধুর পথ পারে
　তুমি আর আমি চিনে নেব দু'জনারে
নিভৃতে হবে না আমাদের আলাপন
　　　　গোপন নয়নপাতে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

কালকূট বলিলেন, "সুরঙ্গমা আপনার কুটীরে বারম্বার আসত তবু আপনি তার হৃদয় হরণ করতে পারলেন না ?

"হৃত বস্তুকে বেশী দিন আয়ত্ত অধিকার করে' রাখা শক্ত। অর্জ্জিত বস্তুকেই স্বচ্ছন্দে ভোগ করা যায়। আমি সুরঙ্গমার হৃদয় হরণ করবার চেষ্টা করি নি, আমি তা অর্জ্জন করতে চেয়েছিলাম। তাই আমি তার মনের দিকেই বেশী মন দিয়েছিলাম দেহের দিকে নয়। আমি জানতাম তার মনকে যদি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় প্রভাবিত করতে পারি তাহ'লে তার দেহ আপনিই এসে ধরা দেবে আমার কাছে। তাই আমি তাকে সৃষ্টি তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। ফুল ফল পক্ষী পতঙ্গদের জীবন লীলার সত্য রূপ তার কাছে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিলাম। তাকে এ-ও বুঝাতে চেয়েছিলাম যে প্রকৃতির এই সত্য রূপকে আচ্ছন্ন করে' কতকগুলি ধূর্ত্ত লোক রহস্যের ধূম সৃষ্টি করেছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এই ধূমের নাম শাস্ত্র, অন্ধ লোকাচার। জীবনের আলোকে মরণের কুহেলী দিয়ে আচ্ছন্ন করে' অদ্ভুত সব প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছে তারা। সুরঙ্গমাকে এই সব প্রহেলিকা থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিলাম আমি, এমন সময় হঠাৎ সুরঙ্গমা একদিন এসে বললে, 'কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমাকে মধ্য প্রদেশে মৃগয়ায় যেতে হবে। কুমারকে আমি বলেছিলাম যে আমি মহর্ষি চার্ব্বাকের কাছে এখন বিজ্ঞানের পাঠ নিচ্ছি। মৃগয়ায় গেলে সে পাঠ বিঘ্নিত হবে।' কুমার বললেন, মহর্ষি চার্ব্বাক পালাবেন না, কিন্তু যে কস্তুরী মৃগদলের সন্ধান পেয়েছি তারা হয়তো পালিয়ে যাবে। আর সদ্য ধৃত বন্য কস্তুরী মৃগ যদি তোমাকে অবিলম্বে উপহার দিতে না পারি তাহলে এই মৃগয়া অভিযানের স্বার্থকতাই বা কি। এখন আপনিই বলুন আমার কি করা উচিত, আমি যাব, না থাকব ?' আমি উত্তর দিলাম, 'ভদ্রে, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না'। সুরঙ্গমা চলে গেল। সুরঙ্গমা চলে যাবার পর আমার মনে হল চতুরাননের কাছে ও যে শপথ করেছিল সেই শপথই ওকে টেনে নিয়ে গেল। আমি ওর বিশ্বাস টলাতে পারি নি। আমার সর্ব্ববিধ বৈজ্ঞানিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে ওর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল আমি সত্যিই তো ওকে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পারি নি। আমি যে সব যুক্তির অবতারণা করেছি সে সব যুক্তিও সম্ভবত খণ্ডন করেছেন সুন্দরানন্দের কুলপুরোহিত আচার্য্য পর্ব্বত শিখর। আচার্য্য পর্ব্বত-শিখর ঘোর আস্তিক, তিনি সব কিছুতেই বিশ্বাস করেন, তাঁর ধারণা আমাদের অবিশ্বাসের মূলে আছে আমাদের অজ্ঞতা। অজ্ঞতার মূলে যে বিশ্বাস-প্রবণতা তা তিনি মানতে চান না। সুরঙ্গমা চলে যাবার পর আমি পর্ব্বত শিখরের আশ্রমে গেলাম একদিন। ভাবলাম তাঁকে যদি আমি প্রভাবিত করতে পারি তাহলে সুরঙ্গমাও এক-দিন না একদিন প্রভাবিত হবেই। কিন্তু গিয়ে দেখলাম পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করা কঠিন। আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা, ব্যক্ত আত্মা, অব্যক্ত আত্মা প্রভৃতি অদৃশ্য কিন্তু দুরারোহ প্রস্তর নিচয় তাঁকে এমনভাবে ঘিরে রয়েছে যে তাঁর যুক্তির নাগাল পাওয়া শক্ত। সেখানে গিয়ে কিন্তু আর একজনের নাগাল পেলাম, তাঁর কন্যা ধারামতীর। আমি নাগাল পাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি নি, আমাদের আলোচনা শুনে সেই আকৃষ্ট হল আমার প্রতি। জ্যোৎস্না-কুল গভীর নিশীথে একদা আমি কিছু মাধবী সুরা এবং বন্য কুক্কুটের মাংস সহযোগে যখন উপলব্ধি করছিলাম যে আনন্দময় জীবনযাপন করার চেয়ে মহত্তর আর কি থাকতে পারে, থাকলেও তার জন্যে কৃচ্ছ সাধন করবার প্রয়োজনই বা কি তখন সহসা বল্কল বাসা ধারামতী আমার আশ্রমে

এসে প্রবেশ করল। দেখলাম তার দুর্ব্বার যৌবন বল্কল-বাসের বাঁধন মানতে চাইছে না। যে শক্তি নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে নিখিল বিশ্বে সতত উন্মুখ তারই প্রকাশ তার উজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টিতে দীপ্যমান। আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ হাসি হেসে সে বললে,"ভগবন, আশা করি আমার আগমনে আপনার আনন্দ বিঘ্নিত হ'ল না। কৌতূহল আমাকে এখানে টেনে এনেছে। পিতার সহিত আপনি এ কয়দিন যে সকল আলোচনা করেছেন তার সারবত্তা হয়তো তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারে নি কিন্তু তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ যুগে সকলেই যখন অলীক কল্প-লোকের স্বপ্নে আকুল চিত্ত তখন আপনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের ভূমিতে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে যে সত্য দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাতে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছি" আমি শুনেছিলাম ধারামতী শবরী কন্যা। শবরী ভল্লুকীর গর্ভে ওর জন্ম। ভল্লুকী ছিল পর্ব্বত শিখরের পরিচারিকা। পর্ব্বত শিখরের আশ্রমেই ধারামতীর জন্ম হয়। ধারামতীর পিতা কে তা আমি ঠিক জানি না, অনেকে বলেন পর্ব্বত-শিখরই ওঁর জন্মদাতা। ওঁর প্রবল আস্তিক্য-বুদ্ধি এবং নীতি-বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও ওঁর একবার না কি পদস্খলন হয়েছিল। সে যাই-হোক ধারামতীকে যে উনি কন্যা স্নেহে লালন করেছিলেন তাতে কোনও সংশয় নেই, ওঁর বিদ্যা বুদ্ধি এবং সংস্কার অনুযায়ী যে ওঁকে শিক্ষাও দিয়েছিলেন সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ, সুতরাং ধারামতীর কথা শুনে প্রথমে আমি বিস্মিত হলাম। সন্দেহ হল হয়তো সে আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছে। বললাম, "ভদ্রে, তুমি আসাতে আমার আনন্দ বিঘ্নিত হয় নি, কিন্তু তুমি আসাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ তুমি যে পরিবেশে লালিত হয়েছ তোমার আচরণ ঠিক সে রকম মনে হচ্ছে না। তবু যখন এসেছ বস। আমার কথা শুনে ধারামতী আমার পার্শ্বে উপবেশন করে' হেসে বললে—"পর্ব্বত স্থাণু হতে পারেন কিন্তু তার থেকে যে ধারা নির্গত হয় তা চঞ্চলা। সুতরাং পর্ব্বতের স্বভাব দেখে ধারার বিচার করবেন না।" উপমাটি শুনে আমি খুব খুসী হলাম। বললাম, "তাহলে আপত্তি যদি না থাকে এই কুক্কুট মাংস এবং মাধ্বী সুরার অংশ গ্রহণ কর।" সেদিন সেই গভীর নিশীথে ধারামতীর যে পরিচয় পেলাম তা অপূর্ব্ব।"

কালকূট ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "যদি সম্ভব হয় আপনার কাহিনীটি একটু সংক্ষিপ্ত করুন। শেষ পর্য্যন্ত কি হল বলুন" "শেষ পর্য্যন্ত যা চিরকাল হয়ে থাকে, যা হওয়া উচিত, তাই হল। ধারামতীর যৌবন ধারায় আমি অবগাহন করতে লাগলাম। কিন্তু সুরঙ্গমাকে ভুলতে পারলাম না আমি কিছুতে। সুরঙ্গমার অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আমার যুক্তি যে অবশেষে পরাজিত হয়েছে এই অপমানের ক্ষতটা প্রতিদিন যেন আমার হৃদয়ে গভীরতর হতে লাগল। আমার এ-ও মনে হতে লাগল যে ওর ওই অন্ধ বিশ্বাসটা হয়তো ভান, আমার যুক্তির অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার ছল মাত্র। আমার মনের এক অদ্ভুত অবস্থা হল। যুক্তির অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করতে পারি না, কারণ ওরই ওপর আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে, যে নারী সেই ব্যক্তিত্বকে বিচলিত করতে চায় তার সঙ্গ কাম্য না হওয়াই উচিত, কিন্তু আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি সুরঙ্গমাকেই কামনা করতে লাগলাম। ধারামতী আমার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়েই আমাকে ভজনা করেছিল। প্রথম প্রথম আমিও তার অর্চনায় তুষ্ট হয়েছিলাম কিছুদিন, প্রতিরাত্রে সে যখন অভিসারে আসত আমি চন্দন লিপ্ত দেহে পুষ্প মাল্যে শোভিত হয়ে সুরা মাংসের প্রাচুর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করতাম তার জন্য। কিন্তু কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলাম আমি মনে মনে সুরঙ্গমারই প্রতীক্ষা করছি, ধারামতীর সঙ্গে সম্পর্কটা নিতান্তই দৈহিক হয়ে উঠছে ক্রমশ।

কালকূট অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিও সবিস্ময়ে ভাবিতেছিলেন বর্ণমালিনীর সহিত প্রণয়ের অভিনয় করিতেছেন। বর্ণমালিনী যে নারী শ্রেষ্ঠা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ব্রহ্মার অনুসন্ধান করিতেছেন, কারণ তাঁহার আশা আছে যে স্তবে তুষ্ট হইয়া চতুরানন হয়তো তাঁহাকে মেঘমালতীরই অনুগ্রহ লাভে সমর্থ করিবেন। হয়তো তিনি মেঘমালতীর মনোভাবই পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়াই কি তিনি এই বিশাল শবদেহের সমীপবর্ত্তী হন নাই? তিনি চার্ব্বাকের একটি কথাও শুনিতেছিলেন না। সহসা তাঁহার কর্ণগোচর হইল চার্ব্বাক বলিতেছে, "হঠাৎ একদিন দুর্ঘটনা ঘটল একটা। সম্ভবত পর্ব্বত শিখরের নির্দ্দেশ মতোই স্বর্ন্দরা-নন্দের মন্ত্রী জিম্ভ্রক আমাকে খবর পাঠালেন যে ধারামতীর

সঙ্গে আমার ধারাবাহিক নৈশ ঘনিষ্ঠতার সংবাদ করাও অগোচর নেই। আমি যদি অবিলম্বে ধারামতীকে পত্নীত্বে বরণ করি তাহলে সব দিক থেকেই ভালো হয়। না করলে ন্যায়ত আমাকে দণ্ডনীয় হতে হবে। আমি জিম্‌ভ্রককে গিয়ে বললাম যে ধারামতীর ইচ্ছানুসারেই তাকে আমি সম্ভোগ করেছি। সে যদি আপত্তি না করে তাহলে তাকে বিবাহও করব। ধারামতীকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। অর্থাৎ তাকে বললাম যে এখনও মনে মনে আমি সুরঙ্গমাকে আকাঙ্ক্ষা করছি, তাকে মানসলোক থেকে চ্যুত করবার বাসনা আমার নেই, ক্ষমতাও নেই। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ঘটেছে তা-ও কম আনন্দজনক নয়, জিম্‌ভ্রক বলছেন তোমাকে বিবাহ করে' সে আনন্দকে চিরস্থায়ী করতে। মানে তিনি ভাবছেন যে বিবাহ হলে ইহজন্মে তো বটেই পরজন্মে এবং পরবর্ত্তী বহু জন্মেও তুমি আমার একাধিপত্য সহ্য করবে। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। পতিকে ত্যাগ করে বহু বরনারী ইহজন্মেই পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়, পরজন্ম আছে কি নেই তা-তো অজ্ঞাত। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। কিন্তু একমত না হলেও তোমাকে বিবাহ করতে আমি অনিচ্ছুক নই। আমার হৃদয় তোমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করছি, সমস্ত জেনে শুনে তুমি যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করতে চাও, কর। ধারামতী কিছুক্ষণ অধোবদনে বসে' রইল, তারপর বলল, মহর্ষি আমি আপনার হৃদয়েশ্বরী হব এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম, সে হৃদয়ে যখন সুরঙ্গমার মতো সুন্দরী শ্রেষ্ঠা সমাসীনা তখন আমার কোনও আশা নেই। নিরাশ হৃদয়ে আপনার ক্রমশ ক্ষীয়মান দেহটাকে মাত্র সম্বল করে আমি আপনার সেবা করতে পারব না। আমাকে বিদায় দিন। রোরুদ্যমানা ধারামতীকে আমি কিছুতেই স্বমতে আনতে পারলাম না। আমি কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলাম না অকপট সত্যকে অবিচলিত চিত্তে স্বীকার করতে না পারলে পদে পদে দুঃখ পেতে হবে এবং সে দুঃখকে ঢাকতে হলে পদে পদে আশ্রয় নিতে হবে ভণ্ডামির। ধারামতী কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাত না করে' কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। সে গিয়ে মহর্ষি পর্ব্বতশিখরকে কিছু বলেছিল কি না এবং তা শুনে মহর্ষি পর্ব্বতশিখর সুন্দরানন্দের মন্ত্রী জিম্‌ভ্রককে প্ররোচিত করেছিলেন কি না তা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু যখন সুন্দরানন্দের সেনাধ্যক্ষ কুলিশপানি আমাকে এসে বললেন, 'আপনি যদি অবিলম্বে সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ না করেন তাহলে আপনাকে বন্দী করবার আদেশ জিম্‌ভ্রক আমাকে দিয়েছেন' তখন কর্ত্তব্য স্থির করতে আমার বিলম্ব হল না। কুলিশ-পানিকে বললাম, 'সুন্দরানন্দের রাজ্য বহু বিস্তৃত। অবিলম্বে তা ত্যাগ করা শক্ত। পদব্রজে সে রাজ্য ত্যাগ করতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবেই। তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' কুলিশ-পানি উত্তর দিলেন, 'ভগবন, আপনাকে পদব্রজে যেতে হবে না। জিম্‌ভ্রক আপনার জন্যে একটি দ্রুতগামী অশ্বতর পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি তাতেই আরোহণ করুন'। তাই করতে হল। অশ্বতর-পৃষ্ঠে আরোহণ করে' আমি সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ করলাম। দুই দিন দুই রাত্রি সেই অশ্বতর সংসর্গে বাস করে এই কথাই আমার বারম্বার মনে হল যে অধিকাংশ মানবই অশ্বতর-সদৃশ। তারা সম্পূর্ণ অশ্বও নয়, নিখুঁত গর্দ্দভও নয়। অর্থাৎ তারা অন্ধ সংস্কার-তাড়িত পশুও নয়, চক্ষুষ্মান বুদ্ধি-চালিত মানবও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণে তারা এমন এক অদ্ভুত মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে এমন এক অদ্ভুত সমাজ সৃষ্টি করেছে যে সে সমাজে নির্ব্বোধ পশু বা বুদ্ধিমান মানব কেউ স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে না। তারা গাভীর দুগ্ধ সবলে অপহরণ করে' তাকে করুণাময়ী জননী বলে' পূজা করে, যজ্ঞীয় পশুকে হত্যা করে' কল্পনা করে যে সে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হল, বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিকের সহজ যুক্তি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে উপেক্ষা করাই তাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার একমাত্র পরিচয়। এই ধরণের চিন্তা-পরম্পরা থেকে যৎকিঞ্চিৎ-সান্ত্বনা লাভ করতে করতে অবশেষে আমি সুন্দরানন্দের রাজ্যসীমা অতিক্রম করলাম। যে রাজ্যে এসে পদার্পণ করলাম তা ক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি বলিষ্ঠ-বীর্য্যের। আমি যখন সে রাজ্যে এসে প্রবেশ করলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। পল্লীপথে লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়েছে। একটি পথিককেই কেবল দেখতে পেলাম এবং তাকে প্রশ্ন করে জানলাম যে আমি বলিষ্ঠ-বীর্য্যের শাসনাধীন হর্ষ-নীড় নামক গ্রামে উপস্থিত হয়েছি। মাত্র এইটুকু খবর দিয়েই

পথিক নিজ গন্তব্যপথে চলে গেল, আমি নিবিড় অন্ধকারে ঝিল্লীমুখরিত এক বিরাট বৃক্ষের সমীপে সেই অশ্বতর-পৃষ্ঠের উপর বসে, চিন্তা করতে লাগলাম কোথায় এখন আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। কোনও গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে যদি উপস্থিত হই তাহলে ভদ্রতাবশত সে হয়তো আমাকে আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু অযাচিতভাবে কারও আশ্রমপীড়া উৎপাদন করতে আমার প্রবৃত্তি হল না। এ-ও মনে হল যে কোনও সহজ-বুদ্ধি-সম্পন্ন গৃহস্থ যদি আশ্রয় দেবার পূর্ব্বে আমার পরিচয় জানতে চান তাহলে সে পরিচয় আমাকে দিতে হবে, নতুবা মিথ্যাচার করতে হবে। এর কোনটা করবারই আমার ইচ্ছা হল না। মনে হল হর্ষ-নীড় গ্রামে যদি কোনও পান্থশালা থাকে কিছু শুল্কের বিনিময়ে সেই-খানেই আমি রাত্রিবাস করব। আমার কাছে এক কপর্দ্দকও ছিল না, কারণ জিমূভ্রকের আদেশ অনুসারে একবস্ত্রেই আমাকে সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমার আশা ছিল অশ্বতরটি বিক্রয় করে' কিছু অর্থসংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না। নিবিড় অন্ধকারে আমি পান্থশালার সন্ধানে হর্ষনীড় গ্রামের পথে পথে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলাম। একটি গৃহেরও দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পেলাম না। গ্রাম পার হয়ে গ্রামপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলাম অবশেষে। সেখানে দেখলাম একটি কুটির থেকে আলোক নির্গত হচ্ছে এবং দ্বারদেশে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে। নিকটে গিয়ে দেখলাম নারীটি বিগতযৌবনা কিন্তু সুসজ্জিতা। আমার দিকে কয়েকবার অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম নারীটি রূপ-জীবনী। অশ্বতর থেকে অবতরণ করে' বললাম, 'ভদ্রে তোমার গৃহে রাত্রিবাস করার সৌভাগ্যলাভ করতে পারি কি?' নীলোৎপলা তৎক্ষণাৎ সাগ্রহ সম্মতি দান করে' আমাকে আহ্বান করলে এবং স্বীয় চেটিকা কর্পূরীকে আদেশ করলে পাদ্যঅর্ঘ্য আনতে। নীলোৎপলার গৃহেই আমি আশ্রয় পেলাম। পরদিন প্রভাতে উঠেই পরিশ্রান্ত অশ্বতরটিকে বিক্রয় করে' যে ক'টি মুদ্রা পেলাম তা নীলোৎপলাকে দিয়ে বললাম, 'এই আমার যথাসর্ব্বস্ব। এর বিনিময়ে তুমি কয়েকদিনের জন্য আমার আহার ও শয়নের ব্যবস্থা কর। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি উপার্জ্জনের কোনও পন্থা আবিষ্কার করতে পারব আশা করি।' নীলোৎপলা বললে, "আপনার আহারের কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু শয়ন সম্বন্ধে আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমার গৃহে জনসমাগম হওয়ার সম্ভাবনা। দিনের বেলাতেও অনেকে আসেন। সুতরাং শয়নের ব্যবস্থা আপনি অন্যত্র করুন। আমার পিছনের দিকে একটি ঘর আছে অবশ্য, তাতে আপনি শয়ন করতে পারেন, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো আপনার নিদ্রা বিঘ্নিত হবে।" আমি বললাম, "নিরুপায় ব্যক্তির নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া কঠিন। নিদ্রা বিঘ্নিত হলেও আপাতত আমি তোমার ওই পিছনের ঘরেই শয়ন করব যতক্ষণ না অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারি।" পরদিনই আমি এক কুম্ভকারের অধীনে একটি কর্ম্ম সংগ্রহ করলাম। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে সেই মাটি দিয়ে কদম প্রস্তুত করবার ভার পেলাম। অপরাহ্নে ছুটি পেলে আমি গ্রামের বাহিরে গিয়ে নদীতে স্নান করে' নীলোৎপলার বাসায় ফিরে আসতাম। নীলোৎপলা প্রতিদিনই আমাকে কিছু খাদ্য এবং পানীয় দিত। আহারাদি শেষ করে' আমি চলে' যেতাম গ্রামপ্রান্তের একটি বিরাট প্রান্তরে। সেইখানেই পদ-চারণা করতে করতে আমি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করতাম কি উপায়ে আমি প্রমাণ করব যে ব্রহ্ম নেই। কারণ সুরঙ্গমাকে আমি ভুলতে পারি নি। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম যে তার অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তি যুক্তির আঘাতে আমি শিথিল করবই। একদিন সন্ধ্যায় কিছু অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল"—। যে সব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে চার্ব্বাক তাহাই- কালকূটের নিকট বিশদ করিয়া বলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

ধরণীর সম্পদ—

সম্মিলিত জাতিসমূহের বিশেষজ্ঞ বিবরণে প্রকাশ, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৪০ কোটি হইয়াছিল—তাহাদিগের বাস—

এশিয়ায়	১২৭ কোটি ২০ লক্ষ
য়ুরোপে	৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ
উত্তর আমেরিকায়	২১ কোটি ৬০ লক্ষ
দক্ষিণ আমেরিকায়	১১ কোটি ৬৫ লক্ষ
আফ্রিকায় (প্রায়)	১৯ কোটি ৮০ লক্ষ
ওসিয়ানিয়ায়	১ কোটি ৩০ লক্ষ
সোভিয়েট উনিয়নে	১৯ কোটি ৩০ লক্ষ

ইহা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, পৃথিবীর লোক-সংখ্যা যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ধরণীর সম্পদে আর তাহাদিগের জীবিত থাকা সম্ভব হইবে না। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মাইকেল রবার্ট একখানি পুস্তকে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কবি ও অঙ্কশাস্ত্র-বিশারদ। তিনি কবির কল্পনাকে অঙ্কশাস্ত্রবিদের নৈপুণ্যের দ্বারা সংযত করিয়া হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তখন লোক-সংখ্যা ছিল—২৩৫ কোটি। পৃথিবীর ৫৭ কোটি বর্গ মাইল স্থান তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকের অংশে ১৫ একর জমী পড়ে। তাহার মধ্যে ৫ একর বনভূমি, ৪ একর মরুভূমি, ২ একর জলহীন, ২ একর তুষারাবৃত। আবার পৃথিবীর কয়লা ও পেট্রল—প্রত্যেকের অংশে পড়িবে—৩ হাজার টন কয়লা, ৫ টন পেট্রল। ইহার মধ্যে প্রতীচীর অধিবাসীরা এশিয়ার ও আফ্রিকার অধিবাসীদিগের তুলনায় অধিক পাইবে। শতবর্ষ পূর্ব্বে কিন্তু প্রত্যেকের অংশ দ্বিগুণ ছিল। বৎসরে জনসংখ্যা ২ কোটি হিসাবে বর্দ্ধিত হইতেছে—তারতেই বৃদ্ধি বার্ষিক ৪০ লক্ষ। সুতরাং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের অবস্থা ভয়াবহ। এখনই পৃথিবীতে শস্যাভাব লক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষ অল্পকাল পূর্ব্বেও গম কিনিত না—করাচী বন্দর হইতে গম রপ্তানী হইত। রবার্টসের মত, অদূর ভবিষ্যতে গমের বাজারে ক্রেতাদিগের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ড—এই দেশ চতুষ্টয়কে চীন, ভারত, ব্রেজিল এই দেশত্রয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্তান কমনওয়েলথের সম্পদ নহে—ভার মাত্র। উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাচ্য দেশসমূহে সুব্যবস্থা করিলে এক পুরুষ চলিতে পারে; কিন্তু তাহার পরে ধ্বংস অনিবার্য্য।

অনেকের বিশ্বাস, আমেরিকার সম্পদের অভাব নাই। কিন্তু বর্ত্তমান হারে লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে, তথায়ও জীবনযাত্রার মান খর্ব্ব করিতে হইবে। ইতোমধ্যেই আমেরিকার বনসম্পদ বহু পরিমাণে নষ্ট করিতে হইতেছে এবং আমেরিকা এখন কাষ্ঠ ও কাগজের জন্য কানাডার উপর নির্ভর করে। কিন্তু কানাডার বনসম্পদও ব্যয়িত হইতেছে এবং রুশিয়ার বনসম্পদ থাকিলেও যে হারে আমেরিকার বন ব্যয়িত হইতেছে, সে হারে রুশিয়ার বনসম্পদ শেষ হইতে ৩০ বৎসর মাত্র লাগিবে।

দেখা যায়, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মানুষ তাহার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিত না; কিন্তু আজ যে সভ্যতা শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে কয়লা, তৈল, লৌহ, তাম্র ও অন্যান্য ধাতুর উপর নির্ভর করে তাহার উপকরণ ব্যয়িত হয়—পুনর্গঠিত হয় না। এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর তৈল সম্পদের পরিমাণ—৮০০ কোটি পিপা। কিন্তু যে হারে তৈল বাহির করা হইয়াছে, তাহাতে সে সম্পদ ২২ বৎসরে শেষ হইবার কথা। কয়লা কিছু অধিক আছে বটে, কিন্তু শত বৎসর পরে যে কয়লা পাওয়া যাইবে, তাহা নিকৃষ্ট জাতীয়।

জল হইতে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাহাতে উপকরণ নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তাহা উৎপাদন করিতে আয়ের শতকরা ১০ ভাগ মূলধনরূপে প্রযুক্ত করিতে হয়।

রবার্টস অবস্থা যেরূপ আতঙ্কজনক বলিয়াছেন, রুশিয়ার বিশেষজ্ঞগণ তাহা সেরূপ শঙ্কাদ্যোতক বলিয়া বিবেচনা করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারাও —অদূর না হইলেও সুদূর-ভবিষ্যতে যে ভয়ের কারণ আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বে একটা প্রচলিত মত ছিল, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ—প্রাকৃতিক বিপদ ও মানবের সৃষ্ট দুর্ব্বিপাক পৃথিবীর জনসংখ্যা হ্রাস করিয়া সাম্যাবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু বিজ্ঞান এখন মহামারী নিবারণ করিতে পারিতেছে এবং দুর্ভিক্ষও নিবার্য্য বলা যায়। অবশিষ্ট থাকে—যুদ্ধ; কিন্তু বর্ত্তমান কালে যুদ্ধ ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এখন যুদ্ধে ধরণীর খাদ্য, তৈল ও ধাতুসম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং সে ধ্বংসে মানুষ কোনরূপে উপকৃত হয় না। যুদ্ধ সঙ্কয়ের বিরোধিতা করে এবং বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থায়

শান্তির সময় যাহা সঞ্চয় করা সম্ভব তাহাও যুদ্ধের আয়োজনে নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া যায়।

সেই জন্য দরিদ্র দেশসমূহের পক্ষে শান্তিকামী হওয়া কেবল স্বাভাবিক নহে, সঙ্গতও বটে। বিশেষ বিজ্ঞানকে বিনাশের কার্য্যে প্রযুক্ত করিয়া যে নূতন নূতন মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতেও সৃষ্টি হয় না—লয় হয়। আণবিক বোমা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এই আতঙ্ক প্রকাশ কিন্তু রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট সরকার করিতেছেন না। তাঁহারা মনে করেন, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের পক্ষে খাদ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব এবং পৃথিবীতে যে মরুভূমি ও তুষারাচ্ছন্ন স্থান আছে, সে সকলেও খাদ্যোপকরণ উৎপাদন করা যায়। রুশিয়া সে বিষয়ে অবহিত হইয়াছে এবং সে বিষয়ে তাহার সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণই একমাত্র প্রয়োজন, তাঁহারা তাঁহাদিগের মতেই এত অভিভূত যে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না বা দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন না। তাহাতে ভুল হয়।

গোধারাম ছাব্বন—

দীর্ঘ ৪০ বৎসর পরে গোধারাম ছাব্বন স্যানফ্রান্সিস্কো হইতে স্বদেশে ফিরিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার অবদান ভুলিবার নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, গোধারাম তাঁহাদিগের অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যেমন ভারত হইতে বৃটিশকে বিতাড়িত করিবার জন্য জাপানের সহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন "গাদর দল" (স্বাধীনতা-সংগ্রামী) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তেমনই জার্ম্মানীর সহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কংগ্রেস যেমন য়ুরোপে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিয়াছিল—"গাদর দল" তেমনই আমেরিকায় সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। লালা হরদয়াল তাঁহাদিগের নেতা ছিলেন। এই দল ভারতবর্ষের প্রতি আমেরিকার অনেকের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

গোধারাম আর্য্য সমাজের কার্য্যে পাতিয়ালায় সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বিরাগভাজন হইয়া—রাজদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্যানফ্রান্সিস্কোয় গমন করেন। বৃটিশ শাসনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভারতে তাহার অবসান ঘটাইবার জন্য লালা হরদয়াল তখন আমেরিকায় আন্দোলন করিতেছিলেন। তখন কালিফর্ণিয়ায় বহু ভারতীয় ছাত্রের মত গোধারাম হরদয়ালের প্রভাবে প্রভাবিত হ'ন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে "গাদর দল" গঠিত হইলে যাঁহারা প্রথমে তাহাতে যোগ দেন গোধারাম তাঁহাদিগের এক জন।

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে তখন ৪।৫ হাজার ভারতীয় ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁহাদিগের মধ্যে দাবাগ্নির মত ব্যাপ্তি লাভ করে। ডক্টর হরদয়াল যেকোন উপায়ে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হ'ন। তিনি কেবল প্রচারে ও অসহযোগেই আপনার কার্য্য সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহেরও পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গাদর দলের কার্য্যকলাপ বৃটিশের পক্ষে বিশেষ বিব্রতকারী হইয়া উঠে; তাহার বিশেষ কারণ এই যে, সে দলের সদস্যরা প্রায়ই পঞ্জাবী ছিলেন এবং পঞ্জাব হইতেই বৃটিশ সৈনিক সংগ্রহ করিত। আমেরিকায় "গাদর দলের" সদস্যদিগের আত্মীয়স্বজনগণ ভারতে ইংরেজ-বিরোধ প্রচার করিতেন। বৃটিশ পারিলে তাঁহাদিগকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করিত; কিন্তু "গাদর দলের" সদস্যরা আমেরিকায় থাকায়, সে কাজ করা সম্ভব হয় নাই। বহু আমেরিকান ঐ দলের উদ্দেশ্যের সমর্থকও ছিলেন।

কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যখন যুদ্ধে বৃটিশের পক্ষাবলম্বন করিল, তখন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। যুদ্ধঘোষণার পরদিনই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার "গাদর দলের" সদস্যদিগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মামলাসোপর্দ্দ করিলেন।

হিন্দু-জার্ম্মান ষড়যন্ত্রের মামলা দীর্ঘ ৬মাস চলিতে থাকে এবং সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হয়। ফলে আমেরিকায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচিত হয়। ঐ মামলায় ভারতীয়, জার্ম্মান ও আমেরিকান অভিযুক্তদিগের সংখ্যা প্রায় এক শত ছিল। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়—তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা নষ্ট করিতেছেন। সেই মামলায় আসামী ৩০ জনের অধিক ভারতীয়ের মধ্যে ১৬ জনকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়; কারণ, হরদয়াল প্রমুখ অবশিষ্ট আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় নাই। যাঁহারা বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন—তাঁহাদিগের মধ্যে গোধারাম, (বর্ত্তমানে 'আমেরিকার উইকলী' পত্রের বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক' ডক্টর গোবিন্দবিহারী লাল ও (বর্ত্তমানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের) ডক্টর তারকনাথ দাস ছিলেন।

আমেরিকার সরকার "গাদর দলকে" দলিত করেন। কিন্তু তাহার সদস্যদিগের মধ্যে কয় জন, কোনরূপে, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা ভারতে বিপ্লবী কাজ করিতে থাকেন। কেহ কেহ মনে করেন, উত্তর ভারতে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা—এ সকলের মূলে "গাদর দলের" সদস্যদিগের প্রেরণা ও প্রচেষ্টা ছিল।

এদিকে কলিকাতার নিকটে বজবজে "কোমাগত মারু" জাহাজে আগত শিখদিগের সহিত ইংরাজ সরকারের সঙ্ঘর্ষ আজ আর কাহারও অবিদিত নাই।

গোধারাম প্রভৃতি কারামুক্ত হইলে ভারতে ফিরিতে পারেন নাই—বিদেশেই ছিলেন। বৃটিশ সরকার একবার গোধারামের জন্য পাসপোর্ট (ছাড়) লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য—তাঁহাকে ভারতে আনিয়া মামলাসোপর্দ্দ করিবেন। কিন্তু আমেরিকার সরকার তাহাতে সম্মত হ'ন নাই, তাঁহাকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে গোধারামের আবেদনে বৃটিশসরকার তাঁহাকে এই সর্ত্তে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দিতে চাহেন যে, স্বদেশে ফিরিয়া তিনি রাজনীতিক কার্য্য ত্যাগ করিবেন। তিনি তাহাতে সম্মত হ'ন নাই।

গোধারাম স্যানফ্রান্সিস্কোয় বাস করিতে থাকেন। তথায় তিনি

ভারতবর্ষের পক্ষে প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিতে থাকেন ; তাঁহার ক্ষুদ্র দোকান ক্যালিফোর্নিয়ায় ভারতীয় ছাত্রদিগের মিলনকেন্দ্র হইয়া উঠে। তিনি ভারতের নানা কার্য্যের জন্ম অর্থ সংগ্রহ করেন।

আজ গোধারামের বয়স ৬৯ বৎসর। তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি দৃঢ় করিবার জন্ম বৃত্তি লইয়া ভারতে আসিয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—

"বহুদিন পূর্ব্বে আমি গৃহত্যাগী হইয়াছিলাম। আজ নিশ্চয়ই ভারত এত পরিবর্ত্তিত যে তাহাকে আর চিনিতে পারা যায় না—আমি তথায় কি ভাবে গৃহীত হইব, জানি না।"

আমরা ভারতের এই দেশভক্ত পুত্রকে সাদরের সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস কেবল ভারতেই নিবদ্ধ নহে—তাহার কয়টি অধ্যায়ের জন্ম বিদেশে—ভারতীয়দিগের কৃত কার্য্যের পরিচয় সংগ্রহ করিতে হয়। যাঁহারা আমেরিকার অধ্যায়ের উপকরণ দিতে পারেন গোধারাম তাঁহাদিগের এক জন—যাঁহারা অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগের একজন।

ডাক্তারী স্কুল ও কলেজ—

বাঙ্গালায় অ্যালোপেথিক চিকিৎসা প্রবর্ত্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে ডাক্তারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেডিক্যাল কলেজ কেবল কলিকাতায় ছিল—তাহাও সরকারী প্রতিষ্ঠান। ডক্টর রাধাগোবিন্দ কর যখন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি কি পাগল হইয়াছেন? তিনি (বিদ্যাসাগর মহাশয়) সাধারণ কলেজ করিয়াই বিব্রত—আবার বেসরকারী ডাক্তারী কলেজ! কিন্তু কর মহাশয় তাঁহার স্বপ্ন সফল করিতে পারিয়াছিলেন। ভারত রাষ্ট্র স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেডিক্যাল স্কুলগুলি বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ বর্দ্ধিত করেন নাই—এমন কি কলিকাতায় একটি অস্থায়ী কলেজ বন্ধও করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে যে পশ্চিমবঙ্গে—বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে চিকিৎসকের অভাব অনিবার্য্য তাহাও যে সরকার বিবেচনা করেন নাই, তাহাই পরিতাপের বিষয়। বিশেষ সরকার চিকিৎসা ব্যবসা জাতীয়করণের কোন চেষ্টাই করিতেছেন না ; তাহাতে চিকিৎসকগণ যথেচ্ছা পারিশ্রমিক লইতে পারিতেছেন। এমন কি কোন কোন হাসপাতালেও অস্ত্র-চিকিৎসার জন্ম রোগীকে শত শত টাকা না দিলে বড় ডাক্তাররা চিকিৎসা করেন না!

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেডিক্যাল স্কুল বন্ধ করা নীতির ফল কিরূপ বিষময় হইয়াছে, আমরা বাঁকুড়া সম্মিলনীর এক আবেদনে তাহার পরিচয় পাইতেছি। বাঁকুড়া সম্মিলনী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং ইহার সহিত শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে জড়িত। এই প্রতিষ্ঠান ১৯২২ খৃষ্টাব্দে একটি মেডিক্যাল স্কুল ও ১৫০টি রোগীর আশ্রয়োপযোগী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান ও সহস্র সহস্র রোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে স্কুলটি সরকারের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুলটি বন্ধ করিবার নির্দেশ দেন। তখন জনগণের পক্ষ হইতে উহা কলেজে পরিণত করিবার দাবী করা হয় এবং প্রধান-সচিব বলেন, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় বাঁকুড়ার দাবী সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। সম্মিলনী সেই কথা শুনিয়া কলেজের প্রথম সোপান হিসাবে বিজ্ঞান বিভাগসহ আই, এস সি, শ্রেণী খুলিয়া তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মঞ্জুর করাইয়া ল'ন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই মেডিক্যাল স্কুলের পরীক্ষা গ্রহণের শেষ বৎসর। সেই জন্ম কলেজে ছাত্র ভর্ত্তি করিবার জন্ম সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন করিলে বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরিদর্শন সমিতি গঠিত করেন এবং সেই সমিতি কলেজের জন্ম আবশ্যক সরঞ্জাম ও গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ইনস্পেক্টার আরও কিছু আসবাব ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে বলেন এবং তদনুসারে কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু সরকার কলেজ প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। হাসপাতালের বার্ষিক ব্যয় লক্ষ টাকা। সরকার হাসপাতালের জন্ম ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু উহার অর্দ্ধাংশও দেন নাই!

সুতরাং স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, হাসপাতালটিও অর্থাভাবে বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ইহার দায়িত্ব কাহার? লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে সকল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, সে সকল ব্যবহৃত হইবে না—হয়ত বা শৃগাল সর্পের আশ্রয়স্থানে পরিণত হইবে।

সম্মিলনীর পক্ষ হইতে লোকের নিকট সাহায্যের জন্ম আবেদন করা হইয়াছে—মেডিক্যাল কলেজ না হইলে স্কুলের "১০।১৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইবে এবং হাসপাতালটিও বন্ধ হইয়া দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে।" এখন জিজ্ঞাস্য, ইহার পরেও কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা—জলপাইগুড়িতে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মত বন্ধ রাখিবেন?

প্যালেষ্টাইনের অভিজ্ঞতা—

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারত সরকার প্যালেষ্টাইনে কৃষিকার্য্য পরিদর্শন জন্ম কয় জন লোককে পাঠাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা তথায় কৃষিবিষয়ে অসাধারণ উন্নতি সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহা দিল্লীর দপ্তরখানায় বিস্মৃতির ধূলাবৃত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। প্যালেষ্টাইন শিশু রাষ্ট্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লর্ড ব্যালফোর ইহুদীদিগকে স্বদেশ প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তদনুসারে—আরবদিগের বহু আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া—ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনে রাষ্ট্র রচনার অধিকার দেওয়া হয় এবং তাহার পরেও তথায় আরবরা নানা উপদ্রব যে করে নাই তাহা নহে। কিন্তু রাষ্ট্র পাইয়া অল্পসংখ্যক ইহুদী রাষ্ট্রবাসী (১৫ লক্ষ মাত্র) যে ভাবে মরুভূমি ও জলাভূমি আবাদযোগ্য করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেইজন্ম ভারতের খাদ্য মন্ত্রী

আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, তথায় ইহুদীরা যে উৎসাহ ও বিশ্বাস লইয়া কাজ করিয়াছে, ভারতের এক দল লোকও যদি সেই উৎসাহ ও বিশ্বাস লইয়া কাজ করে। তবে আমাদিগের খাদ্য-সমস্যার সমাধান অচিরে হইয়া যায়।

এ কথা সত্য। তথায় স্বল্পসংখ্যক নরনারী মরুভূমি, পার্ব্বত্যপ্রদেশ ও জলা—কৃষির উপযুক্ত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের সাফল্যের কারণ কি? অন্যান্য কারণের মধ্যে—সমবায় কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন যে অন্যতম তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এ দেশে সরকার (আমাদিগের জাতীয় সরকার) প্যালেষ্টাইনে ও রুশিয়ায় লব্ধ অভিজ্ঞতার পরেও সমবায় কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন নাই! সে জন্য যে সকল স্থানে চাষ চলিতেছে, সে সকল স্থানে অবশ্য ভূমিসম্বন্ধীয় আইন পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। কিন্তু যে সকল "পতিত" জমী কৃষিকার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য ভারত সরকার বহু টাকা বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বিদেশ হইতে কৃষির যন্ত্রাদি আনাইয়াছেন, সে সকল জমীতে সেই প্রথায় কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করা হয় না কেন? লোকের অভাব নাই। দেশ-বিভাগের ফলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ও পশ্চিম পঞ্জাব হইতে যে লক্ষ লক্ষ বিতাড়িত হিন্দু ও শিখ ভারতরাষ্ট্রে আসিয়াছে তাহাদিগের জন্য কৃষির ভূমি প্রয়োজন। এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ ভার নহে—সম্পদ। তবে তাহার শক্তি সুপ্রযুক্ত করিতে হয়। ভারত সরকার তাহাই করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

আমরা যে রিপোর্টের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে লিখিত হইয়াছিল—যৌথ চাষের ও যৌথ বিক্রয় ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন চেষ্টা করা প্রয়োজন; ফলে যৌথ সমাজ গঠিত হইবে। কিন্তু সেই মতানুসারে কাজের পরীক্ষাও করা হয় নাই। অথচ ভারতের খাদ্য মন্ত্রী তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—যদি খাদ্যোপকরণ বর্দ্ধনের চেষ্টা প্রবল করা না হয়, তবে দুই বৎসরে বিপদ ঘটিবে। সে বিপদ ঘটিয়াছে এবং খাদ্যোপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করায় আমাদিগের সরকারের অর্থ ছিদ্র-কুম্ভে বারির মত বাহির হইয়া যাইতেছে—দেশ দরিদ্র হইতেছে। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তিত করা ত পরের কথা ভারত সরকার আজও জমীদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে পারিলেন না বা, ধনীদিগের তুষ্টিসাধন জন্য, করিলেন না।

সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য্য রুশিয়ায় যেমন প্যালেষ্টাইনেও তেমনই সাফল্যলাভ করিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে যে আবাদের অযোগ্য জমীও শস্য ও ফল উৎপাদন করিতেছে, তাহার বিবরণ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু সেই দুই রাষ্ট্রের লব্ধ অভিজ্ঞতা যে এ দেশে—জাতীয় সরকারও সুপ্রযুক্ত করিতেছেন না, তাহা যেমন লক্ষ্য করিবার বিষয় তেমনই লজ্জার কথা। কৃষিকার্য্যে সেই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন যে সমুদ্রে মৎস্য আহরণ ও ভূমিতলে ট্রেণ চালন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভারত সরকারের কার্য্যে যেন—"গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল" হইতেছে এবং সেই জন্যই দেশের দারুণ দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচিতেছে না।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনে অব্যবস্থা—

কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে পাটগুদামে ১৫ দিনে ১২৪টি উদ্বাস্তু শিশুর মৃত্যুর বিষয় আমরা গতবার আলোচনা করিয়াছি। সেই সম্পর্কে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন মনে করি। গত ২রা ডিসেম্বর কলিকাতার কোন সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়:—

"লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইবার উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল উদ্বাস্তুকে কাশীপুর শিবিরের পরিবেশে রাখা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৪ জন যক্ষ্মা রোগীকে শনিবার (১লা ডিসেম্বর) গভীর রাত্রে পর্য্যন্ত শিয়ালদহ মেইন ষ্টেশনে মৃত ও মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ধুবুলিয়া শিবিরে স্থানান্তরিত হইবার উদ্দেশ্যে কাশীপুর হইতে ট্রাক যোগে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আনীত এই ১৪ জন যক্ষ্মারোগী বেলা ১টা হইতে সম্পূর্ণ পরিচারক-হীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। ষ্টেশনে পৌঁছিবার পর—বেলা প্রায় আড়াইটার সময়ে—তাহাদের এক জনের মৃত্যু হয়। রাত্রি সাড়ে ১১টায় সময়ে হিন্দু সৎকার সমিতি মৃতদেহটি ষ্টেশন হইতে স্থানান্তরিত করে। এই রোগীদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইবার মত কোন চিকিৎসক অথবা কর্ম্মচারীকে তথায় পাওয়া যায় নাই।"

ঐ সঙ্গে লিখিত হয়:—

"আজ রবিবার সকালে রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাশীপুর উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করিবার কথা আছে।"

রাজ্যপালের পরিদর্শন-সম্ভাবনার সহিত এই ১৪ জন রোগীকে উদ্বাস্তু শিবিরে পরিণত পাটগুদাম হইতে সরান হইয়াছিল কি না, আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু এই সকল রোগীকে কেন চিকিৎসার্থ হাসপাতাল না পাঠাইয়া ধুবুলিয়ায় পাঠান হইতেছিল এবং কেনই বা তাহাদিগকে রোগিবাহী যানে না আনিয়া ট্রাকে আনিয়া "সম্পূর্ণ পরিচারকহীন অবস্থায়" ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা জানিতে কৌতূহলের উদ্রেক স্বাভাবিক।

যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহার নাম—জিতেন পোদ্দার; বয়স ৩৫ বৎসর। সে নাকি "এক মাস পূর্ব্বে খুলনা হইতে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিল।" ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই এক মাসকাল তাহার চিকিৎসার—ঔষধ-পথ্যের ও শুশ্রূষার এবং তাহাকে সুস্থ রোগীদিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্র করার কি ব্যবস্থা হইয়াছিল?

ষ্টেশনে তাহাদিগের অবস্থার যে বর্ণনা প্রদত্ত হয়, তাহা পাঠ করিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না।—

"রোগীদিগের পরিধানে প্রায় কোন বস্ত্র নাই; শীতে রাত্রে সবার আচ্ছাদনের সঙ্গতিও নাই। সম্মুখে খোলা জায়গা দিয়া হু-হু করিয়া বাতাস আসিতেছে—তাহার সামনে কুঁকড়িয়া পড়িয়া আছে এই রোগী কয়টি। এক জন শীতার্ত্ত রোগী আমার সম্মুখেই মৃতের ছেঁড়া কাঁথাটি নিজের গাত্রে টানিয়া লইল।"

অথচ সরকারী ব্যবস্থায় তাহাদিগকে আশ্রয় শিবিরে রাখা হইয়াছিল এবং সরকারী ব্যবস্থায় তাহাদিগকে সেই শিবির হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে

না হইয়াছিল। আর সরকারই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদিগের পূর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিবেন—প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যুদ্ধের সময় বন্দিশিবিরে অব্যবস্থা হয়—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচার-চতুর সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের দ্বারা জার্ম্মাণদিগের বন্দিশিবিরে অব্যবস্থা অত্যাচারে পরিণত হইয়াছিল—প্রচার করা হইয়াছিল। উদ্বাস্তু-শিবির যুদ্ধকালীন বন্দিশিবির নহে। তাহাতে যদি এইরূপ অব্যবস্থা হয়—এইরূপ অমানুষিক ব্যাপার ঘটে এবং সে জন্য সরকার লজ্জানুভবও না করেন, তবে তাহা কি মানবতার অপমান বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয় না?

কুপার্স ক্যাম্পে শিশুরা বন্যপশু কর্ত্তৃক নিহত হইতেছে! কাশীপুর শিবিরের ব্যবস্থা লজ্জাজনক—আর শিয়ালদহ ষ্টেশনে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ১৪ জন উদ্বাস্তুকে একই আশ্রয়-শিবির হইতে আনিয়া ফেলিয়া রাখা যে নির্ম্মমতার পরিচায়ক তাহা নিন্দা করিবার উপযুক্ত ভাষা আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ইহা সমগ্র প্রদেশের পক্ষে কলঙ্কের কথা।

যাদবগড়ে হত্যার মামলা—

কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণাংশে যাদবগড় উদ্বাস্তু উপনিবেশ। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত কতকগুলি হিন্দু পরিবার তথায় "পতিত" জমীতে ঘর তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আশা ও বিশ্বাস ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুতি অনুসারে উদ্বাস্তুদিগের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহাদিগের ঐ স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ-সমর্থন করিয়া তাহা regularise করিয়া দিবেন। তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে সরকার তাহা করেন নাই এবং জমীর অধিকারী উচ্ছেদের জন্য আদালতে মামলা আরম্ভ করিয়া জয়ী হ'ন। অর্থাৎ সরকার তাঁহাদিগকে যেমন পূর্ব্বে বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য জমী দেন নাই, তেমনই এই জমীতে বাস করিতে কোনরূপ সাহায্যও করেন নাই। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ২৪পরগণার হুকুমা রাজকর্ম্মচারী পুলিস ও দুই জন সশস্ত্র প্রহরী লইয়া ঐ স্থানে গমন করেন এবং গৃহস্থদিগকে, কোনরূপ গোলমাল না করিয়া, ঘরগুলি সরাইয়া লইতে বলেন। তথায় নাকি ২ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। গৃহস্বামীরা ঘর সরাইয়া না লওয়ায় জমীদারের লোক ঘরগুলি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। তাহাতে উদ্বাস্তুরা রুষ্ট হয়। পুলিস কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং ইষ্টকপাত হইলে এক জন প্রহরী দুইবার গুলী ছুঁড়ে। একটি গুলী ২ শত গজ দূরবর্ত্তী গৃহে অবস্থিতা বীণাপাণি মিত্রকে বিদ্ধ করে এবং তাহাতেই হাসপাতালে বীণাপাণির মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য, যদি কোন হাঙ্গামা হইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত বীণাপাণির কোন সম্বন্ধ ছিল না। কলিকাতার পুলিসের গুলীতে নারীর মৃত্যু স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারত রাষ্ট্রেও নূতন নহে। লতিকা সেন, প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়া দত্ত—এই সকল নারীর রক্তে কলিকাতার রাজপথ রঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা রাজনীতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। বীণাপাণি সেরূপ কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে কোন সচিব যে তাঁহার শোকার্ত্ত সন্তানদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও নহে।

যে রক্ষী গুলী ছুঁড়িয়াছিল, তাহাকে মামলা-সোপর্দ্দ করা হয় এবং সে-মামলার রঙ্গমঞ্চে যবনিকাপাত হয়—১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর। ইহা অবশ্য অসাধারণ law's delay; কিন্তু এই বিলম্ব কেন? বিলম্বে যে সাক্ষ্য সম্বন্ধে গোল হয় এবং লোক ঘটনার কথা ভুলিতে থাকে, তাহা বলা বাহুল্য। বিচারে অভিযুক্ত রক্ষী বেকসুর খালাস পাইয়াছে। কারণ, কোন্ গুলীতে বীণাপাণির মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা স্থির করা যায় নাই।

বিচারে বিলম্ব সম্বন্ধে যাহাই কেন বলিবার থাকুক না, বিচার সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

কিন্তু এই ঘটনায় বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালীন একটি ঘটনা আমাদিগের মনে পড়িতেছে। "নাইন্থ ল্যান্সার্স" প্রসিদ্ধ বৃটিশ সেনাদল তখন শিয়ালকোটে অবস্থিত। তাহারা আর একটি বৃটিশ সেনাদলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আমোদ আহ্লাদের সময় আট্টা নামক ভারতীয় পাচকের মৃত্যু হয়—সন্দেহ, সে নিহত হইয়াছিল। কিরূপে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, স্থানীয় সামরিক কর্ম্মচারীরা তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বার বার সমর বিভাগে সংবাদ লইয়াছিলেন—এমন কি বলিয়াছিলেন, প্রয়োজন মনে করিলে স্বয়ং প্রধান সেনাপতি যেন ঘটনাস্থলে যাইয়া তদন্ত করেন। সামরিক কর্ম্মচারীরা, বোধ হয় বড়লাটের আগ্রহে, তদন্ত সমিতি নিযুক্ত করেন। সমিতি যখন নির্দ্ধারণ দেন—হত্যার জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, তখন লর্ড কার্জ্জন সেই নির্দ্ধারণের নিন্দা করিয়া ৬০।৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং নির্দ্দেশ দেন—সমগ্র সেনাদলকে দণ্ড দিতে হইবে। সে জন্য তিনি ইংরেজ সমাজের অপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন মনে করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিয়াছিলেন।

আমেদাবাদে ঐরূপ একটি ঘটনায়, আদালত—গত ১১ই ডিসেম্বর নিহত মহিলার স্বামী ও সন্তানদিগকে ২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদে দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

যাদবগড়ে কি হইবে?

শিক্ষা-সমস্যায় রাজ্য-পাল—

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান রাজ্যপাল দীর্ঘকাল শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং শিক্ষা-বিস্তারের জন্যই তিনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে তাঁহার মত বিশেষ বিবেচনার উপযুক্ত। গত ২৬শে নভেম্বর তিনি মধ্য প্রদেশে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, সরল ও সারগর্ভ। বর্ত্তমানে যখন আমরা শিক্ষা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি, তখন সেই সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি শ্রদ্ধাসহকারে পঠিত হইবে, সন্দেহ নাই।

তিনি বলিয়াছেন, দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তিনি তাহার বিরোধী নহেন। কিন্তু তিনি মনে

করেন, ইংরেজী বর্জন করিলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব। অবশ্য উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজী বর্জনেই বিপদ ঘটিবে। কারণ, ইংরেজী ব্যতীত আমরা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিব না। তিনি আইনগত ব্যাপারে বিচারালয়ে ইংরেজী ব্যবহারের ফলে সমগ্র দেশে যে আইন সম্বন্ধীয় ঐক্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন, এবং বলেন—

"আমরা যদি ইংরেজী শিক্ষা উপেক্ষা করি, তবে আমরা আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্পর্কিত, মনীষা সম্বন্ধীয়, অর্থনীতিক ও ব্যবসা জগতে আমাদিগের উপযুক্ত স্থানে বঞ্চিত হইব, এমন সম্ভাবনা অনিবার্য্য। সেই জন্য আমি আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালকদিগকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।"

ইংরেজের অধীনতাবিরোধহেতু যে ইংরেজের ভাষা বর্জ্জনের আগ্রহ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পার যায়। কিন্তু আজ যখন জগতে ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা এবং ইংরেজীর সাহায্যেই আমরা আন্তর্জাতিক ও সর্ব্বভারতীয় ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিতে পারি, তখন ইংরেজী বর্জ্জন করার বিপদ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সে বিপদ যে জাতির পক্ষে ভয়াবহ এবং সর্ব্ববিধ উন্নতির পথ বিঘ্নবহুল করে, তাহা স্মরণ রাখা জাতির উন্নতিকামী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ডক্টর মুখোপাধ্যায় আর একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—

পরিবর্ত্তিত রাজনীতিক অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। দেশবাসী আশা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে, শাসন কার্য্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে ও ব্যবহারাজীব প্রভৃতি ব্যবসায়ে নেতার উদ্ভব হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কেবল উচ্চ শিক্ষার, লোক সেবার, বৈজ্ঞানিক ও কারীগরী প্রভৃতি ব্যবসার লোকের ক্রমবর্দ্ধমান অভাব দূর হইবে না, পরন্তু যাঁহারা দেশকে, যত শীঘ্র সম্ভব, অভাব হইতে, অজ্ঞতা হইতে ও ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবেন; তাঁহাদিগের আবির্ভাব হইবে। অর্থাৎ আটলাণ্টিক চার্টার যে ত্রিবিধ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, আমাদিগের কেবল তাহা লাভ করিলেই হইবে না। সুতরাং প্রকৃত নেতা প্রস্তুত করাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। বিশেষ ক্ষমতাসম্ভোগকারী নেতা আর বহু অধিকারে বঞ্চিত জনসাধারণ—এই উভয়ে যে প্রভেদ আছে, তাহা দূর করিতে হইবে।

এই প্রভেদ যে এ দেশে বিদেশীর প্রবর্ত্তিত শিক্ষায় বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র বহুদিন পূর্ব্বে দেখাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে এ দেশে লোক-শিক্ষার নানা উপায় ছিল, এখন আর নাই—"কেন যে ইংরেজী শিক্ষা সত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশে লোক-শিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার মূল কারণ—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি ১২৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল। তখন দেশ পরাধীন —দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি বিদেশী শাসকদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত। আজ পরিবর্ত্তিত রাজনীতিক অবস্থায় যে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শিক্ষাব্রতী—জনগণের একজন—তাহাই বলিতেছেন। ইহা যে বিশেষ আশার কথা, তাহা বলা বাহুল্য।

অষ্ট্রেলিয়ায় ধান্যের চাষ—

গত নভেম্বর মাসের 'ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস' পত্রে অষ্ট্রেলিয়ায় ধান্যের চাষ বিস্তারের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ধান্যের চাষ অধিক দিনের না হইলেও যে ভাবে তাহার বিস্তার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিস্তার আরও বৰ্দ্ধিত হইবে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মারামবিডগীর যে অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা আছে, তথায় ১৫৭ একর জমীতে পরীক্ষা হিসাবে ধানের চাষ আরম্ভ হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যে জমীতে ধানের চাষ হয় তাহার হিসাব—২০ হাজার একর। কিন্তু যদি সেচের জন্য জলের অভাব ও প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন হয় সেই আশঙ্কায় যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২৩ হাজার হইতে ২৫ হাজার একর জমীতেই ধানের চাষ হইত। কৃষকরা কোন বৎসর জমীতে গমের, কোন বৎসর যইয়ের, কোন বৎসর বা অন্য শস্যের চাষ করিয়া তাহার পরে ধানের চাষ করিত। তাহাতে ফসলের ফলন অধিক হয়। আবার সময় সময় পশুচারণক্ষেত্র করিলে ভাল হয়। যুদ্ধের সময় প্রয়োজনবৃদ্ধিহেতু অধিক জমীতে ধানের চাষ আরম্ভ হয়। চাউল মার্কেটিং বোর্ড উৎপন্ন ফসল লইয়া কলে দেন ও কল হইতে বিভিন্ন ক্রেতাকে চাউল দেওয়া হয়।

১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে হিসাব করিলে দেখা যায়, জমীর পরিমাণ ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ এইরূপ—

খৃষ্টাব্দ	জমী (একর)	প্রতি একরে উৎপন্ন (বুশেল)
১৯৪৩-৪৪	৪১ হাজার	৯৮ "
১৯৪৮-৪৯	৩১ "	৮৩ "
১৯৪৯-৫০	৩৮ "	১০০ "
১৯৫০-৫১	৪১ "	১১২ "

এক বুশেল ২১ সের।

অষ্ট্রেলিয়ায় চাউলের চাহিদা বৰ্দ্ধিতই হইতেছে। কারণ, ব্রহ্ম ও ইন্দো-চীনে অশান্তিহেতু সেই দুই দেশ হইতে অধিক চাউল রপ্তানী করা সম্ভব হইতেছে না। স্থানে ফসল বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এশিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে তাহা যথেষ্ট নহে।

ভারতে চাউলের অভাব আমরা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু তাহার কারণ নির্ণয় করা দুষ্কর; কারণ, ফসল বৃদ্ধি সম্বন্ধে সরকার যে আবশ্যক যত্ন করিতেছেন, তাহা বলিবার উপায় নাই। তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয়ে বিদেশ হইতে খাদ্য শস্য আনিয়া দেশে তাহার অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন—লোককে অপূর্ণাহারে থাকিতে হইতেছে এবং যে খাদ্যে লোক অনভ্যস্ত তাহা গ্রহণ করিয়া লোক পীড়িত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, যে ভূমি ব্যবস্থায় কৃষক উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত হয় না—সেই ভূমি-রক্ষার ব্যবস্থাই বহাল রাখা হইয়াছে! এমন

কি সেচের যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহাও করা হয় নাই ও হইতেছে না। যে স্থানে সেচের ব্যবস্থা করা হইতেছে, তথায় তাহা ব্যয়াধিক্যহেতু সমর্থনযোগ্য বলা যায় না।

যদি এই কথাই নির্ভরযোগ্য হয় যে, ভারতরাষ্ট্রে খাদ্যোপকরণের অভাব শতকরা ১০ ভাগমাত্র, তবে কেন ৪ বৎসরে সে অভাব পূর্ণ করা যায় নাই, তাহা বুঝা যায় না। শতকরা ১০ ভাগ অভাবও সত্য কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না; কারণ, ভারত সরকার শস্যের উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য হিসাব রক্ষার ব্যবস্থা অদ্যাপি করিতে পারেন নাই। অথচ কেবলই অভাব দেখান হইতেছে আর বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকার খাদ্য-শস্য আমদানী করা হইতেছে। যদিও প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারত রাষ্ট্র আর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবে না, তথাপি এখন বলা হইতেছে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৫০ লক্ষ টণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে। কার্য্যকালে হয়ত দেখা যাইবে, তাহাতেও কুলাইবে না। কারণ, এই বিরাট দেশে কোন না কোন স্থানে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, হয়ত বা ভূমিকম্পও হইবে। তখন বলা হইবে, সেই সকল কারণেই শস্যের অভাব হইয়াছে।

তাহার পরে হয়ত আমাদিগকে চাউলের জন্য অষ্ট্রেলিয়ারও দ্বারস্থ হইতে হইবে।

খাদ্যাভাব—

গত ২২শে ডিসেম্বর (৬ই পৌষ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসনে চান্সেলার ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দেশে খাদ্যাভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ দুশ্চিন্তার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন, সত্য বটে আজ পৃথিবীর নানাস্থানে লোকের খাদ্যাভাব, কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতে পারি না। আমাদিগকে পূর্ব্বে কখন এত অল্পদ্রব্যের জন্য এত অধিক মূল্য দিতে হয় নাই।

কেন্দ্রী সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ভারত রাষ্ট্রে শতকরা ৮০ জন অধিবাসী অল্লাধিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ভোগ করিতেছে। কিন্তু সমগ্র রাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিবেচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই?—শত ছাত্রের মধ্যে—

২৪ জন উপযুক্ত আহার পায়
৩৮ জন উপযুক্ত আহার পায় না
৩৮ জনের চিকিৎসা প্রয়োজন।

উপযুক্ত আহারের অভাবে স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য্য এবং স্বাস্থ্যহানিতে শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি অসম্ভব। খাদ্যের অভাব বা উপযুক্ত খাদ্য ক্রয়ের অর্থের অভাব আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির ক্ষতি করিয়াছে।

দেশে দুর্ভিক্ষ বলিতে বুঝায়—যে অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না বা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধিহেতু ধনী ব্যতীত আর কেহই তাহা ক্রয় করিতে পারে না। সুতরাং আমরা—এ দেশে, বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে—কয় বৎসর হইতেই দুর্ভিক্ষপীড়িত কি না, তাহা আর বলিতে হইবে না। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার সত্যই বলিয়াছেন—পূর্ব্বে কখনই এত লোককে এত অল্প দ্রব্যের জন্য এত অধিক মূল্য দিতে হয় নাই। তাহার অনিবার্য্য ফল—স্বাস্থ্যহানি—শারীরিক ও মানসিক অপুষ্টি, এক কথায় সর্ব্বনাশ।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান প্রধান-সচিব বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি গদীনসীন হইবার ২ দিনমাত্র পরে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতি মহিলারা শোভাযাত্রা করিয়া দপ্তরখানার সম্মুখে যাইয়া রেশনে খাদ্যোপকরণ হ্রাসের প্রতিবাদ করেন। তখন প্রধান-সচিব বলেন, প্রত্যেক লোকের প্রয়োজন ১৬ আউন্স খাদ্য। কিন্তু দুঃখের ও লজ্জার কথা দীর্ঘ ৪ বৎসর কাল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব থাকিয়া তিনি আজও প্রত্যেককে ১৬ আউন্স খাদ্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। তাঁহার যে সহসচিব স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ৩ বৎসর শয্যাগত—অফিসে যাইতে বা কাজ করিতে অক্ষম তিনিও নিয়মিত বেতন ও মোটর যানের "ভাতা" লইয়া লোকের কষ্টদত্ত অর্থের অপব্যয় করিতেছেন। বিদেশ হইতে জাহাজ ও নাবিক আনিয়া সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার পরীক্ষায় বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। কলিকাতার ভূগর্ভে রেলপথ রচনা সম্ভব কি না, তাহার পরীক্ষায় যেমন, কাঁথীতে লবণ প্রস্তুত করা যায় কি না তাহা পরীক্ষায়ও তেমনই বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগকে প্রভূত পারিশ্রমিক প্রদান করা হইয়াছে। চাকরীয়ার সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে—সুভাষচন্দ্রের আরব্ধ "মহাজাতি সদন" অসম্পূর্ণ রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু বহু অনাবশ্যক গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে; আর লোকের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হইলেই তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কি বলিতে হয় না—পশ্চিম বঙ্গের লোক যাহারা অনাহারে মরে নাই তাহারাও অন্নাভাবে মরণাহত? ছাত্রদিগের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন উপযুক্ত আহারের অভাবে পীড়িত এবং ৩৮ জনের চিকিৎসা প্রয়োজন! অবশ্য শেষোক্ত ৩৮ জনের চিকিৎসার জন্য আবশ্যক অর্থ ও পথ্যের সংস্থান নাই। কারণ, সবই দুর্ম্মূল্য—ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য—কখন এ দেশে এত লোককে এত অল্প দ্রব্যের জন্য এত অধিক মূল্য দিতে হয় নাই। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতীকারের আবশ্যক চেষ্টাও যে হইতেছে না, তাহা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

খাদ্যের অপচয়—

গত ২৪শে ডিসেম্বর (৮ই পৌষ) ভারত রাষ্ট্রের খাদ্য-মন্ত্রী বোম্বাই সহরে বলিয়াছেন—

কীটের ও বৃক্ষরোগের উপদ্রবে এ দেশে যে খাদ্য নষ্ট হয়। তাহার অর্দ্ধেক যদি নিবারিত হয়, তবে ভারতের খাদ্যাভাব থাকে না।

কারণ—বৎসরে ৯০ লক্ষ হইতে এক কোটি টন খাদ্য-শস্য ঐ কারণে নষ্ট হয়। শীতপ্রধান দেশসমূহে ঐ সকল উপদ্রবে খাদ্য-শস্যের শতকরা

২০ হইতে ৩০ ভাগ নষ্ট হয়; কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে অপচয়ের পরিমাণ অনেক অধিক।

খাদ্য-মন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্বের একান্ত অভাব। কিন্তু দীর্ঘ চার বৎসরেও যে ভারত সরকার এই অপচয়ের প্রতীকার করিতে পারেন নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। অনেকের বিশ্বাস, ভারত সরকারের ব্যবস্থার ত্রুটিতে অপচয় বাড়িয়াছে, কারণ, যেরূপ গুদামে—যে ভাবে তাঁহারা শস্য রক্ষা করেন, তাহাতে অপচয়-বৃদ্ধি অনিবার্য্য। এ দেশে—দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায়—কৃষক ও ব্যবসায়ীরা এবং গৃহস্থরা শস্য সঞ্চিত করিতেন, তাহাতে কীটের উপদ্রব অনেক পরিমাণে নিবারিত হইত। ভারত সরকার ইন্দুরের উপদ্রবশূন্য গুদামের ব্যবস্থাও করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গে কোন ভদ্রলোক গুদামে ইন্দুরের উপদ্রব নিবারণের এক উপায় আবিষ্কার করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাহা জানাইয়াছেন; কিন্তু সচিব হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের দ্বারস্থ হইয়াও তিনি তাঁহার উপায় পরীক্ষায় কাহাকেও সম্মত করিতে পারেন নাই! ইহার কারণ অবশ্য সহজেই অনুমেয়।

এ দেশে যে খাদ্য-শস্য নানাকারণে অপচয় হয়, তাহা সকলেই জানেন। মাত্র ২টি সুন্দালী সুমরী পোকা হইতে মার্চ্চ মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট ১২৮,০০০,০০০,০০০ পোকা উৎপন্ন হয়। অর্থণ্ডিত ভারতে যে কেবল একপ্রকার পোকার উপদ্রবে বৎসরে ৭৫ হাজার টন ধান্য ও লক্ষ টন চাউল নষ্ট হইত, সে হিসাব সরকারই দিয়াছিলেন।

এতদিনে ভারতের খাদ্য-মন্ত্রী স্বীকার করিতেছেন, ঐরূপ অপচয়ের অর্দ্ধেক নিবারিত হইলে ভারতে আর খাদ্যাভাব থাকে না। এখন জিজ্ঞাস্য, কেন এতদিনে ঐরূপ অপচয় নিবারণের আবশ্যক ব্যবস্থা হয় নাই?

যে উপলক্ষে মন্ত্রী মুন্সী ঐ উক্তি করিয়াছেন, তাহা—বোম্বাই বন্দরে ব্যাধিগ্রস্ত গাছ আমদানী নিবারণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন উপলক্ষে। বলা হইয়াছে, অপচয় নিবারণের উপায় আবশ্যক অর্থের ও লোকের অভাবে এতদিন প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। অথচ ভারতীয় দূতাবাসের ব্যয়ে কার্পণ্য করা হয় নাই; পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়াছে, কাজ করিতে অক্ষম, শয্যাশায়ী, পঙ্গু সচিবও যথারীতি বেতন ও মোটর গাড়ীর ভাতা পাইয়া আসিয়াছেন এবং বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন। দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রভৃতিতে ব্যয়-বৃদ্ধি, সার প্রস্তুত করিবার কারখানায় ঐ ব্যাপার, জীপ গাড়ী ক্রয়ে অপব্যয় প্রভৃতি বিবেচনা করিলে অর্থাভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং লোকের অভাব কেন ঘটে তাহা বলা দুষ্কর।

কীট-পতঙ্গের উপদ্রব নিবারণের জন্য ভারত সরকার এ পর্য্যন্ত কি কোন উল্লেখযোগ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে সে জন্য কে দায়ী? এ দেশে বৈজ্ঞানিকের অভাব নাই, তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহযোগ লইতে যে ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও জানা যায় না। বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনিয়া তাঁহারা ঐ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ যে অপব্যয়ের নামান্তর মাত্র তাহা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না। কিরূপ লোককে খাদ্য ও কৃষিবিভাগের ভার দেওয়া হয় ও হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর খাদ্য মন্ত্রীর কাথো বা উক্তিতে লোকের অভাব ঘুচিবে না।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আক্রমণ—

পূর্ব্ব পাকিস্তানের সরকার অথবা তাহার অধিবাসীরা যেন বিভক্ত বাঙ্গালার নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না; পরন্তু বার বার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে—পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগকে লুণ্ঠন করিতেছে—ইত্যাদি। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদিগের এই ব্যবহার সংপ্রতি জলপাইগুড়ী অঞ্চলে অধিক প্রবল ও ঘন ঘন হইতেছে। পূর্ব্বে শুনা যাইত, উত্তর পশ্চিম ভারতে সীমান্তস্থিত কতকগুলি জাতি (তাহারাও মুসলমান) পরদ্রব্যাপহরণ প্রয়াসে পররাষ্ট্রে প্রবেশ করিত। তাহাই তাহাদিগের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের—বিশেষ সীমান্তস্থিত অংশের মুসলমান অধিবাসীরা সেইরূপ কাজ করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, ভারত রাষ্ট্রের তোষণ নীতিই তাহাদিগকে এ সব কাজে সাহসী করিয়াছে। অর্থাৎ যদি ভারত সরকার অপরাধীদিগের সমুচিত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহাদিগকে বিচারের জন্য হিন্দুস্থানে দিবার দাবী করিতেন, আর সেই দাবী প্রত্যাখ্যাত হইলে যে পথ অবশিষ্ট থাকে সেই পথ অবলম্বন করিতেন, তবে কখনই এমন হইতে পারিত না।

ভারত সরকার মধ্যে মধ্যে বলেন, পাকিস্তান সরকার তথায় অমুসলমানদিগকে যদি নির্ব্বিঘ্নে ও সসম্মানে রাখিতে না পারেন, তবে তাঁহারা সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কেবল আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই এবং দুষ্কৃতকারীদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্যও করেন নাই। ইহাতে যে রাষ্ট্রের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ২২শে ডিসেম্বর (৬ই পৌষ) পাকিস্তানী পুলিস পুনরায় বেরুবাড়ী থানার নিকটে আটুপাড়ায় অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভারতীয় প্রহরীদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করিয়াছিল। জলপাইগুড়ীর ডেপুটী কমিশনার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে বলিয়াছিলেন, সীমান্তস্থিত যে পথে পাকিস্তানীরা এখন সময় সময় গুলী চালাইতেছে, তাহা দেশ-বিভাগের সময় হইতেই ভারত রাষ্ট্রের বলিয়া বিবেচিত ও স্বীকৃত। সীমা নির্দ্ধারণেও তাহাই স্থির হইয়াছে। অথচ পাকিস্তানীরা বলপূর্ব্বক ভারত রাষ্ট্রের ভূমি অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে।

ডেপুটীকমিশনার কখনই অসতর্ক উক্তি করেন নাই। সুতরাং যে স্থান ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পাক সরকারও স্বীকার করিয়াছেন, পাকিস্তানীরা যদি বলপূর্ব্বক তাহা অধিকার করিতে অগ্রসর হয়, তবে কি ভারত সরকার তাহা সহ্য করিয়া বসিবেন।—

"মেরেছ কলসীর কাণা,
তাই ব'লে কি প্রেম দিব না ?"

কাশ্মীরের যে অংশে পাকিস্তান অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, তাহা হইতে তাহারা বিতাড়িত হয় নাই। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী যেমন স্বাধিকার হইতে পাকিস্থানীদিগকে বিতাড়িত না করিয়া জাতিসঙ্ঘের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, এখন তেমনই অধিকৃত অংশ পাকিস্তানকে প্রদান করিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করিতেছেন। সে কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের বক্তব্য—সে পথে কখন স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না, পরন্তু তাহাতে লাভবানের লোভ বাড়িয়াই চলে।

এখনও কি ভারত সরকার পাকিস্তানের সহিত অধিবাসিবিনিময়ের প্রস্তাব করিতে পারেন না ? মিষ্টার জিন্না ত সেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

পাকিস্তানে ত্যক্ত মুসলমানাতিরিক্ত নরনারীর নির্বিঘ্নতা, অধিকার ও সম্মান সম্বন্ধে যদি ভারত রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব থাকে, তবে সরকারকে সে দায়িত্ব পালন করিতেই হইবে। আর পাকিস্তানীরা যদি ভারত রাষ্ট্রে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকার কি করিতেছেন, আজ—জলপাইগুড়ী ব্যাপারে—ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসীরা তাহাই ভারত সরকারকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। ভারত সরকার উত্তর দিবেন কি ?

সম্মিলন—

ইংরেজের শাসনকালে যেমন "বড়দিনের" ছুটীতে নানা সভা সমিতি সম্মিলন হইত, এখনও তেমনই হয়। এ বার নানা স্থানে নানা সম্মিলন হইয়াছে ও হইবে। জয়পুরে ঐতিহাসিক সম্মিলন, কলিকাতায় সমাজ-সেবক সম্মিলন, বিজ্ঞান সম্মিলন প্রভৃতি যেমন উল্লেখযোগ্য পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন তেমনই উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন আর হয় না ; তাহার স্থানও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন গ্রহণ করিয়াছে। এবার স্থির হইয়াছে, "প্রবাসী" কথাটি বর্জ্জিত হইবে।

পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে মূল সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত। অতুলবাবু চিন্তাশীল সাহিত্যিক এবং তাঁহার অবদান যদি অধিক না হইয়া থাকে, তথাপি তাহা যে মূল্যবান, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাটনায় তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সকল বর্ত্তমান সময়ের ও বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী। তিনি বলিয়াছেন :—

(১) "পূর্ব্বে পশ্চিমে খণ্ডাংশে ছিন্ন হ'লেও মহাদেশের মত প্রকাণ্ড দেশে আমরা এক মহারাষ্ট্র গড়ে তুলেছি,—বাইরের চাপে নয়, নিজেদের প্রয়োজনে ও ইচ্ছায়। এ মহাদেশের ঐক্য কি কেবল হ'বে—রাষ্ট্রীয় ঐক্য, শাসনসৌকর্য্যের ঐক্য—যা ইংরেজের আমলে ছিল। যদি তাই ঘটে তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক প্রকাণ্ড সম্ভাবনাকে আমরা ব্যর্থ করব। সে সম্ভাবনা হচ্ছে—বহু জাতির মিলনক্ষেত্র এই মহাদেশে জাতিতে জাতিতে যে মিল এই রাষ্ট্রীয় ও সাংসারিক প্রয়োজনের গণ্ডী

(২) "প্রতি ভাষার যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, প্রাচীন ও আধুনিক, অনুবাদের মাধ্যমে অন্য ভাষাভাষীর তা'র সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ দিতে হ'বে। পলিটিসিয়ানেরা স্থূল স্বার্থসিদ্ধির মোটা শিকলে জাতি থেকে জাতিকে দূরে রাখছে। সাহিত্যের সোনার সুতোয় তা'দের একত্র গাঁথতে হ'বে। আজ ভারতবর্ষের প্রয়োজন তা'র নানা ভাষায় সাহিত্যের সঙ্গে অপর ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য-রসিকদের পরিচয়। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সাধারণের মনে সমস্ত ভারতবাসীর উপর মমত্ববোধেই এই সাহিত্যিক আদান-প্রদান সম্ভব হ'তে পারে।"

প্রথম উক্তিতে আমরা যে pious wishএর পরিচয় পাই, তাহা কবির স্বপ্ন—বাস্তবে পরিণত হইলে সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু কতদিনে ও কিরূপে তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা বলা যায় না।

দ্বিতীয় উক্তি সাহিত্যের প্রতি মমত্ববোধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। গুপ্ত মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্ভব ও সার্থক করিবার উপায় তিনি নির্দ্দেশ করিবেন,—এ আশা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি পথের সন্ধান দেন নাই।

সকল প্রাদেশিক ভাষার যে পুষ্টিসাধন প্রয়োজন, তাহা লক্ষ্য করিয়া কাজ করিতে হইবে। ইংরেজ এ দেশে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার পথ বর্জ্জন করিয়া—রাজশক্তিতে—সে জন্য কেবল ইংরেজী ভাষার শরণ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, জাতীয় সরকার সেই অন্যায় বহাল রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে লর্ড ডাফরিণের সমীচীন উক্তি স্মরণীয়—

"Far more important than the acquisition of any foreign tongue in the art of skilfully handling your own."

ইংরেজীর জন্য আমাদিগের বিদেশী সরকার সে কথা মনে রাখেন নাই। আমাদিগের জাতীয় সরকার যদি হিন্দীর জন্য তাহাই করেন, তবে তাহা কখনই সঙ্গত হইবে না। বিশেষ ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে হিন্দী এখনও পরিপুষ্ট ও সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম হয় নাই।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন যদি বাঙ্গালার দাবী উত্থাপিত করেন, তবে তাহাতে কেবল বাঙ্গালার নহে—সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের উপকার হইবে।

মিশর—

মিশরের সহিত মীমাংসার চেষ্টা এখনও সফল হয় নাই। প্যারিসে যে আলোচনা সভা হইয়াছিল, তাহাতে বৃটেনের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী এন্থনী ইডেন প্রস্তাব করিয়াছিলেন—

(১) মিশর সরকার কতকগুলি বৃটিশ সামরিক পরামর্শদাতা প্রভৃতি গ্রহণ করিলে এবং শান্তির সময় যেমন—যুদ্ধকালেও তেমনই সামরিক ঘাঁটী রাখিতে দিতে সম্মত হইলে বৃটেন সুয়েজখাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সেনা অপসারণ নীতিতে সম্মত হইবেন।

(২) বৃটিশকে সুয়েজখাল অঞ্চল হইতে সেনাবল অপসারণ করিবার জন্য দুই বৎসর সময় দিতে হইবে ; কারণ, মিশরের গাজা অঞ্চলে

(৩) বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্ক মধ্যপ্রাচীর রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করিবেন, মিশর তাহাতে সম্মতি দিয়া সহযোগে প্রবৃত্ত হইবেন।

(৪) সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা অনুসারে গণভোটে সুদানের ভাগ্যনির্ণয়ের অধিকার সুদানবাসীদিগকে দিতে হইবে।

মিশরের 'আল মোকাটাম' পত্র এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, এই সকল সর্ত্তে মীমাংসা করিতে মিশর সরকার সম্মত হইতে পারেন না।

অনেকের বিশ্বাস, ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য হইয়া বৃটেন যেমন ভারতবর্ষ বিভক্ত—সুতরাং দুর্ব্বল—করিয়া গিয়াছে এবং ভারতে আপনার ব্যবসা প্রভৃতির স্বার্থ সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছে মিশরে তেমনই সুদান স্বতন্ত্র করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং গণভোটের কথা যেমন কাশ্মীরের সম্বন্ধে বলিতেছে তেমনই সুদান সম্বন্ধেও উত্থাপিত করিয়াছে। উভয় দেশেই চতুর ইংরেজ একই নীতি প্রযুক্ত করিয়া শ্বেতাঙ্গদিগের স্বার্থ যথাসম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পারস্য ও কোরিয়া—

পারস্যের অবস্থায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। পারস্য তাহার তৈল-সম্পদ জাতীয় করিয়াছেন এবং তাহাতে কাহারও কোন সঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু বৃটেন তাহাতেই আপত্তি করিয়াছে। তবে বৃটেন "যুদ্ধং দেহি" রব তুলিয়া সে পথে আর অগ্রসর হয় নাই, এখন মীমাংসার চেষ্টাই করিতেছে। মীমাংসা যদি উভয় পক্ষের সম্মতিতে—যুদ্ধ ব্যতীত—সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে তাহাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু বিদেশীর স্বার্থের জন্য কোন জাতিকে স্বীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করাইবার যে নীতি ইংরেজ ও আমেরিকান সরকার প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন জাতির জাগ্রত জনমত সহ্য করিতে পারে না।

কোরিয়ার যুদ্ধের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই—ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় রহিয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না; কারণ, যুদ্ধ চলিতেছে। যখন যুদ্ধবিরতি করিয়া মীমাংসায়ও উভয়পক্ষ একমত হইতে পারিতেছেন না, তখন মীমাংসার আশা যে সুদূরপরাহত, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। মূল কথা—কোরিয়ার যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ হইলেও তাহাতে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপই মীমাংসার পথ বিঘ্নবহুল করিতেছে—কারণ, বিদেশীদিগের স্বার্থ ও দেশবাসীর স্বার্থ কখন এক হইতে পারে না এবং এ ক্ষেত্রে মতবাদই মতান্তরের কারণ। সাম্রাজ্যবাদীরা ও ধনিকবাদীরা কম্যুনিজমের বিরোধিতাহেতু যে কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কাজেই বিবদমান একপক্ষ তাহাদিগের নিরপেক্ষতায় নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। সেই জন্যই মধ্যস্থতা সফল হইতেছে না—হইতে পারেও না।

কাশ্মীর—

কাশ্মীর-সমস্যা যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে। ইতোমধ্যে সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে মীমাংসার পথ রচিত হয় নাই। হয়ত প্রতিনিধি আবার আসিবেন এবং আসিয়া আবার রিপোর্ট রচনা করিবেন। যত দিন যাইবে, ততই কাশ্মীরের একাংশে পাকিস্তানের প্রভুত্ব দৃঢ় হইবে এবং তখন হয়ত সেই অবস্থা [illegible] বলিয়া ভারত সরকার স্বীকার করিয়া লইবেন এবং জাতিসমূহের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান তাহাতেই সম্মতি দিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতা চাহিয়াছিলেন। এখন তিনি বলিতেছেন, কাহারও ধমকীর ভয়ে ভারত রাষ্ট্র কাশ্মীর সম্বন্ধে তাহার নীতি পরিবর্ত্তন করিবে না। সে নীতি কি? সে নীতি কি তোষণনীতিই নহে?

গণভোটের মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারে না বটে, কিন্তু জনগণ যতদিন রাজনীতিক অবস্থা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতন না হয়, ততদিন গণভোটের উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনাই অধিক, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ যে দেশে বা প্রদেশে এবং যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মোন্মাদনার প্রভাব অনেক স্থলে বিচারবুদ্ধি বিকৃত করে সে স্থলে গণভোটে জাতির প্রকৃত মত—যে মত জাতির প্রকৃত স্বার্থের অনুকূল তাহা নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর। কাশ্মীরের অবস্থা বিবেচনা করিলে তথায় যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব প্রবল হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। যে সময় পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া তাহার একাংশে প্রবেশ করিয়াছিল, সে সময় গণভোট গৃহীত হইলে, তাহার ফল যেরূপ হইত, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হইবে কি না বলা যায় না। পাকিস্তানের প্রচারকার্য্যও যে প্রবল তাহা সত্য। সুতরাং গণভোটের ফল কি হইবে, বলা দুষ্কর।

নির্ব্বাচন—

ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পরে তাহার যে অংশ ভারতরাষ্ট্রে পরিণত হইয়া স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়াছে, তাহাতে, এতদিন পরে, প্রথম প্রাপ্ত-বয়স্ক গণভোটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইতেছে। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল ও কংগ্রেসের অভিন্নত্ব দেখাইবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে কেবল যে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি করা হইয়াছে, তাহাই নহে, পরন্তু তিনিই কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যে মন্ত্রীরা ও সচিবরা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইহাই দলগত প্রচারের স্বরূপ। নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালীর অবদান সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন—চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রধান সচিব যথাক্রমে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়—তিন জনই সুভাষচন্দ্রকে দেশত্যাগে বাধ্য করিতে সহায় হইয়াছিলেন। আজ কেন্দ্রী মন্ত্রিমণ্ডলে বাঙ্গালী মন্ত্রী নাই বলিলেই হয়, কারণ, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী—মন্ত্রীর পূর্ণ অধিকারে বঞ্চিত। প্রায় চারি বৎসরকাল কোন বাঙ্গালীকে বিদেশে রাষ্ট্রদূত করা হয় নাই। নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্যতীত—যখন

মিঃয়র আলফ আলীকে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর করিলে নির্ব্বাচনে পরাভবের সম্ভাবনা অনিবার্য্য তখন ব্যতীত—কোন বাঙ্গালীকে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর করা হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের যে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী নরনারী—হিন্দু হইলেও বাঙ্গালী—দেশ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ; সে দিনও কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে যে পাটগুদাম উদ্বাস্তু শিবির পরিণত করা হইয়াছে তথায় ১৫ দিনে ১২৪টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ বহু ব্যাপারে বাঙ্গালীর প্রতি ঈপ্সিত ব্যবহারের অভাব প্রকট হইয়াছে।

নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যে আসিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বজবজে "কোমাগাতামারু" জাহাজে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নিহত শিখদিগের স্মৃতিরক্ষার্থ রচিত স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতার বক্ষে যে "মহাজাতি সদন" অসম্পূর্ণ ও অব্যবহার্য্য থাকিয়া বাঙ্গালীর পীড়ার কারণ হইয়া আছে—কয় বৎসরে তাহা সম্পূর্ণ করা হয় নাই—পরন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা জনসাধারণের প্রতিনিধি সমিতির হস্ত হইতে, আইন করিয়া লইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে দারুণ অন্নাভাবে লোক জীবন্মৃত থাকিলেও যে জমীতে আশুধান্যের চাষ হইত, তাহার অনেকাংশে পাটের চাষ করাইয়া খাদ্যোপকরণের উৎপাদন হ্রাস করা হইয়াছে।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হয় নাই এবং সেগুলিকে হিন্দীভাষাভাষীতে পরিণত করিবার জন্য দ্রুত ও প্রবল চেষ্টা করা হইতেছে।

আমরা আসন্ন নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এই সকলের উল্লেখ করিলাম। কারণ, যে দলই কেন এই নির্ব্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করুন না—পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সন্তোষ রক্ষা করিয়া দেশের জনগণের সহযোগে প্রদেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই সকল অভিযোগের কারণ দূর করা প্রয়োজন—ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। প্রদেশের অধিবাসীরা যদি অসন্তুষ্ট থাকে এবং তাহাদিগের অসন্তোষের কারণ অসঙ্গত না হয়, তবে যে তাহাদিগের অসন্তোষের কারণ দূর করা জাতীয় সরকারের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন—যে দল রাজনীতিক প্রধান্য লাভ করিবেন সেই দলকেই তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ১৮ই পৌষ—১৩৫৮

বিলাতের নির্বাচন

শ্রীমতী শান্তি বসু

গত ২৫শে অক্টোবর বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্স সভার নির্বাচন হয়ে গেছে। বৎসরাধিক আগে আর একবার নির্বাচন হয়েছিল। আইনতঃ পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচন হবার কথা, তার মধ্যেও হতে পারে, যদি প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীমণ্ডলী ইচ্ছা করেন। মিঃ এটলী, শ্রমিক দলের নেতা ও ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী, এবারের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে বলেন যে, কমন্স সভায় গভর্ণমেন্টের সংখ্যাধিক্য এত কম যে কোনরূপ সুদূর ব্যাপী রাজনীতি অবলম্বন করা বা আইন প্রণয়ণ করা সম্ভব নয়, যেহেতু বিপক্ষ রক্ষণশীল দলের সংখ্যা শ্রমিক দলের সংখ্যার প্রায় সমান হওয়াতে জনসাধারণের মতামত তাদের সপক্ষে বা বিপক্ষে তা জানবার উপায় নেই। অনেকবার এমন হয়েছে যে ভোটে গভর্ণমেন্ট খুব সামান্যর জন্য বিপক্ষ দলের শক্তির কাছে জয়ী হতে পেরেছে। কমন্স সভার সভ্য সংখ্যা ৬২৫, কোন কোন বিষয়ে House of Commonsএর Divisionএ শ্রমিক দলের সংখ্যাধিক্য ছয়-সাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিঃ এটলীর এই পুন-নির্বাচনের সিদ্ধান্ত জনমত খুব সাহস ও রাজনীতিজ্ঞের কাজ বলে গ্রহণ করে। আইনতঃ তিনি সামান্য সংখ্যাধিক্য নিয়েই পুরো পাঁচ বৎসর শ্রমিকদলের পক্ষ হতে শাসনতন্ত্র চালাতে পারতেন।

কোনদিন নির্বাচন হবে তা ঘোষণা করা হয় তার প্রায় দেড়মাস আগে। বৃটিশ রাজনীতি ক্ষেত্রে এখন দুইটি প্রধান দল হচ্ছে রক্ষণশীল ও শ্রমিকদল। লিবারল্ বা উদারনীতি দলের সংখ্যা গত পার্লামেন্টে মাত্র নয়জন ছিল। সুতরাং ভোট যুদ্ধ পূর্বোক্ত দুই দলের মধ্যে। বৃটিশ নির্বাচনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় এই আমার প্রথম। প্রথম কয়েক দিন ভারি আশ্চর্য লেগেছিল, বিস্ময় যে কিছু দেখে বা শুনে তা নয়। ব্যাপারটা এত নিস্তব্ধ ও নিস্তেজ যে তাতে অবাক হতে হয়। রাস্তায় রাস্তায় "ভোট ফর, ভোট ফর" উল্লাসধ্বনি পথিক ও গৃহীকে সচকিত করে না। না আছে পোষ্টার, না আছে প্লাকার্ড, না আছে হ্যাণ্ডবিলের ছড়াছড়ি। কচিৎ, কদাচ এক আধটা পোষ্টার নজরে পড়েছিল, তাও আবার চেষ্টা করে খুঁজে বার করতে হয়। বৃটিশ রাজনীতি একটা সন্ধিক্ষণে এসেছে। ব্যক্তিতন্ত্র

বা সমাজতন্ত্র রাজনীতির মূলমন্ত্র হবে তা নিয়ে প্রধান দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই নির্বাচনের এত যে গুরুত্ব তা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে দুই দলের প্রকাশ্য সভায়, সংবাদপত্র ও পুস্তিকা দ্বারা। সভা সমিতিতে বক্তাদের প্রশ্ন দ্বারা বিব্রত করা ছাড়া আর কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্নমাত্র দেখলাম না। এটা আমার খুবই আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল। আর একটা ব্যাপারে খুবই আনন্দ উপভোগ করেছিলাম; নির্বাচন প্রসঙ্গে কার্টুন, কবিতা ও প্রবন্ধ যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল এ শুধু যে সকলের উপভোগ্য তা নয়; রাজনীতি দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও মনোমালিন্যও অনেকটা দূর করে। আমাদের দেশে এর অধিক প্রচলন প্রার্থনা করি।

নির্বাচনের দিন আরো নিস্তব্ধ মনে হোল। সেদিন বক্তৃতা একেবারেই ছিল না। ভোট কেন্দ্রে ভীড় নেই। কোন দলকে ভোট দিতে হবে তা কেউ বলে দেয় না। সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ভোট কেন্দ্র খোলা থাকে। নীরবে লোক আসে ও ভোট দিয়ে যায়। ভীড় হলে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়, কোনও গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা নেই; একটিমাত্র পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনেই হয় না যে এটা একটা ভোটকেন্দ্র।

এই নির্বাচনের ফলাফলে একটা বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন আসতে পারে। প্রধান দুই রাজনীতি দলের মতভেদ সমাজসাম্যবাদ নিয়ে; শ্রমিক দল এই সাম্যবাদের সমর্থন করেন। গত ছয় বৎসর শ্রমিক দলের শাসনে দেশের প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প, যথা Bank of England, কয়লা খনি, Electricity, Gas, এবং সর্ব শেষে লৌহ ও ইস্পাতের প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারী বা ব্যক্তি সমষ্টির হাত থেকে রাজশক্তির চালনায় এসেছে। রক্ষণশীল দল এই নীতির বিরোধী। তা ছাড়া শ্রমিক দল রাজসরকার থেকে অর্থানুকূল্যের দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের দাম কমানো এবং জনসাধারণের বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঔষধের ব্যবস্থা এবং দুস্থের আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি দ্বারা Welfare State বা জনকল্যাণকর রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করেন। শ্রমিক দলের প্রতি সভায় ও বহু বক্তৃতায় ভারতবর্ষের স্বাধীন হবার কথা শোনা গিয়েছিল। শ্রমিক দলের নেতারা বলেন, ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে শ্রমিক দল যে উদারতা ও দূরদৃষ্টিতা দেখিয়েছিলেন তার ফলেই আজ ভারত ও ইংরাজের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন হয়েছে ও রক্ষণশীল দল এই উদারনীতি অবলম্বন না করে ভারতকে সামরিক শক্তি দ্বারা দমন করতে চেষ্টা করতেন। রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ চার্চিল এর উত্তরে বলেন, তিনি দমন নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভারতকে ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ স্বাধীন হবার সুযোগ দিতেন।

নির্বাচনের একদিনের মধ্যেই ফলাফল জানা গেল। স্বাধীন ও উদারনীতি দলের পাঁচজন ছাড়া বাকী সভ্যের মধ্যে রক্ষণশীল দলের অল্প সংখ্যাধিক্য হওয়াতে মিঃ এটলী পদত্যাগ করেন ও তাঁর স্থলে মিঃ চার্চিল প্রধান মন্ত্রী হন। এই যে শাসনমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন হলো, এতে কোনরূপ গোলমাল, উত্তেজনা বা পরস্পরকে দোষারোপ করার বিশেষ কোনও আভাস পাওয়া গেল না। এটা আমার খুবই ভাল লেগেছিল এবং আশ্চর্য্য বলে মনে হয়েছিল।

দুটি প্রধান দলের মধ্যে ব্যবধান এত অল্প, তাতে বোঝা যায় যে দেশের মত দু দলের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রায় সমান। ১৯৫০ সালের নির্বাচনেও এই রকম হয়েছিল। এ থেকে অনেকে মনে করেন যে এ দেশের জনমত দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে—একটা ধনী ও আর্থিক অবস্থাপন্ন লোকের আর একটা শ্রমিক ও অপেক্ষাকৃত নির্ধন লোকের। দেশে যে এরূপভাবে দুটো জগতের—Disralli's Two World এর সৃষ্টি হচ্ছে সেটা খুব মঙ্গলের নয়—অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাই মনে করেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন আরম্ভ হয়েছে। প্রার্থনা করি এদেশের মতই বিনা উত্তেজনায়, বিনা গোলমালে ও শৃঙ্খলায় এবং সর্বশেষে কোনরূপ হাস্যরসের সৃষ্টি না করে, ভারতের নির্বাচনও যেন শেষ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার-এট-ল

(শ্রীমদ্ভাগবত হইতে)

(গোপী)

শঠের বন্ধু ষট্পদ যাও এসো না মোদের চরণ ছুঁতে,
সপত্নী-কুচ-বিলুলিত মালা-কুঙ্কুম তব ও শ্মশ্রুতে।
মধুপুরে আছে শত মানিনীরা তাদের প্রসাদ বহন কর,
যদু-পরিষদে উপহাস হেতু সেথা যাও, কেন চরণ ধর?

দূত ঠিকই বটে শঠ কপটের তুমি ষট্পদ মধুর লোভে,
ফুল-হ'তে ফুলে উড়ে উড়ে যাও
এ দৌত্যগিরি তোমাতে শোভে।
একবার শুধু সে অধর সুধা পান করাইয়া পরাণ বঁধু,
মধুপতি আজ নবরসরাজ কুব্জারে দেন অধর মধু!

পদ্মা আজিও সে পাদপদ্ম অম্লানমুখে করিছে সেবা,
তারে কি ভুলাল উত্তমঃশ্লোক মিথ্যা কথায়, কহিবে কেবা।
যদু অধিপতি আমাদের কাছে পুরাণো, নতুন মোটেই নয়,
আমাদের কাছে তাঁর গুণগান মিথ্যা তোমার সময় ক্ষয়!

বিজয়ী সখার সখীদের কাছে যাও গাও তাঁর শতেক গুণ
আলিঙ্গনেতে শান্ত যাদের উচু কুচতাপ তারা করুন—
তোমায় আদর অভীষ্ট দান, হায় তিনলোকে এমন কোন
কামিনী রয়েছে ইচ্ছামাত্র সে রসরাজের নয় আপন?

অতীব কিতব কপট হাস্য ভ্রূ বিলাসে তাঁর বিজলী হাসি,
কমলা স্বয়ং চরণসেবিকা আমরা তাঁহার অধম দাসী!
দীন দুখীদের অনুকম্পায় অহুদিন তিনি অতি উদার,
দীনের বন্ধু করুণাসিন্ধু উত্তমঃশ্লোক নামটি তাঁর।

শিরে পদ তুলি কেন অনুনয় চরণ নামাও হে চাটুকার,
মুকুন্দদূত, দৌত্য শিখেছ তাঁর কাছে বড় চমৎকার!

ইহ পরকাল পতি ও পুত্র সকলই ছেড়েছি তাঁহার লাগি,
তিনিই মোদের গেলেন ছাড়িয়া অস্থিরচেতা অনহুরাগী।

রামরূপে তিনি অতি নিষ্ঠুর ব্যাধের মতন বালি নিধন,
কামবশে তিনি স্ত্রীজিত, করেন শূর্পনখার নাসাচ্ছেদন।
বামনাবতারে ভোজন অন্তে বলিকে তিনিই বায়স প্রায়
বাঁধিয়াছিলেন, সে নিষ্ঠুরের নিয়ত সখ্য কেই বা চায়।

যাহার মধুর চরিতলীলার কাহিনী সতত শ্রবণ-সুধা,
পান করি তার পীযূষ কণিকা ভুলে যায় সবে ভবের ক্ষুধা।
অতি ধীর জন ও দ্বন্দ্ব ধরম রাগাদি সকল বিসর্জ্জিয়া,
ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল করে খগ সম নভ আলিঙ্গিয়া।

সর্ব্বনাশিনী অমৃত কাহিনী জেনেও সতত করি যে পান,
ব্যাধের গানের ফাঁদেতে পড়িয়া কত মৃগবধূ হারায় প্রাণ।
নিঠুর নখের আঘাত সহিয়া ফিরে ফিরে চাই পরশ তাঁর,
মদন ব্যথায় ব্যথিত হিয়ায় হে দূত,
সে সুধা ঢেলো না আর।

হে প্রিয়ের সখা, প্রিয় কি তোমায় পাঠাল হেথায় পুনর্ব্বার
তুমিই আমার পূজ্য, বল না কি আছে তোমার প্রার্থনার?
বিরহ যাঁহার অতীব অসহ তাঁহার সকাশে লইয়া চলো,
মধুপুরে তিনি আছেন অধুনা অথবা কোথায় আমায় বলো?

কমলা নিয়ত রয়েছেন বুকে সেথা যেতে সদা মন উতল,
ভুলেও কি তিনি সুধান কখন গোকুলের কথা চিরচপল?
তাঁর সখাসখী দাসীদের কথা কখনও তাঁহার স্মরণ হয়,
হায়! আর কবে এশিরে ধরিব অগুরুবাসিত ভুজদ্বয়?

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কংগ্রেস

ডক্টর সতীন্দ্রজীবন দাশগুপ্ত এম্-এস্-সি, ডি-ফিল্

গত ৯ই ডিসেম্বর জয়পুরে ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন স্বনামখ্যাত শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন মহোদয়। শ্রীযুক্ত সেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভেষজ-শিল্পের কর্ণধাররূপে যে বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, সেরূপ অভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি ইতিপূর্বে এই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত সেন এই অধিবেশনে যে সুচিন্তিত সারগর্ভ অভিভাষণ দিয়াছেন তাহা আমাদের দেশবাসীর বিশেষতঃ দেশীয় ভেষজ শিল্পে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রণিধানযোগ্য। প্রথমেই শ্রীযুক্ত সেন অতীতে ভারতের গৌরবময় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এবং ভেষজ শিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বের শেষে রাজশক্তির অবহেলায় এবং ইংরেজ রাজত্বে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রচলন হওয়ায় ভারতীয় ভেষজ শিল্পের অধঃপতন হয়। স্বাধীন ভারতকে পুনরায় ভেষজ শিল্পে উন্নত ও স্বাবলম্বী হইতে হইলে দেশবাসীকে কিরূপ দায়িত্বশীল ও সচেষ্ট হইতে হইবে শ্রীযুক্ত সেন তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন।

যে কয়েকটি প্রধান বিষয় তিনি আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতেছে :—ভৈষজ্য বিজ্ঞানীদের পদমর্যাদা এবং তাহাদের কর্তব্য, তাহাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, জাতীয় ভৈষজ্য উদ্ভিদশালা স্থাপন, ভেষজের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শক্তিমান নির্ণয়, ভেষজ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং ভেষজ শিল্পের উন্নতিকল্পে গবেষণা।

শ্রীযুক্ত সেন বলিয়াছেন যে, ভৈষজ্য বিজ্ঞানীদের সামাজিক ও আর্থিক পদমর্যাদা উচ্চ ডিগ্রীধারী চিকিৎসকের সমান হওয়া উচিত ; কারণ রোগীর চিকিৎসায় চিকিৎসকের যতখানি দায়িত্ব, যিনি ঔষধ প্রস্তুত করেন তাঁহারও ততখানি দায়িত্ব। ভেষজবিদ্‌দেরও সর্বাসাধ্য ঐ শাস্ত্রে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুশীলন করিতে হইবে। বিশেষত জৈব রসায়ন শাস্ত্রে তাহাদের উচ্চতর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। কারণ জৈব রসায়ন শাস্ত্রের সত্যিকারের উচ্চতর জ্ঞান ব্যতিরেকে কোনও ভেষজই, বিশেষতঃ বিভিন্ন Sulphadrugs, Atebrin, Paludrin, Entero-Vioform, Salvarson এবং Carbarsone জাতীয় আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ, wreastibamine প্রভৃতি অ্যান্টিমনি ঘটিত কালাজ্বরের ঔষধ, Sulphone বর্গীয় antileprosy drugs এবং penicillin, streptomycin, chloromycetin প্রভৃতি অতি মূল্যবান ঔষধাবলীর প্রস্তুতি এবং মান নির্ণয় আদৌ সম্ভব নয়। ভৈষজ্য বিজ্ঞানীদের কারখানায় হাতে কলমে কাজ করার মত মনোবৃত্তিও অর্জন করিতে হইবে, তদুপরি দৃঢ় চরিত্র এবং দেশের প্রতি মমত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণ আয়ত্ত করিতে হইবে।

আমেরিকার Bureau of plant industryর ন্যায় আমাদের দেশে একটি প্রতিষ্ঠান ও সেই সঙ্গে জাতীয় ভৈষজ্য উদ্ভিদশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে ভেষজ শিল্পের পক্ষে অপরিহার্য গাছগাছড়া উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ অবস্থায় সরবরাহ পাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে। উপযুক্ত মান সম্পন্ন কোনও উদ্ভিজ্জ ভেষজ তৈরী করিতে হইলে যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গাছগাছড়া দরকার তাহা তিনি ভালরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে Drug Act এবং Drug Rules বলবৎ হইয়াছে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, যাহাতে দেশবাসী উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু প্রতিটি ঔষধের শক্তিমান নির্ণয় যে কিরূপ উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক ব্যাপার এবং তজ্জন্য যে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানীর প্রয়োজন তাহা শ্রীযুক্ত সেন উল্লেখ করিয়াছেন। এর পর শ্রীযুক্ত সেন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বভাবতঃই অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ তাঁহার উপরেই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভেষজ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মভার ন্যস্ত। তিনি বলিয়াছেন, বর্তমান যুগে কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তাকে কেবল কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম অনুযায়ী কারখানা চালাইয়া গেলেই চলিবে না। তাঁহাকে দেখিতে হইবে, কি উপায়ে কারখানায় আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সর্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী প্রস্তুত করা যায়, উৎপন্ন সামগ্রীর ব্যয়ভার কি উপায়ে হ্রাস করা যায় এবং কি উপায়ে সর্বশ্রেণীর কর্মিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগীতা লাভ করা যায়। তাঁহাকে কারখানার প্রত্যেক বিভাগের খুঁটিনাটি ব্যাপার, প্রত্যেক কর্মচারীর সুবিধা অসুবিধা, তাঁহার নিজেকেই তৎপর হইয়া সংগ্রহ করিতে হইবে ; এ বিষয়ে তাঁহার পক্ষে কোনও চর বা অনুচরের উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে না। সর্বোপরি কারখানার প্রত্যেক কুশলী শিল্পীকে কারখানার মূল্যবান সম্পত্তির মত মনে করিতে হইবে, অপক্ষপাত দৃষ্টিতে গুণের মর্যাদা প্রদান হইবে তাঁহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইহা ব্যতীত কোনও প্রতিষ্ঠানই প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

সর্বশেষে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং ভেষজ শিল্পের উন্নতিকল্পে গবেষণার বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সেন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। অতীতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্র ছিল কিন্তু অনুশীলনের অভাবে এই শাস্ত্রের অনেক তথ্য এবং জ্ঞান বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশবাসীর এখনও এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপর গভীর বিশ্বাস বিদ্যমান। Sulphadrugs, antibioties প্রভৃতি তেজস্কর ঔষধ নির্বিচারে ব্যবহার না করিয়া আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ ব্যবহার ক্ষেত্র বিশেষে সমীচীন ও বেশী উপকারী বলিয়া অনেকের অভিমত। কিন্তু আজ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা যে অধঃপতিত অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহা হইতে ইহাকে উদ্ধার করিতে হইলে, শ্রীযুক্ত সেনের মতে বিরাট প্রচেষ্টায় এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে আধুনিকতম ও উচ্চতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বারা ইহার সংস্কার সাধন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বর্তমান যুগে কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাহা ঔষধ শিল্পই হউক বা অন্য কোনও শিল্পই হউক, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করিতে হইলে, গবেষণা অপরিহার্য। এখন দেশে জাতীয় ভেষজ গবেষণাগার স্থাপিত হওয়ায় দেশীয় ভেষজ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত সেন আশা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন, প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপন ও গবেষণা চালান কর্তব্য। এই গবেষণা যদি জাতীয় গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণাগার এবং অন্যান্য ভেষজ গবেষণাগার সমূহের সহযোগিতায় পরিচালনা করা যায় তাহা হইলে আমাদের দেশ অচিরে শিল্প বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

রবীন্দ্রকাব্যে জীবনাদর্শ

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করিবার পর জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন বারংবার জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক,—এই অনন্ত ভাব ও কল্পনা কি শুধু কতকগুলি ক্ষণলীয়মান হৃদয়োচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিমাত্র? এগুলি কি কেবলমাত্র কতকগুলি অস্থায়ী moodএর ব্যাপার? কোনো অনিবার্য ঐক্যের সূত্রে বিচ্ছিন্ন মণিগণের ন্যায় এগুলি কি গ্রথিত ও বিধৃত হইয়া নাই? কোনো সুস্পষ্ট জীবনাদর্শ কি কবির অজস্র শ্লোকরাশির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়া তাঁহার সমগ্র কাব্য-সৃষ্টিকে তাৎপর্য্যময় করিয়া তুলিতেছে না? এখানে একটু ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা। একথা মনে করিবার কারণ নাই যে, কোনো একটি বিশেষ জীবনাদর্শ প্রচার করিবার জন্যই কাব্যের সৃষ্টি। সে ক্ষেত্রে কাব্য হইয়া পড়ে নিতান্তই তত্ত্বাশ্রয়ী ও প্রচারধর্ম্মী। এরূপ কাব্যকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিতে পারা যায় না, কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, একটি বিরাট্ কবিমানস শুধু রস সৃষ্টি করিয়াই রিক্ত হইয়া পড়ে না। কৌতূহলী জীবন-জিজ্ঞাসু পাঠক তাহার নিকট রস সৃষ্টি প্রত্যাশা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতেই ক্ষান্ত ও তৃপ্ত হয় না—তদতিরিক্ত আরো কিছু প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কবি সহজাত অনুভূতি ও প্রজ্ঞা দৃষ্টির বলে জগৎ ও জীবনকে বিচিত্রভাবে উপলব্ধি করিয়া যে আদর্শের ইঙ্গিত করেন, জীবনপথের পথিকের নিকট তাহা অমূল্য পাথেয় স্বরূপ!

রবীন্দ্রকাব্য আমাদিগকে কোন্ পরম সম্পদ দান করিয়াছে—কেন তাহা আমাদের জীবন মনের পক্ষে রসায়ন স্বরূপ এ কথা অন্ততঃ আমাদের এই উদ্ভট ও চমকপ্রদ মতবাদের দিনে সশ্রদ্ধচিত্তে আলোচনার যোগ্য। ধুয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ভাববিহ্বল স্বপ্নলোকচারী রোমান্টিক-ধর্ম্মী কবি; বাস্তব জীবনের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, রবীন্দ্রকাব্যের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কম। সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'বাস্তব' বলিতে কি বুঝায় এ সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ। অথচ এই কথাটি বহু ভ্রান্তির, বহু তিক্ততার এবং বলিতে কি—বহু মূর্খোচিত কাণ্ড-জ্ঞানহীন উক্তির সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অমর শিল্প সৃষ্টির বিরুদ্ধে এই অভিযোগের উত্তর বিস্তৃতভাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে দিবার উপায় নাই। এখানে সংক্ষেপে শুধু ইহাই বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রকাব্য মানবীয় শিল্প-সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। তাহা, শুধু আমাদের 'বিলাসকলা কুতূহলে' তৃপ্তির সামগ্রী নয়। তাহার কুহরে কুহরে আমাদের জীবন মনের পরমৌষধি নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টি লইয়া জগৎ ও জীবনকে দেখিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র রসানুরঞ্জিত নয়; তাহার সহিত অলৌকিক প্রজ্ঞার সংমিশ্রণ প্রকৃতই মণিকাঞ্চন সংযোগ! তাঁহার কাব্যে যে জীবনাদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এই গভীর প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি হইতে সঞ্জাত। এবং এই জীবনাদর্শ তাঁহার কাব্য সৃষ্টিকে সূত্রের ন্যায় বিধৃত করিয়া তাহাকে তাৎপর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে ও তাহার অব্যর্থ পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

জীবন সম্বন্ধে কবি যত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই: অনন্তের পটভূমিকায় আমাদের এই শ্রান্ত, সঙ্কীর্ণ জীবনকে দেখিতে হইবে। অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত করিয়া সসীম জীবনকে দেখিতে গেলেই যত অনর্থের সূত্রপাত!

> দুঃখ সে ধরে দুঃখের রূপ,
> মৃত্যু সে হয় মৃত্যুর কূপ,—
>
> তোমারে ছাড়িয়া যখন কেবল আপনার পানে চাই।

আমাদের সুখ দুঃখ, আনন্দবেদনা, বিরহ মিলন প্রভৃতি ব্যাপারকে দেশকালপাত্রের মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু অসংখ্য জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া অনাদিকাল হইতে অনন্তের পথে যাহার যাত্রা, সেই শাশ্বত পথিকের চোখে ইহজীবনের বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিলে সৃষ্টির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ঐক্যের সন্ধান পাইলে—আমাদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে বিশাল বিশ্বসত্তার মধ্যে বিলীন করিয়া দিলে দুঃখ বেদনার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়,—তখন থাকে "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। আমাদের পুঁজি অল্প এবং তাই ক্ষতিও প্রচুর। সীমাবদ্ধ সঞ্চয় হইতে সামান্য অংশ-টুকু স্খলিত হইলে তাহাকেই আমরা 'মহতী বিনষ্টি' মনে করিয়া শিহরিয়া উঠি:

অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায় তাহা যায়। মৃত্যুর ন্যায় ভয়াবহ ব্যাপারকেও অসীমের দৃষ্টি কোণ হইতে দেখিলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকে না। নরনারীর বিরহ ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। ইহজীবনে দুইটি হৃদয়ের মধ্যে যে মিলন সংঘটিত হয় তাহাকে কেবলমাত্র ঐহিক পটভূমিকায় দেখিলে ভুল হইবে; তাহার নেপথ্য রচনার সূত্রটুকু জন্মজন্মান্তরের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে। অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হইতে যাহারা যুগলপ্রেমের স্রোতে ভাসিয়া ভুবনের ঘাটে মিলিত হইয়াছে, তাহাদের বিচ্ছেদ অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক ঘটনামাত্র। জীবনের অর্থ শুধু ইহজীবন নয়। সুতরাং "নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে" বিচ্ছিন্ন হৃদয় যুগলের মিলন অবশ্যম্ভাবী!

রবীন্দ্রকাব্যে আর একটি মহান্ জীবনাদর্শ—সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস। মন্দ, ভালো, দুঃখ, সুখ এ গুলিতো চিরন্তন জীবন সত্য। অতএব এগুলিকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। কবি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন:

> সত্যেরে লও সহজে।

ভগবানের দানকে বাছিয়া লইবার অধিকার আমাদের নাই। তিনি যাহা দেন তাহাই ভালো।

আমি বাছিয়া লব না তোমার দান,
তুমি যাহা দাও তাহা ভালো।

জীবনকে তাহার সমগ্রতার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইলে—শাশ্বত জীবনসত্তাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতে হইলে দুঃখ-বেদনা, আঘাত-সংঘাত প্রভৃতিকে এড়াইয়া গেলে চলিবে না। ইহারা আমাদের সুপ্ত, মোহগ্রস্ত হৃদয়কে উদ্বোধিত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে লইয়া যায়। অসাড় মানবহৃদয়কে বেদনার স্পর্শে ভগবান প্রবুদ্ধ করিয়া তোলেন।

রবীন্দ্রনাথের মত উদার মুক্তিমন্ত্রের এত বড় সাধক, এরূপ একনিষ্ঠ উপাসক আর কেহ আছে কিনা জানি না। নানাপ্রকার বন্ধন, নানাপ্রকার সংস্কারের নাগপাশে মানুষের জীবন আড়ষ্ট হইয়া আছে। দুঃখভয়, মৃত্যুভয়, রাজভয়, সমাজভয় প্রভৃতি নানারূপ ভয়ে বিশ্বমানব নিরন্তর সঙ্কুচিত। বহুবিধ কুসংস্কার, কুপ্রথায় জীবন সর্ব্বদা সমাকীর্ণ। এরূপ ভীত, নিশ্চেষ্ট, পঙ্গু কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন কবির স্পৃহনীয় নয়। তাই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন :

ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্য মর্য্যাদা গর্ব্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি, দূর করো।

বিশাল মরুচারী আরব বেদুইনের যে উচ্ছৃঙ্খল, অবজ্ঞিত, অবাধ জীবনযাত্রার আলেখ্য কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাকে বলিতে পারা যায় তাঁহার বন্ধন শূন্য সংস্কারমুক্ত জীবনের ভাবচিত্র।

যদি প্রশ্ন উঠে—রবীন্দ্রকাব্য পাঠের সব চেয়ে বড় লাভ কি? তবে এ কথার উত্তর—জীবনকে সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ ও গভীরভাবে ভালবাসিবার প্রেরণা। অবশ্য জীবন অনিত্য ; ইহার ত্রুটিও অসামঞ্জস্য অসংখ্য এবং ইহা অসম্পূর্ণ। কিন্তু তথাপি আমাদের এ জীবন বিধাতার মহাদান। ইহার অনন্ত ত্রুটি, অসামঞ্জস্য, অনিত্যতা ও অসম্পূর্ণতাই ইহাকে সুন্দর মধুর করিয়া তুলিয়াছে। তাই জীবনের প্রতি একটি নিবিড় ভালবাসা রবীন্দ্রকাব্যের সর্ব্বত্র উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির সমগ্র কাব্যসৃষ্টিকে যদি একটি ছন্দোময় জীবনস্তবগীতি আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

এই Spirit of thanksgiving, এই ধন্যোঽহং কৃতার্থোঽহং ভাব একটি উদাত্ত সামগীতির ন্যায় রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিটি ছন্দে অহরহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কবি দেখিয়াছেন—

ধরার প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত
বিরহ-মিলন কত অশ্রু-হাসিময়—

সুতরাং এ হেন পৃথিবীতে কবি মরিতে প্রস্তুত নহেন :

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

যে কারণে তিনি মরিতে প্রস্তুত নহেন, ঠিক্ সেই কারণেই কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা যে মুক্তি অর্জ্জন করিতে হয় তাহার জন্য তিনি লালায়িত নহেন। উচ্ছ্বসিত জীবনপ্রীতি ও সৌন্দর্য্য পিপাসা তাঁহাকে জীবন বিমুখ হইতে দেয় নাই।

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।

ভগবৎপ্রদত্ত এই অমৃতের আস্বাদ হইতে কবি বঞ্চিত হইতে চাহেন না—এমন কি মুক্তির বিনিময়েও নয়!

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত বড় জীবন-প্রেমিক কবি মৃত্যুর মত একটা ভয়াবহ ব্যাপারকে আদৌ গ্রাহ্য করেন নাই। এই "সুখে দুঃখে খচিত সংসার" তাঁহার নিকট—

মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত—একান্তই মম।

মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন এমন মধুর, সংসার এত মনোরম।

But oh, the reason why
I clasp them, is because they die.

কবি গাহিয়াছেন—

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী মূরতি।

এ যেন মধুরায়িত মৃত্যু—"মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান!" মৃত্যু যতই ভয়ঙ্কর হোক্ অমৃতের পুত্র মানুষ তাহার অপেক্ষা অনেক বড়। "আমি মৃত্যু চেয়ে বড়"—অনন্য বিশ্বাস লইয়া এরূপ তেজোদৃপ্ত উদাত্ত বাণী জগতের আর কোনো কবির কণ্ঠে উদীরিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই!

রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করিবার পূর্ব্বে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা কেবল শুধুই কথার গাঁথুনি নয়। একটা গভীর আস্তিক্যবুদ্ধি ও বলিষ্ঠ আশাবাদের উপর ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। জগৎ ও জীবনকে ঋষির প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও কবির রসানুরঞ্জিত দৃষ্টিতে দেখিবার ফলে ইহা একটা মহান আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও অনুপম সৌন্দর্য্যের দ্বারা অভিষিক্ত। ইহা আমাদের রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে এবং আমাদিগকে আশা, আনন্দ, উদ্দীপনা, অপ্রমত্ততা ও দুঃখ শোক মৃত্যুকে জয় করিবার মহামন্ত্র দান করিয়া সুন্দরের বন্দনা গীতি গাহিতে শিখাইয়াছে। ইহাতে যে সৌষম্যমণ্ডিত, সুবলয়িত বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা দেশকালপাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় ; তাহা বিশ্বমানবের চিরন্তন সামগ্রী!

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

—আপনি এখনো জেগে রয়েছেন দাদু ? দাঙ্গা চলিতেছে। কয়েকদিনই চলিয়া গিয়াছে। সেদিন গভীর রাত্রে অরুণা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল।

অরুণা বিনিদ্র হইয়াই ছিল, অকস্মাৎ বাহিরে কিছুর শব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া আলো জ্বালিতেই পাশের ঘর হইতে ন্যায়রত্ন বলিলেন,—ভয় নেই ভাই। কোন নিশাচর চতুষ্পদ শুকনো পাতার উপর ছুটে পালাচ্ছে। আজকের তাণ্ডবের রাত্রে মানুষ এলে তারা রব না-করে আসতো না। তাণ্ডবের ধর্ম্ম ই হ'ল উন্মত্ত উল্লাস।

বাহিরে জংসন শহরে দাঙ্গা চলিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত শাসক সম্প্রদায়—অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। লোকের ধারণা—এ অক্ষমতা অভিপ্রায় মূলক। তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান—এ দেশের লোককে বুঝাইতে চান—চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চান যে, বিবদমান এই দুই সম্প্রদায় একমাত্র তাঁহাদেরই সুশাসনে—এবং সুদৃঢ় ব্যবস্থার মধ্যে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিতে পারে। অন্যথায় হিংসা-দ্বেষে-জর্জ্জর জান্তব আবেগে পরস্পরের টুঁটী কামড়াইয়া দেশের মাটী রক্তাক্ত করিয়া দিয়া শ্মশান করিয়া তুলিবে।

দেবুদের দল শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। সে কথা থাক। কমিটী করিয়া—সমিতি গড়িয়া সভা ডাকিয়া—আপোষ করা যায়—রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহার নাম সন্ধি, মামলার ক্ষেত্রে তাহার নাম আপোষ মিটমাট ;—পঞ্চজন তাহাতে সাক্ষী থাকে—আদালত স্বাক্ষর শীলমোহর দেয় ; কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্ত্তন তাহাতে হয় না। সে বুঝাপড়া স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই তো—এই জংসনেই এইবার লইয়া এই দাঙ্গা কত বৎসর ধরিয়া ধূমায়মান—তাহার হিসাব সঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

এখানকার প্রাচীন লোকেরা বলে—যেদিন তুর্কীরা আসিয়া এদেশে জবর দখল গাড়িয়াছে সেইদিন হইতে। ইতিহাসের তারিখ দেখ—খুঁজিয়া পাইবে। শত শত বৎসর হইয়া গেল—এই অত্যাচার তাহারা সহ্য করিয়া আসিতেছে। ইহা কি সহ্য হয় ? ইহার একটা মীমাংসা প্রয়োজন !

ইরসাদ বলে—আরও, আরও অনেক কাল আগে হইতে। ইতিহাসে তাহার তারিখ সঠিক খুঁজিয়া পাইবে না। শত শত বৎসর কি—হাজার দুই হাজার বৎসর। যখন এই দেশে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়েরা আসিয়া জবর দখল গাড়িয়াছে সেই-দিন হইতে। শূন্য পুরাণ খুঁজিয়া দেখ,—দেখিতে পাইবে—এই পলিমাটির দেশের খাটী বাসিন্দারা—ওই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল—তখনই তুর্কীরা আসিয়া তাহাদের পরিত্রাণ করিয়াছিল। সেই পরিত্রাণের জন্যই তাহারা এই উদার ইসলামকে গ্রহণ করিয়াছিল। এ বিবাদের মোড় ফিরিয়াছে—ওই কাল হইতে। মীমাংসা বাকী আছে।

দেবুরা বলে—হিন্দু প্রবীণদের কথাটা নিতান্তই মাঝখানের কথা। ইসরাদের কথাটা আংশিক সত্য। আসল সত্যটা আজ চাপা পড়িয়াছে। সেটা হইল প্রাচীন ঝগড়া যাই থাক না—সেটা মিথ্যা হইয়া গিয়াছিল—উভয় পক্ষের চরম দুঃখের মধ্যে। ইংরাজ উভয় পক্ষকে কেনা বাঁদির মত আয়ত্তে আনিয়া দুই পক্ষের ঘাড়ে দুই পা রাখিয়া যেদিন হইতে পদসেবা লইতে সুরু করিয়াছিল সেই দিনই দুই পক্ষই বুঝিয়াছিল—বিবাদটা মিথ্যা। কিন্তু আজ আবার নূতন কৌশলে ইংরাজই আবার সেই ঝগড়াটা নূতন ফুৎকারে জাগাইয়া তুলিয়াছে। দুই স্ত্রীর স্বামী যাহারা তাহাদের এ কৌশলটা চিরকালের কৌশল। আদরের তারতম্য করিয়া—আজ ইহাকে সুয়োরাণী উহাকে দুয়োরাণী করার কৌশল। কেনা বাঁদীরাও এই

কৌশলে আসল দুঃখের সত্য ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষে জ্বলিয়া মরে।

আসল কথা যাহাই হউক—বিবাদটাই আজি সত্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম দিন রাত্রেই দেবকী সেন গুলিতে আহত হইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ফৈজুল্লা সাহেব মরিয়াছে, কিন্তু দুই পক্ষের নেতার অভাব হয় নাই। তাহাদের স্থান পূর্ণ হইয়াছে। ওদিক হইতে আসিয়া ফৈজুল্লার স্থান গ্রহণ করিয়াছে—দৌলত হাজির নাতি—হবিবর রহমান, তাহার পৃষ্ঠদেশে আছে ইরসাদ মোক্তার। এদিকে দেবকী সেনের স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে গৌর। তিনকড়ির ছেলে গৌর—তাহার পাশে আছে রামভল্লা। তাহাদের পৃষ্ঠদেশে আছে জীবন দত্ত—সুরজমল শেঠ, এমন কি প্রচ্ছন্নভাবে সুরপতিবাবুও আছে। থাকিবেই। মানুষের জীবনে যতকাল হিংসা আছে—ততকাল থাকিবে। ব্যক্তির জীবন শেষ হয়—কিন্তু তাহার জীবনের হিংসার অন্ত হয় না। সে হিংসা সঞ্চারিত হয় উত্তর পুরুষের জীবনে। সঞ্চারিত—পার্শ্ববর্তীর জীবনে।

মধ্যে মধ্যে শুধু এক আধজন নলিন আসে,—তাহারাই মরিবার সময় কোন হিংসাকে রাখিয়া যায় না। তাহাদের উত্তরাধিকারীও থাকে না। পৃথিবীতে তাহারা অকাজের কাজী। গান করে, ছবি আঁকে, পুতুল গড়ে।

এই কথাগুলিই অরুণা মনে মনে ভাবিতেছিল।

দাঙ্গার দ্বিতীয় দিন সকালেই গৌর জয়তারা আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—সারা বাজারে সে ঘুরিতেছে। তাহার মধ্যে অকস্মাৎ যেন দেখুড়িয়া গ্রামের দুর্দ্ধর্ষ তিনকড়ি মণ্ডল জাগিয়া উঠিয়াছে। রামভল্লা তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে। বলিয়াছে ওরে—তোকে দেখে আমার যে তিনুদাদাকে মনে পড়ছে রে!

দেবু তাহাকে নিরস্ত করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু দেবুকে সে এক কথায় বলিয়া দিয়াছে—না।

বার বার দেবু তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু প্রতিবারই গৌর ওই একই উত্তর দিল—না। শেষবার সে এমন হাঁক মারিয়া 'না' কথাটা উচ্চারণ করিল যে দেবু চমকিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে গৌরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

গৌর রামকে বলিল—জয়তারার আশ্রম রাখবার লোক চাই রাম কাকা। দেবকী দাদা আমাকে ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার তো ওখানে থাকলে চলবে না। কাকে পাঠাবে বল দেখি?

রাম গৌরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কাকে পাঠাব বাবা? রামের দল তো অনেকদিন ভেঙে গিয়েছে!

—তা-হলে?

একটু ভাবিয়া রাম বলিল—বলিস তো আমি যাই। এ দিকে ভদ্রলোকের দলে আমার সুবিধেও হবে না। ওদের ওই লোহার ডাণ্ডাবাজী—ছোরা—বোম পটকা—ওসবও আমি বুঝি না। আর বন্দেমাতরমেও আমার ধাত গরম হয় না। তুই বুঝিস, ও সব ছোকরাদের নিয়ে তুই যা হয় কর। আমি যাই জয়তারা মায়ের থানে—জয়-তারা জয়-কালী বলে লাঠী ধরে বসি। যদি মরি—মায়ের থানে মরব। ড্যাং ডেঙিয়ে স্বগ্‌গে চলে যাব। সতীশ বাউড়ীকে যদি পাই—দেখুড়েতে খবর একটা পাঠাব;—ভল্লাদের যে দু চারজন আছে—আনিয়ে নোব। বুঝলি!

সেই ব্যবস্থাই হইয়াছে। রাম ভল্লা লাঠী হাতে জয়তারা আশ্রমে আসিয়া বসিয়াছে। সন্ধ্যা নাগাদ দেখুড়িয়া শিবকালীপুর হইতে আরও জন কয়েক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ন্যায়রত্ন বিচলিত হইয়াছেন কি হন নাই এ কথা বুঝা যায় না। নিয়মিত কার্য্যসূচী যথা নিয়মে পালন করিয়া চলিয়াছেন। অরুণা কয়েকবারই এ কথা তুলিয়াছিল, ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন—চিন্তা ক'রে কি করবে ভাই? আমার সামর্থ্য গিয়েছে—কি করব, স্থির হয়ে যা ঘটবে—যা অনিবার্য্য তারই প্রতীক্ষা করতে হবে। তোমার সামর্থ্য তুমি জান। তবে যদি চিত্ত তোমার উতলা হয়—তা' হ'লে—তোমার নিরাপদ স্থানে যাওয়াই ভাল।

দেবকী সেনের আহত হওয়ার সংবাদ, নলিনের মৃত্যু সংবাদও শুনিয়াছেন। বলিয়াছেন—সেন তো এরই জন্যে সাধনা করেছে, তার কর্ম্মের—তার কামনার এই অনিবার্য্য পরিণতি; শুধু নলিন বেচারীই গেল অহেতুক!

কথাগুলি যেন হিম শীতল। এতটুকু আবেগ নাই, আসক্তি নাই শুধুই যেন যন্ত্রের মত উচ্চারণ করিয়া গেলেন। অরুণা আর কথা বাড়ায় নাই। নীরবে আপনার কাজ করিয়া চলিয়াছিল। কাজ—বলিতে ন্যায়রত্নেরই সেবা

পরিচর্য্যা। একটা ভাবনা তাঁহার বুকের মধ্যে অহরহ কম্পন তুলিয়া চলিয়াছে ;—অজয়— ; অজয়ের যে খালাস পাওয়ার কথা ; সে যদি খালাস পায়! সে যদি আসে! কিন্তু এই বৃদ্ধের সম্মুখে সে কথা তুলিতে সাহস করে নাই। কে জানে—হয়তো ওই নামটি উচ্চারণ করিবামাত্র ওই বৃদ্ধের আজন্ম তপস্যায় সঞ্চয় করা এই স্থৈর্য্যের আবরণ খসিয়া পড়িবে, মমতা কাতর মনুষ্য হৃদয় অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া জয়তারা আশ্রমের এই আরণ্য পরিবেশের শান্ত স্তব্ধতা ভাঙিয়া—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে উপস্থিত হইবেন একান্ত অসহায় মানুষের মত। সে হইলে ন্যায়রত্নের যেমন এবং যত লজ্জাই হোক না কেন—তাঁহার সাধনা তাঁহার বিশ্বাস একান্ত ভাবে মূল্যহীন হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ুক না কেন—অরুণার লজ্জার তুলনায় সে কতটুকু? বিজ্ঞান ও বাস্তববাদের পথ হইতে ঘুরিয়া যে পথে সে মোড় ফিরিল—সে পথ যে এই ভূমিকম্পে ধ্বসিয়া অতল গহ্বরের মহাশূন্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। তখন যে ওই গহ্বরে ঝাঁপ দিয়া নিজেকে শেষ করিয়া দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকিবে না।

সন্ধ্যার সময় কিন্তু কথা তুলিলেন ন্যায়রত্ন নিজেই। বলিলেন—অজয়ের তো মুক্তির দিন আজ কালেই। না?

অরুণার মুহূর্ত্তে মনে হইল—পায়ের তলার মাটী যেন সরিয়া যাইতেছে—গহ্বরটা সৃষ্টি হইতে সুরু করিয়াছে।

—অরুণা দিদি! ন্যায়রত্ন আবার ডাকিলেন।

—এ্যাঁ! কোন মতে অরুণা উত্তর দিল।

—অজয়ের মুক্তির কথা বলছিলাম।

—হ্যাঁ—আজই তো আসবার কথা।

—এলে তো সকালের ট্রেণেই আসত।

—হ্যাঁ। সাধারণত—সকালেই ছাড়া পেয়ে থাকে বন্দীরা।

ন্যায়রত্ন আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। নীরবে জয়তারা আশ্রমের অরণ্য শোভার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পল্লবে পল্লবে অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিতেছে, কোটী কীট পতঙ্গের সম্মিলিত ধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। মন্দিরের সম্মুখের মুক্ত অঙ্গনটুকুর ঊর্দ্ধে একটুকরা আকাশ দেখা যায় শুধু; সেখানে থরে থরে বিকশিত হইয়া উঠিতে জ্যোতির্লোক। মাটী হইতে আকাশের ওই জ্যোতির্লোক পর্য্যন্ত যেন আলোক সংকেতে একটা কানাকানি চলিতেছে।

অরুণা আর থাকিতে পারিল না, সে তাহার ধৈর্য্যের শেষ সীমায় বোধ করি উপনীত হইয়াছিল। সে অকস্মাৎ ন্যায়রত্নের পায়ে হাত দিয়া বলিল—দাদু কি হবে?

—কি হবে? অজয়ের উপর সব নির্ভর করছে ভাই। সে যদি মুক্তি পেয়ে চলে এসে থাকে—তবে—তার এখানে এসে অনেক আগে পৌছানো উচিত ছিল। তা যখন আসে নি তা-হলে—। তা হলে বিপদ ঘটেছে।

—দাদু! চীৎকার করিয়া উঠিল অরুণা।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—উতলা হয়ো না ভাই!

—তাই কি ঘটেছে? আপনি জেনেছেন?

—না-ভাই—তা' জানব কি করে?

—না—আপনি জানতে পারেন। আমাকে লুকোচ্ছেন আপনি। দাদু!

—না ভাই। কিছু জানতে পারি না। এত কালের সাধনায় পারি শুধু ধৈর্য্য ধরে থাকতে। অনিবার্য্যকে সহ্য করতে। শোকাশ্রুকে সম্বরণ করতে। আনন্দ বিহ্বলতাকে দূরে রাখতে। জানি না কিছু। অনুমান করছি মাত্র। আমার অনুমান—তাকে এই সময়ে মুক্তি দেবে না। সে যে পুলিশ কর্ম্মচারীকে হত্যা করতে গিয়েছিল—সে মুসলমান, তোমার অপমান করেছিল বলেই সে তাকে হত্যা করতে গিয়েছিল। এই হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় তাকে কি মুক্তি দিতে পারে?

অরুণা শান্ত হইল কিন্তু চোখে তাহার ঘুম আসিল না।

হঠাৎ গভীর রাত্রে ঘরের পিছনে পাতার উপর পদশব্দ শুনিয়া—চকিত হইয়া আলো জ্বালিল। পাশের ঘরে ন্যায়রত্ন শুইয়া ছিলেন, মাঝখানের দরজাটা বন্ধ ছিল না ভেজানো ছিল, দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়া দীর্ঘ রেখায় ও ঘরে আলোক রেখা গিয়া পড়িতেই ন্যায়রত্ন বলিলেন—ভয় নেই ভাই। কোন নিশাচর চতুষ্পদ—শুকনো পাতার উপর ছুটে পালাচ্ছে। আজকের তাণ্ডবের রাত্রে মানুষ এলে তারা রব না করে আসত না! তাণ্ডবের ধর্ম্মই হ'ল উন্মত্ত উল্লাস।

অরুণা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—আপনি এখনো জেগে রয়েছেন দাদু?

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

গত ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্সী কলেজে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সপ্তাহকালব্যাপী ৩৯তম অধিবেশনে—নির্বাচন সফরে কলিকাতাগত ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু উপস্থিত ছিলেন এবং এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসারের ফলে বিজ্ঞান ও মানুষের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা লুপ্ত করিয়া মানুষের অন্তপ্রকৃতির অনুশীলন বৈজ্ঞানিকগণকেই করিতে হইবে। অভিভাষণ প্রসঙ্গে অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ জে এন মুখার্জী বলেন, শিল্প ও কৃষিজাত উৎপাদনের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান এবং যন্ত্র বিদ্যাকে কেমন করিয়া সুষ্ঠুতর কাজে লাগান যায়, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তাহা চিন্তা করিতে হইবে।—ভারত ও বিদেশের প্রায় ছয় শত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি-হিসাবে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন এবং প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জ্ঞাপন করেন।

বাংলাভাষা-উচ্ছেদ প্রচেষ্টা—

বিহার সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ; উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগে বিহার পাব্লিক সার্ভিস কমিশন প্রার্থীগণের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। আগামী ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সর্বপ্রথম এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। উক্ত পরীক্ষায় নির্ধারিত বিষয়বস্তসমূহ বিশেষ দ্রষ্টব্য। তাহা এইরূপ :—'এ' শ্রেণীর বিষয়গুলির মধ্যে প্রার্থী নিম্নলিখিত যে কোন একটি অথবা দুইটি বিষয় গ্রহণ করিতে পারে: (১) হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য, (২) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, (৩) উর্দু ভাষা ও সাহিত্য, (৪) আরবি ভাষা ও সাহিত্য, (৫) ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য। এই বিষয় নির্বাচন তালিকায় বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হইয়াছে, কিন্তু কেন, তাহা দুর্বোধ্য। অথচ সমুদয় ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, সুন্দর ও সরল। ইহা সকলেই স্বীকার করেন। অধিকন্তু বিহারে বাংলাভাষীর সংখ্যা অনেক এবং সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তাঁহাদের স্থান উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা ঐ প্রদেশে দীর্ঘদিন ধরিয়া শিক্ষা কৃষ্টি ও চাকুরির ক্ষেত্রে নানাবিধ কার্যে নিযুক্ত আছেন। গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশের সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিবেন ইহাই আশা করা যায়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনা করা এবং বিহার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিষয় তালিকাভুক্ত করিয়া বাংলা ভাষাভাষী সংখ্যালঘুর প্রতি কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় প্রদর্শন একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

আড়িয়াদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে শ্রীশিশিরকুমার গুপ্ত

ফটো—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

লিবিয়ার স্বাধীনতা—

গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৫১) উত্তর আফ্রিকার লিবিয় দেশ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। বিগত ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ১৯৫২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখের পূর্বেই লিবিয়াকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে

বে। ২৪শে ডিসেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লিবিয়ার শাসনক্ষমতা পরিত্যাগ উক্ত প্রস্তাবেরই শেষ পরিণতি। একটা জাতির পরাধীনতা যে কতদূর মারাত্মক আমরা ভারতবাসী তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং স্বাধীন ভারত জগতের যেখানে যত দেশ অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে তাহাদের প্রত্যেকের মুক্তি সর্বান্তঃকরণে কামনা করে।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের মরদেহ লইয়া শোকযাত্রার পূর্বে ব্যারাকপুরের বাসভবনে ভক্তগণ কর্তৃক মাল্যদান ফটো—পান্নালাল সেন

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে (মূল) পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ...তম অধিবেশন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে এবার "প্রবাসী" শব্দটি সম্মেলনের নাম হইতে সর্বসম্মতিক্রমে বর্জিত হইয়াছে। এখন হইতে এই সম্মেলন নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নামে অভিহিত হইবে। পুরুষানুক্রমে যাঁহারা বাংলার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছেন এবং সেই সব স্থানের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন, তথাকার সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক জীবনের সহিত নিজেদের জড়াইয়া ফেলিয়াছেন—তাঁহারা অকারণ নিজেদের নামের সহিত প্রবাসী শব্দটি জুড়িয়া দিতে নিশ্চয় ক্ষুব্ধ হইবেন। এই শব্দটির মধ্যে একটি পৃথকীকরণের মনস্তত্ত্ব নিহিত আছে যাহা স্বাধীন ভারতের সাধারণতান্ত্রিক কাঠামোতে অত্যন্ত বেমানান। ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড, ভারতবাসীও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত এক রাষ্ট্রজাতি—এ অবস্থায় কোন প্রদেশবাসীই কোন প্রদেশে গিয়া বসতি স্থাপন করিলে 'প্রবাসী' রূপে চিহ্নিত হইতে পারেন না। শুধু সাহিত্য সম্মেলনে নয় জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও আমাদের সত্যকার সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণতা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এই ব্যাপারে অগ্রবর্তী হইয়া ও পথ নির্দেশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

"গৌরীশঙ্কর"—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সদ্য সমাপ্ত পাটনা অধিবেশনের অপর একটি প্রস্তাবে হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ার নাম পরিবর্তনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে। ইংরাজ আমলে উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল এভারেষ্ট

শৃঙ্গ। কারণ প্রচার ছিল এভারেষ্ট সাহেবই উহার আবিষ্কর্তা ছিলেন। কিন্তু পরে প্রমাণ বলে জানা গিয়াছে, উহার আবিষ্কর্তা এভারেষ্ট সাহেব নহেন—একজন ভারতীয় এবং তিনি বাঙালী। তাঁহার নাম পরলোকগত রাধানাথ সিকদার। সাহিত্য সম্মেলন এই কারণে ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন যে, 'মাউণ্ট এভারেষ্টের' নাম বদলাইয়া 'রাধানাথ শৃঙ্গ' করা হউক। কোনও একটি বিশিষ্ট পত্রিকা এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গের নূতন নামকরণ যদি প্রয়োজনই হইয়া থাকে তবে তাহাকে আর কোনও মানুষের নামের সহিত সংযুক্ত না করাই ভালো। যে পর্ব্বত গৌরী এবং শঙ্করের তপস্যার ক্ষেত্র বলিয়া পরম পবিত্র তাহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম 'গৌরীশঙ্কর' হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরাও ইহার সহিত একমত।

সাফল্যের পথে নয়া চীন—

সম্প্রতি ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল চীন পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। উক্ত দলের একজন সদস্য এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে, নয়া চীনে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব এখনো বজায় আছে। বর্ত্তমান চীনা সরকারের আমলে চীন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। খাদ্যের ব্যাপারে চীন আজ বাড়তি দেশে পরিণত হইয়াছে। তুলা ও শিল্পের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গিয়াছে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীনের লাভ হইয়াছে। চীনার ৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪১ কোটি লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। খাদ্যাভাবে জর্জ্জরিত পরমুখাপেক্ষী আমাদের ভারতবর্ষ কবে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে!

জগত্তারিণী পদক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার ১৯৫১ সালের জগত্তারিণী পদক খ্যাতনামা প্রাচীন কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। কবির এই সম্মান লাভে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ও পরামর্শ লাভ করিয়া যে কয়জন কবি ও সাহিত্যিক সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন কবি করুণানিধান তাঁহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু কবির সঙ্গীরা সকলেই একে একে বিদায় লইয়াছেন, একমাত্র ইনিই এখনো আমাদের মধ্যে আছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি ইনি আরো দীর্ঘদিন সুস্থদেহে আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন।

লীলা স্মৃতি পুরস্কার—

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সমাবর্ত্তনে শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যকে 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

সাহিত্যের বিকাশ' শীর্ষক দশ সহস্রাধিক শব্দে লিখিত প্রবন্ধের জন্য ১৯৫১ সালের "লীলা স্মৃতি" পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রীভট্টাচার্যই সর্বপ্রথম উক্ত পুরস্কার একাধিকবার লাভ করিলেন। ১৯৪৯ সালের সমাবর্ত্তনেও শ্রীভট্টাচার্য ঐ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

পরলোকে অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা অনিল রায়—

বাংলা দেশের অগ্নিযুগের খ্যাতনামা নেতা এবং পরে সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা অনিল রায় সোমবার

৭ই জানুয়ারী প্রত্যুষে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সমূহের অন্তর্গত প্রিন্স অব ওয়েলস্ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। দুরন্ত আন্ত্রিক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি গত ২৬শে ডিসেম্বর অস্ত্রোপচারের জন্ম বিশিষ্ট সার্জেন ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জির চিকিৎসাধীনে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু অস্ত্রোপচারে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা না থাকায় আর অস্ত্রোপচার হয় নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা লীলা রায়, ছোট ভাই শ্রীঅমল রায় এবং দুই জন ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতার নূতন শেরিফ্—

কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী এ বৎসর কলিকাতার শেরিফ্ নিযুক্ত হইয়াছেন। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র

মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার রাজবাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ স্কুল ও কৃষ্ণনাথ কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ খৃঃ হইতে একাদিক্রমে তিনবার ইনি বহরমপুর পৌরসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং তদবধি ইনি উক্ত পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। মহারাজার চরিত্রে আভিজাত্যের অহঙ্কার নাই, তাঁহার চরিত্রবত্তা ও অমায়িক স্বভাবের গুণে তিনি সর্ব্বজন প্রিয়। আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

লর্ড লিনলিথ্গো—

বৃটিশ শাসিত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বড়লাট লর্ড লিন্লিথ্গো ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েকটি কারণে তাঁহার নাম পরাধীন ভারতের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ন্যায় সুদীর্ঘদিন শাসন কার্য পরিচালনা করা অনেক বড়লাটের ভাগ্যেই ঘটে নাই। তিনি একটানা সাড়ে সাতবৎসর ভারতের বড়লাট ছিলেন। অধিকন্তু এই সময়ের মধ্যে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যে সকল ঘটনা ভারতে ঘটিয়াছে তাহা লর্ড লিনলিথগোর পূর্ববর্ত্তী অনেক বড়লাটের সময়েই পাওয়া যায় না। ক্রিপস্ মিশন, কংগ্রেসের দ্বারা বৃটিশের বিরুদ্ধে ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন এবং ১৯৪৩ সালের বাংলার মন্বন্তর, ইত্যাদি ঘটনা লর্ড লিনলিথ্গোর আমলের। ভারতের বড়লাট হইবার পূর্বে ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় পার্লামেণ্টারী কমিটির তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইন ভারতে পুরাপুরি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের অংশ যথা সম্ভব সাফল্যের সহিত কার্যে প্রয়োগ করার দায়িত্ব তাঁহারই। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা আদায় করিবার জন্য এবং ১৯৪২ সালে কংগ্রেস প্রবর্তিত স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়া লর্ড লিনলিথগো বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অবিস্মরণীয় উপকার করিয়াছিলেন। মোটের উপর লর্ড লিনলিথগোর মৃত্যুতে একজন বিশেষ শক্তিশালী বৃটিশ রাজনীতিক নেতার তিরোভাব ঘটিল।

ফাল্গুন—১৩৫৮

দ্বিতীয় খণ্ড | উনচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্যের লক্ষণ ও উদ্দেশ্য*

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রথমতঃ, সাহিত্যিক 'কবি', দ্রষ্টা বা প্রজ্ঞাবান্। ভারতের ভাষাতত্ত্বগ্রন্থ "নিঘণ্টু"র মতে, "কবিঃ মেধাবী ইতি" (নিঘণ্টুকোশ ৩-১৫)। অর্থাৎ যিনি মেধাবী বা প্রজ্ঞাশীল, তিনিই কবি। "নিঘণ্টুর" ভাষ্যকার "নিরুক্ত"-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ শব্দতত্ত্ববিদ্ 'যাস্কের' মতে, "কবি" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থঃ "কবিঃ ক্রান্তদর্শনো ভবতি, কবতের্বা। প্রসূবতি ভদ্রং দ্বিপদেভ্যশ্চ চতুষ্পাদেভ্যশ্চ" (নিরুক্ত ১২-১৩)। অর্থাৎ, যিনি সকল দর্শনশাস্ত্র অতিক্রম করেছেন, অথবা স্তুতিগান করেন, তিনিই "কবি"; তিনিই সকলের, জীবজন্তুদের পর্যন্ত, সুখ ও মঙ্গলের কারণ। প্রখ্যাত অভিধানকার অমরু "কবি" শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন:

"বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদঃ বুধঃ।
ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ।"

অর্থাৎ, বিদ্বান্, সুধী, ধীর, মনীষী, প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিই "কবি"। এরূপে যিনি তত্ত্বদর্শী, অর্থাৎ, সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা দর্শন করেছেন এবং সেই নিগূঢ় অনুভূতিকে সুললিত, মর্মস্পর্শী, উদ্দীপনাময় ছন্দে প্রকাশ করেছেন—তিনিই সংস্কৃত-সাহিত্যে "কবি" রূপে সম্মানিত হয়েছেন।

এই "কবি" শব্দের অর্থই "সাহিত্যিক"। এরূপ, সার্বজনীন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলে, সাহিত্যিক কঠোর বাস্তবের মধ্যেও আদর্শ, পার্থিব জগতের মধ্যেও অপার্থিব ভাব, ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও এক ভূমা মহান্‌কে দর্শন করে

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের (পাটনা) মহিলা-শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণের একাংশ

ধন্য হন, অপরকেও ধন্য করেন। তিনি সত্যই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন :—

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হো'ক অবহেলা,
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে" (রবীন্দ্রনাথ)

এই মহিমময়ী উপলব্ধির মায়াতুলিকাতেই সাহিত্যিকের মনের মণিকোঠায় সকল সাধারণ, তুচ্ছ, কুশ্রী, ঘটনাও রঞ্জিত হয়ে উঠে এক অপরূপ বর্ণগরিমায়। যে অবিমিশ্র সৌন্দর্য ও আনন্দের নির্ঝর ধারা এই আপাত অসুন্দর ও নিরানন্দ জগতের অন্তস্থলে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে, তাকে প্রকটিত করাই ত সাহিত্যিকের জীবনের ব্রত।

দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যিক মনের দিক থেকে, বুদ্ধির দিক থেকে যেমন সত্যদ্রষ্টা, পরম প্রজ্ঞাবান্ ঋষি, হৃদয়ের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে ঠিক তেমনি পরম দরদী, অনুভূতিশীল ভাবুক। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি বস্তরই প্রাণের স্পন্দন তিনি স্বীয় প্রাণের অন্তর্দেশে নিরন্তর অনুভব করেন—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবনধারায় তিনি নিরন্তর নিস্নাত হন, সমগ্র জগতের সঙ্গে তিনি স্বীয় একত্ব ও অভিনবত্ব উপলব্ধি করেন—কেবল জ্ঞানে নয়, প্রেমে। জ্ঞানের ভাস্বর অরুণালোকে যেমন তাঁর নিকট জীবনের নিগূঢ়তম তথ্যটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তেমনি একই সঙ্গে, প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে জীবনের মধুরতম রসটীও তাঁর নিকট প্রকাশিত হয় ঠিক তেমনি ভাবেই।

এরূপে, মন ও হৃদয়, বুদ্ধি ও ভাব, উভয় দিক থেকেই, সাহিত্যিক একই চরম সত্যের পূজারী। সেই সত্য মানব সভ্যতার প্রথম ঊষাগমে এই পুণ্য ভারতভূমিতেই উদাত্ত ঋষিকণ্ঠে অকুণ্ঠভাবে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—শতাব্দীর দূরদিগন্ত অতিক্রম করে,' আজও তা' একই ভাবে, সমান গৌরবে ধ্বনিত হচ্ছে :—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।"

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭-২৩-১)

"যা ভূমা, তা'ই সুখ ; অল্পে সুখ নেই। একমাত্র ভূমাই সুখ ; একমাত্র ভূমাকেই জানবার ইচ্ছা করবে।"

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতি সামান্য দু' একটী কথা মাত্র বল্‌বার প্রচেষ্টা করছি।

প্রথম প্রশ্ন এস্থলে যা স্বভাবতঃই মনে জাগে, তা হ'ল এই যে : সাহিত্যই ultimate end, বা চরম উদ্দেশ্য, অথবা কেবল means to an end, বা চরম উদ্দেশ্য-লাভের উপায়ই মাত্র। বর্তমান সময়ে, এ প্রশ্নটী এক গুরুতর আকার ধারণ করেছে, কারণ, এই যুগ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানতঃ এক প্রচারধর্মী যুগ। যে যুগে কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিবলে দেশের বা বিদেশের জনসাধারণকে জয় করা যেত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জনজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে, সে যুগ হয়েছে প্রায় গত। দৈহিক জয়ের প্রচেষ্টা স্থলে আজ আবির্ভূত হয়েছে চিত্তজয়-প্রচেষ্টা—প্রদর্শনী, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ বিশেষ মত এবং তথ্যাদি প্রচার ও প্রসারণ। সেজন্য, আজ সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য পরিবর্জন করে, হয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্র ও রাজনীতির ক্রীতদাসই মাত্র, এই নীতি অনুসারে সাহিত্য স্ব মহিমায় চিরপ্রতিষ্ঠিত, স্বতন্ত্র সত্তা নয়, পরম লক্ষ্য বা চরম উদ্দেশ্য নয়—সাহিত্যের মূল সাহিত্য-সৃষ্টিতেই নয়, রাষ্ট্রীয় বা অন্যান্য প্রয়োজনের অন্যতম সাধন বা উপায় স্বরূপেই কেবল।

এই ভয়ঙ্করী নীতির প্রত্যক্ষ ফল আমরা বর্তমান যুগের সকলেই প্রত্যক্ষ দেখছি এবং সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকেই আমাদের আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই আত্ম-বিধ্বংসী নীতির ফলে আজ সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতির প্রাণশক্তিই হয়ে আসছে নির্বাপিত। বলপ্রয়োগ বা সম্পীড়ন দ্বারা জড়দেহের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা যায়, জড় বস্তর পরিবর্তন সাধন করা যায়। কিন্তু অজড় আত্মা দৈহিক শাসন, পীড়ন বা বাধ্যবাধকতার সীমা রেখার সম্পূর্ণ বাইরে। সেজন্য আত্মার উপর, মন ও হৃদয়ের ক্ষেত্রে, 'made to order', বা বাধ্যবাধকতার, বাহিরের আদেশ অনুযায়ী প্রস্তুতির কোনো প্রশ্নই উঠা উচিত নয়, কোনো অবশ্য-পালনীয় আদেশের ভ্রুকুটী ভঙ্গিমায় নয়, কোনো স্বার্থসিদ্ধির আশায় নয়। সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, স্বতস্ফূর্ত প্রাণের আবেগে, উচ্ছল জীবন-তরঙ্গের উদ্বেল নর্তনে। প্রভাতে সহস্ররশ্মির অরুণ

কিরণ সহস্রধারে নিরন্তর আলোকের ঝর্ণা-ধারা বর্ষণ করছে ; কঠিন প্রস্তরগাত্র অনায়াসে ভেদ করে' নৃত্যশীলা নির্ঝরিণী কলহাসে প্রবাহিতা ; মৃত্তিকার অন্ধ-কারাগার মুক্ত হয়ে মাঠে মাঠে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে সতেজ তৃণগুচ্ছ, উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছে কুসুমের বিকচশ্রী ; হিন্দোলিত তরুশাখায় ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ছে বিহঙ্গের কলকাকলী—বৈজ্ঞানিক অবশ্য বল্‌বেন যে এ সবই প্রাকৃতিক রীতিতে আবদ্ধ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, জৈব-বিজ্ঞান প্রভৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে নিয়মিত। কিন্তু আমরা জানি যে, এ সবই প্রকৃতির স্বতঃ-উদ্বেলিত প্রাণেরই প্রকাশ, আনন্দেরই হিল্লোল। এই যে স্বতস্ফূর্ত আনন্দ, এই যে "অকারণ পুলক" বহির্জগতে প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্যে, নব নব রূপে লীলায়িত হয়ে উঠ্‌ছে, সেই আনন্দই মরমী শিল্পীর মর্মোদ্যানে সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের বীজরূপে নিহিত।

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির অর্থই হল, স্বাধীন, স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সৃষ্টি ; সৃষ্টির মূলেই হল স্বতস্ফূর্ত আনন্দ ও আবেগ। সৃষ্টিতত্ত্বের এই মূল রহস্যটীও ভারতেরই পুণ্যশ্লোক ঋষিরাই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। বেদান্তের ভাষায় বল্‌তে গেলে, সৃষ্টি "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ব্রহ্মসূত্র—সৃষ্টি কেবলই লীলা বা ক্রীড়াই মাত্র। নিত্য-মুক্ত, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যতৃপ্ত, আপ্তকাম পরমেশ্বর স্বকীয় নিত্য-উদ্বেলিত ও পরিপূর্ণ আনন্দ থেকেই এই জগৎসৃষ্টিরূপ ক্রীড়ায় মত্ত হন। সে জন্যই উপনিষদ্ বলেছেন :—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥ (তৈত্তিরীয় ৩—৬)। "আনন্দ থেকেই ভূতসমূহের সৃষ্টি, আনন্দেই তাদের স্থিতি, আনন্দেই তাদের লয়।"

সৃষ্টির এই অপূর্ব মূলতত্ত্ব সর্বত্রই এক—ঐশী সৃষ্টিই হোক্ বা মানুষী সৃষ্টিই হোক্, বিরাট সৃষ্টিই হোক্ বা ক্ষুদ্র সৃষ্টিই হোক্, সকলের মূলেই সেই একই প্রেরণা : স্বতস্ফূর্ত আনন্দাবেগ। যে উৎপাদনে স্বাধীনতা নেই, স্বতস্ফূর্ত আবেগ নেই, "অকারণ পুলক" নেই, সে উৎপাদন 'উৎপাদন'ই মাত্র, 'সৃষ্টি' নয়। মনের যে পরম প্রজ্ঞা, হৃদয়ের যে পরম দরদ, আত্মার যে পরম আনন্দের মায়াস্পর্শে অতি সাধারণ 'বিবরণী'ও হয়ে দাঁড়ায় অপূর্ব সাহিত্য—তারই অভাবে প্রকৃত, প্রাণবন্ত সাহিত্যের স্থলে আমরা পাই সাহিত্যের শুষ্ক কঙ্কালই মাত্র।

সুতরাং, সাহিত্যের ক্ষেত্রে "Art for Art's sake" নীতিটাই একমাত্র গ্রহণীয়। সেজন্য, প্রকৃত সাহিত্য কদাপি প্রচারধর্মী হতে পারে না। বাধ্যতামূলকভাবে, রাষ্ট্রীয় মতবিশেষ প্রচার সাহিত্যিকের কর্তব্য কর্ম নয়। একই ভাবে, কেবলমাত্র সামাজিক রীতিনীতি প্রচার বা সমালোচনা; কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকানুযায়ী বিবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদিও যে "সাহিত্য" সংজ্ঞা বাচ্য নয়, তা বলাই বাহুল্য।

এস্থলে আপত্তি হতে পারে এই যে, এই মতানুসারে, "সাহিত্য" ত অবশেষে, রাষ্ট্র ও সমাজের দিক্ থেকে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোনো উপকারই, কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধিই যদি সাহিত্যের মাধ্যমে না হয়, তবে সেই সু-উচ্চ জগৎস্থিত সাহিত্যের মূল্যই বা কি! এর উত্তরে আমরা বল্‌ব যে এস্থলে "মূল্যে"র প্রশ্ন উত্থাপনই যুক্তি বিরুদ্ধ। কারণ, 'Practical Utility' বা ব্যবহারিক মূল্যের কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্থাপিতই হতে পারে না। অন্ততঃ, এই একটী মাত্র ক্ষেত্র থাকুক—মানুষের সাহিত্য—শিল্পকলার মানসক্ষেত্র—যেখানে ব্যবহারিক মূল্যের কথা, বাহ্যিক প্রয়োজনের কথা হয়ে যাক্ পরিম্লান, উজ্জ্বল হয়ে উঠুক স্বাতন্ত্র্যবোধী আত্মিক বিকাশের কথা, স্বতস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশের কথা।

অবশ্য, এ কথা সত্য যে, মনস্বী সাহিত্যিকের রচনা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দিক থেকেও যুগে যুগে বহু সুফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু এই সব সাহিত্য যে, ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহারিক দিক্ থেকেও বিশেষ মূল্যবান্ হতে পেরেছে, তার একমাত্র কারণই হ'ল এই যে, এদের সৃষ্টি সেই ব্যবহারিক প্রয়োজনের উদ্দেশ্য থেকে নয়, কোনো মত-বিশেষ প্রচারের উদ্দেশ্য থেকেও নয়, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আনন্দ ও আবেগ থেকেই কেবল। অন্যথা, অন্যান্য সাধারণ প্রচারধর্মী পুস্তিকা ও পাঠ্যপুস্তকাদির ন্যায়ই তাদের দ্বারা অতি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী, উদ্দেশ্যই সাধিত হ'ত মাত্র—দেশের ও দশের মনের মণি-কোঠায় শাশ্বত, সার্বজনীন আসন তাদের জন্য হত না পাতা। যথা, শরচ্চন্দ্রের উপন্যাসাদি "সাহিত্যই" সমাজের গুপ্ত ক্ষতের,

অনাচার-কদাচারের প্রত্যক্ষ বিবরণী বা documentই মাত্র নয়। পাঠকবৃন্দও এরূপ রচনায় সূক্ষ্মদর্শী, মরমী স্রষ্টার নব-সৃষ্টির পরিচয় পেয়েই ধন্য ও তৃপ্ত হন, সামাজিক ঘটনার ধারা-বিবরণী পেয়েই মাত্র নয়।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে, সাহিত্যিক স্বয়ংই ত রাষ্ট্রীয় মতবিশেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সামাজিক রীতি-নীতিতে ব্যথিত হয়ে, ঐ মত প্রচারের জন্য বা ঐ নীতি দূরীকরণের জন্য কলম-ধারণ করতে পারেন। এক্ষেত্রেও কি তাঁর সৃষ্টি 'সাহিত্য' হবে না, কেবল 'প্রচারই' হবে? এর উত্তর এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য যদি সাহিত্যিক স্বেচ্ছায়, স্বতস্ফূর্ত আবেগে লেখনী ধারণ করেন, তাঁর রচনা নিশ্চয় "সাহিত্য"-সংজ্ঞা বাচ্য হবে, যদি তাতে সাহিত্যের অন্যান্য লক্ষণ বর্তমান থাকে। কারণ, এক্ষেত্রেও, বাহিরের কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা না থাক্‌লে, সাহিত্য স্রষ্টার প্রাণের অনুরোধই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়—অন্য সব উদ্দেশ্য হয়ে যায় গৌণ। অতএব সাহিত্য সৃষ্টিকে সর্বদাই 'an end in itself and not a means to an end' বলে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান আধুনিক সাহিত্যে এই কথাটী বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শবরী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গাঁয়ের একপাশে মেটে ঘরের দাওয়ার ওপর ছেঁড়া মাদুরটা বিছিয়ে একা একা উস্‌খুস্‌ করে গৌরী। ঘরের ভিতর উঠে গিয়ে নিবু নিবু পিদিমটা উস্কে দেয়। এক ঝলক আলো যেন এলো অলোকতীর্থ থেকে। বাইরের দিকে চেয়ে কিন্তু সে হতাশ হয়ে যায়। দিগন্তব্যাপী আকাশ প্রান্তর ছেয়ে শুধু কালো, ঘন কালির চেয়েও তিন পোচ কালো, কেশবতী কন্যের নিবিড় ভোমরা কালো চুলের চেয়েও কালো। যেন মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে দিগ্‌বসনা এলোকেশী দিকে দিকে চুলের চামরটা ঝুলিয়ে দিয়েছে থমথমে পৃথিবীর ওপর।

হাঁপিয়ে ওঠে গৌরী—এই নিরন্ধ্র অন্ধকার যেন চেপে ধরে বুকের ভিতর—ক্ষীণায়ু পিদিমটিকে মনে হয় বড় আপনার। ঐ আলোটুকুকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ঝড়ঝঞ্ঝার নিষ্ঠুর হাত থেকে—ঐ হবে থির-বিজুলীর চমক, নতুন আহিতাগ্নির দীপ্তি।

আজ একজনও আসেনি তার পাঠশালায়। দুলে পিসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হাটের পথে—গুরুমা বলতে অজ্ঞান। সে জিজ্ঞেস করেছিল—আসছ ত সন্ধ্যায় আজ, ধ্রুবচরিত আরম্ভ করবো মনে করছি, আর তোমার ভাইঝি বিনিও ত আসছে না কাদন—

—না গুরুমা, আজ শরীরটা বড় ম্যাজ ম্যাজ করছে, যেতে লারবো।

এটা যে শুধু একটা অহেতুক অজুহাত সেইটেই এখন মনে পড়লো, যখন আজকের উপস্থিতিটা একটা শূন্যগর্ভ বিন্দুতে এসে থেমেছে। কিন্তু তাবলে হাল ছাড়বার মেয়ে গৌরী নয়! পুরুষ মানুষরা গজ গজ করে বটে—যে গাঁয়ে এসব কি কাণ্ড, কিন্তু এত বচ্ছর ধরে সে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে সাঁঝের পিদিমটা জ্বালিয়ে। তার নাইটস্কুল কতবার উঠে গেছে ছাত্রী না পেয়ে, আবার দুটি একটি করে জুটিয়ে এনেছে নিজেই। মেয়েদের পিসীদের, দিদিমা ঠাকুমাদের ঠাকুর-দেবতা পুরাণ-ভাগবতের গল্প শুনিয়ে বশ করেছে, কত সেবা-শুশ্রূষায় তাদের মন টলিয়েছে। ছোট ছোট মেয়েরা—গুরুমা বলতে অজ্ঞান। সে আর কিছু করুক আর না করুক, অভ্যস্ত জীবনের বাইরের একটা নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। এক এক সময় তার নিজেরই মনে হয়েছে—কেন এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, ব্যাগার খাটা। তবু সে পিদিম জ্বালিয়ে বসে থাকে—তার আশার অন্ত নেই, প্রতীক্ষার শেষ নেই, মনে হয় সব কিছু সম্ভব।

অন্ধকার মিশকালো পর্দায় কোথায় যেন একটা সাদা

চিড় দেখা যায়। একটু ক্ষীণ আলোর রেখা এগিয়ে আসছে আলেয়ার মত। নাতিবিস্মৃত অতীতের পদাবলীর পদচিহ্ন কি আবার অঙ্কিত হচ্চে ছন্দছাড়া আঁকা-বাঁকা পথে। এত রাত্রে এত দুর্য্যোগে তার পড়ুয়াদের যে কেউ আসবে তাতো মনে হয় না—অথচ আলোটা যে এইদিকেই আসছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কালসমুদ্র ডিঙিয়ে মনে পড়লো নাকি একজনের, সীমার সমে এসে সে বলবে নাকি—ছিলে ত ভালো। সমস্ত দেহটা কেঁপে ওঠে তার, দুলে ওঠে অজানা ব্যথার দ্রাবক রসে। আগুনের পাবকস্পর্শ সে যে রেখে গেছে ঠিক এইখানে, এই আস্তানায়।

বুড়ো রূপো জেলেকে সঙ্গে করে সৈরভী এসে হাজির।

—বলি কাণ্ডকারখানা কি, বল দিকিন্ গৌরী, নেকাপড়া শিখে মেয়ে আমার ধিঙ্গী হয়েছেন, আহার নিদ্রে খাওয়া দাওয়াও কি শিকেয় তুলেছিস্—মাগো মা, রাত কত হয়েছে সেদিকে খেয়াল আছে—

—হ্যাঁ চলো যাই—বলে আবার বসে পড়ে গৌরী ভারগ্রস্ত মনে নিয়ে।

পূর্ব্বের একটু ইতিহাস আছে। রাতটা ছিল এমনি ঘন-দুর্য্যোগভরা, এমনি সজল কোমল। নতুন বর্ষার প্রথম প্রেম মেঘের ছায়াউত্তরীয় উড়িয়ে এসেছেন—ঝোড়ো হাওয়ায় কার যেন দীর্ঘশ্বাস, কার যেন দৃপ্ত পদক্ষেপ। দারোগাবাবু নিয়ে এসেছিলেন ছোকরা বন্দীবাবুকে—হাসিখুসি-ভরা একটা দীপ্ত আস্ত মানুষকে। দেউলী হিজলী যাতায়াতের পথে এই গাঁয়েই তাকে কিছুদিন আস্তানা গাড়তে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন সদাশয় সরকার বাহাদুর। মাথা গোঁজবার জন্য এই চালাটাও তৈয়ারী করিয়ে রেখেছিলেন শাসনযন্ত্রের প্রভুরা। খালের ধারে ছোট্ট অস্বাস্থ্যকর গ্রাম, ম্যালেরিয়ায়, আমাশয়ে ধুঁকছে, ক্ষিধের লোভে জীর্ণশীর্ণ। সামান্য কয়েক ঘর জেলে দুলে হাড়ি-বাগ্দির বাস, বামন কায়েত নেই, ভদ্র গৃহস্থ নেই, স্কুল নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, সত্যিকার মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার নেই, কারুর মাথাব্যথাও নেই। বাংলাদেশের হাজামজা পচা হাজার হাজার গ্রামের একটি, প্রাণহীন বৈশিষ্ট্যহীন। একদিকে ধূ ধূ করছে হানা, অন্যদিকে বন-জঙ্গল, সামান্য চাষ-আবাদের জমি, একবেলা আধপেটার সম্বল।

বামুনের ছেলে শিশিরকে যখন দফাদার চৌকীদারে নিয়ে এলো তখন জটলা হলো গাঁয়ের পঞ্চায়েতে যে তার হিঁদুয়ানী বজায় রাখতে সমাজ-আচরণীয় লোক পাওয়া যায় কোথায়—

হেসে শিশির বলেছিল—ভাবছেন কেন দারোগাবাবু, নিজেই সব করে নিতে পারবো—আর না হয় যে কোন একটা লোককে ধরে দিন না—মানুষে মানুষে আবার তফাৎ কি—

গ্রাম্য-দারোগা মাথা চুলকুতে চুলকুতে বলেছিল—তাইতো, আপনাদের ভিতর আগুন আছে, সব শুদ্ধু করে নেন, কিন্তু আমাদের ত একটা সংস্কার আছে, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার কাজের জন্য যা তা একটা হাড়ি বাগ্দির ছেলে ধরে আনতে পারি না তো। তা ছাড়া সরকার বাহাদুর যাই করুন, কারুর ধর্ম্মকর্ম্মে হাত দেন না, এতো লেখাপড়া শিখেছেন সে ত জানেনই।

হো হো করে হেসে শিশির জবাব দিয়েছিল—তাহলে একবার চতুর্ম্মুখের কাছে খবর পাঠান বিশ্বকর্ম্মার উপর অর্ডার যাক আপনাদের ফরমায়েসী মানুষ তৈরী হোক্—উপস্থিত আপনি গোটাকতক কুইনিনের বড়ি যদি থাকে পাঠিয়ে দিন ত, গাটা বড়ই ম্যাজ ম্যাজ করছে—

—ঐ সেরেছে চাপোষা লোক মশাই, অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে বসবেন না, তাহলে আর সমলাতে পারবো না—আপনাদের কি, সামান্য মাথা ধরেছে—ডাকো সিভিল সার্জেনকে—কলকাতায় কাগজে কাগজে খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, বড় বড় করে লেখা হোক—ছোট সাহেব বড়-সাহেবের লাগুক ছোটাছুটি—আমিও ছুটী কোথায় ডিম, কোথায় মুর্গী—দোহাই আপনার—কটাদিন চেপে যান—কুইনিন্ যত চান্ আনিয়ে দিচ্চি—চাকরীর তেরাত্তেরি করে এনেছি—বুড়ো বয়সে ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, মারবেন না—

হীরু ঢালি গাঁয়ের চৌকীদার, তাকে ডেকে বলে গেলেন ছোট-দারোগাবাবু—হীরু, বাবুকে তাহলে দেখো, রোজই একবার খবর নেবো, তিনকোশ ভেঙে পারিও না—ঘোড়াটাও হয়েছে বেতো আমারই মত—হ্যাঁ,

তোমার আর পক্ষের মেয়ের ত একটা দুধোলো গাই আছে না—গৌরী তার নাম না—তাকেই খবর দিয়ো—পো-খানেক করে খাঁটি দুধ দিয়ে যাবে বাবুকে রোজ সকালে—সহুরে ছেলে চা-টা খাবার অভ্যেস নিশ্চয়ই আছে—কেন বাপু এসব হাঙ্গামা—বামুনের ছেলে—পয়সা-কড়িও কিছু আছে শুনেছি—অমন টুকটুকে চেহারা, তা না—যাক্‌গে মরুক্‌গে—তা একটু শুদ্ধাচারেই আনতে বলো—হাজার হোক্ ওরা না মানুক্, বামুনের ছেলে ত—

দেবদ্বিজে ভক্তিতে শুধু ছোটবাবু নয়, গাঁয়ের মোড়ল থেকে গুপী চাঁড়াল পর্য্যন্ত সবাই এমন গদগদ হয়ে উঠলো যে শিশিরকে বুঝি মন্দিরেই প্রতিষ্ঠা করে ফেলে।

অজানা অচেনা জায়গায় মচমচে কাঁঠাল কাঠের নতুন তক্তপোষের উপর শুয়ে ঝিল্লী ঝাঁঝরের ঐক্যতান শুনতে শুনতে অনেক রাত্রে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে দেখে সামনে সাদার ফ্রেমে আঁটা, ভোরের তুলিতে আঁকা আকাশ গঙ্গায় লীন একটা প্রসন্ন দিন আস্তে আস্তে জাগছে—গত রাত্রির সমস্ত বর্ষণ মুছে ফেলে। শিশিরের মনে হলো ঠিক এই সময়েই পৃথিবীর আর এক প্রান্তে সোনার আঁচল খসিয়ে সন্ধ্যা নামছে, ফুটে উঠছে রাতের চামেলী। রাত্রির তপস্যা সে কি শুধু উদয় দিগন্তের সন্ধানে—এই চাওয়া-পাওয়া, রাত্রি-দিন, উদয়-অস্তের মাঝখানে কোথায় পাদপীঠ রেখেছেন জীবনের দেবতা কে জানে।

আপনি গান গুণগুণ করে এলো তার কণ্ঠে। দরজা ঠেলে বেরিয়েই চোখে পড়লো দাওয়ার নীচে চকচকে ঝক্‌ঝকে ঘটি হাতে লজ্জাবনতমুখী একটি আঠারো উনিশ বছরের কালো মেয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে—

—আপনার দুধ—অতিকষ্টে বলে সে।

—তুমিই গৌরী, বা বেশ—

আরো কেঁপে ওঠে মেয়েটা, সকালবেলার রক্তিম আলোর বঙ্কিম এক টুকরো তার গালে আবির ছড়িয়ে দেয়।

—তা দুধটা কোথায় রাখবে বলো দিকিন্—জিনিষ-পত্তর ত কিছুই এসে পৌছয়নি—বরং একটা কাজ করো, আমি চট্ করে হাত মুখ ধুয়ে আসি, তুমি দুটো কাঠকুটো [illegible]

বেলায় উঠে মুখের গোড়ায় চা না পেলে ভারী রাগ হয় কিন্তু, বদ অভ্যেস—

চা—হাঁ করে থাকে মেয়েটা—তার বিস্ফারিত ডাগর চোখ দুটোর দিকে চেয়ে কেমন কোমল হয়ে আসে শিশিরের মন।

—তোমার জন্যও জল নিয়ো, আমি একলা বুঝি খাব—

লজ্জায় পড়ে মেয়েটি—চায়ের নামই শুনেছে, কচিৎ হয়ত মুখে উঠেছে—তা ছাড়া তার হাতের তৈয়ারী জিনিষ বামুনের ছেলে মুখে দেবে এটা যে একটা সৃষ্টিছাড়া আজগুবী কল্পনা—শুধু হীরু হাড়ির মেয়ে বলে নয়, তার মায়েরও কি একটা অপবাদ ছিল—হীরু নিজেই মা মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার সাঙ্গাৎ করেছে কাতুকে, মুখরা দজ্জাল কাতুকে।

কোনক্রমে রুদ্ধশ্বাসে বলে ফেলে গৌরী—সত্যি আমার হাতে খাবেন—

—বাঃ, খাবনা, কি হয়েছে—

—সে কী—

—তুমি কি বাঘ না ভালুক—আমারি মত আস্ত জলজ্যান্তো মানুষ, দু'হাত দু'পা, যাও চট্ করে জলটা বসিয়ে দাও—

চোখ দুটো চকচক্ করে ওঠে গৌরীর, বুকের ভিতরটা কেমন করে—তারও মর্য্যাদা আছে, তারও দাম আছে, আর সে দাম তার বাইরের অবয়বের নয়, অন্তরের সত্তার। এতদিন ঐ দামটুকুই বা দিয়েছিল কে। কাঠ-খড়-কুটোর মত সাতগণ্ডা টাকা নিয়ে সাত বছর বয়সে তার বাপ তাকে চালান করে দিয়েছিল ভিনগাঁয়ে পলাশবুনীর বুড়ো মধু মোড়লের কাছে। বিয়েটা অবশ্য বেশীদিন সয়নি। তেরো বছরেই গৌরী ফিরেছিল গাঁয়ে হাতের নোয়া মাথায় তুলে। মা ততদিনে শ্যামসোহাগিনী হয়ে কণ্ঠী বদল করে বৈরিগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, তার জায়গায় আসর জাঁকিয়ে বসেছে কাতু। বাপ চক্ষুলজ্জার খাতিরে যদিও বা দুদিন ঠাঁই দিয়েছিল মেয়েকে, কাতুর ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে, চীৎকারে, আর কুৎসিত গালাগালিতে অতিষ্ঠ হয়েছিল শ্রীমন্তী মেয়েটা। তার উদ্ভিন্ন যৌবনের শ্রীর [illegible]

রাতে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল এক কাপড়ে সৈরভীর বাড়ী এককোশ দূরে জেলে পাড়ায়। বয়সে অসমান হলেও তার সঙ্গে মিতিন্ পাতিয়েছিল সৈরভী নিজেই। দুটো বাঁশ খেজুর নারকেল পাতায় একটা আস্তানা বানিয়ে সেখানেই থেকে গিয়েছিল গৌরী। ধান ভেনে, কাঠ কেটে, ঘুঁটে বেচে, দুধ জুগিয়ে নিজের দুমুঠোর সংস্থান নিজেই করে নিয়েছিল। নানা রোগে ভুগে কিছুদিন পরে মাও ফিরে এসেছিল মেয়ের কাছে, দেড় বছরের ছেলে কোলে। মৃত্যুশয্যায় হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলেছিল—

—গৌরী, তোর হাতেই দিয়ে গেলুম রাধুকে, রাধারাণীর দোর ধরা, মানুষ করিস, বড় বৈরিগী বংশের ছেলে ও—

ইচ্ছা হয়েছিল জিজ্ঞাসা করে—আর আমার কি ব্যবস্থা করলে, মা—

অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা তার বাপের সঙ্গে হাটের মাঝে, লকলকে লতার মত তেজী হয়ে উঠেছে সে তখন, রসে পুরন্ত। পিতৃত্ব বোধটা জেগে উঠেছিল হীরুর—এমন একটা মেয়ে বাধ্য থাকলে আবার বিয়ে দিয়ে বা অন্য কিছু ব্যবস্থা করে কিছু টাকা যে হাতে আসে সেঁ বোধটাও সঙ্গে সঙ্গে। কদিন যাতায়াত করলে সে, মেয়েকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেও চাইলে। গৌরীর কাঠিন্যে আর সৈরভীর আঁশবটির ভয়ে সুবিধে হলোনা কিছু। হাওলাতী টাকাগুলো যখন ভাবী জামাতার দালালকে ফেরত দিতে হলো—আর দু বোতল ধেনোও সঙ্গে সঙ্গে, তখন একটা কটু শপথ করে হীরু বলেছিল—

—যেমন মা, তেমনি মেয়ে, কতো আর ভাল হবে—কাতুও সায় দিয়েছিল, মনের সুখে ঝাল মিটিয়ে গালাগাল দিয়ে পাড়া মাত করেছিল।

সেদিন রাতে রাধুকে জড়িয়ে ধরে গৌরী কেঁদেছিল—মানুষ হ ভাই, তাহলে আর তোর দিদির কোন দুঃখ থাকবে না।

অবোধ শিশু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল।

তারপর এলো শিশির—সে ত আসা নয়, আবির্ভাব। গৌরীর জীবনে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। একে ত তাদের গাঁয়ে বা আশেপাশে পাঁচটা গাঁয়ে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তির কোন বালাই ছিল না। কচিৎ জমিদারের নায়েব গোমস্তা আফিম-মদের এজেন্ট বা তদন্তের জন্য ছোটদারোগা, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টবাবু দয়া করে পায়ের ধুলো দিতেন। কলাটা আশটা, কচুটা মুলোটা, দু প্যাঁচসেরী রুইকাতলা, মুরগী পাটা হাঁসের—মায় গভীর রাতে গোটা মানুষের তলব থেকে বোঝা যেত যে গাঁয়ে যাদের শুভাগমন হয়েছে তাঁরা গণ্যমান্য বদান্য ব্যক্তি, তাঁদের সেবা সৌভাগ্যেরই সামিল। চাষের ফসল, পুকুরের মাছ, গোলার ধানে শুধু তাঁরা তৃপ্ত হতেন না, অনেক সময় নির্ব্বিবাদে চাইতেন ও নিঃসঙ্কোচে পেতেন অনেক কিছু, শুধু দুটো তেল চিট্-চিটে নোট্ বা রাঙামাকা টাকা নয়—দেহোপচারে মসৃণ মাংস ভোগ পর্য্যাপ্ত।

অষ্টাদশী গৌরীরও একদিন ডাক্ পড়েছিল। যৌবন-বতীকে নিশুতিরাতে সৌভাগ্যবতী হবার সুযোগ দেবার জন্য লোকের অভাব ছিল না। সৈরভী সেদিন বোনঝির বাড়ী। কি রকম করে আঁচড়ে কামড়ে প্রমত্ত মাকড়সার বেড়াজাল পেরিয়ে গৌরী বেরিয়ে এসেছিল, সে দুঃস্বপ্নের ইতিহাস তার নিজেরই মনে নেই।

শুধু হিংসেয় ফেটে কাতু বলেছিল—

—ওটাকে নিয়ে যায় কেন, ওটা মেয়েমানুষ নাকি—সাক্ষাৎ ফণিমনসা—ফোঁস করেই আছেন—যেমন ছিরি, তেমনি চেহারা—

পেয়াদা নবীন কাতুর পেয়ারের লোক, সে জবাব দিয়েছিল—বোকা, বোকা বাবু দুটো টাকা দেবেন বলেছিলেন, খেতেও পেতো ভাল, পোলাও মাংস হয়েছিল, তেমন খুশী হলে কোন না একটা শাড়ীও জুটতো—ঐ ত ট্যানাপরা। তা না কালনাগিনী, কুলোপনা চক্র, বাবুর দয়ার শরীর, আর সেদিন একটু বেশী বেহেস্তার হয়েছিলেন, ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে দেখে বল্লেন—ছেড়ে দে, জাতসাপ, বিষদাঁত ভাঙেনি—

আমি ত বলেছিলুম—কাতুকে না হয় ডাকি, আপনার সেবা শুশ্রূষা করুক, ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, ভদ্রলোকের যত্নআত্তি করতে জানে—

—ওমা তাই নাকি—সহর্ষে সলজ্জ উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছিল কাতু। তারপরে ইঙ্গিতে থামতে বলেছিল পেয়াদাকে—চুপ, মোড়ল আসছে—

দুচার সপ্তাহ যেতে না যেতেই শিশিরের আগমনটা দাতে সয়ে গেল সবাইএর—গৌরীরও। সকালে বিকালে দুধ দিয়ে যায় সে—চা শুধু করে দেয় না, মুখ ফিরিয়ে খায়ও একবাটি। রান্নার সুড়ুক সন্ধান দেয়, কতটা নুন দিতে হবে, কতটা ফোড়ন্।

শিশির হেসে বলে—আবার ফোড়ন, কথার ফোড়নেই বাঁচি না, আজ যা খিচুড়ী হয়েছে গৌরী—ভালো, খাবে নাকি একটু—

গৌরী জিভ কেটে চলে যায়।

রাধুত স্বদেশীবাবু বলতে অজ্ঞান—শিশিরের খুচরো কাজগুলো সেই করে দেয়।

একদিন গৌরী ধরে বসলো—রাধুকে পড়াতে হবে।

চট্ করে মাথায় খেলে গেলো শিশিরের তাদের গ্রামের শিরোমণি মশায়ের কথা—প্রাচীন পণ্ডিত অভিজাত-বংশের শেষ স্বয়ম্প্রকাশ—তার মায়ের মন্ত্রগুরু। শিশিরের এম্-এ পাশের খবর যেদিন এলো, শিরোমণি মশায় আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন—মানুষের মত মানুষ হও শিশির, পাশ ত করলে, দেশ দেশ করে পাগলও হয়ে উঠেছো, একটা ছেলে কি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে সত্যিকারের মানুষ করে তোলা দিকিন্ শিশির, হাজার বক্তৃতার চেয়ে সে কাজ হবে বেশী, ভাবী ইমারতের গোড়াপত্তনের একটি ইট্ গাঁথা হয়ে যাবে পাকা করে—জানো শিশির, আমাদের ভারতবর্ষ শুধু দেশ নয়, একটা আদর্শ, ঐ ত বসে রয়েছেন মৌনী ঋষি, ভিক্ষুক ভোলানাথ, পাগল দিগম্বর, আত্মবিস্মৃত, আত্মবিক্ষিপ্ত, সঙ্গে রয়েছেন পাগলী মা, ভুলে গেছেন তিনি অন্নপূর্ণা, বরদাত্রী—পারবে তাদের সান্নিধ্যে জাগ্রত করতে, শবকে শিব করতে, ময়োভব যে তিনি ময়স্কর, পারবে ছিন্নমস্তাকে রাজ-রাজেশ্বরী করতে। দূরে গাঁয়ে বসে একটা লোককেও যদি জাগাতে পারো, তাহলে তাঁদেরই যে জাগানো হলো—সেই ত আমার দেশ—মাটি নিয়ে ত দেশ নয়, মানুষ নিয়ে।

খানিক ভেবে শিশির বল্লে—বেশ, তোমাকেও পড়তে হবে গৌরী—

সে কি, আমাকে—লজ্জায় ঘেমে ওঠে সে—না, না লোকে বলবে কি, ছিঃ—

সে হয় না, শুধু রাধু নয়, তুমিও পড়বে, একদিন না একদিন আমি ত চলে যাব হুকুম এলেই, তোমায় যা শিখিয়ে দিয়ে যাব, তাইতে তুমি আর পাঁচজনকে শেখাবে, আগুন আগুনই, একটি ছোট্ট পিদিমের শিখাতে যে আগুন থাকে, তাতে যে হাজার হাজার পিদিম জ্বালিয়ে দীপান্বিতা করে তোলা যায়—

শিশির চলে যাবে, গৌরী জানে, কিন্তু বিশ্বাস যেন হয় না, এত কাছের মানুষ আবার দূরের হয়ে যাবে।

ভাইবোনে লেগে গেল পড়তে, গৌরীর উৎসাহ দেখে কে, রাধুর বিদ্যে যত না এগুক, গৌরী যেন তপস্যায় বসলো নতুন করে। আরও দুএকজন পড়ুয়া তাদের জুটলো। দারোগাবাবু আপত্তি করলেন না—নতুন খেয়াল নিয়ে থাকলে মন্দ কি, উপরওয়ালাদেরও রিপোর্ট করলেন না। সৈরভী পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে এসে বসে, শোনে মন দিয়ে, বিশেষ করে যেদিন রামায়ণ মহাভারত পুরাণ জাতকের গল্পগুলো সুন্দর করে বলতো শিশির। শুধু হেসে একদিন বলেছিলো—সাবধান গৌরী।

পাড়ার পাঁচজনে দুচার কথা বল্লেও বিশেষ করে মদের মুখে, শিশিরের দিকে চাইলেই তারা যেন আপনি বুঝতে পারতো যে এ লোক তাদের জানাচেনা ধোপ-দুরস্ত ভদ্রব্যক্তি নয়, এ যেন প্রাণের বন্যা, ভোগবতী নিয়ে কারবার নয়, যোগবতীতে ঠেকেছে।

বোশেখ জোষ্টিতে যখন কলেরা লাগলো তখন ঐ স্বদেশীবাবুই লিখে পড়ে জেলার সহর থেকে ডাক্তার আনিয়ে ছুঁচ ফুটিয়ে গাঁটাকে রক্ষা করলে ওলাবিবির কোপ থেকে। পাড়ায় পাড়ায় পুকুরের উপর কড়া নজর রাখলে, ফুটিয়ে জলখাওয়ার রেওয়াজ করলে, নিজের হাতে ওষুধ দিয়ে কতলোককে বাঁচালে। বাঁচলো না শুধু রাধু, গৌরী তখন জেলেপাড়ায় সৈরভীকে নিয়ে ব্যস্ত, এখন যায় তখন যায় অবস্থা, আর শিশির তখন তিন কোশ বেয়ে থানায় এত্তেলা দিতে গেছে নতুন দারোগাবাবুর হুমকীতে।

যাবার সময় রাধু বলেছিল—দিদি, বড্ড তেষ্টা, আর পড়া ছাড়িসনি ভাই—

—মা, মা, বলে কেঁদে উঠেছিল গৌরী। সারা দেশ জুড়ে যে তেষ্টা, সে তেষ্টা মিটবে কিসে।

ঘোঁটও উঠেছিল মৃত দেহটা নিয়ে—কার না কার ছেলে, কে পোড়ায়, ছোটলোক হলেও তাদেরও সমাজ আছে, আচার আচরণ আছে। হীরু আর কাতুই অগ্রণী ছিল এ বিষয়ে। শিশির এসে পড়ায় ঘোঁট আর বেশী দূর এগোয়নি। তার জ্বলন্ত চোখ দুটোর সামনে তারা দাঁড়াতে সাহস করেনি। গৌরীর সাহায্যে একাই সে সব ব্যবস্থা করেছিল কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে।

দাহশেষে শিশির এসে গৌরীর পাশে বসেছিল, মাথাটা টেনে শুইয়ে দিয়েছিল নিজের কোলে, চুলের ভিতর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল মহাবিস্তৃতির দিকে চেয়ে।

ততদিনে নতুন দারোগা এসে গেছে। হীরু প্রভৃতি পাড়ার পাঁচজনে গিয়ে নালিশ করলে—হুজুর, বেনোজল ঢুকিয়ে গাঁয়ের পেঁকোজল পর্যন্ত গুলিয়ে গেলো, ঘরের মেয়েছেলেগুলো পর্য্যন্ত কথা শোনেনা—ঐ গৌরীই হচ্চে পালের গোদা, আগের দারোগাবাবু এ সব কানে তুলতেন না—ঐ নাইটস্কুল না কী হচ্চে বন্দীবাবুর···

দারোগাবাবু শুধু হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন—হুঃ, আচ্ছা ঐ যে মেয়েটার কথা বল্লে, কার মেয়ে, কত বয়স, দেখতে কি রকম···

হীরু মাথা চুলকে বল্লে—হুজুর, আমারই মেয়ে, সোমত্ত বয়েস, ঐ স্বদেশীবাবুই মাটি করলে, কি সব মন্তর দিয়েছে কানে, আবার শুনছি নাকি ঘর ঘর ঘোঁট হচ্চে, তাড়ি, পচাই এ সব আর চলবে না, নরহরির দুটো লুকুনো ভাটিই সেদিন ভেঙ্গে দিয়েছে, হুজুর বাপপিতোমোর আমল থেকে এসব চলছে, আপনারাও নেকনজর করেন···

তারপর কিছুদিনের ভেতরই শিশিরের বদলীর হুকুম এলো একেবারে পাঁচিলের ভেতর।

চোখের জল মুছলো গৌরী।

যাবার দিনে শিশির হেসে বল্লে—ভেবোনা গৌরী, কর্ত্তারা একদিন যাবেনই, তখন আমাদের রাজত্ব, দেখ না কী করি—কটা দিন মুখ বুজে থাকো, আবার ফিরে আসবো—নাইট্ স্কুলটা ততদিন তুমিই চালিয়ো—তোমায় যা শিখিয়েছি দুবছরে তাতে তুমি পারবে, আর এই বইগুলো রইলো, অন্ধকারে একটি পিদিম অন্ততঃ জেলে রেখো, তারি আলো দেখে আসবো।

গৌরী কিছু না বলে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের কাছে মাথাটা ঠেকিয়েছিল, ধুলোর সঙ্গে অমৃত হয়ে মিশেছিল তার চোখের জল।

সৈরভী পাশেই ছিল, তারও চোখ হয়ে উঠেছিল ঝাপসা, সে বলেছিল—কলকাতায় গিয়েই ত মিতিনকে ভুলে যাবেন, মনে কি আর পড়বে এই ছোট্ট গাঁটিকে—

—আমি ভুললেও আমার বইগুলো ভুলবেনা—এগুলোর ভেতর দিয়েই নতুন মানুষ হয়ে যাবে তোমার মিতিন্—ওর ভেতরই আমি রইলুম্—

হয়েছিলও তাই। কত বছর পরে ছাড়া পেলো শিশির। তারপর কত কী ঘটলো, কত কিছু অদল-বদল হলো, জীবন যৌবন ধন মান সাম্রাজ্য। নদীর এপার ওপার হয়ে গেল আলাদা। শিশিরও ভেসে গেল পরিবর্ত্তনের স্রোতে—পরিবর্ত্তনই যে জীবন—শুধু আঁকড়ে থাকলে যে কর্ত্তার ভূত নাড়েও না, ছাড়েও না। সাদা-কালোর নানা সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সে এখন রীতিমত পদস্থ ও ধনী, অভিজাত সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচুর।

হঠাৎ এক একদিন ন'মাসে ছ'মাসে দিনের বেলা ভাঙা ধ্যানের টুকরোয়, রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে সে যেন দেখতে পায় কোথায় যেন দুটো চোখ জ্বলছে, আশায়, প্রতীক্ষায়—কোথায় যেন কে এক বিশীর্ণকায়া, ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মলিনমুখী হরিজনের মেয়ে পিদিম জ্বালিয়ে বসে আছে। বর্ণ পরিচয় থেকে আরম্ভ করে নিজের চেষ্টায় দুটো পাশ করে সে গুরুমা হয়ে বসেছে। দিনে পড়ায় জেলা বোর্ডের হরিজন স্কুলে, দিনেরটা তার বৃত্তি, রাত্রে করে নাইট্ স্কুল স্বেচ্ছায়, সেটা তার নিবৃত্তি। বাইরের যৌবন তার ঝরে গেছে শবরীর প্রতীক্ষায়; কিন্তু অন্তরের রস উথলে উঠেছে দিনে দিনে প্রেমঘন হয়ে দিকে দিকে। রাত্রির নিকষকৃষ্ণ শিলাবেদীমূলে একটি প্রদীপ জ্বেলে ভারতী হয় যৌবনবতী।

গৌরীর মনে পড়ে কবির গল্প পড়তে পড়তে শিশির একদিন বলেছিল—জানো গৌরী, কবি কি লিখেছেন—সেই মানুষ আমার কাছে এলো যে মানুষ আমার দূরের, ধরলেও যাকে ধরা যায়না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে ছাড়িয়ে যে যায় তাকে পাওয়া গেল—সেদিন সে

বোঝেনি তার অর্থ—আজ দু'যুগ পরে সে বুঝেছে। পাওয়ার উল্টোদিকই যে ছেড়ে দেওয়া—'আর সকলেরে তুমি দাও, মোর কাছে তুমি চাও'।

রেড়ির পিদিমটা আর একবার উস্কে দিয়ে এলো গৌরী—আগের দিনের কাগজটা তুলে দেখলে—শিশিরের বক্তৃতা—শুধু ভাববিলাসে কিছু হয় না, ফেণার বুদ্বুদে মিলিয়ে যায় সব, হতে হবে বাস্তববাদী, জীবনটা হার্ডফ্যাক্ট।

গৌরী ভাবে—পিদিমটাকে জ্বালিয়ে রাখাই তার কাছে অতি বাস্তব সত্য।

দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। পিদিমটা নিবু নিবু হয়েও জ্বলতে থাকে।

ভাগবতীয় কৃষ্ণ-চরিত্র

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভাগবত

ভাগবত কথাটির অর্থ ভগবানের ভক্ত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বহু ভক্তের কাহিনী আছে। দক্ষ ও নারদের মাঝামাঝি নানা প্রকার ভক্ত। সকাম ও নিষ্কাম ভক্ত। জ্ঞানী ভক্ত। ভক্তদিগের মনও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সাধন বা ভজন প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন।

ভাগবত। ৯ স্ক। ৪র্থ অধ্যায়,—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্তভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ।
সর্ব্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণ কথা কীর্ত্তন করিয়া শুক, তাহাকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদ, তাহার পাদসেবন করিয়া লক্ষ্মী, তাহাকে পূজা করিয়া পৃথু, তাহাকে বন্দনা করিয়া অক্রূর, দাসভাবে তাহার পরিচর্য্যা করিয়া হনুমান, তাহার সহিত সখার মত ব্যবহারে অর্জুন, এবং তাহার নিকট সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া বলিরাজা ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সকাম ভক্ত ধ্রুব

বিমাতা সুরুচির দুর্ব্বাক্যাহত বালক ধ্রুব, পিতৃক্রোড় হইতে বিতাড়িত হইয়া মাতা সুনীতির নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই অপমানের প্রতিকার অন্বেষণ করিলেন। মাতা তাহাকে অন্ত স্তোক দ্বারা নিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন :—

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।

পারে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। ধ্রুব তপস্যা করিতে বাহির হইলেন।

পথে নারদের সহ তাহার সাক্ষাৎ হইল। নারদ তাহাকে এই দুষ্কর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার পরামর্শ দিলেন। বলিলেন, তুমি অত্যন্ত বালক। এখন তোমার খেলিবার সময়। আর মনের মধ্যে রোষ বা দ্বেষভাব না লইয়া মৈত্রীভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু ধ্রুব বলিলেন—

তথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ।
সুরুচ্যা দুর্ব্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি॥

ধ্রুব নারদের বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াও বলিলেন—তথাপি আমার সুরুচির দুর্ব্বাক্য বাণ ভিন্ন ঘোর ক্ষাত্রভাব ধারণকারী অবিনীত মনে আপনার কথা অবস্থান করিতে পারিতেছে না। নারদ তখন ধ্রুবকে একান্ত চিত্তে বাসুদেবকে ভজন করিতে বলিলেন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ।
এক হ্যেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্।

—যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ নিজের শ্রেয়-ইচ্ছা করে এক হরির পাদসেবনই সেই সকল প্রাপ্তির কারণ।

তাহার পর ধ্রুবের তপস্যা ও সিদ্ধি।

অদিতি—সকাম ভক্তিমতী

দৈত্যাধিপতি বলি পরাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গাধিপত্য লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া মনের দুঃখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। দেবমাতা অদিতি পুত্রদিগের দুঃখে মর্ম্মাহত হইলেন। এমন সময়ে ঋষি কশ্যপ তপস্যা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পত্নীকে শোকসাগরে নিমগ্না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অদিতি নিজ দুঃখের বিবরণ বিবৃত করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়ের পরামর্শ চাহিলেন। কশ্যপ তাহাকে শ্রীহরির শরণ লইতে বলিলেন।

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দনম্।
সর্ব্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্ গুরুম্॥
স বিধাস্যতি তে কামান্ হরির্ দীনানুকম্পনঃ।
অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম॥

—পরম পুরুষ ভগবান জনার্দ্দনের শরণ লও। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর-নিবাসী বাসুদেব। তিনিই জগদ্‌গুরু। সেই দীন দয়াল হরি তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন। "ভগবদ্ভক্তি অমোঘ ফলপ্রদ। অন্য আর কিছুই নহে—এই আমার মত।

অদিতি তখন ভগবানকে কিরূপে ভজনা করিতে হইবে তাহার উপদেশ চাহিলেন। ঋষি তাহাকে অর্চ্চাতে, (মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, ধাত্বাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে) স্থণ্ডিলে, (বালুকাদি প্রস্তুত হোমার্থমণ্ডল বিশেষে) সূর্য্যে, জলে, বহ্নিতে বা গুরুতে সমাহিতভাবে হরির উপাসনা করিতে বলিলেন। কশ্যপ প্রদর্শিত বিধি অনুসারে অদিতি ভগবানের উপাসনা করিতে লাগিলেন। কালে তাহার সিদ্ধিলাভ হইল। ভগবান আবির্ভূত হইয়া বরদান করিলেন। তিনি বলিলেন—

মমার্চ্চনং নার্হতি গন্তুমন্যথা
শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ।

—শ্রদ্ধানুরূপ ফলপ্রদানকারী আমার অর্চ্চনা কখনও বিফল হয় না।

শ্রীহরি অদিতির পুত্রগণের রক্ষার্থ বামনদেবরূপে নিজাংশে অদিতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। উপনয়নের পর বামন ব্রহ্মচারী বেশে, নর্ম্মদার উত্তর তীরে, ভৃগুকচ্ছ নামক যে স্থানে বলি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন সেখানে উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ মাত্র ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন। বলি এই সুন্দর ব্রহ্মচারী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন এই সামান্য পরিমিত ভূমি লইয়া কি হইবে। নিজের জীবিকার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভূমি গ্রহণ কর। ভগবান বলিলেন, যদৃচ্ছা লাভ-সন্তুষ্ট হওয়াই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, আমি অধিক চাহি না। বলি তখন তাহাকে উৎসর্গ করিয়া দান করিবার জন্য জল গ্রহণ করিলেন।

বলির গুরু শুক্রাচার্য্য কিন্তু বিষ্ণুকে চিনিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি মায়া মানব রূপধারী হরি। ইনি এক পদে পৃথিবী দ্বিতীয় পদে আকাশ দেশ গ্রহণ করিবেন। তখন তৃতীয় পদে তুমি কি দিবে? প্রতিশ্রুতি পালন না করিতে পারিয়া তোমাকে নরকে যাইতে হইবে। আর নিজের বৃত্তি রক্ষা করিয়াই দানকার্য্য করিতে হয়। বৃত্তি রক্ষার্থ মিথ্যা কথা বলারও শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। অতএব তুমি অস্বীকার কর।

বলি কিন্তু অটল। সত্য হইতে বিচ্যুত হইবেন না। তিনি মন্ত্র পড়িয়া দান করিবামাত্র বামন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া একপদে পৃথিবী এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্গাদি ব্যাপ্ত করিয়া, বলিকে বলিলেন আমাকে তৃতীয় পদের ভূমি দাও।

বলি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেন। বলিলেন, যাহাতে আমার কথা মিথ্যা না হয় তজ্জন্য তৃতীয় পদ আমার মস্তকে অর্পণ করুন। হরি বলির প্রতি পরম প্রীত হইলেন। তাহাকে বলিলেন, আমি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সুতল নামক পুরী নির্দ্দিষ্ট করিতেছি। সেইখানে তুমি অনুগণ পরিবৃত হইয়া বাস কর। সেইখানে তুমি আমাকে সদা সন্নিহিত দেখিতে পাইবে।

পুরাণে নরক বর্ণনা

সব ধর্ম্মেই নরক বর্ণনা আছে। বাইবেলের—Hell। দান্তের—Inferno। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সবিস্তার নরক বর্ণনা আছে। রৌরব, মহারৌরব প্রভৃতি নরকের নাম। কোথাও পাপী অগ্নিকুণ্ডে দহ্যমান হইতেছে। "কোথায় পূতিগন্ধি নরকে কৃমিদষ্ট হইতেছে। ইত্যাদি। একজন পাশ্চাত্য সাধক—সুইডেনবার্গ স্বকৃত স্বর্গ ও নরক নামক (Heaven and Hell) গ্রন্থে স্বর্গ নরক বর্ণনা করিয়াছেন। সুইডেন-বার্গ বৈজ্ঞানিক ও সাধু। কাণ্ট তাহার সমাধি বর্ণনা করিয়াছেন। এমারসন তাহার সুইডেনবার্গ প্রবন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত এই পাশ্চাত্য ঋষির কথা লিখিয়াছেন। তাহার মত পুরাণ ও যোগবাশিষ্ঠের মতের সহ অত্যন্ত মিলে।

খ্রীষ্টিয়ান ও ইহুদীদের অনন্ত নরক বাস মত, ভারতীয় সাধকদের মত সুইডেনবার্গও বাতিল করিয়াছেন। মৃত্যুর পর আত্মার এই পাঞ্চভৌতিক দেহাবরণ থাকে না। অতএব সেই অবস্থায় আত্মার যাহা কিছু ক্লেশ মানসিক—দৈহিক নহে। জগতে কেহই নিরবচ্ছিন্ন পাপী থাকে না। প্রায় লোকেরই পাপ পুণ্যাত্মক মিশ্র কর্ম্ম। সে কর্ম্মের জন্য মনোমধ্যে যে গ্লানি বা প্রসাদ তাহাই নরক বা স্বর্গ। জীবিত অবস্থাতেও লোকে এই স্বর্গ ও নরক অহরহ ভোগ করিতে থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—বা আপাতদৃষ্ট সমৃদ্ধির মধ্যেও। হিন্দু মতে—সুইডেনবার্গেরও মতে এই গ্লানি দ্বারাই লোকে যখন নিজ দুষ্কৃতের জন্য অনুতপ্ত হয় তখন ক্রমশ তাহার পাপক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়।

ভাগবতেও নরক বর্ণনা আছে। তাহা অতি সামান্য। আর ভাগবতের মতে কাহারও নরকে যাইবার প্রয়োজন নাই। নরক হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় এতই সহজ।

অজামিল

অজামিল নামক এক বিপ্রপুত্র এক নীচজাতীয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া নিজ পরিজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারই সহিত বাস করিত। এই দাসীর অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। অজামিল চৌর্য্য, পাশা, অন্যান্য অসদুপায়ে কুটুম্ব পোষণ করিত। এইরূপে তাহার অষ্টাশীতিবর্ষ বয়ক্রম হইল। তাহার ছোট ছেলের নাম ছিল নারায়ণ। সে অজামিলের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে সর্ব্বদাই ছেলেটির নানা ইষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এমন সময়ে তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। যমদূতগণের পাশহস্ত ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া অজামিল উচ্চৈস্বরে নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া প্রিয় পুত্রকে আহ্বান করিল। এই যে শুধু পুত্রকে আহ্বানার্থ নারায়ণ শব্দোচ্চারণ রূপ হরি সঙ্কীর্ত্তন, ইহাতেই অজামিলের যমদূতের হস্ত হইতে অব্যাহতি হইল। বিষ্ণুর মত রূপধারী বিষ্ণুদূতগণ বিশ্বের সর্ব্বত্র বিচরণ

করিতেছেন। তাহারা অজামিলের তথাকথিত হরিকীর্ত্তনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া যমদূতের হাত হইতে অজামিলকে উদ্ধার করিল।

ইহাতে শ্লোক (ভাগবত। ৬ স্ক। ২ অ। ১৪)
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলন মেব বা।
বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণমশেষাঘ হরংবিদুঃ॥

—পুত্রাদি নাম সংকেতের দ্বারাই হউক, পরিহাসের জন্যই হউক, গীতালাপ পূরণের জন্যই হউক, কিম্বা অবহেলা করিয়াই হউক ভগবানের নামোচ্চারণ সর্ব্বপাপহর।

ভাগবতীয় কৃষ্ণ চরিত্র

ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধে কৃষ্ণকথা সামান্য আছে। প্রাচীন ভক্ত ও অবতারগণের কথা। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। একাদশ স্কন্ধের প্রধান বিষয় উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী—যাহা উদ্ধব গীতা নামে খ্যাত। এই গীতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারই অনুরূপ। তবে অর্জুনের কর্ম্ম শেষ হয় নাই বলিয়া ভগবান তাহাকে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। উদ্ধবের কর্ম্ম শেষ হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে মোক্ষ উপদেশই দিয়াছিলেন।

শ্রীধর স্বামী যেরূপ ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাহা অনুমোদন করিয়া ভাগবতধর্ম্মের মূলকথাগুলি সনাতন প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই ব্যাখ্যা আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এখানে বিবৃত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—ভাগবতকে ভক্তির দ্বারা বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে হইবে—বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা নহে। ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বিদ্যয়া ন চ বুদ্ধ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা

শ্রীকৃষ্ণই যে পরমাত্মা ভাগবতে এই ভাবই পুন পুন নানা ভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহার ক্রোধ নাই, লোভ নাই, ভয় নাই, মোহ নাই, কাম নাই। কিন্তু তিনি ভক্তবৎসল। ভক্তের আত্যন্তিক কামনা তিনি পূর্ণ করিয়া ক্রমশ তাহাকে পরাভক্তির পথে লইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান তাহা তিনি নানা অলৌকিক রূপ, গুণ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। ব্রজ-গোপ-গোপী ক্রমে ক্রমে তাহার অপরূপ রূপলাবণ্য, গুণ ও শক্তির দ্বারা মোহিত হইতেছিলেন। তিনি যে পরমাত্মা তাহাদের এ জ্ঞান একটু একটু করিয়া জন্মিতেছিল। ক্রমশ তাহারা সকাম ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বিপদ হইলেই কৃষ্ণ রক্ষা কর বলিয়া তাহার শরণ লইতেন।

দৃষ্টান্তঃ—ভা। ১০ স্ক। ২১ অঃ—বৃন্দাবনের গোপালকদিগের গো, অজ ও মহিষাদি এক দিবস তৃণ লোভে অতি দূরে গমন করিল। গোপগণ তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তভাবে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ মেঘ গম্ভীর শব্দে গোগণের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গোগণ তাহাতে আনন্দের সহিত প্রতিনাদ করিল। গোপালগণ অচিরে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। এমন সময়ে এক ভীষণ দাবাগ্নি বনমধ্যে উদ্ভূত হইল। তাহার জ্বালায় গো ও গোপগণ বিহ্বল হইয়া রামকৃষ্ণের শরণ লইল :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামিত বিক্রমঃ।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাং স্ত্রাতুমর্হথ॥

—আমাদিগকে দাবাগ্নি হইতে রক্ষা কর।

যোগাধীশ কৃষ্ণ তাহাদিগকে অভয় দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিলেন। তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিলে কৃষ্ণ যোগবলে সেই দাবাগ্নি পান করিলেন। গোপগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া আর দাবাগ্নি দেখিতে পাইলেন না। তাহারা কৃষ্ণের যোগশক্তি বুঝিয়া বিস্মিত হইলেন।

কৃষ্ণের পরামর্শে গোপগণ মহেন্দ্র পূজা বন্ধ করিলে, ইন্দ্র কুপিত হইয়া বৃন্দাবনে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আনিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলেন।

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ।২৫ অঃ

—অতি বৃষ্টি ও অতি বাতের জন্য পশু সকল কম্পিত হইতে লাগিল। শীতার্ত্ত গোপ ও গোপীগণ গোবিন্দের শরণ লইল।

কৃষ্ণ তখন গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

ভা। ১০ স্ক। ৩৪ অ। :—

গোপগণ অম্বিকা-বনে গিয়া সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া দেব পশুপতি ও দেবী অম্বিকার পূজা করিয়া রাত্রিকালে নদী তীরেই সকলে শয়ন করিলেন। এমন সময় এক ক্ষুধার্ত্ত মহাসর্প সেখানে আগমন করিয়া নন্দকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। নন্দের চীৎকারে গোপগণ জাগ্রত হইয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠ দিয়া সর্পকে প্রহার করিয়াও নন্দকে সর্প কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। নন্দ তখন চীৎকার করিয়া কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন :—

স চুক্রোশাহিনাগ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্।
সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয়॥

—হে তাত কৃষ্ণ, এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করিতেছে। আমি তোমার শরণ লইলাম। আমাকে মুক্ত কর।

ঐ সকল উদাহরণ হইতে জানা যাইতেছে যে নন্দাদির প্রথমকালীন কৃষ্ণভক্তি সকাম। উহা ক্রমশ নিষ্কাম ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণই যে পরমাত্মা তাদের সে জ্ঞান ক্রমে ক্রমে দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিল।

ভা। দশম স্কন্ধ। ২৬ অঃ—

এই অধ্যায়ে গোপগণ নন্দের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কার্য্যাবলীর বর্ণনা করিলে নন্দ তাহাদিগকে পূর্ব্বে নামকরণ সময়ে গর্গমুনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে

তস্মান্নন্দ কুমারোঽয়ং নারায়ণ সম গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ॥
ইত্যদ্ধা মা সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্॥

গর্গ বলিয়াছিলেন—নন্দ এই কুমার শ্রী, কীর্ত্তি বিক্রমে ও গুণে নারায়ণের সমান। অতএব তাহার কর্ম্মে বিস্ময় করিবার কিছু নাই। এই বলিয়া গর্গ স্বগৃহে গমন করিলে এই বালককে আমার নারায়ণের অংশ বলিয়াই মনে হয়।

রাসের পূর্ব্বেও গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণই যে পরম পুরুষ এই জ্ঞান উপজিত হইয়াছিল।

ভা। ১০ স্ক। ৩১ অঃ।—গোপী গীতে :—

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিত বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান সাত্বতাং কুলে॥

—তুমি শুধু গোপিকানন্দনই নহ। তুমি অখিল দেহিগণের অন্তরাত্মা-দর্শনকারী। হে সখে, তুমি ব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া বিশ্বরক্ষার জন্য ভক্তগণের কুলে উদিত হইয়াছ।

শ্রীকৃষ্ণই যে নারায়ণের অবতার একথা শুধু বৃন্দাবনে নহে মথুরাতেও প্রচারিত হইয়াছিল। অক্রূর যখন কংসের নির্দ্দেশে কৃষ্ণকে আনিতে বৃন্দাবনে গমন করেন তখন কৃষ্ণ যে পরমেশ্বর অক্রূরের একথা দৃঢ় জ্ঞান হইয়াছিল। অক্রূরের স্বগতোক্তির মধ্যে বিষ্ণুই যে নিজের ইচ্ছায় ভূমির ভার অপহরণের জন্য কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনিই যে প্রধান পুরুষ এইরূপ কথা আছে। রামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া অক্রূর তাহাদের চরণতলে পতিত হইলেন :—

ভা। ১০ স্ক। ৩৯ অঃ—

পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রাম কৃষ্ণয়োঃ।
ভগবদ্দর্শনাহ্লাদ—বাষ্প পর্য্যাকুলেক্ষণঃ।

—ভগবানের দর্শনাহ্লাদে তাহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল।

কৃষ্ণ যখন কংসের সভায় অবতীর্ণ হইলেন তাহার বর্ণনা—ভা। ১০ স্ক। ৪৩ অঃ।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীনাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ ১৭॥

—মল্লদিগের পক্ষে বজ্র স্বরূপ, নরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর, স্ত্রীগণের নিকট মূর্ত্তিমান কন্দর্প, গোপগণের স্বজন, অসৎ রাজাদিগের শাস্তা, পিতামাতার নিকট শিশু স্বরূপ, ভোজপতির (কংস) পক্ষে মৃত্যু স্বরূপ, বিদ্বানদিগের বিরাট, যোগীদিগের পরম তত্ত্ব, বৃষ্ণিদিগের পরদেবতারূপে জ্ঞাত শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত রঙ্গ স্থলে প্রবেশ করিলেন।

সভায় উপস্থিত জনবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহারা তাহাকে যেন চক্ষুর দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করিতে লাগিলেন, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন :—

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি।
অবতীর্ণা বিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি।
পুতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ।
অর্জ্জুনৌ গুহ্যকঃ কেশী ধেনুকোঽন্যে চ তদ্বিধাঃ॥
গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ।
কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ॥
সপ্তাহমেক হস্তেন ধৃতোঽদ্রিপ্রবরোঽমুনা।
বর্ষবাতাশনিভ্যশ্চ পরিত্রাতঞ্চ গোকুলং॥

—ইহারা সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের অংশে বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পুতনা প্রভৃতি দানবদিগকে ইনি নিহত করিয়াছেন। দাবাগ্নি হইতে সবৎস গাভীদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। সর্প কালিয়কে দমন করিয়াছেন। ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। ইনি সপ্তাহকাল এক হস্তের দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত-ধারণ করিয়া বর্ষা, বাতাস ও বজ্র হইতে গোকুলকে রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম যখন কংসের নিধনের পর বসুদেব দেবকীকে মস্তক দ্বারা তাহাদের পাদস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন, তখন পিতামাতাও পুত্রদিগকে জগদীশ্বর ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে শঙ্কিত হইলেন :—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃত সংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥ (ক্রমশঃ)

বার্টাণ্ড রাসেল

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বর্ত্তমান যুগের জীবিত দার্শনিকদিগের মধ্যে বার্টাণ্ড রাসেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইংলণ্ডের এক প্রাচীনতম অভিজাত বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতামহ লর্ড জন রাসেল ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের নেতা এবং প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতা ভাইকাউণ্ট এম্বার্লি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার উপাসক। তাঁহার ভ্রাতা আর্ল রাসেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বার্টাণ্ড রাসেল তাঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি আর্ল উপাধি গ্রহণ করেন নাই। বার্টাণ্ড রাসেল নামে তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি কেম্বি‌‌্রজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিরোধিতা করায়, ইংলণ্ডের জনগণ তাঁহার প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে তিনি তাঁহার অধ্যাপক-পদ হইতে অপসৃত হন। ইহার পরে কিছুকাল তিনি নানা দেশে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

উইল ডুর‍্যাণ্ট লিখিয়াছেন, "বার্টাণ্ড রাসেল দুইজন। একজন ছিলেন গণিতবিদ্ নৈয়ায়িক। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শবাধার হইতে দ্বিতীয় বার্টাণ্ড রাসেল মিষ্টিক-কমিউনিষ্ট-রূপে বহির্গত হন। হয়তো একটা কোমল মিষ্টিক-ভাব চিরকালই তাঁহার মধ্যে ছিল। প্রথমে রাশীকৃত বীজগণিতের সূত্ররূপে তাহার প্রকাশ হইয়াছিল। পরে তাহাই ধর্ম্মভাবানুপ্রাণিত সাম্যবাদে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাসেলের একখানা গ্রন্থের নাম Mysticism and Logic। এই গ্রন্থে তিনি মিষ্টিক ভাবের অযৌক্তিকতাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া, পরে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর এতই গৌরব খ্যাপন করিয়াছেন, যে তাহা হইতে মনে হয় 'লজিকের' মধ্যেই বা কোনও মিষ্টিক শক্তি আছে। ইংলণ্ডের পণ্ডিতি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রাসেল কঠিনমনা (tough minded) হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কেন না তিনি জানিতেন, কঠিনমনা হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব!"

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে রাসেল আমেরিকায় গমন করেন। এই সময়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি "বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উইল ডুর‍্যাণ্ট লিখিয়াছেন "রাসেল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার বক্তৃতার বিষয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের (Epistemology) মতই কৃশ, রক্তহীন এবং মৃতকল্প প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চারিত প্রত্যেক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছিল। মহাযুদ্ধ তখন কেবল আরম্ভ হইয়াছে। এই কোমল-হৃদয়, শান্তিপ্রিয় দার্শনিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ মহাদেশকে বর্ব্বরতার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া মনে ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের" মত জীবন হইতে এত দূরবর্ত্তী বিষয়ে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দেখিয়া মনে হইয়াছিল, তাঁহার বক্তৃতার বিষয় যে দূরবর্ত্তী, তাহা তিনি জানিতেন এবং যে ভীষণ বাস্তব ব্যাপার সংঘটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা হইতে দূরে থাকিতেই তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তখন ক্ষণেকের জন্য সজীবিত, বাস্তবতা-বর্জ্জিত, চিন্তা (abstractions) অথবা গণিতের সূত্র (formula) বলিয়া মনে হইয়াছিল।"

রাসেলের গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আছে—(1) Introduction to Mathematical Philosophy. (2) Mysticism and Logic. (3) Principles of Social Reconstruction. (4) The Problems of Philosophy. (5) The Philosophy of Leibnitz (6) The Analysis of Mind (7) The Analysis of Matter. (8) Roads to Freedom. (9) Why Men Fight. (10) History of Western Philosophy.

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রাসেল প্রধানতঃ লজিক ও গণিতের চর্চ্চাতেই নিবিষ্ট ছিলেন। গণিতের সনাতন সত্য এবং নিরপেক্ষ জ্ঞান-কর্ত্তৃক তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ গণিতের প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে তিনি প্লেটোর প্রত্যয়-জগতের এবং স্পিনোজার সনাতন শৃঙ্খলার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে গণিতের নিশ্চিতিই দর্শনের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং দার্শনিক সত্য প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ (apriori) হওয়া উচিত। তাহাদের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ থাকিবে না, সম্বন্ধ থাকিবে "সম্বন্ধের" (relations), সার্বিক সম্বন্ধের। বিশেষ বিশেষ তথ্য এবং ঘটনার অপেক্ষা তাহারা করিবে না। জগতের প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতি যদি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তথাপি দার্শনিক সত্যের অন্যথা হইবে না। যদি সকল ক হয় খ, এবং স হয় ক, তাহা হইলে স হয় খ—ইহা চিরন্তন সত্য, 'ক'র প্রকৃতির উপর ইহার সত্যতা নির্ভর করে না। Mysticism and Logicএ তিনি লিখিয়াছেন"সার্বিকদিগের জগৎ (World of Universals)কে সত্তার জগৎ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। সত্তার জগৎ অপরিণামী, অ-নমনীয় ও নিশ্চিত। গণিতবিদ্ নৈয়ায়িক এবং দার্শনিকের নিকট এবং জীবন অপেক্ষা পূর্ণতাই যাহাদের প্রিয়তর, তাহাদের সকলের নিকটই, এই জগৎ আনন্দ-প্রদ।" "বীজ-গণিতের মত তর্ককে সাঙ্কেতিকে পরিণত করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে গণিতের নিয়মের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।...বিশুদ্ধ গণিতে যে সকল উক্তি আছে, তাহাদের মর্ম্ম এইরূপ যে, যদি কোনও প্রতিজ্ঞা কোনও বস্তু-সম্বন্ধে সত্য হয়, তাহা হইলে অন্য একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞাও সেই বস্তু-সম্বন্ধে সত্য হইবে। প্রথম প্রতিজ্ঞা

সত্য কি না, তাহার আলোচনা নিষিদ্ধ। যে যে বস্তু-সম্বন্ধে প্রথম প্রতিজ্ঞা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার নাম করাও নিষিদ্ধ।...সুতরাং বলা যায়, যে যে বিষয়ের আলোচনাকালে আমরা কোন্ বস্তুর কথা বলিতেছি, তাহা জানি না, এবং যাহা বলিতেছি তাহা সত্য কি না, তাহাও জানি না, সেই বিষয়ই গণিত।"

রাসেল সুস্পষ্ট চিন্তার অনুরাগী ছিলেন। এই অনুরাগ হইতেই তাঁহার গণিতের প্রতি প্রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন "ঠিক ভাবে দেখিলে গণিতের মধ্যে যে কেবল সত্য আছে, তাহা নহে; পরম সৌন্দর্য্যও আছে। সে সৌন্দর্য্য স্থাপত্যের সৌন্দর্য্যের মত উত্তাপবিহীন ও গম্ভীর। আমাদের প্রকৃতির দুর্বল অংশের উপর তাহার কোনও প্রভাব নাই। চিত্র-কলা অথবা সুরকলার উজ্জ্বল পরিচ্ছদ তাহার না থাকিলেও, তাহা পরম বিশুদ্ধ, এবং যে অনবদ্য পূর্ণতা কেবল সর্ব্বোত্তম কলাসৃষ্টিরই অধিগম্য, তাহা ইহারও সাধ্যায়ত্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণিতের যে অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, তাহাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। পূর্ব্বে "গণিতের অসীম" (mathematical Infinite) সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা ছিল, তাহাদের সমাধানে আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যে জ্যামিতি দুই সহস্র বৎসর যাবৎ গণিতের দুর্গ অধিকার করিয়া বসিয়া ছিল, এই শতাব্দীতে তাহার ধ্বংস সাধিত হইয়াছে এবং জগতের প্রাচীনতম পাঠ্য পুস্তক, ইউক্লিডের গ্রন্থ, অবশেষে স্থান-চ্যুত হইয়াছে। এখনও যে ইংলণ্ডে বালকদিগকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা লজ্জাজনক। যে সকল প্রতিজ্ঞা বহুদিন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহাদের বর্জ্জনের ফলেই আধুনিক গণিতে নূতন নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, রাসেল তাহারও প্রমাণ দাবী করেন। সমান্তরাল রেখাসকল কখনও একত্র মিলিত হয় না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া পূর্ব্বে ধারণা ছিল। কিন্তু প্রমাণিত হইয়াছে, যে সীমাহীন দূরে তাহারা মিলিত হইতে পারে। সমগ্র কোনও বস্তু তাহার অংশ অপেক্ষা বৃহৎ না হইতেও পারে, ইহা রাসেল প্রমাণ করিয়াছেন। যত সংখ্যা আছে, যুক্ত সংখ্যা সকলের সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক। ইহা সকলেই জানে। রাসেলের পাঠকগণ শুনিয়া চমকিত হইলেন, যে যুক্ত ও অযুক্ত মিলিয়া যত সংখ্যা আছে, যুক্ত সংখ্যাগণ তাহার সমান। ইহা বোঝা কঠিন নহে। কেননা যুক্ত ও অযুক্ত প্রত্যেক সংখ্যার যাহা দ্বিগুণ, তাহা যুক্ত সংখ্যা। সুতরাং যুক্ত ও অযুক্ত যত সংখ্যা আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই দ্বিগুণিত যুক্ত সংখ্যার সংখ্যা তাহাদের সংখ্যার সমান। সংখ্যা অসীম-সংখ্যক বলিয়াই এই অসম্ভব সম্ভবপর হয়। সংখ্যার সংখ্যা অসীম। প্রত্যেক সংখ্যার মধ্যে যত একক আছে, তাহাদের সমষ্টিও অসীম। সুতরাং অসীমসংখ্যক সংখ্যার মধ্যে যত একক আছে, তাহাদের সংখ্যা সেই সকল সংখ্যার সমষ্টির সমান। ইহা প্রহেলিকার মত শোনাইলেও সত্য।

গণিতের নিশ্চিতি ধর্ম্মের মধ্যে না পাইয়া রাসেল ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। খৃষ্ট-ধর্ম্মে যাহারা অবিশ্বাসী, যে সভ্যতা তাহাদের উপর উৎপীড়ন করে, আবার যাহারা খৃষ্টের উপদেশ ঠিকভাবে গ্রহণ করে, তাহাদিগকেও কারারুদ্ধ করে, তিনি তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। এই দ্বন্দ্ব-সমাকুল জগতে তিনি কোনও ঈশ্বরকে দেখিতে পান নাই। মানুষের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধেও তিনি কোনও আশা পোষণ করেন নাই। A Freeman's Worship প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "যে যে কারণ হইতে মানুষের উৎপত্তি (তাহারা অচেতন বলিয়া) তাহাতে উদ্দেশ্য ছিল না। মানুষের উৎপত্তি, মানব সমাজের বৃদ্ধি ও উন্নতি, মানুষের আশা ও ভয়, তাহার ভালবাসা ও বিশ্বাস সকলই পরমাণুপুঞ্জের আকস্মিক সমবায়ের ফল। উৎসাহ, বীরত্ব, চিন্তা ও ভাবের তীব্রতা, কিছুতেই মৃত্যুর পরপারে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা করিতে পারে না। মানুষের যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী সাধনা, তাহার নিষ্ঠা, তাহার প্রেরণা, মানবীয় প্রতিভার মাধ্যাহ্নিক

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

জ্যোতিঃ সমস্তই সৌরজগতের বিরাট মৃত্যুর মধ্যে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে, এবং মানবকীর্ত্তির-সমগ্র-সৌধ বিধ্বস্ত বিশ্বের ধ্বংসাবশেষের বন্যার নিম্নে অনিবার্য্য সমাধি-প্রাপ্ত হইবে। এই মত সর্ব্বসম্মত না হইলেও নৈশ্চিত্যের এতই নিকটবর্ত্তী, যে ইহাকে বর্জ্জন করিয়া কোনও দর্শনেরই টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই।"

প্রথম মহাযুদ্ধ-আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে রাসেলের মনে ভীষণ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। রক্তপাত তিনি ঘৃণা করিতেন। সহস্র সহস্র যুবককে মরণের পথে যাত্রা করিতে দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে তিনি

প্রায় "একঘরে" হইলেন। অনেক বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হইল। তাঁহাকে লোকে দেশদ্রোহী বলিতে লাগিল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। রাসেল যুদ্ধ কেন ঘটে, তাহার চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই চিন্তার ফলই তাঁহার সাম্যবাদ। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেই তিনি যুদ্ধের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদই তাঁহার নিকট যুদ্ধ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়া প্রতীত হইল। সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিই চৌর্য্য ও দস্যুতার ফল। কিম্বার্লির হীরক-খনি ও র‍্যাণ্ডের স্বর্ণ খনি সকলই দস্যুতা-লব্ধ। তিনি লিখিয়াছেন, ভূমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব হইতে সমাজের কোনও লাভ হয় না। মানুষ যদি যুক্তির পথে চলিত, তাহা হইলে অচিরেই জমিতে ব্যক্তিগত 'স্বত্ব' রহিত করিত। ভূমির বর্ত্তমান অধিকারীদিগকে ইহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনত্যধিক জীবনব্যাপী বৃত্তি দিলেই যথেষ্ট।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষিত হয় রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক। যে দস্যুতা-দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদ-কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত হয় এবং অস্ত্র-দ্বারা এই সম্পত্তির ভোগের নিশ্চিতি সাধিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র অমঙ্গলের আকর। যদি রাষ্ট্রের কার্য্যের অধিকাংশ সমবায়ী সমিতি অথবা শিল্পীদিগের সংঘ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়; তাহা হইলে তাহার ফল ভাল হইবার কথা।

ব্যক্তিত্বের মূল্য (Value of human individuality) সম্বন্ধে রাসেল লিখিয়াছেন, সুখী, স্বাধীন এবং সৃজন-সমর্থ ব্যক্তিদ্বারা গঠিত সমাজই বড় সমাজ। সমস্ত ব্যক্তিকেই যে একরূপ হইতে হইবে, তাহা নহে। অরচেষ্ট্রায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র বাজায়, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্য এক বলিয়া সঙ্গতির উৎপত্তি হয়, সমাজেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের উদ্দেশ্যের সমতা হইতে সামাজিক সঙ্গতির উদ্ভব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া তাহার গর্ব্ব থাকা উচিত। তাহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান-অনুসারে কর্ম্ম করিবার এবং নিজের লক্ষ্য অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই থাকা উচিত— যতক্ষণ না তাহার কর্ম্ম দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হয়। দারিদ্র্য এবং কষ্ট বিদূরিত করা, জ্ঞানের বৃদ্ধি করা এবং সৌন্দর্য্য ও কলার সৃষ্টি করা সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়কমাত্র। পূজার বস্তু নহে। বর্ত্তমানে জীবন এবং জ্ঞান এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে, যে ভ্রান্তি এবং কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া সত্যে উপনীত হওয়া কেবল স্বাধীন আলোচনা দ্বারাই সম্ভবপর। অচল ধারণা এবং যুক্তিহীন বিশ্বাস হইতে ঘৃণা এবং যুদ্ধের উদ্ভব হয়। চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা-দ্বারা ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হয়।

শিক্ষা-সম্বন্ধে রাসেল বলিয়াছেন;—আমরা মনে করি কতকগুলি বিষয়ের নির্দ্ধারিত জ্ঞান-দানই শিক্ষা; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানসিক অভ্যাসকে বিজ্ঞানানুসারী করাই শিক্ষা। বুদ্ধিহীন লোকে তাড়াতাড়ি মত গঠন করে এবং তাহার মতকে অবিচলিত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বৈজ্ঞানিক সহজে কিছু বিশ্বাস করেন না, এবং মত-পরিবর্ত্তন অধিকতর ব্যবহার হইতে যে জ্ঞান-বিবেকের উদ্ভব হইবে, তাহার ফলে আমাদের বিশ্বাস প্রমাণ করে অতিক্রম করিবে না, এবং সে বিশ্বাস যে ভ্রান্ত হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। আমাদের চরিত্রের সহজাত অংশে অত্যন্ত নমনীয়। আমাদের বিশ্বাস, বাহ্য অবস্থা, সামাজিক অবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান-দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর। শিক্ষা-দ্বারা অর্থ অপেক্ষা কলার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা অসম্ভব না হইতে পারে। রেনেসাঁর সময় তাহাই হইয়াছিল। শিক্ষাকে এমন ভাবে পরিচালিত করাও সম্ভবপর, যে তাহা দ্বারা সৃজন-বৃত্তির পোষণ এবং সম্পত্তি-অর্জ্জনের প্রবৃত্তি ও লোভের খর্বতা সাধিত হইতে পারে। ইহাই উন্নতির (growth) মূল কথা, এই তত্ত্ব হইতে দুইটী স্বতঃ সিদ্ধের উদ্ভব হয়। প্রথমটি শ্রদ্ধা- তত্ত্ব; দ্বিতীয়টি পরমতসহিষ্ণুতা-তত্ত্ব। ব্যক্তি ও সমাজের জীবনী শক্তির পুষ্টির সহায়তা করিতে হইবে, ইহাই শ্রদ্ধা-তত্ত্ব। কোনও বিশেষ ব্যক্তি অথবা সমাজের উন্নতিকল্পে অন্য ব্যক্তি অথবা সমাজের ক্ষতি যাহাতে না হয়, যথা সম্ভব তাহা দেখিতে হইবে। আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সকলের যদি উন্নতি করা যায়, তাহাতে শিক্ষার ভার যদি উপযুক্ত লোকের উপর ন্যস্ত হয়, যদি উপযুক্তভাবে তাহাদিগকে মানব-চরিত্রের সংস্কারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে মানুষের অসাধ্য কোনও কর্ম্ম থাকে না। বলপ্রয়োগে বিপ্লব আনয়ন অথবা আইন দ্বারা অর্থলোভ এবং আন্তর্জ্জাতিক পাশবিকতা দমন করা—অসম্ভব। শিক্ষা সংস্কার-দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। শিক্ষা-দ্বারা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে ও আপনার স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম করা যাইতে পারে।

কিন্তু শিক্ষাদ্বারা অসম্ভবকে সম্ভবপর করিবার ক্ষমতার উপর এই বিশ্বাস, এই আশাবাদের মূল্য কি? "মানুষের যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনা ও মানবীয় প্রতিভার মাধ্যাহ্নিক জ্যোতিঃ সৌরজগতের বিরাট মৃত্যুর মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, এবং মানবকীর্ত্তির সমগ্র সৌধ বিধ্বস্ত বিশ্বের ধ্বংসাবলীর নিম্নে সমাধিপ্রাপ্ত হইবে" ইহাই যদি মানবসভ্যতার পরিণাম হয়, তাহা হইলে শিক্ষার উন্নতি-দ্বারা অসাধ্যসাধনের চেষ্টায় লাভ কি? ধর্ম্ম ও দর্শনের আলোচনা কালে রাসেল তাঁহার মনের যে মিষ্টিক ও কোমলভাব দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সমাজতন্ত্রের আলোচনায় তাহা বন্ধনমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। যে সংশয়বাদ ও স্বতঃসিদ্ধের প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ গণিত ও তর্কশাস্ত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতে প্রয়োগ করেন নাই। মানবসমাজের ভবিষ্যতের যে মনোহারী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কবিত্বপূর্ণ হইলেও জীবনের সমস্যা-সমাধানে কতটা সক্ষম, তাহাতে সন্দেহ আছে। মানব-সমাজে অর্থ অপেক্ষা কলা অধিকতর আদৃত হইবে, এ কল্পনায় সুখ আছে; কিন্তু যতদিন জাতির উত্থান-পতন তাহাদের আর্থিক সম্পদ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে, ততদিন আর্থিক সম্পদ দ্বারাই যে সকল জাতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবে,

রাসেলের স্বপ্ন স্থায়ী হইতে পারে নাই। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফল দেখিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। যেরূপ গণতন্ত্র তাঁহার আদর্শ ছিল, রাশিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হয় নাই। তথায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তিনি দেখিতে পান নাই। প্রচারকার্য্যের সমস্ত পথ রাষ্ট্র ভিন্ন অন্য সকলের নিকট রুদ্ধ দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। রাশিয়ার অধিবাসিগণের নিরক্ষরতা বর্ত্তমান অবস্থায় মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কেননা পড়িতে যাহারা সক্ষম, রাষ্ট্রের ইচ্ছামতই তাহাদের মত গঠিত হইবে। রাসিয়ার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল, যে পিতার সম্পত্তি যদি সন্তানে ভোগ করিতে না পায়, তাহা হইলে ভূমির উন্নতি সাধিত হইবে না, কৃষিকার্য্যও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন (Value of Human Individuality, Amrita Bazar Patrika, Dec. 3. 1950), সোভিয়েট রাশিয়ায় মানুষের মর্য্যাদা বলিয়া কিছুই নাই। মানুষ দাসের মত রাষ্ট্রের অধ্যক্ষদিগের পদানত হইয়া থাকিবে, ইহাই সেখানে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। যাঁহারা ব্যক্তিত্বকে মূল্যবান বলিয়া মনে করেন, এই মনোভাবের সহিত তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। এই মনোভাব যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে মানব-জীবনের মধ্যে যাহা মূল্যবান, তাহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবে, এবং মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুতে পরিণত হইবে। এই অসম্মান হইতে মানব সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য শান্তিপ্রিয় রাসেল যুদ্ধেরও সমর্থন করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

গান

যুগের যে ব্যথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে
বাণীরূপে তারে
চাই যে রাখিতে ঘিরে।
সে ব্যথা বহ্নিরূপে
জ্বলে এ হিয়ার ধূপে
এ মহাপৃথিবী
ভেসে যায় আঁখি নীরে।

আমি চাই সেই
মৌন হৃদয় বাণী
ফুটিয়ে তুলুক
গানের কমলখানি!
জীবনের ব্যথারাশি
যদি না বাজায় বাঁশি
সে সুর কেমনে
দোলা দেবে হিয়া তীরে।

কথা ঃ গোপাল ভৌমিক — সুর ও স্বরলিপি ঃ শ্রীবুদ্ধদেব রায়

II জ্ঞা রসণ্া সা I জ্ঞা জ্ঞা মা I পা ধা ণর্সা I ণা ধপমা পা I
যু গে র যে ব্য থা কাঁ দি য়া কাঁ দি য়া

দা পা পা I পা পা পা I জ্ঞা পা পা I পা গপদর্সা ণা I
ফি রে ০ ০ ০ ০ বা ণী রূ পে তা রে

জ্ঞা পা মা I জ্ঞা সা ঋা I জ্ঞা জ্ঞা সা I -া -া -া II
চা ই যে রা খি তে ঘি ০ রে ০ ০ ০

II মা দা দা I না র্সা ঋ্া I র্সা না -া I -া -া -া I
সে ব্য থা ব হ্ ন্ হি রূ পে ০ ০ ০ ০

দা না র্সা I ঋর্ ঋর্সনা না I না র্সা -া I -া -া -া I
জ লে এ হি য়া য় ধূ পে • • • •

র্সা র্সর্রা র্সণা I ণা ণা ণা I পা ণা র্সা I র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I
এ ম হা পৃ থি বী ভে সে যা • • •

পা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রর্সা র্সা র্রর্সনা I না র্সা -া I -া -া -া II
ভে সে যা য় আঁ খি নী রে • • • •

বাণীরূপে তারে ইত্যাদি·········

II সা গা গা I গা গা গা I গমা পণা র্সণা I পা মা পা I
আ মি চা ই সে ই ম উ ন হৃ দ য়

গা মা -া I -া -া -া I মা দা দা I দা ণদা মা I
বা ণী • • • • ফু টি য়ে তু লু ক

মা র্সা র্সা I র্সা র্রর্সনা না I না র্সা র্সা I -া -া -া II
গা নে র ক ম ল খা নি • • • •

II মা দা দা I না র্সা ঋর্া I র্সা না -া I -া -া -া I
জী ব নে র ব্য থা বা শী • • • •

দা না র্সা I ঋর্ঋর্সনা না I না র্সা -া I -া -া -া I
য দি না বা জা য় বাঁ শী • • • •

র্সা র্সর্রা র্সণা I ণা ণা ণা I পা ণা র্সা I র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I
সে সু র কে ম নে দো লা দে বে • •

পা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রসা র্সা র্রর্সনা I না র্সা -া I -া -া -া I
দো লা দে বে হি য়া তী রে • • • •

বাণীরূপে তারে ইত্যাদি·········

(চিত্র-নাট্য)

ফেড্ ইন।

সোনালী রৌদ্রভরা প্রভাত।

বাড়ীর পাশে গোলাপ বাগান; শিশিরে ঝলমল্ করিতেছে। নন্দা একটি গানের কলি মৃদুকণ্ঠে গুঞ্জন করিতে করিতে ফুল তুলিতেছিল। তাহার মুখখানি শিশির-খচিত অর্ধ-বিকচ গোলাপ ফুলের মতই নবোন্মেষিত অনুরাগের বর্ণে রঞ্জিত!

কয়েকটি সবৃন্ত গোলাপ তুলিয়া নন্দা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ঠাকুর ঘর হইতে ঠুং ঠুং ঘণ্টির আওয়াজ আসিতেছে। যদুনাথ পূজায় বসিয়াছেন; যুক্ত করে মুদিত চক্ষে মন্ত্র পড়িতেছেন, আর মাঝে মাঝে ঘণ্টি নাড়িতেছেন। নন্দা আসিয়া দুইটি গোলাপ ফুল ঠাকুরের সিংহাসন প্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিল, তারপর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ড্রয়িংরুম। দিবাকর খোলা জানালায় পিঠ দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে, কাগজে তাহার মুখ ঢাকা পড়িয়াছে। নন্দা আসিয়া টেবিলের ফুলদানীতে ফুল রাখিল। দিবাকর কাগজে মগ্ন, নন্দার আগমন জানিতে পারিল না। নন্দা তখন একটু গলা ঝাড়া দিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দিল। দিবাকর তাড়াতাড়ি কাগজ নামাইয়া দেখিল, নন্দা ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

কাট্।

উপরে নিজের ঘরে গিয়া নন্দা বাকি ফুলগুলি ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিল। কিন্তু একটি ফুলের স্থানাভাব ঘটিল, ফুলদানীতে ধরিল না। নন্দা ফুলটি হাতে লইয়া এদিক ওদিক তাকাইল, কিন্তু কোথাও ফুলটি রাখিবার উপযুক্ত স্থান পাইল না। তখন সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

দিবাকরের ঘরে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া নন্দা দেখিল সেখানেও ফুল রাখিবার কোনও পাত্র নাই। দিবাকরের সম্পরিকৃত বিছানা পাতা রহিয়াছে। নন্দা গিয়া ফুলটি মাথার বালিসের উপর রাখিয়া দিল, তারপর লজ্জারুণ মুখে ঘর হইতে পলাইয়া আসিল।

কাট্।

নীচে ড্রয়িংরুমে দিবাকর তখনও সংবাদপত্র পাঠ শেষ করে নাই, যদুনাথ লাঠি ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার পশ্চাতে সেবক।

যদুনাথ: এই যে দিবাকর—

দিবাকর তাড়াতাড়ি কাগজ মুড়িয়া আগাইয়া আসিল।

দিবাকর: আজ্ঞে—

যদুনাথ চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় দিবাকরের প্রতি তাঁহার প্রীতির ভাব আরও গভীর হইয়াছে।

যদুনাথ: তারপর, কাগজে নতুন খবর কিছু আছে নাকি?

দিবাকর: কিছু না। তবে জিনিষ পত্তরের দাম বেড়েই চলেছে। একে-লগন্সা চলছে, তার ওপর দোলও এসে পড়ল—

যদুনাথ: ওঃ, তাই তো, দোল এসে পড়ল; এখনও দোলের বাজার করানো হয় নি। সেবক, নন্দাকে ডাক্—

সেবক: এবার কিন্তু বাবু আমার জন্যে এক শিশি চামেলির তেল চাই, তা ব'লে দিচ্ছি।

যদুনাথ: তুই চামেলির তেল কি করবি?

সেবক: বৌ চেয়েছে।

বলিয়া সেবক সলজ্জ ভাবে নন্দাকে ডাকিতে গেল।

দিবাকর: কি কি বাজার করতে হবে?

যদুনাথ: আমি কি ছাই সব জানি? নন্দা জানে। পুজোর সময় আর দোলের সময় অনেক বাজার করতে হয়; নিজেদের জন্যে, চাকর বাকরদের জন্যে কাপড় চোপড়, আরো কত কি। এই যে নন্দা!

সেবকের দ্বারা অনুসৃত হইয়া নন্দা প্রবেশ করিল।

নন্দা: দাদু, আজ কি দোলের বাজার করতে যাওয়া হবে?

যদুনাথ: আজ! তা বেশ, আজই যা।

নন্দা: তুমি যাবে না?

যদুনাথ: আমি পারব না, আমার হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। মন্মথ কোথায়?

নন্দা: দাদা ঘুমচ্ছে। দাদা কি ন'টার আগে কোনও দিন বিছানা ছেড়ে ওঠে!

যদুনাথ: হুঁ, লগ্নে কেতু কিনা, ও তো আল্‌সে-কুঁড়ে হবেই। তমোগুণ—তমোগুণ। তা দিবাকর যাক তোর সঙ্গে।

নন্দা মনে মনে খুশী হইল, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিল না।

নন্দা: বেশ তো। কেউ একজন হ'লেই হ'ল।

দিবাকর: কি কি কিনতে হবে তার একটা ফিরিস্তি—

নন্দা: ফিরিস্তি আমার তৈরি আছে।

সেবক: আমার চামেলির তেল কিন্তু ভুলোনা দিদিমণি।

নন্দা: আচ্ছা আচ্ছা। তুই ড্রাইভারকে গাড়ী বার করতে বল্। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়া ভাল, বারোটার আগে ফিরতে পারব।

সেবক: ডেলেভর কোথায়? ডেলেভর তো দু'দিনের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেছে।

যদুনাথ: সত্যি তো, আমার মনে ছিল না। তা আজ না হয় থাক; কাল যাস নন্দা।

নন্দা ক্ষুণ্ণ হইল। বাজার করিতে যাইবার প্রস্তাবে বিঘ্ন ঘটিলে মেয়েরা স্বভাবতই মনঃপীড়া পান। দিবাকর তাহা দেখিয়া সঙ্কোচভরে বলিল—

দিবাকর: তা যদি হুকুম করেন আমি মোটর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

যদুনাথ ও নন্দা উভয়েরই চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

যদুনাথ: অ্যাঁ! তুমি মোটর চালাতেও জান?

দিবাকর: আজ্ঞে কিছুদিন মোটর-ড্রাইভারের চাকরি করেছিলাম—

যদুনাথ: বা বা! তুমি তো দেখছি ঝালে ঝোলে অম্বলে সব তাতেই আছ! বেশ বেশ। হবেই বা না কেন? হাজার হোক মেষ! তাহলে নন্দা, দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়্—

নন্দা: হ্যাঁ দাদু, আমি পাচ মিনিটে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

নন্দা বস্ত্রাদি পরিবর্তনের জন্য দ্রুত চঞ্চল আনন্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ওয়াইপ।

রাজপথ। যদুনাথের মিনার্ভা গাড়ী দিবাকরের দ্বারা চালিত হইয়া একটি বৃহৎ বস্ত্রালয়ের সামনে আসিয়া থামিল। নন্দা চালকের পাশের আসনে বসিয়াছিল, উভয়ে অবতরণ করিয়া দোকানে প্রবেশ করিল।

এইরূপে এক দোকান হইতে অন্য দোকানে, বস্ত্রালয় হইতে জুতার দোকানে, সেখান হইতে মণিহারীর দোকানে গিয়া বাজার করা যখন শেষ হইল তখন গাড়ীর পিছনের আসনে পণ্যদ্রব্য স্তূপীকৃত হইয়াছে।

গাড়ীতে বসিয়া ফিরিস্তি দেখিতে দেখিতে নন্দা বলিল—

নন্দা: মনে তো হচ্ছে সবই কেনা হয়েছে।

দিবাকর: সেবকের চামেলির তেল?

নন্দা: হ্যাঁ।

দিবাকর: তাহলে এবার ফেরা যেতে পারে?

নন্দা: আপনি ফেরবার জন্যে ভারি ব্যস্ত যে!

দিবাকর: ব্যস্ত নয়। তবে এখনও গোটা পঞ্চাশেক টাকা বাকি আছে, আর একটা দোকানে ঢুক্‌লে কিছুই থাকবে না।

নন্দা হাসিয়া উঠিল। দিবাকর গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

নন্দা: আপনি দেখছি ভারি হিসেবী।

দিবাকর: ভয়ঙ্কর। আপনিই তো শিখিয়েছেন।

নন্দা: একেই বলে গুরু-মারা চেলা!

এই সময় একটা মোড়ের কাছে আসিয়া দিবাকর মোটর ঘুরাইবার উপক্রম করিল; নন্দা অমনি ষ্টিয়ারিংয়ের উপর হাত রাখিয়া গাড়ীর গতি সোজা পথে চালিত করিল। গাড়ী একটা আঁকাবাঁকা টাল খাইয়া ঋজু পথে চলিল।

দিবাকর সবিস্ময়ে নন্দার পানে তাকাইল।

দিবাকর: এ কি! আর একটু হ'লেই অ্যাক্‌সিডেন্ট হ'ত!

নন্দা: হয় নি তো।

দিবাকর: কিন্তু ব্যাপার কি? বাড়ীর পথ যে ও দিকে!

নন্দা: সামনে কিন্তু সোজা পথ। বাঁকা পথের চেয়ে সোজা পথ কি ভাল নয়?

দিবাকর: ভাল। তাহলে কি এখন সোজা পথেই যাওয়া হবে, বাড়ী ফেরা হবে না?

নন্দা: বাড়ী ফেরার এখনও ঢের সময় আছে, এই তো সবে সাড়ে দশটা। চলুন, সহরের বাইরে একটু ঘুরে আসা যাক। কত দিন যে খোলা হাওয়ায় বেড়াই নি!

দিবাকর: বেশ চলুন। এটা কিন্তু হিসেবের মধ্যে ছিল না।

ডিজল্‌ভ্‌।

নির্জ্জন পথের উপর দিয়া মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই পাশে অবারিত মাঠ; মাঝে মাঝে তরু গুল্ম; দূরে ভাগীরথীর রজতরেখা। নন্দা উৎফুল্ল চঞ্চল চোখে চারিদিকে চাহিতেছে; দিবাকর কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখে তাকাইয়া অবিচলিত মুখে গাড়ী চালাইতেছে।

নন্দা: কী চমৎকার! রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে প'ড়ে যায়—

নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

দিবাকর: হুঁ।

নন্দা: কিন্তু আপনি তো কিছুই দেখছেন না। চুপ্‌টি ক'রে ব'সে ব'সে কী ভাবছেন?

দিবাকর: ভাবছি—

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা দিশা হারা নিবিড় তিমির ঢাকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

নন্দা চকিত চক্ষে দিবাকরের পানে চাহিল, যেন দিবাকরের মুখে সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রত্যাশা করে নাই।

ডিজল্‌ভ্‌।

রাস্তা হইতে এক রশি দূরে ঢিপির উপর একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখা যাইতেছে; মন্দিরটি জীর্ণ এবং পুরাতন।

নন্দা: দেখুন দেখুন—মন্দির! বোধহয় শিব মন্দির।

দিবাকর: উঁহু। শিব মন্দির হ'লে মাথায় ত্রিশূল থাকত।

নন্দা: তবে কার মন্দির?

দিবাকর: তা জানি না। হনুমানজীর হ'তে পারে।

নন্দা: কখখনো না। আমি বলছি শিব মন্দির; (দিবাকর মাথা নাড়িল) বেশ, বাজি রাখুন।

দিবাকর: (বিবেচনা করিয়া) এক পয়সা বাজি রাখতে পারি। কিন্তু প্রমাণ হবে কি ক'রে?

নন্দা: গাড়ী দাঁড় করান, চোখে দেখলেই সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

দিবাকর গাড়ী থামাইল, নন্দা নামিয়া পড়িল।

দিবাকর: এক পয়সার জন্যে এত পরিশ্রম করতে হবে?

নন্দা: হ্যাঁ, নামুন। চলুন মন্দিরে।

দিবাকর নামিয়া গাড়ী লক করিল।

দিবাকর: চলুন। কিন্তু মিছে ওঠা-নামা হবে। মন্দিরে হয়তো চাম্‌চিকে আর ইঁদুর ছাড়া কোনও দেবতাই নেই।

নন্দা: নিশ্চয় আছে। একটু কষ্ট না করলে কি দেবদর্শন হয়!

রাস্তা ছাড়িয়া দু'জনে মাঠ ধরিল। ঢিপির পাদমূল হইতে ভগ্নপ্রায় এক প্রস্থ সিঁড়ি মন্দির পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে তাহারা শুনিতে পাইল, কেহ একতারা বাজাইয়া মৃদুকণ্ঠে ভজন গাহিতেছে। নন্দা উজ্জ্বল চক্ষে দিবাকরের পানে চাহিল।

নন্দা: শুনছেন?

দিবাকর: শুনছি। ছুঁচোর কীর্ত্তন নয়, মানুষ ব'লেই মনে হচ্ছে।

তাহারা মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ভিতর হইতে এক পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি; চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ; মাথার উপর পাকা চুল চূড়া করিয়া বাঁধা; মুখে প্রসন্ন হাসি। হাতে দুইটি ফুলের মালা লইয়া তিনি নন্দা ও দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পুরোহিত: এস মা! এস বাবা! এত দূরে কেউ আসে না। আজ তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হ'ল।—এই নাও ঠাকুরের নির্মাল্য। চিরসুখী হও তোমরা, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর।

বৃদ্ধ দু'জনের গলায় মালা দুটি পরাইয়া দিলেন। বৃদ্ধের ভুল বুঝিতে পারিয়া দু'জনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িল। নন্দা তাড়াতাড়ি টাকা বাহির করিতে করিতে আরক্ত মুখে বলিল—

নন্দা : মন্দিরে কোন্ ঠাকুর আছেন ?

পুরোহিত : মা, আমার ঠাকুরের নাম ননী-চোরা। বৃন্দাবনে যিনি গোপিনীদের ননী চুরি ক'রে খেতেন ইনি সেই বাল-গোপাল।

নন্দা মন্দিরের দ্বারে টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল; দিবাকরও প্রণাম করিল। পুরোহিত আবার আশীর্বাদ করিলেন—

পুরোহিত : আমার প্রেমময় ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন। চিরায়ুষ্মতী হও মা, ফলে ফুলে তোমাদের সংসার ভ'রে উঠুক—

দিবাকর ও নন্দা তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিল; পুরোহিত স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেকগুলি ধাপ নামিয়া নন্দা একটি চত্বরের মত স্থানে বসিল। মুখে লজ্জার সহিত চাপা কৌতুক খেলা করিতেছে। সে এপাশে ওপাশে চাহিয়া নিরীহ ভাবে বলিল—

নন্দা : বেশ যায়গাটি। ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

দিবাকরের মুখ গম্ভীর, কিন্তু চোখে দুষ্টামি উঁকিঝুঁকি মারিতেছে।

দিবাকর : হুঁ—কিন্তু আমি ভাবছি—

নন্দা : কি ভাবছেন ?

দিবাকর : ভাবছি ঠাকুরেরও চুরি করা অভ্যেস ছিল।

নন্দা : ঠাকুর তো খালি ননী চুরি করতেন।

দিবাকর : শুধু ননী নয়, শুনেছি আরও অনেক কিছু চুরি করেছিলেন।

নন্দা : যেমন—?

দিবাকর : যেমন গোপিনীদের মন।

নন্দা : তা সত্যি।—

নন্দা যেন চিন্তিত হইয়া গালে হাত দিল।

দিবাকর : কি ভাবছেন ?

নন্দা : ভাবছি সব চোরেরই কি এক রকম স্বভাব !

দিবাকর : তার মানে ?

নন্দা : মানে সব চোরই কি মেয়েদের মন চুরি করে !

দিবাকর : না না, ও সব বাজে গুজব। চোরেদের স্বভাব মোটেই ওরকম নয়। দেখুন, আপনি চোরেদের নামে মিথ্যে দুর্নাম দেবেন না।

নন্দা : অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে আপনি কখনও কোনও মেয়ের মন চুরি করেন নি ?

দিবাকর : না, কখ্‌খনো না। ও সব আমার ভালই লাগে না।

নন্দা মুখ টিপিয়া হাসিল। এই সময় মন্দির হইতে একতারা সহযোগে ভজনের সুর ভাসিয়া আসিল। দু'জনে শান্ত হইয়া শুনিতে লাগিল।

পুরোহিত : নাচ নাচ মন-মোর—
আওল নওল কিশোর।
প্রেম-চন্দনে অঙ্গ রঙ্গই
নাচত মাখন-চোর—
নাচ নাচ মন মোর।

চূড়া-পর, মরি, পিঞ্ছ নাচত, নাচে গলে বনমাল
মণি-মঞ্জীর চরণপর চঞ্চল, চপল করে করতাল।
নাচ রে শ্যাম কিশোর বৃন্দাবন চিত-চোর,
গোপবধূ মন প্রীত-রস-ঘন
পুলকভরে তনু ভোর—নাচ নাচ মন মোর।

ডিজল্‌ভ্।

ঘণ্টাখানেক পরে।

যদুনাথের ফটক। দিবাকর গাড়ী চালাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

এদিকে হল্ ঘরের টেবিল ঘিরিয়া তিনজন বসিয়া ছিলেন: যদুনাথ, মন্মথ ও পুলিস ইন্স্‌পেক্টর। সেবক নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। ইন্স্‌পেক্টর গম্ভীর মুখে বলিতেছিলেন—

ইন্সপেক্টর : যখন চোরের জুতো যোড়া নিয়ে গিয়েছিলাম তখন ভাবি নি যে ও থেকে চোরের কোনও হদিস পাওয়া যাবে। রুটিন মত জুতো যোড়া পরীক্ষার জন্য হেড্ অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আজ হেড্ অফিস থেকে খবর পেয়েছি—

যদুনাথ : কী খবর পেয়েছেন ?

ইন্সপেক্টর : আমরা ভেবেছিলাম ছিঁচ্‌কে চোর। কিন্তু তা নয়। জুতো থেকে সনাক্ত হয়েছে যে চোর—কানামাছি !

এই সময় একটা আকস্মিক শব্দ শুনিয়া সকলে ফিরিয়া দেখিলেন নন্দা ও দিবাকর অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। দিবাকরের হাতে একটা জুতার বাক্স ছিল, তাহা তাহার হাত হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়াছে। নন্দা যেন পাথরে পরিণত হইয়াছে। দিবাকরের মুখ ভাবলেশহীন; সে নত হইয়া জুতার বাক্সটা তুলিয়া লইল।

যদুনাথ ইন্সপেক্টরকে অধীর প্রশ্ন করিলেন—

যদুনাথ: কানামাছি! সে আবার কে?

ইন্সপেক্টর: কানামাছির নাম শোনেন নি? একজন নামজাদা চোর। খবরের কাগজে তার কথা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়—

নন্দা নিঃশব্দে আসিয়া যদুনাথের পিছনে দাঁড়াইয়াছে। সে একবার দিবাকরের দিকে চোখ তুলিল; তাহার চোখে চাপা আগুন।

মন্মথ: হ্যাঁ হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি বটে। আপনি বলতে চান্ সেই কানামাছি আমাদের বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকেছিল? কিন্তু জুতো থেকে তা বুঝ্‌লেন কি ক'রে?

ইন্সপেক্টর: এর একটা ইতিহাস আছে। প্রায় তিন বছর ধ'রে এই চোর অনেক বড় মানুষের বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকেছে, অনেক টাকা চুরি করেছে। একলা আসে একলা যায়, তার সঙ্গি-সাথী নেই। কিন্তু একবার সে এক জনের বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকেছিল, বাড়ীর লোকেরা জেগে উঠে তাকে তাড়া করে। কানামাছি পালালো, কিন্তু তার পুরোনো জুতো যোড়া ফেলে গেল। সেই জুতো পুলিসের কাছে আছে। আপনার বাড়ীতে যে-জুতো পাওয়া গেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল, অবিকল কানামাছির পায়ের ছাপ। সুতরাং—

সেবক সানন্দে হাত ঘষিতে লাগিল; যদুনাথ কিন্তু বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

যদুনাথ: এ তো বড় ভয়ানক কথা। সূর্যমণির ওপর যদি কানামাছির নজর প'ড়ে থাকে। ইন্সপেক্টরবাবু, এ চোর তো আপনাদের ধরতেই হবে।

ইন্সপেক্টর: ধরা কিন্তু সহজ নয়। কানামাছির চেহারা কেমন আমরা দেখিনি; দেখেছি কেবল তার পায়ের ছাপ। ভেবে দেখুন, কলকাতা সহরের লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে পায়ের ছাপ মিলিয়ে চোরকে ধরা কি সম্ভব? একমাত্র তাকে যদি হাতে হাতে ধরা যায় তবেই সে ধরা পড়বে। কিন্তু কানামাছি ভারি সেয়ানা চোর। আ বিশ্বাস সে আমাদেরই মতন ভদ্রলোক সেজে বেড়ায়, বন্ধুবান্ধবও তাকে চোর ব'লে চেনে না। এরকম চূড়ামণিকে ধরা কি সহজ যদুনাথবাবু?

নন্দার অধরোষ্ঠ খুলিয়া গেল; সে যেন এখনি দিবাকরের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার দৃষ্টি প'ড়িল দিবাকরের উপর। দিবাকর শান্তভাবে তাহার পানে চাহিয়া আছে, যেন সব কিছুর জন্যই সে প্রস্তুত। নন্দা অধর দংশন করিয়া উদ্‌গত বাক্য রোধ করিল।

যদুনাথ: কিন্তু—তাহ'লে—আমার সূর্যমণি!

ইন্সপেক্টর: আপনার সূর্যমণি সম্বন্ধে খুবই সাবধান হওয়া দরকার। পুলিসের দিক থেকে কোনও ত্রুটি হবে না; আপনিও যাতে সাবধানে থাকেন তাই খবর দিয়ে গেলাম।—আচ্ছা, আজ তাহ'লে উঠি। যতদূর জানা আছে, কানামাছি রাত্রে ছাড়া চুরি করে না। আপনি রাত্রে বাড়ী পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন।

যদুনাথ: হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই আমি দু'টো চৌকিদার রাখব।—কাণামাছি—কি সর্বনাশ—অ্যাঁ!

ইন্সপেক্টর: আচ্ছা.নমস্কার!

নন্দা এতক্ষণে কথা কহিল—

নন্দা। একটা কথা। চোরের নামই কি কানামাছি?

ইন্সপেক্টর: চোরের নাম কেউ জানে না। কানামাছি নামটা খবরের কাগজের দেওয়া। আসল নামের অভাবে ঐ নামই চ'লে গেছে।

নন্দা: ও—

ডিজল্‌ভ্‌।

(ক্রমশঃ)

সুয়েজ খাল

শ্রীআদিনাথ সেন

[illegible] আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে লোহিত সাগর। ইউরোপ ও [illegible] মধ্যে ভূমধ্যসাগর। লোহিত সাগরের দক্ষিণপ্রান্তে ও [illegible] পশ্চিমপ্রান্তে, এডেনের ও জিব্রাল্টারের নিকট প্রণালী [illegible]। লোহিত সাগরের উত্তরে এবং ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণপূর্ব্বে [illegible] এশিয়া ও আফ্রিকা স্থলপথে সংযুক্ত ছিল। ফরাসী [illegible] লেসপ্‌ ঐ ভূভাগে সুয়েজ খাল খনন করায় আটলান্টিক [illegible] মহাসাগরে যাইবার একটি সোজা পথ পাওয়া গেল। পূর্ব্বে,

সুয়েজ খাল
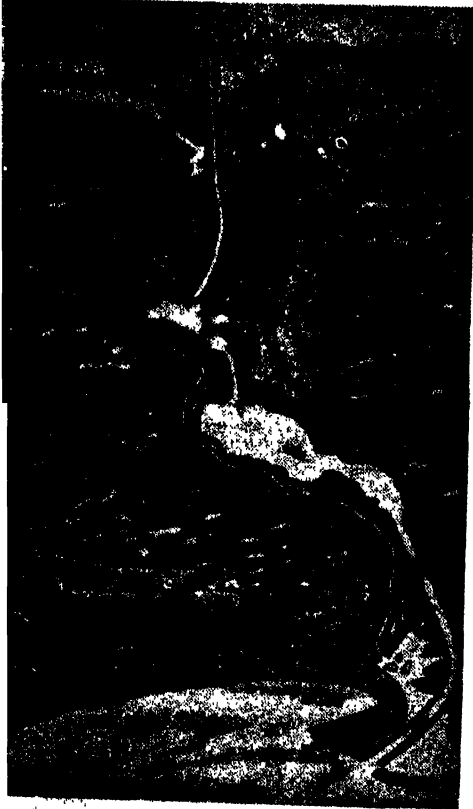
[illegible]র সর্বদক্ষিণ প্রান্তের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিয়া পাশ্চাত্যের [illegible]। ভারতবর্ষ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি আবিষ্কার করিয়াছিল এবং [illegible] পথেই চলাচল নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং এই নূতন পথ, ব্যবসা [illegible] সুগম, বিশেষতঃ ইংরেজের পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্য নিকটস্থ করিয়া দিল। [illegible] এখন ইংরেজের রাজনৈতিক ও সামরিক শাসনে আসিল। এখন খাল রক্ষণে ১০,০০০ ইংরেজ সৈন্য ও ৪০০ পাইলট বর্ত্তমান। জিব্রালটার ও এডেন ইংরেজ অধিকৃত বলিয়া, ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর পূর্ণমাত্রায় আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও, পাছে মাঝখানে কাহারও বিরুদ্ধতায় চলাচলের বাধা হয়, সেইজন্য রক্ষার অজুহাতে মিশরকেও ইংরেজের রক্ষণাধীনে থাকিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইংরেজের বৃহৎ সাম্রাজ্য ক্ষীণ হইয়াছে। যাতায়াতের ও খবরাখবরের বিস্ময়কর উন্নতি হওয়ায় এবং ইজিপ্টের দেশাত্মবোধে, এই অঞ্চলে ইংরেজের আধিপত্য অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে এবং আরও হইবে।

ভারতবর্ষ হইতে সুয়েজখালে যাইতে প্রথমে এডেন পার হইতে হয়। আরব মরুভূমির এককোণে, পাহাড়ের গায়, সামান্য সমতল ভূমিতে এডেনের সেনানিবাস ও দুর্গ। দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। জাহাজ হইতে সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল জলে মুদ্রা নিক্ষেপ করিলে, তথাকার লোকেরা অনায়াসে সমুদ্র তল হইতে ঐ মুদ্রা উদ্ধার করে। ইহা একটি বিস্ময়ের বিষয়। অপর পারে আফ্রিকার বৃটিশ সোমালীল্যাণ্ড। এডেনের পর লোহিত সাগর লম্বালম্বি পার হইতে হয়। গ্রীষ্মকালে ইহা বড়ই কষ্টকর। পূর্বপারে বিশাল আরব মরুভূমি। সমুদ্রের অনতিদূরে, মুসলমানদের তীর্থস্থান মক্কানগর। প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে একবার মক্কানগর দর্শন, শাস্ত্রের নির্দেশ। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর বহু মুসলমান মক্কায় তীর্থ করিতে গমনকরেন। ইহাদিগকে হজ যাত্রী বলা হয় এবং ফিরিয়া আসিলে ইহারা খাজা উপাধি[illegible] ভূষিত হন। জেডার বন্দরে নামিয়া মোটর বাসে ৬৫ মাই[illegible] পথে মক্কায় পৌঁছান যায়। এখানে ৩৫,০০০ যাত্রী এককালে থাকিতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত আছে এবং যাত্রী রাখা এখানকার লোকদের প্রধান আয়ের পথ। মক্কায়, সর্বদা কালো কাপড়ে ঢাকা চতুষ্কোণ কাবা মন্দির, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া, ভিতরের একটি বাদামী আকারের কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তর চুম্বন করা তীর্থযাত্রীর অবশ্য কর্তব্য। নমাজ পড়াও অবশ্য একটি বিশেষ কাজ—পরে পীর পয়গম্বরের সমাধিদর্শন।

পরিণত বয়সে যখন মহম্মদ মক্কায় ধর্মপ্রচার সুরু করিলেন, তখন পৌত্তলিকদিগের বাধায়, তথা হইতে ২৪৫ মাইল উত্তরে মেদিনা সহরে যাইতে বাধ্য হন এবং তথায় কিছুদিন স্বপরিবারেই আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই প্রবল শক্তিতে এই ধর্ম প্রথমে অনুনয়ে ও পরে তালোয়ারের জোরে, উত্তর আফ্রিকা দিয়া পশ্চিম ইউরোপে এবং এসিয়া মাইনর দিয়া উত্তর দিকে দক্ষিণ ইউরোপ ও মে[illegible] পটেমিয়া দিয়া পূর্বদিকে সর্বত্র ছড়াইয়া যায়। মধ্য-আরবের অধিবাসীরা গরীব বলিয়া ও চলাচলের অসুবিধা থাকায়, এতদিন বাহিরের সভ্য জগতের সহিত আরবদেশের সম্বন্ধ কম ছিল। ইহা সত্ত্বেও আশ্চর্য্যের

বিস্তার এই যে এই ধর্ম দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ বর্জন হেতু এবং সকলেই এক সম্প্রদায়ভুক্ত এই জ্ঞানে, নিয়মিত উপাসনায় এবং বিবাহাদি ব্যাপার সরল হওয়াতে, উহা বহু লোককে আকৃষ্ট করে। এইক্ষণে পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ লোকই মুসলমান ধর্মাবলম্বী, কিন্তু বর্তমানে ইহার আর বিস্তৃতি নাই।

আরব মরুভূমির উত্তরে, পারস্য উপসাগরের সন্নিকটে বোগ্দাদ অঞ্চল (ঐতিহাসিক বেবিলোন) হইতে সুয়েজ পর্যন্ত বিস্তৃত আংশিক চন্দ্রাকার উর্বরা ভূমিতে যীশুখৃষ্টের বাসস্থান নাজারেস্ (যাহা হইতে নাজারীন্ নাম) ছিল—ভারতবর্ষও অনতিদূরে। সুতরাং দেখা যায় যে সমস্ত পৃথিবীর প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলির উৎপত্তিস্থান অতি অল্প পরিমাণ ভূভাগেই নিবদ্ধ। কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থান বলিয়া, এই চন্দ্রাকার ভূমিটুকুই বিভিন্ন কৃষ্টির ঘাত প্রতিঘাতের ক্রীড়াভূমি এবং সমগ্র জগতের আদি ইতিহাসের পটভূমি।

নিদর্শন হইতেই এই প্রাচীন সভ্যতার উৎকর্ষ অনুমিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয় জানা যায় নাই। পরবর্তীকালেও বিদেশী পরিব্রাজক বা আক্রমণকারী মারফতই ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। বেবিলোন অঞ্চলের পূর্ব ইতিহাস মারী রাজ্যে সংগৃহীত লিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মিশরীয় ঐতিহাসিকেরা ৩১টি রাজবংশ ও ৩৩০ জন রাজার (গড়ে ১৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব ধরিলে, ৫,০০০ বৎসর) নাম ও বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন ইতিহাসে কিছু অসামঞ্জস্য থাকিলেও, অন্তত অষ্টাদশ রাজবংশ (প্রায় ১৬০০ খৃঃ পূঃ) হইতে অন্যান্য পরবর্তী বংশের রাজবিস্তার কাহিনী তৎকালীন শিলা বা পেপিরাসে (জলজ উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত কাগজে) লিখিত লিপিতে সমর্থিত হইয়াছে। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে ইহার বহুল উল্লেখ, ইহার সভ্যতা প্রমাণিত করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে শান্তিপূর্ণভাবে ইহা আধ্যাত্মিক প্রচার কার্যে নিবদ্ধ ছিল বলিয়া এবং ইহার মূলগত

লোহিত সাগরের পশ্চিম পারে আফ্রিকার কূলে, মাসোয়া বন্দর পূর্বে ইতালীর অধিকারভুক্ত ছিল, সম্প্রতি ইহা ইংরেজদিগের সমুদ্রোপকূল হইতে কিছু দূরে প্রায় সমান্তরাল ভাবে বিখ্যাত নীলনদ উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়া, ইথিওপিয়া ও নিউবিয়ার মধ্য দিয়া, কয়েকটি বৃহৎ জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়া, মধ্য ও উত্তর মিশর অতিক্রম করিয়াছে (৭০০ মাইল) এবং দুইধারে পাহাড়ের ভিতরে ক্রম বিস্তৃত জমি (গড়ে ১৫ মাইল) উর্বরা করিয়া কাইরোতে ভাগ হইয়া বিভিন্ন মুখে ভূমধ্য সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। উহা হইতে একটি কৃত্রিম শাখাও লোহিত সাগরের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে পানীয় জল প্রবাহিত হয়।

সুয়েজ খালে ড্রেজার

মাসোয়াকে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা উষ্ণস্থান বলিয়া ধরা হয়, অতিশয় গরম ও ঠাণ্ডার মধ্যে গড়ে ৮২ ডিগ্রি ফারেনহাইট। সাহারা মরুভূমিতে সর্বোচ্চ তাপ ১৫৪°। কলিকাতায় ১০০° এর উপরে হইলে তাপ অসহ্য বোধ হয়। অন্তসীমায়, মেরুপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা—৭৬ ডিগ্রি এবং সাইবিরিয়ায়—৯৪ ডিগ্রিও পাওয়া গিয়াছে।

মিশরীয় সভ্যতা ৭০০০ বৎসর পূর্বেকার (৫০০০ খৃঃ পূঃ), ভারতে (আর্য্য উপনিবেশেরও পূর্বেকার) মহেঞ্জোদারো, বেবিলোন ও প্রাচীন চীনের সভ্যতার কতকটা সমসাময়িক। কিন্তু প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উদ্ভূত। কালে চলাচলের সুবিধার পর, পরস্পর পরিচিত হয়, ভারতবর্ষে শুধু সুবিস্তৃত পয়ঃপ্রণালী ও উৎকৃষ্ট স্থপতিবিদ্যার

উচ্চ আদর্শ সুদৃঢ় থাকায়, নানা ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও উহা সুদীর্ঘকাল কেবল যে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে তাহাই নহে, উপরন্তু নবজীবনে উদ্বেলিত হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

চেহারায়, ভাষায়, চালচলনে, মিশরবাসীগণ এশিয়া হইতে উদ্ভূত মনে হয়। আদিম আফ্রিকাবাসী যেমন আবিসিনিয়ান, ইথিওপিয়ান, ইত্যাদির সহিত ইহাদের কোন সাদৃশ্য নাই। মিশরের বর্তমান লোক সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। বৃষ্টিপাত বড়ই কম, বৎসরে দেড় ইঞ্চি মাত্র। এই কারণে স্থানটি অতিশয় শুষ্ক—দিনে নিদারুণ গরম ও রাত্রে দুর্বহ ঠাণ্ডা। এই শুষ্কতার দরুণই অনেক পুরাতন জিনিষ নষ্ট হইয়া যায় নাই। অধিবাসীগণ দুইটি পাহাড়ের শ্রেণীর মধ্যস্থ উপত্যকায় উৎপন্ন শস্যাদির ও নদীর মিষ্ট জলের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। বন্যায় নদীর জল ২১ হইতে ২৮ ফুট, অর্থাৎ দোতালা দালানের সমান উচ্চ হইয়া উঠে; সুতরাং বাঁধ

দিয়া প্রবাহ আয়ত্তাধীন না রাখিলে, হয় শস্য জলিয়া নতুবা ডুবিয়া যাইবে। প্রাচীন মিশরীয়গণ অতি সুচারুরূপে ইহার সুব্যবস্থা করায় তাহাদের সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর মিশরে ঐতিহাসিক থেম্‌ফিস্ (বর্তমান কাইরো) প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের রাজধানী ছিল। প্রথম রাজা মেনেস্, উত্তর ও দক্ষিণ মিশর একত্রীভূত করিয়া থেম্‌ফিস্, ও থিবেস নগর স্থাপন করেন। মেনেসের সমাধি হইতে তৎকালীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময়ে হিয়ারোগ্লিফিক্ চিত্র ভাষার পত্তন হয় (৪৪০০ খৃঃ), মিশরবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর পর শবদেহ যত্নে রক্ষিত হইলে, কালে আত্মা পাখীর মত উড়িয়া আসিয়া দেহকে পুনর্জীবিত করিবে। সমাধিতে এই নিমিত্ত অসম্ভব পরিমাণে জীবনযাত্রার যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী স্থাপিত হইত। কোনরূপ ভুল না হইতে পারে, এইজন্য প্রমাণ আকারের তাহার মূর্তিও রক্ষিত হইত। সমাধি রক্ষার উদ্দেশ্যে, প্রথমে সুগঠিত পাথরের সমাবেশে পিরামিড্ তৈয়ার করিয়া সমাধি গৃহ চাপা দেওয়া হইত। কিন্তু যে গোপন পথে শবসমাধিতে নীত হইত, হয়ত পাহারাদারদের সাহায্যেই, সেই পথেই দস্যুরা লুণ্ঠন করিত। তৃতীয় রাজবংশ হইতে পিরামিড্ তৈয়ারী সুরু হয়। সর্ব-বৃহৎটি চতুর্থ রাজবংশের ক্যারাও খুফি তৈয়ার করেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড স্ফিন্‌কস জানোয়ারের শরীরে মানুষের মাথা) মূর্তি নীরব পাহারাদারভাবে স্থাপিত হয়। এইরূপ বিশাল নির্মাণকার্যে জবরদস্তি করিয়া লোক খাটান হইত। সর্বসমেত ৬৬টি পিরামিড্ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু লুণ্ঠনের দরুণ কোনটাতেই কোন বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে ইদানীং এই অঞ্চলে, অনুসন্ধানে অনেক সমাধি মন্দির এবং পুরাতন তথ্য বাহির হইয়াছে। এই পিরামিডগুলি স্থপতিবিদ্যার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া, পৃথিবীর ৭টি বিস্ময়জনক কীর্তির একটী ধরা হয়।

ষষ্ঠ রাজবংশের সময় এশিয়ার দিকে রাজ্য বিস্তৃতি হয়, কিন্তু পরে রাজ্য সঙ্কুচিত হওয়াতে, আক্রমণের আশঙ্কায় রাজধানী ২০০ মাইল দূরে থিবসে দিয়া গিয়া রাজত্ব দৃঢ় করা হয়। একাদশ ও দ্বাদশ রাজবংশ পিরামিড্ ইত্যাদি বাজে কাজে শক্তি ক্ষয় না করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যে মন দেয় এবং পালেষ্টাইন ও সিরিয়া অঞ্চলে রাজ্যের বিস্তৃতি হয়। দ্বাদশের উসার্টসেন ১, পশ্চিমে লিবিয়ান পাহাড়ের দিক হইতে নীলনদের গতি ঘুরাইয়া সোজা করিয়া দেন (২৪৩০ খৃঃ)। ইনি নিকটস্থ হেলিওপোলিসে বহু মন্দির তৈয়ার করেন এবং "ক্লিওপেট্রার সূচ", এইভাবে পরে ইতিহাসে বর্ণিত (Cleopatras' medle ohelisk) চতুষ্কোণ প্রস্তর (চিত্র ভাষায় নির্মাতার বিবরণসহ) স্তম্ভ দ্বারা উহা সুশোভিত করেন। পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ রাজবংশীয়েরা, এশিয়া হইতে আগত হিকসস্‌দের দ্বারা দক্ষিণ মিশরে বিতাড়িত হন ও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করেন।

এই সময়ে পূর্বাঞ্চলে হাঙ্গামা বা দুর্ভিক্ষের দরুণ, বাইবেলে বর্ণিত ইস্‌রাইলেটস্‌দের ৪৩০ বৎসরের মিশরে নির্বাসন সুরু হয়। জোসেফ (১৭০৩-১৬৩৫ খৃঃ পূঃ), ইত্যাদিকে জবরদস্তি করিয়া কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, উল্লেখ আছে। উসার্টসেন কর্তৃক জোসেফ আদৃতও হন, কিন্তু পাছে ইহারা অন্য শত্রুদের সহিত যোগ দেয় এই আশঙ্কায় উহাদের পৃথক ও সতর্ক দৃষ্টিতে রাখা হইত। সুয়েজের নিকটবর্তী গোসেনে ইহাদের বাস সীমাবদ্ধ ছিল। সমূলে উচ্ছেদের নিমিত্ত বালক শিশুদের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু মোজেজ্ দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া সদলবলে মিশর হইতে পলাইয়া যান (১৩[illegible] খৃঃ পূঃ) এবং কষ্টে সৃষ্টে ঘুরিয়া ফিরিয়া, কানান্ (পালেষ্টাইন্) অঞ্চল অধিকার করেন। এই বিবরণ হইতে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পোর্ট সেইড্

প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ রাজবংশের (১৬৩৫-১৩৯০ খৃঃ পূঃ) স্থাপয়িতা এমস্, হিকসস্‌দের তাড়াইয়া দেন এবং সিরিয়া ও পালেষ্টাইনে রাজ্যের বিস্তার করেন। খৃঃ পূঃ ১৫৫০ সনে রাজধানী থিব্‌সে (বর্তমান লুক্সর) লইয়া যাওয়া হয়। প্রবল প্রতাপশালী রাজারা অনেক মন্দিরাদি ও সমাধি তৈয়ার করেন।

নীল নদের কূলে লুক্সর সহর ও কর্ণাক গ্রাম। এখানে বহু বিরাট মন্দিরের ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। নদীর অপর পারে রাজসমাধির প্রান্তরে (vally of the tombs of Kings) সমাধিতে তখনকার সময়কার যাবতীয় মূল্যবান্ আসবাব সমেত, শবাধারে সুগন্ধি ঔষধি দ্বারা রক্ষিত দেহ (mummy) স্থাপিত হইত। কড়া পাহারা সত্ত্বেও, দস্যু তস্কর দ্বারা সমস্ত ধনরত্নাদি লুণ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু অনেক মূল্যবান জিনিষ উদ্ধার হইয়াছে। ১৩শ [illegible]

বাহির হইয়াছে। এইভাবে অনেকগুলি শবাধার অন্যত্র একটি পাহাড়ের গুপ্ত গহ্বরে সংগৃহীত হইয়াছিল। ৩০০০ বৎসর এইভাবেই থাকে। ১৮৭৫ সনে একটি দস্যু পরিবার (রেসুল) উহার সন্ধান পায় এবং ৬ বৎসর পর্যন্ত গোপনে, অবসর মত, সোনা ও অন্যান্য আভরণ খুলিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। ধরা পড়িয়া স্বীকার করিলে, সমস্তই কাইরো মিউজিয়ামে সরান হয়। এই সব শবাধারের প্রত্যেকটি রাজার বিস্তৃত বিবরণ ও অপহৃত হইয়া থাকিলে তৎকালে পুনরুদ্ধারের ও দস্যু শাসনের ব্যবস্থা সঙ্গীয় লিপিতেই পাওয়া গিয়াছে এবং তিন সহস্র বৎসরের অধিককাল পরে উনবিংশ শতাব্দীতে অনুসন্ধানে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস বাহির হইয়াছে। উপরোক্তভাবে বহু সমাধি বিপর্যস্ত হইলেও, কেবল নিম্নোলিখিত ফ্যারাও টুটেন খামের সমাধিটি চাপা পড়িয়া যাওয়াতে (প্রথম অবস্থায় সামান্য লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও) ১৯২২ সনে, সাড়ে তিন হাজার বৎসর পরে, প্রায় ঠিকমতই উহার উদ্ধার হইয়া জগতে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। দুইটি ইংরেজের ১৬ বৎসর ব্যাপী অসাধারণ চেষ্টায় ইং ১৯৩৮ হয় এবং মিশর সরকার খরচ বাবদ ৩৬,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দিয়া, কাইরো মিউজিয়ামে সমস্ত আবিষ্কার রাখিয়া দেন। পূর্বেই অপহৃত "ক্লিওপেট্রার যুদ্ধ" (obelisk) এখন নিউইয়র্ক, লণ্ডন ও প্যারীসের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রথম দুইটি কাইরোর নিকটস্থ হেলিওপোলিস্ হইতে অগষ্টাস্ কর্তৃক খৃষ্টীয় অব্দের পূর্বে আলেকজান্দ্রীয়ায় নীত এবং ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সনে জবরদস্তি করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। তৃতীয়টি লুক্সর হইতে মহোমেট আলী কর্তৃক ১৮৩৭ সনে ফরাসী সরকারকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। এখন আর নূতন কিছু আবিষ্কার বিদেশে যায় না। যাহা বিভিন্ন দেশবাসীর অদম্য চেষ্টায় স্ব স্ব মিউজিয়ামে আগেই আহরিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় থাকিয়াই যাইবে।

খাল কোম্পানির অফিস ও শহর

এই সময় ঐতিহাসিক আদি মন্দিরের ও সমাধি গাত্রে লিপিবদ্ধ হয়, কারণ পিরামিড নির্মাণ ছাড়িয়া দিয়া এইবার চিরবিশ্রামের নিমিত্ত উপরোক্ত রাজসমাধির প্রান্তরে, দুর্গম পাথরের পাহাড়ের গহ্বরে পুরোপযোগী ঐশ্বর্য্য সমেত চিরস্থায়ী কামরা নির্মিত হইতে লাগিল। এই বংশেরই একটি অল্প বয়স্ক ফ্যারাও, ঈশ্বরপূজার পরিবর্তন করিয়া রাজধানী সরাইয়া নেন। কিন্তু পুরোহিতদের হাতে রাজ্যচ্যুত হন। ইহার পরেই অষ্টাদশ বংশের শেষ ফ্যারাও, টুটেনখামেন, পুরোহিতদের মতে চলিতে বাধ্য হন, কিন্তু ৯ বৎসর পরেই মারা যান। ফ্যারাও হিসাবে ইনি নগণ্য হইলেও, ইহার সমাধি আবিষ্কার (১৯২২ সনে) হইতে পুরাতন মিশরের অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। ঊনবিংশ রাজবংশে (১৩৫৫ খৃঃ পূঃ) রামেসিস ১ প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। ১৩৬৫ ইনি রাজধানী পুনরায় মেম্ফিসে নিয়া আসেন এবং বহুদিন রাজত্ব করেন। ইহার ১০০টি পুত্র ও ৫৯টি কন্যা। পুত্র সেটি ১ নীলনদের সহিত লোহিত সাগর যোগ করাইয়া দেন এবং অপর পারের তামা ও টারকোয়া খনির কাজ চালাইতে থাকেন এবং এইভাবে এশিয়ায়ও রাজ্যবিস্তার করেন। রামেসিস্ ২এর বিশাল ভাস্কর মূর্ত্তি বিস্ময় উৎপাদন করে। ১২০০ হইতে ১০০০ খৃঃ পূঃ লৌহযুগের আরম্ভ ধরা হয়। ইহার পূর্বে কাঁসার যুগের অনেক সভ্যতার নিদর্শন সুচারু কাজে মিসরীয় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চবিংশ রাজবংশ (৭০০ খৃঃ পূঃ) অবজ্ঞাত ইথিওপিয়ানদের ষড়-বিংশ বংশের সময় (প্রায় ৬০০ খৃঃ পূঃ), বেবিলোনের নেবুচাদনাজারের নিকট পরাজিত হওয়াতে, রাজ্য সঙ্কুচিত হয়। সপ্তবিংশ বংশ (৫২৭-৪৮৬) পারস্য দেশীয়, ডেরিয়াস, জারেক্সস্ ইত্যাদি, ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পারস্যের উত্থানের ও বিস্তৃতির পর, গ্রীসের সহিত ম্যারাথন প্রভৃতি যুদ্ধে হারিয়া যাওয়াতে, প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গ্রীসের উত্থান ও বিস্তৃতি হয় এবং আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় শেষ হয়। একত্রিংশ বংশ ৩৪০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে (৩৩২ খৃঃ পূঃ) আলেকজাণ্ডার মিশর দখল করেন এবং তাহার নামে আলেকজান্দ্রীয়া নগর স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মিশর সেনানায়ক টলেমীর ভাগে পড়ে এবং তাহার বংশে ক্লিওপেট্রা পর্যন্ত (৩০ খৃঃ পূঃ) রাজ্য চলে। এইবার রোমের উত্থানের সময় মিশর রোমের অধীনতায় যায়। ৬৩৯ সনে মিশরে মুসলমান রাজ্য বিস্তার হয়। তারপর মিশরের নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে, সুলতান সালাদিন, মামেলুক, নেপোলিয়ান প্রভৃতির নাম করা যায়। পরে তুর্কীর সুলতানের এবং ১৯০৪ সনে ব্রিটিশের রক্ষণাবেক্ষণে আসে। ১৯২২ সনে কতকগুলি সর্তে মিশর স্বাধীন হয়। আশা করা যায়, সর্তগুলি শীঘ্রই দূর হইবে।

লোহিত সাগর পার হইয়া, টৈফিক্ বন্দরে সুয়েজ খালে ঢুকিতে হয়। একটি পথ-প্রদর্শক (pilot) আসিয়া জাহাজ নিরাপদ রাস্তা দিয়া চালাইতে সাহায্য করে। কয়েকটি বৃহদাকারের ড্রেজার সর্বদা খাল পরিষ্কার (গভীর) রাখে। পূর্বোল্লিখিত নীল নদ হইতে আনা পরিষ্কার জলের খাল, টিমসা হ্রদের নিকট হইতে এই খালের পাশে পাশে চালান হইয়াছে। ঝাউ গাছের সারির মধ্যে একটি রেলের লাইনও আছে। দূরে নগ্ন পাহাড় ও মরুভূমি দেখা যায়। পথে বিটার হ্রদ। ইহা পার হইয়া খাল দিয়া গেলে টিমসা হ্রদ এবং পুনরায় খাল। বাইবেলে উল্লিখিত গোসেন খালের পশ্চিম পারে কিছু দূরে, অনুমিত হইয়াছে। মোজেজ এইখানে জলার পারে আসিয়া আশ্রয় লন এবং অলৌকিক ভাবে জল সরিয়া গেলে, সদলবলে পার হইয়া যান। কিন্তু পশ্চাদ্ধাবিত ফ্যারাও ঐ পথে নিমজ্জিত হয়। পূর্বদিকে সিনেই পর্বত দেখা যায়। এইখানে মোজেজ্ ভগবানের আদেশ পাইয়াছিলেন। গত যুদ্ধের সময় একটি ঘূর্ণায়মান (swing) পোল নির্মিত হইয়া ২ পারের রেল লাইন যোগ করিয়া দিয়াছে এবং ট্রেন না বদলাইয়া এখন সুয়েজ বা পোর্ট সেইড হইতে এসিয়ায়, বিরুট, প্যালেষ্টাইন ইত্যাদি স্থানে যাওয়া যায়। ইস্‌লামিয়া, এল্ ক্যান্টারা খালের ধারে বসতি। সেখানে হ্রদ পার হইয়া পুনরায় খালে পোর্ট সেইড পৌঁছান যায়। এখানে ইউরোপের মত বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খাল কোম্পানির আফিস, খালের পাশে সাইমন আর্টজ্ ইত্যাদি দোকানের বহর এবং শেষকালে লেসেপ্সের মূর্ত্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য। সহরটি দেখিবার মত, কিন্তু লোকজন বিরল। দেশী সহরের অংশ দুর্বৃত্তদের আড্ডা এবং দল বাঁধিয়া তথায় যাওয়া সমীচীন। খাল পার হইলেই ভূমধ্যসাগর।

১৩৮০ খৃঃ পূর্বে এই খাল কাটিবার সেটির প্রথম চেষ্টা। নেপোলিয়ানও ১৭৯৮ সনে বিশেষ চেষ্টা করেন। অনেক বিদ্রূপের ভাগী হইয়া লেসেপস্ ১৮৫৪-৫৯ সনে এই খাল কাটেন; পরে সরু খাল পাথরে বাঁধান ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। খালটি ১০৩ মাইল লম্বা, ২১ মাইল হ্রদের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। পানামা খালও লেসেপ্সের পরিকল্পনা, কিন্তু দেশে দুরবস্থায় ও দুর্নামে জর্জরিত হইয়া কিছু করিতে পারেন না। বহুদিন পরে উহা কাটা হয়।

ভারতের দক্ষিণে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চিড়িয়াখানাটী বেশী বড় নয়, কিন্তু জীবজন্তু রাখবার ব্যবস্থাটা ভাল—যথাসম্ভব তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে রাখা হয়েছে। পথ থেকে রাজার নতুন প্রাসাদ দেখে যাওয়া হল পদ্মনাভস্বামীর মন্দিরে।

ত্রিরুমল নায়েকের প্রাসাদ

মন্দিরটী বিরাট—বর্তমানে এর সংস্কার হচ্ছে। দরজায় কড়া পাহারা, হাতে বন্দুক ও সঙ্গীণ। মহিলাদের হাতে প্লাষ্টিকের ব্যাগ ছিল, প্রহরীরা তা সঙ্গে নিতে আপত্তি জানায়—প্লাষ্টিক যে চামড়া নয় একথা বোঝাতে কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। অবশেষে মন্দিরে প্রবেশ করা গেল—মন্দিরের দেবতা নারায়ণ—অনন্ত শয্যায় শায়িত বিরাট মূর্ত্তি—নাম পদ্মনাভস্বামী। আসলে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অধিপতি এই পদ্মনাভস্বামী—মহারাজা এঁর সেবাইত মাত্র। অনন্ত শয্যায় শুয়ে ত রাজ্য পরিচালনা করা যায় না, সুতরাং শাসন ভার "সেবাইত"য়ের উপরেই ন্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। মন্দিরটী বড় কিন্তু খুব পরিষ্কার নয়। কাঠের ফ্রেমে পিতলের প্রদীপ সাজান; পাকাপাকি ব্যবস্থা। মন্দির পরিদর্শন শেষ করে সহর পরিদর্শনে বার হওয়া গেল। সহরের পুরানো অংশে পথঘাট সরু। সরকারী বাড়ীগুলি সুগঠিত, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীগুলি বিশেষ সুদৃশ্য নয়। অধিকাংশ রাস্তা পিচমোড়া এবং ইলেকট্রিক আলো শোভিত। সহরের বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় জলশক্তিতে, পল্লীভাসান নামক স্থানে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটী ছোট, উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ মাত্র ৫০০ কিলোওয়াট।

পল্লীভাসান সহর থেকে বহুদূরে—পরিদর্শন করতে হলে আর ও দুদিন থাকতে হয়—সুতরাং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন স্থগিত রেখে সেই রাত্রেই মাদুরা যাত্রা করা হল। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের গাড়ী বিটার মাপের—প্রথম দ্বিতীয় ও মধ্যশ্রেণীর ব্যবস্থা বেশ ভাল। সজ্জা

বলতে কি মধ্যশ্রেণীর কামরাগুলি এত ভাল যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বেশী ভাড়া দিয়ে যাওয়া নিরর্থক মনে হয়। তবে মধ্যশ্রেণীতে বার্থ রিজার্ভ করার ব্যবস্থা নেই।

রাত্রি সওয়া আটটায় ট্রেণ। হোটেলে সকাল সকাল ডিনার সেরে ষ্টেশনে হাজির হওয়া গেল। ত্রিবান্দ্রম সেন্ট্রাল ষ্টেশনটী বিশেষ বড় নয় তবে ব্যবস্থা মন্দ নয়। পশ্চিম ঘাটমালার পাশ দিয়ে ও পরে পশ্চিম ঘাট ভেদ করে রেলের লাইন চলেছে—পথের দৃশ্য খুবই সুন্দর, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে সে দৃশ্য সম্পূর্ণ উপভোগ করা গেল না। দিনের ট্রেনে এলে পথের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যেত—কিন্তু দুঃখ করে কি লাভ—এমনিভাবেই আমাদের চলতে হয়।

ট্রেণটী প্যাসেঞ্জার জাতীয়, সুতরাং প্রত্যেক ষ্টেশনে থামতে থামতে বেলা দশটায় মাদুরায় এসে পৌঁছানো গেল। রিটায়ারিং রুমের জন্য তার করা হয়েছিল কিন্তু আগে থেকে ঘর দখল থাকায় আমরা আশ্রয় নিলাম ষ্টেশনের ঠিক বাইরে—"ট্রাভালার্স" বাংলোতে। বাড়িটী
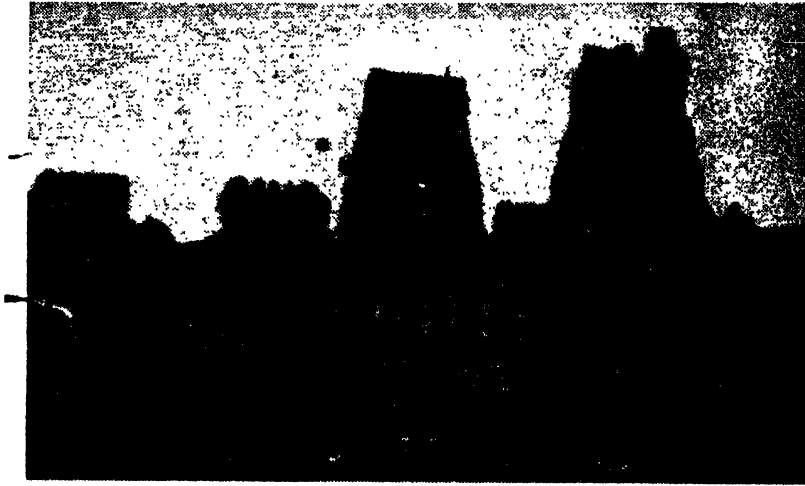
মাদুরার মন্দির

একতলা—ডাকবাংলোর মতো। ইলেকট্রিক আলো ও কলের জল আছে। প্রত্যেক ঘরের সংলগ্ন স্নানের ঘর। ব্যবস্থা ভালই।

মাদ্রাজের পথে লঙ্কার ক্ষেত দেখে যা ভয় পেয়েছিলাম তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে—বাংলোর রক্ষীকে দুপুরের খাবার কথা না বলে—মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ষ্টেশনের খানা ঘরে। খাবারের পরিমাণ তাতে একটা সাধারণ লোক ত দূরের কথা একটী শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়া দুরূহ। অবস্থা দেখে বিনয়দা টিনের ঘী এবং ডিম ভাজার ব্যবস্থা করলেন। কোনো রকমে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা ক'রে বাংলোয় ফিরে বেয়ারাকে ডেকে বলা হল যে রাত্রের জন্য সে খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে কিনা—অবশ্য ঝাল না দিয়ে। বেয়ারাটী খুব সপ্রতিভ, নাম John ভারতীয় খৃষ্টান। ঈষৎ হেসে সে উত্তর দিল যে বাঙালীবাবুদের জন্য বহুবার সে খাবার তৈরী করেছে এবং বাঙালীবাবুরা যে ঝাল খায় না এ সম্বন্ধে সে খুব ওয়াকিবহাল। তার কথায় সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে সহর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা গেল। জানা গেল যে সহরে চলাফেরা করার জন্য ট্যাক্সি পাওয়া যায় বটে কিন্তু তা ব্যয়সাপেক্ষ। বাংলোর সামনে দিয়ে সরকারী বাস যায়—তাতে চড়লে সহরের সব কিছু দেখা যাবে।

সরকারী বাসগুলি বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার। দুপুরবেলা, সুতরাং ভিড়ও নেই। আমাদের দলটী বাসে উঠতেই তা ভরতি হয়ে গেল। বাসে দুজনের বেশী দাঁড়াবার হুকুম নেই এবং যেখানে চিহ্ন দেওয়া আছে এমন জায়গা ছাড়া অন্যত্র থামবার নিয়ম নেই। আমাদের বাসে এখানকার স্থানীয় মহিলা দু' একজন উঠেছিলেন—তাঁদের সাড়ী ও কানের গহনা আমাদের দলীয় মহিলাদের লক্ষীভূত হ'ল। মাদুরার সাড়ী অবশ্য বিখ্যাত, সুতরাং সাড়ীর দোকান অবশ্য দ্রষ্টব্য কিন্তু তার পূর্ব্বে অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য।

মাদুরার তিরুমল নায়কের প্রাসাদের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। আমরা বাস থেকে অবতরণ করেছিলাম এই প্রাসাদের কাছেই, সুতরাং কালবিলম্ব না করে প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করা গেল। বাড়িটীর আকার প্রাসাদোচিত, বর্ত্তমানে এর বিভিন্ন অংশ আদালত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাসাদমধ্যস্থ প্রাঙ্গণটী বেশ বড়—প্রচুর স্তম্ভ ও পিলানের সমাবেশে একটী রাজকীয় আড়ম্বরের পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নাই কিন্তু স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে এর মধ্য থেকে প্রশংসাযোগ্য কিছু পাওয়া সন্দেহস্থল।

খবর পাওয়া গেল মাদুরার প্রধান দ্রষ্টব্য মীনাক্ষি দেবীর মন্দির-দ্বার পাঁচটার পূর্ব্বে খোলা হয় না। সুতরাং নিরুদ্বেগে পাঁচটা পর্য্যন্ত সাড়ীর দোকান ও তাঁতীদের তাঁতশালা পরিদর্শন চলল। কিছু সাড়ী সংগ্রহ করার পর মন অনেকটা শান্ত হয়ে এল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। মন্দিরের গোপুরম বহুদূর থেকে দেখা যাচ্ছে। তাঁতীপাড়া মন্দিরের কাছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মন্দিরের সীমানার মধ্যে এসে পড়া গেল।

মন্দিরের সীমানা বলতে শুধু মন্দির নয়—চার পাশের দোকান বাজার প্রভৃতি নিয়ে একটা জায়গা—একটি ছোটখাট সহর। পুরাতন সহর স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে মাদুরার মন্দিরের যথেষ্ট নাম আছে। স্থান এবং কাল হিসাব করলে পথগুলি প্রশস্ত বলতে হয়। রাস্তাগুলি সমকোণ। দুধারে দোকান। কাপড়, অলঙ্কার, তৈজসপত্র প্রভৃতি

যাবতীয় সামগ্রী। তখনকার মতো দোকানগুলির দিকে নজর না দিয়ে সোজা মন্দির চত্বরে প্রবেশ করা গেল। গোপুরমের মধ্যে পূজার উপকরণের দোকান। ইতিমধ্যে একটী গাইড বা পাণ্ডা জাতীয় ব্যক্তি আমাদের সঙ্গ নিয়েছিলেন। তার সাহায্যে মন্দিরের সর্ব্বত্র অতি সহজভাবে ঘুরে ফিরে বেড়ান হ'ল। দেবীদর্শনেও কোনো অসুবিধা হয়নি। মীনাক্ষি দেবীর প্রকৃত মূর্ত্তি কি রকম তা বলা শক্ত—স্বর্ণ ও হীরক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে অন্তরালবর্ত্তিনী দেবীর পাষাণ প্রতিমার পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। দেবীকে যথারীতি ডালা উৎসর্গ করে সান্ত্বনা লাভ করা গেল—যে এরপর স্বর্গের পাশপোর্ট সংগ্রহে কোনো অসুবিধে হবে না।

মন্দিরটী বিরাট—৮৪৭ ফুট লম্বা এবং ৭২৯ ফুট চওড়া। চারিদিকে চারটী বিরাট গোপুরম—মধ্যে আরও পাঁচটী গোপুরম—মোট সংখ্যা ৯টী। সবচেয়ে বড় গোপুরমটী ১৫২ ফুট উঁচু। মন্দিরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দির—মীনাক্ষিদেবীর স্বামী।

পানবান সেতু

মন্দির চত্বরের উত্তরপূর্ব্ব অংশে "সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ"। অঙ্কের হিসাবে স্তম্ভ সংখ্যা ৯৯৭ কিন্তু সত্যি গুণলে এ সংখ্যাও পাওয়া যায় না। কিছুটা অংশ ভেঙে গেছে এবং সেজন্য সেই ভগ্ন অংশ দেওয়াল দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। মন্দিরের প্রদক্ষিণ পথটী বেশ চওড়া প্রায় ষোল ফুট—দুধারে পাথরের স্তম্ভ—স্তম্ভ শীর্ষে ভারী কারুকার্য্যময় ব্র্যাকেট—তার উপরে সোজা ছাদ গোটা পাথর দিয়ে তৈরী। ব্র্যাকেটগুলির কারুকার্য্য বেশ সুন্দর।

প্রদক্ষিণ পথের পাশে—শাস্ত্রে উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত বহু দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পাছে ভক্তদের স্পর্শে দেবতাদের অঙ্গহানি ঘটে সেই ভয়ে তাঁদের লোহার শিকের বেড়ায় পেছনে রাখা হয়েছে।

মন্দির চত্বরে বিজলী বাতি থাকলেও গর্ভ গৃহের কাছে প্রদীপের ব্যবস্থা। কাঠের ফ্রেমে পাকাভাবে পিতলের প্রদীপ বসান—দেখতে বেশ ঝকঝক করে, প্রদীপ জ্বালালে ভারী সুন্দর দেখায়।

মীনাক্ষিদেবীর মন্দিরের সামনে—টৈপ্পাকুলম বা পুষ্করিণী। পাকা বাঁধান। জল কিন্তু খুব পরিষ্কার নয়। শোনা গেল—এর আর একটী নাম আছে পোট্টা মারাই বা স্বর্ণ পুষ্করিণী অর্থাৎ এখানে সোনার পদ্ম ফোটে। আমরা কিন্তু তার সাক্ষাৎ পেলাম না।

মন্দিরটীর গঠন কৌশল ও কারুকার্য্য দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একাধিক শতাব্দী ধরে এর নির্ম্মাণ কার্য্য চলেছে। যতদূর জানা যায় চোদ্দ থেকে ষোল শতাব্দীতে এই মন্দির তৈরীর কাজ চলেছে—তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অংশ নির্মিত হয়েছে তিরুমল নায়কের রাজত্বের সময়। মন্দিরটীর সাধারণ অবস্থা ভালই, তবে স্থলবিশেষে কয়েকটী স্তম্ভ ও ব্র্যাকেট জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সেগুলি পরিবর্ত্তন করার কাজ চলেছে। নতুন স্তম্ভ ও ব্র্যাকেটগুলি পুরাতনের আদর্শে নির্ম্মিত হলেও এ দু'য়ের উৎকর্ষের তারতম্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

এত বড় মন্দির, বেশ ভাল করে দেখতে হলে অন্তত তিনটী দিন লাগে কিন্তু হাতে অত সময় কই? একদিনেই সমস্ত মন্দির ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়া গেল। বৈকালীন "চা" পান তখনও সমাধা করা হয়নি।

ধনুকোডীর জাহাজঘাটা
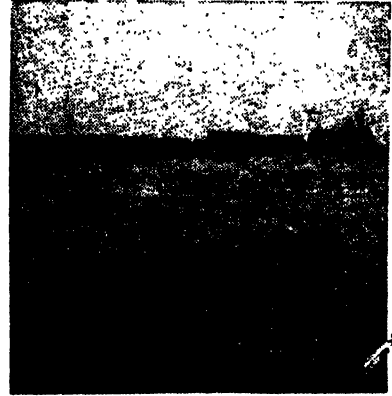
অথচ চার পাশে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দিনের আলোয় মন্দির পথের দুধারে যে দোকানগুলির দিকে নজর পড়েনি—ফিকে নীল রংয়ের ফ্লুয়োরেসেন্ট আলোর ঔজ্জ্বল্যে তাদের মোহিনী রূপ রাতের অন্ধকারে স্বয়ং-প্রভ হয়ে উঠল। কিন্তু তাদের মোহিনী মায়া অতিক্রম করে আমরা প্রবেশ করলাম একটী কফি হাউসে। উদ্দেশ্য মন্দির পরিক্রমাজনিত ক্লান্তি নিরসন। চায়ের পরিবর্ত্তে কফি মন্দ লাগে না।

কফি হাউস থেকে বার হয়ে লক্ষ্য করা গেল—এ অঞ্চলে প্রচুর স্বর্ণকারের দোকান। সোনা রূপার দ্রব্যসম্ভার ও জড়োয়া পাথরের কারবার। এসব জড়োয়া পাথর আসে সিংহল থেকে। দাম খুব বেশী নয় কিন্তু পাথরগুলি বাঁধাবার কৌশলে খুব উজ্জ্বল মনে হয়। এতক্ষণে স্থানীয় মহিলাদের কাণের দুল ও নাকছাবির ঔজ্জ্বল্যের কারণ স্পষ্ট বোঝা গেল। দোকানী কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিন্ধী।

ইতস্ততভাবে জিনিষপত্র যাচাই করতে করতে হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় দেখা গেল—[illegible]কে আটটা বেজে গেছে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব

স্না করে বাংলোয় ফেরা গেল। কলে তখনও জল পাওয়া গেল সুতরাং বেশ আরাম করে হাত পা ধুয়ে ইজিচেয়ারে বসতে না বসতে শ্রীজন্ এসে খবর দিলেন—ডিনার প্রস্তুত। কাল বিলম্ব না করে খাবার ঘরে উপস্থিত হওয়া গেল। ইংরাজী ও দেশী উভয় মতের সংমিশ্রণে খাবার ব্যবস্থা। পরিমাণ ও আস্বাদ দু'য়েরই জন্ত শ্রীজন আমাদের ধন্তবাদের পাত্র।

আহার সমাপ্ত করেই শয্যাগ্রহণ করা হল—কেননা ৫-৫০ মিনিটে ভোর বেলায় ধনুস্কোডীর ট্রেন ধরতে হবে। তবে সুখের কথা এই যে, ট্রেনটী মাদুরা থেকেই যাত্রা সুরু করবে।

পাছে আমাদের না নিয়ে ট্রেন চলে যায় এই ভয়ে সাড়ে চারটার সময়েই ঘুম থেকে উঠে বিছানাপত্র বেঁধে ষ্টেশনে হাজির হওয়া গেল, কিন্তু অত আগে ষ্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল যে আমাদের থেকেও সাবধানী লোক বিস্তর আছেন। তাঁরা বোধ হয় ট্রেণ প্লাটফরমে লাগানর সঙ্গে সঙ্গে এসে আসন সংগ্রহ করেছেন। যাই হোক পছন্দ মতো একটী

রামেশ্বরের অতিথিশালায়

কামরায় আমাদের পুরো দলটী উঠে বসায় আর কেউ সেদিকে ঘেঁসবার চেষ্টা করেনি। ভোরের আলো স্পষ্টভাবে ফুটতে না ফুটতে ট্রেন চলতে সুরু করল। ঘুমের আমেজ কেটে গেছে এখন চা খেতে পেলে সান্ত্বনা পাওয়া যায় কিন্তু চা কোথায় পাওয়া যায়।

উমাদেবী আমাদের আশ্বাস দিলেন—মাভৈঃ। চা চিনি দুধ জল মায় ষ্টোভ পর্য্যন্ত সঙ্গে আছে—শুধু জল গরম করার যা অপেক্ষা। শ্রীমান কালাচাদ উৎসাহ সহকারে সহধর্ম্মিণীর সাহায্য করলেন। কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে অনুভব করা হল—চা কী সুস্বাদু। সকলে একবাক্যে বললাম—উমাদেবীর জয় হোক।

গাড়ী ধীরগতিতে চলেছে—৭-১৭ মিঃ মনমাদুরাই জংশন। এখানে খানা কামরা আছে—বিনয়দা কর্ত্তব্য হিসাবে প্রাতরাশের হুকুম দিলেন।

টাইম টেবিল বা সময়পঞ্জীর হিসাবে ধনুস্কোডী পৌঁছবার সময় ১১-৫৫ মিঃ। মাদুরা থেকে দূরত্ব ১০৪ মাইল—অঙ্কের হিসাবে ট্রেনের গতি দাঁড়ায় ঘণ্টায় ১৭॥০ মাইল। ট্রেনের এই মন্থরতা কিন্তু বিশেষ অনুভব করা গেল না। দেখতে দেখতে মণ্ডপম ষ্টেশনে এসে পৌঁছান গেল—হলদে সাইনবোর্ডে সিংহল যাত্রীদের এখানে অবতরণ করার কথা লেখা আছে। অনেকগুলি চালা ঘর দেখা গেল—এখানে সিংহল যাত্রীদের "কোয়ারেন টাইন" করা হয়।

মণ্ডপমের পরেই বিখ্যাত "সেতুবন্ধ"। সমুদ্রের ওপর সেতু এবং সেই সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেণে ভ্রমণ—আগেকার যুগের লোকের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। রামায়ণের যুগে রামচন্দ্র তাঁর বানর সৈন্ত নিয়ে হেঁটে এই সেতু পার হয়েছিলেন—আর আমরা পার হচ্ছি ট্রেণে এই ভেবে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে। সেতুর মধ্যে এক জায়গায় সেতু তুলে নেবার বন্দোবস্ত আছে—জাহাজ পারাপারের জন্ত। সেতু পার হয়েই পামবন্ জংশন। এখান থেকে লাইনটী দু'ভাগ হয়ে গেছে—এক ভাগ গেছে ধনুস্কোডী, অপর ভাগ "রামেশ্বর"। রামেশ্বর যেতে হ'লে এখানে ট্রেন বদল করতে হয়। প্রত্যেকটী ট্রেনের জন্তু জন্তু সাটল ট্রেণ আছে।

রামেশ্বরের গোপুরম

আমরা গাড়ী বদল না করে. সোজা চললাম ধনুস্কোডী—পথে একটী ছোট ষ্টেশন পড়ে—নাম রামেশ্বর রোড—এখান থেকে রামেশ্বর মন্দিরের গোপুরমের চূড়া দেখা যায়। এখান থেকে রামেশ্বর যাবার একটা হাঁটা পথ আছে—কিন্তু কোনো রকম যানবাহন পাওয়া যায় না।

রেল লাইনের দু'পাশের দৃশ্য মোটেই মনমুগ্ধকর নয়—শুধু বালি আর কাঁটা গাছ—আর কিছু দূর গিয়েই সমুদ্রের নীলের আভাস পাওয়া গেল। তার পরই ধনুস্কোডী।

ষ্টেশনের অল্প আগে—লাইনের একটী অংশ বাঁ দিকে বেঁকে গেছে—জাহাজ ঘাটে। ট্রেন থেকে সিংহলগামী জাহাজ ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। "বোট একস্‌প্রেস" ট্রেনখানি সোজা জাহাজ ঘাটে গিয়ে দাঁড়ায়, অন্ত ট্রেনগুলি যায় ষ্টেশনে।

ধনুস্কোডী দেখে অত্যন্ত নিরাশ হতে হল। যেমন ষ্টেশনের শ্রী তেমনি

চতুষ্পার্শ—অতি নোংরা ও অপরিষ্কার। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুম প্রায় গুদাম ঘরের সামিল। এখানে বিশ্রাম করা দুরূহ।

সন্ধান করা গেল—কোনো ভাল হোটেল পাওয়া যায় কিনা। সেদিকে নিরাশ হতে হল। সমুদ্রে স্নান করার কোনো ব্যবস্থা নেই। শোনা গেল মাইল চারেক পথ অতিক্রম করতে পারলে সমুদ্রে স্নান করা যেতে পারে।

বিরক্ত হয়ে স্থির করা হল—পরবর্ত্তী ট্রেনে প্রত্যাবর্ত্তনই শ্রেয়। তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে—সুতরাং আর ঘোরাঘুরি না করে যে ট্রেনটা ফিরে যাবে তারই একটা কামরা দখল করে বসা গেল।

হাতে তখনও এক ঘণ্টার ওপর সময় আছে—অতএব ক্যামেরা হাতে করে জাহাজ ঘাটের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। ষ্টেশন থেকে জাহাজ ঘাটা যাবার কোনো পাকা পথ নেই—জলের ধারে ধারে বালির ওপর দিয়ে যাওয়া—জুতো পায়ে চলা মুস্কিল।

রামেশ্বরের পৃথিবী বিখ্যাত অলিন্দ

ট্রেণ একেবারে জলের ওপর জেটীতে গিয়ে দাঁড়ায়। জেটীর গেটে সশস্ত্র পাহারা এবং কষ্টমসের বেড়া। সিংহল এখন ভিন্ন দেশ, সুতরাং সেখানে যেতে হলে বিদেশ যাবার সকল রকম বিধিনিষেধ মানতে হয়।

ধনুষ্কোডী থেকে কলম্বো—ষ্টীমার যোগে সংযোগ। ওপারে তালাই মান্নার জাহাজ ঘাট—ঘণ্টা চারেকের পথ—তারপর ট্রেণে কলম্বো ১২ ঘণ্টার মাত্র।

এবারের মতো কলম্বো যাত্রা স্থগিত রেখে ষ্টেশনে ফেরা গেল। রামেশ্বরের যাবার ট্রেন ঘণ্টাখানেক পরে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে—পামবামের সেতু ভাল করে দেখবার জন্য ষ্টেশন থেকে বার হওয়া গেল। ষ্টেশনের ডিসট্যাণ্ট সিগনালের কাছে সেতু। হেঁটে যেতে কোন কষ্ট হল না। জলের ধারটা বড় সুন্দর—জলে ঢেউ নেই—উপকূলে প্রচুর ঝিনুক ও প্রবাল পড়ে আছে। সংগ্রহ করার বাতিক থাকলে সুবর্ণ সুযোগ। সুযোগের কিছুটা সদ্ব্যবহার করে ষ্টেশনে ফিরে দেখি—ট্রেন ভর্ত্তি। কোনো রকমে স্থান সংগ্রহ করে বসা গেল। এঞ্জিন একটা প্রচণ্ড শব্দ করে যাত্রা সুরু করে দিল। যথাসময়ে রামেশ্বরম্ পৌছতে আধ ঘণ্টা সময় লাগে। মধ্যে একটা ছোট্ট ষ্টেশন আছে—তুলনায় নামটা অনেক বড়—থংগাছিমাদম্। বেলা চারটায় রামেশ্বর পৌঁছে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয়ের সন্ধান করা গেল। ষ্টেশনের কাছে একটা দু'তলা ধরমশালা আছে—কুলীদের পরামর্শে সেখানে গিয়ে ওঠা গেল। বাড়ীর চেহারা মন্দ নয়, কিন্তু ব্যবস্থা আমাদের মনোমত নয়। শোনা গেল মন্দির কর্ত্তৃপক্ষদের কতকগুলি গেষ্ট হাউস আছে, চেষ্টা করলে—সেখানে স্থান সংগ্রহ করা যেতে পারে। সেই বাড়ীগুলি সমুদ্র এবং মন্দিরের কাছে। কাল বিলম্ব না করে মন্দির কর্ত্তৃপক্ষীয়দের উদ্দেশে টোঙ্গা নিয়ে বার হওয়া গেল।

কাছারি বাড়ীতে প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করতেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটা ছোট বাংলো ধরণের বাড়ী আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হল—ভাড়া নাম মাত্র। বাংলোটিতে দুটো বেশ বড় বড় ঘর; সামনে ও পিছনে বারান্দা। দুটি স্নানের ঘর এবং ড্রেসিং রুম। তাছাড়া পিছনে একসারি ঘর—রান্না ও ভাঁড়ারের জন্য। ঘরে ইলেকট্রিক আলো এবং কলের জল। আর কি চাই। ভাল করে গুছিয়ে বসতে না বসতে ফিরিওয়ালাদের দল এসে হাজির। শাঁখ, ঝিনুক, ঝিনুকের মালা, তুলসীর মালা, ছবি ইত্যাদি দ্রব্য বিক্রয়—বেশ দরাদরি চলে। কিছু জিনিস কিনে তখনকার মতো ফেরিওয়ালাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেল।

সন্ধ্যা নাগাদ, স্নান ও চা পান সমাপ্ত ক'রে মন্দির দর্শন ও রাত্রের আহারের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা গেল। সন্ধান নিয়ে দেখা গেল—রামেশ্বরমে ভাল হোটেল কিংবা খাবারের জায়গা একান্ত দুর্লভ। অগত্যা নিরুপায় হয়ে—একটা গুজরাটী হোটেলে খাবারের বন্দোবস্ত করা গেল—পরোটা এবং আলু পিয়াজের তরকারি। হোটেলের মালিক আমাদের জানালেন যে খাবারের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি কেননা তিনি বিশুদ্ধ ঘৃত ও প্রথম শ্রেণীর আটা ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করেন না।

অতঃপর মন্দির দর্শন। আমাদের বাসস্থানের সামনেই মন্দির—বিরাট গোপুরম। পূর্বদিকের গোপুরমটী সব চেয়ে বড়—প্রায় ৮০ ফুট উঁচু। মন্দিরের বাইরে ২০ ফুট উঁচু প্রাচীর। ভিতরে তিন দফা প্রদক্ষিণ পথ প্রত্যেকটী বেশ চওড়া। রামেশ্বর মন্দিরটী দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে খুবই উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য এর দালান—একপ্রস্থে ৬৯০

ফুট লম্বা। সারা পৃথিবীতে এত লম্বা দালান আর কোথাও নেই। দালানের প্রস্থ ১৭ ফুট থেকে ২১ ফুট, উচ্চতায় প্রায় ত্রিশ ফুট—দুধারে কারুকার্যময় স্তম্ভ। স্তম্ভের ভাস্কর্য-শিল্প বেশ বলিষ্ঠ। মন্দিরের অলিন্দে স্থানীয় নরপতিদের মূর্তি রক্ষিত আছে—দ্বারপাল হিসাবে সেগুলি রক্ষিত হয়ে থাকলে অবশ্য বলবার কিছু নেই, কিন্তু ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবে সেগুলি একেবারে অচল।

মন্দিরের ভিতরেই বাজার ও খেলনার দোকান—নানা রকমের শাঁখ, [illegible]ক, ঝিনুকের মালা প্রভৃতি বেশ সুদৃশ্যভাবে সাজান। ইলেক্ট্রিক আলোয় দোকানগুলি আলোকিত—আমাদের মতো ভ্রাম্যমান পতঙ্গেরা সেই আলোকে আকৃষ্ট হয়ে পকেটের ভার মোচন করে এবং হাতের বোঝা বৃদ্ধি করে আনন্দ লাভ করে। সারাদিন ট্রেনে ঘুরেও মন্দির ও দোকানে ঘোরাফিরি করে সাড়ে ৯টা নাগাদ ক্লান্তিবোধ বেশ প্রবল বলে মনে হল।

আর কালবিলম্ব না করে—বাসস্থানে ফিরে গুজরাটী হোটেলের আহার্য আক্রমণ করা গেল। আক্রমণই বটে—ঢাকা খুলে দেখি পরোটা গুলি [illegible]ট আকারের প্রায় ১০″ থেকে ১২″ ইঞ্চি ব্যাস। এ জাতীয় পদার্থের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ছিল না। কিন্তু খেয়ে দেখা গেল যে আকার বিরাট হলেও পদার্থগুলি স্বাদু ও সুপাচ্য। ক্ষুধার পরিমাণ যতই হোক না কেন—আহার্য যা সংগ্রহ করা হয়েছিল তা পর্যাপ্তেরও অধিক। অর্ধেকেরও বেশী উদ্বৃত্ত হওয়ায়—সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে সে রাত্রির মতো শয্যাগ্রহণ করা হল।

রাত্রে একবার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল—যখন মূষিক বা মার্জার জাতীয় কোনো জন্তু আমাদের সযত্ন রক্ষিত খাদ্যগুলির অংশ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

ভোর হতে না হতে শয্যা ত্যাগ করে সমুদ্রস্নানে যাওয়া হল। সমুদ্র আমাদের বাসস্থানের খুব নিকটে অনেকটা অগভীর হ্রদের মতো। ঢেউয়ের কোনো উচ্ছ্বাস নেই। বহুদূর চলে গিয়ে কোমর পর্যন্ত জল পাওয়া গেল। মধ্যে মধ্যে পাথর। ভরসা করে আর বেশী দূর যাওয়া হল না। পুরীতে সমুদ্র স্নানের যে আনন্দ পাওয়া যায় এখানে তা সম্ভব নয়। এ যেন পুষ্করিণীতে স্নান। স্নান সেরে মন্দিরে যাওয়া হল—গত রাত্রের অসমাপ্ত কর্তব্য সমাপনের জন্য। পূজার রেট বাঁধা—বিশেষ বিবরণ নোটিস বোর্ডে লিখিত। মন্দির কর্তৃপক্ষ অফিসে গঙ্গা জল পাওয়া যায়—অর্থের বিনিময়ে যা [illegible] সুপ্রাপ্য। পূজার ডালার দরও অল্প—ডালায় সাজান কলা নারিকেল ও ফুলের মালা। পাণ্ডাদের কোনো রকম জুলুম নেই। দেবদর্শনের জন্য পাণ্ডাদের সাদর আহ্বানে বেশ তৃপ্তচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া গেল।

তারপরই "ইণ্ডো-সিলোন [illegible]" ধরার তাড়া। বেলা একটায় পামবান স্টেশন। এই গাড়ীটিতে সাধারণতঃ ভিড় একটু বেশী থাকে। এই সংবাদ পূর্বাহ্ণে জানা থাকায় বিনয়দা আগের দিনই ধনুষ্কোডীর টিকিট কলেক্টারকে এ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। অনুরোধের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবশ্য আর কিছু উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। গাড়ী যখন পামবানে এসে থামল—তখন দেখি সত্যই আমাদের জন্য ব্যবস্থা করা আছে।

ট্রেনে উঠে চিন্তা হল—মধ্যাহ্ন ভোজনের। গাড়ীতে খানা কামরা ছিল। সুতরাং খানাকামরার বয়কে ডেকে হুকুম দেওয়া হল—উপবাসী তীর্থযাত্রীদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য।

(ক্রমশঃ)

মৃগতৃষ্ণিকা

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

মরুতৃষা মিটাবারে ছুটেছিস্ মরীচিকা পানে
কী মায়ার টানে
শোন্ রে পথিক,
পথপ্রান্তে ফেলে গেলি মরুদ্যান কত মনোহর,
সবুজ সুন্দর—
ভুলে দিগ্বিদিক—
চলেছিস্ পাগলের প্রায় হয়ে পথহারা—
হবে না কি সারা
জীবনের যাত্রাপথ ?
কভু কি মিটিবে তোর প্রাণের পিয়াসা
লয়ে মিথ্যা আশা,!
ব্যর্থ মনোরথ !

আকাশের বুকে যবে জাগে ইন্দ্রধনু,
স্বপ্নময় তনু,
রঙীন বিলাস,
আপনার হাতে কেহ তাহারে কি চায় ?
ক্ষণপরে হায়
মিলায় প্রকাশ !
তার চেয়ে তাকা দেখি হৃদয় মাঝারে
নিভৃত অন্তরে
খুঁজে পাবি সেথা,
যাত্রা তোর যার লাগি তৃষাতুর হ'য়ে
কত ব্যথা স'য়ে
হবে না সে বৃথা ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরেন্দ্রসিং আসতে নেমে এসে বললে—"কলের কুলিরা তোয়েরই আছে, কিন্তু তাতে হবে না, বাজার থেকেও লোক চাই, আপনি ব্যবস্থা করুন।...কিন্তু আসল কথা, যার জন্যে আপনাকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছি—একজন লোক চাই, ভালো ডুবুরি, সে ফাটলের মুখে নেমে দেখবে ভেতর দিকে গর্ত কি রকম, কহাত চওড়া, ভেতরে কতটা..."

বীরেন্দ্রসিং মনে মনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, না ভেবেই বললেন—"তা বোধহয় পাওয়া যেতে পারে; এত লোক, ডেকে জিজ্ঞেস করে দেখলে..."

মৃন্ময় বললে—"কিন্তু একটা কথা ভাববার আছে—যে নামবে সে নাও উঠে আসতে পারে; সেইজন্যেই আপনার মত নেওয়া, নয়তো আমিই তো ব্যবস্থা করতে পারতাম। ভেতরে ফাটল যদি খুব বেশি হয়—স্রোত ঢুকছে, তাকে একরকম চুষে নিতে পারে..."

স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে থেকে বললে—"দয়া করে শীগগির আপনাকে ঠিক করে ফেলতে হবে।"

বীরেন্দ্রসিং একবার মমতার দৃষ্টিতে নিচের সমস্ত কলোনিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপরে বেশ দৃঢ় অথচ কাতর কণ্ঠে বললেন—"যাক সব ভেসে মৃন্ময়বাবু, আমার লখমিনিয়ার জন্যে অন্যের প্রাণ যাবে কেন?"

মৃন্ময়ের সব উত্তর ঠিক করাই ছিল, একবার ঝিলের ওপারে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে—"কিন্তু একটার জায়গায় অনেক প্রাণ চলে যেতে পারে বীরেন্দ্রবাবু, এক্ষুনি। এই বাঁধ যদি এখুনি ভাঙে—এটুকু যদি ভাঙে আরও ভাঙবার সম্ভাবনা—তাহলে আপনার ঐ সামনের আশ্রম, হাসপাতাল—এর চেয়ে এত নিচু জমিতে—তায় ঝিলটা ভরা রয়েছেই—বুঝতেই পারছেন—কোটালের বানের মত জল গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এখন লোক পাঠিয়ে যে ওদের সরিয়ে ফেলবেন তারও সময় নেই আর।"

এত ব্যাকুল এর আগে দেখে নি. বীরেন্দ্রসিংকে, শক্ত লোক বলেই জানত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন—"কোন উপায়ই নেই মৃন্ময়বাবু?"

একবার অসহায় ভাবে দৃষ্টিটা চারিদিকে বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"আমি নিজে যে সাঁতারের কিছু জানি না... রাজার বাড়ির অপদার্থ ছেলে..."

মৃন্ময় তাঁর হাতটা ধরলে, বেদনাসূচক কণ্ঠেই বললে—"এইজন্যে এসেই আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম বীরেন্দ্রবাবু, এমন সোনার জায়গায় এসব এনে ফেললেন কেন?...থাক, আপনি এতটা ভয় পাবেন না, আমি যা হোতে পারে তার কথাই বললাম, হবেই যে এমন কিছু কথা নেই, সেই জন্যেই প্রাণপণে করছি চেষ্টা। চলুন ওই উঁচু জায়গাটায় গিয়ে ডেকে বলতে হবে, আপনি বরং পাশে দাঁড়ান, আমিই বলি, বিপদের কথাটা আমি বুঝিয়েই বলবো, তা সত্ত্বেও যে আসতে চায় আসবে, জোর করা হচ্ছে না তো..."

এত লোকের মধ্যে মাত্র পাঁচজন হাত তুললে, একজন এদেশী আর চারজন সাঁওতাল। দেশী লোকটিকে এ কাজের পক্ষে দুর্বল মনে হওয়ায় তাকে ছেড়ে দিয়ে মৃন্ময় সাঁওতাল চারজনকে এগিয়ে আসতে বললে। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে, তাকে সমস্ত বুঝিয়ে বাঁধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একটা কাণ্ড হোল।

মৃন্ময় যখন অবস্থাটা বুঝিয়ে সবাইকে আহ্বান করছিল, কতকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে, ওদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করবার জন্যেই, সেই সময়ই তার লক্ষ্য গেল, সাঁওতালদের মধ্যেই, ওরই ভেতর একটু আলাদা হয়ে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝংড়ু, আর পাশেই রুম্মা। ঝংড়ুর মাথার রাঙা সালুর পটিটা নবোদিত সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে, রুম্মারও তার সেই সকালের ভূষণ-পরিচ্ছদ

—আঁট করে পরা একটা খাটো সাঁওতালী শাড়ি, রূপার মল, হাতে রূপার বালা, খোঁপায় একটা থোকা লাল জবা, ঝংড়ুর সালুর রঙে রঙ মেশানো।·· দৃশ্যটা যেমন মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিলো, তেমনি আবার ঢেউয়ের ভাষাও জুগিয়ে যাচ্ছিল লোকেদের গরম করে তুলতে।···রুম্মাকে মনে হচ্ছিলো স্বপ্নরাজ্য থেকে নেমে এসেছে—একটু বিস্ময় আর প্রচুর প্রশংসার দৃষ্টিতে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে মৃন্ময়ের পানে—মৃন্ময়ের মনে হোল তার পৌরুষে অভিভূত হয়েই, কেন না সে-ই তো এখন ত্রাণকর্তা, সেই বিরাট রঙ্গমঞ্চের সেই তো নায়ক এখন।

লোকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাঁধের দিকে এগিয়েছে, এমন সময় পেছনে কয়েকজনের মুখে আওয়াজ শুনে ফিরতেই মৃন্ময় দেখে ঝংড় ভিড় চিরে হন হন করে এগিয়ে আসছে, তার পেছনেই রুম্মা। মৃন্ময় দাঁড়িয়ে পড়ল, ঝংড় একেবারে সামনে এসে বললে—"ও নাই যাবে।"

বাংলাটা যেন জিদ করেই শেখেনি ঝংড়, রুম্মার ঠিক উল্টো।

বীরেন্দ্রসিং, সুকুমার, আরও অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের পেছনে ভিড় জমে উঠছে।

সুকুমারেরই চাকর, সে-হিসাবে সেই বললে—"কেন ঝংড়, ও নিজে যেতে চাইছে—এতগুলো লোকের বিপদ ··"

"নাই যাবে"।—লোকটার হাত চেপে ধরলে। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সবাই একেবারে চুপ করে গেছে, বীরেন্দ্রসিং কিছু না বলায় আর কেউ যেন কিছু বলতেও পারছে না।

মৃন্ময় একটু কড়া হয়ে প্রশ্ন করলে—"তোমার কেউ হয়?"

"হাম ও লোকদের সর্দ্দার আছি; নাই যাবে।··ও নাই যাবে, ও শকবে নাই, বাচ্চা আছে···চল্!"

শেষের কথাগুলা বলার সঙ্গে সঙ্গে যুবাকে একটা টান দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল; সঙ্গে সঙ্গেই পা বাড়ালে।

মৃন্ময় রুম্মার পানে চেয়ে বললে—"তুমি বারণ করো।"

"শুনবে? করলেন তো আপনারা বারণ।··তা ভিন্ন আমরা সর্দ্দার, একটা ছেলেকে বিপদের মুখে যেতে দেব কি করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে?"

সমস্ত জায়গাটা এত নিঃশব্দ হয়ে গেছে, একটা সূচ পড়লে তার শব্দটা শোনা যায়। অনেকগুলাই কারণ—প্রথম তো সমস্ত ঘটনাটুকুই, তারপর রুম্মার চেহারা, তার ওপর তার এই একেবারে শুদ্ধ উচ্চারণে পরিষ্কার বাংলা বলা, বলার ভঙ্গি।···মৃন্ময়ের কাছে আরও কিছু বেশি আছে—রুম্মার দৃষ্টি—তাতে কত ইঙ্গিত, কত ব্যঞ্জনা যে রয়েছে, যেন থৈ পেয়ে উঠতে পারছে না। এতগুলা ভালো-মন্দ লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে একজন তরুণী যে এত স্পষ্টভাবে চেয়ে বলতে পারে কথা, সব বাদ দিলেও, এইটেই একটা বিস্ময়কর জিনিস।

ঝংড় এগিয়ে যাচ্ছে ওদিকে, কি ভেবে আর একবার রুম্মার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে নিয়ে মৃন্ময় পা বাড়িয়ে বললে—"দাঁড়াও সর্দ্দার, সব বুঝিয়ে দি তোমায়, অমনি নেমে গেলে চলবে না।"

"সর্দ্দার"-টা বললে একটু ব্যঙ্গ করেই, কথাটার ওপর একটু অযথা জোর দিয়েই।

বাঁধের মুখে দাঁড় করিয়ে ঝংড়ুর কোমরে একটা চৌদ্দ-পনের হাতের কাছি বাঁধা হোল শির দাঁড়ার ওপর দিয়ে; যাতে ঠিক মাঝখানটায় থাকে। সেই সঙ্গে একটা ছোট পাতলা দড়ি দিয়ে পিঠের ওপরটা ও সেটাকে আরেকবার বাঁধা হোল, তারপর তার হাতে একটা হাত দুয়েকের বাতা দেওয়া হোল, তাই দিয়ে ফাটলের দৈর্ঘ্য, গভীরতা হবে মাপতে। তাকে ভাল করে সব বুঝিয়ে দেওয়া হোল। বড় দড়ির সঙ্গে একটা ছোট পাতলা দড়িও বেঁধে দেওয়া হোল, তার মুখটা রইল ঝংড়ুর হাতে, বিপদ দেখলেই টান দেবে। মনে হোল বিপদের কথাটাই সব চেয়ে বেশি অগ্রাহ্য করলে ঝংড়, মুখে কিছু না বলেই। কাপড়টা নিজের সুবিধা মতো এঁটে নিয়ে বললে—"বঢ়ো"।—অর্থাৎ এগোও।

বাঁধে কেউ উঠবে না, কতকটা হুকুমের ভঙ্গিতেই জানিয়ে দিলে মৃন্ময়; খালি সে, ঝংড়, একজন সহকারী অফিসার, আর চারজন কুলি যারা দড়িটা ধরবে।···বড়ো ফাটলে জলের তোড় আর একটু বেড়েছে।·· বাঁধের ওপর কজনে পা দেওয়ার সঙ্গেই কিন্তু রুম্মাও পা তুলে দিলে। মৃন্ময় আরও কড়া হয়ে, দৃষ্টিতে আরও আদেশের ভাব ফুটিয়ে বললে—"না, ও চলবে না।"

রুক্মা মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করে বললে—"আপনি চলুন, আমার স্বামীর বিপদটা বেড়েই যাচ্ছে যত দেরি করছেন।"

এদিকটা একেবারে নিস্তব্ধ, সবাই যেন একটা নাটকের খুব রোমাঞ্চকর অংশ উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখছে। শুধু বীরেন্দ্র সিংহের গলার স্বর উঠলো—"ওকে যেতে দিন।"

ভেতরের দিকের বড়ো ফাটলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সবাই। জলটা আর একটু জোরে ঢুকছে, বড় একটা চাটুর আকারের ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে, আগে এটা ছিল না; অবশ্য বাইরে দেখতে এমন কিছু ভীতিজনক নয়। মৃন্ময় ফাটলের মুখ দুটো মিলিয়ে দেখলে আরও দেড় ইঞ্চি বেড়ে গেছে এর মধ্যে, অর্থাৎ বাঁধটা আরও হেলেছে সেই পরিমাণ।

কথাটা রুক্মাকে জানালে, কিন্তু তার মুখে কোন পরিবর্তন দেখতে পেলে না। রুক্মা যেন সেদিকে কান না দিয়েই ঝাংড়ুর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সালুর পটিটা খুলে তার মধ্যে আপনার খোঁপার জবাটা বসিয়ে আবার শক্ত করে দিলে বেঁধে। সবাই ফাটলের ওধারে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল, শুধু রুক্মা দাঁড়িয়ে রইল ফাটলের মুখের ওপর। ঝাংড়ু নেমে গেল।

সেই পঁয়ষট্টি বছরের প্রায়-বৃদ্ধ ঠিক চল্লিশ মিনিট রইল, জলের মধ্যে, দুটো ফাটল মিলিয়ে; প্রথম ডুবনে তিন মিনিট, মৃন্ময় ঘড়ি ধরে দেখলে। অদ্ভুতভাবে অঙ্কগুলা লিখিয়ে গেছে—প্রায় কত হাত নিচে, ফাটলের দৈর্ঘ—গভীরতা কত—তা পর্যন্ত।

যখন উঠে সবাই বাঁধ থেকে নেমে এলো তখনও কোন শব্দ নেই এক রকম, শুধু দুতিনবার সাঁওতালের দল কি বলে একটা বিজয় হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বীরেন্দ্রসিং নিশ্চয় কিছু একটা এঁচে রেখেছেন, মন্তব্য করবার মধ্যে শুধু তিনিই বললেন—"ওদের কেউ কেউ জলের মধ্যে ঢুকে কুমীর বেঁধে আনে।"

এরপর সব সহকারীদের নিয়ে মৃন্ময় আলাদা বসে কি একটা পরামর্শ করলে, কাগজ পেনসিল নিয়ে কিছু কিছু গণনাও হোল, শেষ হলে বীরেন্দ্রসিংহের কাছে বসে বললে —"বালির থলে এবার ফেলুক, কিন্তু হুড়োহুড়ি করা চলবে না।···আসল যা এখন দরকার, বাঁধের একেবারে ওদিকটায় ডিনামাইট করে হাত তিরিশেক উড়িয়ে দিয়ে জলের রাস্তা করে দিতে হবে, হ্রদের অন্য আর এক জায়গাতেও, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই; ডিনামাইট কারখানার ল্যাবরেটারিতে আছেই।"

আঠার

কিছুদিন আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় রইল না মৃন্ময়ের। চৈত্রমাসের অর্ধেক হয়ে এল, সামনেই বর্ষাকাল, এর মধ্যে বাঁধ না মেরামত করে তুলতে পারলে সমস্তই হবে পণ্ড। এই জন্যই ডিনামাইট যাতে না করতে হয় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কথাটা গোপনও রেখেছিল সেই জন্যই, শুনলে বীরেন্দ্রসিং এই ব্যবস্থাই করতে বলতেন, এরকম করে রাক্ষসের মুখে লোক নামতে দিতেন না।

সান্ধ্য বৈঠকে এসে বসা, কি সরমার জীবন নিয়ে কৌতূহল, কি রুক্মার জীবন নিয়ে খেলায় নামা—এসবই রইল বন্ধ। সরমার সম্বন্ধে কৌতূহলটা হয়তো কমেই এসেছিল—যে ভাবে সে নিজেকে প্রকাশ করে ধরলে সেদিন; তার ওপর সেটাকে জীইয়ে রাখবার জন্য এই সময়ের অভাব।···আর একটা কথা, যতদিন পর্যন্ত সরমার সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ছিল, একটা রহস্যের আভাস ছিল, ততদিন পর্যন্ত তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে ছিল একটা প্রচ্ছন্ন লোভ। এখন সন্দেহটা যত দূরে চলে যেতে লাগল, লোভের ধারটাও এল মরে। এখনও সরমা সুন্দরীই—অপরূপাই, কিন্তু পরের বিবাহিতা স্ত্রী—তাকে আর কোন রহস্য ঘেরে নেই।···তার ওপর এদিকে চিন্তারও নেই সময়।

রুক্মার সম্বন্ধে লোকের অত কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ, আছে সে উচ্চস্তরে, থাকতে রাজি হয়েছে, সেইটেই লোভকে করে উৎসাহিত। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা।···সেদিন বাঁধের ওপরের দৃশ্যটা একটু দেয় বাধা মনকে—যেভাবে ঐ বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গেই মরবার জন্য পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে এমন কিছু নাও হতে পারে, একটা সাময়িক উৎক্ষেপ মনের।···সর্বোপরি একটা ব্যাপার রয়েছে, ঘটনাটার পর রুক্মার সঙ্গে বারকয়েক যা চোখোচোখি হয়েছে; তাতে তার দৃষ্টিতে কি একটা যেন পেয়েছে মৃন্ময়। রুক্মার শান্ত অপলক দৃষ্টির ভাষা বোঝা কঠিন, প্রায় অসম্ভবই, কিন্তু তবুও এটুকু বেশ বোঝা যায়

যে মৃন্ময়কে নিয়ে সে যেন কিছু ভাবে, তাকে কিছু একটা বলতে চায়।

কিন্তু সময় নেই মৃন্ময়ের যে এ-সব ভেবে একটা সিদ্ধান্ত করে। কর্মের মধ্যে ক্ষণিক একটি অবসরে সিগারের ধোঁয়ার কুণ্ডলির মধ্যে এক আধটা ছবি ভেসে উঠে, দুএকটা কথা পড়ে মনে, আবার কুণ্ডলির সঙ্গেই ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

আশ্রমের বাসায় থাকেও বড় কম আজকাল। পাহাড়ের গোড়ায় একটা তাবু ফেলিয়েছে, সমস্ত দিনটা সেখানেই প্রায় যায় কেটে, কখনও কখনও গভীর রাত পর্য্যন্ত, এমনও হয়েছে যে সারা রাতও গেছে কেটে। তিনটে শিফ্‌টে কাজ হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টাই, বৈশাখের মধ্যে বাঁধ শেষ করে ফেলতে হবে, সেই সঙ্গে খালও। এখানে প্রায় জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিই বৃষ্টি টেনে আনে পাহাড়ে।

মৃন্ময়ের এই সমাচার, আর ঝিলের ওদিকে তার কর্মক্ষেত্রের।

ঝিলের এদিকের কর্মস্রোত নিজের খাতে বয়ে চলেছে, শান্ত, নিস্তরঙ্গ। আশ্রম-স্কুলের কাজ দিন দিন বেশ গুছিয়ে উঠছে, ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে আশ্রমের পরিধিও উঠছে একটু একটু ক'রে বেড়ে। বৃদ্ধির দিক দিয়ে দেখতে গেলে হাসপাতালটা বেড়ে গেছে বড় বেশি রকম, মিল-কলোনি আর এদিকে সহরটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই। বারোর জায়গায় এখন কুড়িটা বেড, একটা ঘর বাড়াতে হয়েছে, আউট-ডোরের কাজও বেড়ে গেছে ঢের বেশি। তবে সেই আগে নিত্য ডাক্তার ছেড়ে-যাওয়ার যে অশান্তি সেটা আর নেই। সুকুমার দায়িত্ব নেবার পরই একজন ছোকরা বেহারী-ডাক্তারকে নিয়োগ করেছে, বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে ভালভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই অঞ্চলেরই লোক, একটু আদর্শপ্রিয়, বীরেন্দ্রসিংহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের একটু সেবা করতে চায়। এছাড়া আরও একটা কারণ আছে, সুকুমার নিজের মাইনেটা অনেক কমিয়ে দিয়ে বাকি অর্দ্ধেকটা ডাক্তার, লেডী-ডাক্তার, আর নার্স-কম্পাউণ্ডারদের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছে; যেটা নেয় মাত্র ভাতা হিসাবে নেয়, অর্থাৎ ওর পুরোপুরিই সেবা।

কাজই ওর আনন্দ, সে কাজ যত বাড়ছে, অবসর যতই যাচ্ছে কমে, সে-আনন্দ কানায় কানায় তার মনটাকে দিচ্ছে ভরে।

কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তার মনে একটি ছায়া এসে পড়ছে মাঝে মাঝে, তার মনে হয় সরমা যেন মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করে নি, এই যে তার অক্লান্ত পরিশ্রম, নিজের শিক্ষা নিয়ে, আশ্রমের কাজ নিয়ে, হাসপাতালেও খানিকটা সেবার কাজ ক'রে, তার ওপর আবার ইচ্ছা ক'রেই কন্যার সংসারের সমস্ত ভার তুলে নিয়ে জীবনকে আবার পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবার তার এই যে সাধনা, এ বোধহয় তারই সাময়িক ক্লান্তি। ভেবে দেখবার বেশি সময়ও পায় না, বলে এই ধারণাটাই নিয়ে রইল কিছুদিন, তারপর হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাতে সেটা গেল ভেঙে।

একদিন বিকালের দিকে হঠাৎ বাসায় এসে দেখে বাসাটা শূন্য, শুধু ভেতরের বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে সরমা ঘুমচ্ছে। হাসপাতালে সুকুমার মোটা ক্রেপ-সোলের জুতা ব্যবহার করে, বিশেষ কোন শব্দ না হওয়ায় সরমা ঘুমিয়েই রইল। বিকালের ছায়া বারান্দাটার মাঝে প্রবেশ করে সরমার মুখে একটা গভীর প্রশান্তি এনে দিয়েছে। ওপরের ফ্যানটা আস্তে আস্তে ঘুরছে, তাইতে কপালের চুলগুলি একটু চঞ্চল। আজ অনেকদিন পরে ভালো করে দেখলে সরমাকে, কর্ম্মকোলাহলের মাঝখানেই এই ক্ষণিক অবসরটুকু দিয়ে সুকুমারের দৃষ্টিও বোধ হয় বেশি মন্ময় হয়ে থাকবে, চোখ ফেরাতে পারছে না।

দাঁড়িয়ে দেখবার একটু সুযোগও হয়েছে আজ। বুধাই আর ভুলা যে বাড়িতে নেই তার কারণ স্কুলে আজ স্পোর্টস্। বাচ্চুর শরীরটা আজ একটু খারাপ, কন্যা নিশ্চয় তার কাছে। পাচিকা বিন্দুর-মাও নেই, থাকেও না বড় একটা; কালামাহুন, গুটি কাজ করে, করে, বাকি সময়টা নিজের ঘরে ঘুমোয়, কিম্বা মোটা চশমা চোখে দিয়ে রামায়ণ পড়ে।

এই নিস্তব্ধতার কোলে সুপ্ত তরুণীর ছবিটি শুধুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে সুকুমারের। সামনে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ চোখ খুললেই নজরে পড়ে যাবে সরমার। সুকুমারের একবার মনে হোল দাঁড়িয়েই থাকুক, চোখ খুললে এই যে দেখে ফেলা—এর মধ্যে দিয়েই আজ

সব কথা হয়ে যাক, এই রকম এই অর্থহীনভাবে কতদিন আর থাকবে দুজনে ?

তারপর আবার কি ভেবে চেয়ারের পেছনের দিকটাতে গিয়ে দাঁড়াল, একটা পর্দা থাকা দরকার।

সন্তর্পণে পা ফেলে একটু পাশ ঘেঁষে পেছনে দাঁড়াতেই মনে হোল যেন সরমার চোখে শুকনো অশ্রুধারার দাগ। একটু ঝুঁকে দেখলে, সত্যই তাই।

একটা রূঢ় ধাক্কা লাগল সুকুমারের বুকে। যে-অবসর, বাড়ির যে নিস্তব্ধতা এখনই তার কাছে এত মিষ্ট হয়ে উঠেছিল, একজনের জীবনের রিক্ততায় তাই যে কি অকরুণ হয়ে উঠেছে তাই দেখে তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল।...অনেক পরিবর্ত্তন এনে ফেলেছে কাজে; আগে এই সময়টা নিয়মিতভাবে হাসপাতাল থেকে আসত সুকুমার, ওদিকে সরমা আসত আশ্রম-স্কুল থেকে। চা হোতো, খানিকটা গল্প হোত। আজকালও আসে, কিন্তু রোজ পারে না আর, আসাটা নিয়ম নয়, সপ্তাহে দুএকবার আসতে পারলে তো পারলে, নয়তো ঝড়ু গিয়ে চা দিয়ে আসে।...আজ শুকনো দুটি বিন্দু অশ্রুর নীরব অনুযোগে সুকুমার হঠাৎ বুঝতে পারলে—কত বড় একটা নিষ্ঠুরতা সে করে গেছে ধীরে ধীরে।

তার নিজের অশ্রু উঠতে লাগল ঠেলে, মনে হোল এগিয়ে গিয়ে মুছিয়ে দেয় চোখ দুটি; তারপর নিশ্চয় অশ্রুই নামবে, হয়তো সুকুমারের চোখেও; কিন্তু নামুক, তাইতেই এই যে কাজ, তার উন্মাদনা, তার সাফল্য সব যাক ভেসে, দুজনে একটা অস্পষ্ট সম্বন্ধ নিয়ে দাঁড়াক জীবনে।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু মনের এই আবেগটাকে সংযতই করে নিলে সুকুমার। এটা ঠিক হয় না, একটা গণ্ডী যে টেনে রেখেছে সেটা থাক; কি করবে? এত সমস্যা যার জীবনে, দুবিন্দু অশ্রু তার পক্ষে এমন আর বেশি কি ?

আজ চায়ের জন্যও আসে নি, একটা কি নিতে এসেছিল। কি যে নিতে এসেছিল ভুলে আবার বাগানের খানিকটা গেছে, বুকটা আবার টনটন করে উঠল। সরমার সুমস্ত মুখটা মনে পড়ল...তাকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না।

আবার ফিরে দাঁড়াল, একটু ভাবলে, তারপর একটা হাঁক দিলে—"দুলা !"

জানেই দুলা বাড়িতে নেই, শুধু সাড়া দিয়ে বাড়িতে ঢোকা, যাতে সরমা জেগে উঠে একটু সম্বৃত করে নিতে পারে নিজেকে। রুম্মা বেড়ার ওদিকের আউট-হাউস থেকে বেরিয়ে এল, বললে—"ওদের দুজনের কেউ আসে নি এখনো, কি খেলা-ধুলা আছে স্কুলে।'

"সরমা এসেছে ?"

"বোধহয় নয়, কই ডাকেন নি তো আমায়।"

"ঝড়ু আছে কি রকম ?"

"অনেকটা ভালো। আপনার চায়ের ব্যবস্থা করে দোব।"

"থাক্, সরমা আসুক আগে, হয়তো তারও দেরি হবে।"

সরমাকে আরও একটু সময় দেবার জন্যেই এই এককাঁড়ি মিথ্যা। সে বেশ ভাল করেই নিজেকে গোছগাছ করে নিয়ে বার-বারান্দার দরজায় এসে দাঁড়াল, বললে—"না, আমি এসে গেছি অনেকক্ষণ। ঝড়ু কি রকম আছে ভেবে ওকে ডাকিনি। ভাল থাকেতো আয় রুম্মা, চাটা করে দে না হয়।...ওকি তুমি দাঁড়িয়েই রইলে যে, উঠে এসো।"

সুকুমার বললে—"বাগানেই বসলে কেমন হয় ?—নদীর ধারটায় গিয়ে।...তাই করা যাক, দাঁড়াও।"

হাসপাতালের দিকে একটা লোক যাচ্ছিল—তাকে মালীটাকে ডেকে দিতে বললে। সে এলে তাকে দিয়ে নদীর ধারে কয়েকটা উইকারের চেয়ার আর একটা টেবিল রাখিয়ে দিলে। যাবার সময় বলে দিলে ছোট ডাক্তার-বাবুকে বলতে তার কাজগুলো যেন একটু দেখে নেয়, সুকুমার এখন আর ফিরবে না।

সরমাকে বললে—"চলো বসা যাক গিয়ে, রুম্মা চা নিয়ে আসবে'খন।"

সরমা প্রশ্ন করলে—"আজ আর যাবে না বললে যে ?"

"একটু দেওয়া যাক না ফাঁকি আজ।"

সোজা না গিয়ে ঘুরে ফিরে চলল দুজনে। বাগানটাও আর দেখবার ফুরসত হয় না ওর; এমন কি সরমার অবহেলার চিহ্নও একটু আধটু ফুটে উঠেছে জায়গায় জায়গায়, যা প্রথম চোখে পড়ল আজ। কিন্তু আজকে বলেই আর অনুযোগ করলে না, একটি যে দীর্ঘশ্বাস পড়ল

সরমার সেটাও যেন শুনেও শুনলে না। একটু পরে প্রশ্ন করলে—"ফাঁকির কথায় চটলে না তো?...চুপ করে রইলে তাই জিগ্যেস করছি।"

"চটবো!—আমি যেন বুদ্ধার স্টেটের জেনারেল ম্যানেজার!"—কথাটা বলে সরমা একটু হেসে উঠলো, তারপর আবার গম্ভীর হ'য়ে বললে—"তবে এও তো ঠিক, তোমার ওদিকে ফাঁকি দিলে মোটেই চলে না।"

"কোনওদিকে ফাঁকি দিলেই চলে না।"

সরমা চকিত দৃষ্টি তুলে স্বকুমারের মুখের ওপর ফেললে, প্রশ্ন করলে—"কই, আর কোন্ দিকে দিচ্ছ?"

কথাটা উল্টে নিলে স্বকুমার, একটু হেসে বললে—"একটু ফাঁকি পড়ছে এই বাগানটা, এতে অবশ্য আমার থেকে তোমার অপরাধটাই বেশি।"

সরমা দাঁড়িয়ে একটা করবীর ঝাড় থেকে শুকন ফুলগুলা বেছে ফেলতে ফেলতে বললে—"তা অস্বীকার করতে পারি না। আসল কথা ঝড়ুটা ক'দিন থেকে একরকম পড়েই রয়েছে।"

স্বকুমার হেসে বললে—"তোমার চেয়ে আমি কর্মী ভালো, ফাঁকি দিয়ে তার ওপর ছুতো করতে জানি না।"

হেসেই জবাব দিলে সরমা—"বড় দোষটাই যখন করলাম, ছোটটাতেই কি এসে যায়?"

রম্মা চায়ের ব্যবস্থা করে নিয়ে এসেছে, বললে—"ছেঁকে দোব দিদিমণি?"

সরমা বললে—"আমিই এসে ছেঁকে নিচ্ছি, তুই ঝড়ুর কাছে গিয়ে বস্‌গে একটু, তার শরীরটা খারাপ।"

রম্মা নিচের ঠোটটা চিবিয়ে নিয়ে একটু নিচু স্বরে বললে—"হ্যাঁ, গেলুম বসতে, আমার নিজের শরীর নেই! দুপুর থেকে ঠায় বসে আছি।"

এটাও ওরা দুজনে শুনলেই, তারপর আরও একটু গলা তুলে বললে—"তাহলে এসো, বাড়িতে সব পাট পড়ে রয়েছে, এখন ওর দিকে গেলে চলবে না আমার।"

সরমা স্বকুমারের দিকে চেয়ে বললে—"চলো বসিগে।"

"ওদিকটা ঘুরে আসবে না একবার?"

"জলে চা ছেড়ে দিয়েছে, ক'সে নষ্ট হয়ে যাবে।"

চমৎকার লাগছিল দুজনে মিলে অলস ভ্রমণটুকু। সরমার মনের ভারও এই স্বরেই বাঁধা আজ, অযথা কথা কাটাকাটি থেকে যায় বোঝা; স্বকুমার একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে—"চা নষ্ট হলেই যত ক্ষতি? বেশ, চলো।"

সরমা আর কিছু উত্তর দিলে না, দুজনে এসে দুটি চেয়ারে বসলো।

(ক্রমশঃ)

বাঙলা দ্রুত-শ্রুতিলিপি

শ্রীজনরঞ্জন রায়

শব্দকে চৈতন্যময় বস্তু ও গতিশীল বলা হয়।

মনে হয় বৈদিক যুগে শব্দ প্রাধান্য ছিল এবং তন্ত্রের যুগে বর্ণপ্রাধান্য দেখা দেয়। যদি বলি—বৈদিক যুগের নামব্রহ্ম ও তন্ত্রযুগের বীজমন্ত্র, শব্দ ও বর্ণের সামঞ্জস্য করিয়াছে, তবে তাহা ভুল হইবে মনে হয় না।

এই কথাটা মনে রাখিয়া সংস্কৃত বা তাহার শাখা বাঙলা শব্দের দ্রুত-শ্রুতি-লেখার পদ্ধতি নির্ণয় করিতে হইবে।

ইংরাজী ও বাঙলা কথার উচ্চারণ-নীতি পৃথক। সুতরাং পিটম্যান্ সাহেবের অনুকরণে (Pitman's Shorthand) বাঙলা শব্দের দ্রুত-শ্রুতি লেখার পদ্ধতি সঙ্কলন করিতে যাওয়া অবৈজ্ঞানিক হইবে। অথচ ইংরাজী সর্টহ্যাণ্ড বিশারদ দুই ব্যক্তি পিটম্যান পদ্ধতিতে 'বাঙলা সর্টহ্যাণ্ড' লেখার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন (১)। সে পদ্ধতি অচল হইতে পারে বহু কারণে, ক্রমে তাহা বলিতেছি।

কোন্ প্রণালী ঠিক কাজের হইবে, তাহা লইয়া নিশ্চয় অনেকে আলোচনা করিতেছেন। তবে কেহই কিছু জানাইতেছেন না। বোধ হয় অন্যে তাঁহার আবিষ্কার হাত করিয়া ফেলিবেন—এই ভয়ে। আমি কিন্তু একজনের কথা জানি (২), যাঁহার সঙ্গে এই বিষয় নিয়া ভালোভাবে

(১) নৈহাটী কমার্শিয়াল ইনিষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীশান্তিকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙলা সর্টহ্যাণ্ড বা সাঙ্কেতিক শ্রুতি লিখন'—১৬২ পৃষ্ঠা— দাম ৫.

(২) নবদ্বীপের শ্রীমান কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী বি,এল, কাব্যরত্ন, উকিল।

আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহার পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য মনে করি। সুধীজনের বিচারের জন্য এই পদ্ধতির কল্পনা হইতে বিকাশ-পথের কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত মনে করিতেছি।

বাঙলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা নয়। এজন্য বৈদিক স্বরের চিহ্ন ও উচ্চারণ (৩) বাঙলা ভাষায় নাই।

আমাদের ভাষা ব্যাকরণসম্মত। সুতরাং ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করিতে হইবে আমাদের ভাষা লিখিবার সময়।

---

(৩) বৈদিক স্বরের চিহ্ন ও উচ্চারণ।—বৈদিক যুগেও স্বরের চিহ্ন ছিল। স্বর চারি রকমের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ ও প্লুত। ক, খ, গ, ঘ দ্বারা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

উদাত্ত স্বরে—চিহ্ন ছিল না, ক উদাত্ত। অনুদাত্ত খ—তাহার নীচে শায়িত লম্বারেখা। স্বরিৎ গ—উপরে লম্বমান রেখা। প্লুত ঘ৩—প্লুত স্বর বুঝাইতে ৩ সংখ্যা দেওয়া হইত।

ক্রন্দনে ও গানে দীর্ঘ বা প্লুত স্বর ব্যবহৃত হইত।

দৃষ্টান্ত—'নি' হ্রস্ব, 'নী' দীর্ঘ এবং 'নি ই-৩' প্লুত।

স্বরচিহ্ন সম্বন্ধে মতভেদও আছে। কেহ কেহ উদাত্ত বুঝাইতে বর্ণের উপরে লম্বমান রেখা দিতেন। অনুদাত্ত হইলে বর্ণের নীচে শায়িত লম্বমান রেখা দিতেন। স্বরিৎ বুঝাইতে কোনো রেখাই দিতেন না। আবার অনেকে স্বরিৎ বুঝাইতে বর্ণের নীচে একটি বাঁকা রেখা দিতেন।

স্বর উচ্চারণের সঙ্গে হাত ছোড়া, হাত নামানো প্রভৃতিও ছিল। উঁচু-নীচু স্বর প্রকাশের সময় হস্ত সঞ্চালন করিতে কালোয়াতদেরও দেখা যায়, বক্তাদেরও দেখা যায়। মাথা নীচু করিয়া অনুদাত্ত, উঁচু করিয়া স্বরিৎ, ঘাড় খাড়া রাখিয়া উদাত্ত স্বর বাহির করা হইত ঋক, কৃষ্ণ-যজু ও অথর্ব্ব বেদ পাঠের সময়। কিন্তু শুক্ল-যজু পাঠের সময় সামনে হাত বাড়াইয়া দিতে হইত। তাহার অগ্রভাগ নামাইলে অনুদাত্ত, উঠাইলে উদাত্ত, ডাহিনে বাঁয়ে তির্য্যক সঞ্চালনে স্বরিৎ প্রকাশের নিয়ম ছিল। সাম বেদে বর্ণের উপরে ১ দিলে উদাত্ত, ২ দিলে অনুদাত্ত, ৩ দিলে স্বরিৎ স্বর প্রকাশের ইঙ্গিত হইত।

বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণে' কোথাও কোথাও অন্য রকম ব্যবস্থা অনুসরণ করা হইত। কৃষ্ণ-যজুর ব্রাহ্মণে বেদের মতো উচ্চারণ ও চিহ্ন পদ্ধতিই ছিল। শুক্ল-যজুর ব্রাহ্মণে বর্ণের নীচে উদাত্ত স্বর প্রকাশের চিহ্ন ঠিক অনুদাত্তের মতো শায়িত রেখা।

স্বর বাহির হয় উচ্চারণের দ্বারা। উচ্চারণের তারতম্যে বর্ণ বিভাগ হইয়াছে সকল ভাষায়। কিন্তু বর্ণের সেই উচ্চারণেও অনেক তফাৎ ছিল। স্বরবর্ণের ভিতরে ড থাকিলে তাহা উচ্চারিত হইত ড় এবং ঢ হইত ঢ়। অনুস্বারের হ্রস্ব দীর্ঘ দুই রকম উচ্চারণ হইত। অনুস্বারের পর ব (উর) সংযোগে উচ্চারিত হইত হ্রস্ব অনুস্বার এবং খুং শব্দের দ্বারা দীর্ঘ অনুস্বার উচ্চারিত হইত। হ্রস্ব অনুস্বার ং রূপে লেখা হইত, দীর্ঘ অনুস্বার ঁ রূপে লেখা হইত। তবে অনেকে বর্ণের উপর শুধু চন্দ্রবিন্দু দিয়া অনুস্বার লিখিতেন। য'এর উচ্চারণ ইয় না করিয়া জ'এর মতো এবং ষ'এর উচ্চারণ খ'এর মতো করার পদ্ধতি এখনো আছে।

সামগানে স্বরজ্ঞান দরকার হইত। গান সংহিতায় বলা হইয়াছে উর, কণ্ঠ, শির—এই তিন স্থান হইতে শব্দ উঠে। সাতটি স্বরই এই তিন স্থানে বিচরণ করে। এই সপ্ত স্বরই ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবৎ ও নিষাদ।

(৪) আমাদের ব্যাকরণে শব্দ সংকোচন বলিতে কি বুঝায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে একটু মনে করিয়া দিলেই তাহা স্মরণ করিতে পারিবেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের "সহর্ণেব" প্রথম সূত্র। এখানে 'ণ' বলিলে শুধু স্বরবর্ণকে বুঝিবার সংকেত আছে। 'ধ' দীর্ঘ শুধু র্ব শব্দের দ্বারা বুঝিবার সংকেত আছে। "অন্ত্যা যা দৃষ্টি" এই সংজ্ঞা দ্বারা উপধা বর্ণ 'টি'-কেই বুঝায়...ইত্যাদি।

ভারতীয় বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের আকৃতি আসিয়াছে বাক্ ইন্দ্রিয়ের (vocal organএর) বিভিন্ন অংশের আঘাত-প্রতিঘাত ও ভঙ্গিমার সমাবেশে। অন্য কোনো দেশের বর্ণমালা এরূপ নয় মনে হয়। ভারতীয় বর্ণমালা যেমন বিজ্ঞানসম্মত, ভারতীয় ব্যাকরণও সেইরূপ বিজ্ঞানসম্মত। ইংরাজ অধ্যাপকগণ ভারতে শিক্ষকতা করিতে আসিয়া নিজেদের ভাষার ব্যাকরণ-পদ্ধতির দৈন্য ঘুচাইতে সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতিতে ইংরেজি ব্যাকরণ (grammer) রচনা করেন।

আমাদের ব্যাকরণ আলোচনাকালে, তাহাতেও ভাষা সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াস আমাদের চোখে পড়ে (৪)। তবে তাহা শব্দ-সঙ্কোচ দ্বারা, রেখার দ্বারা নয়। রেখার দ্বারা শব্দ সঙ্কোচ পদ্ধতি (shorthand writing), কর্ম্মবহুল দুরন্ত-গতিশীল নবযুগের অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় অন্যতম আবিষ্কার।

শব্দ উচ্চারণ পদ্ধতি (phœnetic) লইয়া একটু আলোচনা করা যা'ক।

মুখগহ্বরে জিবের সাহায্যে বর্ণ উচ্চারণের স্থানগুলিকে এইরূপে ব্যাকরণ সম্মতভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। এখানে বেশ খানিকটা মুন্সিয়ানার প্রয়োজন। কারণ পাঁচটি বর্গে ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে ভাগ করিতে হইবে।

কণ্ঠে জিব ঠেকালে কণ্ঠ্যবর্গের উচ্চারণ হয়। কণ্ঠ্যবর্গের অক্ষর ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

তালুতে জিব ঠেকিলে তালব্যবর্গের উচ্চারণ হয়। তালব্যবর্গ বলিতে চ, ছ, জ, ঝ, শ'কে বুঝায়।

জিহ্বা সঞ্চালনে মূর্দ্ধ্যবর্গ উচ্চারণ হয়। মূর্দ্ধ্যবর্গ বলিতে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র'কে বুঝায়।

দাঁতে জিব ঠেকিলে দন্ত্যবর্গের উচ্চারণ হয়। দন্ত্যবর্গের অক্ষর ত, থ, দ, ধ, ল।

ঠোঁটে-ঠোঁটে ঠেকিলে ওষ্ঠ্যবর্গের উচ্চারণ হয়। ওষ্ঠ্যবর্গের অক্ষর প, ফ, ব, ভ, ম।

ঙ, ঞ, ং, ণ ফলা ও ম-ফলাকে আনুনাসিক বর্ণের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। এইগুলিকে বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইহাদের নিজস্ব কোনো উচ্চারণ নাই। অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইলে সেই বর্ণের উচ্চারণের ব্যতিক্রম করে মাত্র।

অতিরিক্ত বোধে স, ষ, ন, ঢ—এই চারিটি অক্ষরকেও বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণের চব্বিশটি অক্ষর মাত্র বজায় আছে।

স্বরবর্ণের মধ্যে আটটি অক্ষরকে লওয়া হইয়াছে। সেগুলি যথাক্রমে—অ, আ, ই, উ, এ, ঐ, ও, ঔ। অতিরিক্ত বোধে ঈ, ঊ, ঋ, ৯ অক্ষর চারিটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে (৫)।

এইবার প্রতীক-চিহ্নের আকৃতি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকাশিত 'বাঙলা সটহ্যাণ্ড' নামক পুস্তক পিট্‌ম্যান্ সাহেবকে হুবহু অনুকরণ করিয়া ক অক্ষরকে ইংরাজী K (Kay) বানাইয়া একটি সোজা রেখা (—) দ্বারা লিখিবার পদ্ধতি ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহাতে সব বাঙলা অক্ষরেরই পিটম্যানের অনুরূপ প্রতীক আছে। যুক্ত অক্ষর প্রভৃতির জন্য তাহাতে সাঙ্কেতিকার বহু পাঠমালা ও অনুশীলনী দিয়া জটিলতা ও দুরূহতার সৃষ্টি করা হইয়াছে মনে হয়। পিটম্যানে বর্ণদ্বিত্ব বা স্বরের দ্বিত্ব মোটেই নাই। অথচ বাঙলায় পাঁচটি স্বরের দ্বিত্ব আছে। ইহাও পিটম্যান অনুকরণকারীদের বিপক্ষে যায়।

নব আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মুখমণ্ডলের যে স্থান হইতে যে বর্ণের উচ্চারণ বাহির হইতেছে প্রায় তাহারই আকৃতি প্রতীকরূপে লওয়া হইয়াছে। যথা—

কণ্ঠ বর্ণের প্রতীক চিহ্ন এইরূপ ‿
তালব্য বর্ণের প্রতীক চিহ্ন এইরূপ ⁀
মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রতীক চিহ্ন এইরূপ ।
দন্ত্যবর্ণের প্রতীক চিহ্ন এইরূপ (
এবং ওষ্ঠ্যবর্ণের প্রতীক চিহ্ন এইরূপ)

এইভাবে ব্যঞ্জনবর্ণের পাঁচটি বর্গের প্রতীক চিহ্নের রূপ দেওয়া গেল। স্বরবর্ণগুলির প্রতীক চিহ্নও জানাইতেছি—

অ .
আ • (চওড়া ফোঁটা),
ই ।
উ । (চওড়া দাঁড়ি),
এ —
ঐ — (চওড়া মাত্রা)
ও
ঔ ʼ (চওড়া রেফ)

শ্রীমানের হাতের সব তাস আমি সাধারণকে দেখাইতে পারিতেছি না। কারণ কিছুটা সতর্কতার প্রয়োজন আছে। কি জন্য প্রয়োজন, তাহা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই বুঝিবেন।

নব আবিষ্কারের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। ইহাতে যুক্ত অক্ষরের (৬), বর্ণদ্বিত্বের (৭), সকল নামের এক ও বহুবচনের এবং ক্রিয়াপদের কালপ্রকাশের (tense) দ্রুত শ্রুতিলিপির প্রতীক চিহ্ন বিজ্ঞান সম্মত ও ব্যাকরণশুদ্ধ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। অথচ কোনো জটিলতা নাই।

সুতরাং এই নব আবিষ্কৃত পদ্ধায় ব্যাকরণ সম্মত বানান পাওয়া যাইবে, পিটম্যান অনুসরণে তাহা অসম্ভব ছিল।

সংস্কৃত ভাষাগোষ্ঠীর সর্টহ্যাণ্ড লেখার পক্ষে এই নবপন্থা বিশেষ উপযুক্ত হইবে মনে করি।

আমাদের ব্যবসায় বুদ্ধি নাই, জানিনা প্রায় দীর্ঘ চারি বৎসরের সাধনায় বাঙলা সর্টহ্যাণ্ড লেখার নিখুঁত যে পদ্ধতি শ্রীমান কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা বাঙলার সেবায় নিয়োজিত হইবে কি না। আবিষ্কারককে নিজের ঢাক নিজে পিটানোর দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া আমাদেরও উচিত, যদি বাঙলা ভাষার প্রসার আমাদের কাম্য হয়। সেই উদ্দেশ্যেই এই বিষয়টি লইয়া কিছু আলোচনা করা গেল।

---

(৫) সবটাই ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ সম্মত নহে। এখানে বর্ণ সাজানো হইয়াছে সর্ট হ্যাণ্ডের সৌকর্য্যার্থে তবে ব্যাকরণসম্মতভাবে।

(৬) য ফলা, র ফলা, বা ব ফলা যুক্ত অক্ষর; বর্ণদ্বিত্ব (অর্থাৎ যে কোনো দুইটি বর্ণের যৌথ উচ্চারণ যুক্ত) অক্ষর, অথবা একই বর্ণের দ্যোতক উচ্চারণকারী (emphatical pronunciation যুক্ত, যথা- অন্য, অম্ল, অদ্বয়) অক্ষর শুধু একটি চিহ্নে প্রকাশিত হইবে। কারণ ন' এরই দ্যোতক উচ্চারণ হইতেছে।

(৭) বর্ণদ্বিত্ব-একই বর্ণ পর পর থাকিলে বর্ণ দ্বিত্ব হয়। যেমন-গগন। বর্গদ্বিত্ব একই বর্গের দুইটি বর্ণ পর-পর থাকিলে বর্গদ্বিত্ব হয়। যেমন—কখন। এইগুলিরও বিজ্ঞানসম্মত সহজ সাঙ্কেতিক চিহ্ন এই নূতন পদ্ধতিতে আছে।
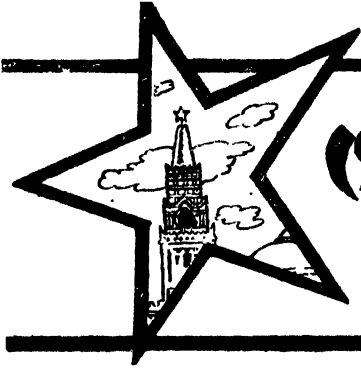
অগষ্ট মাসের গোড়ায় শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' চিত্র রূপের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি, দিল্লীর সোভিয়েট দূতাবাস থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এক চিঠি পেলুম। সে চিঠিতে ভারতস্থ সোভিয়েট দূতাবাসের মুখ্য সেক্রেটারী এবং সোভিয়েট কৃষ্টি প্রতিষ্ঠান VOKSএর প্রতিনিধি শ্রীযুত সান্দেস্কো সাদর-নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন— তাঁদের রাজ্য পরিক্রমণ করে ওদেশের সিনেমা শিল্প এবং কলা-সৃষ্টির প্রত্যক্ষ পরিচয় নেবার জন্য!

সোভিয়েট সিনেমা-শিল্পের অপূর্ব কৃষ্টি কলার কথা অনেক শুনেছি এবং পড়েছি। তাছাড়া মাঝে-মাঝে যে ক'খানি সোভিয়েট-ফিল্ম এদেশের ছবিঘরে দেখানো হয়েছে, তা থেকেও ওদেশের শিল্পীদের শিল্প-প্রতিভার আভাস পেয়েছি। কিন্তু, শুধু সিনেমা শিল্প কেন, আজকের দিনে সোভিয়েট দেশ ছোট বড় সকলের কাছেই রহস্যময় অপরূপ রাজ্য! খবরের কাগজে, কেতাবে, লোক-মুখে ভালো-মন্দ এত সব অদ্ভুত কাহিনী নিত্য ভেসে আসে এই সোভিয়েট রাজ্য আর তার বিধি-ব্যবস্থা, কার্য্য কলাপ এবং বাসিন্দাদের সম্বন্ধে, যে মন স্বভাবতঃ কৌতূহলী হয় তার স্বরূপ জানবার জন্য! কিন্তু জানবার [illegible]ই নাকি সহজ নয়! ইচ্ছা করলেই নাকি সেদেশে যাওয়া যায় না এবং গেলেও নাকি সেদেশের লোকজনদের আচার-ব্যবহার আর কীর্ত্তি কলাপের খাঁটি পরিচয় মেলবার আশা কম। অর্থাৎ শুধু বাইরের খোলার পরিচয়ই মেলে—ভিতরের সার-বস্তু থাকে জ্ঞানের অগোচরে!

কাজেই এ অপ্রত্যাশিত-আমন্ত্রণ পেয়ে 'না' বলতে পারলুম না। তাছাড়া শুনলুম, আমি একা নই…বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলকাতা থেকে নাট্য এবং চিত্র-জগতের আরো অনেকে এমনি সোভিয়েট-রাজ্য পরিক্রমার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। বিদেশী রাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার আমন্ত্রণে দেশ ছেড়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের বিদেশ যাত্রা—ভারতের ছায়া-ছবির ইতিহাসে এই প্রথম। এর আগে আর কোনো বিদেশী রাজ্য কখনো ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পীকে এ ধরণের সুযোগ বা সম্মান দেছেন বলে জানা নেই।

সোভিয়েট যাত্রী আমাদের এ দলে বোম্বাই থেকে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধা ফিল্ম-অভিনেত্রী শ্রীমতী দুর্গা খোটে, জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা শ্রীঅশোককুমার (গঙ্গোপাধ্যায়) এবং ভারত-গভর্ণমেন্টের ফিল্মস্ ডিভিশনের চিত্র-পরিবেশনা-শাখার অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীহরি আবাজী কোলহাৎকার। মাদ্রাজ থেকে চিত্র-পরিচালক শ্রীসুব্রাহ্মণম্, হাস্যরসাভিনেতা শ্রীকৃষ্ণণ এবং কৌতুকাভিনেত্রী শ্রীমতী মথুরম্; কলকাতা থেকে প্রবীণ নট-নাট্যকার শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নবীন চিত্র-পরিচালক শ্রীনিমাই ঘোষ এবং আমি। নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও সোভিয়েট-আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁর পক্ষে বিদেশ যাত্রা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দলে ন'জন হলেও একসঙ্গে আমরা বেরিয়েছিলুম সাতজন। অশোককুমার সে সময়ে ছিলেন লণ্ডনে। আমাদের সোভিয়েট রাজ্যে পৌঁছুবার ক'দিন পরে তিনি লণ্ডন থেকে সোজা মস্কোয় এসে পৌঁচেছিলেন। কিন্তু বেশী দিন সোভিয়েট দেশে তিনি থাকতে পারেন নি। লণ্ডনে তাঁর অসুস্থা পত্নীর পরিচর্য্যার জন্য তাঁকে প্রায় হপ্তা-খানেক পরেই মস্কো থেকে লণ্ডনে ফিরে আসতে হয়। কোলহাৎকারও সোভিয়েট রাজ্যে এসেছিলেন অনেক পরে। অশোককুমারের লণ্ডনে ফিরে যাবার ক'দিন পরে বোম্বাই থেকে বিমান-যোগে ইউরোপের পথে জেনিভা প্রাহা হয়ে এসে তিনি আমাদের সঙ্গে মস্কোয় মিলিত হন।

আমাদের সোভিয়েট যাত্রার কথা ছিল সেপ্টেম্বরের গোড়ায়। কিন্তু দিল্লীর সরকারী দপ্তর থেকে পাশপোর্ট পেতে বিলম্ব ঘটায় আমাদের যাত্রার দিন পেছিয়ে দিতে হয়েছিল। কলকাতার আমরা তিনজন যাত্রী পাশপোর্ট পেলুম সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখ নাগাদ। পাশপোর্ট পাবার খবর দিল্লীর সোভিয়েট দূতাবাসে টেলিগ্রাম করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুত সান্দেস্কো সেখান থেকে জানালেন, আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র দলের প্রতিনিধিরা পনেরোই সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিল্লীতে হাজির হচ্ছেন; কাজেই আমিও যেন পনেরো তারিখের মধ্যে ওখানে পৌঁছুই। প্রতিনিধিরা সবাই দিল্লীতে গিয়ে জড়ো হবার পর সকলে একত্রে বেরুবো। সোভিয়েট-যাত্রার দিন থেকে দেশে আবার ফিরে আসার দিন পর্য্যন্ত আমাদের সুখ-দুঃখ, আহার-বিহার এবং অর্থ-অনর্থের সব ভার গ্রহণ করবেন সোভিয়েট সরকার; তার আগে অর্থাৎ দিল্লীতে যাবার এবং থাকবার খরচ-খরচা এবং ব্যবস্থা—সে-সব আমাদের নিজেদের হয়ে করতে হবে।

সুতরাং দিন-রাত খেটে ষ্টুডিয়োতে ছবির কাজ শেষ করে ১৩ই

সেপ্টেম্বর রাত দশটায় গিয়ে হাজির হলুম দমদমার বিমান-বন্দরে ...'ডেকান্ এয়ারওয়েজ্‌স' Night Mail Serviceএর প্লেনে চড়ে দিল্লীর পথে পাড়ি দেবো বলে। এরোড্রোমে পৌঁছে দেখি, খদ্দরের ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী-মণ্ডিত হয়ে লাঠি হাতে মনোরঞ্জনবাবু ওরফে আমাদের বাংলা নাট্য জগতের 'মহর্ষি' বসে আছেন আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত—তীর্থযাত্রীর মত! তিনিও আমার মত শেষ মুহূর্তে দিল্লী চলেছেন এই রাতের উড়ো-জাহাজে চড়ে! আমাকে সহযাত্রী পেয়ে উল্লসিত উঠলেন 'মহর্ষি'!

কি কারণে জানি না...আমাদের প্লেন কিন্তু ছাড়লো নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পরে। বাড়ীর সকলে এবং বন্ধুবান্ধব অনেকেই এসেছিলেন এরোড্রোমে। প্লেনে ওঠবার সঙ্কেতে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে অপরিচিত অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মনোরঞ্জনবাবু এবং আমি গিয়ে উঠলুম আমাদের প্লেনের কেবিনে।

তিথিটা ঠিক মনে নেই...তবে চাঁদের ঝাপ্‌সা আলো ফুটে ছিল চারিদিকে! দেখতে দেখতে দূরে ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেল আত্মীয়-পরিজনদের চেহারা। রঙীণ আলোর অনন্ত চুম্‌কী বসানো এরোড্রোমের ঝাপসা-অন্ধকার বিরাট মাঠ পার হয়ে কুয়াশা ভরা স্তব্ধ শান্ত নৈশ-আকাশের বুকে শব্দের তরঙ্গ তুলে সবেগে উড়ে চললো আমাদের প্লেন—নাগপুরের উদ্দেশে। আমাদের নীচে...অনেক নীচে...দেওয়ালিরাতের আলোকসজ্জার মত আঁকা-বাঁকা বিচিত্র ছাঁদের সারি দিয়ে সাজানো শহর-কলকাতার জ্বলজ্বলে জ্বলন্ত বাতির আলোগুলোও ধীরে ধীরে ঘন কুয়াশার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রাতের আব্‌ছা-অন্ধকারে আকাশের উপর থেকে গঙ্গা-নদীকে দেখাচ্ছিল আঁকা-বাঁকা রূপালি একগাছা চকচকে ফিতের মত। চাঁদের ম্লান-আলোয় ভরা আব্‌ছা-অস্পষ্ট ঘোলাটে আকাশের বুকে আমরা ভেসে চললুম। খুব উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছিল আমাদের প্লেন...কাজেই বেশ কন্‌কনে শীতের আমেজ ছিল আগা-গোড়া। তবে প্লেনের ব্যবস্থাপকের দেওয়া কম্বলে অঙ্গ আবৃত করে—বেশ আরামেই আমরা ছিলুম।

দমদমার এরোড্রোম ছাড়বার কিছুক্ষণ পরেই প্লেনের বাতি সব নিভিয়ে দিতেই যাত্রীদের অনেকে গাঢ় নিদ্রার সাধনা সুরু করে দিলেন। ...ঘুম এলো না আমার চোখে...চলন্ত প্লেনের 'কক্‌পিটের' জান্‌লার বাইরে রাতের আকাশের পানে দৃষ্টি মেলে জেগে বসে রইলুম চুপচাপ। পাশের সীটে 'মহর্ষি' তাঁর ক্লান্ত-দেহ এলিয়ে দিলেন ঘুমের কোলে।

কুয়াশা আর চাঁদের আলোয় মেশানো ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট সীমাহীন অনন্ত আকাশ...প্লেনের চলন্ত এঞ্জিনের একঘেয়ে অবিরাম ছন্দ...তারই মধ্যে কখন কেটে গেল সময়।

রাত প্রায় দুটো নাগাদ আমাদের প্লেন এসে নামলো নাগপুরের সুবিস্তীর্ণ এরোড্রোমে। এইখানে, আমাদের প্রায় ঘণ্টা-খানেক স্থিতি—কেন না, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং দিল্লীর যত কিছু চিঠি পত্রের ডাক—সব আসে এই রাতের প্লেনে। ভারতের প্রধান এই চারটি শহর থেকে চারখানি বিভিন্ন প্লেন রোজ রাত্রে তাদের ডাকের চিঠি-পত্র বয়ে মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে এসে হাজির হলে ডাকঘরের কর্মীরা সে সব বাছাই করেন। তাঁদের বাছাই হবার পর ভোরের আলো ফোটবার আগেই কলকাতার প্লেন ডাক নিয়ে ফেরে আবার কলকাতায় এমনিভাবেই বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং দিল্লীর প্লেনও যে যার চিঠি-পত্র নিয়ে ফিরে যায় নিজের নিজের শহরে। ডাক গাড়ী এবং রাতের প্লেনে যে-সব যাত্রী আসা যাওয়া করেন—তাঁরাও এই ডাক-বাছাই হবার অবসরে নাগপুর এরোড্রোমের ছবির মত সাজানো সুন্দর ছোট বিশ্রামাগারের রেস্তোরাঁয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম এবং জলযোগাদি সেরে নেন। এ সবের ব্যয়ভার অবশ্য বহন করে বিমান কোম্পানি...যাত্রীদের টিকিটের মূল্যের সঙ্গে তারা এ খরচটুকু আদায় করে নেন। কাজেই আমাদের আর অপব্যয় করতে হলো না এবার কিছু। প্লেন থেকে নেমে সোজা গিয়ে বসলুম রেস্তোরাঁর চেয়ারে।

পরিপাটি ভোজনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে বিশ্রামাগারের বাগিচায় বিশ্রামে বসেছি এমন সময় এরোড্রোমের লাউডস্পীকারে ডাক এলো—আমরা সবাই এগিয়ে চললুম এরোড্রোমের বিশাল মাঠের মধ্যে রাখা চারখানি বিরাটকায় উড়ো-জাহাজের দিকে। কলকাতার যাত্রীরা উঠলেন কলকাতাগামী প্লেনে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই যাত্রীরা—মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের প্লেনে। আমরা এবারে কলকাতার প্লেন ছেড়ে উঠলুম গিয়ে দিল্লীগামী প্লেনের কন্দরে। মাল পত্র সব আমাদের আগেই প্লেনে উঠে গিয়েছিল বিমান কোম্পানির লোকজনদের ব্যবস্থায়।

আমাদের আগেই বোম্বাই আর মাদ্রাজের প্লেন দু'খানি উড়ে চলে গেল। রাত প্রায় পৌনে তিনটে নাগাদ ছাড়লো আমাদের প্লেন। ভোরের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে সবেগে উড়ে চললো সে দিল্লীর দিকে।

রাতের কুয়াশা কেটে ধীরে ধীরে আকাশের বুকে ফুটে উঠলো ঊষার প্রথম আলোক রেখা!...নিজের চোখে না দেখলে বর্ণনায় ঠিক বোঝানো যায় না। সে ছবির সৌন্দর্য্য পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে শহরের উঁচু ইমারৎ আর কল-কারখানার চিমনীর আড়ালে, অকূল সাগরের তীরে গিরি-কান্তারে, বন প্রান্তরে দেখেছি প্রভাতের প্রথম উদয়-ছটা! কিন্তু বনের বিহঙ্গ রাতের আবাস ছেড়ে ডানা মেলে আকাশের বুকে উঠে ভোরের আলোর আকাশের বিচিত্র রূপ দেখে—তারই অপরূপ আভাস পেলুম বহু ঊর্দ্ধে এই মহাশূন্যে মেঘলোকে এসে।

হেমন্ত কাল...কাজেই রাতের কুয়াশার বাষ্পে নীচে যে ধরিত্রী এতক্ষণ ছিল অস্পষ্ট, আবছা, অদৃশ্য—সকালের সোনালী-রোদের ঝলকে রঙীণ হয়ে উঠেছে তার নদী-গিরি প্রান্তর! সবুজ ফসলের ক্ষেত...রুক্ষ বালি কাঁকরের চর...খাল-বিল পুকুর...তারই মাঝে মাঝে আঁকা বাঁকা পথ...রেলের লাইন...ঘর-বাড়ী-কারখানা...সবই বেশ স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছিল উপরে উড়ো-জাহাজ থেকে...আকাশে ভেসে যেতে যেতে!

দীর্ঘ পথের শেষে পনেরোই সেপ্টেম্বর সকাল সাতটা দশ মিনিটে আমাদের প্লেন এসে নামলো দিল্লীর উইলিংডন বিমান-বন্দরে। এ বিমান-বন্দরটি যদিও ভারতের রাজধানীতে, তবু আয়তনে দমদমার চেয়ে অনেক ছোট।

এরোড্রোমের ঝামেলা মিটতে বিলম্ব ঘটলো কিঞ্চিৎ—কেন না 'ডেকান এয়ারওয়েজের' যাত্রী-বাহী বাস নাকি মোটে একখানি। পরের গাড়ির জন্য ওঁদের দিল্লী-শহরের অফিস থেকে নতুন যাত্রীদের নিয়ে সেখানা উইলিংডন এরোড্রোমে পৌঁছুলো অনেক দেরীতে—কাজেই আমাদের যাবার দেরী হলো প্রচুর। নতুন যাত্রীদের মোট-ঘাট নামিয়ে, আমাদের মাল-পত্র ওঠানো হবার পর বিমান-কোম্পানির মোটর-ভ্যানে চড়ে নামলুম এসে দিল্লী শহরের কেন্দ্রস্থল—ক্যানট-প্লেসে তাঁদের অফিসে।

সামনে ট্যাক্সির আড্ডা। সেখান থেকে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে, নিজেদের মাল-পত্র তুলে 'মহর্ষি' এবং আমি সোজা রওনা হলুম নিউ দিল্লীর কার্জ্জন রোডে সোভিয়েট দূতাবাসে—আমাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে বিদেশ-যাত্রার সঠিক খোঁজ খবর সংগ্রহ করতে।

নয়া-দিল্লীর নয়া-ছাঁচের নয়নাভিরাম নানা সড়ক মাড়িয়ে কার্জ্জন রোডের সুদৃশ্য প্রাসাদোপম সোভিয়েট দূতাবাসে গিয়ে যখন পৌঁছুলুম বেলা তখন প্রায় সাড়ে নটা। ওখানকার অনেকেই সবেমাত্র সকালে জমায়েৎ হতে শুরু করেছেন তাঁদের দৈনন্দিন কাজে। জিনিষপত্র ট্যাক্সিওয়ালার জিম্মায় রেখে দূতাবাসের দিকে এগুতেই দরজার সামনে মধুভাষিণী এক মহিলা মিষ্ট-হাসিতে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে আমাদের সাদরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন সাজানো প্রশস্ত একটি হল ঘরের সামনে। তারপর আমাদের পরিচয় নিয়ে ভিতরে গেলেম খবর জানাতে।

খানিক পরেই দিল্লীর সোভিয়েট দূতাবাসের অন্যতম বিশিষ্ট-কর্মী শ্রীযুত জিকভ এলেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। বহু-পরিচিতের মত নিতান্ত আন্তরিক ঘরোয়াভাবেই কথাবার্তা শুরু করলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের সোভিয়েট যাত্রার প্রয়োজনীয় সরকারী কাগজ-পত্র জোগাড় হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে আমরা দুজনেই যখন সগর্বে পাশপোর্ট এবং শারীরিক সুস্থতার মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বার করে দেখাচ্ছি, তখন সাদর-সম্ভাষণ জানিয়ে শ্রীযুত সান্দেস্কো এসে ঘরে ঢুকলেন। চমৎকার ব্যবহার···অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের দু'পক্ষের আলাপ বেশ জমে উঠলো।

কথায় কথায় শ্রীযুত সান্দেস্কো জানালেন যে সোভিয়েট গামী আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র দলের বাকী প্রতিনিধিদের সকলে এখনো এসে পৌঁছেননি। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁরা দিল্লীতে এসে হাজির হয়েছি—তাঁদের আপাততঃ ক'দিন থাকতে হবে এখানে যাঁর যথা নিজের ব্যবস্থামত স্থানে। বোম্বাই থেকে শ্রীমতী দুর্গা খোটে দিল্লীতে এসে দলের বাকী প্রতিনিধিদের জন্য অপেক্ষা করছেন সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখ থেকে। শ্রীযুত অশোককুমার আপাততঃ তাঁর নির্ম্মীয়মান ছবির কাজে লণ্ডনে রয়েছেন—তিনি সেখান থেকে সোজা মস্কোয় গিয়ে আমাদের দলে যোগ দেবেন। কলকাতা থেকে শ্রীনিমাই ঘোষ আগের দিন ট্রেণে এসে পৌঁচেছেন দিল্লীতে। বাকী শুধু মাদ্রাজের তিন প্রতিনিধি···তাঁরা এসে হাজির হবেন সম্ভবতঃ আজ কালের মধ্যেই।

যাবার ব্যবস্থা—দিল্লী থেকে এরোপ্লেনে চড়ে লাহোর···সেখান থেকে ট্রেণে চড়ে পেশোয়ার···তারপর পেশোয়ার থেকে মোটরে কাবুল। কাবুল থেকে সোভিয়েট-প্লেনে উঠে সোভিয়েট-রাজ্যের উজ্‌বেকীস্তানের প্রধান শহর তাশ্‌কান্দ—সেখান থেকে এরোপ্লেনে চড়ে সোজা মস্কো।··· খুব লম্বা পাড়ি!

বৈদেশিক-রীতির কানুন-মাফিক, যে সব বিদেশী-রাজ্যের পথ মাড়িয়ে আমাদের যেতে হবে—সে সব দেশের দিল্লীস্থ দূতাবাস থেকে প্রত্যেকের পাশপোর্টে Transit-Visa বা পথ-চলার ছাড়পত্র মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন যাবার আগে। মস্কোয় যাবার জন্য আমাদের গন্তব্য-পথ পাকিস্তান, আফগানিস্থান এবং সোভিয়েট-রাজ্যের মধ্য দিয়ে। কাজেই আমাদের পাশপোর্টে এ তিনটি রাজ্যের মঞ্জুরনামা বা Visa সংগ্রহ করা বিশেষ দরকার। সোভিয়েট-রাজ্যের মঞ্জুরনামা জোগাড় করায় হাঙ্গামা নেই, কেন না দিল্লীর সোভিয়েট দূতাবাসই সে ব্যবস্থা করবেন···শুধু চাই পাকিস্তান আর আফগানিস্থানের দূতাবাসের মঞ্জুরনামা।

অতএব সোভিয়েট দূতাবাসের বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে বাইরে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে চড়ে সোজা বেরিয়ে পড়লুম। উদ্দেশ্য, দিল্লী শহরে আমাদের ক'দিন মাথা থাকবার মত স্বচ্ছন্দ একটি আশ্রয় চাই—সেখানে দু'দণ্ড বিশ্রাম নিয়ে পাকিস্তান আর আফগানিস্থান দূতাবাসের দপ্তরে ঘুরে আমাদের গন্তব্য পথের Visa যোগাড় করা।

কিন্তু সেদিন শনিবার···পাকিস্তান এবং আফগানি-দূতাবাসের দপ্তর চটপট বন্ধ হয়ে যাবে বেলা একটার মধ্যে। পরের দিনও বন্ধ—রবিবার। কাজেই আশ্রয়ের এবং বিশ্রামের ভাবনা মুলতুবী রেখে আগে আমাদের ছাড়-পত্রে পথের মঞ্জুরীনামাগুলো মঞ্জুর করিয়ে নেওয়াই আসল কাজ বলে মনে হলো।

মনোরঞ্জনবাবু পড়লেন দুশ্চিন্তায়। কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় তাঁর ধারণা ছিল, দিল্লীতে পৌঁছুবার পর থেকেই তিনি হবেন সোভিয়েট-অতিথি···অর্থাৎ সেখানে থাকবার যা কিছু ব্যবস্থা, সবই হবে সোভিয়েট সরকারের ব্যয়ে ও বন্দোবস্তে। কিন্তু বাঙলা দেশ ছাড়বার আগেই শ্রীযুত সান্দেস্কোর টেলিগ্রাম পেয়ে দিল্লীতে অবস্থানের আসল ব্যবস্থা আমার জানা ছিল বলেই মনোরঞ্জনবাবুর ধারণা যে ভুল—সেটুকু তাঁকে জানিয়েছিলুম পথে প্লেনে আসবার সময়। সে কথাটা ঠিক তখন মনে উপলব্ধি ধরেনি তাঁর। কাজেই সোভিয়েট দূতাবাসে এসে যখন শুনলেন, দিল্লীতে থাকবার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের করতে হবে—তখন একেবারে মুষড়ে পড়লেন—কেন না বিশাল রাজধানী দিল্লী তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নির্বান্ধব···এখানে জানা-শোনা তাঁর কেউ নেই। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে 'সহ'-যাত্রী আমাকেই করলেন তিনি একান্তভাবে অবলম্বন···অন্ধের যষ্টির মত।

আমি ঠিক করেছিলুম দিল্লীতে আমি কদিন কাটাবো আমার অনুজা শ্রীমতী সুজাতার তোগ্‌লক রোডের ভবনে। কিন্তু সুজাতা তখন স্বামী-পুত্র কন্যার সঙ্গে তিনমাসের জন্য ভারতের বাইরে বেরিয়েছেন—ইংলণ্ড আর ওয়েল্‌সে। সুতরাং বাড়ীতে তাঁদের লোকজনও নেই—এক পাহারাদার ছাড়া। বাকী অনুচরের দল দেশে গিয়ে আরামে ছুটি উপভোগ করছেন

মালিকের অনুপস্থিতিতে ! এ রকম অবস্থায় ঘরের লোক আমার একার পক্ষে সেখানে ক'টা দিন কাটিয়ে দেওয়া চলতো, কিন্তু 'মহর্ষির' মত বিশিষ্ট অতিথিকে সেই ফাঁকা-বাড়ীতে টেনে নিয়ে যাওয়ার মানে-তাঁকে অসুবিধায় ফেলা। তাই ঠিক করলুম, কোনো ভালো হোটেলে গিয়ে উঠবো দুজনে।

সাহেবী-ফ্যাসানেবল্ ইম্পিরিয়াল হোটেলে ওঠায় 'মহর্ষির' ঘোরতর আপত্তি। প্রথমতঃ ব্যয়-বহুল স্থান···দ্বিতীয়তঃ বিদেশী আদব-কায়দা তেমন রপ্ত নয় তাঁর।

পথে সুপ্রশস্ত মন্ডি হাউসের কম্পাউণ্ডে পড়ে দিল্লীর আব্‌গারী-বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী। সোজা তাঁর কাছে গেলুম মনোরঞ্জনবাবুর থাকবার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। অতি অমায়িক ভদ্রলোক···অফিসে বেরুচ্ছিলেন···মধুর আপ্যায়নে বন্ধুর মতই আমাদের কৃতার্থ করলেন। তবে তাঁর কন্যার তখন খুব শক্ত অসুখ ···হাসপাতালে আছেন। সে জন্য শ্রীযুত সেনগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী খুবই ব্যস্ত···দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। কাজেই তাঁদের ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করা রীতিমত উপদ্রবের সামিল হবে, তাই সেনগুপ্ত মশায়ের আতিথ্যের আন্তরিক অনুরোধ নিতান্ত অভদ্রের মতই উপেক্ষা করতে হলো। তবু তিনি ছাড়বেন না। বিদেশে পাছে আমাদের কোনো অসুবিধা বা কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নিজেই এখানে ওখানে নানা জায়গায় টেলিফোন করে শেষে পুরোনো দিল্লীর 'আগ্রা হোটেলে' আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাছাড়া আমাদের পাশপোর্টে বিদেশ-যাত্রার Visa পেতে বিলম্ব বা অসুবিধা না ঘটে এজন্য তিনি নিজে পাকিস্তান এবং আফগান্ দূতাবাসে টেলিফোন করে অনুরোধ জানালেন। উপরন্তু তাঁর নিজের চাপরাশীকে দিলেন ট্যাক্সিতে আমাদের সঙ্গে—'গাইড' হয়ে বিভিন্ন দূতাবাসে নিয়ে যাবার জন্য। তাঁর এ-সহৃদয়তায় কথা ভোলবার নয়।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা আবার ট্যাক্সিতে চড়ে নয়া-দিল্লীর পথে বেরুলুম।

প্রথমে গেলুম পাকিস্তানের হাই-কমিশনারের অফিসে। অফিসের লোকজন তখনো সকলে আসেননি কাজেই ট্যাক্সিতে বসে অপেক্ষা করলুম। সেখানে দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে পাকিস্তান-যাত্রী ভারতীয়দের Visa এখানে দেওয়া হয় না···দেওয়া হয় এখান থেকে খানিক দূরে আরেকটি যে পাকিস্তানী সরকারী-দপ্তর আছে, সেখানে। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলুম সেই দপ্তরে। সেখানকার কর্মকর্তা অতি অমায়িক লোক···আমরা যেতেই গরম চায়ের কাপ এবং সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলেন···মধুর আলাপ আপ্যায়নে আপ্যায়িত করলেন। তাঁর ঊর্দ্ধতন বড়কর্ত্তার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন এবং জানালেন যে, আমরা পাকিস্তানের ছাড়-পত্রের বিষয়ে নির্দেশ যা পেয়েছি তা ভুল। অর্থাৎ, আমাদের বিদেশ-যাত্রার Visa এঁরা দেবেন না···সে ব্যবস্থা করবেন, প্রথমেই পাকিস্তান দূতাবাসের যে দপ্তরটিতে আমরা গিয়েছিলুম সেখানকার কর্মকর্তারা। সুতরাং ট্যাক্সি ঘুরিয়ে আবার সেই পাকিস্তান হাই-কমিশনারের অফিসে ফিরে গেলুম। পুনর্মূষিকো ভব !

সেখানে যেতেই দেখা হলো আমাদের সোভিয়েট-রাজ্যের সহযাত্রী নিমাই ঘোষের সঙ্গে। তিনিও এসেছেন এখানে তাঁর পাকিস্তানের পথের Visa সংগ্রহ করতে। দপ্তরের অফিসে পরিচয় হলো আমাদের ভূতপূর্ব অবিভক্ত বাঙলার জনাব আলতাফ্ হোসেন মশায়ের সঙ্গে। তাঁর সহায়তায় এবারে সঠিক ব্যবস্থা হলো সরকারী মঞ্জুরনামা সংগ্রহের। কিন্তু বিভ্রাট ঘটলো নিমাই ঘোষের। পাশপোর্টে বিদেশ যাত্রার Visa নিতে হলে প্রত্যেকের নিজের নাম ধাম, দৈহিক পরিচয় এবং 'কী', 'কেন', 'কোথায়', 'কি জন্য' চলেছি, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর লিখে তার সঙ্গে চারখানি করে পাশপোর্ট ফটোর কপি আর নামমাত্র একটা দক্ষিণা দিতে হয়। এ রীতিটা আমার আগে জানা ছিল বলেই কলকাতা থেকে পাশ পোর্ট ফটোর প্রায় ডজন দুয়েক কপি এনেছিলুম সঙ্গে—সুতরাং কোনো অসুবিধা ঘটেনি। এ নিয়মটি, মনোরঞ্জনবাবুর জানা ছিল না, কাজেই তিনি তাঁর পাশপোর্টের ছবির কোনো প্রতিলিপি সঙ্গে আনেন নি। তবে আমার মুখে ব্যাপার জেনে, ঐ দুপুরেই সকালে পাকিস্তান দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবার সময় ফুটপাথের উপরকার বিনা-ছাদার open air স্টুডিয়োতে এক 'মুস্কিল আসান্'কারী কাজের লোক ক্যামেরাওয়ালা ফটোগ্রাফারের কাছে টাকা আষ্টেক সেলামী দিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে তাঁর পাশপোর্টের ছবির খান বারো কপি করিয়ে নিয়েছিলেন মনোরঞ্জনবাবু। সেই আধো-ভিজে আধো শুকনো ফটোর চারখানা সঙ্গে দিয়ে, নাম ধাম-কুলজী লিখে Visa ফর্মখানি পূর্তি করে দিতেই হাঙ্গামার দায় থেকে 'মহর্ষি' রেহাই পেয়েছিলেন ! কিন্তু নিমাই ঘোষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ফটো ছিল না—কাজেই তাঁর ছাড় পত্র পেতে বিলম্ব ঘটলো ! ···অর্থাৎ সোমবার দিন আবার তাঁকে ফটোর কপি নিয়ে আসতে হবে এই পাকিস্তানের দূতাবাসে—মঞ্জুরী নামার জন্য। বাকী আমাদের দুজনের Visa মিলবে সন্ধ্যা···শনিবার বিকেলেই—বেলা চারটের মধ্যে। শুধু বিকেলে আরেকবার এঁদের দপ্তরে এসে সেটুটি সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া দরকার !

আমাদের সোভিয়েট-সহযাত্রিণী শ্রীমতী ডলি ঘোষকেও চকিতের মত একবার দেখলুম এখানে···তাঁর পাশপোর্টে আবার নতুন করে Visaর ছাপ লাগিয়ে নিতে এসেছেন। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াতেই তিনি এসে পাকিস্তানের মঞ্জুরীনামা জোগাড় করে রেখেছিলেন তাঁর পাশপোর্টে—তবে তার মেয়াদ ছিল মাত্র তিরিশ দিনের···অর্থাৎ পাকিস্তানের পথ মাড়িয়ে কাবুলে পৌঁছতে যেটুকু সময় লাগে। কাজেই দলের বাকী প্রতিনিধিদের পাশপোর্ট পেতে দেরী হওয়ার দরুণ তাঁর ক'দিনের মাত্র মেয়াদের সে মঞ্জুরীনামা বাতিল নামঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। অতএব নতুন করে আবার একবার সংগ্রহ করতে হলো তাঁর পাশপোর্টে পাকিস্তানের Visaর ছাপ। এখানে সহযাত্রিণী শ্রীমতী ঘোষের দেখা পেলুম বটে কিন্তু কোন কথা হলো না—দপ্তরের কাজ সই করা নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের Visa-পর্ব সেরে যখন বাইরে এলুম—তখন দেখি, তিনি তাঁর কাজ সেরে চলে গেছেন। ঠিকানা জানিনে তাঁর··· সুতরাং বিরাট শহর দিল্লী চুঁড়ে তল্লাস করে তাঁকে খুঁজে বার করা মুস্কিল। দেখা যথাসময়ে হবে—এই ভেবে তখনকার মত পাকিস্তান-দূতাবাস থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে চড়ে রওনা হলুম আফগানিস্থানের দূতাবাসের সন্ধানে।

(ক্রমশঃ)

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমস্ত শুনিয়া কালকূট কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, কি আশ্চর্য্য, ইনি যদি ব্রহ্মাকে সত্যই দেখিতে পান আনন্দিত হইবেন না, হতাশ হইবেন। কিন্তু আমি যদি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাই আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না, কারণ মেঘমালতীর যে রোষ-বহ্নি আমার জীবন দগ্ধ করিতেছে, পিতামহের প্রসাদ লাভ করিলে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে পারিব এ আশা আমার আছে। আমরা উভয়ে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই শবদেহের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি !'

"কি ভাবছেন আপনি"—চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল।

"ভাবছি আর কালবিলম্ব না করে শব-ব্যবচ্ছেদ শুরু করা উচিত"

"বেশ করুন"

"প্রথমে কোন জায়গাটা কাটব"

"পেটটাই কাটুন"

কালকূট পেটের মধ্যভাগটা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ছুরিকাটি বাহির করিয়া যেই অস্ত্রোপচার করিতে যাইবেন অমনই বিরাটকায় ক্ষিপ্রজঙ্ঘ উঠিয়া বসিল এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল "আপনারা কে !"

"আমার নাম কালকূট। এঁর নাম আমি জানি না"

"আমি চার্ব্বাক"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ একবার কালকূট এবং একবার চার্ব্বাকের মুখের দিকে চাহিয়া সশব্দে বিজৃম্ভন করিল।

"আপনারা আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করলেন কেন"

"আপনি কি ঘুমুচ্ছিলেন ? আমরা ভেবেছিলাম আপনি মৃত"

কালকূটই কথা বলিতেছিলেন, চার্ব্বাক নীরবে বসিয়াছিল।

"মৃত্যুরই অপর নাম যে মহানিদ্রা তা কি আপনাদের জানা নেই ? আমি মহানিদ্রা-ঘোরেই পরম আনন্দ উপভোগ করছিলাম, আপনারা কেন আমাকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন বলুন তো"

চার্ব্বাক এইবার কথা কহিল।

"আমাদের ধারণা জীবনই সর্ব্বপ্রকার আনন্দের উৎস। সেই আনন্দ-উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই তো আমি মৃত্যু বলে' মনে করি"

"জীবন আনন্দের উৎস সন্দেহ নেই, কিন্তু ঝঞ্ঝাটেরও উৎস। জীবন মুখরা ঈর্ষা-পরায়ণা স্ত্রীর মতো। স্বাধীন-চেতা আনন্দকামীরা তার কবল থেকে দূরে পলায়ন করতে সতত উৎসুক থাকেন, কিন্তু সব সময়ে পলায়ন করতে পারেন না। জীবনের করাল আলিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করে' মুক্ত হওয়া সহজ নয়। আমি অনেক কষ্টে তা ছিন্ন করেছিলাম, কিন্তু আপনাদের স্পর্শ-প্রভাবে যা ছিন্ন ছিল তা আবার যুক্ত হয়ে গেল, আমি পুনরায় সেই মুখরার বাহুপাশে নিক্ষিপ্ত হলাম। আপনারা এ কাজ করলেন কেন—"

কালকূট উত্তর দিলেন।

"আপনাকে বিব্রত করছি এ ধারণা আমাদের ছিল না। আমার অন্তত ছিল না। আমি আপনার অঙ্গচ্ছেদ করতে এসেছিলাম সৃষ্টিকর্ত্তার সন্ধানে। এঁরও উদ্দেশ্য তাই ছিল—"

"সৃষ্টিকর্ত্তার সন্ধানে ? তাঁকে বাইরে সন্ধান করছেন কেন, তিনি তো আপনাদের মধ্যেই আছেন। সূর্য্য যদি আলোর সন্ধানে নক্ষত্র-ব্যবচ্ছেদ করতে যান তাহলে তা যেমন হাস্যকর হবে, আপনাদের আচরণও ঠিক তেমনি হাস্যকর হচ্ছে"

চার্ব্বাক চুপ করিয়া ছিল। এইবার কথা বলিল।

"আমাদের আচরণ যে হাস্যকর তা আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে চাই। আপনি যা বললেন পুস্তকেও তা

লিপিবদ্ধ আছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তা আমরা যাচিয়ে নিতে চাই"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল চতুর্দ্দিক যেন বজ্র গর্জ্জনে সচকিত হইয়া উঠিল।

"দেখুন, কোন কিছু প্রত্যক্ষ করতে হলে চোখ থাকা দরকার। আমার মনে হচ্ছে আপনাদের তা নেই।"

"কি করে' এ অসম্ভব কথা মনে হল আপনার"

"আমার মতো একজন জলজ্যান্ত মানুষকে আপনারা মড়া ভেবেছিলেন, এইটে কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?"

"চক্ষুষ্মান মনুষ্যেরও ভ্রম হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম আমরা অহরহই করে' থাকি কিন্তু তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয় যে আমাদের চক্ষু নেই? বলতে পারেন আমাদের দর্শন সব সময় নির্ভুল নয়, বলতে পারেন আমাদের চক্ষুর বোধশক্তি সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমাদের চক্ষু নেই একথা বললে—"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিল।

"ধরুন, আমি যদি মড়াই হতাম, আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে' সৃষ্টিকর্ত্তার সম্বন্ধে কি তথ্য আপনারা আবিষ্কার করতেন, বলুন"

"কি করে' বলব! যা এখনও আবিষ্কার করি নি তাঁর স্বরূপই তো অজ্ঞাত আমাদের কাছে"

এমন সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের বিশাল দক্ষিণ চক্ষুর কালো অংশটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বাতায়নের মতো খুলিয়া গেল এবং সেই বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া একটি রূপসী নারী চার্ব্বাককে সম্বোধন করিলেন—

"আপনাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য আমি আপাত-মৃত ক্ষিপ্রজঙ্ঘকে পুনর্জীবিত করেছিলাম। কিন্তু আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শব-রূপের মধ্যেই আপনারা কোনও সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবেন আশা করে' এসেছিলেন। আমি আপনাদের হতাশ করব না। আমি নিজেকে সংহরণ করছি। আপনারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোন। আমি কিছুক্ষণ পরে আবার প্রকট হব ওর দেহে। আশা করি ততক্ষণে আপনারা আপনাদের অনুসন্ধান সমাপ্ত করতে পারবেন"

চার্ব্বাক আর বিস্মিত হইতেছিল না। তাহার বোধশক্তি যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। সে নির্ব্বাক হইয়া ক্ষিপ্রজঙ্ঘের অক্ষি-বাতায়ন-বর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

কালকূট প্রশ্ন করিলেন—

"ভদ্রে, আপনার এই পরমাশ্চর্য্য আবির্ভাবে আমি অতিশয় বিস্মিত হয়েছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিন"

"আমি ক্ষিপ্রজঙ্ঘের প্রাণ-লক্ষ্মী। আমি ওর দেহের অণু পরমাণুতে ওতঃপ্রোত হয়ে আছি অনাদিকাল থেকে, ওকে বিবর্দ্ধিত করছি, আনন্দিত করছি নানারূপে নানাভাবে।"

"কিন্তু ক্ষিপ্রজঙ্ঘের কথা শুনে মনে হল আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই উনি নাকি অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করছিলেন। আমাদের স্পর্শ প্রভাবে ওঁর মহানিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন"

"আপনাদের স্পর্শ দ্বারা আমি ওঁর মধ্যে প্রবেশ করেছি এ ধারণা আমিই ওঁর মধ্যে সম্ভব করেছি। আমাকে ত্যাগ করে' উনি মহানিদ্রাঘোরে আনন্দ উপভোগ করছিলেন এ ধারণাও আমারই সৃষ্টি। ওঁর প্রতিটি কার্য্য আমিই নিয়ন্ত্রিত করছি। আপনারা ওঁর দেহকে ছিন্ন করে' দেখুন, আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ হোক, আমি কিছুক্ষণের জন্য সরে' থাকছি"

"কিন্তু ওঁর ছিন্ন ভিন্ন দেহে আপনি আবার প্রবেশ করবেন কি উপায়ে—"

"আমি তো কোথাও যাব না, আমি সরে' থাকব, সংহরণ করব নিজেকে। আপনাদের মনে হবে ক্ষিপ্রজঙ্ঘ জীবন্ত নয়, মৃত, এতক্ষণ যেমন মনে হচ্ছিল—"

"ক্ষিপ্রজঙ্ঘ কি বরাবর জীবিতই ছিলেন?"

"ছিলেন এবং থাকবেন। আমি কখনও কোন কারণেই ওকে ত্যাগ করে' যাব না। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের অথবা আপনাদের যখন মনে হবে যে ওর দেহটা শবদেহ ছাড়া আর কিছু নয় তখনও আমি থাকব। ওর দেহের সঙ্গে আমি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমরা বারম্বার রূপান্তরিত হব, কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ কখনও ঘটবে না।"

"আমরা যদি ওঁর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করি বা ভস্মীভূত করি তাহলেও কি আপনাদের অস্তিত্ব নষ্ট হবে না?"

সৃষ্ট বস্তু কখনও নষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র। তবে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ আছে। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের দেহকে বেশী ছিন্ন ভিন্ন করবেন না। ওর দেহের বর্তমান রূপটি অবলম্বন করে' নূতন রকম আনন্দ উপভোগ করব ইচ্ছা আছে। এবার আমি সরে যাচ্ছি। আপনারা কার্য্য আরম্ভ করুন"

অক্ষি-বাতায়ন বন্ধ হইয়া গেল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘ শুইয়া রহিল।

চার্ব্বাক অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, 'অদ্ভুত'

কালকূট বলিলেন, "মহর্ষি চার্ব্বাক, এখন বিহ্বল হয়ে পড়লে চলবে না। আমরা যা করতে এসেছি তা করতেই হবে। এই শবদেহের মধ্যেই আমরা পরমাশ্চর্য্যময়ী প্রাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রত্যক্ষ করলাম। হয়তো ব্রহ্মাকেও প্রত্যক্ষ করব। কোন অঙ্গ থেকে আরম্ভ করি বলুন তো? আমার মনে হয় উদর ছিন্ন ভিন্ন করবার আগে হাতটা ব্যবচ্ছেদ করলে কেমন হয়?"

চার্ব্বাক মৃদু হাসিয়া বলিল, "বেশ, তাই করুন"

৭

চন্দ্রালোকে সপ্তশিরা পর্ব্বতের উপত্যকাটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে কলস্বরা তটিনীটি তরঙ্গ-ভঙ্গে চতুর্দ্দিক আনন্দিত করিয়া তুলিয়াছিল মনে হইতেছিল সে যেন তটিনী নয়, সে যেন কোনও উচ্ছ্বসিতা কিশোরী, অশ্রান্ত কলকল স্বরে অন্তরের আনন্দকে ছন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই তটিনী-তীরবর্ত্তী বিশাল বটবৃক্ষের গ্রন্থিল এক শাখায় বিচিত্রবর্ণ যে বিরাট বিহঙ্গমটি ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল তাহার প্রতিবিম্ব জ্যোৎস্নালোকে তটিনীর স্বচ্ছ তরঙ্গমালায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। মনে হইতেছিল সেই প্রতিবিম্বকে [illegible] করিয়াই বুঝি তরঙ্গিনী'র তরঙ্গলীলায় আকুলতা জাগিয়াছে। প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তরঙ্গাঘাতে প্রতি মুহূর্ত্তে রূপ-পরিবর্ত্তন করাতে তরঙ্গিনী যেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে যেন প্রতিবিম্বের একটি সম্পূর্ণরূপ দেখিতে চাহিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না, বুঝিতেছিল না যে তাহার নিজের অসংযত আগ্রহই প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিবিম্বকে বিকৃত করিয়া দিতেছে। উপত্যকার নৈশ নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া সেই বিচিত্রবর্ণ বিরাট বিহঙ্গম সহসা কথা কহিয়া উঠিল।

"অয়ি, নদী-রূপিণী বিনতা, তুমি বিচলিত হ'য়ো না। তোমার এই অধীরতাই বারম্বার তোমার কষ্টের কারণ হয়েছে। অধীরতা-বশেই তুমি তোমার দ্যুতিমান পুত্র অরুণকে বিকলাঙ্গ করেছ, তার অভিশাপই তোমার জীবনকে দুঃখময় করেছে। এখনও তুমি তোমার সপত্নী কদ্রুর সেবা করে' চলেছ। এখনও তোমার দাসীত্ব মোচন হয় নি—"

নদী আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কই কদ্রু, কোথা সে—"

"তোমার মাতা কদ্রুও রূপ পরিবর্ত্তন করেছে। তুমি নদী হয়েছ, কদ্রু হয়েছে তোমার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী তটভূমি। তার গর্ভ-বিবরে এখনও সর্পকুল সঞ্জাত হচ্ছে। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ তাদের সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করতে পারে নি। আর তুমি তোমার অজ্ঞাতসারেই তোমার সপত্নী ও সপত্নী-সন্ততির সেবা করে যাচ্ছ। এখনও তুমি অভিশাপ মুক্ত হও নি"

"বৎস গরুড়, কোথায় ছিলে তুমি এতদিন"

"আমি গরুড় নই। আমি তার মূর্ত্ত স্মৃতি মাত্র"

"কিন্তু আমি যে তোমার শ্বেত বদন, রক্ত পক্ষ, কাঞ্চন-সন্নিভ দেহ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নেবে এস বৎস, জননীকে ছলনা কোরো না"

"অধীর হ'য়ো না বিনতা। যে গরুড় গজকচ্ছপরূপী কলহপরায়ণ ধনলোভী ভ্রাতাদের আহার করেছিল, অমৃত অর্জ্জনের জন্য যে গরুড় দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও পরাঙ্মুখ হয় নি, সে গরুড় বহুকাল পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হয়েছে। একটি বিশেষ ব্রত উদযাপন করতে সে এসেছিল, ব্রত শেষ হয়েছে, সে চলে গেছে। যে শক্তি তাকে সৃষ্টি করেছিল সেই শক্তিতে সে লীন হয়ে গেছে। সে এখন বিষ্ণুর বাহন, তোমার কেউ নয়। তুমিও কি আর সেই বিনতা আছ? কশ্যপের পত্নী যে বিনতা উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ সম্বন্ধে সপত্নী কদ্রুর সমক্ষে সত্য ভাষণ করেছিল সে বিনতা কোথায়? সে-ও আর নেই। সৃষ্টির বিশেষ যুগে বিশেষ প্রয়োজনে একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করে' সে-ও রূপান্তরিত হয়েছে। একথা বিস্মৃত হ'য়ো না বিনতা যে আজ তুমি

নবরূপে নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, নদীরূপে যে মহাসাগরের দিকে তুমি প্রধাবিত হচ্ছ সেই মহাসাগরই এখন তোমার উপাস্য, সেই মহাসাগরই কশ্যপ। তোমার মধ্যে স্বামীর নবরূপই এখন তোমাকে নবসম্পদে শক্তি-শালিনী করবে। তুমি সেই সম্পদের জন্য প্রস্তুত কি না তাই নির্দ্ধারণ করবার জন্যে আমি গরুড়রূপে নিজেকে তোমায় প্রতিফলিত করেছি। দেখছি গরুড়ের সম্বন্ধে এখনও তুমি মোহাচ্ছন্ন। তুমি ভুলে গেছ যে কদ্রুর উপর কর্তৃত্ব লাভ করাই তোমার উদ্দেশ্য, সেইজন্যই তুমি পুত্র কামনা করেছিলে। কিন্তু দু'জন মহাবলশালী পুত্র লাভ করেও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি। তোমার অত্যধিক ব্যগ্রতা অরুণকে পঙ্গু করেছে, আর তোমার নিরর্থক তর্ক-প্রিয়তার ফলে তোমাকে যে দাসীত্ব বরণ করতে হয়েছিল গরুড়ের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়েছে তোমাকে সেই দাসীত্ব থেকে মুক্ত করতে এবং তা করতে গিয়ে গরুড় হয়ে গেছে বিষ্ণুর ভক্ত। আপাতদৃষ্টিতে তোমার দাসীত্ব মোচন হলেও প্রকৃতপক্ষে তুমি স্বাধীন হও নি। নবজন্মেও তুমি তটরূপিনী কদ্রুর সেবা করে' চলেছ, তার নাগ সন্ততিদের লালন পালনে সহায়তা করছ। আমি জানতে এসেছি সত্যই কি তুমি স্বাধীনতা চাও?"

"নিশ্চয় চাই। কিন্তু আমি গরুড়কেও চাই। সে মাকে ভুলেছে এ কথা বিশ্বাস হয় না"

"বিষ্ণুকে পেতে হলে মাকেও ভুলতে হয়"

"তবে তার এ অশোভন বিস্মৃতি ভাঙতে হবে"

"এইবার তুমি দক্ষ-কন্যার মতো কথা বলেছ। কিন্তু তার এ বিস্মৃতি ভাঙতে হলে কি করতে হবে জান?

"কি"

"তাকে বিষ্ণুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে"

"তাই আনব যদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু কি করে' এ অসম্ভব সম্ভব হবে তাও বলে দিন"

"নূতন শক্তি অর্জ্জন করতে হবে"

"কি করে"

"প্রথমেই প্রবলভাবে ইচ্ছা করতে হবে। তোমার ইচ্ছার প্রাবল্যই তোমাকে শক্তি দেবে এবং সেই শক্তির আকর্ষণে আরও শক্তি সঞ্চারিত হবে তোমার মধ্যে। অমিত ইচ্ছা-শক্তিতে তুমি যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন তোমার ইচ্ছাই তোমাকে রূপান্তরিত করবে। সেই রূপান্তরিত তুমি গরুড়কে বিষ্ণুর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবে তখন"

বিহঙ্গমের কথায় নদীরূপিণী বিনতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "তুমি যদি সত্যই গরুড় না হও, তাহলে কে তুমি, আত্মপরিচয় দাও। তোমার বাহ্য রূপের সঙ্গে গরুড়ের সাদৃশ্য এত বেশী যে এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি—"

তাহার বাক্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গরুড় মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। বিনতা সবিস্ময়ে দেখিল স্বয়ং মহর্ষি কশ্যপ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

"প্রভু, আপনি—"

"হ্যাঁ আমিই। সমুদ্রমন্থনের পরই সমুদ্রের মৃত্যু হয়েছিল। পিতামহের আদেশে আমি মৃতসমুদ্রে জীবন সঞ্চার করে' জীবন্ত সমুদ্ররূপে দিগ্বিদিকে প্রসারিত ছিলাম। সহসা কাল তিনি আমাকে স্বৈরচর করে' দিয়েছেন, আমি এখন যা' খুশী হতে পারি। সেই শক্তিবলেই আমি গরুড় হয়েছিলাম। পিতামহের কৃপায় তুমিও স্বৈরচর হ'তে পার। স্বৈরচর হলে' গরুড়ের নাগাল পাওয়া অসম্ভব হবে না। তোমার অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধা তাহলে হয়তো তৃপ্ত হবে!"

"কি করে' স্বৈরচর হওয়া যায়"

"তোমার একাগ্র ইচ্ছার সঙ্গে পিতামহের ইচ্ছা সম্মিলিত হলে"

"আমার তরঙ্গ ধারা যে আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে বিক্ষিপ্ত করছে"

"নিজেকে সংযত কর, সংহত কর। যে সমুদ্রের দিকে তুমি প্রবাহিত হচ্ছিলে আমি তা ত্যাগ করেছি, তুমি তোমার গতি-বেগ রুদ্ধ কর এইবার। আমি চললাম। কদ্রুর দাসীত্ব থেকে যদি সত্যিই মুক্তি চাও তপস্যা কর। যদি স্বৈরচর হতে পার তাহলেই প্রকৃত মুক্তি পাবে।"

এই বলিয়া কশ্যপ বিরাট কূর্ম্মে রূপান্তরিত হইলেন এবং সপ্তশিরা পর্ব্বতের একটি শিরা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ

ভেনিস

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভারতবর্ষের প্রত্যেক সহর ও প্রকৃতির লীলা-ভূমিতে দেব-দেউল দেখলে মনে হয় ধর্মানুষ্ঠান এবং শিল্প-সাধনা দেশের জীবন-ধারার একদিন ছিল প্রধান স্রোত। পশ্চিম-ভারতে বহুলোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেও ভারতীয় কৃষ্টির এ মূল উৎসকে প্রাধান্য দেবার উৎসাহ দেখিয়েছিল। কিন্তু দুটা কারণ তাদের করেছিল ভিন্ন-মুখ। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে হিন্দু শাসন-কর্তা থাকলেও সম্রাট ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এ ধর্ম এসেছিল বাহির হতে এবং সম্রাটদের পূর্ব-পুরুষও ছিলেন বিদেশী। কাজেই ভারতীয় হয়েও তাঁরা ছিলেন বাহির-চাওয়া। যাদের বাপ-মা উভয়েই এদেশের হিন্দু বংশের—ধর্ম-মত পরিবর্ত্তনের ফলে, তারা উপহাস্য ও পরিত্যজ্য হ'য়েছিল স্বজাতির কাছে—এ কারণ তারা গর্বিত হত রাজ-ধর্মের স্পর্শে। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে বিলাত-ফেরত এক শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধে ঐ রকম দোটানা সমস্যা উঠ্‌ত। পূর্ব-পুরুষের ধর্মানুরক্ত আত্মীয় স্বজন পাড়া পড়শীর প্রতি দ্বন্দের ভাব সহজেই অভিভূত করত মোশ্লেম দীক্ষিতকে। সংসারে তার সুবিধা হ'ত, তাই হিন্দুর বিদ্বেষের মূল্যে একটু ঈর্ষা থাকত। এর ফলে হিন্দু হিন্দুয়ানীর মাহাত্ম্য দেখাবার জন্য যথা-সম্ভব তুচ্ছ অনুষ্ঠান ও নিত্য-কর্মে আপনাকে হারিয়ে ফেললে। দেশে সাহিত্যানুরাগও বাড়ল, প্রাদেশিক ভাষায় হিন্দু প্রাচীন সংস্কৃতিকে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টাও করলে। মুসলমান আরবী ভাষায় লেখা তার ইমানের মূল কথা না বুঝে পীর-পয়গম্বরের পূজায় এবং হিন্দু ধর্মের বিরোধিতায় আত্ম-নিয়োগ করলে। চিত্তের পট-ভূমিতে রহিল সেই গর্বের কথা—সে রাজার সমধর্মী। আর সেই অপমানের অভিমান এবং ধর্মান্তর গ্রহণ, তাকে স্বজাতীর মূল-সঙ্ঘ হ'তে একেবারে বিদায় দিলে। জীবনের মূল-স্রোত দেশের উভয়-ধর্মীর মধ্যে সমভাবে রহিল। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে বড় মন্দির বা জাঁকালো ধর্ম ভবন গঠন দুঃসাধ্য হল উত্তর ভারতে। রাজ-শক্তি দেশের সৌন্দর্য্য তৃষাকে মেটাবার চেষ্টা করলে মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণে। সকল ভারতীয় মিলে রাজানুশাসনে দিল্লী,

রস-উপলব্ধির ক্ষেত্রে তুলনা মারাত্মক। তাতে স্মৃতি সৃষ্টি করে অযথা অভাব অভিযোগ। কলিকাতার শীতের দিনে হিমালয়ের তুষার ক্ষেত্রের কল্পিত অভাব শৈত্যকে উপভোগ্য করে না।

উপভোগের পর অন্য পরিবেশে মানুষের বুদ্ধি দৃশ্য ভাব বা অনুভূতিকে অবশ্য সহজেই তুলনা করতে চায়। ইতালী ঘোরবার সময় এক একবার দিনের শেষে এ কথা মনে হয়েছিল যে দেশটার সঙ্গে আমাদের পুণ্য-ভূমির কৃষ্টিগত সাদৃশ্য অস্বীকার করবার উপায় নাই। ভেনিস মন্দির এবং প্রাসাদে পূর্ণ। আকার এবং প্রকার ভিন্ন-মুখ হ'লেও বহুক্ষেত্রে ওদেশে ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যের

দীর্ঘশ্বাস সেতু

তুলনার সূত্র বিদ্যমান। উত্তর ভারতে বহু দেব-মন্দির চূর্ণ হয়েছে কালের এবং গৃহ-শত্রুর নিষ্ঠুরতায়। কিন্তু আজিও যে স্থাপত্য-সম্ভার বুকে করে রেখেছে ভারত, তা অতুলনীয় না হলেও এক প্রগাঢ় সৌন্দর্য্য ও বহির্মুখ ভাব-ধারার সঙ্কেত। এ বন্যা ভারত ছেড়ে বৃহত্তর ভারতে ছুটেছিল। লঙ্কা, মলয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি তার প্রমাণ রেখেছে অঙ্গে। দক্ষিণ-ভারতের ধর্ম্ম স্থাপত্য অপরূপ। নেপাল আর্য্য ও মঙ্গল আর্টকে সমন্বয় ক'রে বিচিত্র স্থাপত্যে নিজেকে সাজিয়েছে।

আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, আজমিঢ়, মুর্শিদাবাদ, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি সুদর্শন ভবনে সু-সজ্জিত করলে। বাহির হতে আমদানী করা নক্সায় নির্মিত মসজিদের চূড়ায় ভারতের ছত্র, ঘণ্টা ও পদ্মপত্র বিন্যস্ত হ'ল। ভারতের সকল মসজিদের গুম্বুজ দেখলে একথা স-প্রমাণ হবে। বারাণসীতে বিশ্বনাথের মন্দিরের অঙ্গ চেপে প্রকাণ্ড মসজিদ গড়ে উঠ্‌ল। প্রায় সেই সময় বা কিছু পরে কনস্তান্তিনোপলে খৃষ্টীয় গির্জা মুস্লিম মস্‌জিদ হল তুর্ক বিজয়ীর আদেশে। মোট কথা শিল্প-সাধনা বন্ধ হ'ল না উত্তর ভারতে—স্থাপত্যের রূপ ও প্রকার পরিবর্তিত হ'ল মাত্র।

আমি ভেনিসের প্রসঙ্গে এ কথা বলছি ধান-ভানা ব্যাপারে শিব-সঙ্গীত হিসাবে নয়। মুসলমান রাজাদের সময় ভারতের স্থাপত্য শিল্প উত্তর ভারতে মাত্র একই প্রকারের মসজিদ নির্মাণ ব্যতীত অন্য কোনো পথে অগ্রসর হয়নি। কারণ হিন্দুর পক্ষে বড় মন্দির উত্তর ভারতে সৃষ্টি অসম্ভব হ'য়েছিল। তাই শিল্প দক্ষিণ ভারতে অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করলে। উত্তর ভারত ধনীর গৃহে ঠাকুর দালান গৃহ-দেবতার দেউল প্রভৃতিতে শিল্প-তৃষা মেটালে। কিন্তু সাধারণ জনগণের প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রায় হিন্দু জগৎ হতে লোপ পেলে। বিস্ময়ের বিষয় ভেনিসের বহু অট্টালিকা এবং আমাদের ধনী গৃহের ঠাকুর দালান এক ধরণের। এমন কি গোছা বাঁধা সরু থামের সমষ্টি মোটা থাম, গোল খিলান এবং সিঁড়ির থাক ভেনিসের স্থাপত্য শিল্পের অনুরূপ।

ইতালীর সাগর-নীরে যে বিদেশী মিশে গেল, সে ভিন্ন ধর্ম আনেনি; যখন প্রাচীন রোমক পেগান ধর্ম খৃষ্ট-ধর্মের সংঘাতে লুপ্ত হল, তখনও দেশে বিদেশী রাজা আসেনি। তার ফলে দেব-দেবীর স্থান অধিকার করলে সন্ত ও মহাপুরুষ। শিল্প-তৃষা ইতালীয় জীবনের এক অপূর্ব ধারা। যখন পশ্চিম য়ুরোপ হ'তে গথ, ভিসিগথ, হুন প্রভৃতি এসে প্রাচীন রোমকে বিপর্য্যস্ত করলে, তখন শিল্প সাধনার স্রোত বন্ধ হল সত্য। কিন্তু শীঘ্র আবার ইতালী আপনাকে ফিরে পেলে। জীবনের কতকটা ব্যাপারের প্রকার বদলালো মাত্র। খৃষ্ট-ধর্ম অব্যাহত রহিল। পরে নূতন ধর্ম-ভবন নির্মিত হ'ল গথিক প্রথায়। গোল খিলান গুলা হল কোনা, অট্টালিকার অঙ্গে নানা অ-খৃষ্টীয় ও বীভৎস মূর্তি স্থান পেলে। তাদের সঙ্গে বাইবেল বর্ণিত আখ্যায়িকার নায়ক নায়িকাদের মূর্তি বিরাজ করলে। বহু রাজা ও পোপ্ সৃষ্ট হলেন। ভাস্কর এবং চিত্র-শিল্পী তাঁদেরও অমর করলেন—মন্দির এবং দুর্গের প্রাচীরে। গৃহস্থের গৃহ-প্রাচীরও নিজেকে সুদৃশ্য করবার চেষ্টায় অঙ্গ-শোভায় পুতুল ব্যবহার করলে। ইংরাজ মিশনরী এদেশে এসে হিন্দুর পুতুল পূজাকে বিদ্রূপ করলে, কিন্তু তার নিজের দেশের গির্জা, ক্যাথিড্রল, এবী প্রভৃতি পৌত্তলিক সাজ ছাড়েনি। হিন্দুর পুতুলদের পরিকল্পনা দেব দেবীর। অবতার রাম, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধের মূর্তি বহুল মন্দির। খৃষ্ট-মন্দির মানুষের মূর্তিতে সাজানো। ইংরাজের সেন্টপল

টিনটোরেটোর বিখ্যাত চিত্র :—"মার্কারি এবং রূপ, সৌন্দর্য ও দয়া বিধায়িনী দেবকন্যাত্রয়"

গির্জায় লর্ড কিচ্‌নার প্রভৃতি মানুষ মারা বীরের মূর্তি বিদ্যমান।

পরে যখন চৌদ্দ পনেরো শতকে ইতালীর শিল্প নব-জীবন লাভ করলে তখন গথিক প্রভাব বিনষ্ট হয়ে প্রাচীন রোমক শিল্প ধারার হল পুনরুদ্ধার। পুরাতন সপ্ত-গ্রহের মন্দির প্যানথিয়নকে মাইকেল এঞ্জেলো সেন্ট পিটারের গির্জার মাথায় তুললেন—সেকথা সগর্বে প্রচার ক'রে। সেই বুরুজ বদবদল হ'য়ে য়ুরোপ, এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার শত শত ধর্মস্থল, স্মৃতি-সৌধ এবং অট্টালিকার শিরোভূষণ। আমাদের দেশের পোষ্ট অফিস এবং

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের চূড়াও সে শিল্পের রূপান্তর। আবার রোমক মন্দির প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের আদর্শে নির্মিত কিনা সে কথা পুরাতত্ত্ববিদ্ সুধীর বিবেচ্য।

ভেনিসের অলিগলি গণ্ডোলা নৌকায় ঘুরে একথা স্পষ্ট বোঝা গেল যে অর্থ, যশ, মানের সঙ্গে ভেনিস শিল্প-সাধনা ছাড়েনি। সেই শিল্প-সাধনার সঙ্গে ধর্ম-জীবনের বাহিরের রূপ মিলিয়ে দিয়েছিল স্বচ্ছন্দে।

রাষ্ট্র-বিপ্লবে চিরদিন একদল লোক দেশ ছেড়ে পালায়। রোমক সাম্রাজ্যে বর্বর আক্রমণের হাত এড়াবার জন্য ইতালীর প্রত্যেক প্রদেশ হ'তে পলাতক বাস্তহারা ভেনিসের ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে আশ্রয় নিলে। রোম-সাম্রাজ্য যখন দু'ভাগে বিভক্ত হ'ল ভেনিস পড়ল প্রাচ্য সাম্রাজ্যের

টিনটোরেটোর আর একখানি বিখ্যাত চিত্র :—
ব্যাকাস এবং এরিএড্নার বিবাহ

ভাগে। অষ্টম শতাব্দীতে ভেনিস স্বাধীন হ'ল—নামে প্রজাতন্ত্র, কিন্তু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ছিল প্রভূত। তার শ্রীবৃদ্ধি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ঈর্ষার কারণ হ'ল। প্রজাতন্ত্র ভেনিসও সাম্রাজ্যবাদ মদিরা পান করলে। ইতালীর উত্তর প্রদেশগুলি ভেনিসের করায়ত্ত হ'ল। তার সঙ্গে এলো ফ্লরেন্স প্রভৃতি হ'তে শিল্পী। যোলো শতকে রোমের দৃষ্টান্ত তাকে শিল্পীর আশ্রয়স্থল করলে। জর্জিয়ানী, টিসিয়ন টোরেন্টিনো প্রভৃতি শিল্পী, ভেনিস-শিল্পের পরিকল্পনা প্রবর্তন করলে—বিষয় বস্তু হ'ল বাইবেলের আখ্যান কিন্তু তার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক পুরাণের গল্পও রূপ পেলে চিত্রকরের তুলিকায়। আমি কতকগুলি চিত্রের এস্থলে নমুনা দেব। মূর্ত্তিতে ভেনিসের মহিলা রূপ পেয়েছে। পটভূমিতে প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর চিত্তের ছায়া দেদীপ্যমান।

আজ ভেনিসের সে প্রাচীন সম্পদ নাই, তবে তার ঐতিহ্য পৃথিবীর সকল দিক থেকে লোক আনে সহরে। স্থায়ী অধিবাসী যথা-সম্ভব কুটীর-শিল্প এবং বিপনীর সাহায্যে ভ্রমণকারীর নিকট হতে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। সবত্র হোটেল ও পান্থ-নিবাস। ট্রামের বদলে সর্বদা বড় খালে যাত্রী-পোত চলাফেরা করে। সু-সজ্জিত গণ্ডোলার মাঝি যাত্রীর নিকট হ'তে যথাসাধ্য অর্থ-শোষণ করে। কাঁচের কাজ পরিপাটি। স্ফটিক ও চীনামাটির বাসন, ফুলদান প্রভৃতিতে এরা অতি সুক্ষ্মকাজ করতে পারে। আর হীরা, মরকত, মতি ও মাণিকের গহনা অতি সুন্দর। আমাদের সামনে কাঁচের খেলনা নির্মাণ করলে আমার পৌত্রীদের জন্য এক কারখানার কারিগর।

ভেনিসের সেণ্ট মার্কের চাতালে প্রকাণ্ড থামের উপর আছে এক ডানাওয়ালা সিংহ। এ অপরূপ পশুরাজের চিত্র বহু স্থলে দেখা যায়। ভেনিসের রাষ্ট্রপতিকে ডোজ বলা হ'ত। ডোজের প্রাসাদ যতবা প্রকাণ্ড, ততবা শিল্প-সম্ভারে পূর্ণ।

বলা বাহুল্য ভেনিসে যত সেতু আছে এতো সেতু কোনো সহরে নাই। এর কারণও অনিবার্য্য, যেহেতু পথ জলপথ। পুলের মধ্যে দুটি পুল, সাহিত্য চির-প্রসিদ্ধ করেছে—দীর্ঘশ্বাসের সেতু এবং রিয়ালটো। সেণ্ট মার্কের পার্শ্বে ডোজের প্রাসাদ। তার সংলগ্ন বিচারালয়। ছোটো খালের ওপারে কারাগৃহ। বিচারালয় হ'য়ে কারাগৃহে যেতে হ'লে এই সেতু পার হ'তে হয়। এ ঢাকা পুল। কবি-চিত্তে বায়রণ হতাশের দীর্ঘশ্বাস শুনে ঐ সেতুর নাম দিয়েছিলেন—ব্রিজ্ অফ্ সাইজ।

রিয়ালটো ছিল পূর্বদিনের প্রধান লেনদেনের স্থান। সেখানেও ঢাকা সেতু। আজিও সেতুর উপর নানা দোকান। আমরা সেখানে চামড়ার পুস্তকাধার কিনেছিলাম যাতে ঐ সেতুর ছবি আছে। শিশুদের জন্য স্মারক গণ্ডোলা কিনলাম। অর্থবান সেখানে মূল্যবান পদার্থ কেনে ভ্রমণের স্মারক হিসাবে।

সেণ্ট মার্কের চাতালই প্রধান মিলনক্ষেত্র। সেখান

থেকে ওপারে বহু দূরে দেখতে পাওয়া যায় এক প্রকাণ্ড গির্জা।

স্টীমারে গেলাম লিডো। সে পল্লী একটি স্বতন্ত্র দ্বীপের পরে চমৎকার সুসজ্জিত পল্লী। তার একদিকে আড্রিয়াটিক সাগর। সেণ্ট মারিয়া ডেল্লা স্যালুট বড়খালের তীরে প্রকাণ্ড গির্জা। কিন্তু তার গম্বুজ সেণ্ট পিটারের মত—অর্থাৎ মাইকেল এঞ্জেলো প্রবর্তিত প্যানথিয়ন মন্দির গির্জার ছাদের উপর। অবশ্য প্যানথিয়নে জানালা নাই—মাত্র একটি দরজা আর ছাদের মাঝে ছিল খোলা অংশ সূর্য দর্শনের জন্য। আজকাল সকল গম্বুজের মাথা বন্ধ এবং তার উপর প্রায় অপর একটা চূড়া। আমাদের তাজমহল প্রভৃতিতে ঘণ্টা এবং পদ্মের পাতা আর সুজ্জা কারনিসের উপর পদ্ম, ভারতের নিজস্ব।

আজ ভেনিস বিলাসীর তীর্থস্থান। প্রচুর খাদ্য, বহু ভোজনালয়, লীডো প্রভৃতি স্থলে সমুদ্র স্নানের ব্যবস্থা। য়ুরোপের জলের ধারে তো মহিলারা মাত্র কৌপীন ও একটা কাঁচলী বেঁধে ঘোরে, কারও অঙ্গে থাকে জাঙ্গিয়া এবং গেঞ্জি। এ পোষাকে গ্রীষ্মে তারা সময় সময় সহরের বাহিরে ভ্রমণ করে—প্রমোদ উদ্যান প্রভৃতিতে। লণ্ডন, রোম, প্যারিস প্রভৃতি সহরের অভ্যন্তরে সওদাগরী পটীতে আধুনিক পোষাকের তত প্রচলন নাই। কিন্তু ছুটির দিনে সূর্যালোকের সন্ধানে স্ত্রী পুরুষ আজ প্রাচীন দিনের মত দেহকে আবরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। য়ুরোপ হতে আমদানী করবার বহু ভাব ও রীতি বিদ্যমান। কিন্তু নারায়ণের ইচ্ছায় যেন আমাদের আধুনিক মহিলা ওদের নগ্নতা আমদানী না করেন এ প্রার্থনা সাধারণ।

নীড়

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ ঘরের দ্বারে তুমি পাবেনাকো মাঙ্গল্য রচনা,
গৃহ-শিল্পী তরে নাই ভবন-বিলাসী হেথা কোন,
মাথার উপরে যবে সূর্য্য ওঠে দিবা দ্বিপ্রহরে
সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে রোদ ঝিকিমিকি উঁকি দিয়ে যায়।

দেয়ালে ভেঙ্গেছে বালি, সাদা চূণ কাল হয়ে গেছে,
তারি মাঝে হেথা-হোথা নানা রঙে আঁকা নানা রেখা,
ঠিকানা অনেক আর দু লাইন কবিতাও আছে,
মেয়েলী হাতের লেখা নাম আছে শ্রীকরবী বসু।

এই ঘরই ঠিক করে তোমায় জানাই প্রিয়তমা,
দশ টাকা ভাড়া মাসে, পেয়ে গেছি তোমারি বরাতে,
এ সহর কলকাতা, এখানে যে ঘর মিলে গেল,
আমি তো করিনি আশা, কি জানি তুমি কি ভেবেছিলে।

যা হোক মিলেছে ঘর, এইবার এসো তাড়াতাড়ি,
এখন শীতের শেষ, ফাগুন দুয়ারে কড়া নাড়ে,
মনেতে লাগালো রঙ দেয়ালের শ্রীকরবী বসু,
তুমি এলে এই ঘরই রাতারাতি স্বর্গ হয়ে যাবে।

নীড়হারা

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমি যেন এক নীড়হারা পাখী
অসীম গগনে মেলেছি ডানা
ক্লান্ত পাখায় উড়ে চলে যাই
চলিবার পথে থামা যে মানা।
বৈশাখী ঝড় এল কোথা হতে
সাধের কুলায় ধূলায় লোটে
সেই ঝড়ে মোর পাখা মেলে দিই
অজানার পথে মন যে ছোটে।
জানি না কোথায় কবে হবে মোর
নিরুদ্দেশের সন্ধ্যা বেলা
গহন রাতে অসীমের বুকে
থেমে যাবে মোর এ ডানা মেলা।
বৈশাখী ঝড়ে নীড় হারা পাখী
কেহ তো তাহারে চিনিবে না রে
নীড় হারাদের বেদনা কখনও
নীড়ে বসা পাখী বুঝিতে পারে?
গভীর আঁধারে যাত্রা আমার
চঞ্চল পাখা মেলেছি কবে
ক্লান্ত পাখায় উড়ে চলে যাই
আমি যে একেলা অসীম নভে।

ভারতের আবার ঋণ গ্রহণ—

গত ৫ই জানুয়ারী (২০শে পৌষ) ভারত রাষ্ট্রের সহিত আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তদনুসারে—ভারত রাষ্ট্রের গঠন মূলক কার্য্য দ্রুত সম্পাদন জন্য আমেরিকা ভারতকে প্রায় ২৫ কোটি টাকা (৫০ মিলিয়ন ডলার) ঋণ প্রদান করিবে।

বলা হইয়াছে, বর্ত্তমানে ভারত রাষ্ট্র যে বিদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার (৫০০ মিলিয়ন ডলার) খাদ্য দ্রব্য আমদানী করে, তাহা ভারতে উৎপন্ন করিবার জন্যই এই টাকা প্রথমে প্রযুক্ত হইবে।

একান্তই পরার্থপরতা-প্রণোদিত হইয়া—ভারতের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য আমেরিকা এই ঋণ প্রদান করিতেছে কি না, সে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না। এককালে ইংলণ্ড পৃথিবীর সকল দেশের মহাজন বলিয়া বিবেচিত হইত ; আজ সে পদ আমেরিকা অধিকার করিয়াছে। তাহার অর্থ আছে, সে সেই অর্থ প্রযুক্ত করিয়া লাভবান হইতেই চাহে। সে ভারত রাষ্ট্রকে ঋণ দিতেছে ; তাহাতে সে কেবল যে সুদে লাভবান হইবে, তাহাই নহে, পরন্তু ভারত রাষ্ট্র যে কাজে সেই অর্থ প্রযুক্ত করিবে তাহার জন্য যে বহু যন্ত্রাদি তাহাকে ক্রয় করিতে হইবে, তাহাতেও আমেরিকা দুই প্রকারে লাভবান হইবে—

(১) শিল্প বিস্তারে

(২) বিক্রীত পণ্যের মূল্যে

শিল্প বিস্তার-ফলে তাহার বহু লোক কাজ পাইবে—বেকার সমস্যার উদ্ভব হইবে না। আর যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিয়া সে লাভ করিবে। ভারত রাষ্ট্র তাহার মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে ; সুতরাং তাহাকে যে টাকা আমেরিকাকে সুদের জন্য ও যন্ত্রপাতির জন্য দিতে হইবে, তাহাতেও তাহার ক্ষতি ও আমেরিকার লাভ হইবে।

যে ঋণ গৃহীত হইবে, তাহা সুদে আসলে শোধ করিতে হইবে। শোধের উপায় কি ? দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার ঋণভার বর্দ্ধিত করা সঙ্গত কি না, তাহাও বিশেষ বিবেচ্য। ইংরেজের শাসনে ভারতবর্ষ খাতক ছিল—যুদ্ধের সময় তাহার ঋণ শোধ হয় ও সে মহাজন হয়। কিন্তু তাহার ইংলণ্ডের নিকট প্রাপ্য অর্থ যে ভাবে নিঃশেষ হইতেছে, তাহাতে তাহার সে অবস্থা আর থাকিবে না। মুদ্রামূল্য হ্রাসে ভারতরাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ও হইতেছে এবং তাহাকে খাদ্য দ্রব্যের জন্য আমেরিকা প্রভৃতি যে সকল দেশের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে ; সে সকল দেশের সহিত আদান-প্রদানেও তাহার আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। পাকিস্তান সম্বন্ধেও সে কথা প্রয়োগ করিতে হয়। কেবল খাদ্যোপকরণের জন্যই নহে—পাট ও তুলা প্রভৃতির জন্যও পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্যে ভারতরাষ্ট্র আর্থিক ক্ষতি ভোগ করিতেছে। ট্রাক্টার প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য ভারতরাষ্ট্র যে ঋণ করিয়াছে, তাহা—কিস্তি অনুসারে—পরিশোধ করিবার সময় হইয়াছে। এই সময় আবার নূতন ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে। ইহা যে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি বন্ধক দিয়া গৃহীত হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। বৃটেনের শাসনকালে বিদেশী মূলধন আনয়নের সমর্থক যে যুক্তি "একস্টারন্যাল ক্যাপিটাল"—সমিতি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা—পরিবর্ত্তিত রাজনীতিক অবস্থায়—গৃহীত হইতে পারে না। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, ভারতরাষ্ট্র যে তাহার উন্নতিকর কার্য্যের জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তাহা যোগাইতে পারে না—এ বিশ্বাসের আর অবকাশ নাই এবং যে সরকার পোষ্টকার্ড হইতে রেলের ভাড়া পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সে সরকার যদি আন্তরিক চেষ্টায় ব্যয়-সঙ্কোচ করেন। তবে যে মূলধনের অভাব আরও দূর হইতে পারে। তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল কারণে অনিশ্চিত ফললাভের আশায় বিরাট বিরাট পরিকল্পনা লইয়া বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রকে পঙ্গু করা দূরদর্শী শাসক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নহে।

প্রেস রিপোর্টে বলা হইয়াছিল, এশিয়ার অসম্পূর্ণরূপ পরিপুষ্ট দেশ-সমূহের উন্নতির জন্য আমেরিকার বৎসরে ৫০ হইতে ৮০ কোটি ডলার প্রযুক্ত করা প্রয়োজন। সম্প্রতি মিষ্টার মরিশ জিনকিন তাঁহার 'এশিয়া ও প্রতীচী' নামক পুস্তকে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমেরিকার পক্ষে ভারত রাষ্ট্রকেই ৫০ কোটি ডলার প্রদান করা প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন :—

"কেবলই যে বলা হইতেছে, এশিয়ায় কেবল দক্ষ কর্ম্মীর প্রয়োজন, মূলধনের নহে—তাহা অসার। ভারতের রেলওয়ে এঞ্জিনিয়াররা ও তাহার স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞরা বহুব্যয়সাধ্য অনেক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কেবল পরামর্শে হইবে না—অর্থের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।"

কিন্তু এই অর্থ যদি বিদেশ হইতে ঋণরূপে সংগ্রহ করিতে হয়, তবে কি তাহার বিপদ নাই ? যাঁহারা আমেরিকার ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া-

ছেন, তাঁহারা জানেন, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে আমেরিকা তাহার লৌহ শিল্প প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আমেরিকায় যাহা হইয়াছে, ভারতেও তাহাই সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

উন্নতিসাধন যত দ্রুত ও যত শীঘ্র হয় ততই যে ভাল তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেই উন্নতির জন্য যে মূল্য দিতে হইবে, তাহা যদি দেশের লোকের ক্ষমতাতিরিক্ত হয়, তবে তাহা বিপজ্জনকই হয়। কেবল তাহাই নহে, বিদেশীর অর্থে যদি সেই উন্নতি সাধিত হয়, তবে তাহা পরে দেশের রাজনীতিক স্বাধীনতার পথও বিঘ্নকৃত করিতে পারে। মিশরে খদিত ইস্মাইলের ঋণেই মিশর বিব্রত ও বিপন্ন হইয়াছিল। আজ পারস্যেও আমরা যে অবস্থা লক্ষ্য করিতেছি, তাহা আতঙ্কজনক। সুতরাং বিশেষ সতর্কতা বলম্বন প্রয়োজন।

ভারতে বিদেশীর তৈলশোধন কারখানা—

বিদেশীর শোষণ নিবারণ ব্যতীত যে এ দেশের দারিদ্র্য দূর হইবে না, এ কথা প্রায় এক শত বৎসর হইতে বলা হইতেছে। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে বলিয়াছিলেন—রাজনীতিক পরবশ্যতা সহজেই লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু অর্থনীতিক পরবশ্যতা রাজনীতিক পরবশ্যতা অপেক্ষাও অনিষ্টকর; কারণ, অর্থনীতিক পরবশ্যতা দেশের সকল কাজের উৎস শুষ্ক করে। বিস্ময়ের বিষয়, ভারত সরকার—

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অইল কোম্পানী
ব্রহ্ম শেল অইল কোম্পানী
ক্যালটেক্স অইল কোম্পানী

তিনটি বিদেশী কোম্পানীকে ভারত রাষ্ট্রে তৈল শোধনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার দিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় কোম্পানী বোম্বাই প্রদেশে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবেন; তৃতীয় কোথায় তাহা করিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই—কলিকাতা, বিশাখাপত্তন ও মান্দ্রাজ এই তিন স্থানের কোনটিতে (পূর্ব্ব উপকূলে) কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোম্পানীর বিশেষজ্ঞরা ও ভারত সরকারের লোকরা স্থান স্থির করিবেন। কোম্পানীর লোক আসিয়াছেন—এখন চুক্তি পাকা হইলেই কাজ আরম্ভ হইবে।

পশ্চিম বঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—ভারত রাষ্ট্র স্বায়ত্ত শাসনশীল হইবার পরে

কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী
কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী

দুইটি বিদেশী কোম্পানীর আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করা হইয়াছে—

"পর দীপমালা নগরে নগরে—
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

যে সরকার দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার কোটি করিতে দ্বিধানুভব করিতেছেন না এবং ট্রাক্টার ক্রয়ের জন্য যেমন বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন, তেমনই গঠনমূলক কাজের জন্য আবার আমেরিকার নিকট হইতে ২৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতেছেন, সেই সরকারই ভারত রাষ্ট্রে তিনটি বিদেশী কোম্পানীকে তৈলশোধনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে দিতেছেন। পারস্যের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাও তাঁহাদিগকে সে কাজে নিবৃত্ত করিতে পারিল না!

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—দারিদ্র্য দূরীকরণই সরকারের প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীকে এ দেশে নূতন নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার প্রদান দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার উপায় না—তাহা দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধির উপায়? বিদেশীর কলকারখানায় দেশীয় লোক কেরাণী হইতে শ্রমিকের কাজ করিলে কি হয়, তাহা বিবেচনা করিয়াই ১২৮০ বঙ্গাব্দে—অর্থাৎ ৭৫ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে মনোমোহন বসু লিখিয়াছিলেন—

"তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে
সার শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন!"

তখন দেশ ইংরেজের রাজ্য ছিল। কিন্তু আজ—দেশ যখন স্বায়ত্ত-শাসনশীল তখন যে বিদেশ হইতে পঙ্গপাল আনিয়া দেশে যত সার-শস্য আছে তাহা গ্রাস করাইয়া দেশের লোকের জন্য খোসা ভুষি মাত্র অবশিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? দেশের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনীতিক পরবশ্যতা যে শেষে তাহার রাজনীতিক পরবশ্যতার কারণও হইতে পারে—না হইলেও রাজনীতিক পরবশ্যতা অপেক্ষাও ভয়াবহরূপ অনিষ্টকর হইতে পারে, তাহা মনে করিয়া দেশের জনগণের আতঙ্কিত হইবার কারণ অবশ্যই আছে।

বদরীনাথে চীনের দাবী—

এ বার যাঁহারা কৈলাস মানস সরোবরে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন, সে অঞ্চলে কম্যুনিষ্ট চীনের সেনাদল উপস্থিত হইতেছে। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, পশ্চিম তিব্বতে যে চীনা কম্যুনিষ্টরা আসিয়াছে, তাহারা বদরীনাথ মন্দির দাবী করিতেছে। বদরীনাথ যুক্ত-প্রদেশের গাড়োয়াল জিলায় অবস্থিত। ঐতিহাসিকগণের মত এই যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মগুরু শঙ্করাচার্য্য প্রথমে বদরীনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বার বার তুষার পতনে মন্দির ধ্বংস হইয়া যায় ও পুনর্গঠিত হয়। বর্ত্তমান মন্দির বহুদিনের নহে।

প্রকাশ চীনারা মন্দিরের দক্ষিণে ৫।৬ মাইল পর্য্যন্ত স্থান দাবী করিতেছে এবং কাঞ্চন গঙ্গার কূলে পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। তাহারা বলে, ঐ মন্দির প্রথমে বৌদ্ধ মন্দির ছিল এবং এখনও মন্দিরের ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভুটিয়ারা কতকগুলি কাজ করিয়া থাকে। মন্দিরটি অলকনন্দা নদীর তীরে উপত্যকায় অবস্থিত। স্থানটি তিব্বতে প্রবেশের মানা গিরিসঙ্কট

প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দুনরনারী ঐ মন্দিরে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন। স্থানটি গাড়োয়াল হইতে তিব্বতে গমনের পথে অবস্থিত।

পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল, কতকগুলি তিব্বতী পরিবার ঐ অঞ্চলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। গাড়োয়াল, টিহরী-গাড়োয়াল ও আলমোরা যুক্তপ্রদেশের এই ৩টি জিলার সীমান্তে তিব্বত। আলমোরা জিলার অপর সীমান্তে নেপাল অবস্থিত।

কিছুদিন হইতে যে নেপাল রাজ্যে বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। নেপালের রাজা ত্রিভুবন কিছুদিনের জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে ছিলেন এবং ভারত সরকারের সাহায্যে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নেপালে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে; কিন্তু বিশৃঙ্খলার স্থানে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন হয় নাই। নেপালে এখন যে সকল রাজনীতিক দল রহিয়াছে সে সকলের একটি নাকি কম্যুনিষ্ট-দিগের সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রয়াসী এবং তাহারাই নাকি ভারত রাষ্ট্রের সীমান্তস্থিত গার্ভিয়াং নগর হইতে কয় মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী তাকলা-কোটে অবস্থিত তিব্বতী সেনাদলকে প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য যোগাইয়াছে।

ভারত সরকার এ বিষয়ে কি সংবাদ পাইয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে কি করিতেছেন, তাহা প্রকাশ নাই—হয়ত তাঁহারা তাহা প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। কিন্তু সংবাদ গোপন করিলে অনেক সময় সত্যের স্থান বিকৃত বা অতিরঞ্জিত সংবাদ অধিকার করে। আবার বিপদের সম্ভাবনা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করাও সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

বদরীনাথ, কৈলাশ ও মানস-সরোবর হিন্দুর তীর্থস্থান। তাহা যেমন তিব্বতীরা তেমনই চীনারাও অবগত আছেন। এ বার হিন্দু তীর্থযাত্রীরা কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হ'ন নাই। চীনা সেনানায়করা ভারতীয় ভাষা না জানিলেও হিন্দু তীর্থযাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"ভাই! ভাই!" বোধ হয়, তাঁহারা কম্যুনিষ্টদিগের ব্যবহৃত comrade শব্দের ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

ভারতের ইংরেজ সরকার তিব্বতে চীনের অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তিব্বত যে এককালে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। সে অবস্থায় তিব্বত অধিকারের পরে চীন ভারত-রাষ্ট্রের বদরীনারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন বা কোন কোন অংশ দাবী করিবে কি না, তাহা বলা যায় না।

ভারত সরকার চীনের গণতান্ত্রিক সরকার স্বীকার করিয়াছেন। উভয় সরকারে, মতভেদ থাকিলেও, সম্প্রীতি—যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে দিকে উভয় সরকারেরই লক্ষ্য থাকিবে, এমন আশা করা যায়।

সেকণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড, পাঠ্য-পুস্তক ও প্রকাশক সঙ্ঘ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্ত হইতে প্রাথমিক বা প্রবেশিকা পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার নবগঠিত সেকণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডকে সে ভার দিয়াছেন। বোর্ড গঠিত হইয়া প্রথমেই পরীক্ষারনাম এই বোর্ডের জন্য বহু কর্ম্মচারীর বেতন হইতে বাড়ী ভাড়া পর্য্যন্ত নানা বাবদে যে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে তাহাতে যদি প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা হইত, তবে পশ্চিমবঙ্গের অধিক ও স্থায়ী উপকার হইতে পারিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাই করেন নাই। যে শিক্ষা-সচিবের কার্য্যকালে এই বোর্ড গঠিত হইয়াছে, তিনি যে সচিব হইবার পূর্ব্বে এই পরিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন, তাহা অনেকে বলিয়াছেন। শিক্ষাকে সর্ব্বতোভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করার উপযোগিতা সম্বন্ধেও মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ যে নাই, এমন নহে। ডিশরেলীর মতে ইহা বর্ব্বর যুগের ব্যবস্থা—

"Wherever was found what was called a paternal Government was found a State education. It had been discovered that the best way to secure implicit obedience was to commence tyranny in the nursery."

নূতন বোর্ড যেন পরিচিত ও পুরাতন পদ্ধতি বর্জ্জন বলিয়া অপরিচিত পদ্ধতির প্রবর্তন জন্যই আগ্রহশীল হইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমেই পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে একচেটিয়া ব্যবসার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা গত জুলাই মাসে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এই তিন শ্রেণীতে যে সকল পাঠ্য পুস্তক পঠিত হইয়াছিল, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই সকলই বহাল থাকিবে। কিন্তু সহসা—অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়া—তাঁহারা ঐ ৩ শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, অন্যান্য অর্থাৎ বিজ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়েও তাঁহারা এই ব্যবস্থা করিবেন।

যে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশকদিগের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বোর্ড ক্ষমতা-গর্ব্বে সে প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, সকল ক্ষেত্রেই একচেটিয়া ব্যবস্থা অমঙ্গলজনক হয় এবং প্রতিযোগিতা উন্নতির কারণ হইয়া থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্য কয়খানি মাত্র পুস্তক প্রকাশের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সব পুস্তক প্রকাশের ভার, অধিকার ও দায়িত্ব প্রকাশকদিগকে দিয়াছিলেন—প্রকাশকরা, নির্দ্দেশানুসারে, উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা পুস্তক রচনা করাইয়া তাহা অনুমোদিত করাইয়া লইতেন। তাহাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকে নানা ভুল দেখা গিয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রের একটি কবিতায় "বড় বক্ত জোর"—"বড় রক্ত জোর"ও হইয়াছে!

যোগ্যতা মাত্র কয়জন লোকের থাকিতে পারে—ইংরেজের আমলের সিভিল সার্ভিসে চাকুরীয়াদিগের এই মনোভাব কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। বোর্ড এ ক্ষেত্রে সেই মনোভাবের অনুশীলন করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বোর্ড যদি ইচ্ছা করেন, তবে দেখিতে পারেন, আজ তাঁহারা যে ব্যবস্থা করিতেছেন, পূর্ব্বে একবার সরকারের শিক্ষা বিভাগ সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সুফল ফলে নাই। সেই সময় কোন বিদেশী পুস্তক

তোষণ করিয়া লইয়াছিলেন। তখন যে সকল পাঠ্য-পুস্তক সরকারী বিভাগের অনুমোদিত হয়, সেই সকলে "সার্থকশব্দক", "খাদ্য শিকড়" প্রভৃতি কথার ব্যবহারে 'হিতবাদীর' তীব্র মন্তব্য স্মরণীয়। তখন ঐ বিদেশী প্রতিষ্ঠান কয় জন বাঙ্গালীকে ঠিকা হিসাবে পুস্তক রচনা করিবার কাজ দিয়া আপনারা লাভবান হইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, বোর্ড সেই কাজই করিতেছেন।

আবার বোর্ড যাঁহাদিগকে পুস্তক রচনার ভার দিতেছেন, তাঁহারাই যে সে বিষয়ে যোগ্যতমব্যক্তি এমন না-ও হইতে পারে। বহু লোককে সে কাজের ভার দিয়া যোগ্যতম পুস্তক পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিলে প্রতিযোগিতায় রচনার উৎকর্ষ লাভ সম্ভব হয়।

"বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠানের প্রতি যাঁহার যত শ্রদ্ধাই কেন থাকুক না তাহার ব্যবস্থাই যে অভ্রান্ত এমন না-ও হইতে পারে।

পুস্তক রচনা ও প্রকাশ লইয়া প্রকাশকদিগের সহিত বোর্ডের যে সংঘর্ষ প্রথমেই আরম্ভ হইল, তাহা আমরা দুঃখের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি। শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির তুলনায় প্রকাশকদিগের আর্থিক ক্ষতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু যে প্রকাশকরাই এতকাল শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যে লোকসেবা করিয়া লোকের উপকার ও সরকারকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতাভাজন—উদ্ধত অবিনয় তাঁহাদিগের প্রাপ্য নহে।

আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। দেশে শিক্ষার বিস্তার সাধন ও উৎকর্ষ বিধান যে স্থলে সরকারের উদ্দেশ্য সে স্থানে যেন বোর্ডের ব্যবস্থা জনকয়েক লোককে লাভবান করিবার উপায়ে পর্য্যবসিত না হয় এবং বোর্ডের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পুস্তকের মূল্য অকারণ অধিক না হয়। বোর্ড যে ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে এই দুই অনিষ্ট ঘটিতে পারে বলিয়াই আমরা আজ বোর্ডকে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। প্রকাশকদিগের স্বার্থই যেমন শেষ বিবেচ্য নহে, বোর্ডের জিদও তেমনই একমাত্র বিবেচ্য নহে।

নির্ব্বাচনে অব্যবস্থার অভিযোগ—

স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতরাষ্ট্রে এইবার প্রথম প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন হইল। যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নহে সে দেশে অজ্ঞ জনগণের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কমাত্রেরই ভোটাধিকার সঙ্গত কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। সে যাহাই হউক, এই বিরাট নির্ব্বাচনে যে নানা অব্যবস্থার ও অনাচারের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে সকল স্থানে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ত্রুটিতে বা ইচ্ছাকৃত কার্য্যে অনাচার ঘটিয়াছে, সে সকল স্থানে কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আমরা নিম্নে কয়টি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(১) নানা স্থান হইতে ব্যালটবাক্স ভাঙ্গার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। গত ২১শে জানুয়ারী 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্র লিখেন মুর্শিদাবাদ জিলায় কান্দী নির্ব্বাচনকেন্দ্রে পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচনকল্পে প্রত্যেকটি ব্যালটবাক্সের লাক্ষা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। অথচ এ কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্ব্বাচন বিভাগকে ও ভারত সরকারকে জানান হইয়াছিল। কিন্তু ফল কি হইয়াছে, জানা যায় নাই। 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' লিখিয়াছিলেন—কেবল জানাইলেই হইবে না, কিরূপে ঐ কার্য্য সম্ভব হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ প্রয়োজন। কারণ, যে ভাবে কেবলই ব্যাপার গোপন করা হইতেছে, তাহাতে লোকের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়া অনিবার্য্য।

(২) হুগলী জিলায় ও মেদিনীপুর জিলায় ২টি কেন্দ্র হইতে ঐরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। উভয় কেন্দ্রেই সচিব অন্যতম প্রার্থী ছিলেন। সেই জন্যই সেই কেন্দ্রদ্বয়ে ঐরূপ ঘটনার সংঘটন আরও সন্দেহের ও দুঃখের বিষয় বলিতে হয়। কিরূপ উহা সম্ভব হইয়াছিল?

(৩) কলিকাতার কোন কেন্দ্রে প্রার্থীর সংখ্যা ৯ জন হইলেও সরকারী 'গেজেটে' মাত্র ৮ জনের নাম প্রকাশিত হয়। কেবল তাহাই নহে—একজনের প্রতীক আর একজনের বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল; অথচ প্রতীক চিহ্ন ২৮শে নভেম্বর প্রদান করা হয় এবং 'গেজেটের' তারিখ ১২ই ডিসেম্বর! এতদিন পরেও যে ভুল ধরা পড়ে নাই, তাহা যে সকল কর্ম্মচারীর অযোগ্যতার পরিচায়ক, তাঁহাদিগকে কি পুরস্কৃত করা হইবে? বহু সংবাদপত্রে—'গেজেটে' প্রকাশিত ভুল সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় যে ভোটাররা বিভ্রান্ত ও নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকাশ, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বাহ্ণে কোন ভোটপ্রার্থী 'রিটার্নিং অফিসারকে' ঐ ভুল দেখাইয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলে কর্ম্মচারীটি দপ্তরখানায় যাইয়া সংবাদ দেন, দিল্লীতে টেলিফোন করা হইয়াছিল—দিল্লীর কর্ম্মচারী অব্যবস্থাই সমর্থন করিয়াছেন।

(৪) এক স্থানে ১৪টি ব্যালটবাক্স পাওয়া যায় নাই। প্রথমে শুনা গিয়াছিল, সেগুলি "জনসঙ্ঘ" দলের প্রার্থীর এবং সেগুলিতে ব্যালট কাগজ ছিল। পরে সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হয়, সেগুলি খালি বাক্স—সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া যাইবার পথে ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়, তবে—ঐ সতর্ক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং ব্যালটবাক্সের অভাবেও কিরূপে নির্ব্বাচন নির্ব্বাহিত হইয়াছিল? যে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি জনসাধারণ সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে?

ইহা ব্যতীত নানা কেন্দ্রে প্রার্থীবিশেষের লোককে বে-আইনী কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল—জাল ভোটার ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল—ইত্যাদি বহু অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

বিহারে অর্থের অপব্যয়—

নানা দিকে আমরা সরকারের অপচয়ের যে সকল সংবাদ পাইতেছি, সে সকলের দীর্ঘ তালিকায় আর একটি সংবাদ যুক্ত হইল। বিহার সরকার পূর্ণিয়ায় কৃষিকার্য্যের জন্য ৪ হাজার একর জমী প্রায় ৫ লক্ষ ৫০

টাকা ব্যয় করিয়া এখন বলিতেছেন—দেখা গেল, জমী বালুময় এবং তাহাতে উর্ব্বরতার উপকরণ নাই।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে কৌতূহল অনুভূত হয়—জমী কাহার নিকট হইতে, কোন্ সূত্রে ক্রয় করা হইয়াছিল? কোন সাধারণ কৃষক যদি এক বিঘা জমী ক্রয় করে, তবুও সে জমীতে ফসল হইতে পারে কি না দেখিয়া তবে তাহার জন্য মূল্য দেয়। বিহার সরকার ৪ হাজার একর জমী সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যে কিনিবার পূর্ব্বে কি জমীর অবস্থা বুঝিবার প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই? যে স্থানে ৪ হাজার বিঘা জমী "পতিত" সে স্থানে যে সন্দেহের কারণ আছে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু টাকাটা যখন পরের তখন সন্দেহের প্রয়োজন কি? সাড়ে ৫ লক্ষ টাকায় জমী কিনিয়া সদাশয় সরকার তাহাতে কৃষিকার্য্যের জন্য ২ লক্ষ টাকা যন্ত্রপাতিতে ব্যয় করিবার পরে বিহার সরকারের বিশেষজ্ঞরা আবিষ্কার করিয়াছেন—সে জমী চাষের অযোগ্য। তবে ইহার পরে জমীতে উর্ব্বরতার ইন্‌জেকশন দেওয়া হইবে কি না তাহা প্রকাশ নাই।

বিহার সরকার হয়ত বাধ্য হইয়া একটা কৈফিয়ৎ দিবেন। কিন্তু এরূপ ব্যাপারের যে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে, তাহা মনে করা যায় না। এইভাবে জনগণের অর্থের অপব্যয় যাহারা করিতে পারে, তাহারা কিরূপ ব্যবহার পাইবার উপযুক্ত?

কেন কেহ এই ব্যাপার ভারত সরকারের পূর্ব্বনির্ম্মিত গৃহের কারখানা সম্পর্কিত ব্যাপারের সহিত তুলনা করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় তুলনা দিবার ব্যাপারের কোন অভাব সরকার রাখেন নাই। ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে পাটের চাষ সম্বন্ধীয় পরীক্ষার কথা, আশা করি, দেশের লোক ভুলিতে পারে নাই।

যে জমী বালুকাময় সুতরাং কৃষিকার্য্যের অযোগ্য তাহার ৪ হাজার একর যে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার কি কোন বিশেষ কারণ নাই। সরকারের ভাণ্ডার হইতে এই সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা কাহার কাহার ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছে এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী (অবশ্য তাহারা বিশেষজ্ঞ) সেই জমীতে চাষের জন্য ২ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করাইয়াছেন? এই সকল কর্ম্মচারীর প্রকাশ্যভাবে বিচার হওয়া কি প্রয়োজন নহে? এই সকল লোক কি সরকারকে মরুভূমিতে টাকা ছড়াইয়া দিতেও প্ররোচিত করিতে পারে না এবং বিহার সরকারের কৃষিবিভাগের দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কর্ম্মচারীরা হয়ত তাহাদিগের প্ররোচনায় প্ররোচিত হইতে পারেন।

যে স্থানে এইরূপ অপব্যয় সম্ভব সে স্থানে যে দেশের ও দশের প্রকৃত উন্নতি সাধনের কোন সম্ভাবনা ও আশা থাকিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। বিহার সরকার এই চাষের অযোগ্য জমীর জন্য যে ২ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কি বিদেশ হইতে ক্রীত ট্রাক্টার অন্তর্ভুক্ত ছিল? যদি থাকিয়া থাকে, তবে এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে হয়—কেন্দ্রী ট্রাক্টার বিভাগ কিরূপ বিচার-বিবেচনা করিয়া—কিরূপ সংবাদে নির্ভর করিয়া বিহার সরকারকে সে যন্ত্র সরবরাহ করিয়াছিলেন?

আমরা কি এমন আশা করিতে পারি না যে, এ বিষয়ে আবশ্যক—নিরপেক্ষ—প্রকাশ্য তদন্ত হইবে এবং কাহারও অপরাধ প্রতিপন্ন হইলে উপযুক্ত দণ্ডবিধান হইবে?

যক্ষ্মা রোগ—

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, কলিকাতায় যক্ষ্মারোগে প্রতিদিন ৮ জনের মৃত্যু হয়। কেবল কলিকাতায় নহে, দার্জ্জিলিংএও এই কালব্যাধির বিস্তার হইতেছে। যক্ষ্মাকে এ দেশে "রাজরোগ" বলা হয়। তাহার অনেক কারণ আছে—(১) ইহা রোগের মধ্যে প্রধান—দুরারোগ্য বা অনারোগ্য, (২) বিস্তার-বিষয়ে ইহার প্রভাব অসাধারণ, (৩) বিলাস-ব্যসনরত রাজারা এই রোগগ্রস্ত হ'ন।

এই দুর্ভাগা দেশে এই রোগে পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার আবশ্যক ব্যবস্থা নাই—হাসপাতালের সংখ্যা অল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে হাসপাতালে অ্যালোপেথী ব্যতীত অন্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা হয়, তাহাতে কোনরূপ সাহায্য প্রদান "পাপ" জ্ঞানে তাহাতে বিরত থাকেন। অথচ রোগীকে স্বতন্ত্র করিয়া যেরূপ সতর্কতাবলম্বন গৃহে—পরিবারের মধ্যে—সম্ভব নহে, সেইরূপ সতর্কতা সহকারে রাখিয়া চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস যে এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, তাহা বলা বাহুল্য। এ দেশের সরকার যে লোককে আবশ্যক আহার্য্য দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব হইবার পরেই তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী অগ্রণী হইয়া যখন নারীদলের সহিত দপ্তরখানার সম্মুখে যাইয়া খাদ্যোপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী করিয়াছিলেন, তখন ডক্টর বিধানচন্দ্র বলিয়াছিলেন, মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ১৬ আউন্স খাদ্য প্রয়োজন। কিন্তু তিনি ৪ বৎসরে লোককে উহা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। আর এই অপূর্ণাহারে যে লোককে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। এই অবস্থা যে যক্ষ্মারোগের প্রকোপবৃদ্ধির কারণ হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। খাদ্যাভাবই রোগবৃদ্ধির প্রধান কারণ। তাহার পর বাস-ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গে—বিশেষ পশ্চিম বঙ্গের সহরে যাঁহারা বস্তীতে বাস করেন, তাঁহাদিগের পরিবেষ্টন কিরূপ অস্বাস্থ্যকর তাহা যেমন বিবেচনার বিষয়, যাঁহারা এক বা দুই কামরায় পাকা বাড়ীতে সপরিবারে বাস করেন; তাঁহাদিগের অবস্থাও তেমনই ভয়াবহ। আবার পুনর্ব্বাসনের সুব্যবস্থা না হওয়ায় পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু পরিবারসমূহের বাস-ব্যবস্থা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শঙ্কিত না হইয়া পারেন না।

সহরে—বিশেষ কলিকাতায় ও উদ্বাস্তু উপনিবেশে বাস-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনে যত বিলম্ব হইবে, ততই যক্ষ্মারোগের ব্যাপ্তি হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রে আশ্রয় হইতে বিতাড়িত একজন নারীর কেওড়াতলা শ্মশানে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণের যে সচিত্র

বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তদপেক্ষাও ভয়াবহ অবস্থার বিষয় আমরা অবগত আছি। কোন যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি আশ্রয়হীন হইয়া গঙ্গার ঘাটে আশ্রয় লয় এবং তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া একটি-তাক্ত ভগ্ন মসজেদে আশ্রয় লইয়া আত্মহত্যা করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিল। সত্যই সত্য উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর হইতে পারে।

যক্ষ্মারোগগ্রস্তদিগের জন্য অধিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও সে সকল আরোগ্যশালায় রোগীদিগের চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন এবং সে কাজ যে সরকারকেই করিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কবে জাতীয় সরকার এ বিষয়ে কর্ত্তব্য পালনে দৃঢসঙ্কল্প হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন?

পরিপূরক খাদ্য—

ভারত রাষ্ট্রে খাদ্যের অভাব ভারত সরকার দীর্ঘ পাঁচ বৎসরেও দূর করিতে পারিলেন না। কিন্তু খাদ্য শস্যের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিপূরক খাদ্যের চাষে খাদ্যাভাব প্রশমিত হইতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে লাভ হয়—তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কলার চাষ ঐ দেশের উত্তর ভাগে সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। নিউ সাউথ ওয়েলসের জলবায়ু কতকটা উষ্ণপ্রধান দেশের জলবায়ু বলা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার সেই অংশে কলার চাষ হয় এবং চাষীরা উৎপন্ন ফলের মূল্যও ভাল পায়। প্রতিবৎসর এই অঞ্চল হইতে কলা মেলবোর্ণ, ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি কেন্দ্রের বাজারেও প্রেরিত হয়। প্রতিবৎসর যে ফল এইরূপে প্রেরিত হয়, তাহার মূল্য প্রায়—৬ কোটি টাকা।

নিউ সাউথ ওয়েলসের কলা চাষীদিগের সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মচারী হিসাব দিয়াছেন—কলা বিক্রয় করিয়া বৎসরে যে ৬ কোটি টাকা আয় হয়, তাহার মধ্যে সাড়ে ৮ কোটি টাকা চাষীরা পায় এবং তাহারা গবাদি পশু পালন, ইক্ষুর চাষ ও বৃক্ষরক্ষা—এ সকলের আয়ের সহিত ঐ আয় সংযুক্ত করে। এই সকল কারণে অষ্ট্রেলিয়ার এই অঞ্চলে কৃষকদিগের আয় অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদিগের আয়ের তুলনায় অধিক।

নিউ সাউথ ওয়েলসের কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞ জানাইয়াছেন, ঐ প্রদেশ হইতে প্রতিবৎসর [illegible] লক্ষ ৫০ হাজার বাক্স কলা রপ্তানী হয় এবং সম্প্রতি তথায় পরীক্ষাক্ষেত্রের যে কলা প্রেরিত হইয়াছে, তাহার এক বাক্সের মূল্য ৬০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ আছে এবং সে বিভাগে বিশেষজ্ঞ হইতে চাপরাশী পর্য্যন্ত বহু কর্ম্মচারীর জন্য বৎসরে ব্যয়ও অল্প হয় না। কিন্তু সে বিভাগ কি কাজের জন্য গৌরবলাভ করিতে পারেন? "ইন্দ্র শাইল" ধান ও "কাকিয়া বোম্বাই" পাট—বহুদিনের কথা।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিবার কথা, অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

[illegible]

জন্য নলকূপ বসাইয়া যে জমীতে এক ফসল হইত, তাহাতে তিন ফসলও ফলাইয়াছেন, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের নিকট সে জন্য টাকা চাহেন নাই! বোধ হয় সেই উক্তিতে কিছু সুফল ফলিয়াছে। কারণ, নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে—গত ২৪ জানুয়ারী প্রকাশ করা হইয়াছে, গত বৎসর হইতে কলিকাতার উপকণ্ঠে পরীক্ষা করিয়া সরকার দেখিয়াছেন—দশ মাসে একই ক্ষেত্রে তিনটি ফসল ফলান সম্ভব—বোরো ধান, আশুধান ও আমন ধান।

রুশিয়ার সরকার বলেন—বিজ্ঞানকে তাহার উচ্চ বেদী হইতে অবতরণ করিয়া কৃষকদিগের মধ্যে আসিয়া তাহার আবিষ্কারের বিষয় প্রচার করিতে হইবে। এ দেশে তাহাই হইতেছে না। কৃষকের দীর্ঘকাল-লব্ধ অভিজ্ঞতাও সরকারের কৃষি বিভাগের গবেষণার ভিত্তি হইতেছে না। সেই জন্যই কৃষির প্রকৃত উন্নতিসাধন সম্ভব হইতেছে না—কৃষিকার্য্য গবেষণাগার হইতে ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না।

দেখা যাইতেছে, এ দেশে ব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতি। সাহস করিয়া দৃঢ়তা সহকারে সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—নহিলে আর কিছুই হইবে না হইবে কেবল—অর্থব্যয়—অপব্যয়।

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন—

এখনও পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন-রঙ্গমঞ্চে যবনিকাপাত হয়নাই; সুতরাং শেষ ফল সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা সঙ্গত হইবে না। তবে বুঝা গিয়াছে, নির্ব্বাচনশেষে যখন আবার অভিনয় হইবে তখন অনেক পরিচিত মুখের স্থান নূতন মুখ গ্রহণ করিবে। সচিব সঙ্ঘের সচিবদিগের মধ্যে পক্ষাঘাতে পঙ্গু অর্থ সচিব নির্ব্বাচনপ্রার্থী হ'ন নাই; কিন্তু লোক বলিতেছে, তিনি ৩ বৎসরকাল প্রায় উত্থানশক্তি রহিত থাকিলেও স্বয়ং যেমন সচিবত্ব ত্যাগ করেন নাই তেমনই প্রধান সচিব বা গভর্ণরও তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই, তেমনই তাঁহাকে হয়ত ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত করিয়া ঐ পদেই বহাল রাখা হইবে অর্থাৎ যাবজ্জীবন সচিবত্বের সুযোগ দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট সচিবদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সচিব-চতুষ্টয়ের নির্ব্বাচনফল এখনও জানা যায় নাই—

রাজস্ব সচিব কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ
শিক্ষা সচিব রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
সেচ সচিব ভূপতি মজুমদার
মৎস্য সচিব হেমচন্দ্র নস্কর

নিম্নলিখিত ৮ জন সচিব পরাভূত হইয়াছেন।

(১) স্বরাষ্ট্র সচিব কালীপদ মুখোপাধ্যায়। ইনি বজবজ কেন্দ্র হইতে প্রার্থী ছিলেন এবং নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 'কোমাগত মারু' যাত্রী নিহত শিখদিগের স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন। কমুনিষ্ট প্রার্থী বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় উঁহাকে পরাভূত করেন। এই মুখোপাধ্যায় বনাম মুখোপাধ্যায় ব্যাপারে বঙ্কিমবাবু ১৩,১৭১টি ও কালীপদবাবু ৬,৩৩৫টি ভোট পাইয়াছেন।

(২) খাদ্যসরবরাহ-সচিব নিকুঞ্জ মাইতী। ইনি পটাশপুর কেন্দ্রে

(মেদিনীপুর) প্রার্থী ছিলেন এবং জনার্দন সাহুর দ্বারা পরাভূত হইয়াছেন। জনার্দনবাবু—২২,৩৮৩টি ও নিকুঞ্জবাবু ৭,৬১৭টি ভোট পাইয়াছেন। জনার্দনবাবু তমলুক ময়না যোগদা ব্রহ্মচর্য্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড-মাষ্টার এবং নব-প্রতিষ্ঠিত "জন সঙ্ঘের" মনোনীত প্রার্থী ছিলেন।

(৩) খাদ্য ও কৃষি-সচিব প্রফুল্লচন্দ্র সেন। ইনি আরামবাগ নির্ব্বাচনকেন্দ্রে স্বতন্ত্র (বামপন্থীদিগের দ্বারা সমর্থিত) প্রার্থী ডক্টর রাধাকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণবাবু ১৮,৪৩৪টি ও প্রফুল্লবাবু ১৭,৩০৯টি ভোট পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রধান-সচিব ও অর্থ-সচিব দুই জনকে বাদ দিলে সচিবসঙ্ঘে খাদ্য ও কৃষি-সচিবের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

(৪) আইন-সচিব নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। ইনি মহেশতলা (২৪ পরগণা) নির্ব্বাচনকেন্দ্রে কম্যুনিষ্ট প্রার্থী সুধীরচন্দ্র ভাণ্ডারী কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। সুধীরবাবু ৬,৩১৪টি ও নীহারেন্দুবাবু ৬,৪৫১টি ভোট পাইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ৪ জন সচিবের সাফল্য-সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে :—

(১) আবগারী-সচিব (তপশিলী) শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ

(২) স্থানীয়-স্বায়ত্ত-শাসন-সচিব যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা

(৩) সমবায়-সচিব ডক্টর আমেদ

(৪) প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়

দেখা যাইতেছে, যে সকল সচিবের সহিত লোকের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ তাঁহারাই পরাভূত হইয়াছেন।

ডক্টর রায় কলিকাতা বহুবাজার নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১৩,৯১০টি ও তাঁহার প্রতিযোগী (মার্কসিষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক) সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৯,৭৯৯টি ভোট পাইয়াছেন। কংগ্রেস পক্ষ বিধানচন্দ্রের নির্ব্বাচনকেন্দ্রে যাহাকে "অষ্টবজ্র সম্মিলন" বলে তাহাই করিয়াছিলেন, বলা যায়। সুতরাং যে কংগ্রেসের অধীনে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান এবং হস্তে ক্ষমতা ও অর্থ আছে সেই কংগ্রেসের প্রধান-সচিবের জয়ে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

যে দল কংগ্রেসেরই "ভাঙ্গা দল" বলা যায় সেই "কৃষক মজদুর-প্রজা" দলের পশ্চিমবঙ্গ নির্ব্বাচনে শোচনীয় পরাভব হইয়াছে ; দলটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কারণ :—

(১) দলের দলপতি ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেলিয়াঘাটা কেন্দ্রে (মার্কসিষ্ট ফরওয়ার্ডব্লক দলের প্রার্থী) সুহৃদকুমার মল্লিক চৌধুরী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। সুধীরবাবু ৫,২৮৮ ও সুরেশবাবু ৪,৬৩০টি ভোট পাইয়াছেন। মধ্যে স্বতন্ত্রপ্রার্থী বিধুভূষণ সরকার ৫০০৭টি ভোট পাওয়ায় সুরেশবাবু তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কেবল এই কেন্দ্রেই কংগ্রেস দল কোন প্রার্থী মনোনীত করেন নাই। অনেকের বিশ্বাস, কংগ্রেস দল বিধুভূষণবাবুকেই সমর্থন করিয়া "সাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে" নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন এবং বিধুভূষণবাবুর পরাজয় পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের পরাজয়।

এই স্থানে বলা প্রয়োজন, "মার্কসিষ্ট ফরওয়ার্ডব্লক" দল কম্যুনিষ্ট দলের সহিত নির্ব্বাচনী মিলন করিয়াছিলেন।

(২) দলের অন্যতম মণ্ডল প্রাক্তন প্রধান-সচিব ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ উত্তর টালিগঞ্জ নির্ব্বাচনকেন্দ্রে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন (কংগ্রেস) কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। প্রিয়রঞ্জনবাবু ৬,২৮৫টি ও প্রফুল্লবাবু ৫,৬৪৬টি ভোট লাভ করেন।

এই কেন্দ্রে শ্রীমতী লীলা রায়ও ("সুভাষিষ্ট ফরওয়ার্ডব্লক" দলের) প্রার্থী ছিলেন ; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে কিছুদিন পূর্ণোদ্যমে নির্ব্বাচনী কাজ করিতে পারেন নাই।

(৩) অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ঘাটাল (মেদিনীপুর) নির্ব্বাচনকেন্দ্রে কম্যুনিষ্ট প্রার্থী যতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। যতীশবাবু ২১,৪২৮টি ও অন্নদাবাবু ৯২০৩টি ভোট পাইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সচিব-সঙ্ঘে সুরেশবাবু ও অন্নদাবাবু উভয়েই সচিব ছিলেন।

কৃষক মজদুর-প্রজা দলের নির্ব্বাণ লাভের কারণ এই যে, এ দলের কর্ত্তারা যতদিন সম্ভব কংগ্রেস ত্যাগ না করিয়া কেবল কংগ্রেসের কলঙ্ক প্রক্ষালনের কথাই বলিয়াছিলেন এবং পরে যখন তাঁহারা স্বতন্ত্র দল গঠন করেন তখনও বামপন্থী সম্মিলন তাঁহাদিগের জন্যই হইতে পারে নাই। কারণ, তাঁহারা তাঁহাদিগের দলের জন্য অতিরিক্ত অধিক প্রার্থী মনোনীত করিবার দাবী করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, পরন্তু কম্যুনিষ্ট দলের সহিত কোনরূপ মিলনে অসম্মত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত কারণে অনেকে তাঁহাদিগকে ছদ্মবেশী কংগ্রেস দলীয় বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাও নহে এই দলের কর্ত্তারা যখন সচিব ছিলেন, তখন তাঁহারা—

(১) নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন ;

(২) ঐ আইনের প্রতিবাদে সমবেত জনতাকে তৃষ্ণার জল প্রদানকারী সেবাব্রত শিশিরকুমার মণ্ডল পুলিসের গুলীতে নিহত হ'ন ;

(৩) বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু-সমস্যা নাই—তাঁহারা (ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হইলেও) পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দুদিগকে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে দিবেন না ;

(৪) খাদ্য সমস্যার সমাধান ও চোরা বাজারের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই।

আমাদিগের লিখিবার সময় (১৫ই মাঘ) পর্য্যন্ত কংগ্রেস দলের ৪ জন সচিবের পরাভবই উল্লেখযোগ্য নহে। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে সে দলের মনোনীত প্রার্থীদিগের পরাভব ঘটিয়াছে এবং তাঁহাদিগের পরাভব নিবারণের জন্য দলের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কয়টি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য—

(১) যদিও কংগ্রেস জমীদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তথাপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারে জমীদার সচিবের অভাব নাই এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটী পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বপ্রধান জমীদার বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহাতাবকে মনোনয়ন দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি

বর্দ্ধমানেই কম্যুনিষ্ট প্রার্থী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। বিনয়কৃষ্ণ ১১,৪৩২টি ও মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ ৯,৪৭৭টি ভোট পাইয়াছেন। শুনা যায়, কংগ্রেসী সরকার কর্ত্তৃক বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল স্কুল বন্ধ করা ও হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা হ্রাস করা—এই দুই কারণেও বর্দ্ধমানের নির্ব্বাচকরা বিরূপ হইয়াছিলেন।

(২) মহিষাদল কেন্দ্রে কুমার দেবপ্রসাদ গর্গের অসাধারণ সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। দেবপ্রসাদ ২৫,৮১৩টি ভোট পাইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস মনোনীত সুশীলকুমার ধাড়া ৭,১১৫টি ভোট পাইয়াছেন। অথচ কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে তথায় প্রচারে কোনরূপ কার্পণ্য হয় নাই। কি কারণে দেবপ্রসাদ স্বতন্ত্র প্রার্থী হইয়াছিলেন, আশা করি তাহা বিধান বাবুর অগোচর নাই।

(৩) সাঁকরাইল (হাওড়া) কেন্দ্রে ("মার্কসিষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক" দলের) কানাইলাল ভট্টাচার্য্য কংগ্রেসী দলের চীফ হুইপ সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও কৃপাসিন্ধু শাহ কংগ্রেসী অরবিন্দ গায়েনকে পরাভূত করিয়াছেন। কানাই বাবু ২৭,০৮৭টি ও সুশীল বাবু ১৬,২৭০টি ভোট পাইয়াছেন এবং কৃপাসিন্ধু বাবু ২১,৮০৭টি ও অরবিন্দ বাবু ১৫,৩০৭টি ভোট পাইয়াছেন। সাঁকরাইল কেন্দ্রে বামপন্থী সম্মিলনের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী সুবোধচন্দ্র চৌধুরীর নির্ব্বাচন বর্জ্জন যে কানাই বাবুর সাফল্যে সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বামপন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেসী প্রার্থীদিগের সাফল্যের কারণ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, যে সকল ভোট তাঁহাদিগের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে, কংগ্রেসী প্রার্থীদিগের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অল্প। দিল্লীর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ইহাই দেখা গিয়াছিল।

১৪ই মাঘ পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের নির্ব্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যাধিক্য থাকিলেও কংগ্রেসী দল যে বহুপরিমাণে লোকের আস্থা হারাইয়াছে, তাহা নির্ব্বাচনফলে সপ্রকাশ।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রধানতঃ ২টি দল দেখা গিয়াছে :—

(১) কংগ্রেসী

(২) কম্যুনিষ্ট

পূর্ব্বেই বলিয়াছি "মার্কসিষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক" নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট দলের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন।

প্রায় ৭০ বৎসরের সম্ভ্রম, সমগ্র শাসন-যন্ত্রের ক্ষমতা, অজস্র অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন, বিদেশের শুভেচ্ছা, অনুশীলনতীক্ষ্ণ প্রচার-নৈপুণ্য প্রভৃতি লইয়া কংগ্রেস দল যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহার পার্শ্বে কম্যুনিষ্ট দলের সাফল্য লক্ষ্য করিবার বিষয়—উপেক্ষনীয় ত নহে। ইহা কি ইংরেজীতে যাহাকে signs of the times বলে অর্থাৎ কালের গতি ও নিয়তি? দিব্য দৃষ্টিতে কি স্বামী বিবেকানন্দ অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে এই নিয়তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সমসাময়িক ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে "দশ হাজার

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক, কোদাল ধরে, চাষার কুটী ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে। * * * অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভারত।"

নির্ব্বাচন—

ভারত রাষ্ট্রে কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস আপনাকে একটি দলে পর্য্যবসিত করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বর্ত্তমান সরকারের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা বলিয়া সেই দলের নেতৃত্ব তাঁহার মন্ত্রিত্বের সহিত সংযুক্ত করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রে যে নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাও সরকারী প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব হয় নাই—হইতে পারেও না। কারণ, যদিও পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম্মভীরু গভর্ণর তাঁহাকে গভর্ণরের যান ব্যবহার করিতে দেন নাই, তথাপি তিনি সরকারী বিমান ব্যবহার করিয়াছেন সরকারের পুলিস তাঁহার আগমন নির্গমনকালে ও সভায় তাঁহাকে বিপন্মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহার সফরের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং কোথায় জওহরলালের মন্ত্রিরূপ শেষ হইয়াছে এবং কোথায় তাঁহার কংগ্রেস সভাপতিরূপ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর।

ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন, "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।" পণ্ডিত জওহরলাল বিস্তর কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার উক্তিতে যদি সত্যের সহিত মিথ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে মিশ্রিত হইয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তিনি কংগ্রেসের কীর্ত্তি বলিয়া যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলের গৌরবই কংগ্রেস পাইতে পারে কি না, সে বিষয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ থাকিতে পারে। কংগ্রেসকে যে অবাধ প্রচার কার্য্য পরিচালিত করিতে হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, দেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে কংগ্রেসের প্রতি লোকের যে আস্থা ছিল, এখন আর তাহা নাই। ইহার প্রথম কারণ—ফ্রান্সের কথায় ডরমান লিখিয়াছেন—

It "is usual in France that when national affairs are unsuccessful a great outcry arose, not only against the men who had jobbed and blundered, but against the system under which they worked."

অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না করা, চিকিৎসা-ব্যবস্থা জাতীয় করণে অক্ষমতা, জমীদারী প্রথা বিলোপ করার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, মুদ্রামূল্য হ্রাস করা, বিদেশী কোম্পানীগুলির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, কাশ্মীর হইতে অনধিকার প্রবেশকারীদিগকে বিতাড়নে অক্ষমতা, শাসনের ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্কোচন, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনে অব্যবস্থা—এ সকল অভিযোগ বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত

সে অভিযোগ যে মিথ্যা সরকার তাহা বলিতে পারেন নাই।

কংগ্রেসের হস্তে ক্ষমতা, ব্যবস্থা ও অর্থ তিনটি থাকিলেও যে বহু ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মনোনীত নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগের জনমতে পরাভব ঘটিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোথাও বা কংগ্রেস দলের পক্ষে—সংখ্যাল্পতা হেতু সচিবসঙ্ঘ গঠন অসম্ভব হইয়াছে, কোথাও বা কংগ্রেস দলকে সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ-গঠন করিয়া অন্যান্য দলের লোককে গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বহু ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা, সচিবরা, কংগ্রেস সমিতির কর্ত্তারা পরাভূত হইয়াছেন। অবস্থা দেখিয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পণ্ডিত জওহরলাল মাদ্রাজে কংগ্রেস সমিতির কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন—কেন এমন হইল। কেন এমন হইল, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইবার কথা নহে। নির্ব্বাচন শেষ হইলে নিশ্চয়ই সে বিষয় আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় আসিবে।

কংগ্রেস যে মনোনীত প্রার্থীদিগের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে দিন পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই দিন সেই আইনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডক্টর আম্বেদকার বলিয়াছেন :—

"নির্ব্বাচনে বিপুল ব্যয় হইবে। আমার ভয় হয়, বড় বড় ব্যবসায়ীরাই নির্ব্বাচিত হইবেন। অন্ততঃ পার্লামেণ্টে তাহাই হইবে।"

যিনি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারই উক্তি। আইনে—প্রার্থীর পক্ষে কত ব্যয় করা অধিকার-বহির্ভূত নহে, তাহার উল্লেখ আছে, আর দলের পক্ষে অবাধ ব্যয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোন্ দল অবাধে ব্যয় করিতে পারেন? স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে নির্দ্দিষ্ট ব্যয় করাও যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব, তাহা দেশে লোকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। যে সকল প্রার্থী অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করেন, তাঁহারা হয় অবিবেচনার কাজ করেন, নহেত তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যের সাধুতায় সন্দেহ থাকিতে পারে। মালহোত্র মহাশয় বলিয়াছেন, দিল্লীতে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে সম্পর্কে ৪৭টি নির্ব্বাচনকেন্দ্রে নির্ব্বাচন প্রার্থীরা মোট অন্ততঃ ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কি ভয়ানক কথা! তবে ব্যবস্থাপরিষদে ও পার্লামেণ্টে ব্যয় কিরূপ হওয়া অনিবার্য্য? দিল্লীর নির্ব্বাচনেও ভোটের কাগজ বিক্রয় হইয়াছিল! সমগ্র দেশে দুর্নীতি ব্যাপ্ত হইয়াছে।

স্থানাভাবে আমরা এ বার মালহোত্র মহাশয়ের হিসাব উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। কিন্তু সে হিসাব যে সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে সকল প্রার্থী স্বয়ং নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ের অধিক ব্যয় করেন, তাঁহারাও অবশ্য তাহা স্বীকার করেন না, সুতরাং মিথ্যা হিসাব দাখিল করেন—দুর্নীতিদুষ্ট পথে নির্ব্বাচনের দিকে অগ্রসর হ'ন। ইহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে।

বলিয়াছি, দলের পক্ষে অবাধ ব্যয়ে বাধা নাই। দেশে কোন্ দল প্রবল, তাহা যেমন দিল্লীর মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে দেখা গিয়াছিল, তেমনই পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচনকালে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে কৃষক মজদুর-প্রজা দল কংগ্রেস দলের রূপান্তর বলা যায় তাহার ধনশালী বলিয়া খ্যাতি নাই। হিন্দু মহাসভায় দল ও রামরাজ্য পরিষদ গুরুত্বে উপেক্ষণীয়। যে দলকে পণ্ডিত জওহরলাল নির্ব্বাচনী বক্তৃতাসমূহে অশিষ্টভাবে আক্রমণ করিয়া গাত্র-দাহের পরিচয় দিয়াছেন, সেই জনসঙ্ঘ কেবল গঠিত হইতেছে—তাহার গুরুত্ব অর্থে নহে, মতে কি না তাহা পরে দেখা যাইতে পারে। সুতরাং অবশিষ্ট কেবল কংগ্রেস দল। কংগ্রেসের দলে যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন, এ বারও যদি কংগ্রেস দল জয়লাভ করে তবে তিনি দলকে দুর্নীতিমুক্ত করিবেন। অবশ্য নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে নাই, তাহা সকলেই অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতাফলে বুঝিয়াছেন।

কংগ্রেস দল যে ধনী ব্যবসারী প্রভৃতির দ্বারা সমর্থিত, তাহা অজ্ঞাত নাই। বিড়লার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া যে পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহা উপন্যাসেরই মত বিস্ময়কর। পশ্চিমবঙ্গে কোন কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী প্রকাশ্যভাবেই বলিয়াছিলেন, যাহারা লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারে, কংগ্রেস দল এমন লোক বাছিয়া মনোনয়ন দিয়াছেন। সে কথা হয়ত অতিরঞ্জিত। তবে পশ্চিমবঙ্গের কোন প্রার্থী (আমরা নাম প্রকাশে বিরত থাকিলাম) প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে মনোনয়নের জন্য লক্ষ টাকাই কংগ্রেসী দল চাহিয়াছিলেন এবং সে কথা তিনি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে জানাইয়া "স্বতন্ত্র" হিসাবে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তিনি সাফল্যলাভও করিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গে কংগ্রেস জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের প্রতিশ্রুতি থাকিলেও বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহাতব (ইনি পরাজিত হইয়াছেন) রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, কৃষ্ণদাস রায় প্রভৃতি বড় বড় জমীদার মনোনয়ন লাভ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস দল অর্থের অপব্যবহার করিয়াছেন, এমন কথা আমরা বলিতেছি না বটে, কিন্তু বহু কংগ্রেসী (কোন কোন অকংগ্রেসীও) প্রার্থীর ব্যয় বাহুল্য অনেকের বিস্ময়ের ও সন্দেহের কারণ হইয়াছে।

নির্ব্বাচনের পরে নানা স্থানে (বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে) ভোট গণনায় বিলম্ব অনেকের সন্দেহ উদ্দিক্ত করিয়াছে। লোকাভাবে ভোট গণনায় বিলম্বের যুক্তি হাস্যোদ্দীপক। ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনা—ইহার মধ্যবর্ত্তীভাগে যে বাক্সগুলি কংগ্রেসী সরকারের ব্যবস্থায় ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

কোন কোন স্থানে বাক্স ভাঙ্গা ও খোলা অবস্থায়ও পাওয়া গিয়াছে। তাহার কারণ কি?

যে সকল সচিব নির্ব্বাচনে পরাভূত হইয়াছেন, তাঁহারা পদত্যাগ করুন, এই দাবী করা হইয়াছে। অর্থাৎ নির্ব্বাচনে পরাভব ও নূতন সচিবসঙ্ঘ গঠন, ইহার মধ্যবর্ত্তীকালে যেন তাঁহারা চাকরী বা ঠিকা দেওয়া, পার্মিট প্রদান প্রভৃতি করিতে না পারেন। সে বিষয়ে সরকার কি করিবেন, জানা নাই। এই দাবীর মূলে যে অনাস্থা ও অনাস্থাজনিত সন্দেহ রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। আর যে সকল সচিব নির্ব্বাচনে পরাভূত হইয়াছেন, তাঁহারা আত্মমর্য্যাদার গৌরব রক্ষার্থ এখনই পদত্যাগ করিবেন কি না, তাহাও দেখিবার বিষয়। যদি তাঁহারা পদত্যাগ করেন, তবে মধ্যবর্ত্তী

কালের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণরকেই বিভাগীয় কর্মচারীদিগের দ্বারা কার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে। নির্ব্বাচনে পরাভূত সচিবরা কি কংগ্রেসেও তাঁহাদিগের পূর্ব্বাধিকৃত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন?

পাকিস্তানী অত্যাচার—

পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা পূর্ব্বেরই মত পশ্চিমবঙ্গে—বিশেষ সীমান্তস্থিত স্থানসমূহে—অত্যাচার করিতেছে। তাহারা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসিয়া ভারত রাষ্ট্রের প্রজাদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে—গবাদি পশু সুবিধা পাইলেই ধরিয়া লইয়া যায়—ইত্যাদি। প্রকাশ, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা ভারত রাষ্ট্রের ভোটার তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ভোট দিতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে শূন্য হস্তে যায় নাই—"যাহা পাই তাই ধরে নিয়ে যাই" নীতির অনুসরণ করিয়া পরদ্রব্যাপহরণ ও পরধনলুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সীমান্তের কোন কোন স্থানে ইহাদিগের অত্যাচার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রবল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে এইরূপ অত্যাচার হইতে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। প্রজার ধন প্রাণ মান নিরাপদ রাখা যে সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য। যে সরকার—যে কোন কারণেই কেন হউক না—ঐ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন না, সে সরকার কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'ন। পাকিস্তানী প্রজাদিগের এইরূপ অত্যাচার যে পাকিস্তান সরকার কর্ত্তৃক প্রণোদিত এমন মনে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সেই জন্য মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইলে পাকিস্তান সরকারই পাকিস্তানী প্রজাদিগকে সংযত রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। তবে পূর্ব্ববঙ্গে হক্ত মুসলমানাতিরিক্ত প্রজাদিগের অবস্থা যে শোচনীয় সেজন্য পাকিস্তান সরকারকে দায়ী না করিয়া পারা যায় না। ইহা যে তাঁহাদিগের অমুসলমান বিতাড়ন ও দমন নীতির অভিব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতে তাঁহাদিগের অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের অবস্থারই মত—ভারত সরকার তাহার প্রতীকার করিতে পারে না! ইহা কি প্রতিশ্রুতিপালন?

কাশ্মীর-সমস্যা—

কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হইতেছে না—সমাধানের অন্তরায়—বিদেশে জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতা। ভারত রাষ্ট্রের সেনাবল যখন সে সমস্যার সমাধান অদূরবর্ত্তী করিয়াছিল, তখনই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আপোস মীমাংসার আগ্রহে জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতা চাহিয়াছিলেন। আবার যখন জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধি কাশ্মীরে পাকিস্তানীদিগকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া রায় দিয়াছিলেন, তখনও ভারতরাষ্ট্র অনধিকার-প্রবেশকারীদিগকে বিতাড়িত করিবার অধিকার চাহেন নাই—তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিতে বলেন নাই। ফলে অনধিকার-প্রবেশকারীরা যে অংশ অধিকার করিয়াছিল সে অংশে রহিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে আপনাদিগের অধিকার দৃঢ় করিতেছে। ইহার পরে গণভোটের সার্থকতা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধির পর প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন—প্রতিনিধির রিপোর্ট পেশ হইতেছে—কেবলই কালবিলম্ব হইতেছে। লর্ড ইস্মে কমনওয়েলথ ব্যাপারে বৃটেনের সেক্রেটারী অব ষ্টেট। তিনি বলিয়াছেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘ অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছেন, সুতরাং বিবদমান পক্ষদ্বয় যাহাতে উভয় পক্ষ শীঘ্র একযোগে কাজ করিতে পারেন, এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু বাহির হইতে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া অসঙ্গত। অথচ জাতিসঙ্ঘের মীমাংসাও কি তাহাই হইবে না?

এ স্থলে উভয় পক্ষের কথা উঠে কেন? যখন জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধি পাকিস্তানীদিগকে কাশ্মীরে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়াছেন, তখন জাতিসঙ্ঘ কি তাহাদিগকে কাশ্মীর ত্যাগ করিতে বলিবেন না?

জাতিসঙ্ঘ হয়ত প্রতিনিধির কাজে আরও বিলম্ব করিবার ব্যবস্থা করিবেন। তাহা ভারত রাষ্ট্রের অনিষ্টকরই হইবে।

মিশর—

কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির অবস্থায় রহিয়াছে। পারস্যের বিবাদের প্রাবল্য হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু মিশরে অবস্থা অন্যরূপ। তথায় মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের অগ্নির দাহিকা শক্তি অনুভূত হইতেছে এবং অন্তর্বিপ্লবেরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মিশরের রাজা প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে নূতন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী প্রথমেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তিনি বৃটেনের সহিত কোনরূপ চুক্তিতে বদ্ধ হইবেন না। ইহাতে বিক্ষুব্ধ দল তুষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে কি চুক্তি অনিবার্য্য নহে? অবশ্য সে চুক্তি যাহাতে দেশের পক্ষে কোনরূপ অনিষ্টের কারণ না হয় অথচ দেশের সম্ভ্রম কোনরূপ ক্ষুণ্ণকারী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে মনে হয় বারুদের স্তূপ রহিয়াছে—যে কোন মুহূর্ত্তে, যে কোন স্থান হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গপাতে বিষম ব্যাপার ঘটিতে পারে। সেই জন্যই আশঙ্কার কারণ ছিল, কোরিয়ার গৃহ-যুদ্ধ হয়ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করিবে। সকল রাষ্ট্রই সেইরূপ যুদ্ধের আশঙ্কায় যথাসম্ভব সংযত হইয়া কাজ করিতেছে। কিন্তু সংযম যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয়, তাহাও নহে। সেই জন্য আজ কেবল প্রাচীর নহে, পরন্তু প্রাচীর ও প্রতীচীর দৃষ্টি মিশরে নিবদ্ধ হইয়াছে—কি জানি মিশরের ব্যাপার আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে পরিণত না হয়।

মিশরের ব্যাপার যে জটিল হইয়া উঠিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১২ই মাঘ, ১৩৫৮ সাল।

চিকিৎসা-বিভ্রাট

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

[রোগ শয্যায় স্বামী শায়িত। শয্যা মোটা, কিন্তু মাটির উপর বিছানো। স্ত্রী বিরক্ত মুখে পাশে একটি শয্যায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় উপবিষ্ট। ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারের সুট পরণে, সেজন্য পূর্ব হইতেই সেখানে একখানি চেয়ার রক্ষিত ছিল। ডাক্তার বসিবার পূর্বে একবার উভয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন]

স্ত্রী। বসুন। চেয়ার দেয়া হয়েছে দেখতে পারছেন না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি এত দেখছেন?

ডাক্তার। (একটু বিস্মিতভাবে রোগীর স্ত্রীর দিকে ভাল ভাবে চাহিয়া) কে রোগী তাই দেখ ছিলাম।

স্ত্রী। কে রোগী?—সকাল থেকে রুগীর পি—পত্যির যোগাড় করে এই একটু এসে বসেছি—আমাকে দেখে রোগী বলে মনে হয়!

ডা। ওঃ আপনি রোগীর পি—পত্যির যোগাড় করছিলেন? ছেলেপুলে নেই!

স্ত্রী। ওসব গুষ্টির খবর পরে নেবেন, এখন রুগী দেখুন।

ডা। (রোগীর দিকে ফিরিয়া) আপনিই রোগী তাহলে?

স্ত্রী। কেন বিশ্বাস হল না?

ডা। (নীরবে পরীক্ষা করিয়া) কিসে কষ্ট হয় বলুন তো?

রোগী। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আজ্ঞে বাঁচতে।

ডা। ভাববেন না, এ কষ্ট বেশী দিন থাকবে না।

স্ত্রী। (ক্রুদ্ধস্বরে) তার মানে?

ডা। (নিস্পৃহভাবে) এভাবে থাক্‌লে বেশী দিন এ কষ্ট থাকবে না এই আর কি!

স্ত্রী। ওঃ তাই বলুন। ঠিক বলেছেন। এমন অবুঝ হাড়-জ্বালানো মানুষ আর কোথাও পাবেন না। সকাল থেকে দু বার খাবার পাঠিয়েছি দু বারই থুঃ থুঃ করে ফেলে দিয়েছে। হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে।

ডা। (নিস্পৃহভাবে স্ত্রীর পানে চাহিয়া) কেন জ্বালিয়ে খান কেন, কাঁচা খেতে পারেন না?

স্ত্রী। (উঠিয়া বসিয়া) কাঁচা খাবে মানে?

ডা। আমরা এসব রুগীকে র মিট জুস্ খেতে দিই,—এত জানেন আর এটা জানেন না? (স্ত্রী কিছু বলিবার পূবে রোগীকে লক্ষ্য করিয়া) সাবু বার্লি ফেলে দেন?

রো। কি করব? খেয়ে মরব? প্রথমে চিনি দিয়ে বার্লি খেতে চাইলাম—এল নুনে পোড়া।

স্ত্রী। বটে আমার কুচ্ছ করা হচ্ছে? আবার বলা হয় কুচ্ছ করিনে? কুচ্ছ করেন না, গুষ্টির পিণ্ডি করেন। চিনির বদলে ভুলে দু চামচ নুন দিয়েছিলাম। তার পরে যে সাবু পাঠালাম সেটা কেন রুচল না—তা বলে ম—কুচ্ছ শেষ কর।

ডা। সাবু কেন খান নি?

স্ত্রী। সুধু খায়নি তা নয়, সাবুর বাটি উপুড় করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমি যাই স্ত্রী তাই এখনও রইচি। অন্য স্ত্রী হলে মুখে আগুন জেলে দিয়ে—

ডা। সাবুও ফেলে দিয়েছিলেন?

রো। আজ্ঞে, আমি যাই তাই—বাটিটা খালি করে দিয়েছিলাম। আপনি হলে বাটিটা ছুঁড়ে মাথাটা ফাটিয়ে দিতেন!

স্ত্রী। (নিকটে একটি বরফ ভাঙ্গিবার মোটা লোহা ছিল তাহা লইয়া) মাথা ফাটাবে? এস না মাথা ফাটানোর মজা দেখাই।

ডা। বাঃ এই তো আপনি বেশ চিকিৎসা জানেন—তবে আমাকে কেন মিছামিছি ডাকা? তাহলে আমি যাই।

স্ত্রী। অমনি গেলেই হ'ল। যাও দিকি চিকিৎসা না করে একবার দেখি। এসেছ যখন একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাও। আমিও দায়ে খালাস হই।

ডা। ওঃ তাই। (রোগীকে) তা আপনি সাবু ফেলে দিলেন কেন?

রো। আজ্ঞে তাতে সাবু ছিল না—একেবারে লঙ্কা গোলা জল।

ডা। (রোগীর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া) তাই নাকি ?

স্ত্রী। মুখে আগুন—ভুল কি কারো হয় না ? সাবুটা দিতে ভুলেছিলাম—আর খেতে ভাল হবে বলে শুকনো আমসী গুঁড়ো দেব ভেবেছিলাম। পোড়া মনের ভুলে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছিলাম। ভুল না হয় হয়েছিল, তা বলে অত ?

ডা। ঠিক তো। অতঃপর এতটুকু আর সইতে পারলেন না ? আর কদিন ?

স্ত্রী। কদিন মানে ? বেঁচে আমায় এতদিন জালিয়ে আবার মরে জালাবে ভেবেছ। তুমিও তো কম মুখপোড়া নও দেখছি।

রো। (হতাশভাবে) ডাক্তারবাবু আমি রোগ সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই। নইলে চিকিৎসা বৃথা।

ডা। (স্ত্রীর দিকে চাহিয়া) তা হলে আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আমি কোন 'কুচ্ছো' করতে দেব না। ভয় নেই।

স্ত্রী স্বামীর পানে কটমট করিয়া চাহিতে চাহিতে বাহিরে গেল।

রো। ডাক্তার, আমায় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। তবু একটু শান্তিতে মরব।

স্ত্রী। (অধীরভাবে) হোলো, তোমাদের কথা হোলো।

ডা। হ্যাঁ, হয়েছে। এবার চলুন ঐ ঘরে। আপনাকে দুটো কথা বলে যাই রোগী সম্বন্ধে।

স্ত্রী। (অন্য ঘরে আসিয়া) কি বলবে বল ?

ডা। বলি—হাঁ। ভাল কথা, ফি কে দেবে ?

স্ত্রী। আমি আমি। আর কোন যমে দেবে! কত ফি !

ডা। চৌষট্টি টাকা।

স্ত্রী। চৌ-ষ-ট্টি। একেবারে পুরোপুরি শ' করতে পার নি ? মরণ আর কি! ডাক্তারেরও মরণ নেই! (আঁচল হইতে নোট ও টাকা বাহির করিয়া গণিয়া)—এই নাও! ধর! হাঁড় ভরেছে তো ? এখন কি করতে হবে বল ?

ডা। (একবার স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া) এত ঝকি কেন সহ্য করছেন। দিন এঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে।

স্ত্রী। হাসপাতালে! আমার সোয়ামি যাবে হাসপাতালে! তোমার আস্পর্দ্ধা তো কম নয় ডাক্তার! কেন আমি কি মরিছি। আমার টাকা নেই ? ওই মুখপোড়া বুঝি বলেছে ?

ডা। না, এই মুখপোড়াই বলেছে।

স্ত্রী। এই পরামোর্শো দেবার জন্য তোমায় ডাকা হয় নি। কড়কড়ে চৌষট্টি টাকা পকেটে পুরেছ। ভাল চাও তো ওষুধ দাও। আর একটা ভাল পরামোর্শো দিয়ে যাও।

ডা। ও: আচ্ছা, তাই দিয়ে যাচ্ছি। (গম্ভীরভাবে) দেখুন আপনার স্বামীর এখন প্রয়োজন পরিপূর্ণ শান্তি আর বিশ্রাম। (ব্যাগ খুলিয়া) এই কটা ঘুমের ঔষধ রইল।

স্ত্রী। (শান্তভাবে) এখন পথে এস। তা কখন্ কখন্ খাওয়াব বললে না তো ?

ডা। খাওয়াতে হবে না, আপনাকে খেতে হবে। আপনি ঘুমুলে তবে না উনি একটু শান্তি পাবেন।

[ব্যাপারটা বুঝিতে রোগীর স্ত্রীর একটু সময় লাগিল। কিছুটা বুঝিতেই রোগীর স্ত্রী যখন উগ্র মূর্তিতে বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিল ডাক্তারের গাড়ী তখন স্টার্ট দিয়াছে। গতিশীল মোটরের শেষ শব্দটুকু গতিহতার নিষ্ফল ক্রোধকে যেন উপহাস করিয়া মুহূর্তে দৃষ্টি পথের বাহির হইয়া গেল।]

রামপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক ও ভক্তিমূলক গানগুলি বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ রহিল, বাংলার বাহিরে প্রসারলাভ করিল না। ইহার কারণ বোধহয় এই, যে বাংলাদেশের জন্যই ইহাদের জন্ম। বাংলার তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ ইহাদের অলঙ্কার, বাংলার গ্রাম্যভাষায় ইহাদের পরিচয় এবং ইহারা বাঙালীর চিরপরিচিত শক্তিমূর্ত্তির চরণে আবেগরঞ্জিত কুসুমদামের উৎসর্গ। যদিও কয়েকটি গানে বৃহত্তর জীবনের ইঙ্গিত আছে, মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন কষ্ট বোধ্য Universal appeal আছে—তাঁহার সঙ্গীতসম্ভারের মধ্যে নিখিলের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সন্ধান নাই, প্রকৃতির বন্দনায়—আলোকে উৎসবে আনন্দে কিম্বা সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালোপযোগী আরাধনার ছন্দে ইহা সমুজ্জ্বল নহে। গীতার 'যৎকরোষি যদশ্নাসি'র ব্রহ্মার্পণ জ্ঞান ও ভাগবদ্ধর্ম্ম তাঁহার একটি গানে নিহিত আছে—যেথায় বলিতেছেন, "যাহা আমি খাই, খাওয়াই যেন শ্যামামাকে।" তিনি ভক্ত, অনুভূতির প্রকাশভঙ্গীর কৌশলহীনতায় ও শিল্পের অভাবে তাঁহার গান Religious বা sacred Verse হয় নাই। ইংলণ্ডে এই দুই প্রকার গানের এই প্রকারই তারতম্য আছে। "Sacred verse can hardly go beyond one province. Secular verse covers many provinces; manners, incident, love, landscape—the Vast sphere of drama; in a word, all the many-coloured romance of life."

রামপ্রসাদের যুগে বাংলার নৈতিক ও সামাজিক অবনতি ঘটিয়াছিল; সাহিত্য অমার্জ্জিত, চিন্তাধারা স্রোতহীন ভক্তিহীন নিছক আচার লিপ্সা ও কুসংস্কারের গ্লানিতে মোহাচ্ছন্ন; দেহাতীত ছাড়িয়া দেহ লইয়া তাণ্ডব চলিতেছে; শ্যাম ও শ্যামার অসার উপাসকবৃন্দের অশোভন দ্বন্দ্ব কবিগান তর্জ্জার লড়াই অতিক্রম করিয়া বাহুযুদ্ধে পরিণত, স্বার্থের সৈকতাননে ভগবদ্‌ভক্তি তখন ক্ষীণগঙ্গার মতো মিলাইয়া যাইতেছে। এহেন দুর্য্যোগে সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক অন্ধকার শেষে বাংলার কাব্যগগনে দুইটি জ্যোতিষ্কের উদয় হইল—ভারতচন্দ্র (জন্ম ইং ১৭১২) ও রামপ্রসাদ (জন্ম ইং ১৭২০?)। ইহাদের রচনায় মুগ্ধ হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" ও রামপ্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্রের মতো রাজসাহায্যের গৌরব কিন্তু রামপ্রসাদ পান নাই। মহারাজার উৎসাহে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের চণ্ডীরচনার প্রণালীতে 'অন্নদামঙ্গল' সরল সুললিত কবিতায় বর্ণনা করিতে থাকিলে একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত হইয়া তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন এবং নীলমণি সমদ্দার নামক একজন গায়ক সেই রচনায় সুরসংযোগ করিয়া পালাভুক্ত করিয়া রাখিতেন। 'অন্নদামঙ্গল' এইভাবে সুরক্ষিত হইল। পরে ১৮১৬ খৃঃ ইহা বিখ্যাত Baptist Missionary John Thomas এর পণ্ডিত পদ্মলোচন চূড়ামণির দ্বারা সংশোধিত হইয়া Ferries & Co'র ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়।

রামপ্রসাদের গান ও কবিতা এইভাবে গ্রথিত হইবার সুযোগ না পাইলেও লোকের মুখে মুখে প্রবাদের মতো ফিরিত। সুতরাং উচ্চারণ ও ভাবার্থ ইত্যাদির নানাবিধ দোষ কালীকীর্ত্তন ব্যবসায়ী গায়কদের মধ্যে এইসব গানে সঞ্চারিত হওয়ায় গানগুলির "শ্রবণকালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হইত"—এমনকি এই গানগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইত যদি না কবি ঈশ্বরগুপ্ত বহুদিন পরে দশবৎসরকাল ঐ সকল গান ও কবিতা সংগ্রহের জন্য বাংলার নানাস্থানে ঘুরিয়া এবং "আকর স্থান হইতে মূল পুস্তকাদি আনয়ন" করিয়া, দোষগুলি সংশোধন করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "কালী কীর্ত্তন" নামক গ্রন্থে এই প্রেরণামূলক গানগুলি লিপিবদ্ধ করিতেন। সেই সূত্রে সুধীসমাজ রামপ্রসাদের অমূল্যগানগুলির জন্য কবি ঈশ্বরগুপ্তের নিকট ঋণী। গুপ্তকবি পরে রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার নিজ পত্রিকা 'সংবাদপ্রভাকরে' বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—কিন্তু সে পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া প্রসিদ্ধ গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন।

রামপ্রসাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য—সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয়—বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলন। পুরাণ, তন্ত্র, আগমনিগমের জটিল জটাজাল হইতে যেখানে তাঁহার জাহ্নবী মুক্ত হইয়াছে, সেখান হইতেই তাহার খরস্রোত অপূর্ব্ব তরঙ্গভঙ্গে দুকূল ভাসাইয়া চলিয়াছে। তাঁহার দর্শন ভক্তের নিকট সহজবোধ্য—চিত্তশুদ্ধিরও রিপুজয়ের দ্বারা অন্তরের বৈরাগ্যসাধনে হৃদকমলের জ্বালা জুড়াইয়া শমনের ভয়হীন হইয়া অন্তিমে মায়ের কোলে 'কোলের ছেলে'র মতো ফিরিতে চাহিয়াছেন। এ বৈরাগ্য ষড়ৈশ্বর্য্যের অন্যতম, ইহা মুমুক্ষুর বৈরাগ্য—ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আনিয়া দেয়। উচ্চশিক্ষিত না হইয়াও নূতন সুরে বলিষ্ঠ ভাষায়, অনুপম ছন্দে প্রেরণায় সঙ্গীত রচনার শক্তি এবং Motherhood of God (ঈশ্বরের মাতৃভাব) এত দৃঢ় তাঁহার অনুভূতি আসিল কোথা হইতে? তান্ত্রিক বলিবেন, নির্জ্জনে উচ্চ চিন্তার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন মূলাধার হইতে তাহাকে ক্রমশঃ উচ্চতর চক্রগুলি পার করাইয়া মস্তিষ্কের সহস্রার স্পর্শ করাইতে রামপ্রসাদ তন্ত্র-সাধনার দ্বারা সমর্থ হইয়াছিলেন। চক্রের শক্তিগুলি তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল হওয়ায় জ্ঞানের বিকাশ হয় আশ্চর্য্যরূপে। যোগী তখন শুধু শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন না, শক্তিশালীও হন। যাহা হউক, তত্ত্বের গহনে প্রবেশ না করিয়া বলা যায় রামপ্রসাদ একনিষ্ঠভাবে ভগবানকে মাতৃরূপে ধ্যান করিয়া দুঃখ জয় করিয়া, মা'র ছেলে বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন

[চাকলা জুড়ে নাম রটেচে, শ্রীরামপ্রসাদ মা কালীর ব্যাটা]। তাঁহার দুঃখবাদ অনন্ত বৈরাগ্যের পথে লইয়া যায় না—বীরের মতো সহ্য শক্তি প্রদান করে—মার কাছে অভিমানে ছুটিয়া গিয়া সান্ত্বনা ও অভয় চাহিতে বলে। তিনি সাকার ও নিরাকার দুইই মানিতেন—'এলোকেশীদিগ্বসনা', ও 'তারা আমার নিরাকারা' এই দুইটি বিখ্যাত গান তাহার পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই ভক্ত সমাগমে রামপ্রসাদের গান শুনিতে ভালবাসিতেন, তাঁহার প্রিয় গান গুলির মধ্যে—

> "প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি,
> আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

বিশেষ আদরের ছিল। রামপ্রসাদের উক্তি—"সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী"—শ্রীরামকৃষ্ণ আরও সরল করিয়া বলিতেন "ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর অবধি যেতে পারে—জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।" রামপ্রসাদকে তিনি বলিতেন ত্রিগুণাতীত ভক্ত ; যোগীর উপযুক্ত সংজ্ঞা ; প্রত্যেকটি গান তাঁহার অনুভূতির বিকাশ। অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী কবি কয়েকটি বিখ্যাত গানে তাঁহার বিশ্বাস পরিস্ফুট করিয়াছেন—'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জাননা" ইত্যাদি, তিনিই প্রথম আগমনী গানের রচয়িতা ; শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত সঙ্গীতে দেখা যায়। Thompson সাহেবের শাক্ত সঙ্গীতের তালিকায়, তাঁহার সঙ্গীত উচ্চস্থান পাইয়াছে ; রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনুশীলনে ও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বঙ্গ আলোচনায় রামপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার স্বকীয় ভক্তিরস, মাতৃপ্রতীকে ঈশ্বরের আবাহন ও সামীপ্যলাভের প্রবল উন্মাদনা ভক্তের মনের উপর অভূতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার ভাবোন্মাদ মাধুরীর আকর্ষণ দুর্নিবার, সুরের মায়াজালে শব্দের ধ্বনিলীলা তাঁহার একান্ত নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথও রামপ্রসাদী সুরে "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" এবং অতুলপ্রসাদ তাঁহার বিখ্যাত গান "দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে" রচনা করিয়া সুধী অভিজাত সমাজে তাঁহার সুরকে উচ্চাসন দিয়াছেন। ব্রাহ্মসঙ্গীতেও তাঁহার সুরের প্রচলন দেখা যায় "কি আশায় মন আছ, ভুলে" ইত্যাদি। তাঁহার সমসাময়িক গ্রামবাসী বৈষ্ণব-সাধক আজু গোঁসাই রঙ্গের দ্বারা তাঁহার কয়েকটি গানকে আরও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন—

> রামপ্রসাদ—"এবার কালী তোমায় খাব
> হাতে কালী মুখে কালী
> সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।"
> আজু—"সাধ্য কি তোর কালী খাবি
> সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে
> চুন, কালী মেখে যাবি" ইত্যাদি।

বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো রামপ্রসাদের রচনা ছিল জীবনের ধর্ম্ম সাধনার সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত। পদকর্ত্তাদের মতোই তিনি নিজের আনন্দ ও মুক্তির জন্য গান রচনা করিতেন। অন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল না। Art হিসাবে তাঁহার গান বা কবিতা উচ্চশ্রেণীর নহে, কিন্তু তাঁহার প্রেরণায় চিত্তদ্রবকারী, পাচনীশক্তি বিশিষ্ট শক্তির উৎসধারে বাঙ্গালী স্নান করিয়া একদিন তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল। তাঁহার কয়েকটি গান Classic হইয়া গিয়াছে—একটি সুবিখ্যাত গান প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিদুষী পত্নী শ্রীমতী লীলা রায় ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া P. E. N সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

তাঁহার কণ্ঠ ছিল সুমধুর, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, দেহ সুঠাম ও বলিষ্ঠ ; গানের ভাষার কথা ত সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহাকে ঘিরিয়া অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে ; জগন্মাতা তাঁহার কন্যারূপে তাঁহার সহিত একত্রে বেড়া বাঁধিয়াছিলেন—এই জনশ্রুতির মূলে ছিল বোধহয় তাঁহার সঙ্গীত "মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া। ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি দড়া"। তাঁহার কথা Miltonএর ভাষায় বলা যায়—

> "Blest pair of sireus, pledges of Heaven's joy
> Sphere-born harmonious sisters, Voice and Verse
> Wed your divine sounds."

বাঁশী

শ্রীঅশ্বিনী পাল

ফাগুন-আকাশ-আলো সংগোপনে শান্ত পরশিয়া
জীবন-সৌন্দর্য্যরাশি ধরাবক্ষে তোলে মুকুলিয়া ;
উত্তপ্ত প্রবাহ জাগে প্রতি অঙ্গে প্রাণ-স্পর্শ আনি,
মৃত্যু নয় ; দিকে দিকে জীবনের পরিপূর্ণ বাণী।
তৃণ তরু কহে কথা বনবনান্তর
মূক মাটী মনে হয় সেও আজি সংগীত-মুখর।

নিখিল সমুদ্র পানে চাহি গাহে গান নদী জল,
পাহাড়ে পর্ব্বতে তার উঠে ধ্বনি কাঁপে ধরাতল !
মাটীর অন্তর হ'তে তৃণ-বীজ উঠে অঙ্কুরিয়া,
জড় হ'তে নামে আলো চেতনার স্পর্শ তারে দিয়া
চুম্বনে পরশে নৃত্যে সংগীতে ঝংকারে,
দাঁড়ায় বিপুল মুক্তি বাঁশী হাতে দুয়ারে দুয়ারে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ন্যায়রত্ন জাগিয়া আছেন—কিন্তু সে জাগিয়া থাকা এক অদ্ভুত জাগিয়া থাকা। বহির্জগতের শব্দ গন্ধ স্পর্শ সমস্ত কিছুর সঙ্গে যোগ থাকিয়াও যেন যোগ নাই। যে প্রচণ্ড প্রবহমান স্রোতে—দুই তীরের মাটি ধ্বসিয়া পড়িতেছে—মূল ছিঁড়িয়া বনস্পতি আছাড় খাইয়া পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে—সেই প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে বিপুলভার শিলাখণ্ডের মত তিনি যেন অনড় অথচ তাঁহার নাড়ীতে যেন টান পড়িতেছে। স্থির দৃষ্টি মেলিয়া ঘরের চালের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—অথচ ওই চালখানার কাঠ খড় কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে নাই। তাঁহার সমস্ত চেতনা যেন বিপুলভার শিলাখণ্ডের মত কোন গভীরে অতল জলস্রোতের তলায় ডুবিয়া রহিয়াছে।

অরুণা মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই বৃদ্ধের ধ্যান-মগ্নতার সঙ্গে তাহার পরিচয় না-থাকা নয়। আজ দীর্ঘ কয়েক বৎসর তাঁহার ধ্যানমগ্নতা সে নিত্য দেখিতেছে। কিন্তু আজ যেন তাঁহার সেই নিত্যকার রূপের সঙ্গে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। আজ যেন তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া তন্ময় হইয়া যান নাই; আজ যেন তিনি নিজের অন্তরলোকের মধ্যে ডুব দিয়াছেন, কি যেন খুঁজিতেছেন।

সমস্ত জীবন ধরিয়া আত্মার সর্বোত্তম প্রিয় বস্তু বলি দিয়া সংসারের সুখ দুঃখ আনন্দ শোক সমস্ত কিছুর নাগালের বাহিরে যে একটি মনের আসন তিনি লাভ করিয়াছেন—যে আসনে বসিয়া অহরহের জন্য একটি সুপ্রসন্ন হাস্য মাধুর্যের অধিকারী হইয়াছেন—সেই আসন কি টলিয়াছে তাঁহার? সেই হাস্য মাধুর্যের প্রদীপটি নিভিয়া গেল আকস্মিক কোন বাত্যা বিক্ষোভে? নিরাসক্ত যে মানুষটি এই কয়দিনের দাঙ্গার প্রচণ্ডতার মধ্যেও ঘুমাইয়াছেন—তিনি আজ এই গভীর রাত্রেও বিনিদ্র কেন? তবে কি—?

অরুণার মুহূর্তে সন্দেহ হইল—বোধ হয় অজয়ের কোন সংবাদ আসিয়াছে। সেই সংবাদের আঘাত—আজ—এতদূর উঠিয়াছে যে—সুখ দুঃখ আনন্দ শোকের নাগালের বাহিরে—ঊর্ধ্বে স্থাপিত মনের আসন পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে—তাঁহাকে টানিতেছে এই মাটির পৃথিবীর বুকে এবং তিনি প্রাণপণ সাধনায় আরও—আরও ঊর্ধ্বলোকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশ্বনাথের সঙ্গে যে-দিন ন্যায়রত্নের শেষ সাক্ষাৎ হয়—সেদিন অরুণা উপস্থিত ছিল; সে স্মৃতি মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করিতেছে। এই জংসন শহরেরই ডাক-বাংলোয় বিশ্বনাথ তাহারই হাত ধরিয়া টানিয়া রাখিয়াছিল—সেই মুহূর্তেই ন্যায়রত্ন ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; উপবীতহীন বিশ্বনাথকে দেখিয়া ন্যায়রত্নের সেই মূর্তি, হৃদয়ের ভিতরে যে দ্বন্দ্ব ঝড়ের বেগে বহিয়া গিয়াছিল—তাহার শব্দ তিনি প্রকাশ হইতে দেন নাই, সে দ্বন্দ্বের গতিবেগে জীবনের আশা তরু সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছিল—শিকড়ের টানে হৃদয়-ক্ষেত্রটা ফাটিয়া বোধ করি চৌচির হইয়া গিয়াছিল—তাহারও কোন লক্ষণ তিনি বাহিরে ফুটিয়া উঠিতে দেন নাই,—শুধু একবার বলিয়া উঠিয়াছিলেন—নারায়ণ,নারায়ণ। আজিকার এই স্তব্ধ জাগ্রত ন্যায়রত্নের সঙ্গে সেদিনের ন্যায়রত্নের যেন একটা সাদৃশ্য আছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। একটা আকুল প্রশ্ন বুকের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ফাটানো আর্তনাদে উঠিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু জিহ্বাগ্র পর্যন্ত আসিয়া সভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কঠোর সত্যবাদী চিকিৎসককে জীবন-সংশয় রোগী সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে যেমন রোগীর পরমাত্মীয়ের অন্তর ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া যায়—তেমনি ভাবেই ভয়ে সে অভিভূত হইয়া গেল। শুধু নীরবে শঙ্কাতুর অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া মাটির পুতুলের মতই বসিয়া রহিল।

ঘরের প্রদীপটার শিখা ম্লান হইয়া আসিতেছিল। ন্যায়রত্ন এক সময় বলিলেন—প্রদীপের তেল বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। একটু তেল দাও তো ভাই।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরও আজ যেন অন্যদিনের কণ্ঠস্বর হইতে স্বতন্ত্র পৃথক। কেমন যেন, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যায় না। অরুণা কোন মতে আত্মসংবরণ করিয়া উঠিল, প্রদীপে নতুন করিয়া তেল দিয়া নতুন সলিতা দিয়া শিখাটি উজ্জ্বল করিয়া দিল এবং সেই উজ্জ্বল আলোয় একবার কোনমতে সাহস করিয়া ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিল।

ন্যায়রত্ন তাহার সে দৃষ্টি অনুভব করিলেন, তাহার মুখের দিকে না-চাহিয়াও হাতখানি তুলিয়া ইঙ্গিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—এইখানে বস।

অরুণা বসিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, ন্যায়রত্ন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। এবার সে কোন মতে বলিয়া ফেলিল—দাদু? এই একটি শব্দের মধ্যেই তাহার আবর্ত্ত বিক্ষুব্ধ অন্তরের সমস্ত প্রশ্ন প্রকাশ পাইল; অন্ততঃ নিজে সে তাই মনে করিল—মনে করিল সব প্রশ্ন করা হইয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন শান্ত দীপ্তকণ্ঠে মৃদু স্বরে বলিলেন—ভাই।

—বলুন, দাদু বলুন! আমি সব সইতে পারব। আপনি বলুন।

ন্যায়রত্ন ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—তুমি কি বলতে পারছ কিছু? আমার আকৃতিতে কি কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে?

অরুণা বিস্মিত হইয়া গেল, কি বলিতেছেন তিনি—সে বুঝিতে পারিল না। সে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আজ সূর্য্যোদয়ের পর থেকেই—তাই বা কেন ঘুম ভাঙার পর থেকেই মন যেন আমার অতীত-কালের দিকে ফিরল। দিনের বেলা থেকেই স্মরণ করছি অতীত কালের কথা। রাত্রি হ'ল—নারায়ণ স্মরণ করে শুলাম নিদ্রা কোন মতেই এল না। প্রদীপের শিখা অনুজ্জ্বল হয়ে এল—চোখের সম্মুখে ছায়াছবির মত দেখতে লাগলাম বিগত প্রিয়জনকে। বিশ্বনাথ এল প্রথম; তারপর জয়া, তারপর শশীশেখর, বউমা, তারপর শশীশেখরের মা, আমার মা, আমার পিতৃদেব; একে একে সকলেই এলেন; স্পষ্ট চোখে দেখলাম। তারপর কত লোক—এ অঞ্চলের কত ঘটনা কত কথা; ভূত কাল—তার কৃষ্ণ যবনিকা তুলে ধরেছে আমার দৃষ্টির সম্মুখে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আকাশ নক্ষত্র সীমাহীন স্থান সমস্ত কিছু যেন আমার মানস লোক থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তুমি হঠাৎ ভয় পেয়ে এসে ঘরে ঢুকলে—তারই ফলে মন সজাগ হল; কানে এই বাইরের শুকনো পাতার উপর চতুষ্পদের ছুটে চলে যাওয়ার শব্দ। তোমাকে নিশ্চিন্ত ক'রে—আমি নিশ্চিন্ত হলাম; আমার অবস্থা আমি বুঝতে পারলাম।

ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে তিনি কথা বলিতেছিলেন। যেন এক নিস্তব্ধ শীত-নিশীথে বৃদ্ধ বিরলপত্র বনস্পতির শাখাগ্র হইতে একটির পর একটি পাতা ঝরিতেছিল, কখনও বা এক সঙ্গে দুই তিনটি।

অরুণা অবাক হইয়া শুনিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছিল—বাহিরে যেন নামিয়া আসিয়াছে এক সীমাহীন রাত্রি। কাল যেন অতি মন্থর পদক্ষেপে পদপাত করিয়া চলিয়াছে; সে যেন হারাইয়া যাইতেছে। তিনি কি বলিতেছেন তাহাও সে যেন সম্যক বুঝিতেছে না।

একটু বিশ্রাম লইয়া ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে ডান হাতখানি তুলিয়া অরুণার কোলের উপর রাখিয়া বলিলেন—আয়ুর্ব্বেদ তো তোমার পিতৃকুলের বেদ। বৈদ্য ব্রাহ্মণের কন্যা তুমি—দেখতো আমার নাড়ীটা—দেখ তো ভাই।

অরুণা চমকিয়া উঠিল এইবার। বলিল—শরীর কি খারাপ হয়েছে দাদু?

—শরীর? খারাপ? না—সে তো কিছু নয়।

—তবে?

—তবু বুঝতে পারছি—আমাকে যেতে হবে। দেখ না নাড়ীটা।

—আমি তো দেখতে জানি না—

—জান না?

তিনি এবার নিজেই নিজের নাড়ী ধরিয়া পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। অরুণার সর্ব্ব শরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল, গলায় যেন কি বাধিয়াছে; সর্ব্ব দেহে ঘাম দেখা দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর ন্যায়রত্ন নাড়ী ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—যেতে হবে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। নাড়ী

দেখে বুঝবার মত শক্তির তীক্ষ্ণতা আর নাই। না থাক; আমার আঙুলের অগ্রভাগ স্পর্শ ক'রে দেখ না, বুঝতে পারবে।

হ্যাঁ—আঙুলের ডগাগুলি নখের মাথায় হিম স্পর্শ অনুভব করিল অরুণা।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—অনুমান হয় সপ্তাহকাল মধ্যেই মুক্তি আসবে।

অরুণা উৎকণ্ঠাভরে বলিল—কেন এ কথা বলছেন দাদু? কোন অসুখ তো আপনার নেই।

—না। অসুখের তো প্রয়োজন নাই ভাই। আমার এ যে সমাপ্তি। মনের মধ্যে দেহের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমি তার স্পর্শ পাচ্ছি। অন্তর তার আগেই আসবে।

অনেকক্ষণ কথা বলিয়া তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। একটা গভীর নিশ্বাস লইয়া চোখ বন্ধ করিলেন।

হঠাৎ বলিলেন—কে? কে? অ—তুমি! ঋণ শোধ নিতে এসেছ?

চকিত হইয়া অরুণা ডাকিল—দাদু! দাদু! দাদু!

(ক্রমশঃ)

জৈন আগম-সাহিত্য

ডক্টর শ্রীনাথমল টাটিয়া এম-এ, ডি-লিট

কোনও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যও বিকশিত হইয়া থাকে। ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত হইয়াছে আধ্যাত্মিক সাধনাকে অবলম্বন করিয়া এবং তাই ভারতীয় সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই আধ্যাত্মিক সাহিত্যের এত প্রাচুর্য। একদিকে যেমন বেদ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের এক অংশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে আর্যসভ্যতার প্রবৃত্তি প্রধান আচারব্যবহার, অপরদিকে সেইরূপ বেদেরই অপর অংশ উপনিষৎ এবং বৌদ্ধ পিটক, জৈন আগম প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ভারতীয় নিবৃত্তিপ্রধান আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গ। এই প্রবন্ধটিতে আমরা চেষ্টা করিব, জৈন আগম-সাহিত্যের একটি স্থূল রূপরেখা অঙ্কন করিতে।

আগম-সাহিত্যের বাহ্য স্বরূপ

চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর কেবল জ্ঞান (পূর্ণজ্ঞান) লাভের পর মধ্যমা পাবা নগরীতে যে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যে এগার জন ব্রাহ্মণ আচার্য তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি গণ (শিষ্যসম্প্রদায়) ছিল বলিয়া তাঁহারা 'গণধর' নামে অভিহিত হন। তীর্থঙ্কর মহাবীরের উপদেশকে অবলম্বন করিয়া এই গণধরগণ ও পরবর্তীকালে অন্য প্রতিভাসম্পন্ন বিশিষ্ট আচার্যগণ কর্তৃক অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহা আগম, শ্রুত, প্রবচন প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই আগম-সাহিত্যের বহু গ্রন্থ কালক্রমে লোপ পায়। কিন্তু আজও সেই বিশালকায় সাহিত্যের যে অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাও নিতান্ত কম নহে। যদ্যপি দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় এই লুপ্তাবশেষ সাহিত্যের যথার্থতা ও প্রাচীনতা স্বীকার করেন না তথাপি শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মতে তাহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। সুদীর্ঘ গবেষণার পর আজ দিগম্বর সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষ বিচারকগণও ইহার যাথার্থতা ও প্রাচীনতা স্বীকার করিতেছেন। আগম-সাহিত্যের গ্রন্থগুলি একই কালে বা স্থানে রচিত হয় নাই এবং সকল স্থলে তাহার ভাষাগত প্রাথমিক রূপও অব্যাহত থাকে নাই। বেদাভ্যাসী ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বেদ বা শ্রুতি লিপিবদ্ধ না করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন, জৈন সাধুগণও সেইরূপ তাঁহাদের অতি বিশাল আগম-সাহিত্য লিপিবদ্ধ না করিয়া স্বীয় স্মৃতি-শক্তির দ্বারা তাহা রক্ষা করিতেন। তবে দুর্ভিক্ষাদি নানা কারণে সাধু জীবনের কঠোর সংযম পালনে সার্থক মেধাবী সাধুগণের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় স্বীয় শাস্ত্রসমূহ সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। শাস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত অনুরূপ আজীবন কঠোর তপস্বী-জীবনের বিধান না থাকায় নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়াও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের বেদগুলি এবং বৌদ্ধসম্প্রদায় তাঁহাদের পিটকগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আগম-সাহিত্যের যে গ্রন্থগুলির রচনা তীর্থঙ্কর মহাবীরের উপদেশকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং গণধরগণ করিয়া থাকেন সেইগুলিকে 'অঙ্গ' নামে অভিহিত করা হয়। 'অঙ্গ' ভিন্ন আর সমস্ত আগম সাহিত্যকে 'অঙ্গবাহ্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'অঙ্গ' গ্রন্থগুলিকে অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে শ্রুতজ্ঞানসম্পন্ন আচার্যগণ পরবর্তীকালে 'অঙ্গবাহ্য' গ্রন্থগুলির রচনা করেন। গণধরগণ দ্বাদশটি 'অঙ্গ' রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'দৃষ্টিবাদ' নামক অন্তিম 'অঙ্গ'টি, যাহাতে বহু অঙ্গবাহ্য গ্রন্থের আকর চতুর্দশ 'পূর্ব' গ্রন্থগুলির সমাবেশ ছিল, ভগবান্ মহাবীরের নির্বাণের পর এক হাজার বৎসরের মধ্যেই ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশিষ্ট একাদশটি 'অঙ্গ' ভাষা ও পরিমাণগত অল্পবিস্তর পরিবর্তন সত্ত্বেও তাহাদের অন্তর্গত প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

'অঙ্গবাহ্য' গ্রন্থগুলির সংখ্যা ও বিভাগ সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায় একমত নহেন। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় স্বীকৃত বর্তমানে উপলব্ধ অঙ্গ ও অঙ্গবাহ্য গ্রন্থগুলির নাম ও বিভাগ এইরূপ—

১১টি অঙ্গ—আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, স্থানাঙ্গ, সমবায়াঙ্গ, ভগবতী, জ্ঞাতৃধর্মকথা, উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তরৌপপাতিকদশা, প্রশ্নব্যাকরণ ও বিপাকসূত্র।

১২টি উপাঙ্গ—ঔপপাতিক, রাজপ্রশ্নীয়, জীবাভিগম, প্রজ্ঞাপনা, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, নিরয়াবলী, কল্পাবতংসিকা, পুষ্পিকা, পুষ্পচূলিকা ও বৃষ্ণিদশা।

১০টি প্রকীর্ণক—চতুঃশরণ, আতুরপ্রত্যাখ্যান, ভক্তপরিজ্ঞা, সংস্তারক, তন্দুলবৈচারিক, চন্দ্রবেধ্যক, দেবেন্দ্রস্তব, গণিবিদ্যা, মহাপ্রত্যাখ্যান ও বীরস্তব।

৬টি ছেদসূত্র—নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, দশাশ্রুতস্কন্ধ, বৃহৎকল্প ও জীতকল্প।

৪টি মূলসূত্র—উত্তরাধ্যয়ন, দশবৈকালিক, আবশ্যক ও পিণ্ডনির্যুক্তি।

২টি চূলিকাসূত্র—নন্দিসূত্র ও অনুযোগদ্বারসূত্র।

এই পঁয়তাল্লিশটি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম এগারটি অঙ্গ ও অবশিষ্ট চৌত্রিশটি অঙ্গবাহ্য গ্রন্থ। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত স্থানকবাসী ও তেরাপন্থী সম্প্রদায় উক্ত এগারটি অঙ্গও মাত্র একুশটি অঙ্গবাহ্য গ্রন্থ স্বীকার করিয়া অঙ্গবাহ্য গ্রন্থগুলিকে নিম্নোক্ত চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১২টি উপাঙ্গ—উপরোক্ত।

৪টি ছেদসূত্র—ব্যবহার, বৃহৎকল্প, নিশীথ ও দশাশ্রুতস্কন্ধ।

৪টি মূলসূত্র—দশবৈকালিক, উত্তরাধ্যয়ন, নন্দিসূত্র ও অনুযোগ।

১টি আবশ্যকসূত্র—আবশ্যকসূত্র।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে সমগ্র আগম-সাহিত্য লুপ্ত হইয়াছে ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মতে উপরোক্ত বারটি 'অঙ্গ' এবং মাত্র চতুর্দশটি 'অঙ্গবাহ্য' গ্রন্থ (যথা—সামায়িক, চতুর্বিংশতিস্তব, বন্দনা, প্রতিক্রমণ, বৈনয়িক, কৃতিকর্ম, দশবৈকালিক, উত্তরাধ্যয়ন, কল্পব্যবহার, কল্পাকল্পিক, মহাকল্পিক, পুণ্ডরীক, মহাপুণ্ডরীক ও নিশীথিকা) রচিত হইয়াছিল এবং ভগবান্ মহাবীরের নির্বাণের ৬৮৩ বৎসর পরে আর এমন কোনও আচার্য বিদ্যমান ছিলেন না যিনি কোনও একটি অঙ্গ বা 'পূর্ব' গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে জানিতেন। আংশিকভাবে 'অঙ্গ'গ্রন্থ বা 'পূর্ব'গ্রন্থের জ্ঞাতা আচার্যগণের মধ্যে পুষ্পদন্ত ও ভূতবলি নামক আচার্যদ্বয়'ষট্খণ্ডাগম' নামক গ্রন্থের এবং আচার্য গুণধর 'কষায় পাহুড়' নামক গ্রন্থের রচনা করেন। এই গ্রন্থ দুইটিকে দিগম্বর সম্প্রদায় আগমস্থানীয় মনে করেন। ইহা ছাড়া রবিষেণকৃত পদ্ম পুরাণ, জিনসেনকৃত আদিপুরাণ, গুণভদ্র কৃত উত্তরপুরাণ, জিনসেন (দ্বিতীয়) কৃত হরিবংশপুরাণ, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, জয়ধবল, কুন্দকুন্দাচার্যকৃত প্রবচনসার প্রভৃতি গ্রন্থ ও উমাস্বামীবিরচিত তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র এবং পরবর্তীকালে বিরচিত আরও কতিপয় গ্রন্থের প্রামাণ্য দিগম্বরগণ স্বীকার করেন।

এই স্থলে জৈন আগম-সাহিত্য কি প্রকারে ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং কি উপায়েই বা লুপ্তাবশেষ গ্রন্থগুলি সংরক্ষিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসঙ্গত হইবে না। দৃষ্টিবাদ নামক দ্বাদশ অঙ্গ ও তদন্তর্গত চতুর্দশ 'পূর্বের' কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ই ইহা স্বীকার করেন যে চতুর্দশ পূর্বের জ্ঞাতা শ্রুতকেবলী (সম্পূর্ণ শ্রুত বা আগমের অধিকারী) আচার্যগণের মধ্যে ভদ্রবাহুই শেষ আচার্য। আচার্য ভদ্রবাহু স্বর্গগমন করেন বর্ধমান মহাবীরের নির্বাণ দিবস হইতে পরিগণিত ১৭০ (দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে ১৬২) বীরাব্দে। তাঁহার স্বর্গগমনের কয়েক বৎসর পূর্বে সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের পর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আগম সাহিত্যকে সুব্যবস্থিত করিবার নিমিত্ত ১৬০ বীরাব্দে পাটলিপুত্র নগরীতে জৈন শ্রমণসংঘ (সাধুসম্প্রদায়) সম্মিলিত হইলেন। এই সম্মেলনে সমবেত শ্রমণগণ স্ব স্ব আবৃত্তির দ্বারা প্রথম একাদশটী অঙ্গ সুব্যবস্থিত করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু দৃষ্টিবাদ নামক অন্তিম অঙ্গটীর আবৃত্তি করিতে কেহই সক্ষম হইলেন না। তখন তাঁহারা স্থূলভদ্র প্রমুখ কতিপয় সাধুকে আচার্য ভদ্রবাহুর নিকট ঐ দ্বাদশ অঙ্গটী অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র স্থূলভদ্রই ঐ অঙ্গটী অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ অঙ্গের অন্তর্গত প্রথম দশটি 'পূর্ব' অধ্যয়ন করিবার পর স্থূলভদ্র সেই অধ্যয়নলব্ধ বিভূতির পরিচয় দেওয়ায় আচার্য ভদ্রবাহু অবশিষ্ট চারিটি 'পূর্ব' তাঁহাকে অধ্যাপন করাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু স্থূলভদ্রের আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে সেই 'পূর্ব' চারিটির মাত্র শব্দ পাঠ করাইতে সম্মত হইলেন, অর্থ-ব্যাখ্যা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতএব আচার্য ভদ্রবাহুর স্বর্গগমনের পর চতুর্দশ-'পূর্ব'-ধর শ্রুতকেবলী (সম্পূর্ণ শ্রুতের জ্ঞাতা) আর কেহই রহিলেন না। অবশিষ্ট দশ-'পূর্ব'ধর আচার্যগণের অস্তিত্বও ৫৮৪ (দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে ৩৪৫) বীরাব্দে লোপ পাইল। ইহার প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে আর একটি দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষে জৈন শ্রমণ সংঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আগম সাহিত্য আবার ধ্বংসের সম্মুখীন হইল। এইবার আচার্য স্কন্দিলের সভাপতিত্বে মথুরা নগরীতে শ্রমণ সংঘ সম্মিলিত হইলেন এবং নষ্টাবশেষ আগমগুলি সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রায় ঐ সময়ে আচার্য নাগার্জুনের অধ্যক্ষতায় আর একটি ঐরূপ সম্মেলন কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত বলভী নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে, অর্থাৎ মহাবীর-নির্বাণের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে, আচার্য দেবর্ধিগণি—ক্ষমাশ্রমণের অধ্যক্ষতায় পুনরায় বলভী নগরীতে শ্রমণ সংঘ সম্মিলিত হইলেন এবং ধ্বংসাবশিষ্ট আগমগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। আচার্য দেবর্ধিগণের এই দূরদর্শিতা ও সুব্যবস্থার ফলেই আজও জৈন আগম-সাহিত্য স্বীয় স্বরূপ অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই আগম সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে আরও বহুগ্রন্থ প্রাকৃত, সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে সেইগুলির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

আগম-প্রামাণ্য

তীর্থঙ্করের উপদেশকে অবলম্বন করিয়া গণধরগণ যে শাস্ত্রগুলির রচনা করেন সেইগুলি 'অঙ্গ' নামে পরিচিত ইহা পূর্বে উল্লিখিত [illegible]

অঙ্গ'গুলিকে আশ্রয় করিয়া চতুর্দশ-'পূর্ব'-ধর এবং তাঁহাদের অবর্তমানে দশ-'পূর্ব'-ধর আচার্যগণ যে শাস্ত্রগুলির রচনা করেন তাহা 'অঙ্গবাহ্য' নামে অভিহিত হয়। অতএব 'অঙ্গ' ও 'অঙ্গবাহ্য' শাস্ত্রসমূহের সমষ্টিরূপ আগম-সাহিত্যের মূলে রহিয়াছে তীর্থঙ্করের উপদেশ এবং ঐ উপদেশের প্রামাণ্যের উপরই নির্ভর করিতেছে আগম সাহিত্যের প্রামাণ্য। ব্যক্তিবিশেষ প্রদত্ত উপদেশের ত্রিকালাবাধিত প্রামাণ্য স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া মীমাংসক সম্প্রদায় ধর্মোপদেশের মূল আকর শ্রুতি বা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিলেন। নৈয়ায়িক প্রভৃতি ঈশ্বরবাদী দার্শনিকগণ বেদের ঈশ্বর কর্তৃকত্ব স্বীকার করিয়া তাহার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সাংখ্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদী দার্শনিকগণ স্বীয় আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা যাঁহারা রাগদ্বেষরহিত এবং সর্বজ্ঞ হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের উপদেশের ত্রিকালাবাধিত প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন। যেহেতু স্বয়ং সর্বজ্ঞ না হইলে অপরের সর্বজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করা যায় না এবং যুক্তি বা তর্কের দ্বারাও কোনও পুরুষবিশেষের সর্বজ্ঞতা প্রতিপাদন করা সম্ভব নহে—অতএব মীমাংসক দার্শনিকগণ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের সর্বজ্ঞতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বেদকে অনাদি স্বয়ংসিদ্ধ অপৌরুষেয় জ্ঞানের আকররূপে অঙ্গীকার করিয়া তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন। জ্ঞাতার অভাবে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া নৈয়ায়িক প্রভৃতি ঈশ্বরবাদী দার্শনিকগণ বেদের ঈশ্বরকর্তৃকত্ব স্বীকার করিলেন। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষরহিত। তিনি জীবসমূহকে তাহাদের কর্মানুরূপ ফল প্রদান করেন এবং তিনিই মুক্তি-মার্গের উপদেষ্টা, সাংখ্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদী দার্শনিকগণ যুক্তিযুক্ত না হইলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা প্রতি জীবে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়ার স্বাভাবিক শক্তি স্বীকার করিয়া এমন কতিপয় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন যাঁহারা স্বকীয় সাধনার দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া সর্বজনহিতার্থে মুক্তিলাভের উপায় প্রচার করিয়া থাকেন। তীর্থঙ্কর মহাবীর একজন ঐরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার উপদেশকে অবলম্বন করিয়া রচিত আগম-সাহিত্যের প্রামাণ্য জৈন সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।

বিষয়বস্তু

আধ্যাত্মিক বিকাশের মূলমন্ত্র অহিংসা, সংযম ও তপস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বহু ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকবিষয় জৈন প্রবচন বা আগম-সাহিত্যে আলোচিত হইয়াছে। দুঃখক্লিষ্ট সংসারের স্বরূপ ও তাহা হইতে মুক্তির উপায়—এই দুইটি প্রশ্নের সমাধান নানা প্রসঙ্গে নানারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে প্রতি অঙ্গ ও অঙ্গবাহ্য গ্রন্থে। তাই কথিত হইয়াছে—'তপ-নিয়ম-জ্ঞানরূপ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া অমিতজ্ঞানী সর্বজ্ঞ (তীর্থঙ্কর) ভব্য (মোক্ষের অধিকারী) জীবের প্রবোধের নিমিত্ত জ্ঞান (রূপ পুষ্পের) বৃষ্টি করেন। গণধরগণ তীর্থঙ্করের সেই উক্তি (রূপ পুষ্প) গুলি নিরবশেষ ভাবে জ্ঞানরূপ বস্ত্রে ধারণ করতঃ সেইগুলির দ্বারা প্রবচন (রূপ পুষ্পমালা) রচনা করেন।' বিবিধ দার্শনিক সমস্যাগুলির সমাধান নিহিত হইয়াছে তীর্থঙ্করোক্ত—'উপ্পন্নেই বা', 'বিগমেই বা' এবং 'ধুবেই বা'—এই তিনটি পদে। কথিত আছে এই তিনটি পদকে বীজরূপে গ্রহণ করিয়া গণধরগণ অঙ্গগ্রন্থগুলির রচনা করেন: 'উৎপাদ', 'বিগম' (ব্যয়) ও ধ্রৌব্য (স্থৈর্য)—এই তিনটি ধর্ম প্রত্যেক পদার্থে বিদ্যমান। এই তিনটি ধর্ম যাহাতে নাই তাহা অসৎ, তাহা অলীক। এক কথায় বলিতে গেলে, বিশ্বের জড় বা চেতন সকল পদার্থই পরিবর্তনশীল এবং সেই পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রত্যেক পদার্থের স্বীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। জ্ঞান ও কর্মবাদের এই মূল তথ্যগুলির দ্বারা আগম-সাহিত্য ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।

আগম সাহিত্যের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রন্থে আলোচিত বিবিধ বিষয়গুলি বিস্তৃত আলোচনা এই স্থলে সম্ভব নহে বলিয়া অঙ্গ ও অঙ্গবাহ্য গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিব।

আচারাঙ্গ নামক প্রথম অঙ্গগ্রন্থে অহিংসা এবং অহিংসামূলক আচারের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। গৃহত্যাগী সাধুর কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে নানা কথা এই অঙ্গটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সূত্রকৃতাঙ্গনামক দ্বিতীয় অঙ্গটিতে বহু প্রাচীন দার্শনিক মতবাদ ও তাহাদের খণ্ডন আমরা দেখিতে পাই। আত্মা, পুণ্য, পাপ প্রভৃতি পদার্থের স্বরূপ এবং অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিষয় স্থানাঙ্গনামক তৃতীয় অঙ্গটিতে স্থান লাভ করিয়াছে। সমবায়াঙ্গ নামক চতুর্থ অঙ্গটিতে ঐরূপ আরও বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ভগবতীসূত্র একটি আকর গ্রন্থ। জৈন ধর্ম ও দর্শনের বহু কথা প্রশ্নোত্তররূপে এই সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞাতৃ ধর্মকথা নামক ষষ্ঠ অঙ্গটিতে বহু উপদেশাত্মক ধর্মকথা সংগৃহীত হইয়াছে। উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, ও অনুত্তরৌপপাতিকদশা—এই তিনটি অঙ্গে কতিপয় আদর্শ জৈন গৃহস্থ এবং গৃহত্যাগী সাধুর জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। প্রশ্নব্যাকরণ নামক দশম অঙ্গটিতে হিংসা, অসত্য, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ—এই পাঁচটি দোষ এবং তাহাদের নিষেধরূপ অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি ব্রতের স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিপাকসূত্র নামক একাদশ অঙ্গটিতে শুভ ও অশুভ কর্মের ফলবিপাকের স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে।

অঙ্গবাহ্য গ্রন্থগুলির অন্তর্গত ঔপপাতিক নামক প্রথম উপাঙ্গে আলোচিত হইয়াছে জীব, অজীব প্রভৃতি তত্ত্বের স্বরূপ এবং দেব, নরক প্রভৃতি যোনিতে উপপাত বা জন্মলাভের কারণ এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায়। রাজপ্রশ্নীয় নামক দ্বিতীয় উপাঙ্গগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে শ্রাবস্তীর রাজা প্রদেশীর প্রশ্নের উত্তররূপে প্রদত্ত ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমণ কেশী কর্তৃক নাস্তিকবাদের খণ্ডন ও আত্মার স্বরূপ বর্ণন। জীবাভিগম-নামক তৃতীয় উপাঙ্গে বিশদভাবে জীব ও অজীব তত্ত্বের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। প্রজ্ঞাপনা নামক চতুর্থ উপাঙ্গ একটি আকর গ্রন্থ। ইহাতে জীব, অজীব, আস্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জরা ও মোক্ষ—এই সাতটি তত্ত্বের স্বরূপ এবং আরও বহু দার্শনিক তথ্য বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সূর্য প্রজ্ঞপ্তি, জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি ও

চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি নামক পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম উপাঙ্গে ভূগোল ও খগোল বিষয়ক বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। নিরয়াবলী নামক অষ্টম উপাঙ্গে মগধের রাজা বিম্বসার শ্রেণিকের কাল, সুকাল, মহাকাল প্রভৃতি দশটি পুত্রের নিরয় (নরক) গমন ও তাহার কারণ বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাঙ্গটি 'কল্পিকা' নামেও অভিহিত হয় কারণ সদোষ ও নির্দোষ—এই দুই প্রকার কল্প বা আচরণের মধ্যে সদোষ কল্পের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ রাজপুত্রগণ নরক গমন করেন। কল্পাবতংসিকা নামক নবম উপাঙ্গে রাজা বিম্বসার শ্রেণিকের পৌত্র পদ্ম, মহাপদ্ম, ভদ্র প্রভৃতির জীবন চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই গৃহত্যাগী হইয়া সংযম পালন করতঃ দেবলোকে গমন করেন। পুষ্পিকা ও পুষ্পচূলিকা নামক দশম ও একাদশ উপাঙ্গে কতিপয় জীবনচরিত্রের বর্ণন দ্বারা সংযম পালনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃষ্ণিদশা নামক দ্বাদশ উপাঙ্গটিতে বাসুদেব কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবের নিষধপ্রমুখ দ্বাদশটি পুত্রের জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ও সংযম পালন করতঃ দেবলোকে গমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রকীর্ণক গ্রন্থগুলিতে জীবনশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সাধনার উপায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ছেদ সূত্রগুলিতে সাধু জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও প্রায়শ্চিত্তাদি বর্ণিত আছে। উত্তরাধ্যয়ন, দশবৈকালিক প্রভৃতি মূল সূত্রগুলিতে বহু দার্শনিক তথ্য, সাধু জীবনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ও বৈরাগ্যোৎপাদক উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নন্দিসূত্রে জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকার অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনুযোগদ্বার সূত্রে নানাবিধ ব্যাখ্যা পদ্ধতি এবং নয়, প্রমাণ প্রভৃতি বহু দার্শনিক তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে।

অতি সংক্ষেপে জৈন আগম সাহিত্যের একটি সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইল। আগম সাহিত্যের অন্তর্গত প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির বিশেষ পরিচয় ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা লেখকের রহিল।

কোগ্রাম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

তোমারে হেরিতে বহুদিন হ'তে ছিল যে অভিপ্রায়,
ষাট পার হ'ল পরে দেখি শোভা পায়?
শুভ কার্ত্তিক মাসে
সবুজ পাথার সাঁতারি—তোমায় দেখিবার অভিলাষে
কুনুর হইনু পার,
দূর হ'তে তোমা আশ্রমসম লাগিল চমৎকার,
হেরিনু তোমার ঘেরি চারিধার শুচিতার সঞ্চার।

তোমার মাটিতে সহসা পা দিতে হইনু আত্মহারা,
সর্ব্ব অঙ্গে তুলি তরঙ্গ প্রতি রোম দিল সাড়া।
চক্ষে জাগিল অজয়ের শ্বেত সিকতার বিস্তার,
জনমান্তর স্মৃতি বুঝি মোর প্রাণ করে তোলপাড়।
চিনিনু তোমারে তুমি যে তীর্থভূমি
পিতামহদের চরণের ধূলি আজো ধ'রে আছ তুমি।
যেই ধূলিরূপে পদ্মদাসের কূলে
জীবন প্রদীপ রচিয়া জ্বালায়ে তুলসীমঞ্চে ফুলে,
তাহারি অংশ আমার এ দেহে মনে
চমকিয়া আজ উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে।

লোচনের পাটে এ লোচনে ঝরে জল,
মোচন করিতে এ পাণি হারায় বল,
দেহে শোণিতের প্রতি বিন্দুটি ক'রে উঠে কোলাহল।
কই মোরে তুমি, কহ,
কোথায় সাজিল সাত মধুকর কোথা সে ভ্রমর দহ?
কোথা চণ্ডীর ঘটী
পায়ে ঠেলি মাধু ডাকিয়া আনিল কালীদহে সঙ্কট।
ঐ মন্দিরে খুল্লনা মা কি দাঁড়াইয়া জোড়করে
ঢালি আঁখি জল যাচিত কুশল পতি-পুত্রের তরে?

লভি চণ্ডীর বর
যে ইছাই ঘোষ স্বাধীন হইয়া গৌড়ে দিত না কর
হেথা হতে হবে কত দূরে তা'র গড়?
প্রেম বন্যায় আসে যে ভাসায়ে নান্নুর কেন্দুলী
বৈরাগী দল বরষে বরষে গৈরিক কেতু তুলি'
রস মাতঙ্গ, তরঙ্গ কুল মাতি করে কোলাকুলি,
আগে আগে তার বাজে লোচনের খোল,
গৃহসংসার সব মনে পড়ে—হরিবোল, হরিবোল।
তব আহ্বানে মহাকীর্ত্তন আসে,
কৌপীন শুধু সম্বল থাকে আর সব স্রোতে ভাসে।

কোন সেই ভূমা যার তরে সঁপি ঐহিক সম্বল,
কীর্ত্তন পথে পাতিয়া রেখেছ কন্থার অঞ্চল?
সন্তান তব কৃষ্টির দায়া বহিয়াছে দেশে দেশে
বীরবেশে, চীর বেশে।
একতারা হাতে কত না বাউলে পাঠাইলে দিকে দিকে
খুঁজিতে তাদের মনের মানুষটিকে।
তোমার মানস কুসুমের সৌরভে
মোদিত করিলে গৌড় বঙ্গ মাতালে প্রেমোৎসবে।

মথুরা কোশল দ্বারকাপুরীর মত
ফুরায়ে আসিছে তোমার ত্যাগের ব্রত,
রাখিয়াছ তুমি শেষ সম্বল বুকের আঁচলে ঢাকি।
সেইটুকু তব সঁপিবার আছে বাকী।
চণ্ডীমায়ের চরণে আমার পরম আকিঞ্চন,
সুবিলম্বিত হউক তোমার চরম সমর্পণ।

পাপবোধের উৎপত্তি ও উন্মেষ

শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়

মানুষের মনে পাপবোধ যৌনবোধের মতই আদিম। বোধহয় সেই জন্যই বাইবেলে আদিম পাপের (original sin) পরিকল্পনা পাওয়া যায়। পাপের প্রসঙ্গটা ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত থাকলেও বহুক্ষেত্রে ওর মূল নিহিত থাকে সামাজিক চেতনায়। তাই দেশকালভেদে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'পাপ' আখ্যায় লাঞ্ছিত আচরণের তালিকারও বিভিন্নতা দেখা যায়! বস্তুতঃ পাপের অনুভূতি ও সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রভৃতির স্থায় একটা ক্রমবিকাশী নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে পাপবোধ মূলতঃ ব্যক্তির (Subjective); এর নির্ভরতা বিষয় অথবা উপলক্ষের উপরে ততটা নয়, যতটা ব্যক্তির নীতি-মানসের (ethical sense) উপরে। এই নীতিমানসের একটি বৃহদংশ—ধরতে গেলে এর বহিঃপ্রকাশের প্রায় সমস্তটাই—যুগধর্ম্মী, অতএব পরিবর্ত্তনশীল সমাজ থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে পুনর্গঠিত হয়। কেবল এর কেন্দ্র বিন্দুটুকুই (nucleus) প্রকৃতিজাত। এই কেন্দ্রবিন্দুতে নিহিত রয়েছে মানব-মনের আদিম নৈতিক আদর্শ। কম্পাস-সূচীর উত্তর দক্ষিণ-নির্দ্দেশিতা যেমন নিকটবর্ত্তী কোন চৌম্বক প্রভাব হেতু বিচলিত হয় মানুষের এই আদিম নৈতিক আদর্শও তেমনি বিভিন্নমুখী সামাজিক সূত্রের প্রয়োজনায় রূপান্তরিত হয়।

বস্তুতঃ পাপবোধ সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে নৈতিক আদর্শের সামঞ্জস্যমূলক একটি অনুপাতের বিপর্য্যয় থেকেই উদ্ভূত হয়। এই দিক থেকে কম্পাস সূচীর উপমাটি খুব প্রাসঙ্গিক। কম্পাস সূচী কোন অকস্মাৎ-প্রযুক্ত শক্তির দ্বারা আপনার সাম্যের অবস্থান থেকে বিচলিত হ'লে তার ভেতরে একটি কম্পন দেখা দেয়; সেই কম্পনের মধ্য দিয়েই সেটা আবার স্বস্থানে ফিরে আসতে চায়। আদর্শভ্রষ্ট মানুষের মনেও দেখা দেয় অনুশোচনা। এই অনুশোচনার স্পন্দনই তাকে জানিয়ে দেয় যে সে পাপ করছে এবং এই অনুশোচনাই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে তাকে আবার আদর্শের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনে। পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন অনুশোচনাই পাপবোধের-সজ্ঞান প্রকাশ।

কুলস্মৃতি (racial consciousness) এবং সমাজ-ব্যবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে পাপবোধ যখন একটি সুষম ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তাকেই আমরা স্বাভাবিক ভাষায় বলি বিবেক। এইটেই হ'চ্ছে আমাদের আচরণের আদর্শানুযায়িত্বের পরিমাপ করবার জন্যে মানসিক ওলন সূত্র (plumb-line) অথবা জেরো-জেরো রেখা (zero-zero line)। বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে আমাদের আচরণ যতদূরে সরে যাবে, সেইটাই আমাদের পাপের পরিমাণ; পাপবোধের তীব্রতাও তার সঙ্গে সমান অনুপাত রক্ষা ক'রে চ'লবে। বস্তুতঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রে (cognition) যেটা পাপ, অনুভূতির ক্ষেত্রে (affection) সেটাই পাপবোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই জন্যে আমরা বলি মনের অগোচর পাপ নেই: অর্থাৎ পাপের সঙ্গে-সঙ্গে পাপবোধও থাকবেই থাকবে। যেখানে মনে কোনো পাপবোধ হয় নি, অথচ কাজটিকে আমরা পাপ বলে উল্লেখ করি, সেখানে বুঝতে হবে যে কাজটি সমাজগত নৈতিক আদর্শকে অতিক্রম করেছে, যদিও কর্ম্মীর ব্যক্তিগত আদর্শ তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। এতে বোঝা যায় ব্যক্তিগত বিবেকের মতো সামাজিক বিবেক ব'লেও একটা বস্তু আছে। এই সামাজিক বিবেক যেখানে গ'ড়ে ওঠে নিজের নিয়মে—অর্থাৎ যে সমাজের স্মৃতিশাস্ত্র গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত, কোন প্রতাপশালী স্মার্ত্ত পণ্ডিতের জোর ক'রে চাপানো বিধিনিষেধের সংগ্রহ নয়—সেখানে সমাজবাসী লোকেদের বিবেকের গড় নির্ণয় ক'রলে তা সামাজিক বিবেকের কাছ ঘেঁসে যাবে। গড় নির্ণয়ের কথাটা নিছক তুলনা (analogy) হিসেবেই ব্যবহৃত হ'লো; কেন না, ব্যক্তির মতো সমাজেরও একটি পৃথক সত্তা আছে, তা কেবল কতকগুলি লোকের সংকলন নয়। অপর পক্ষে কোন লোকের ব্যক্তিগত বিবেক যখন সামাজিক বিবেকের সঙ্গে অনেকখানি অমিল প্রকাশ করে, তখন বুঝতে হবে সেই ব্যক্তিটি যথেষ্ট পরিমাণে সমাজ সচেতন নয়।

একেবারে আদিম অবস্থায় গুহামানবের মনে পাপবোধের এলাকা হয়তো খুব সঙ্কীর্ণ ছিল। তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হ'তো কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির (instincts) তাড়নায়। অনেকস্থলে এই প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক প্রবণতার (tropism) মতো সম্পূর্ণ অচেতনভাবে কাজ ক'রে যেতো। কিন্তু বর্ব্বর মানবসমাজ কিছু পরিমাণে আত্মসচেতন হ'তে না হ'তেই তাদের মনকে পাপবোধ ঘিরে ধ'রেছে। বর্ব্বরতার প্রতীক (totmic) যুগে দেখা যায় তাদের মধ্যে বিধিনিষেধের (taboos) অন্ত নেই। এ-দিক দিয়ে নিশ্চিতই ওরা সভ্যসমাজকে ছাড়িয়ে গেছে। এমন কি প্রাথমিক অবস্থায় নিরঙ্কুশ যৌনবিহার (promiscuosity) স্বভাবতঃ অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত থাকলেও আবার অনেক বর্ব্বর সমাজে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সতর্কতার পরিমাণ আমাদের বিস্মিত ক'রে দেয়। এখানে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে—সভ্যতার প্রসার মোটের ওপরে পাপবোধের পরিমাণ ও তীব্রতাকে বাড়িয়ে দেয় না কমিয়ে দেয়। নৃতত্ত্বের (anthropology) আলোচনা থেকে দেখা যায় বর্ব্বর সমাজে পাপবোধের মূল অজ্ঞানতাজনিত ভয়। Freud ও তার Totem and Taboo বইতে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথাই ব'লেছেন। যে ভয় অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিকদের মতে ধর্ম্মের মূল, সেই ভয়ই বর্ব্বরদের মধ্যে পাপবোধের সৃষ্টি করে। তা'হ'লে দাঁড়ালো এই যে ওদের পাপবোধ ধর্ম্মের অপভ্রংশ কুসংস্কার থেকে উৎপন্ন। প্রাক্-নৈতিক

(pre–moral) যুগে এক ভয় ছাড়া পাপের অন্য কোনো মাপকাঠি থাকা সম্ভব নয়। ওদের ধারণা অনুসারে যা' কিছু দুঃখের—বিশেষ ক'রে আধিদৈবিক দুঃখের কারণ, তাকেই ওরা পাপ বলে গণ্য করে। 'পাপ ক'রলে দেবতার বিচারে দুঃখ পেতে হয়'—আমাদের ধর্মশাস্ত্রের এই গোড়ার কথাটি সম্ভবতঃ সেই বর্ব্বর যুগেরই অনুস্মৃতি।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মনে পাপের যে একটা সম-সামাজিক ভিত্তি গড়ে উঠ্‌লো তার উদ্ভব অনেকটা এই রকম। পৃথিবীতে তিনভাগ জলের মতো মানুষের জীবনে দুঃখটাই প্রধান অংশ জুড়ে র'য়েছে, সুখ যেটুকু তা' অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এ বোধটা মানুষের সহজাত। সুখ মানুষের পরম কাম্য ব'লেই সুখ সম্বন্ধে একটা পালাই পালাই ভাব লেগেই থাকে। তাই যখনই মানুষ সুখ ভোগ করে, তখনই সে কখনও স্পষ্ট কখনও বা অস্পষ্টভাবে অনুভব করে যে ভবিষ্যতের খাতায় তার সুখের অংশ কমলো। বিশেষতঃ সে সুখে আছে এবং তারই পাশে অন্য কেউ দুঃখ ভোগ করছে, এমন ঘটনা সে যখন দেখে, তখন পার্শ্ববর্তীর দুঃখ যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই তার সুখকে আকর্ষণ করতে থাকে। যেমন ভৌগোলিক নিয়মে কোন জায়গায় বায়ুর চাপ বেড়ে গেলে সেখান থেকে বাতাস কম চাপ বিশিষ্ট অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়, মনস্তত্ত্বেও অবিকল সেই ধরণের একটি সাম্য-সংস্থাপনী নীতি আছে। এই নীতির সক্রিয়তায় বর্ত্তমানে উপভুজ্যমান সুখ স্বভাবতঃই ভবিষ্যতের দুঃখের ভূমিকারূপে প্রতিভাত হয়। বর্ত্তমানের থেকে ভবিষ্যত দামী—এটাও মানবমনের আর একটি স্বতঃসিদ্ধ। তাই যা কিছু ভবিষ্যত দুঃখের জনক, তাহাই পাপ তাকে পরিহার করতে হবে—এইভাবে পাপের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে উঠলো। এর বিপরীত সিদ্ধান্তটিকেও মানুষ বিনা পরীক্ষায় সত্য ব'লে মেনে নিলো। অর্থাৎ যা' কিছু বর্ত্তমানে ক্লেশকর তাই-ই ভবিষ্যতে সুখের হেতু হবে, অতএব তাই-ই মানুষের আচরণীয় পুণ্য। সেই জন্যই পুণ্য বলে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলীর বেশীর ভাগই শারীরিক কৃচ্ছ সাধন মূলক। মনে হয় সুখভোগই পাপ এবং দুঃখভোগই পুণ্য—এ ধারণা এক সময় আমাদের মধ্যে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। বুদ্ধ চরিতের রচয়িতা অশ্বঘোষ বুদ্ধের আত্মচিন্তনের অংশ স্বরূপ একটি শ্লোকে দেখিয়েছেন, দুঃখকে যদি পুণ্য ব'লে মনে করি, তবে সুখ হবে পাপ; তারই সঙ্গে যখন ধ'রে নে'য়া যায় ইহ জগতে দুঃখ ভোগ করলে পরলোকে সুখ পাওয়া যায়—তখন এই আত্মবিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে ইহ জগতে পুণ্য করলে তার ফলে পরলোকে পাপ হবে—ততো অধর্ম্মঃ ফলতীহ ধর্ম্মঃ। এই Reductio ad absurdumটি একটি সরল কুযুক্তির (fallacy) উপরে স্থাপিত হ'য়েছে। ইহ জগতের সুখই পাপ, পর জগতের সুখ পাপ নয়। কিন্তু এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় অশ্বঘোষের যুগে সম্ভবতঃ দুঃখ ও পুণ্যের নির্ব্বিশেষ একাত্মতা এদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ ক'রেছিল। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও mortification of the flesh অর্থাৎ দেহ-নিপীড়নের কথা পাওয়া যায়। এইরূপে পাপবোধের প্রথম এবং স্বাভাবিক স্তর এক ধরণের Stoicism অথবা সহিষ্ণুতাবাদের আকারে মানুষের মনে উপস্থিত হ'লো। এর উপরে এসে জমা হ'লো নৈতিক স্তর। এই নৈতিক স্তরের ভিত্তি উপযোগিতা-বাদের (utilitarianism) উপরে প্রতিষ্ঠিত।

পাপবোধের নৈতিক সম্বন্ধে Darwin-এর The Descent of man বই এ মানুষ ও ইতরশ্রেণীর নীতিবোধের তুলনামূলক আলোচনার প্রসঙ্গে একটি অতি সুন্দর মন্তব্য আছে:

'...A man cannot prevent past impressions often repassing through his mind he will thus be driven to make a comparison between the impressions of past hunger, vengeance satisfied, or danger shunned at other men's cost, with the almost ever-present instinct of sympathy, and with his early knowledge of that others consider as praise worthy or blamable. This knowledge cannot be banished from his mind, and from instinctive sympathy is esteemed of great moment. He will then feal as if he had been baulked in following a present instinct or habit and this with all animals causes dissatisfaction or even misery.'

এর থেকে বোঝা গেল যে মানুষ ঝোঁকের মাথায় কিংবা প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে হয়তো একটা কাজ ক'রে ব'সলো, কিন্তু তার অতীতের অভিজ্ঞতা তাকে ব'লে দেয় যে এর ফল ভাল হবে না এবং এই সচেতনা-টুকুও তার মধ্যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে যে এর দ্বারা সে তার সঙ্গী-সাথীদের সমর্থন হারালো, যে সমর্থনের প্রতি লোভ তার দুর্নিবার; এই সব অনুভূতির সংমিশ্রণ তার মনের মধ্যে একটি অসন্তোষের সৃষ্টি করে এবং এই অসন্তোষ অনুতাপের আকার নেয়। সে বোধ করে যে সে অন্যায় করেছে, পাপ করেছে। (এখানে Sin আর Vice—এই দুটোতে হয়তো মেশামেশি হ'য়ে গেল, কিন্তু পাপবোধের উদ্ভবের আলোচনা করতে গেলে এ দুটোকে পৃথক ব'লে গণ্য করা চলে না।)

এর উপরে যে স্তরের আরোপ হয় সেটা আচরণিক ও আনুষ্ঠানিক। এর মূল হ'লো অভ্যাসগত অনুষ্ঠানে। স্বভাবতঃই ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এর রূপ ভিন্ন। এক-এক সমাজ এক-এক ধরণের আচার ও অনুষ্ঠানকে কেন যে নীতি ও ধর্ম্মসম্মত ব'লে গ্রহণ করলো বর্ত্তমানে তার মর্ম্মভেদ করা সহজ নয়। বোধ হয় এর পিছনেও অংশতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনের তাগিদ এবং রুচিগত বিশেষত্ব কাজ ক'রেছে। এটা স্বাভাবিক যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নারীর বস্ত্র-হীনতাকে শালীনতার অভাব ও দুর্নীতি-মূলক ব'লে গণ্য করা হ'বে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নগ্নতাবাদের (Nudism) প্রচার সত্ত্বেও ইংলণ্ডে এখনও কোনো সংকীর্ণ শ্রেণীর মধ্যেও একে সমর্থন করা হয়নি। কিন্তু আচার সম্বন্ধে যাই হোক, অনুষ্ঠানের পুরাতত্ত্ব অনেক বেশী জটিল। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী তার আপেক্ষিক দুর্ব্বলতা অতএব নির্ভরশীলতার পরিচয় দেয়, না তার কল্পনাকুশলতা প্রমাণিত করে—এ বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জো নেই। একে একটি সুপরিকল্পিত দার্শনিক ভাবনা প্রবাহ

ব'লেও মনে হয় না, তাই একে অনুষ্ঠানের মধ্যেই ধ'রেছি। সম্ভবতঃ অনুষ্ঠানের মূলে অনেক জায়গায় কিছু পরিমাণে খেয়াল-খুশীর (arbitrariness) সংমিশ্রণ আছে, ঠিক যে ধরণের খেয়াল-খুশী ভাষার বিবর্তনে কাজ ক'রেছে। কিন্তু উদ্ভবের ইতিহাস যাই হোক, কোন আচার অথবা অনুষ্ঠান যখন কোন সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তখন তাকে অতিক্রম করাকে যার কাছে পাপ ব'লে মনে হবে না এমন লোক সেই সমাজে বেশী মিলবে না। শোনা যায়, বিধবা ভ্রাতৃজায়া ক্যাথারাইন অব্ আ্যারগণকে বিবাহ করবার জন্যে অষ্টম হেন্‌রির মনে পরে পাপবোধ জাগ্রত হ'য়েছিল। এখানে সামাজিক দণ্ড অথবা অসমর্থনের ভয় নেই। কিছুদিন আগেও আমাদের মধ্যে গোপনে কুক্কুট-মাংসাহারী যুবককে অনুতাপের পীড়নে দগ্ধ হ'তে দেখা গিয়েছে। বোধহয় সমাজের অনুশাসনগুলি আমাদের মনে মনোবিকলন বিশেষজ্ঞের (Psycho-analyst) Suggestionএর মতো কাজ করে এবং সেখানে স্থায়ী নৈতিক বাঁচা (mould) সৃষ্ট হয়ে ওঠে। মনোবৈজ্ঞানিক যাকে বলেন Complex, তার থেকে এদের মূলগত পার্থক্য এই যে এগুলির পেছনে যে কেবল সমাজের অনুমোদন আছে তাই-ই নয় সমাজের অঙ্গুলি-হেলনেই এদের উৎপত্তি। আসলে কিন্তু এই ধারাগুলিও একজাতীয় কর্ম্মপ্রেরক্।

সমাজে বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে স্বভাবতঃই অতি অল্প সংখ্যক লোক জন্মগ্রহণ করে, বাকী সকলেই প্রাথমিক আচরণে সামাজিক বিবেক দ্বারা চালিত হয়। এই একমাত্র বিবেক তাদের ধর্ম্মভীরু ক'রে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। তবু কিন্তু আমরা সকলেই পাপী।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি :
জানম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি :—

[এ]টা জনসাধারণের চিরন্তন স্বীকারোক্তি। জানা ও করা—তারো চেয়ে [বে]শী জানা ও হওয়ার মধ্যে একটা বড়ো রকম পার্থক্য থাকে। সাধারণ-[ভা]বে বলতে গেলে এর কারণ এই যে আমাদের মনের মধ্যে জানাকে কর্ম্মে [প]রিণত করবার যে একটা যন্ত্র বসানো আছে, তার কার্য্য-কারিতা [(e]fficiency) সাধারণ মনুষ্যের বেলা খুব কম। এটা হোলো [জ্ঞা]নের পরিভাষা। আবার ব্যবসায়িক উপমা প্রয়োগ ক'রে বলা চলে, জ্ঞান ও কর্ম্মের এক্‌সচেঞ্জ আফিসের কেরানী কিছুটা জ্ঞানকে ডিস্‌কাউন্ট হিসেবে ধ'রে রাখে। এখানে জ্ঞান ব'লতে আমি বিশেষভাবে বিবেককেই বুঝছি। মানুষের বিবেক-ভ্রংশের কারণ অবশ্য পরিচালনী শক্তি হিসেবে বিবেকের দুর্ব্বলতাই নয়। এর অন্য কারণ ডারুইন সাহেব তাঁর পূর্ব্বো-লিখিত বইয়ে প্রসঙ্গক্রমে ব'লেছেন। সামাজিক মানুষের পক্ষে আচরণের ক্ষেত্রে সামাজিক বিবেকই অবশ্য মূল সুর। এরই সমতলে মোটামুটিভাবে তার জীবন-নাট্যের অভিনয় হয়। কিন্তু এরই সমান্তরালে তার আদিম প্রবৃত্তিগুলোও (instinct) কাজ ক'রে চলেছে। থেকে থেকে ওগুলো বেশ শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে এবং অকস্মাৎ-প্রযুক্ত বলের (impulsive force) মতো আমাদের সামাজিক বিবেকের উপরে আপতিত হ'য়ে আমাদের আদর্শভ্রষ্ট করে দেয়। কিন্তু এই নূতন অবস্থানে (এইটাই পাপের অবস্থান) আমরা বেশীক্ষণ থাকতে পারি না। উড়ুক্কু মাছের মতো কিছুক্ষণ নভোবিহার ক'রেই বাইবেলে বর্ণিত অমিতাচারী পুত্রের (Prodigal Son) মতো আমরা আবার পূর্ব্ব অবস্থানে ফিরে আসি। এই জন্যই বোধহয় আশাবাদী দার্শনিকেরা বলেন, মানুষের চরম প্রবণতা ভালোর দিকেই। কিন্তু ঠিক ক'রে ব'লতে গেলে ব'লতে হয়, মানুষের মূল প্রবণতা পাপের দিকে কিন্তু তার স্থায়িত্ব পুণ্যের সমতলে। পুণ্যের দিকে যে আদিম ঝোঁক মানুষের মধ্যে দেখা যায়, সে প্রতিক্রিয়াত্মক। পুণ্য হ'চ্ছে মাটি আর পাপ আকাশ। পুণ্যকে সাধারণতঃ আকাশ ও পাপকে রসাতল ব'লে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু পুণ্যকে ব্যবহারিক (practical) আদর্শ ম'নে ক'রলে আর তাকে আকাশ বলা যায় না, কেননা পাখীর মতো নভোসঞ্চার আমাদের স্বাভাবিক আয়ত্তে নয়। আর যা কিছু মাটি ছাড়িয়ে র'য়েছে তাকে আমরা আকাশ ব'লেই জানি, রসাতলের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমাদের মনে নেই।

পাপ সর্ব্বক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ফল, তাই পাপের আকর্ষণ এতো তীব্র। একধরণের দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে পাপকে adventure ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু পাপ ক'রলে তার মূল্য দিতে হবে, তা যে আকারেই হোক। তাতে রাজি হলেই হোলো। Gerald Gould যেমন ব'লেছেন—

I have a price to pay, and I pay
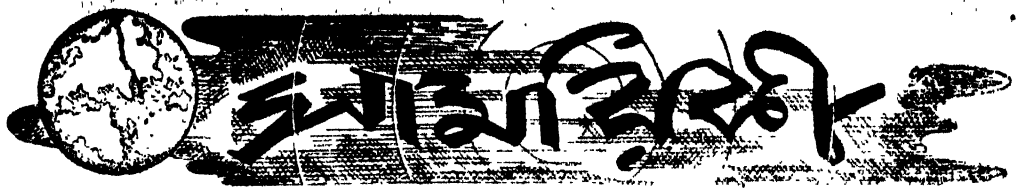
নির্বাচন—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের নির্বাচন শেষ হইয়া আসিল। মোট ২৩৮টি সদস্য পদের মধ্যে কংগ্রেস দল ১৫১টি আসন লাভ করিয়া একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। তাহার পরই কম্যুনিষ্ট দল—তাহাদের সদস্য সংখ্যা ২৮ জন। এবারের নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—পশ্চিমবঙ্গে ১৩জন মন্ত্রীর মধ্যে ৭জন মন্ত্রীর পরাজয়। মন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার শারীরিক অসুস্থতার জন্য সদস্যপদ প্রার্থী হন নাই—প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা, ডক্টর আর-আমেদ এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্মন—এই ৫জন নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন এবং মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—এই ৭জন জয়লাভ করিতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে বহু দলের উদ্ভব হইয়াছিল এবং এক একটি কেন্দ্রে ১২।১৩জন পর্য্যন্ত প্রার্থী একটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শুধু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে মাত্র একজন প্রার্থী ছিলেন। একদিকে যেমন বহু খ্যাতনামা কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় ঘটিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই অন্যান্য দলের বহু খ্যাতনামা নেতাও পরাজিত হইয়াছেন। মেদিনীপুরে জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি, নদীয়ার জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪পরগণার জেলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিরও যেমন নাম উল্লেখযোগ্য—তেমনই ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কৃষক প্রজা মজদুর নেতা শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, হিন্দুসভার নেতা শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কংগ্রেস বিরোধী দলের নেতাদেরও নাম করা যায়। কংগ্রেস পক্ষের জমীদারপ্রার্থী বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীউদয়চাঁদ মহাতাব, উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যেমন পরাজিত হইয়াছেন, তেমনই অন্য পক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মেদিনীপুর মহিষাদলের শ্রীদেবপ্রসাদ গর্গ, বর্দ্ধমান শেয়ার-সোলের শ্রীপশুপতিনাথ মালিয়া প্রভৃতিও জয়ী হইয়াছেন। ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান হইলেও তথায় যে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় অনাদৃত নহে, তাহার প্রমাণে মুর্শিদাবাদ, ২৪পরগণা প্রভৃতি জেলায় কয়েকজন মুসলমান প্রার্থীকে কংগ্রেস পক্ষের প্রার্থী হইয়া জয়লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী হইয়াও লোকসভা (পার্লিয়ামেণ্ট) নির্বাচনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাথ সাহা, কম্যুনিষ্ট শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির জয়লাভে যোগ্যতার সমাদর দেখা গিয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বিধান পরিষদের নির্বাচনে খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়লাভও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিধান পরিষদে জলপাইগুড়ী জেলায় ১০টি, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ৮টি ও কোচবিহারের ৬টি—আসনের সবগুলিতেই কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন। নদীয়া জেলাতেও ১০টির মধ্যে ৯টি ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৬টির মধ্যে ১৪টি আসন কংগ্রে-পাইয়াছে। হাওড়ায় ১৬টির মধ্যে ৮টি, হুগলী জেলায় ১৪টি মধ্যে ৭টি, বর্দ্ধমান জেলায় ২০টির মধ্যে ১০টি, বাঁকুড় ১৪টির মধ্যে ১১টি ও মালদহে ৯টির মধ্যে ৬টি আ কংগ্রেস পাইয়াছে। সোসালিষ্ট দল ও আর-সি-পি-দল পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় একটিও আসন পায় ন হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের ২০জন জয়লাভ করিলেও তাঁহারা হয় ত শেষ পর্য্যন্ত সংখ্যাগ কংগ্রেস দলের সহিতই একযোগে কাজ করিবেন। কং দল ভাঙ্গিয়া যাঁহারা কৃষক প্রজা মজদুর দল গঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সব নেতার পরাজয় ঘটায়, সে দলের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা বলা কঠিন। তাঁহাদের দলের ২৪পরগণা হইতে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও নদীয়া

হইতে শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের জয়লাভ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা যে কম্যুনিষ্টদিগের সহিত একযোগে কাজ করিবেন এমন মনে হয় না। ভারতবর্ষের লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—খ্যাতনামা কবি ও ভারতবর্ষের লেখক শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ও নদীয়ায় কংগ্রেসের প্রার্থী হইয়া বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের লেখক শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন—বর্ত্তমান নির্বাচনে পুনরায় জয়লাভ করিয়াছেন।

প্রবাসী বাঙালী বালিকার কৃতিত্ব—

লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের হোবর্ণবরো দ্বারা পরিচালিত—এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়—১০ বৎসর

শ্রীমতী শর্মিলা চক্রবর্তী

বয়স্কা শ্রীমতী শর্ম্মিলা চক্রবর্ত্তী প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। তাহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রীমতী এনিড ব্লাইটনের (Enid blyton) সাহিত্য। শ্রীমতী শর্ম্মিলা লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সহকারী আইন উপদেষ্টা দেওঘর নিবাসী শ্রীহিতেসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা।—আমরা তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।—

কোমাগাটা মারু স্মৃতি—

গত ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বজবজে কোমাগাটামারু স্মৃতিস্তম্ভের আচরণ উন্মোচন করিয়া গিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সেদিনের ইতিহাস সম্বলিত এক সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর যে স্থানে একদল দেশপ্রেমিক কর্ম্মীকে হত্যা করা হইয়াছিল, বজবজের সেই স্থানে স্মৃতি স্তম্ভটি রক্ষিত হইয়াছে। পুস্তকে সেদিনের বীর 'বাবা গুর্দিৎ সিং' এর চিত্র আছে—বাবা গুর্দিৎ ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আজও জীবিত। সেদিনের ঘটনায় ২০ জন মারা যায়, ২১১ জন ধৃত হয় ও ২৮ জন পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। বাবা গুর্দিৎ পলায়নকারীদের অন্যতম। আজ ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর তাঁহাদের কাহিনী সকলের স্মরণ করার সময় আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এই পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার করায় সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালী আজ সেই অকৃত্রিম দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া 'নূতন বঙ্গ' নির্মাণে অগ্রসর হইবার শক্তিলাভ করুক, তবেই কোমাগাটামারুর স্মৃতিরক্ষা সার্থক হইবে।

আমেরিকার আটজন মণীষী—

কলিকাতাস্থ আমেরিকান কনস্যুলেট জেনারেল-এর ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স ইনফরমেশন সার্ভিস কর্ত্তৃক ঐ নামে এক পুস্তিকা প্রণীত হইয়া বিতরণ করা হইতেছে। ইহাতে নিম্নলিখিত ৮ জন মণীষীর জীবনকথা, চিত্র ও জীবনের ঘটনার চিত্রাদি আছে—চমৎকার ছাপা। যে কেহ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন—(১) জাতির জনক 'জর্জ্জ ওয়াশিংটন, ১৭৩২-১৭৯৯ (২) মানবাধিকার রক্ষার অগ্রদূত টমাস জেফারসন—১৭৪৩-১৮২৬ (৩) জনগণের কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান, ১৮১৯-১৮৯২ (৪) যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি রক্ষায় শহীদ আব্রাহাম লিঙ্কন, ১৮০৯-১৮৬৫ (৫) কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ জর্জ্জ ডব্লু কার্ভার, ১৮৬৪-১৯৪৩, (৬) শিল্পজগতে অগ্রণী এন্ড্রু কার্ণেগী ১৮৩৫-১৯১৯ (৭) মানব হিতৈষিণী সমাজ সেবিকা জেন এডাম্স—১৮৬০-১৯৩৫ (৮) বৈদ্যুতিক প্রতিভার আধার টমাস-এ-এডিসন ১৮৪৭-১৯৩১। এই প্রচার কার্য্যের ফলে

আমেরিকার সহিত ভারতের মৈত্রী বৃদ্ধি পাইবে। ভারত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ও বিদেশে এই ভাবে প্রচার কার্য্য পরিচালিত হইলে ভারত সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইবে।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ—

ইংলণ্ডের তথা বৃটীশ সাম্রাজ্যের সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস এলিজাবেথ

পরলোকগত রাজা ষষ্ঠ জর্জ

(২৬ বৎসর বয়স্কা) নূতন সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ষষ্ঠ জর্জ ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৭ সালে বৃটীশ সম্রাট পদ লাভ করেন। তাঁহার পিতা পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর তাঁহার অগ্রজ অষ্টম এডোয়ার্ড সিংহাসন লাভ করেন—কিন্তু তিনি পদত্যাগ করায় ষষ্ঠ জর্জ সম্রাট হইবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু ১৫ বৎসরের অধিক তাঁহার পক্ষে রাজ্য ভোগ সম্ভব হইল না। সাম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়ার মৃত্যুর ৫১ বৎসর পরে পুনরায় একজন উপাধি গ্রহণ করিলেন। বয়স ২৬ বৎসর হইলেও নূতন সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ বহু গুণের অধিকারিণী, সুশিক্ষিতা এবং পিতামহী মেরীর মত হইয়াছেন। নূতন সাম্রাজ্ঞীর একটি ৩ বৎসরের পুত্র ও একটি ১৮ মাসের কন্যা আছে। তাঁহার স্বামী গ্রীসের রাজবংশের সন্তান, মাউণ্টবেটেন বংশসম্ভূত। তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর—নাম ফিলিপ।

ইংলণ্ডের নূতন রাণী এলিজাবেথ

ভারতে আজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও পূর্ব-সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়া ভারতবাসী সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছে।

অভিবাদন—

গত ২৬শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় 'ভারতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক দিবসে সানন্দ অভিবাদন' জানাইয়া আমাদের এক উপহার দিয়াছেন। তাহাতে বাঙ্গালীর পৌষ পার্বণের এক ত্রিবর্ণ চিত্র মুদ্রিত আছে। ছবি খানি সকল দিক দিয়া ঐ পবিত্র দিনের উপযোগী—

রক্ষা করিবেন। প্রধান মন্ত্রীর অভিবাদন—ঐ দিনটিকে সকলের মনে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। উহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে—

'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।'

প্রধান মন্ত্রীকে প্রত্যভিবাদন জানাইয়া আমরা প্রার্থনা করিব, তাঁহার নেতৃত্বে ও পরিচালনায় বঙ্গজননী সত্যই অপরূপ রূপ ধারণ করুন।

সুপ্রসিদ্ধা মহিলা লেখিকা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর মাতৃবিয়োগ—

বিগত ৭ই মাঘ সোমবার ইং ২১শে জানুয়ারী ১৯৫২ সাল প্রাতঃকালে কোচবিহারের ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী তদীয় চতুর্থ পুত্র শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষের ৬৫।২ হিন্দুস্থান পার্কের ভবনে সজ্ঞানে

নারায়ণী দেবী

পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের স্বর্গীয় রমানাথ দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং মির্জাপুরের স্বর্গীয় পঞ্চানন ঘোষের (যাঁহার নামে কলিকাতায় পঞ্চানন ঘোষের ষ্ট্রীট আছে) পুত্রবধূ ছিলেন। তিনি চার পুত্র, ছয় কন্যা এবং বহু নাতি নাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত দানশীলা ও ধর্মপ্রাণা মহিলা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধা মহিলা লেখিকা

মহিলা লেখিকার উপাধি লাভ—

গৌহাটির সুপরিচিতা সমাজ-সেবিকা ও লেখিকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না সেনগুপ্তা মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন সংগ্রামের সহিত যুদ্ধ করিয়াও সাহিত্য সাধনার উল্লেখ-

শ্রীমতী জ্যোৎস্না সেনগুপ্তা (গৌহাটি)

যোগ্য উদাহরণ স্থাপন করিয়াছেন। চারিটি সন্তানের জননী, বেয়াল্লিশ বর্ষীয়া এই মহিলা নিজ চেষ্টায় বিশ্বভারতীর অন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে সাহিত্যতীর্থ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

প্রাচ্যবাণী মন্দির—

বিগত ২০শে এবং ২১শে জানুয়ারী প্রাচ্যবাণী মন্দিরের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতা রাজভবনের মার্বেল হলে সম্পন্ন হইয়াছে। ২০শে জানুয়ারী রবিবারের সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠ, অশীতিপরবয়স্ক ডক্টর যদুনাথ সরকার মহাশয়। ডক্টর নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডক্টর সেনগুপ্ত মহাশয় প্রাচ্যবাণী মন্দিরের বর্তমান কার্যপদ্ধতি ও গবেষণা

মন্দিরের অকুণ্ঠ উদ্যম ও কার্যোদ্দীপনা এবং কর্মকুশলতা অচিরে সার্থকতায় আত্মপ্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সংস্কৃত শিক্ষা ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের বহুল প্রচেষ্টা বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কাশী, দিল্লী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থলে শাখা স্থাপন পূর্বক প্রাচ্যবাণী মন্দির সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের এবং সংস্কৃত জ্ঞান সম্প্রসারণের বিশেষ জোর প্রদানপূর্বক তিনি বলেন যে, সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষাসমূহের পাঠ্যতালিকাভুক্ত প্রায় ১২০০ গ্রন্থের মধ্যে এমন কি ২০০ শত গ্রন্থও বর্তমানে মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায় না; ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চা বিষয়ে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, যুগে যুগে বঙ্গদেশ সংস্কৃত শিক্ষায় অগ্রণী ছিল এবং ভারতের স্বাধীনতাগমে সেই বঙ্গদেশেই সংস্কৃত শিক্ষাও

প্রাচ্যবাণী মন্দিরের ছাত্র দিবসোপলক্ষে অভিনীত প্রতিমা-নাটকের প্রেক্ষামণ্ডলী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার, শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত ও বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী

র অপূর্ব যত্ন করিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই সার্থক হইবে। প্রাচ্যবাণী প্রকাশিত গ্রন্থাবলী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগুলীর পরম আদরের সামগ্রী। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উল্লেখপূর্বক রাজ্যপাল মহোদয় বলেন যে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ভারতীয় নানা প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা হইতে অনেকাংশে সহজ এবং এই ভাষা শিক্ষার অপরিসীম গবেষণার পথ সর্বতোভাবে সুগম করিবার জন্য প্রাচ্যবাণী মন্দিরের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যম। পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া রাজ্যপাল মহোদয় বলেন যে তাঁহাদিগের চিত্ত অবনমিত হওয়ার কোনই কারণ নাই। পূর্বে বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তার নিমিত্ত অনুবাদাদির মাধ্যমে যে সরকারী কার্যব্যবস্থা অবলম্বন

[illegible]

পরিষদের তাদৃশ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্বক তিনি বলেন ভারতজননীর সেবাই তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সেই জন্যই সংস্কৃত শিক্ষা তাহাদের জীবনের অবশ্য ব্রত হওয়া উচিত। উপসংহারে উপস্থিত সুধীবৃন্দকে রাজ্যপাল মহাশয় আশ্বাস দেন যে, পূর্বোক্ত সর্ববিষয়ে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পূর্ণ সাহায্য প্রদান করিবেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্বগৌরব অচিরেই সম্পূর্ণ উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। প্রধান অতিথি ডক্টর যদুনাথ সরকার মহাশয় মনোজ্ঞ সংস্কৃত ভাষায় অভিভাষণ প্রদান করেন; তিনি বলেন যে, জাতীয় ভাব স্বকীয় জীবনে যাহাতে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুরিত হয়, তজ্জন্য সংস্কৃত শিক্ষা ভারতীয় মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সংযম শিক্ষা, জীবন নিয়ন্ত্রণ, প্রকৃষ্ট দেশসেবা প্রভৃতি সর্বব্যাপারে সৌকর্যের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা জাতীয় জীবনের অপরিহার্য সম্পদ এবং এই সম্পদের যে অধিকারী হইতে পারেনা, সে হতভাগ্য। দ্বিতীয় দিনে বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে প্রাচ্যবাণী ছাত্রদিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্র ও ছাত্রী সদস্য ও অন্যান্য সুধীবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং রাজ্যপাল পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় মহোদয়া প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ তালুকদার উদ্বোধন করেন; বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত তালুকদার বলেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের বিচিত্র রাজ্যে একবার মাত্র প্রবেশ করিলে তাহার অভিনব সমৃদ্ধি সম্ভারে মনপ্রাণ বিমোহিত হয়, ইহার তুলনা জগতে নাই। ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধনপূর্বক সুললিত সংস্কৃত ভাষায় প্রাচ্যবাণীর যুগ্মসম্পাদক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন যে, আজ ভারতের দিকে দিকে জনজাগরণের যে সাড়া পড়িয়াছে, সেই জনজাগরণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত করিবার জন্যই আমাদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার অনিবার্য প্রয়োজন এবং বঙ্গবাসী ছাত্রছাত্রীমাত্রেরই সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি দরদী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের সম্যক সুযোগসুবিধা বিধানের নিমিত্ত প্রাচ্যবাণী মন্দির বিগত দুই বৎসর আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে এবং তিনি এই আশা সম্পূর্ণভাবে পোষণ করেন যে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টার ফল অচিরেই সমষ্টিগতভাবে বঙ্গীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের মাধ্যমে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলেন যে, যুক্তিযুক্ত বিচারের মাপকাঠিতে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের বিচার করিতে হইবে এবং এই মাপকাঠিতেও বিশ্বসাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান অতুলনীয়। উভয় দিবসেই প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্যগণ কর্তৃক মহাকবি ভাসরচিত প্রতিমা নাটক মূল সংস্কৃত অভিনীত হয়। উচ্চারণ বৈশুদ্ধ্য এবং অভিনয়চাতুর্য সকলের মনোরঞ্জন করে। ডক্টর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে পাঁচজন অভিনেতাকে পদক পুরস্কার দেওয়া হয় এবং শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ আরো কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করেন।

আমাদের সম্পাদকের সাফল্য—

ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত নির্বাচনে ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর কেন্দ্রে পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ কেন্দ্রের আগড়পাড়া গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি ও আজন্ম বাসস্থান। তিনি কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী ছিলেন এবং জনসাধারণের প্রীতি ও শুভেচ্ছাই নির্বাচনে তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত নর্থ বারাকপুর, বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট, খড়দহ ও পানিহাটী এই ৪টি মিউনিসিপাল

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নব-নির্বাচিত সদস্য শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এলাকা এবং বিলকান্দা, বন্দিপুর ও শিউলী তিনটি ইউনিয়ন এলাকার অধিবাসীদের ভোটে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। ঐ কেন্দ্রে মোট ৫ জন প্রার্থী ছিলেন এবং সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় প্রার্থী অপেক্ষা তিন হাজারেরও অধিক ভোট পাইয়াছিলেন। সারা জীবন তিনি ঐ অঞ্চলে কংগ্রেস তথা জনসাধারণের সেবা দ্বারাই এই যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, নূতন কর্মক্ষেত্রেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন। শ্রীভগবানের নিকট আমরা তাঁহার কর্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পরলোকে মেজর কুণালচন্দ্র সেন—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পৌত্র মেজর কুণালচন্দ্র সেন, এম, বি, ই গত ১৮ই জানুয়ারী প্রত্যূষে তাঁহার ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি অবিভক্ত ভারতের ডাক ও তার বিভাগের বাংলা ও আসাম সার্কালের ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ইজিপ্ট, বসরা, সেলোনিকা ও মেসোপটেমিয়া'র যুদ্ধক্ষেত্রে অপূর্ব্ব বীরত্বের জন্য সম্মানিত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি ভারতস্থ আর্মি মেল সেক্সানের ডেপুটি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ছিলেন। মেজর কুণালচন্দ্র একজন চৌকস্ খেলোয়াড় ও সু-অভিনেতা হিসাবে প্রখ্যাত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ ও অভিনয় করিয়া তিনি বিশ্বকবি কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি বাংলা ও ইংরাজী পুস্তক জনসমাদৃত হইয়াছিল।

পরলোকে মেজর কুণালচন্দ্র সেন এম-বি-ই

তিনি একজন উদারচেতা, ধর্ম্মপ্রাণ ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়

শ্রীমেনকারাণী চন্দ্র

জীবনের রঙ্গমঞ্চে অসময়ে টানে যারা যবনিকা খানি
আপন ললাট পরে দেয় আঁকি সমাপ্তির বাণী ;
অনধীত অধ্যায়ের অকথিত ভাষা
মনের নিভৃত কোণে তৃপ্তিহীন আশা—
গুমরি গুমরি কাঁদে যাহাদের ব্যর্থ হতাশায় ;
মালিন্যের রূঢ়তম আঘাতে হারায়—
জীবনের ভার সাম্য যেন ক্লান্তি ভরে,
অনাহত পথধূলি পরে—
তাহাদের শ্রান্তিময় অপর্য্যাপ্ত নগ্নতার যূপকাষ্ঠ পরে
স্তব্ধ নিশা জ্যোতিহীন তমসার অকূল গহ্বরে,
দেখাও আলোক তব ওগো জ্যোতির্ম্ময় !
মুমূর্ষু প্রাণের রসে জাগাও নির্ভয়।
অরণ্যের সামগান স্রোতস্বিনী পরে,
স্বপ্নময় ভাষাহীন বেপথু অন্তরে,—
জাগাইয়া দিক্ বাণী অন্তরে উল্লাস।
পূর্ণ হোক্ মহত্তের হর্ষ কলোচ্ছ্বাস॥

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ—ইংলণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট :

৫ম টেষ্ট—মাদ্রাজ :

ইংলণ্ড : ২৬৬ (রবার্টসন ৭৭, স্পুনার ৬৬, কার ৪০। মানকড় ৫৫ রানে ৮ উইকেট) ও ১৮৩ (রবার্টসন ৫৬, ওয়াটকিন্স ৪৮। মানকড় ৫৩ রানে ৪ এবং গোলাম মহম্মদ ৭৭ রানে ৪ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৪৫৭ (৯ উইকেটে ডিক্লে: উমরীগড় নট আউট ১৩০, পঙ্কজ রায় ১১১, ফাদকার ৬১। হিলটন ১০০ রানে ২, ওয়াটকিন্স ৮৪ রানে ২ এবং ট্যাটারসাল ৯৪ রানে ২ উইকেট।

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত পঞ্চম টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ এক ইনিংস ৮ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করায় আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে খেলার ফলাফল সমান দাঁড়িয়েছে। ইংলণ্ডের বিপক্ষে সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়লাভ। ভারতবর্ষ এ পর্য্যন্ত ২৫টি সরকারী টেষ্ট ম্যাচ খেলেছে, ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৫টি, অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫টি এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫টি। মোট খেলায় ফলাফল : ড্র ১২ (ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৭, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৪ এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১) এবং হার—১২টি (ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৭, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১ এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪) এবং জয় ১টি (ইংলণ্ডের বিপক্ষে)।

ভারতবর্ষ-ইংলণ্ডের মধ্যে প্রথম সরকারী টেষ্ট ম্যাচ সুরু হয়েছে ১৯৩২ সালে। ইংলণ্ডের জয় ৭ এবং ভারতবর্ষের ১। ৭টি খেলা ড্র গেছে। মোট ৫টি টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড 'রাবার' পেয়েছে ৪বার। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজেই কেবল 'রাবার' অমীমাংসিত থেকে গেল। ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড 'রাবার' পায় বটে কিন্তু সেবার মাত্র একটি টেষ্ট খেলা হয় এবং ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতবর্ষের পক্ষে সেই প্রথম সরকারী টেষ্ট খেলা। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ভারতবর্ষের 'রাবার' পাওয়া খুবই সঙ্গত ছিল। দিল্লীর প্রথম টেষ্ট খেলাতে ভারতবর্ষের জয়লাভ করা খুবই উচিত ছিল কিন্তু ভারতবর্ষ সে সুযোগ হেলায় হারিয়েছে বলা চলে। শেষ, পঞ্চম টেষ্ট খেলাতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়লাভের যে অদম্য জিদ্ ছিল তার অভাব আগের খেলাগুলিতে ছিল বলেই খেলাতে প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। ক্রিকেট খেলায় ভুল-ত্রুটি জয়লাভের পক্ষে একমাত্র অন্তরায় নয় যতখানি অন্তরায় সৃষ্টি করে জিদের অভাব। বিজয় হাজারে, ভিনু মানকড় এবং পঙ্কজ রায় এই তিনজন পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচই খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে টেষ্ট খেলায় নবাগত তরুণ খেলোয়াড় পঙ্কজ রায়ের সাফল্যই বেশী করে সকলকে আকৃষ্ট করেছে। দ্বিতীয় এবং ৫ম টেষ্টে সেঞ্চুরী রান ক'রে দর্শক সাধারণকে তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ দান করেছেন। তাঁর সজাগ ফিল্ডিংও এই সঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবীণ টেষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র ভিনু মানকড় সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। ভারতীয় দলে তাঁর স্থান পূরণ করার মত খেলোয়াড় বর্ত্তমানে কেউ নেই।

মাদ্রাজের চীপক মাঠে ৬ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ড টসে জয়লাভ ক'রে পঞ্চম টেষ্ট খেলা সুরু করে। অসুস্থ থাকায় নাইজেল হাওয়ার্ডের স্থানে ডোনাল্ড কার ইংলণ্ডের অধিনায়কত্ব করেন। প্রথম দিনের নির্দ্ধারিত সময়...

ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ২২৪ রান করে। মানকড় ৪৬ রানে ৩টে উইকেট পান। রবার্টসন ৭১ রান ক'রে নট আউট থাকেন। স্পুনার ৬৬ রান করেন।

পরলোকগত ইংলণ্ডের রাজা ৬ষ্ঠ জর্জ্জের সম্মানার্থে ৭ই ফেব্রুয়ারী খেলা স্থগিত রাখা হয়।

৮ই ফেব্রুয়ারী, খেলার দ্বিতীয় দিনে ২৬৬ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের রানের সঙ্গে মাত্র ৪২ রান যোগ হয়, ৭০ মিনিটের খেলায়। দলের পক্ষে রবার্টসন সর্ব্বোচ্চ ৭৭ রান করেন।

এইদিন মানকড় ইংলণ্ডদলের বিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ হ'ন। মাত্র ৯ রান দিয়ে তিনিই ইংলণ্ডের বাকি

মানকড়

পাঁচজনকে আউট করেন। এই পাঁচজনকে আউট করতে মানকড়কে ৬.৫ ওভার বল দিতে হয়, তার মধ্যে মেডেন পান ৩টে। ইংলণ্ডের ২৬১ রানের মাথায় মানকড় পর পর বলে কার এবং রিজওয়েকে আউট করেন। এর পরই ট্যাটারসাল মানকড়ের বল আটকে তাঁর 'হ্যাট-ট্রিক' নষ্ট করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের কোন খেলোয়াড়ই হ্যাট-ট্রিক করতে পারেননি।

লাঞ্চের ৩৫ মিনিট আগে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে মুস্তাক এবং রায়ের জুটিতে। লাঞ্চের সময় ৩১ রান দাঁড়ায়, রায় ২২, এবং মুস্তাক ৯। একঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষের ৫০ রান ওঠে। ৫৩ রানের মাথায় মুস্তাক আলী নিজের দোষে ৭৫ মিনিটের খেলায় ২২ রান ক'রে ষ্টাম্প আউট হ'ন। প্রথমদিকে স্পুনার হাতে বল না রেখেই উইকেট ভেঙ্গে ফেলেন। বলটা মাটিতে পড়ে থাকে। মুস্তাক ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। নতুবা পুনরায় ক্রিজে ফিরে আসার সময় তিনি যথেষ্ট পেয়েছিলেন। স্পুনার মাটি থেকে বল কুড়িয়ে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় মুস্তাককে আউট করেন। রায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে হাজারে এবং মানকড় যথাক্রমে ২০ এবং ২২ রান ক'রে আউট হয়ে যান। অমরনাথ রায়ের সঙ্গে খেলতে নামেন। ট্যাটারসলের বলে এক্সট্রা-কভার বাউণ্ডারী মেরে রায় তাঁর ১০১ রান পূর্ণ করেন। দলের রান তখন ১৭৩। এই রান করতে রায়ের ২১৫ মিনিট সময় লাগে। বাউণ্ডারী
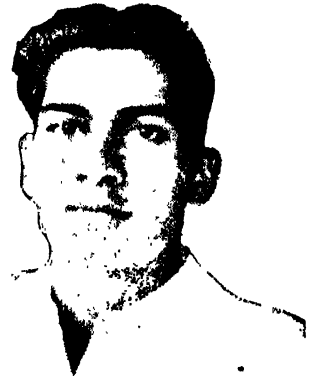
ফাদকার

করেন ১৩টা। রায় মাত্র একবার প্রথমদিকে আউট হতে হতে বেঁচে যান। দলের ১৯১ রানের মাথায় রায় ১১১ রান ক'রে ট্যাটারসালের বলে ওয়াটকিন্সের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। ড্রাইভ ক'রে বেশীর ভাগ রান তুললেও রায় লেগেও বল পাঠিয়ে রান করেন। তাঁর খেলা দর্শকমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দদান করে। নির্দ্ধারিত সময়ে ৪ উইকেটে ভারতবর্ষের ২০৬ রান ওঠে। অমরনাথ এবং ফাদকার যথাক্রমে ২৭ এবং ৩ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষ ৯ উইকেট হারিয়ে ৪৫৭ রানের উপর ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড ক'রে ইংলণ্ডকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে দেয়। উমরীগড় ১৩০ রান ক'রে নট আউট থাকেন। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের অন্যান্য খেলাতে

উমরীগড় মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি। ৫ম টেষ্টে তিনি সৌভাগ্যক্রমে দলভুক্ত হ'ন, অধিকারী হঠাৎ আহত হয়ে পড়ায়। ফাদকারের ৬১ রানও উল্লেখযোগ্য। অমরনাথ ৩১ রান করেন। গোপীনাথ করেন ৩৫ রান। তৃতীয় দিনের খেলায় দর্শনীয় মার হয়েছিল, হিলটনের বলে সোজা ড্রাইভে উমরীগড়ের 'ওভার বাউণ্ডারী'। নির্দ্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিটের কিছু আগে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের থেকে ১৯১ রানের ব্যবধানে থেকে ২য় ইনিংস সুরে ক'রে এবং কোন উইকেট না হারিয়ে ১২ রান করে।

১০ই ফেব্রুয়ারী, টেষ্টের চতুর্থ দিনের খেলা ভারতবর্ষের পক্ষে সুদীর্ঘ বছর স্মরণীয় হয়ে থাকবে। খেলা আরম্ভের দশ

উমরীগড়

মিনিটেরও কম সময়ে ইংলণ্ডের স্পুনার এবং লসন আউট হয়ে যান। দলের রান ১৫ অর্থাৎ পূর্ব্ব দিনের রানের সঙ্গে মাত্র ৩ রান যোগ হয়েছে।

দলের ১৩৫ রানে ৫টা উইকেট পড়ে যায়। ইংলণ্ডের তখন একমাত্র ভরসা ওয়াটকিন্স এবং কারের উপর। এঁরা দু'জনে দিল্লীর ১ম টেষ্টে ইংলণ্ডকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু সে ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হ'ল না। দু'জনেই ১৫৯ রানের মাথায় আউট হ'ন। এর পর ইংলণ্ড দলের ১৭৮ রানের মাথায় ৮ম এবং ৯ম উইকেট পড়ে গেল। ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও ১৩ রান দরকার। খেলায় শেষ দিকটায় কি উত্তেজনা! সুদীর্ঘ বছর অপেক্ষার পর ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাধনা সার্থক হ'তে চলেছে। তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস ১৮৩ রানে শেষ হয়ে গেল চা-পানের ২০ মিনিট আগে। মানকড় ৫৩ রানে ৪টে এবং গোলামমহম্মদ ৭৭ রানে ৪টে উইকেট পান। রবার্টসন দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ ৫৬ রান করেন। তাঁর পরই ওয়াটকিন্সের ৪৮ রান উল্লেখযোগ্য। মানকড় ৫ম টেষ্টে মোট ১২টা উইকেট পেয়ে ভারতীয় দলের পক্ষে একটি টেষ্ট ম্যাচে বেশী উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেন। এ সম্পর্কে বিশ্ব রেকর্ড করেন, ইংলণ্ডের এস, এফ বার্ণেস ১৭টা উইকেট পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২য় টেষ্টে ১৯১৩-১৪ সালে জোহানেসবার্গে। তিনি উইকেট পান ৫৬ রানে ৮টি এবং ১০৩ রানে ৯টি।

উইকেট-রক্ষক পি সেন ৫ম টেষ্টের ১ম ইনিংসে ৪টি ষ্ট্যাম্প ক'রে ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেটে রেকর্ড করেন। টেষ্ট ক্রিকেটে এরূপ কৃতিত্ব বিরল। লক্ষ্য করার বিষয়, সেন দু' ইনিংসে যে ৫জনকে ষ্ট্যাম্প করেন তা মানকড়ের বলেই। এ থেকে উভয়ের মধ্যে বেশ একটা বোঝাপড়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য সিরিজে ভারতীয় দলের উইকেট-রক্ষক বেশী ষ্ট্যাম্প করেছেন, ১১টা। ইংলণ্ডের মাত্র ১টা। রান আউট হয়েছে ভারতীয় দলের ৬জন, ইংলণ্ডের মাত্র ১জন। এ পর্য্যন্ত ১৫টি টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের কোন খেলোয়াড়ই নিজের উইকেট ভেঙ্গে আউট হ'ন নি। ইংলণ্ডের ২জন হয়েছেন এবং তা আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে।

চতুর্থ টেষ্ট—কানপুর

ভারতবর্ষ : ১২১ (রায় ৩৭। ট্যাটারসাল ৪৮ রানে ৬ উইকেট হিলটন ৩২ রানে ৪ উইঃ)

ও ১৫৭ (অধিকারী ৬০। হিলটন ৬১ রানে ৫ উইকেট)

ইংলণ্ড : ২০৩ (ওয়াটকিন্স ৬৬। গোলাম আমেদ ৭০ রানে ৫ এবং মানকড় ৫৪ রানে ৪ উইকেট)

ও ৭৬ (২ উইকেটে। গ্রেভসী ৪৮ নট আউট)

কানপুরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেষ্ট ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ভারতবর্ষকে হারিয়ে 'রাবার' লাভের পথে এগিয়ে যায়। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং ওয়েষ্টইণ্ডিজ এই তিনটি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষ যে সরকারী টেষ্ট খেলেছে তার একটা দেশের

সত্বেও ভারতবর্ষের ভাগ্যে একবারও 'রাবার' জুটেনি। ইংলণ্ডের সঙ্গে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ভারতবর্ষ প্রাধান্ত-লাভের যে সুযোগ হারালো তা নিকট ভবিষ্যতে আসবে বলে মনে হয় না। খেলায় দোষত্রুটি ছাড়াও ভারতীয়দলের পক্ষে সাফল্যলাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছে দল গঠন ব্যাপারে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর রক্ষণশীল নীতি। অন্তদেশে দলাদলি যে নেই তা নয়, তবে সেখানের পরিচালকমণ্ডলী এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এত জাগ্রত যে, আভ্যন্তরীণ দলাদলির নোংরামি প্রাধান্ত লাভ ক'রে জাতীয় সম্মানকে বিসর্জ্জন দেয় না। খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ব্যাপারে আমাদের বিপক্ষদল আমাদের তুলনায় অনেক বেশী দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে এসেছে। অপরকে দেখেও আমরা কোন শিক্ষালাভ করতে পারিনি। কানপুরের খেলার ফলাফল ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের সবথেকে বেশী হতাশ করেছে। পাঁচদিনের খেলা আড়াইদিনের কিছু কম সময়ে শেষ হয়েছে।

১২ই জানুয়ারী টেষ্ট খেলা সুরু হয়। ভারতবর্ষ টসে জিতে ব্যাট করে। প্রথম ব্যাট করার সুযোগ কোন কাজেই লাগেনি। ৩৯ রাণের মাথায় তিনটি উইকেট পড়ে যায়। প্রথমদিনের খেলাতেই স্পিন বোলারের পক্ষে পীচ যে এতখানি সহায়ক হবে তা কেউ পূর্ব্বাহ্নে কল্পনা করতে পারেন নি। ইংলণ্ডের অধিনায়ক হাওয়ার্ড সময়মত বোলার পরিবর্ত্তন ক'রে খেলায় যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ৪ উইকেটে মাত্র ৫০ রাণ দাঁড়ায়। ১২১ রাণে দলের ইনিংস শেষ হয়। স্পিন বোলার ট্যাটারসাল ৪৮ রাণে ৬টা এবং হিলটন ৩২ রাণে ৪টে উইকেট পান। ট্যাটারসাল খেলার এক সময় ৮টা বলে কোন রাণ না দিয়ে ৩টে উইকেট পান। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইংলণ্ডদলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩ উইকেট পড়ে ৬৩ রাণ দাঁড়ায়। মানকড় ২টো এবং সিন্ধে ১টা উইকেট পান। অধিনায়ক হাজারে কালক্ষেপ না ক'রে স্পিন বোলারদের উপর আক্রমণের ভার ছেড়ে দেন কিন্তু ইংলণ্ডদলের মত ভারতীয় বোলারদের আক্রমণে তেমন তীব্রতা ছিল না।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ২০৩ রাণে শেষ হয়। ইংলণ্ডের পক্ষে ওয়াটকিন্স উভয়দলের সর্ব্বোচ্চ ৬৬ রাণ করেন। গোলাম আমেদ ৭০ রাণে ৫টা উইকেট পান।

৮২ রাণ পিছনে পড়ে ভারতীয়দল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে কিন্তু এবারও সূচনা ভাল হ'ল না। ১ম উইকেট পড়ে ৭ রাণে, ২য় এবং ৩য় পড়ে ৩৭ রাণের মাথায়।

চায়ের কিছু পরে ভারতীয়দলের খেলার অবস্থা এমন জয়লাভ একরকম সম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উমরীগড় এবং অধিকারী দলকে এই শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার করেন। হাজারে প্রথম ইনিংসের মত এবারও কোন রাণ না ক'রে আউট হ'ন। ৩ উইকেট হাতে নিয়ে ভারতীয় দল মাত্র ৪৩ রাণে এগিয়ে থাকে। তৃতীয় দিনের খেলায় ১৫৭ রাণে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস শেষ হয়। অধিকারী দলের সর্ব্বোচ্চ ৬০ রাণ করেন। হিলটন ৫, ট্যাটারসাল ২ এবং রবার্টসন ২ উইকেট পান।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৭৬ রাণ তুলতে ইংলণ্ডকে ২টো উইকেট হারাতে হয়।

অষ্ট্রেলিয়া—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ :

পঞ্চম টেষ্ট

অষ্ট্রেলিয়া : ১১৬ (ম্যাকডোনাল্ড ৩২। গোমেজ ৫৫ রানে ৭ এবং ওরেল ৪২ রানে ৩ উইকেট) ও ৩৭৭ (মিলার ৬৯, হ্যাসেট ৬৪, ম্যাকডোনাল্ড ৬২, হোল

পরলোকগত পতৌদির নবাব ইফ্‌তিকার আমেদ

৬২। ওরেল ৯৫ রানে ৪ এবং গোমেজ ৫৮ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৭৮ (মিলার ২৬ রানে ৫ এবং জনষ্টোন ২৫ রানে ৩ উইকেট) ও ২১৩ (ষ্টলমেয়ার ১০৪। লিণ্ডওয়াল ৫২ রানে ৫ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া এই শেষ টেষ্ট ম্যাচে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে ২০২ রানে পরাজিত করেছে। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের ৪র্থ টেষ্টে জিতে অষ্ট্রেলিয়া পূর্ব্বেই 'রাবার' পেয়ে যায়। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে খেলার ফলাফল দাঁড়াল : অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৪ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ (৩য় টেষ্ট)।

অষ্ট্রেলিয়া-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এ নিয়ে ২টি টেষ্ট সিরিজে মোট ১০টি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে; অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৮ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২। অষ্ট্রেলিয়া দু'বারই 'রবার'

শুরু হয় ১৯৩০-৩১ সালে। ১৯৫২ সালের টেষ্ট সিরিজের গড়পড়তা তালিকায় অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ব্যাটিংয়ে প্রথম স্থান পেয়েছেন হ্যাসেট, মোট রান ৪০২, সর্ব্বোচ্চ রান ১৩২ এবং এভারেজ ৫৭·৪৩। মিলার, (এভারেজ ৪০·২২) রিং এবং লিণ্ডওয়াল যথাক্রমে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ স্থান পেয়েছেন। বোলিংয়ে ১ম স্থান পেয়েছেন মিলার, ৩৯৮ রানে ২০টা উইকেট, এভারেজ ১৯·৯০। জনষ্টোন ২য় স্থানে এভারেজ ২২·০৯। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তায় ১ম স্থান পেয়েছেন গোমেজ, মোট রান ৩২৪, সর্ব্বোচ্চ রান ৫৫ এভারেজ ৩৬·০০। ওরেল ২য় স্থানে আছেন, মোট রান ৩৩৭, সর্ব্বোচ্চ রান ১০৮, এভারেজ ৩৩·৭০। বোলিংয়ে ট্রিম ১ম স্থান পেয়েছেন, ৫টা উইকেট ৫৯ রানে, এভারেজ ১১·৮০। গোমেজ ২য় স্থানে, ২৫৬ রানে ১৮টা উইকেট, এভারেজ ১৪·২২। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে বেশী উইকেট পেয়েছেন জনষ্টোন ২৩টা ৫০৮ রানে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে পেয়েছেন ভ্যালেনটাইন ২৪টা ৬৯১ রানে, এভারেজ ২৮·৭৯। সর্ব্বোচ্চ রান হ্যাসেট (অষ্ট্রেলিয়া) ১৩২ এবং ওরেল (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) ১০৮ রান।

অষ্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম শ্রেণীর খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ব্যাটিংয়ে ১ম ওয়ালকট, মোট রান ৭৫১, সর্ব্বোচ্চ রান ১৮৬ (দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান), এভারেজ ৪১·৭২। ওরেল ২য়, মোট রান ৬১৯, সর্ব্বোচ্চ রান নট আউট ১৬০, এভারেজ ৪১·২৬। বোলিংয়ে ১ম ট্রিম, ২৫০ রানে ১৫টা উইকেট, এভারেজ ১৬·৬৬। দলের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উইকেট পেয়েছেন ভ্যালেনটাইন ৫৩টা, এভারেজ ২৪·৫৪।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে টেষ্ট খেলায় 'রাবার' লাভের ফলে অষ্ট্রেলিয়া নিজেকে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটদল প্রমাণিত করেছে।

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৫২ সালের জানুয়ারীর ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া ৯টি টেষ্ট সিরিজে মোট ৪৪টি টেষ্টম্যাচ খেলেছে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয় ৩৮ এবং হার মাত্র ৬টি টেষ্টম্যাচ। এই ৯টি টেষ্ট সিরিজের মধ্যে ৮টিতে অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' পেয়েছে। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেষ্ট সিরিজে টেষ্ট ম্যাচের ফলাফল সমান দাঁড়ায়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া ৪টি টেষ্ট সিরিজ খেলেছে—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ২টি, ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১টি ক'রে। এই ৪টি টেষ্ট সিরিজের মোট ২০টি খেলায় অষ্ট্রেলিয়া অপরাজেয় অবস্থায় 'রাবার' লাভ করে; অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয় ১৫টি খেলা ড্র ৫টি।

অষ্ট্রেলিয়ার এই গৌরবময় অধ্যায়ে দলের অধিনায়কত্ব করেন ডন্ ব্র্যাডম্যান ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৮ সালে এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৪৭-৪৮ সালে। হ্যাসেট করেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৪৯-৫০ সালে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া ২০টি টেষ্ট খেলাতে অপরাজেয় থেকে প্রথম পরাজয় স্বীকার করে ১৯৫১ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে পঞ্চম টেষ্টে এবং ২য়বার ১৯৫২ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৩য় টেষ্টে। ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতা নেই। বে-সরকারীভাবে অষ্ট্রেলিয়াকে নিঃসন্দেহে ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান বলা চলে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক মহাত্মা গান্ধী রচিত গ্রন্থের অনুবাদ "ধারবেদা মন্দির হইতে"—১।০
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থ "রাশিফল"—২৲
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "পরিচয়"—২৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "প্রিয়তমা"—২৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "সাগর-রুদ্র স্বপন"—২৲, "উদ্দীপ্ত মোহন"—২৲, "দুর্দ্ধর্ষ মোহন"—২৲
শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত উপন্যাস "জীবনায়ন" (২য় সং)—৪।০, "সহযাত্রিণী" (২য় সং)—৩৲
শ্রীমতী মিনতি নাথ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মেঘে ঢাকা চাঁদ"—২।০
চরণানন্দ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "শতদল"—১।০
শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী প্রণীত "ছেলেদের গীতা"—১।০
ভিক্ষু শীলাচর সঙ্কলিত "ইসিপতন—সারনাথ"—১।০
জসীম উদ্দীন প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মাটির কান্না"—২৲
অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "স্বপ্ন ও সংগ্রাম"—২৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "গৃহদাহ" (৬ষ্ঠ সং)—৪।০, "নিষ্কৃতি" (১৬শ সং)—১।০
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম" (৩০শ সং)—২৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "দুর্গাদাস" (১২শ সং)—২।০
রাধারাণী দেবী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মিলনের মন্ত্রমালা" (৩য় সং)—৩৲
নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "কুরুক্ষেত্র" (৯ম সং)—৩৲
শ্রীনিত্যানন্দ কর্ম্মকার প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "রক্ত-লেখা"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

শিল্পী—আর, কে, শর্ম্মা

ভীম ও দ্রৌপদী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

চৈত্র—১৩৫৮

দ্বিতীয় খণ্ড	উনচত্বারিংশ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

-জীবন বার্ত্তা *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

সন্ন্যাসীর নেতিবাদ

এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম এবং এই আত্মা চতুষ্পাৎ। ইনি নির্ব্বিশেষ অচিন্ত্য, ব্যবহারিক জগতের অতীত, ইহাতে সমস্ত স্থির হইয়া আছে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, ২।৭

বিশ্ব চেতনার পরপারে যাহা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত অহংকে নয়—বিপুল বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহার অপরিমেয় পটভূমিকায় অতি তুচ্ছ একটা ক্ষুদ্র ছবি মাত্র এরূপ এক বিশ্বাতীত চৈতন্য আছে। ইহা সমস্ত বিশ্ব ও তাহার ক্রিয়া রাজিকে ধারণ করিয়া অথবা কেবল উপদ্রষ্টা রূপে বর্ত্তমান আছে। অতি বিশাল এই বিশ্বপ্রাণকে ইহা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে অথবা আপন আনন্ত্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে।

জড়বাদী তাহার দিক হইতে যেমন বলিতে পারে—জড়ই সত্য পদার্থ; যাহার সম্বন্ধে আমরা একরূপ নিশ্চিত হইতে পারি তাহা এই ব্যবহারিক জগৎ; তাহার অতীত যদি কিছু থাকে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, একেবারে অসৎ বা শূন্য না হইলেও মনের একটা স্বপ্ন, সত্য বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন একটা ভাবনা মাত্র; ঠিক তদ্রূপ সন্ন্যাসী বিশ্বাতীতের ভাবে বিমুগ্ধ ও বিভোর হইয়া তাহার দিক হইতে বলিতে পারে যে শুদ্ধ চিৎই সত্য, ইহাই জন্ম, মৃত্যু ও পরিণাম-রহিত একমাত্র তত্ত্ব; এই ব্যবহারিক জগৎ মন ও ইন্দ্রিয়ের সৃষ্ট—কল্পনা বা স্বপ্ন, শুদ্ধ ও শাশ্বত জ্ঞান হইতে পরাঙ্মুখ চিত্তের একটা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র।

যুক্তি ও অনুভবের সাক্ষ্য পরস্পর-বিরোধী এই উভয়

* শ্রীঅরবিন্দ কৃত Life Divine ৩য় অধ্যায় অবলম্বনে।

মতের অনুকূলে সমান ভাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে। জড়বাদ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাক্ষ্যকে মাত্র বিশ্বাস করিতে বলে। ইন্দ্রিয় দ্বারা জড়জগৎ অনুভূত হয় সুতরাং ইহা সত্য, জড়াতীত কিছু অনুভূত হয় না সুতরাং অতীন্দ্রিয় যাহা কিছু তাহা মিথ্যা বা অ-সৎ (non-existent) —ইন্দ্রিয়ের এই দাবি যে সত্য নয় তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কেবল তাহাকেই সত্য মনে করিবার অভ্যাসের ফলে জড়বাদী বলে যে জড়াতীত কোন সত্য নাই কিন্তু জড় জগতে এমন সব সূক্ষ্ম পদার্থ আছে যাহা ইন্দ্রিয় দিয়া ধরিতে না পারিলেও তাহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা জড়বাদীর পক্ষেও অসম্ভব। তাহার যুক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় জড়াতীত কিছু নাই, ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয় তাহা সত্য নহে। ইহাতে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাকেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, নিরপেক্ষভাবে দেখিলে এরূপ বিচারের কোন মূল্য নাই [এরূপ ভুল বিচারকে ইংরাজীতে argument in a circle বলে—ন্যায়শাস্ত্র মতে সিদ্ধ-সাধন]

ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাকে ধরা যায় না এমন জড় বস্তু যে কেবল আছে তাহা নহে, আমাদের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-বোধ বা দৃষ্টিশক্তি আছে যাহা দ্বারা জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াও জড়বস্তুকে জানা যায়। যাহাদের উপাদান এবং গঠন প্রণালী আমাদের স্থূল জগতের মত নয় এমন সকল অতীন্দ্রিয় বস্তু বা জগতের সঙ্গেও এই সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দিতে পারে।

মানুষের মধ্যে যখন চিন্তা শক্তির প্রথম উন্মেষ হইয়াছে সেই বহু পুরাকাল হইতে অতীন্দ্রিয় বস্তু ও জগৎ সম্বন্ধে মানুষ তাহার বিশ্বাসও অনুভবের কথা বলিয়া আসিতেছে। মধ্যে জড় জগতের রহস্য-নির্ণয়ের জন্য মানুষের মন একান্ত ভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনাতে তাহার উৎসাহ কমিয়া গিয়াছিল কিন্তু নূতন ভাবের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আবার এ সমস্তের দিকে তাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ এমন ভাবে বাড়িয়া চলিতেছে যে যাহাদের মন কেবল মাত্র অতীতের মোহে আবিষ্ট অথবা যাহাদের বুদ্ধি শাণিত থাকা সত্ত্বেও অনুভব এবং অনুসন্ধানের স্বরচিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাহিরে কিছু দেখতে চায় না, কিম্বা যাহারা পূর্ব্ব যুগের মৃত বা মুমূর্ষু মতবাদগুলিকে রক্ষা করিবার একান্ত চেষ্টা করা এবং তাহাদের পুনরাবৃত্তি করাই যুক্তি এবং জ্ঞানালোক বলিয়া ভুল করে তাহারা ছাড়া অন্য সকলে অতীন্দ্রিয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। এই সমস্ত প্রমাণের মধ্যে দূর অনুভূতি (প্রাকাম্য) বা তদনুরূপ অলৌকিক রহস্যের কোন কোন বাহ্য বিভূতিকে এখন আর কেহ বড় সন্দেহের চক্ষুতে দেখে না।

রীতিমতভাবে অনুসন্ধানের ফলেও জড়াতীত তত্ত্বের আভাস মাত্র মানুষ পাইয়াছে বলিতে হয়, যে আভাস পাইয়াছে তাহাও অপূর্ণ এবং অস্পষ্ট। কারণ যে ভাবে যে পদ্ধতিতে এ বিষয়ে গবেষণা চলিয়াছে তাহা এখনও অনেকটা অপক্ক এবং দোষত্রুটীপূর্ণ। তৎসত্ত্বেও আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না জড় জগতের তেমন অনেক তথ্য পুনরাবিষ্কৃত এই সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আমাদিগকে দিয়াছে। সেই সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আমাদিগকে জড়াতীত জগতের সংবাদ যখন দিতে আসে তখনই তাহাদের সাক্ষ্য মিথ্যা হইবে এ কথাও সমর্থন করা যায় না। সকল সাক্ষ্যকে এমন কি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়দত্ত সাক্ষ্যকেও যুক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া যেমনভাবে বুঝিয়া লইতে হয়, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র, বিধান এবং পদ্ধতির সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া তবে তাহাদিগকে যেমন গ্রহণ করিতে হয় এ সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে তেমনি ভাবে বুঝিতে এবং গ্রহণ করিতে হইবে এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু জড় জগতের সত্যের জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হইয়া আত্ম পরিচয় দিবার যেমন দাবি আছে, বৃহত্তর অনুভূতির ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত বস্তু ও জগতের তদুপযোগী সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হইয়া আত্ম পরিচয় দিবার ঠিক তেমনি দাবি নিশ্চয়ই আছে। এই জগতের অতীত মহান রূপ রেখায় যাহাদের রূপায়ন, বিপুল শক্তি ও বিধানের যাহারা আধার সেইরূপ অনেক জগৎ আছে। তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য তদুপযোগী জ্যোতির্ম্ময় বৃত্তি ও সাধন আমাদের মধ্যে আছে। তথা হইতে তাহাদের শক্তির আবেশ এই জড়ীয় আবেষ্টনে এই জড়দেহে অনেক নামিয়া আসে এবং এইখানেই তাহাদের প্রকাশ ক্ষেত্র গড়িয়া তোলে। তাহারা যে আলোর

দূত পাঠায় তাহাদের কাছে তাহাদের পরিচয়ও কিছু পাওয়া যায়।

আমাদের সকল অনুভবের মূলে রহিয়াছে চৈতন্য, যাহাকে সাক্ষী-চৈতন্য বলা যায়। বিশ্বজগৎ তাহার অনুভবের ক্ষেত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ অনুভবের দ্বার বা উপায়। জড়-জগৎ এবং তাহার বস্তুনিচয় হউক অথবা জড়াতীত বস্তু বা জগৎই হউক, জগৎ এক বা বহু হউক—এই সাক্ষী চৈতন্যের কাছে সত্য বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইবে কেবলমাত্র তাহাই সত্য বলিয়া আমরা জানিব। মানুষ জগৎকে নিজ চৈতন্যের বিষয়রূপে প্রতিভাত দেখিতে বাধ্য, কারণ ইহা মানব-চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য। এক পক্ষের যুক্তি এই—মানুষের এই ভাবে দেখা শুধু মানুষের দেখার বেলায় সত্য তাহা নহে, সমস্ত জগৎ ব্যাপারটা এইরূপ, এখানে এক সাক্ষীচৈতন্য আছে, জগতের সমস্ত পদার্থ-ক্রিয়া বা ভাব এই সাক্ষী-চৈতন্যের বিষয়; সাক্ষী থাকিবে না—সাক্ষ্য বা বিষয় ও ক্রিয়া থাকিবে ইহা হইতে পারে না, কারণ এই চৈতন্যের মধ্যে এই চৈতন্যের জন্যই বিশ্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, বিশ্বের বা তাহার কোন ক্রিয়ার তদতিরিক্ত কোন স্বাধীন সত্তা নাই। জড়বাদীর পক্ষ হইতে ইহার এই উত্তর দেওয়া হয় যে জড়জগতের একটা শাশ্বত সত্তা আছে তাহা কাহারও দ্বারা সৃষ্ট নহে। এ জগতে জীবন এবং মনের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ইহা বর্ত্তমান ছিল এবং প্রাণ-মনের ক্ষণিক দীপ্তি আবার যে দিন নির্ব্বাপিত হইয়া তাহাদের বিলয় হইবে সেদিনও জড় জগৎ থাকিবে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিপরীত-মুখী এ ধারা দুইটার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মূল্য খুব বেশী, কারণ এই তত্ত্ব-বিদ্যা হইতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে; যাহা দ্বারা তাহার জীবন, যে জন্য সে সাধনা করে সেই লক্ষ্য এবং যেখানে তাহার শক্তি নিবদ্ধ রাখে সেই ক্ষেত্র পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। কেননা ইহার মূলে রহিয়াছে 'বিশ্ব সত্য কিনা' এবং তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় 'মানব জীবনের মূল্য কি' এই গুরুতর প্রশ্ন।

জড়বাদের সিদ্ধান্তকে যদি আমরা একান্ত করিয়া ধরি তবে দেখিব যে ব্যক্তির বা জাতির জীবন ও নিয়তি আমাদের কাছে তুচ্ছ এবং অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এ মতে ভাল ভাবে আমরা ইহাই জানিব যে ব্যক্তি নাড়ীচক্রের বা স্নায়ুমণ্ডলীর বিকার হইতে জাত ক্ষণস্থায়ী এবং জাতি তাহারই একটু দীর্ঘকালস্থায়ী একটা মিথ্যা মানসিক বোধ মাত্র। তখন ন্যায়তঃ হয় এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হইতে যতটা সুখ ও ভোগ আদায় করা যায় তাহা করা উচিত হইবে (—যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ) না হয় জাতি ও ব্যক্তির নিঃস্বার্থ কিন্তু লক্ষ্যহীন সেবায় জীবন কাটাইতে হইবে। আমরা যে জড় শক্তির তাড়নায় কাজ অথবা ভোগ করি তাহা আমাদিগকে ক্ষণস্থায়ী এবং মিথ্যা একটা জীবন দিয়া বিভ্রান্ত করে- অথবা নৈতিক এবং মানসিক পূর্ণতার মিথ্যা একটা মহত্ত্বের বোধ দিয়া বঞ্চনা করে। জড়বাদও শেষকালে আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদের মত সদাসদাত্মিকা এক মায়াতে আসিয়া পৌছে, সৎ কেন না ইহা প্রত্যক্ষ এবং ইহাকে স্বীকার না করিয়া পারা যায় না, অসৎ কেন না ইহা প্রাতিভাসিক এবং ক্ষণস্থায়ী। অপর পক্ষে বাহিরের এই জগৎ মিথ্যা, মায়াবাদের এই মতের উপর যদি বেশী জোর দিই তবে অন্য পথে জড়বাদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ কিন্তু তদপেক্ষা কঠোরতর এক সিদ্ধান্তে পৌছিব। তখন বলিব এই জগৎ, আমাদের অহং, মানব জীবন স্বপ্নের মত অলীক, ইহাদের কোন লক্ষ্য নাই, প্রাকৃত জীবনের অর্থশূন্য জটিল জালের এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক নির্ব্বিশেষ সৎ বা এক পরম অ-সতের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়া মানব-জীবনের যুক্তিযুক্ত সার্থকতা।

আমাদের প্রাকৃত জীবন হইতে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি—তাহাকে ভিত্তি করিয়া যুক্তিতর্ক দ্বারা এ রহস্য আমরা সমাধান করিতে পারিব না। অনুভূতির যেখানে অভাব বা ফাঁক আছে সেখানে শুধু বিচার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। আমাদের প্রাকৃত চেতনায় এক দিকে যেমন আমরা দেহধারী ব্যক্তি-চেতনার অতিরিক্ত বিশ্ব মন বা অতি মানস বলিয়া যে কিছু আছে তাহা স্পষ্ট ভাবে অনুভব করি না, অপর দিকে আমাদের অন্তরাত্মাকে দেহের উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেই হইবে, দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও লয় হইবে অথবা দেহকে ছাপাইয়া গিয়া তাহার সম্প্রসারণ যে একেবারে অসম্ভব জোর করিয়া এরূপ বলিবার কোন প্রামাণ্য অনুভবও-আমাদের নাই। সুতরাং হয় আমাদের চৈতন্যের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণ করিয়া, না হয় জ্ঞান লাভের যে যন্ত্র আমাদের আছে তাহার অপ্রত্যাশিত উৎকর্ষ সাধন করিয়া

আমাদিগকে মায়াবাদ ও জড়বাদের এই প্রাচীন তর্কের সমাধান করিতে হইবে।

সন্তোষজনকভাবে চৈতন্যের এই সম্প্রসারণ করিতে হইলে ব্যক্তিগত চৈতন্যের অন্তর্জীবন সম্প্রসারণ করিয়া তাহাকে বিশ্বচেতনায় পৌছিতে হইবে, কারণ যে সাক্ষী-চৈতন্যের কথা উক্ত হইয়াছে সে সাক্ষীচৈতন্য যদি সত্যই থাকে তবে তাহা জগতে জাত ব্যক্তিগত শরীর-চৈতন্য বা মন নহে। পরন্তু যিনি বিশ্বচৈতন্য, নিখিল বিশ্বে সর্ব্বগত-ভাবে বা অন্তর্য্যামী বোধ চৈতন্যরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, বিশ্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে তাঁহারই শাশ্বত ও সত্য প্রকাশরূপে, অথবা তাঁহারই জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে তাহা হইতে জাত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লয় পাইবে। যুগপৎ যিনি প্রাণবন্ত পৃথিবী এবং সজীব মানবদেহের মধ্যে শান্ত ও শাশ্বত রূপে অবস্থিত আছেন এবং ভিতর হইতে ইহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, যিনি মন ছাড়া মনন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ছাড়া দর্শনাদি করিতে পারেন, শরীর-চৈতন্য নয় তিনিই বিশ্বের সাক্ষীচৈতন্য ও প্রভু।

মানুষের মধ্যেও বিশ্বচেতনার প্রকাশ যে হইতে পারে, এ সম্ভাবনা আধুনিক মনোবিজ্ঞানও ধীরে ধীরে স্বীকার করিতেছে আমাদের জ্ঞানলাভের আরও যে সূক্ষ্ম উপায় আছে এ কথাও মানিতে চাহিতেছে—যদিও ইহার মূল্য এবং শক্তি যখন স্বীকার করিয়াছে তখনও ইহাকে চিত্ত-বিভ্রমের পর্য্যায়ে ফেলিতে বিরত হয় নাই। প্রাচ্যের মনোবিজ্ঞান ইহাকে সত্য বলিয়া বরাবরই স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাকে অনুভব করার দিকে আমাদের ভিতরের পরিণতির গতি রহিয়াছে ইহা বলিয়াছে। আমাদের অহং বোধ যে সীমা নির্দ্দেশ করে তাহাকে অতিক্রম করিয়া সজীব এবং আমরা যাহাকে নির্জীব মনে করি—সে সমস্তই যাহার পক্ষপুটতলে আশ্রিত রহিয়াছে সেই বিশ্বচৈতন্যের সহিত একাত্মতা অনুভব করা যে আমাদের সাধনার লক্ষ্য তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

বিশ্বচেতনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বসত্তার সহিত তাহারই মত আমরা এক হইয়া থাকিতে পারি, তখন আমাদের চেতনার এবং এমন কি ইন্দ্রিয়ানুভবেরও রূপান্তর হইতে আরম্ভ হয়। ফলে আমরা বুঝিতে পারি—জড়ও সেই অখণ্ড সত্তা। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় প্রত্যেক জড়পদার্থ জড়-সত্তার অন্য অপদার্থ হইতে বিভিন্ন হইয়াও সেই সত্তা এবং তাহার অন্য বহুরূপের সহিত যোগরক্ষা করিয়াছে। তেমনিভাবে মন এবং প্রাণও একেরই বহুরূপে প্রকাশ, প্রত্যেক প্রকাশ পৃথক হইয়াও প্রত্যেকের ক্ষেত্রের অনুরূপভাবে অপরের সহিত একত্বে মিলিত হইতেছে। এই ভাবে যদি আমরা অগ্রসর হইতে চাই তবে অনেক ধাপের পরে অতিমানসের জ্ঞান লাভ করিব এবং সকল নিম্নতর ক্রিয়া তাহারই ক্রিয়া বুঝিতে পারিব। তখন আমরা যে কেবল বিশ্ব-চৈতন্যের অস্তিত্ব বোধ লাভ করিব, সজ্ঞানে তাহাকে অনুভব করিতে পারিব তাহা নহে, পরন্তু তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যাইতে পারিব। এখন যেমন আমরা অহং বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি তখন তেমনি এই অতিমানসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিব, ক্রমশঃ অন্য মন প্রাণ অন্য শরীরের সহিত একত্ববোধে বেশী করিয়া মিলিত হইব এবং নিজেদের ও অপরের এমন কি প্রাকৃত জগতের উপর এমন দিব্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইব যাহা আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কুচিত অহমিকার শক্তি এমন কি কল্পনারও অগোচর।

যে লোক বিশ্বচৈতন্যের এই প্রকার সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে এবং তাহাতে বাস করিতেছে তাহার পক্ষে এ চৈতন্য পাথিব জগত হইতে অধিকতর সত্য। ইহা যে শুধু স্বরূপে সত্য তাহা নহে ইহা কর্ম্মে এবং পরিণামেও সত্য এবং জগৎও ইহার কাছে সত্য। কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা রূপে জগৎ সত্য নয়। সেই উচ্চতর অবস্থা—যেখানে আমাদের সকল সংস্কার খসিয়া পড়ে যেখানে চৈতন্য এবং সত্তাতে কোন ভেদ নাই, তাহার ক্রিয়া এবং গতি ও স্বপ্ন বা মিথ্যা নহে। তাহার চৈতন্যে অবস্থিত আছে বলিয়াই জগৎ সত্য কারণ তাহার সত্তার সহিত অভিন্ন চৈতন্যময়ী-শক্তি এ জগতের স্রষ্টা। বরং জড়ের বিবিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব এবং মিথ্যার ছলনা।

কিন্তু যে চিৎসত্তা এই অতিমানসের স্বরূপ সত্য তিনি একদিকে নিজেকে বিশ্বছন্দে লীলায়িত করিলেও বিশ্বের অতীতও বটে এবং বিশ্ব ভিন্নও তাহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জগত তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে কিন্তু তিনি জগৎ আশ্রয় করিয়া নাই। আমরা যেমন বিশ্বচৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট

হইয়া সমস্ত বিশ্বসত্তার সহিত এক হইয়া যাইতে পারি তেমনি এই বিশ্বাতীত চৈতন্যেও আমরা অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারি এবং তখন বিশ্ব সত্তাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, তখন আমাদের মধ্যে জাগে সেই পুরাতন প্রশ্ন 'এই বিশ্বাতীত কি অপরিহার্য্যরূপে জীব জগৎ বিশ্ব বিবর্জ্জিত' 'সেখানে পৌছিলে তাহার সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ কি হইবে'।

বিশ্বাতীত অবস্থায় পৌছিবার দুয়ারে উপনিষদে যাহাকে শুদ্ধ ক্রিয়াশূন্য অস্নবিব (স্নায়ুশূন্য) বলেন, যিনি সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থান, যাহাতে দ্বৈতের মালিন্য নাই, ভেদের ব্রণ নাই বহুত্বের কোন প্রকাশ নাই, অদ্বৈত বেদান্তীরা যাহাকে নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলেন তাহার সাক্ষাৎ পাই। সাধকের মন যখন মধ্যবর্ত্তী-পর্ব্বগুলিকে বাদ দিয়া হঠাৎ এই স্থানে প্রবেশ করে তখন জগৎ মিথ্যা এবং এই অমেয় নৈঃশব্দ্যই একমাত্র সত্য এইরূপ মনে করে। মানুষের মন যে সমস্ত অতি বিশাল এবং প্রতীতি-জননক্ষম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে এ অনুভূতি তাহাদের অন্যতম। এই বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপের অথবা ইহারও অতীত অসম্ভূতির (non being) যে অনুভূতি হয় সেখানে আমরা দ্বিতীয় নেতিবাদের মূল দেখিতে পাই। সন্ন্যাসীর এই নেতিবাদ অপর প্রান্তস্থিত জড়বাদীর অনুরূপ কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরও পূর্ণ আরও চূড়ান্ত এবং আরো বেশী বিপজ্জনক—সেই ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যাহার কানে ইহার সেই গভীর আহ্বান ধ্বনি আসিয়া পৌছে।

প্রাচীন আর্য্য জাতি চিৎ ও জড়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া জড়ের বিরুদ্ধে চিতের বিদ্রোহ তুলিয়া সেই সমন্বয়ের ভিতরে এক বিক্ষোভ আনয়ন করে এবং তাহার পর হইতে ২০০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই নেতিবাদ ভারতীয় মনকে প্রধানভাবে পরিচালিত করিয়াছে। জগৎ মিথ্যা এই বোধই যে ভারতীয় ভাবধারার সর্ব্বস্ব তাহা নহে, যাহারা ইহা স্বীকার করে নাই এমন অনেক দর্শন এবং ধর্ম্মমত ও অভীপ্সা ভারতে দেখা গিয়াছে। চরম পন্থীদের দার্শনিক মতের যে মিলনের চেষ্টা হয় নাই তাহাও নহে। তৎসত্ত্বেও একথা বলা চলে যে ভারতবর্ষ এই বিশাল নেতিবাদের ছায়াতলেই সে যুগে বাস করিয়াছে এবং সন্ন্যাসীর গৈরিকবাস জীবনের শেষ কাম্য মনে করিয়াছে। বুদ্ধদেব প্রচারিত কর্ম্মের শৃঙ্খল, বন্ধন এবং একান্ত বিরোধ, জন্মেই বন্ধন এবং জন্মরহিত হইতে পারিলেই মুক্তি, এই সমস্ত জ্ঞান আসিয়াছে। তাই প্রায় সকলেই সমস্বরে বলিয়াছেন যে এই দ্বৈতের জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে না, নিত্য বৃন্দাবনের পরমানন্দ অথবা ব্রহ্মলোকের অন্তহীন রসোল্লাস অথবা অনির্ব্বচনীয় এক নির্ব্বাণ, যেখানে এক নির্ব্বিশেষ একত্বের মধ্যে সকল বহুত্বের চির অবসান তাহাই পরম কাম্য। পরবর্ত্তী যুগেও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু সাধু সন্ত, বহু গুরু আসিয়াছেন, ভারতবাসীর হৃদয়ে যাহাদের পবিত্র এবং উজ্জ্বল স্মৃতি রহিয়াছে তাঁহারা এই সুদূর অভিযানের পথেই মানুষকে ডাকিয়াছে। বৈরাগ্যই সে জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ, পার্থিব-জীবন গ্রহণ করা অজ্ঞানেরই নামান্তর, মানুষের জন্মের খাটি ব্যবহার জন্মের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি, চিৎস্বরূপের আহ্বান, জড় হইতে পলায়ন, ইহাই তাঁহারা বলিয়া আসিয়াছেন।

বর্ত্তমানে সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে। তাই এ যুগের মানুষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, যে জাতি একদিন মানব সভ্যতাকে অগ্রগতি দিবার বিপুল দায় বহন করিয়াছে, মানুষের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ভাণ্ডারের জন্য নানা প্রকার সম্পদ আহরণ করিয়াছে সেই প্রাচীন জাতি আজ কর্ম্মক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রাণ শক্তিতে ভাঁটা ধরিয়াছে বলিয়া তাহার কর্ম্মবিমুখতা সমর্থনের জন্য এই বৈরাগ্যের ধুয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যায় যে আমাদের জীবনের সম্ভাবনাসমূহের অতি উচ্চতম শিখরে অবস্থিত এক পরম ও সচেতন অনুভূতির সহিত এই অবস্থা অচ্ছেদ্য-ভাবে বিজড়িত এবং ইহার মধ্য দিয়া সত্তার একটি সত্য বিভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তা ছাড়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের পূর্ণতা লাভের পথে এখনও ইহা একটী অপরিহার্য্য উপাদান এবং যতদিন পর্য্যন্ত জীবনের অন্য প্রান্তে মানুষের মন ও প্রাণ পাশবিকতার হাত হইতে মুক্ত না হইতেছে, ততদিন এ বৈরাগ্যের বিশেষ সাধনাও শ্রেয়স্কর।

জীবনকে সার্থকতার জন্য আমরা একটা বৃহত্তর এবং পূর্ণতর ইতি খুঁজি ইহা ঠিক। আমরা ইহা বোধ করি যে সন্ন্যাসীর আদর্শে বেদান্তের এক মহা সত্য 'একমেবা-

দ্বিতীয়ং' স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই দ্বিতীয় মহাবাক্যের মর্য্যাদা যেরূপ, সেরূপ পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই। মানুষের আকুল অভীপ্সা ইহাতে যেরূপ উর্দ্ধে ব্রহ্মাভিমুখে গিয়াছে সেইভাবে এই ব্রহ্মেরই প্রকাশ-ক্ষেত্র এই জগতের বুকে ভাগবতী জ্যোতি ও শক্তিকে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা হয় নাই। আত্মাতে সত্য যেরূপ পূর্ণ ও সুন্দরভাবে দেখা হইয়াছে জড়ের ক্ষেত্রে তাহার অর্থ তেমনভাবে বুঝা হয় নাই। সন্ন্যাসী পরম তত্ত্বের উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীন বৈদান্তিকের মত ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা তেমন ভাবে লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের পূর্ণতর ইতির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াও ইহার বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আবেগ ও আকৃতিকে আমরা যেন ছোট করিয়া না দেখি। আমরা দেখিয়াছি জড়বাদ কি ভাবে ভগবদুদ্দেশ্য সাধনে সহায় হইয়াছে কিন্তু এ কথা আমাদিগকে অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে সন্ন্যাসীর নৈতিবাদ সে উদ্দেশ্য সাধনে বৃহত্তর সহায়তা করিয়াছে। জড় বিজ্ঞানের অনেক সত্যের আকার হয়তো ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তবু আমরা যে বৃহৎ ও পূর্ণ সাম্য চাই তাহাতে বিজ্ঞানের সত্যকে স্থান দিতেই হইবে। তেমনি প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা হইতে আমরা যে সত্য পাইয়াছি তাহার পরিমাণ হ্রাস হওয়া বা মূল্য কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার মধ্যে যে সত্য ছিল তাহাকে রক্ষা করা এবং আমাদের অভীপ্সিত জীবনে তাহার স্থান দেওয়া আরও বেশী প্রয়োজন একথা যেন না ভুলি।

চম্পায় হিন্দু-সভ্যতা

শ্রীপ্রণবকুমার সরকার

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে পূর্ব-উপদ্বীপে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ ভারতীয় উপনিবেশ চম্পারাজ্য বর্ত্তমানের আনাম ও কোচিন চীনকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল।

সেকালে তাম্রলিপ্ত বন্দর হতে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে বহু ভারতীয় বাণিজ্যপোত ভারত ও পূর্বদেশের মধ্যে বাণিজ্যব্যপদেশে গমনাগমন করত। বাণিজ্যসূত্রে যাতায়াতকারী কোন একদল ভারতীয় কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শতকে চম্পায় হিন্দু উপনিবেশের সূচনা হয় বলে মনে হয়। আনামী দস্যুদলের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে কয়েক শতাব্দী পরে হিন্দু-গৌরব চম্পার পতন হয়। সঙ্গে সঙ্গে গৌরবের শেষ চিহ্নটুকুও সেখান থেকে ও সেখানকার অধিবাসিদের প্রাণ থেকে ধুয়ে মুছে যায়।

চম্পার ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা যবদ্বীপ হয়ে এসেছিল। এ অনুমানও নিতান্ত অসঙ্গত নয়। তারা নিজেদের দেশের প্রধান স্থানের নামের অনুকরণে তাদের উপনিবেশেরও নামকরণ করেছিল বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে পরম শৈব চাঁদ সদাগরের রাজধানী বর্দ্ধমান জেলার চম্পাই-নগরের কথাও মনে পড়ে। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নদীয়া দেবগ্রাম-বিক্রমপুর নামে উপনিবেশ স্থাপন করেন)।

আগেকার চম্পার অবস্থান অঞ্চলে যারা এখন বাস করে তারা 'চাম' বলেই পরিচিত। চম্পা হতেই যে চামের উৎপত্তি তাতে সন্দেহ নাই। আবার এই চাম থেকেই 'শ্যাম' নাম হয়েছে কিনা জানি না। আদি চামেরা মন-খ্মের জাতির শাখা বিশেষ; প্রাচীন কোচিন চীন ও আনাম তাদের দেশ ছিল। সম্ভবতঃ প্রথমে মন-খ্মেরের সঙ্গে ভারতীয় মিশ্রণ ও পরে তার সঙ্গে আনামীর যোগে এখনকার চাম জাতির সৃষ্টি হয়।

এখানকার অধিবাসীদের দীক্ষা দিয়েছিল হিন্দু সভ্যতা। বিজেতাদের দেবভাষা সংস্কৃতই তাদের ভাষা হয়ে পড়ল। তাই তাদের ভাষায় এখনও সংস্কৃত প্রভাব কত! তাদের ভাষায় প্রচলিত বহু সংস্কৃত শব্দের মধ্যে পুব্ (পূর্ব), উৎ (উত্তর), দক্ (দক্ষিণ), আর খোম (সোম), বুধ (বুধ), শুক (শুক্র), শনৈশ্চর (শনি) ইত্যাদি।

চম্পায় বহু প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়—সে সকল মাত্রের কারুকার্য্য অতুলনীয়। কাম্বোজ বা ওঁকার ধামের মন্দিরের মত এ সকল মন্দির বিপুলাকার নয়। কম্বোজের মন্দির গাত্রের শিল্পকাজের সঙ্গে এর শিল্পকাজের তফাৎ আছে। চম্পার মন্দিরগুলির নির্ম্মাণপ্রণালীও স্বতন্ত্র। এখানকার মন্দিরের মধ্যে শ্রীলিঙ্গরাজ মন্দিরটাই প্রসিদ্ধ; অধিকাংশই শিবমন্দির। শ্রীলিঙ্গরাজ মন্দিরে বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে; সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতকের বলে মনে হয়। মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে আরম্ভ হয়; কারণ সেই সময়ই চম্পার গৌরবের যুগ। চম্পার মন্দিরগুলি এক একটা দুর্গবিশেষ। শ্রীলিঙ্গরাজ মন্দিরে একটা শিবমূর্ত্তি আছে, মূর্ত্তিটী ষড়ভুজ। উপরের হাতে আছে বজ্র ও পদ্ম, মাঝের দুই হাতে খড়্গ ও পাত্র এবং নীচের দুই হাত পিছনে ফিরান। ভারতীয় শিবমূর্ত্তির থেকে এর একটু তফাৎ মনে হয়। সেখানে যে সব হিন্দু এখনও আছেন তাঁরাই এ সকল মন্দিরে পূজা করে থাকেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বৌদ্ধেরাও শিবকে বুদ্ধ জ্ঞানে পূজা করেন। পূজাপদ্ধতি ভারতীয় পদ্ধতিরই মত। মন্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষা হতে চাম ভাষায় অনূদিত। মন্ত্রের মধ্যে সংস্কৃত শব্দের প্রভাব বিশেষ দেখা যায়। পূজার উপকরণও ভারতীয় পূজার উপকরণের মতই। সেখানকার এই পূজাপদ্ধতি আজও সেই প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি বহন করে আসছে—যদিও চাম জাতি হিন্দু নাম, এমন কি তাদের নিজ দেবদেবীর পূর্বনামও ভুলতে বসেছে। কালচক্রের আবর্ত্তনে আবার সেদিন হয়তো ঘুরে আসছে যেদিন আমাদের এই সভ্যতা বর্ত্তমানের এই মালিন্য কাটিয়ে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে জগৎ আলোকিত করবে।

(চিত্র-নাট্য)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব দৃশ্যের পর মিনিট পনরো গত হইয়াছে।

দিবাকর নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল, দ্বার খোলার শব্দে ফিরিয়া দেখিল নন্দা প্রবেশ করিতেছে। নন্দার চোখ দুটি সূর্যমণির মতই জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

নন্দা দরজা ভেজাইয়া দিয়া দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বিদ্রূপশাণিত কণ্ঠে বলিল—

নন্দা: আপনি কি সুন্দর গল্প বলতে পারেন! কী অদ্ভুত আপনার উদ্ভাবনী শক্তি! ধন্য আপনি!

দিবাকর চক্ষু নত করিল।

নন্দা: কানামাছি! খবরের কাগজওয়ালাদের কি স্পর্দ্ধা আপনাকে কানামাছি বলে! আপনি কানাও নয়, মাছিও নয়। আপনি পাকা চোর—নামজাদা চোর—চতুর চূড়ামণি!!

দিবাকর: আমার একটা কথা শুনবেন?

নন্দা: আপনার কথা আমি ঢের শুনেছি, অভিনয়ও ঢের দেখেছি। কি অপূর্ব অভিনয়! গরীব—অসহায়—পেটের দায়ে চুরি করতে আরম্ভ করেছেন—

দিবাকর: অন্তত ও কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই আমি পেটের দায়ে চুরি করতে আরম্ভ করেছিলাম।

নন্দা: চুপ করুন। আপনার একটা কথাও সত্যি নয়। সত্যি কথা বলতে আপনি জানেন না। আজই আপনি বলেছেন যে মেয়েদের মন চুরি করতে আপনি জানেন না; কিন্তু মেয়েদের চোখে কি ক'রে ধুলো দিতে হয় তা আপনি বেশ জানেন। মেয়েদের কাছে ন্যাকা সেজে কাজ আদায় করতে আপনার জোড়া নেই!

দিবাকর: আমাকে দুটো কথা বলতে দেবেন?

নন্দা: কী বলবেন আপনি? আমাকে বোধহয় বোঝাবার চেষ্টা করবেন যে আপনি সূর্যমণি চুরি করতে আসেন নি!

দিবাকর: না, আমি সূর্যমণি চুরি করতেই এসেছিলাম।

নন্দার বিদ্যুৎ শিখার মত আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

নন্দা: উঃ! অসহ্য! নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।

সে ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, ক্ষণেক পরে তাহার ঘরের দরজা দড়াম্ করিয়া বন্ধ হইল। দিবাকর তাহাকে অনুসরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, শব্দ শুনিয়া আবার জানালায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে একবার জানালা দিয়া বাহিরে উঁকি মারিল।

নন্দা নিজের ঘরে গিয়া দরজায় ছিট্‌কিনি লাগাইয়া দিয়াছিল। রাগে ফুলিতে ফুলিতে ওয়ার্ডরোবের সামনে দিয়া যাইবার সময় সে আয়নায় দেখিল, পূজারী প্রদত্ত মালাটি এখনও তাহার গলায় দুলিতেছে। সে এক-টানে মালা ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল। দেয়ালে নন্দার একটি ছবি টাঙানো ছিল, ছিন্ন মালা ছবির ফ্রেমে আটকাইয়া ঝুলিতে লাগিল। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদী মালাটা যেন কিছুতেই নন্দাকে ছাড়িবে না।

নন্দা গিয়া খাটের কিনারায় বসিল; ক্লান্তিভারাক্রান্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার উত্তপ্ত ক্রোধ এতক্ষণ তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

ঘরের জানালা খোলা ছিল। এই সময় দিবাকরকে জানালার বাহিরে দেখা গেল। সে নিঃশব্দে জানালা ডিঙাইয়া ঘরের ভিতর আসিল; একবার চকিত চক্ষে নন্দাকে দেখিয়া লইল।

জানালার কাছেই নন্দার পড়ার টেবিল। দিবাকর দেখিল টেবিলের উপর কয়েকটি ফটো পড়িয়া রহিয়াছে; তন্মধ্যে একটি নন্দার। দিবাকর

ছবিটি পকেটে পুরিয়া ঠোঁটের উপর হাত রাখিয়া একটু কাশিল। নন্দা চমকিয়া চোখ তুলিল ; দিবাকরকে দেখিয়া সূচীবিদ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

নন্দা। এ কি! আমার ঘরে ঢুকলেন কি ক'রে?

নন্দা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দিবাকর শুষ্কস্বরে বলিল—

দিবাকর: শুধু দরজা বন্ধ ক'রে নামজাদা চোরকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

নন্দা বুঝিল, একদিন দিবাকর যেমন ঐ জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, আজ তেমনি অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়াছে। নন্দার মুখের ভাব তিক্ত হইয়া উঠিল।

নন্দা। দেখছি আমার জানলাও বন্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমাকে এমন ভাবে উত্যক্ত করছেন কেন? আর কি চান আপনি?

দিবাকর। আমার সত্যিকার পরিচয় আপনি কাউকে বলেছেন কি?

নন্দা: না বলিনি এখনও। কিন্তু বলব, শিগ্‌গিরই বলব।

দিবাকর: বেশ, বলবেন। কিন্তু তার আগে আমার কথাও আপনাকে শুনতে হবে। ভয় নেই, আমি নিজের সাফাই গাইব না, চোখে ধুলো দেবার চেষ্টাও করব না। নিছক সত্যি কথা বলব। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে।

নন্দা কথা কহিল না, ওষ্ঠাধর চাপিয়া দিবাকরের পানে চাহিয়া রহিল। ইহাকেই অনুমতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া দিবাকর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল।

দিবাকর: চুরি করবার যে একটা নেশা আছে তা বোধহয় আপনি জানেন না ; জানবার কথাও নয়। প্রথম যখন আমি চুরি করতে আরম্ভ করি তখন আমার বয়স পনরো-ষোল বছর। বাবা সামান্য চাকরি করতেন, কিছু সঞ্চয় করতে পারেন নি। তিনি হঠাৎ মারা গেলেন ; সংসারে রইলাম শুধু মা আর আমি। কেউ সাহায্য করল না, কেউ একবার ফিরে তাকাল না। আমার তখনও রোজগার করবার বয়স হয়নি—একদিন মরীয়া হয়ে চুরি করলাম। সেই আরম্ভ।—কিন্তু মা'কে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না, তিনি একরকম অনাহারেই মারা গেলেন।

দিবাকর একটু চুপ করিল। নন্দা তীক্ষ্ণ অবিশ্বাস লইয়া শুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু শুনিতে শুনিতে তাহার মুখের ভাব একটু একটু করিয়া পরিবর্তিত হইতে লাগিল। দিবাকর নীরস আবেগহীন কণ্ঠে আবার আরম্ভ করিল—

দিবাকর: নিজের বলতে আমার আর কেউ রইল না। পৃথিবীতে আমি একা ; কেউ আমাকে চায় না, আমার মরা-বাঁচায় কারুর আসে যায় না। আমার মন কঠিন হ'য়ে উঠতে লাগল। আমার ওপর যখন কারুর মমতা নেই, তখন আমারই বা কারুর ওপর মমতা থাকবে কেন? সংসার যখন আমার শত্রু তখন আমিও সংসারের শত্রু। এই ভাবে বড় হ'য়ে উঠলাম। আমি নির্বোধ নই ; জানতাম, যদি একবার ধরা পড়ি তাহলে সমাজ আমাকে ছাড়বে না, দাগী করে ছেড়ে দেবে। খুব সাবধানে চুরি করতে শিখলাম। আর শিখলাম ধনীকে ঘৃণা করতে। যাদের টাকা আছে তারাই আমার শত্রু ; তারা সম্পত্তি আগ্‌লে নিয়ে ব'সে আছে, যে সেদিকে হাত বাড়াবে তাকেই তারা পায়ের তলায় পিষে ফেলবে। তারা নিষ্ঠুর, তারা পরের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিজেরা বড়মানুষ হ'য়ে বসেছে ; তারাই আমার মুখের অন্ন কেড়ে খাচ্ছে—

নন্দা: (তপ্তকণ্ঠে) মিথ্যে কথা। বড়মানুষ মাত্রেই গরীবের মুখের অন্ন কেড়ে খায় একথা সত্যি নয়।

দিবাকর: পুরোপুরি সত্যি না হ'লেও একেবারে মিথ্যেও নয়। যাক, আমি নিজের মনের অবস্থা বর্ণনা করছি।—একটা কথা আপনাকে মিথ্যে ব'লেছিলাম, আমার শিক্ষা সম্বন্ধে। চুরির টাকায় আমি এম-এ পাস করেছি, অশিক্ষিত নই। আধুনিক মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। Proudhon বলেছেন, property is theft : যার সম্পত্তি আছে সেই চোর। মনে আছে কথাটা আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। যারা বিত্তবান তারাই যদি চোর তবে আমার চোর হ'তে লজ্জা কি?……ক্রমে আমি কঠিন অপরাধী হয়ে উঠলাম ; চুরির নেশা আমাকে চেপে ধরল। সুবিধে পেলেই চুরি করতে আরম্ভ করলাম। এই ভাবে গত তিন বছর কেটেছে। এখন আর আমার টাকার দরকার নেই, কিন্তু নেশা ছাড়তে পারি না।

দিবাকর আবার থামিল। নন্দা সম্মোহিত হইয়া শুনিতেছিল, নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া উঠিল—

নন্দা : তারপর ?

দিবাকর নন্দার দিকে না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

দিবাকর : তারপর—একটা বাড়ীতে চুরি করতে গেলাম। আট ঘাট বেঁধেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ধরা প'ড়ে গেলাম। ভেবেছিলাম তারা আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু তারা ধরিয়ে দিলে না। দয়া মায়া আশা করিনি, দয়া মায়া গেলাম, সমবেদনা পেলাম; সৎপথে চলবার প্রেরণা পেলাম। যে বাড়ীতে চোর হ'য়ে ঢুকেছিলাম সেই বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম।—

নন্দা : সে কোন্ বাড়ী ?

দিবাকর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল—

দিবাকর : কিন্তু তবু আমার চুরির নেশা গেল না। একদিকে লোভ, অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা—দুয়ের মধ্যে দড়ি টানাটানি সুরু হল। এমনি ভাবে কিছুদিন চলল। তারপর সব ভেসে গেল।

নন্দা : ভেসে গেল !

দিবাকর : আমার মনে স্নেহ মমতা ভালবাসার স্থান ছিল না, শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না; সব পাথর হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন কোথা থেকে এক প্রবল বন্যা এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শুধু র'য়ে গেল ভালবাসা শ্রদ্ধা আর আত্মগ্লানি।

দিবাকরের কথা শুনিতে শুনিতে নন্দা এক পা এক পা করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার মুখে সংশয় ভরা অবিশ্বাস আর ছিল না, চোখে এক নূতন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দিবাকর পকেট হইতে চক্‌চকে নূতন চাবিটি বাহির করিয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

দিবাকর : যতদিন আমার প্রাণে ভালবাসা ছিল না, ততদিন আত্মগ্লানিও ছিল না। কিন্তু এখন মনে হ'ল আমি নরকের কীট, আমার সর্বাঙ্গে পাঁক লেগে আছে, যাকে ভালবাসি তার পানে চোখ তুলে চাইবার অধিকার আমার নেই—

নন্দা টেবিলের দিকে দৃষ্টি নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—

নন্দা : কাকে আপনি ভালবাসেন তা তো বললেন না !

দিবাকর : সে কথা বলবার নয়।—এই চাবি তৈরি ইচ্ছে করলেই তা চুরি করতে পারতাম। কিন্তু আর সে ইচ্ছে নেই। এখন আমাকে কেটে ফেললেও আর চুরি করতে পারব না।

চাবিটি টেবিলে রাখিয়া দিয়া সে বাষ্পচক্ষে নন্দার পানে চাহিল।

দিবাকর : আমার যা বলবার ছিল শেষ হয়েছে। এখন আপনি পুলিসে খবর দিতে পারেন। আমি পাশের ঘরে থাকব।

দিবাকর দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ডিজ্‌লভ্।

হলঘরের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে কয়েক মিনিট বাকি আছে।

মন্মথ টেবিলের সম্মুখে বসিয়া অলসভাবে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিল। ঘরে আর কেহ নাই। যদুনাথ এখনও তাঁহার চিরাভ্যস্ত দিবানিদ্রা শেষ করিয়া ঘর হইতে বাহির হন নাই।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। মন্মথ নিরুৎসুকভাবে যন্ত্র তুলিয়া কানে দিল।

মন্মথ : হ্যালো—

তারের অপর প্রান্ত হইতে যে কণ্ঠস্বরটি ভাসিয়া আসিল তাহাতে মন্মথ তড়িৎ স্পৃষ্টের ন্যায় খাড়া হইয়া বসিল, তাহার বাজার ভরা মুখ মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে একবার সচকিতে চারিদিকে চাহিল।

মন্মথ : অ্যাঁ—লিলি ! হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মন্মথ। কি বললে—তুমি একলা আছ ?

লিলি নিজের বাসা হইতে টেলিফোন করিতেছে। দাশু ও ফটিক তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। লিলি কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া ফোনের মধ্যে বলিল—

লিলি। হ্যাঁ, কেউ নেই। আমি একলা।

মন্মথ : দাশু বাবু ? ফটিক বাবু ?

লিলি মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া দাশু ও ফটিকের পানে কটাক্ষ পাত করিল।

লিলি : তাঁরা আর আসবেন না। তাঁদের আমি—। তাঁদের কথা দেখা হ'লে বলব; কিন্তু আপনিও কি আমাকে ভুলে গেছেন, মন্মথবাবু ?

মন্মথ : ভুলে গেছি ! কি বলছ তুমি ? আমি এখনি তোমার কাছে যাচ্ছি—

লিলি : শুনুন, এখন আসবেন না। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন, কেমন ? শুধু আমি আর

মন্মথ : আচ্ছা, সেই ভাল। তোমাকে যে কত কথা বলবার আছে, লিলি—হেঁ হেঁ—আচ্ছা—আচ্ছা—নিশ্চয়।

মন্মথ টেলিফোন রাখিয়া আহ্লাদে প্রায় লাফাইতে লাফাইতে উপরে চলিয়া গেল।

ওদিকে লিলি টেলিফোন বন্ধ করিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে দাশু এবং ফটিকের পানে চাহিল। দাশু উত্তরে সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়িল।

দাশু : হ্যাঁ, আজই একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে ফেলা চাই, আর দেরী নয়। চল ফটিক, আমাদেরও তৈরি থাকতে হবে।

ডিজল্‌ভ্

বেলা আন্দাজ সাড়ে চার। লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া যদুনাথ একটি জ্যোতিষের বই দেখিতেছেন; নন্দা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া চা প্রস্তুত করিতেছে। নন্দার মুখখানি গম্ভীর, একটু শঙ্কিত। এক পেয়ালা চা ঢালিয়া সে যদুনাথের সম্মুখে ধরিল।

নন্দা : দাদু, তোমার চা।

যদুনাথ বই সরাইয়া রাখিয়া চা লইলেন, কথাচ্ছলে বলিলেন—

যদুনাথ : আজ একাদশী কিনা, বাতের ব্যথাটা বেড়েছে।—মন্মথ কোথায়?

নন্দা : দাদা কি জানি কোথায় বেরুল।

যদুনাথ : আর দিবাকর?

নন্দা : বোধ হয় নিজের ঘরে আছেন। ডেকে পাঠাব?

যদুনাথ : না, দরকার কিছু নেই। ছেলেটার ওপর আমার ভারি মায়া প'ড়ে গেছে। বড় ভাল ছেলে।

নন্দা : (একটু হাসিয়া) শেষ কিনা, তাই তোমার মায়া পড়েছে।

যদুনাথ : না না, সত্যি ভাল ছেলে। তোর ভাল লাগে না?

নন্দা প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল।

নন্দা : দাদা ওঁকে পছন্দ করে না।

যদুনাথের মুখ গম্ভীর হইল।

যদুনাথ : হুঁ, সে আমি জানি। কিন্তু ওর সঙ্গে কোনও রকম অসদ্‌ব্যবহার ক'রে না তো?

নন্দা। না। দাদা ওঁকে এড়িয়ে চলেন, উনিও দাদাকে এড়িয়ে চলেন।—দাদু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা

যদুনাথ : কি কথা?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দা আস্তে আস্তে বলিল—

নন্দা : মনে করো, একজন অপরাধী। অনেক অপরাধ করার পর তার অনুতাপ হয়েছে, আর সে অপরাধ করতে চায় না। তবু কি তাকে শাস্তি দিতে হবে?

যদুনাথ তীক্ষ্ণ সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলেন।

যদুনাথ : হঠাৎ একথা কেন?

নন্দা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

নন্দা : অম্‌নি। জানবার কৌতূহল হ'ল, তাই জিগ্যেস করছি।

যদুনাথ : নন্দা, বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ; একেবারে দণ্ডনীতির গোড়ার কথা! ত্যাখ, মানুষ যখন অপরাধ করে তখন তার ফলে কারুর না কারুর অনিষ্ট হয়, সমাজের ক্ষতি হয়। অনুতাপ খুব ভাল জিনিষ, কিন্তু অনুতাপে তো ক্ষতিপূরণ হয়না। মানুষ যে-কাজ করেছে তার ফল—ভাল হোক মন্দ হোক—তাকে ভোগ করতে হবে। এটা শুধু মানুষের আইন নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আইন। আগুনে যে হাত দিয়েছে তার হাত পুড়বে, হাজার অনুতাপেও তার জ্বলুনি কম্‌বে না। কেমন, বুঝতে পারছ?

নন্দা : পারছি।

যদুনাথ : এই হচ্ছে অনাদি নিয়ম। মানুষ তার সমাজ-ব্যবস্থায় এই নিয়ম মেনে নিয়েছে। না মেনে উপায় নেই, না মান্‌লে সমাজ একদিনও চলবে না। পাপ যে করেছে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অপরাধীকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

নন্দা। কিন্তু অনুতাপ—

যদুনাথ : অনুতাপ ভাল; যার অনুতাপ হয়েছে তাকে আমরা স্নেহের চক্ষে সহানুভূতির চক্ষে দেখব, কিন্তু তার প্রাপ্য দণ্ড থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেবার অধিকার আমাদের নেই। দণ্ড ভোগ ক'রে তবে সে কর্মফলের হাত থেকে মুক্তি পাবে, তার দাঁড়িপাল্লা আবার সমান হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দা ভয়ে ভয়ে বলিল—

নন্দা : আচ্ছা দাদু, মনে কর—মনে কর দাদা যদি কোনও অপরাধ ক'রে থাকে—

নন্দা : না না, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে কর দাদা যদি কোনও অপরাধ করে, কিন্তু তার পর অনুতপ্ত হয়, তবু কি তুমি তাকে শাস্তি দেবে? জেলে পাঠাবে?

যদুনাথ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

যদুনাথ : মন্মথ যদি জেলে যাবার মত অপরাধ করে তাহলে আমি তাকে জেলে পাঠাব। আমার বুক ভেঙে যাবে, তবু তাকে জেলে পাঠাব। নন্দা, একটা কথা জেনে রাখো। ন্যায়-অন্যায় বোধ যদি না থাকে তাহলে জীবনে কিছুরই কোনও মূল্য থাকে না, জীবনটাই গেলো হ'য়ে যায়। আমি জীবনে অনেক দাগা পেয়েছি, অনেক জিনিষ হারিয়েছি। তোমাদের মা বাবা, তোমাদের ঠাকুরমা—সবাই একে একে আমাকে ছেড়ে গেছেন। কিন্তু তবু আমি মনের জোর হারাই নি। শেষ পর্যন্ত সবই যদি যায়, তবু ন্যায়ধর্মকে আঁকড়ে থাকব। ওই আমার শেষ সম্বল।

শুনিতে শুনিতে নন্দার চোখে জল আসিয়াছিল; সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

চিত্রান্তর।

(ক্রমশঃ)

দীনবন্ধু-সাহিত্যে হাস্যরস

প্রভাকর

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি পড়িলে স্বভাবতঃই পাঠকের মনে হয়—হাস্যরস সৃষ্টিতেই তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অধিকার। কারণ দেখা যায়, যেখানে তিনি এই স্বাভাবিক পথ ছাড়িয়া করুণ বা গম্ভীর রসের অবতারণা করিতে গিয়াছেন, সেখানে তিনি আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; বরং তাহা নীলদর্পণের সরলা বা সৈরিন্ধ্রীর বিলাপের মত স্থানে স্থানে হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রশোকে মূর্চ্ছিতা সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া বধূ সৈরিন্ধ্রী যখন বলিতে থাকে, "আহা, হা! বৎসহারা হাম্বারবে-ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন," তখন তাহার মধ্যে বিষাদের স্বাভাবিক প্রকাশের অভাবটাই অত্যন্ত বিসদৃশভাবে প্রকটিত হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে তাঁহার নাটকাবলীর মধ্য দিয়া—বিশেষতঃ "জামাই বারিক," "বিয়ে পাগলা বুড়ো," "সধবার একাদশী" প্রভৃতি প্রহসনের ভিতর দিয়া—তিনি যে অজস্র হাস্য-রসের পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা যেমনই বিচিত্র, তেমনই অকৃত্রিম। নিমচাঁদ, বগী-বিন্দী, রাজীবলোচন, কেনারাম, জলধর, জগদম্বা প্রভৃতির চরিত্র-সৃষ্টির সময় দীনবন্ধু যেমন আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতির সন্ধান পাইয়াছিলেন—আপন প্রাণের উচ্ছল কৌতুকপ্রিয়তার প্রেরণায় যেন তাহারা আনন্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাই এই চরিত্রগুলির মধ্যে এমন সজীবত্ব, স্বাভাবিকত্ব এবং অনন্যসুলভ স্বকীয়ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা সত্যই অপূর্ব্ব।

দীনবন্ধুর কবিত্বশক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে তাঁহার প্রতিভার মূল উৎস দুইটি—একটি তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং অপরটি, তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি। এই দুইটিই তাঁহার সকল শক্তি ও দুর্ব্বলতার কারণ। সুতরাং দীনবন্ধুর হাস্যরসের মূলানুসন্ধান করিবার সময় তাঁহার এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইন্‌স্পেকটিং পোষ্টমাষ্টার হিসাবে কার্য্যোপদেশে দীনবন্ধুকে নানা-স্থানে ক্রমাগত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইত এবং নানা শ্রেণীর লোকের সম্পর্কে আসিতে হইত। তিনি নিজেও খুব মিশুক ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন বলিয়া অনায়াসে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত অত্যন্ত অন্তরঙ্গ-ভাবে মিশিতে পারিতেন। এই ভ্রমণ ও মেলামেশার সময় তাঁহার অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত। ফলে তিনি সমাজের সম্বন্ধে যে বিপুল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণতঃ যে কোনও সাহিত্যিকের পক্ষে দুর্লভ। সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ এই অভিজ্ঞতা-সম্পদ তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীর চরিত্রের প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তা এমন স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করিতে সাহায্য করিয়াছে, যে উহাতে আমাদের কৌতুকবোধ অনিবার্য্যরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

দীনবন্ধুর সহানুভূতির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে, সুখ-দুঃখ, রাগদ্বেষ—সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি।" এই সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি আবার এমন প্রবল ছিল যে উহাকে তিনি আয়ত্তে রাখিতে পারিতেন না—বরং নিজেই সহানুভূতির অধীন ছিলেন। ফলে, যে চরিত্রের সহিত তাঁহার সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপিত হইত, তাহার সহিত তাঁহার অন্তরের এমন আত্মবিস্মৃত ঐক্য স্থাপিত হইত, যে তিনি তাহার চিত্র অঙ্কনকালে তাহার চরিত্রের কোনও অংশ বর্জ্জন করিতে পারিতেন না—এমন কি, ভাষা পর্য্যন্তও নয়। ইহার

ফলেই, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যকর চরিত্রগুলি এমন সজীব ও জীবনানুগ হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

দীনবন্ধুর হাস্যরসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে উহার খাঁটি বাঙ্গালী রূপ। এইখানেই আধুনিক সাহিত্যের হাস্যরসের সহিত দীনবন্ধুর হাস্যরসের পার্থক্য। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে এবং সুমার্জ্জিত সভ্যতার চাপে আমাদের ভাষা এখন যেন সহজ প্রকাশ-ভঙ্গী হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের হাস্যপরিহাসও যেন আর বাংলার নিজস্ব অকৃত্রিম সুরটি বজায় রাখিতে পারে নাই। ফলে, যে কৌতুক-পরিহাস একদিন "রঙ্গে-ভরা" বঙ্গদেশের প্রাণকেন্দ্র হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইত, সেই সহজ, সরল, কখনও অসংযত ও অমার্জ্জিত, প্রাণখোলা হাসির প্রবল প্রবাহ আজ শালীনতার শত বন্ধনে আড়ষ্ট এবং সৌখীনতার বিচিত্র কারু-কার্য্যের তলে আত্ম-বিস্মৃত। সেই জন্যই দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি পড়িবার সময় আমাদের মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত হইতে হয়, হয়ত এতটা উচ্চহাস্য রুচি-বিরুদ্ধ। দীনবন্ধু রুচির মুখরক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার চরিত্রগুলিকে বিকলাঙ্গ করিতে চেষ্টা করেন নাই, কৃত্রিমতার চাপে তাঁহার স্বাভাবিক পরিহাস-প্রিয়তার শ্বাসরোধ করেন নাই। তিনি বাংলার ও বাঙ্গালীর অন্তরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং সেই দোষে গুণে ভরা, কৌতুকপ্রিয় বাঙ্গালী প্রকৃতিকে তিনি যেমন ভাবে বুঝিয়াছেন, ঠিক তেমনটি করিয়াই উহাকে চিত্রিত করিয়াছেন। অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষকের রঙ্গরসের মধ্যে তিনি শিক্ষিত মার্জ্জিত সমাজের শিষ্টাচারসম্মত ওজন-করা কথার অবতারণা করিয়া দুঃসহ ন্যাকামির সৃষ্টি করেন নাই। "নীল দর্পণ" হইতে প্রহার-জর্জ্জরিত ও নীলকুঠির গুদাম ঘরে আবদ্ধ তোরাপ ও রাইয়ত চতুষ্টয়ের কথাবার্ত্তার কিয়দংশ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

তোরাপ। দুত্তোর লেট দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওঠ্‌চে। উঃ, কি বলবো, সুমুন্দির ম্যাকবার ভাতারমারির মাঠে পাই, এম্‌নি থাপ্লোড় ঝাঁকি, সুমুন্দির চাবালিটে আস্‌মানে উড়িয়ে দেই, ওর গ্যাড ম্যাড্‌ করা হের ভেতর দে বার করি।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাইয়তের কথাবার্ত্তায় অশিক্ষিত গ্রাম্য উপমার মধ্য দিয়া অজ্ঞাতসারে যে হাস্যরসের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সত্যই উপভোগ্য।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই ম্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটী, যে কুটীর সাহেবডোরে সকলে ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি ম্যাকবার মোরে ফোজদুরিতি ঠেলেলো। মুই সেবের কেচরির ভেতর অনেক তামাসা দেখেলাম। ওমা:! ন্যাজের কাছে ব'সে মাচেরটক্‌ সাহেব যেই জাল মেরেছে, দুই সুমুন্দি মোক্তার এম্‌নি র র ক'রে ম্যাসচে, হেড়োহেড়ি যে কত্তি নেগ্‌লো, মুই ভাব্‌লাম, ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুড়ো এঁড়ের নড়্‌ই বেদ্‌লো।

... ...

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ি যে কি হ'তি নেগেছে, তা কিছুই জান্‌'তি পালাম না। মুই হ'লাম ভিন্‌গাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা বোস্‌মশার সলায় প'ড়ে দাদন ক্যাড়ি ক্যালাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো, তাইতি বোসমশার কাছে মিছরি নিতি ম্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম!—আহা। কি দয়ার শরীল! কি চেহারার চটক! কি অরপুরব রূপই দেখেলাম, ব'সে আছে যেন গজেন্দ্র-গামিনী!

এ ভাষা পল্লী-বাংলার বুকের-ভাষা ও মুখের-ভাষা, দুইই। ইহার মধ্যে কোনও ভেজাল আমদানী করা হয় নাই। বাংলার কৃষকের সরলতা ও অজ্ঞতা, তাহার অমার্জ্জিত ভাষা ও অসংযত ভাবাবেগ ইহার মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রতা-রাজীবলোচনের প্রেমালাপ, মল্লিকা-মালতীর পরিহাস, কমলা বিন্দুবাসিনীর কলহ প্রভৃতির ভিতরও এই খাঁটি বাঙ্গালী সুর ধ্বনিত। দুঃখের বিষয় আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে আমরা এই সুরটির সন্ধান আর তেমনটি পাইতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে, আমরা আজকাল "মোটা কাজ" ভালবাসিনা, "এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ।"

দীনবন্ধু কিন্তু হাস্য-পরিহাসে একটু মোটা কাজেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার লেখার মধ্যে কোথাও এমন কিছুই নাই, যাহা অস্পষ্ট বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি গ্রাহ্য। কোথাও তিনি পাঠকের বোধশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির উপর অযথা অতিরিক্ত দাবী করেন নাই। যদিও পরিহাস-মাত্রই অল্পাধিক পরিমাণে বুদ্ধিগ্রাহ্য, তথাপি দীনবন্ধু বোধহয় একমাত্র 'সধবার একাদশীর' কয়েকটি স্থান ব্যতীত আর কোথাও হাস্য কৌতুককে বিদ্যার খোলে পুরিয়া রাখেন নাই। তিনি সাধারণ গ্রাম্য জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতেই তাঁহার হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান পাইয়াছেন প্রচুর এবং তাহাই অজস্রভাবে সকলের মাঝে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। এই মোটা কাজের একটা সুবিধা এই যে ইহাতে কাহারও হাসির অভাব ঘটেনা; এবং প্রাণের সঙ্গে—আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-ধারার সহিত—ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার ফলে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্যভাবে আমাদের কৌতুক-বোধকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। পেঁচোর মা, হাবার মা, আদুরী প্রভৃতির কৌতুক যদি আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয়, তাহার কারণ এই নয় যে দীনবন্ধু তাহাদের মুখে এমন রহস্যময় পরিহাস বা এমন উচ্চাঙ্গের উপমা-সংবলিত ভাষা দিয়াছেন যাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া যায়; তাহার প্রকৃত কারণ বরং এই, যে অধুনা আমরা বাংলার পল্লীজীবন হইতে এতদূর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, যে গ্রাম্য-জীবন হইতে হাস্য-কৌতুকের উপাদান সংগৃহীত হইলে, আর আমাদের তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না।

দীনবন্ধুর হাস্যরসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কখনও বাস্তব-পরিপন্থী হইয়া উঠে নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহার প্রতিভা স্বভাবতঃই হাস্যরসমূলক এবং সেইজন্যই করুণ ও কোমল চিত্রাঙ্কনে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সত্য সত্যই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কেবলমাত্র যেগুলির সহিত হাস্যরসের অল্পবিস্তর সম্পর্ক আছে, সেইগুলিই সমধিক জীবন্ত মানুষ; অপর সকল চরিত্র, বিশেষতঃ গম্ভীর প্রকৃতির চরিত্রগুলির প্রাণ নাই। তাহারা বাগ্‌বিন্যাসপটু যন্ত্রমাত্র। পূর্ব্বে দীনবন্ধুর যে অসাধারণ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই তাঁহার

এই বস্তু-নিষ্ঠার মূল উৎস। কেমন করিয়া এই বহুদর্শিতা ও সহানুভূতি তাঁহাকে জীবনানুগ স্বাভাবিক চরিত্র-সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে শুধু একটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। অনেকেই অভিযোগ করেন যে অতিরিক্ত বস্তু-নিষ্ঠার মোহে দীনবন্ধু অনেকস্থলে প্রকৃত শিল্পী-সুলভ সংযম ও সুষ্ঠু নির্ব্বাচনের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার হাস্যরস প্রায়ই শ্লীলতা ও শোভনতার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। রুচিভেদের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিবার মত নয়। দীনবন্ধুর উগ্র সহানুভূতিই ইহার জন্য দায়ী। তিনি বন্ধু বঙ্কিমের কাছে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তিনি বাস্তব আদর্শ চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার অধিকাংশ চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। এইরূপ জীবন্ত প্রত্যক্ষ আদর্শের সহিত তাঁহার সহানুভূতির যোগ ঘটিলে তিনি উহার মধ্যে আপনার সত্তা হারাইয়া ফেলিতেন; ফলে অঙ্কনকালে তিনি তাহার কোন অংশই বাদ দিতে পারিতেন না। তাহার আকৃতি-প্রকৃতির আবশ্যক ও অনাবশ্যক, নির্দ্দোষ ও আপত্তিজনক, সকল খুঁটিনাটি ব্যাপারই চিত্রিত করিতে বাধ্য হইতেন। ফলে, স্থানে স্থানে শিল্পী-সুলভ সংযম ব্যাহত হইত। এইজন্যই তোরাপের ভাষার সহিত তাহার অশ্লীল উক্তিগুলি পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। বাস্তবজীবনে রাজীবলোচন, নদেরচাঁদ ও নিমচাঁদকে যেমনটি দেখিয়াছেন, নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাদের অবিকল সেইরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। তাই অসংযমকেও সর্ব্বত্র এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু এই ত্রুটির কথা আমরা ভুলিয়া যাই যখন দেখি, তাঁহার নাটকাবলীর মধ্যে একমাত্র জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র ইহারাই। রক্তমাংসের মানুষের দোষগুণ, ক্রটি বিচ্যুতি, দুর্ব্বলতা, সবই স্বাভাবিক-ভাবে ইহাদের মধ্যে বিরাজিত। নাট্যকারের পছন্দ-অপছন্দ ইহার মধ্যে কোনও ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, "রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।"

তবে ইহা হইতে কেহ যদি মনে করেন দীনবন্ধুর হাস্যরস-সৃষ্টি এমনই বাস্তবপন্থী, যে উহাতে idealism-এর বা কল্পনার কোনই স্থান নাই, তাহা হইলে ভুল হইবে। অল্পাধিক পরিমাণে idealism-এর সম্পর্ক ব্যতীত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং হাস্যরস-সৃষ্টিও নিষ্ফল। বাস্তবজীবনের মধ্যে প্রায়ই অনেক কিছু থাকে যাহা বিসদৃশ, অশোভন ও নীরস। সুতরাং কল্পনাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া সেই জীবনের ফোটোগ্রাফ তুলিয়া দেখাইলে তাহা দ্বারা হাস্যরস-সৃষ্টি সার্থক হয় না। কারণ, তাহা আমাদের মনকে পীড়িত করে। সেইরূপ একেবারে বাস্তবসম্পর্কবর্জ্জিত কল্পনার সাহায্যেও মানুষের কৌতুক-বোধকে আশানুরূপ জাগ্রত করা যায় না; কারণ, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত। প্রকৃত হাস্যরসিক এই বাস্তব ও কল্পনার এমন এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ সৃষ্টি করেন, যাহার ফলে বাস্তব তাহার রুক্ষ শ্রীহীনতা মুক্ত হইয়া কল্পনার কমনীয় আলোকে ঝলমল করে, এবং কল্পনা তাহার অবাস্তব স্বপ্নরাজ্য ছাড়িয়া দৃঢ় বাস্তব-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দীনবন্ধুর হাস্যরসের মধ্যেও আমরা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি। তাঁহার যে সকল চরিত্র আমাদের কৌতুক উদ্রেক করে, সেগুলির সব কয়টিই যে নির্দ্দোষ প্রকৃতির ব্যক্তি, এ কথা বলা আদৌ চলে না; বরং তাহাদের মধ্যে একান্ত আপত্তিজনক চরিত্রের সংখ্যাই অধিক। নদেরচাঁদ, জলধর, নিমচাঁদ, রাজীব প্রভৃতি কেহই ভাল লোক নহে; সমাজে এই সকল প্রকৃতির লোকদের কেহই সুনজরে দেখিতে পারেন না। দীনবন্ধুও ইহাদের দুর্ব্বলতা, দোষ, ত্রুটি প্রভৃতিকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্যই ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের মাতলামি, বকামি, উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদির অন্তর্নিহিত কৌতুকাবহতাটিও তিনি আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। ফলে, এই সকল চরিত্র আমাদের মনে কোনও বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক করিতে পারে না; বরং আমরা উহাদের প্রতি এক প্রকার সহানুভূতি অনুভব করি। এ সহানুভূতি অবশ্য তাহাদের অন্যায় বা দোষের প্রতি নয়—ইহা তাহাদের দুর্ব্বলতা ও দুর্ভাগ্যের প্রতি। এইখানেই প্রকৃত হাস্যরসিকের চেষ্টার সাফল্য। এইরূপেই তিনি হাসির রসায়নে অজ্ঞাতসারে অনেকপ্রকার সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা করেন। দুষ্ট দুশ্চরিত্রের প্রতিও যে আমাদের ঘৃণা বা বিতৃষ্ণার অভাব, ইহার মূলেও দীনবন্ধুর সহানুভূতি। এই সহানুভূতি বাস্তব জীবনে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির উপরও কল্পনার এমন প্রলেপ দিয়াছে, যে বাস্তবতার পীড়া-দায়ক দৃষ্টি-কটু অংশটুকু আবৃত হইয়া গিয়াছে। এই idealism এর সাহায্যেই তিনি নীরস বাস্তবের যথাযথ অবতারণা না করিয়া তাহার রস মূর্ত্তিকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারই সাহায্যে পাঠক মনে বাস্তবতার মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই idealism-এর কথা বলিতে গেলে দীনবন্ধুর হাস্যরসে humour এর প্রাধান্যের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই humour কথাটির সম্পূর্ণ ভাবার্থ জ্ঞাপক কোনও বাংলা প্রতিশব্দ নাই। ইংরাজী সাহিত্যে কথাটি যে অর্থে ব্যবহার হয়, তাহাতে হাস্যরসের সহিত সহানুভূতির সংমিশ্রণ বা সহানুভূতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হাস্যরসকেই বুঝায়। সুতরাং দীনবন্ধু সাহিত্যে যে এই সহানুভূতি-স্নিগ্ধ পরিহাসের প্রাচুর্য্য ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দীনবন্ধুর সহানুভূতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "নিজে পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন।" সেইজন্যই দোষ-ত্রুটির আলোচনায় তিনি কখনও অসহিষ্ণু বা নিষ্ঠুর হইতে পারেন নাই; তাই তাঁহার নাটকে তীব্র ব্যঙ্গ বা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের একান্ত অভাব। পাপিষ্ঠকে তিনি কশাঘাত করিয়া সংশোধন করিবার চেষ্টা করেন নাই; —তাহাকে সকলের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া সাধারণ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের তুলনায় তাহার দুর্ব্বলতা প্রসূত দুষ্কর্ম্ম ও দুরবস্থা যে কতদূর অসঙ্গত ও হাস্যকর, তাহাই সকলকে বুঝিতে সাহায্য করিয়াছেন। জীবনের এই অখণ্ডানুভূতি—যাহার সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র, খণ্ডিত বা বিকৃত জীবনের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি এমন সরসরূপে প্রকট হইয়া উঠে, তাহাই হাস্যরসিকের প্রধান উপজীব্য। জীবন সম্বন্ধে দীনবন্ধুর এই প্রজ্ঞালোকদীপ্ত সমগ্র-দৃষ্টি ছিল বলিয়াই তিনি হাস্যরস সৃষ্টিতে এত কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন।

তাঁহার হাস্যকর—চরিত্রগুলির অধিকাংশের সম্বন্ধে মনে হয়, ইহারা যেন জীবন-সমুদ্র-কূলে "ভাঙা জাহাজের ভীড়"—ছিন্নময়, ছিন্নপাল, ভগ্নহাল ; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই এই হতভাগ্যদিগের দোষ-ত্রুটি-মূঢ়তার উপর নাট্যকারের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি যেন এক অপূর্ব্ব করুণা-স্নিগ্ধ আলোকপাত করিয়াছে।

হাস্যকর চরিত্রগুলির মধ্যে নিমচাঁদের ব্যর্থ জীবনের জন্য অনুতাপ, হেমচাঁদের দাম্পত্য-প্রেম, রাজীবলোচনের জ্যেষ্ঠ কন্যা রামমণির উপর নির্ভরতা প্রভৃতি এক একটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, এই সকল স্থানে কৌতুক যেন সহানুভূতির রসে টলটল করিতেছে। দীনবন্ধুর হাস্যরসের অন্তরালে সর্ব্বদাই যে অন্তঃশীলা করুণাধারা প্রবাহিত তাহা যেন এখানে অশ্রু-উৎসে উৎসারিত হইয়া উঠিতে চায়। তাঁহার সৃষ্ট অতি-অকিঞ্চিৎকর চরিত্রগুলির মধ্যেও এইরূপ সহানুভূতির সুসমার স্পর্শের অভাব নাই। বৃদ্ধা রঙ্গপ্রিয়া দাসী আদুরী যখন তাহার মৃত স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া তাহার বহু-প্রাচীন দাম্পত্য-জীবনের সুখ কাহিনী বর্ণনা করিতেছে, সেখানেও হাস্য-কৌতুকের উগ্র আলোকের উপর এই একই সহানুভূতির স্নিগ্ধ মেদুর ছায়া-সম্পাত হইয়াছে। Idealsimএর এই পেলব-স্পর্শের ফলেই দীনবন্ধুর হাস্যরসাত্মক বাস্তব চরিত্র-চিত্রগুলি এমন অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

দীনবন্ধু-সাহিত্যে হাস্যরসের বিষয় আলোচনা করিবার সময় তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা যেন "যাহা কিছু স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন ও বিপর্য্যস্ত," তাহার দিকেই! হাস্যরসিক মাত্রকেই যে এইরূপ প্রকৃতির হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই ; সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে লইয়াও যে কত সুন্দর হাস্য-রসের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ভাল করিয়াই দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অমিত রায়ের মত চরিত্র দীনবন্ধুর ভাণ্ডারে একটিও নাই। যেখানেই তিনি কোনও সৎ শিক্ষিত যুবকের চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়াছেন, তখনই তাহা ললিত, বিন্দুমাধব, অরবিন্দ প্রভৃতির ন্যায় প্রাণহীন মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অথচ, দরিদ্র কৃষক, মদ্যপ, দুশ্চরিত্র যুবক, বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো, বৃদ্ধা রঙ্গপ্রিয়া পরিচারিকা, পরিহাস-নিপুণা পল্লীবালা, অপদার্থ হাকিম ইত্যাদি চরিত্র রচনার সময় তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। ইহার কারণ কি? অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহার তলেও দীনবন্ধুর সহানুভূতি ও সামাজিক অভিজ্ঞতা কাজ করিতেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে বোধ হইতে পারে এই প্রকার অজ্ঞ, দুর্ব্বল, উৎকেন্দ্র বা বিকৃত চরিত্র লইয়া রঙ্গরস করার সুবিধা বলিয়াই বোধ হয় দীনবন্ধু দেখিয়া দেখিয়া—তাঁহার নাটকগুলিতে এই প্রকার নর-নারীর সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দীনবন্ধু কোন চরিত্র-অঙ্কনকালে সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া তাহার অনুকরণ করিতেন। সুতরাং যেখানে সেই-রূপ প্রত্যক্ষ আদর্শ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে তাঁহার সৃষ্টি স্বাভাবিক হইতে পারিত না। তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত অবাধে মিশিতে পারিতেন ; কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি স্বভাবতঃই তাঁহার হৃদয়কে দুঃখী, দরিদ্র, হতভাগ্য প্রভৃতির দিকেই প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিত। এই জন্যই এই সকল চরিত্রকে তিনি একেবারে জীবন্ত করিয়া অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। রাজা রমণীমোহন, ললিত-লীলাবতী অথবা বিজয়-কামিনীর মত চরিত্রের সহিত খুব সম্ভব তাঁহার সহানুভূতির যে কোনও আন্তরিক সংযোগ ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এইটিই দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভার একটি দুর্ব্বলতা যে তিনি যাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্ত হন নাই, তাহাকে তিনি কল্পনার তুলিকায়—স্বাভাবিক সজীবতা দান করিতে পারিতেন না। বস্তুহীন কল্পনা-বিলাস তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। এইখানেই লিরিক কবির সহিত নাট্যকার দীনবন্ধুর পার্থক্য। Shakespeare এর মধ্যে এই গীতি-কবি ও নাট্য-শিল্পী এক হইয়া গিয়াছিল ; তাই Shakespeare যে কল্পলোক হইতে Ariel বা Caliban এর আমদানি করিয়া তাহাদের বাস্তব রূপদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেখানে দীনবন্ধুর বস্তু-নিষ্ঠ প্রতিভা কখনও পৌঁছিতে পারে নাই। ললিত লীলাবতী বা বিজয় কামিনীর প্রেম-কাহিনীর ব্যর্থতার কারণ এই যে ইহার প্রতিরূপ তিনি তৎকালীন বঙ্গ সমাজে দেখিতে পান নাই। এইগুলির অবতারণা করিতে তাঁহাকে সংস্কৃত বা ইংরাজী সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এই প্রকার পরোক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ আদর্শে প্রাণসঞ্চার করা তাঁহার বস্তু-নির্ভর কল্পনার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ এই প্রকার হাস্যলেশবর্জ্জিত গম্ভীর বা করুণ চরিত্র তাহার আপন প্রকৃতিরই প্রতিকূল ; সেজন্য জোর করিয়া সহানুভূতিকে ইহাদের উপর প্রয়োগ করিতে গিয়া তিনি কেবল নিরর্থক বিলাপোক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন—সে মেলোড্রামা-সুলভ বিলাপ আমাদের মনে কোনই ভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারে না।

ইহা হইতে মনে হওয়া অসম্ভব নয়, যে দীনবন্ধুর মধ্যে হয়ত একটু ডিমোক্র্যাটিক ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, এবং তাহার জন্যই তথাকথিত আভি-জাত্যের প্রতি তাঁহার এই সহানুভূতির অভাব এবং সাধারণতঃ "সব-হারা--দের" সহিত তাহার প্রাণের স্বাভাবিক সংযোগ। কিন্তু প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, তিনি তাঁহার গভীর সহানুভূতির যাদু মন্ত্রে এই মূঢ়, দুর্ব্বল-চিত্ত বা পথভ্রান্ত নর-নারী—চরিত্রগুলিকে অকৃত্রিম জীবন-চিত্র হিসাবে এমন একটি স্বকীয় আভিজাত্য দান করিয়াছেন, যাহার তুলনা সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যেও খুব সুলভ নহে।

"সমুদ্র মন্থন" বিষয়ে দুটী কথা

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

ভাদ্রের "ভারতবর্ষে" (১৩৫৮) শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের "সমুদ্র মন্থন" শীর্ষক (প্রভূত গবেষণাপূর্ণ) প্রবন্ধটী পড়ে যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এটী সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। নীচে যথাক্রমে ব্যক্ত করা গেল। ত্রুটী মার্জ্জনীয় :—

১। সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমবিবর্ত্তনবাদের ইতিহাসের আলোয় বিচার করলে প্রথমেই আমরা দেখি "উড্ডীয়মান উচ্চৈঃশ্রবার" আগমন সম্ভব নয়। পরবর্তী কালে মেরুদণ্ডী জীবের আবির্ভাবে "Sea horse" নামে অশ্বের বিকৃত রূপধারী একরকম মৎসের সন্ধান পাই। তার উড়বার ক্ষমতা ছিল কিনা একথা জীবতাত্ত্বিকগণ জোর করে বলেন নি। সৃষ্টি রহস্যে সমুদ্র জলে শৈবাল জাতীয় ভাসমান উদ্ভিদ প্রাণের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভব। ক্রমে আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রথম জীব—জেলি ফিস এবং ক্রমশঃ Quantity ও Qualitative change আসে। মৎস্য হতে উভচর স্থলচর বৃক্ষারোহণী; সর্ব্বশেষে পাই খেচর। ঐরাবতের কথা দ্বিতীয় স্তরে আসতেই পারে না। অতবড় বিরাট দেহ এবং নিপুণ দেহযন্ত্র—বিশেষ স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব বহু কোটী কোটী বৎসর পরে।

২। পারিজাত পুষ্পের জন্ম Evolution theoryর ধারা অনুযায়ী নিশ্চয়ই হস্তীর উদ্ভবের পরে নয়। শৈবালের ক্রমবর্দ্ধমান ইতিহাসের সঙ্গে এর যোগসূত্র রয়েছে।

৩। প্রবাল দ্বীপ গঠিত হয় ১০০ বৎসরে ১ ইঞ্চির ½ অংশ মাত্র। সুতরাং একটা প্রবাল প্রাচীর বা দ্বীপ গড়ে উঠ্‌তে কোটী কোটী বৎসরের প্রয়োজন এবং প্রবাল রত্ন নয়। তবে সমুদ্রগর্ভে জাত মাত্রই যদি রত্ন হয়, সে কথা স্বতন্ত্র। প্রবালের বর্ণ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে রক্তে রাঙা রঙটী বহু পরবর্তী কালের। সে যুগে শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ বর্ণহীনতার প্রাধান্য ছিল। হিন্দু পুরাণের বৈজ্ঞানিক যে কোন ব্যাখ্যা দিলেও ঘটনার পরিবেশকে অস্বীকার করা চলে না। যথা অনন্ত ক্ষীরোদ সমুদ্রে নারায়ণ (Symbol of white heat) এখানে সর্ব্বপ্রথম দেখ্‌তে পাই সেই আদি শ্বেতবর্ণ যা ক্ষীরোদ সমুদ্র এবং নারায়ণের অঙ্কশায়িনী যে লক্ষ্মী তাঁর গলায় শ্বেত ঐরাবত কর্ত্তৃক প্রদত্ত মণিহারের বর্ণ শ্বেত—সমুদ্র হতে সংগৃহীত। মন্থনে ঐরাবত ওঠার পর কৌস্তভ মণি উঠ্‌ল। প্রবন্ধকার বলেছেন যে কৌস্তভ সাগরের জলরাশি বা বিষ্ণুকে বোঝায়। বিষ্ণু শব্দের অর্থ বিষও হয়। আবার বিষ্ণু অন্যতম অষ্ট বসু। মণি শব্দ কেবলমাত্র মূল্যবান নয় যে কোন সম্পদকে (প্রয়োজনীয়) বুঝায়; প্রাকৃতিক সম্পদ মাত্রেই কৌস্তভ মণি বা বিষ্ণুধন।

৪। পুরাণবর্ণিত ধন্বন্তরী সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি না থাকলেও আপত্তি নেই। তবে সমুদ্র মন্থনে অমৃত কলসীর প্রাণবৃদ্ধিকর গ্যাসসমূহই যে ধন্বন্তরী এরও কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ কেবলমাত্র উল্লিখিত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং জল (সাধারণ) ধন্বন্তরী নয়। এ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের বহু ঊর্দ্ধে নানাপ্রকার গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়—ভূগর্ভে এবং ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় প্রাণবস্তু অথবা গুণবস্তু সমূহকেই ধন্বন্তরী বলা যেতে পারে। এটা কেবলমাত্র গ্যাস বা জলেই সীমাবদ্ধ নয়।

৫। বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ (তন্ত্র)—"লক্ষ্মীস্তু ধান্যরূপাসি" বলে ধান্য শস্যের একটী রূপ দিয়েছেন এ অতি সত্য কথা। কিন্তু পুরাণ অতি পরবর্তী কালীন। ঈশোপনিষদে ঐশ্বর্য্যকে ঈশ্বর এবং লক্ষ্মী আখ্যা দিয়েছেন। ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত প্রাণধারণের উপযোগী প্রাকৃতিক বস্তু মাত্রেই লক্ষ্মী।

সর্ব্ব প্রথম শস্য হিসেবে আমরা Evolution theoryতে ধানকে পাই নে। তা হলে জঙ্গলে বন্য ফল আহরণ করে জীবনধারণ করতে হোত না। বন্য ফল ব্যবহারের পরবর্তী কালে প্রস্তর যুগে মানুষ বন্য জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে, মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থনীতির গোড়ার কথায় খাদ্য সংগ্রহ ব্যাপারে Direct ও Indirect labour, এর প্রধান সাক্ষ্য। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বন্যফলমূলের অভাবে খাদ্যের অনটন দেখা দেয় তখনই শস্য উৎপাদনের বুদ্ধি মানব মনে অঙ্কুরিত হয়েছে—বহু অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ। এমন কি সে যুগের ঐ উৎপাদনটী বন্য ফলমূলসংগ্রহ নীতিরই রূপান্তর। বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে ধান্য ও কড়াই জাতীয় শস্যের উৎপাদন অনেক পরের ব্যাপার।—বিবর্ত্তনবাদীগণ একথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

৬। অক্সিজেন (O_2) বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর গ্যাস বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তারা জীবের বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য্য অঙ্গ মাত্র। তবে ওজন (O_3) গ্যাস স্বাস্থ্যকর।

৭। সৃষ্টি তত্ত্বের পৌরাণিক ইঙ্গিত অবতার-মাহাত্ম্যের মধ্যেই প্রথম ধ্বনিত হয়। এ নিশ্চয়ই প্রবন্ধকার অবগত আছেন সুতরাং পৌরাণিক ঘটনাকে Evolution theoryতে বিচার করতে হলে অবতার তত্ত্বকে নিয়ে করাই ভাল—ধারাবাহিক ক্রম বিবর্ত্তন তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সমুদ্র মন্থনের মধ্যে খুব প্রাচীনত্ব বা Originality নেই। সমুদ্র মন্থনের পৌরাণিক ইতিহাস সুবল মিত্র মশাইএর অভিধান মত এই—মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীহীন হলে লক্ষ্মী সমুদ্রগর্ভে গিয়ে বাস করতে থাকেন, তাতে ত্রিলোক শ্রী ভ্রষ্ট হয়। পরে ব্রহ্মার উপদেশে দেব ও অসুরগণ সমুদ্র মন্থন করেন এবং লক্ষ্মী, চন্দ্র, পারিজাত, ধন্বন্তরী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি উত্থিত হলে দেবগণ সেগুলো গ্রহণ করে নিলেন।

উক্ত সমুদ্র মন্থন ব্যতীত আরো দুটী মন্থনের কথা পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে দুর্ব্বাসার অভিশাপ খণ্ডন জনিত মন্থন; মহাভারতে, ব্রহ্মার

আদেশ মত অমৃতলোভী দেবাসুরের মন্থন। শেষ মন্থনটী দুর্ব্বাসার অভিশাপ মুক্তি জনিত মন্থনের Continuation। স্বয়ং স্বয়ম্ভু লভ্যাংশ হতে বঞ্চিত হয়ে পুনরায় মন্থন করান এবং তাতেই বিষ ওঠে।

৮। সমুদ্র মন্থন পুরাণ্যান্তর্গত। পণ্ডিতগণ মনে করেন পুরাণের জন্ম রামায়ণ ও মহাভারতের পরবর্তী কালীন। খৃষ্ট জন্মের এক হাজার চারশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁর পৃথিবীর ইতিহাসে বলেছেন। অতএব যখন পুরাণ পরবর্তী কালীন বলে প্রমাণিত, তার রূপকের উপখ্যানগুলো নিশ্চয়ই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থারই অঙ্গ ছিল। সমুদ্রে সওদাগরী কার্যে প্রাচীন ভারতীয় সওদাগরগণ বহির্গত হতেন বলে বহু প্রমাণ আছে। যেমন চাঁদ সওদাগরের সমুদ্র যাত্রা ব্যবসায় নিমিত্ত। পণ্য দ্রব্য সম্ভার, ফলমূল, প্রাণী এবং যথাসম্ভব সংগৃহীত মূল্যবান ধাতব দ্রব্যাদির Reference পাওয়া যায়। পৌরাণিক ঘটনায় মনসার অভিশাপে চাঁদের সওদাগরী তরী জলমগ্ন হয়। সমুদ্র যাত্রায় নৈসর্গিক দুর্যোগ অতি স্বাভাবিক। চাঁদসওদাগরের পণ্য তরী জলমগ্ন হওয়া এরই রূপক মাত্র। শ্রীমন্ত সওদাগরের সম্বন্ধে ঐ ধরণের রূপকের প্রয়োগ রয়েছে। শ্রীমন্তের সাত ডিঙ্গা নিয়ে সিংহল যাত্রার পথে 'কমলে কামিনী" মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ দৃশ্য সমুদ্র ব্যবসায়ী বণিককুলের মধ্যে ধর্ম্ম ও পুণ্য লাভের বাসনা মনে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে সিংহলে ব্যবসায় আদির প্রসার ও উৎকর্ষতা সম্যক সাধিত হয়। এগুলি Home market for industrial capital এর speculation মাত্র।

মন্থনের প্রধান দৃষ্টি অমৃতের দিকে ছিল। অমৃতটীকে যদি প্রধান পণ্য হিসেবে ধরা হয় তাহলে গোলযোগের মাত্রাটা কিছু কমে। সোমরসের ব্যবহার বৈদিক যুগ হতে প্রচলিত। যদিচ যুগে যুগে রাসায়নিক উৎকর্ষতা লাভ করেছে। মাদক দ্রব্য ব্যবহার, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্য—প্রধান দেশগুলোর সঙ্গে কারণবারি, অমৃত ইত্যাদি liquors এর আমদানী রপ্তানীর পরিচয় মাত্র। সমুদ্র মন্থনের অমৃত, বাণিজ্য নিমিত্ত সমুদ্র যাত্রার অন্যতম প্রধান পণ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

৯। সভ্যতা এবং বুদ্ধিমত্তার মানদণ্ড হয়েছে সাহিত্যের রূপরস। সমুদ্র মন্থন কালীন অথবা পুরাণকারগণের কালে বর্ত্তমানের ভাষালঙ্কার ব্যবহৃত হত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হত না বলেই প্রমাণিত হয়েছে। বৃহত্তর দার্শনিক তত্ত্বকে (বস্তু তান্ত্রিক) রূপকের সাহায্যে এমন কি Romantic প্রলেপে পরিবেশ করা সে যুগে হত না। নিছক সত্য অথবা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সরল মনে শাসন ভয় জন্মাবার কৌশল বর্ত্তমান ছিল। বৈয়াকরণিক অর্থ, শব্দের যাই করা যাক না কেন, তৎকালে ইন্দ্রকে ইন্দ্র এবং সূর্য্যকে সূর্য্যই বলা হত। অবশ্য দার্শনিক মতে বিভিন্ন স্তরের ইন্দ্র এবং দেবতাদের অবস্থান দেখা যায়। কেবলমাত্র বেদ এবং তন্ত্রে একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিবেশ করা হয়েছে। Quantitive এবং Qualititive change এর মধ্য দিয়ে।

১০। মাঝে মাঝে উপমা ও যুক্তিগুলো পূর্ণ বিবর্ত্তনবাদের কোল ঘেঁসে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে। যথা পোকার সাহেবের রাম নাম হতে রোমের উৎপত্তি খুঁজে বের করার দৃষ্টান্ত। আর একটা কথা এই যে লেখক মন্থন জনিত প্রথম ফললাভ চন্দ্রের কথা একদম চেপে গিয়েছেন। সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তায় চন্দ্রের স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়।

ব্যবস্থা-পত্র

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

(১)

ডাক্তারখানা। সকাল থেকে ডাক্তারবাবু একলাটি চুপ ক'রে বসে আছেন। একটিও রোগী আসছে না। কী আশ্চর্য্য। সহরের স্বাস্থ্য খুব ভাল হ'য়ে গেল নাকি?

হঠাৎ একটি রোগী এসে হন্তদন্ত হ'য়ে বলে—ডাক্তারবাবু! রক্ষে করুন…

—কি হয়েছে?

—খিদে!

—খিদে? বিস্মিত ভাবে ডাক্তারবাবু চেয়ে থাকেন মুখের দিকে। বিরাট দেহ। চমৎকার স্বাস্থ্য। সুন্দর

ক্ষুৎ-কাতর রোগী বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু! ভয়ানক খিদে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খাচ্ছি। শুধুই খাচ্ছি। তবু খিদে মিটছে না…

ভীতভাবে চেয়ারটা টেনে একটু পিছিয়ে নিয়ে—ডাক্তারবাবু বলেন—কী ভয়ানক কথা!

রোগী বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। রেশানের চাল এনে, ভাত রাঁধবার অপেক্ষা করতে পারছিনে। শুকনো চিবিয়ে খাচ্ছি। কাঁকরও কড়মড়িয়ে পিষে নিচ্ছি! গম-ভাঙাবার দেরি সইছে না…

—দাঁত দেখি?…হাঁ করুন তো…? ও বাবা! মুখ-

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সাত দিনের রেশান—এক দিনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে! ট্যাঁক গড়ের মাঠ। কালোবাজারে ঘুরে বেড়াই। বড় বড় হাঙর-কুমীরের ভুরি-ভোজন দেখি। চুনোপুঁটির পকেট মেরে ব্যাগ্‌টা বোঝাই করি বটে, পেট-বোঝাই করতে পারিনে। কি উপায় করি বলুন তো? গিন্নী আমাকে টুঁটি-টিপে মারতে পারলে বাঁচেন, বিধবা হ'তেও ভয় পান না।

—কী সর্ব্বনাশ! ভয়ে ভয়ে ডাক্তারবাবু বুক-পকেট্ থেকে ফাউণ্টেন্-পেন্‌টা তোলেন। একখানা খাতা খুলে নিয়ে বলেন—বলুন—আপনার নাম ও ঠিকানা···

নাম-ঠিকানা লিখ্‌তে আর একটি রোগী এসে হাজির হন। তার দিকে ফিরে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেন—বলুন—আপনার কি হয়েছে?

রোগী বলে—ডাক্তারবাবু! অরুচি।

—অরুচি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভয়ানক অরুচি। কিছু খেতে পারিনে। যা' মুখে তুলি, তাতেই বমি। খাবার দেখ্‌লেই ওয়াক্—থুঃ!

রোগীর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, গলায় সরু সোনার হার, হাতে রিষ্ট্-ওয়াচ্। দেহটি কঙ্কালসার। কণ্ঠস্বর নাকী ও মুখে মুহুর্মুহুঃ-সিগারেট্। ডাক্তারবাবু বলেন—দাঁত দেখি? ···হাঁ করুন···

—সব নড়ে গেছে। জোরে হাঁ করলে—দু'একটা পড়ে যেতেও পারে···

—থাক্, তা'হলে দরকার নেই···

রোগী বলে—শুনুন ডাক্তারবাবু! আমার কাপড়ের ব্যবসা আছে। বুঝতেই তো পারছেন—কণ্ট্রোলের মাল পিছন দরজা দিয়ে চালিয়ে বেশ কিছু কামিয়েছি! কোনো জিনিষের অভাব নেই আমার। ল্যাংড়া-আম—টাকায় দুটো—আলমারী ভর্ত্তি। পাশেই দ্বারিক—দশটাকা-সেরের সন্দেশ! ছেলেরা আনে। মুখ ফিরিয়ে বসে থাকি। বন্ধুরা টেনে নিয়ে যায়—রেস্তোরাঁতে। ভাল ভাল খাবার সামনে আসে। চপ্-কাটলেট্-রাই, মাটন্—মাছের ফ্রাই, কোনোটা'তেই লোভ নাই! সিগারেট পোড়াই। উপায় করুন ডাক্তারবাবু! বিধবা-হবার ভয়ে গিন্নী আমার কেঁদে ভাসাচ্ছেন···

—বলুন—আপনার নাম ও ঠিকানা···

নাম-ঠিকানা লিখ্‌তে লিখ্‌তে আর-একটি রোগী এসে হাজির হন্।

লোকটি অতি বৃদ্ধ। মাথায় পক্ক কেশ। মুখে সুপক্ক গোঁফদাড়ি। গরমের দিনেও গায়ে একটা মোটা জামা ও গরম র‍্যাপার জড়ানো।

তাঁর দিকে ফিরে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেন—বলুন, কি হয়েছে আপনার?

দন্তহীন মুখে একটু হেসে বৃদ্ধ বলেন—আজ্ঞে ডাক্তার-বাবু! খেলেও বুঝিনা যে খেয়েছি। না-খেলেও বুঝিনা যে খাইনি। খেলাম তো, খুবই খেলাম। না-খেলাম তো মোটেই খেলাম না। মোটের উপর খাওয়া, আর না-খাওয়ার তফাৎ বুঝ্‌তে পারি না···

—চমৎকার! আচ্ছা আপনারা একটু বসুন। আপনাদের ব্যবস্থা-পত্র লিখে আনি।

ডাক্তারবাবু কক্ষান্তরে প্রবেশ করেন।

(২)

—এক-নম্বর! দুই নম্বর! তিন নম্বর! এই নিন্ আপনাদের তিনখানা ব্যবস্থা-পত্র

তিনজনের হাতে তিনখানা কাগজ দেন ডাক্তারবাবু।

তারা দাবী করেন—আজ্ঞে, ওষুধ?

ডাক্তার বলেন—আপনাদের ব্যাধি—রাজনৈতিক ও সামাজিক। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত কোনো ওষুধ দিতে পারবো না। মাপ করবেন···

একনম্বর জিজ্ঞাসা করেন—রাজনৈতিক ও সামাজিক মানে?

ডাক্তার বলেন—বর্ত্তমান কালে কণ্ট্রোল ও কালো-বাজারের দৌলতে—ধনীরা হচ্ছেন, বেজায় ধনী। আর—গরীবরা হচ্ছেন, বেজায় গরীব। ধন-বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না-ঘটলে, আপনাদের ব্যাধি দুরারোগ্য। ধনসাম্য নির্ভর করে রাষ্ট্র-নীতির উপর।

আমার পরামর্শ হচ্ছে—আপনারা ডাঃ রায়ের কাছে যান। তিনি 'ফরসেফ' হাতে নিয়ে, মাথায় হাত রেখে

টেবিলে তুল্‌তে সাহস পাচ্ছেন না। উপায় কি বলুন?
ডাঃ রায় ছাড়া—অন্য ডাক্তারের অসাধ্য আপনারা।

দুই-নম্বর জিজ্ঞাসা করেন—আমাদের ব্যাধি সামাজিক বল্‌লেন কেন?

ডাক্তার বলেন—যদি আশু-প্রতীকার চান্—তা'হলে এক-নম্বর ও দুই-নম্বর অবিলম্বে সংসার-বিনিময় করুন…

তিন-নম্বর চম্‌কে ওঠেন—সংসার-বিনিময়? সে আবার কি?

ডাক্তার বলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। এক নম্বরের ঘরে—খিদে আছে, খাবার নেই। দুই-নম্বরের ঘরে খাবার আছে, খিদে নেই। সুতরাং সংসার-বিনিময় ছাড়া আশু-প্রতীকারের কোনো উপায়ই নেই…

এক নম্বর ও দুই নম্বর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বলেন—কী সর্ব্বনাশ! আমাদের গিন্নীরা রাজী হবেন কেন?

ডাক্তার বলেন—কেন হবেন না? এক নম্বরের গিন্নী স্বামীকে মেরে ফেলে বিধবা হতে চান। দুই নম্বরে গিন্নী, বিধবা হবার ভয়ে কেঁদে ভাসান। অতএব, সমস্যাটি যে সামাজিক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে আপনারা হিন্দুমহাসভাকে 'কন্‌সাল্‌ট্' করুন। জনমতকে জিজ্ঞাসা করুন—এই অসাম্য দূরীকরণ উদ্দেশ্যে হিন্দু-কোড বিলে একটা নূতন ধারা সন্নিবেশ করা যায় কিনা? এখন তা'হলে আসুন…নমস্কার!

অতিবৃদ্ধ তিন-নম্বর জিজ্ঞাসা করেন—কই, আমাকে তো কিছু বল্‌লেন না?

ডাক্তারবাবু বিরক্তভাবে বলেন—আপনার যখন খেলেও চলে, না-খেলেও চলে, তখন আপনি গিয়ে দয়া ক'রে বসে থাকুন, গোলদীঘিতে। রাজনীতি ও সমাজনীতি চর্চ্চা করুন—বলেই তিনি প্রবেশ করলেন কক্ষান্তরে।

মানুষ-কৃষ্ণ

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

আমরা জানি না জ্ঞানীর ব্রহ্ম যোগীর জ্যোতির্ম্ময়,
ধারণা-অতীত বিরাট পুরুষে রীতিমত করি ভয়,
ভাগবতী নহে আমাদের তত্ত্ব, রক্ত-মাংসে গড়া
প্রাণের পিপাসা, লোভ, ভালবাসা শত মমতায় ভরা।

মাটির মানুষ আমরা যে তাই রূপের লালসা করি,
ধূলি বালি দিয়া রচি সংসার, তাই নিয়ে বাঁচি মরি।
ভরত-রাজার হরিণ-জন্ম জেনেও খোকারে ডাকি,
আদরে যতনে নয়নে নয়নে হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি।

যশোদার কোলে তাই শিশুরূপী মানুষের ভগবান
স্নেহের কৃষ্ণে, মানুষ কৃষ্ণে চায় আমাদের প্রাণ
আমরা যে পারি ডাকিতে আদরে জড়াইতে বাহুডোরে
শাসন করিতে, তাড়না করিতে চতুর কৃষ্ণ চোরে।

মানব-শিশুর সখাসাথী হোয়ে সাথে সাথে খেলা করে,
সারথী হইয়া বসিতে ব্যাকুল মানুষের রথ' পরে।
নারীর চরণ ধরিয়া সে কাঁদে, লিখে দেয় দাস-খত
সে ঋণ শুধিতে নয়নের জলে ভিজায় মাটির পথ।

সেই ভালবাসা-ভরা কৃষ্ণেরে ত লইব বক্ষে টেনে
জীবন জুড়ানো তাহার পরশ দয়িত-জনের জেনে।
রূপের পিপাসা মিটাইব মোরা রূপের রাজায় পেয়ে—
ধন্য করিব জন্ম, মানুষ-কৃষ্ণের জয় গেয়ে।

দীনের কৃষ্ণ, হীনের কৃষ্ণ, সহায়হীনের নাথ,
তিমির-বরণ এস ঘুচাইতে আমার তিমির রাত
এস হে পুত্র, এস হে সঙ্গী, এস এস প্রিয়তম
এস আত্মীয়, পরম বন্ধু, মুছাও মনের তম।

ভাগবতীয় কৃষ্ণচরিত্র

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কার্য্য

পুতনা বধ। যমলার্জুন ভঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিবার যশোদার বৃথা প্রয়াস। নানা অসুর বধ। ইন্দ্রের দর্প ভঙ্গ। গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোপ-গোপীদিগকে বাত, বজ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা। কালীয় দমন—ইত্যাদি।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষা

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণই যে পরমাত্মা ইহা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে একদিন গোবৎসগুলি ও রাখাল বালকদিগকে অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। বৎস ও বৎসপালদিগকে দেখিতে না পাইয়া কৃষ্ণ ইহা ব্রহ্মার কার্য্য বলিয়া জানিলেন। ব্রহ্মাকে নিজ যোগৈশ্বর্য্য বুঝাইবার জন্য তিনি নিজেই শত শত বৎস ও বৎসপালক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। এই নব-বৎস বা রাখালদিগকে বৎস-মাতা ও রাখাল-মাতাগণ নিজেদেরই সন্তান ভাবিয়া ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এক বর্ষ পরে ব্রহ্মা পরাজয় স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন।

যোগেশ্বরের বহু মূর্ত্তি ধারণ

রাসে শ্রীকৃষ্ণ বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বারকায় নারদ শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্ত্তি ধারণ দেখিয়াছিলেন। এক গৃহে তিনি নারদকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া গ্রহণ করিলেন। কোন গৃহে নারদ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব বা কোনও মহিষীর সহ অক্ষ ক্রীড়া করিতেছেন। কোন গৃহে তিনি পুত্রদিগকে লালন করিতেছেন। কোন গৃহে তিনি মন্ত্রীদিগের সহ মন্ত্রণা-কার্য্যে ব্যাপৃত। কোন গৃহে স্থপতিবর্গের সহ বিবিধ পূর্ত্ত ক্রিয়ার ব্যবস্থায় রত। যজ্ঞশালায় তিনি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বহু কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

আরও :—ভাগবত। ১০ স্কন্ধ। ২৯ অ।

কোন গৃহে শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস, পুরাণের মঙ্গল কথা শ্রবণ করিতেছেন। কোন গৃহে তিনি প্রিয়ার সহ হাস্য কথায় হাসিতেছেন। কোথাও তিনি অর্থকামপ্রদ ধর্ম্মকার্য্যের সেবন করিতেছেন। কোন গৃহে তিনি স্থির-ভাবে বসিয়া প্রকৃতিরও পর যে পুরুষ তাহাকে ধ্যান করিতেছেন। কোথাও তিনি বিগ্রহ বা সন্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন। কোথাও রামের সহ তিনি সাধুগণের হিত চিন্তা করিতেছেন। ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর এই নিবন্ধ আর একটু বিস্তৃত করা যাইতেছে। বঙ্কিম ভাগবতের কৃষ্ণকে অগ্রাহ্যপ্রায় করিয়া মহাভারতের কৃষ্ণকেই লইতে বলিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতেও কৃষ্ণের যোগেশ্বরত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। গীতা। ২ অ। ৫ শ্লোক।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

—হে অর্জুন তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে—সে সকল তুমি জান না, আমি জানি।

ভাগবতে ও মহাভারতে বর্ণিত আছে নর ও নারায়ণ নামক দুই ঋষি নৈমিষারণ্যে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন এবং নর অর্জুন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের জাতি-স্মরত্ব শক্তি ছিল, অর্জুনের ছিল না। গীতা। ৭ অ। ২৬ শ্লো।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥

—আমি বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীতকে জানি, আমাকে কেহই জানে না। গী। ৯ অ। ৫।

…পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্—

—আমার ঐশ্বর যোগ দেখ। গী। ১১।১০।৪

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।

ঐ ৮ অ শ্লো।

পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ঐ ৯ শ্লো—মহা যোগেশ্বরো হরি।

ঐ ১৮ অ। ৭৫ শ্লো।

যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্। ঐ।১৮।৭৮।

যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

এক্ষণে—ভাগবত হইতে :—ভাগবত।১০ স্কন্ধ।১৪ অ।২১ শ্লো।

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্।
যোগেশ্বরোতী ভবত স্ত্রিলোক্যাম্॥

—হে ভূমন্ (বৃহৎ) ভগবান্ কে ত্রিলোকে তোমার যোগেশ্বর লীলা জানিতে পারে? ঐ। ২১ অ। ১৭ শ্লো।

কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্ যোগমায়ানুভাবিতম্। ঐ। ২৭ অ। ১৯।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভবঃ। ঐ। ২৯।১৬।

নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ ঐ। ৪৯।১৬

নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা॥ ঐ।৬১।২১

অনাগতমতীতঞ্চ বর্ত্তমানমতীন্দ্রিয়ম্।
বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ।

—যোগিগণ ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্ত্তমান ও অতীন্দ্রিয় বস্তু সকল এবং তাহারা বস্তু দূরস্থ বা আবৃত থাকিলেও সম্যক্ দেখিতে পান। ঐ।৬৪।২৯।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ ॥ ঐ।৬৯।৩১।

বীক্ষ্যযোগেশ্বরেশস্য যেষাং লোকা বিসিস্মিরে। ঐ।৬৯।৩৮।

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দ্দর্শা অপি মায়িনাম্। ঐ। ৭৪।৪৮।

সাধয়িষ্যা ক্রতুং রাজ্ঞঃ কৃষ্ণোযোগেশ্বরেশ্বরঃ। ঐ।৮৫।২৯।

রাম রামাপ্রমেয়াত্মন্ কৃষ্ণযোগেশ্বরেশ্বর। ঐ।১২স্ক।১১।৩১।

...যোগাধীশো গুহাশয়ঃ।

ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

আমরা এক্ষণে ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিবার উপযুক্ত মনস্তত্ত্বে উপনীত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ—পরমাত্মা। তিনি যোগেশ্বরেশ্বর। যোগেশ্বরগণ যোগবিভূতিশালী। তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দূরস্থ ও আবৃত বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহারা এককালে বহু মূর্ত্তি ধারণ করিতে সমর্থ। অষ্টসিদ্ধি তাহাদের করে স্থিত।

ঈদৃশ শ্রীকৃষ্ণের রাগ নাই, দ্বেষ নাই। কাম নাই, ক্রোধ নাই। লোভ নাই, মোহ নাই। ভয় নাই, লজ্জা নাই। কিন্তু তিনি ভক্তবৎসল।

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং। গীতা।৯।২৯।

যাহার কেহ দ্বেষের পাত্র নাই বা প্রিয়পাত্র নাই তিনি ভক্তবৎসল হইবেন কেন? শ্রীধর বলেন—ভক্তেরেবায়ং মহিমা—ভক্তেরই ইহা মহিমা। শঙ্কর শ্রীধর উভয়েই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যেমন অগ্নির যে নিকটে যায় তাহারই আলোকপ্রাপ্তি এবং শৈত্যকষ্ট দূর হয়। ইহাতে অগ্নির কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই। অতি দুরাচারেরও ভগবানের শরণাপন্ন হইবার কোনও বাধা নাই।

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব সমন্তব্য সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ। গী।৯।৩০।

—অতি দুরাচারও যদি আমাকে (ভগবান্‌কে) ভজনা করে তাহা হইলে তাহার উত্তম ভাল। তাহাকেও সাধু ভাবিতে হইবে।

ভাগবতে বহুসংখ্যক ভক্তের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তাহাদের মনোবৃত্তি নানাবিধ। কপিলদেব জ্ঞানী ভক্ত। ধ্রুব ও অদিতি সকাম ভক্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ নিষ্কাম ভক্ত। ব্রজ গোপী ও গোপদের ভক্তি প্রথমে সকাম, পরে নিষ্কাম।

জীবের আত্যন্তিক কামনা ভগবান্ পূর্ণ করেন। জীবমাত্রেই ভগবানের অংশ। অতএব তাহাদেরও ভগবৎশক্তি কিছু কিছু আছে।

যথা প্রদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গা সহস্রশঃ

প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।

তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥

মণ্ডুকোপনিষৎ।২।১।

—যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় সেইরূপ (হে সৌম্য) অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ জীব জন্মে ও তাহাতেই লয় হয়।

অতএব জীব যে কোন দেবতার নিকটই একান্ত প্রার্থনা করে অথবা নিজেই যদি একান্ত ভাবে কোনও ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয়। কিন্তু সেই ইচ্ছা যদি তাহার সুসঙ্গত না হয় তবে তাহাকে আবার অন্য ইচ্ছা করিতে হইবে। ততঃ কিম্।

সাধু সন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক দরিদ্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার এ দারিদ্র্যের এত কষ্ট কেন? সাধু কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন—দেখুন বঙ্কুবাবু, পূর্ব্বজন্মে আপনি একজন বিপুল ধনী ছিলেন। সেই অর্থ আপনাকে এত কষ্ট দিয়াছিল যে মরণকালের কিছু পূর্ব্ব হইতে আপনার একান্ত প্রার্থনা ছিল ভগবান্ আর যেন আমার অর্থ না হয়।

ব্রজ-গোপী

ব্রজ গোপী সম্বন্ধে বঙ্কিম কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। আর অনেকেই কৃষ্ণলীলার কদর্থ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক গুণ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও রূপে গোপীগণ মোহিত হইয়াছিল। তাহারা ব্রত করিয়া প্রত্যহ কাত্যায়নীর কাছে প্রার্থনা করিত—ভা।১০।২২।৪।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।

নন্দ গোপ সুতংদেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

—হে কাত্যায়নি, হে মহামায়া, হে মহাযোগিনীদিগের অধীশ্বরি নন্দ গোপ-সুতের পুত্রকে আমার পতি করুন, আপনাকে নমস্কার।

গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আপনাদিগের এই আত্যন্তিক কামনা নিবেদন করিল, তিনি তখন নানা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। পতিশুশ্রূষা করা, গৃহকর্ম্ম করা স্ত্রীগণের পরম ধর্ম্ম বলিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ (ভগবান্‌কে) প্রাপ্তির জন্য ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান এবং দর্শন যেমন ফলপ্রদ তাহার সন্নিকর্ষ তেমন নহে—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।

ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ভা ১০।২৯।২৭

—এই সকল কথা বলিলেন এবং তাহাদিগকে গৃহে ফিরিতে বলিলেন। ইহাতেও যখন তাহারা নিজেদের কামনা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না তখন ভগবান্ পতিভাবে তাহাদের বাসনা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ইহার ফলেই বৃন্দাবনের রাসলীলা। ইহা শুধু নৃত্যগীতাদিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ভগবান্ যোগমায়া সৃষ্টি করিয়া গোপীদিগের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গোপীই কৃষ্ণকে নিজ সন্নিকটে দেখিল। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দেশের বল-নৃত্য এই রাস-নৃত্যেরই অনুরূপ। কিছুকাল হইল Readers' Digest নামক এক প্রসিদ্ধ আমেরিকান কাগজে একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধে লিখিত আছে আমেরিকার অধিকাংশ কুমারীই বিবাহের পূর্ব্বে বিবিধ-ভাবে প্রিয়-পিষ্ট (Petted) হইয়া থাকে। তৎকালীন গোপসমাজেও হয়ত ঐরূপ ব্যাপারই ঘটিত।

বর্ত্তমান কালের মনস্তত্ত্ববিজ্ঞার মত এই যে, মানুষের একান্ত আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিয়া ভাল ফল হয় না। শরীর-মনের দুর্ব্বল অবস্থায়, অন্তর্মনে (Sub-conscious) প্রেরিত ঐ কামনা প্রবলতর ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবদিগের কামজ যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল ফ্রয়েডির মনস্তত্ত্বের দ্বারাই তাহার ব্যাখ্যা করা যায়।

আধুনিক ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলার ধারা

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(১)

চিত্রের ভাষা—রেখার ভাষা, চিত্রের ধারা—রঙের ধারা, চিত্রের প্রাণ—চিত্রকরের তুলির টান। ভাস্কর্য্য যেখানে স্থির, অচঞ্চল, কবিতা যেখানে মুখর, চিত্র সেখানে রূপের মধ্যে অরূপের মৌন বিকাশ। শ্রেষ্ঠ চিত্র শুধু রঙে সজ্জায় রূপায়িত হইয়া শেষ হইয়া যায় না, সে তাহার মুক আবেদনে জানাইতে চায় শিল্পীর অন্তর্নিহিত গোপন কথাটী। এক একটী
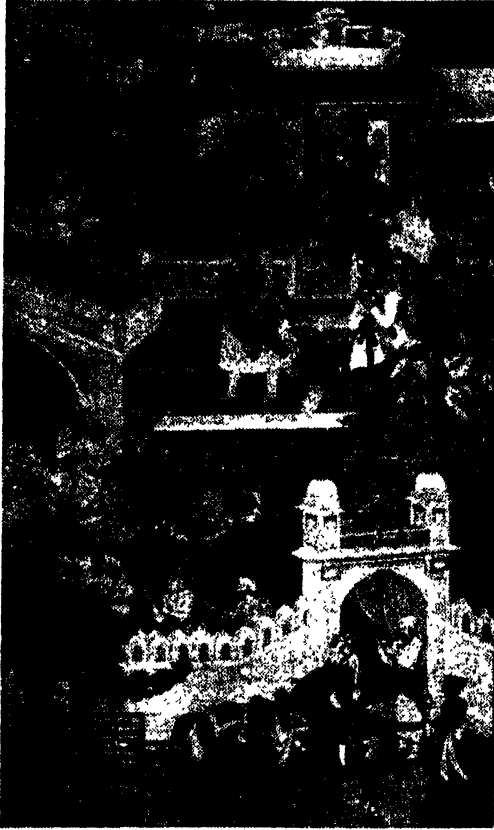
জয়পুরী ঢঙে অঙ্কিত শ্রীকৃপাল সিং শেখাবতের পাবুজী রাঠোরের বিবাহ চিত্রের ছায়াছবি

চিত্র-শিল্পী তাঁহাদের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করেন তাঁহাদের তুলিকা-নিঃসৃত নব নব ধারায়, তাঁহাদের বিষয় নির্ব্বাচনের বৈচিত্র্যে ও মৌলিকতায়।

গত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া ভারতীয় চিত্র কলার নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই নবযুগের চিত্র-শিল্পে নানা দেশের নানা জাতির চিত্র-শিল্পের অনুপ্রেরণা ও সংমিশ্রণ গোচরীভূত হয়। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট চিত্র ও ভাস্কর্য্যের মধ্য দিয়া ভারতীয় চিত্রকলার ধারা যে কত বিভিন্ন পথে হয়ত বা বিপথে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রবন্ধে করিলাম।

ছবি সম্মুখে না দেখিলে ছবির আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না, এজন্য হয়ত এ প্রবন্ধ রস-পিপাসুর মনকে অতৃপ্ত রাখিবে। কিন্তু আমি প্রায়ই আধুনিক কালের বিখ্যাত শিল্পী ও চিত্রকরদের উদাহরণ দিয়াছি যাঁহাদের চিত্র ও ভাস্কর্য্য হয়ত অনেকেই দেখিয়াছেন এবং যাহা লইয়া রূপজ্ঞদের ভিতর অল্পবিস্তর আলোচনা হইয়াছে।

(২)

এক সময়ে চিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রূপসাধনা। রূপ ছাপাইয়া কোন অরূপ বা অতিন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভাব-রাজ্যের সন্ধান মিলিল কিনা তাহা

চিত্রের আলোকচিত্র

শিল্পী চিন্তা করিতেন না। সৌন্দর্য্যের অর্থ ছিল স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। এই বাহ্য সৌন্দর্য্যে রঙের অপূর্ব্ব সম্ভার দিয়া দর্শকদের চমক লাগাইলেন যে সব ইউরোপীয় চিত্রকর তাঁহাদের মধ্যে টিসিয়ান, রাফেল, কর্জ্জিয়নীর নাম করা যাইতে পারে। রাফেলের পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রকররা বিশেষ করিয়া লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, ওতিচেলি প্রভৃতি এই বহিসৌন্দর্য্যের পরিপ্রেক্ষিতে আনিয়া ফেলিলেন, একটী ম্লান ব্যাখাতুর অপার্থিব জ্যোতি—এই অঙ্কন বিশিষ্টতা অনুপ্রাণিত করিল উনবিংশ শতাব্দীর একদল চিত্র-শিল্পীকে।

তাঁহারা রাফেল-প্রবর্ত্তিত চিত্র-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিয়া একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিলেন চিত্র শিল্পে—এবং জন এভারেট মিলে, দান্তে

গাব্রিয়েল রসেটীর প্রভৃতির সমন্বিত এই চিত্রকরদের নাম হইল প্রিরাফেল আইট ব্রাদারহুড।

উপরোক্ত রূপ এবং ভাবের দুইটী বিশিষ্ট ধারা লইয়া ইউরোপীয় চিত্র শিল্প ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বৃটিশ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সহিত।

এই বিদেশী সংস্কৃতির সহিত ভারতে আসিল ভাস্কর্য্যে ইতালীয়ান

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর "ঝড়ের পরে"

মার্ব্বেল, চিত্রে ইতালীয়ান Masters এবং প্রি-র‍্যাফেলাইট ইংরাজ চিত্র-শিল্পীর চিত্র সম্ভার।

ক্রমে গাব্রিয়েল রসেটী, বার্ণজোন্স মিলে, লেনস বরো, ল্যাণ্ডসিয়ার এর চিত্র প্রতি আভিজাত ঘরের গৌরবের সামগ্রী হইয়া পড়িল। এই সময়টিতে আমরা সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হইয়াছিলাম আমাদের জাতীয় চিত্রকলা। বিস্মৃত কেন প্রাক্ মুসলমান যুগের হিন্দু চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য এবং মুঘলযুগের স্থাপত্য ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিকে আমার অবজ্ঞা, উপহাস ও তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—বিদেশীদের সহিত।

(৩)

যারা উনবিংশতি শতাব্দী ব্যাপী বিলাতী চিত্র ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি হইতে কলা সরস্বতীকে মুক্তি দিলেন প্রথম শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্রনাথ।

১৯২০ হইতে ১৯৩০ এই দশ বৎসর কাল বাংলা সংস্কৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলিলেই চলে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সাহিত্যে, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষ রাজনীতিতে, প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশ বিজ্ঞানে, আশুতোষ শিক্ষা বিস্তারে, রাজেন্দ্রনাথ ব্যবসা নীতিতে এবং অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পে বাংলার নাম, এই সময়টীতে, সংস্কৃতির ইতিহাসে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। এই মহিমান্বিত যুগের একটী বিশিষ্ঠ অধ্যায় হইতেছে ভারতীয় কারুশিল্পের পুনরুত্থান এবং তাহার যথোচিত সমাদর।

ঠিক যে সময়টীতে কলারসিকের দৃষ্টি, পাশ্চত্য পদ্ধতিতে, চিত্রে বাহ্য-সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে—বাহ্য সৌন্দর্য্য পশ্চাতে ফেলিয়া, সূক্ষ্ম রেখার টানে ও হালকা রঙের সমাবেশে এক অপার্থিব স্বপ্নলোক অঙ্কিত করিতে লাগিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ইহাতে কত না চিন্তায়, কত না তর্কে—সমালোচকরা মুখরিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু সকলে মানিতে বাধ্য হইলেন যে, রঙের ও রেখার যে মোহাবিষ্ট সমাবেশ একদিন দেখা গিয়াছিল অজন্তার গুহা গাত্রে, ভাস্কর্য্যের যে লীলায়িত ছন্দ ধরা পড়িয়াছিল দাক্ষিণাত্যের দেব দেউলে—তাহা নবরূপে বিকশিত হইয়াছে এই প্রতিভাবান শিল্পীর তুলিকার টানে। কালিদাসের কাব্যে নারীর যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে—

সেই তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা, পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী—ইহার চিত্র পটে স্থির হইয়া আছে।

অবনীন্দ্রনাথ শুধু ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির পুনরুদ্ধার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, মুঘল ও পারস্য পদ্ধতি ঘাড়ওয়াল, কাংড়া ও জয়পুরী পদ্ধতি, চীন ও জাপান চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিও তাহার অঙ্কনের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ও অনিন্দ্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

অবনীন্দ্রনাথের সহিত উঠিলেন এক দল দক্ষ শিল্পী সম্প্রদায়—নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সারদা উকিল, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, আবদার রহমান চাঘতাই প্রভৃতি—যাঁহাদের শিল্প-প্রতিভা একের পর এক ভারতীয় চিত্রাঙ্কন করিয়া—রবিবর্ম্মা প্রভৃতির একান্ত নীরস বাহ্য-সৌন্দর্য্য-প্রকাশকে একরকম নষ্ট করিয়া দিলেন। ছবি যে প্রকৃতির নকল বা ফটোগ্রাফী নয় তাহা ইহারা প্রমাণ করিলেন।—

(৪)

কিন্তু এই যে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন, তাহাও ক্রমে গতানুগতিক হইয়া আসিল—ভারতীয় চিত্র বস্তুতঃ, ভাবমুখর, অপার্থিব-সত্য বটে, ইহার সহিত জীবনের যোগ সূত্র অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু ইহার চিত্র ও ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি

বরাবর কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। যেমন—

জ্র যুগ ধনুবাকৃতি—
ডমরু মধ্য, কম্বুগ্রীব,
করভ-উরু
বিম্বাধর,
খঞ্জন বা কমল নয়ন।

এই বাঁধা-ধরা নিয়মের সহিত প্রাণের টান ছিল না বলিয়া ইহাতে সতেজতা বা শক্তি সম্যকভাবে ফুটিত না। ইহা যখন একান্ত এক ঘেঁয়ে হইয়া অসহ হইয়া উঠিতেছিল সেই সময় উঠিলেন এক প্রতিভাবান শিল্পী, দেবী

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ভাস্কর্য "শীত"-এর ছায়াচিত্র

প্রসাদ রায়চৌধুরী! (১৯৩০।৪০ এই দশ বৎসর ভারতীয় শিল্পে ও ভাস্কর্য্যে দেবীপ্রসাদের যুগ বলিলে চলে)।

ইনি ভারতীয় শিল্পীর গতানুগতিক ধারাকে ছাপাইয়া জীবনের সহিত শিল্পের যোগাযোগ করিলেন এক বলিষ্ঠ প্রাণবান শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া। শিল্পের মধ্য দিয়া, জীবনের সত্য প্রকাশ হইল ইহার ভাস্কর্য্য ও চিত্রের ভিতর।—ইনিই প্রথম চিত্রে নগ্ন কুশ্রীতার ভিতর দিয়া, কঠোরতার ভিতর দিয়া, জীবন সংগ্রামে ক্লিষ্ট মানব-মানবীর দুঃখ ও দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া জীবনের নির্মম সত্যগুলি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার, শ্রমের জয় এবং শীত প্রভৃতি ভাস্কর্য্য দ্রষ্টব্য। দিলেন তাঁহাদের চিত্রের ভিতর বাস্তবতা বা Realism ক্রমেই তীব্রতর হইয়া দেখা দিতে লাগিল—এবং এই বাস্তবতা প্রকাশ হইতে লাগিল বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনের মৌলিকতায়। ক্ষুধার তাড়নায় জীর্ণ শীর্ণ নরনারী যখন কলিকাতার রাজপথে মরিতে ছিল তখন সেই বিভীষিকা দেবীপ্রসাদ, ভবেশ সান্ন্যাল, রথীন মৈত্র প্রভৃতি নব যুগের চিত্রকরদের চিত্রের ভিতর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় ১৯৩৫ হইতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিত্র শিল্পীদের ভাবের ও অঙ্কন পদ্ধতি বা technique এর আদান প্রদান খুব ঘনিষ্ঠভাবে চলিতে থাকে—তাই যে বাস্তবতা প্রথম, প্রচণ্ড শক্তির সহিত দেখা দিয়াছিল দেবীপ্রসাদের শিল্পে—তাহারই নূতনতর বিকাশ হইল উত্তর ভারতে রোএরিক, অমৃতা শেরগিল, রূপ ও মেরীকৃষ্ণ প্রভৃতির চিত্রের ভিতর এবং বাংলাদেশে রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, শৈলেজ মুখোপাধ্যায়ের চিত্রের ভিতর।—

ইহার পরবর্ত্তীকালে প্রায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষার্দ্ধ হইতে ভারতীয় চিত্রকলায় আরও একটী পরিবর্ত্তন আসিল—তাহা অতি-বাস্তবতা এবং তাহা চিত্রে একটী বিশেষভাব বা সঙ্কেতের দ্বারা পরিস্ফুট করা—এই

রাম কিঙ্করের অঙ্কিত "মাতৃস্নেহ" চিত্রের ছায়াচবি

(impressionism or surrealism)। এই সকল চিত্র হইল হেঁয়ালির মত, বর্ণ এবং আলোক সম্পাতের ইঙ্গিতে কিছু বলা কিছু না বলার মত।

ইহাদের প্রেরণা ও অনুভূতি গ্যাগোয়া, ভ্যানগো, পিকাসো, মাতিস প্রভৃতি ফরাসী চিত্রকরদের চিত্রের মাধ্যমে। এই শ্রেণীর চিত্রে ফুটিয়া উঠে মানব মানবীর অন্তর্নিহিত চরিত্রের বিশিষ্টতা এবং প্রকৃতি পরিচয়ে—অতি সাধারণ বিষয় বস্তু নির্ব্বাচনে।

ইহার পর আরও একটী ধারা দেখা দিল—তাহা নিছক রূপসজ্জা বা Decorative আর্ট। ইহা প্রথম ধরা দিয়াছিল রেখা ও রঙের মাধ্যমে—সতীশ সিংহের রেখাঙ্কনে এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কনে (cubismএর ভিতর দিয়া) তাহা উত্তর কালে আরও পরিস্ফুট ও তীব্রতর হইল যামিনীরায়ের পটপদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রাঙ্কনে ও শুভঠাকুরের

কাজেই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় পাঁচটী ধারা মোটামুটি ভাবে বর্ত্তমান—

১ম। গ্রীক বা ইতালিয়ান পদ্ধতিতে নিছক রূপচর্চ্চা—পাশ্চাত্য রবিবর্ম্মা হইতে আরম্ভ করিয়া যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, হেমেন্দ্র মজুমদার, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, সতীশ সিংহ প্রভৃতি।—

২য়। ভারতীয় চিত্রাঙ্কন, ভারত, পারস্য মুঘল, কাংড়া জয়পুরী ঢঙ্ ইত্যাদিতে প্রাচ্য চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি। অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি—

৩য়। বাস্তবতা বা বলিষ্ঠ মানবতার মাধ্যমে এক প্রাণবান চিত্রাঙ্কন—

দেবীপ্রসাদ, রমেন চক্রবর্ত্তী, ললিত সেন, রথীন মৈত্র শৈলজ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ঘোষ প্রভৃতি—

৪র্থ। চিত্রের ভিতর মনের ভাবটী বিশেষ জোর দিয়া প্রকাশ করা—ইহাতে বর্ণ সম্পাতের ইঙ্গিতে চিত্রর মনের ভাব বুঝা যায়। ইহা ফরাসী শিল্পীদের অনুপ্রেরণা—অমৃত শেরগিল, গড়ে, চিঞ্চলকর, রামকিঙ্কর প্রভৃতি এই শ্রেণীর।—

পিকাসো গ্যালেয়া প্রভৃতি ফরাসী চিত্রকরার এইশ্রেণীর চিত্র আঁকিয়া সমালোচকদের প্রবল ধাক্কা দিয়া এখন চিত্র শিল্পের ইতিহাসে একটী বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছে। এই শ্রেণীর চিত্র অধুনা ভারতীয় চিত্রশিল্পকে ধীরে ধীরে বদলাইয়া দিতেছে। এই শ্রেণীর চিত্রের ভারতীয় মাটীর সহিত কোন যোগ আছে কিনা এবং ইহা শাস্ত্রসম্মত কিনা তাহা লইয়া তর্ক চলিতেছে। কিন্তু Artএর দিক দিয়া এই শ্রেণীর চিত্রের একটা বিশিষ্ট নিবেদন আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।—

৫ম। সাজাইবার বা decorative Art, ভারতের গ্রামে, কুটীর গাত্রে যে শিল্প একান্তে, নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহা দেখিয়াছি কালীঘাটের পটে, কাঠের পুতুলে এবং পুতুল নাচে পুত্তলী সম্ভারে। তাহা এক অপূর্ব্ব শ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠিল যামিনী রায়ের চিত্রাঙ্কনে—এবং শুভ ঠাকুরের জ্যামিতিক পরিক্রমায় ও রূপসজ্জার ভিতর ইহার অভিনবত্ব এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীর মনোহারিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রকলার ধারা বিবেচনা করিতে হইলে এই পঞ্চ ধারাকে বিবেচনা করিতে হইবে। ইহারাই অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় কলাভবন আলোকিত করিবে—তাই বর্ত্তমানে চিত্র বুঝিতে হইলে তাহার ধারাকে বুঝিতে হইবে। একেকে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া লঘু করিলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতাকে যেমন মাইকেলের মহাকাব্যের সহিত তুলনা করা চলে না—তেমনি—এক শ্রেণীর চিত্রকে অন্য শ্রেণীর চিত্রের সহিত তুলনা করা চলে না।—প্রতি চিত্রের বিশিষ্ট technique বিচার করিয়া তাহাকে সেই শ্রেণীর চিত্রের সহিত তুলনা করিতে হইবে। নহিলে—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ হইবে।—

জীবন-সন্ধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রান্ততায়
জীবন-সন্ধ্যায়
তন্দ্রালস নয়নের অশ্রুধারা দিয়া
বিদায়ের কবিতাটি লিখি আজ তোমায় স্মরিয়া।
নিরলস ব্যস্ততার মাঝে কভু হয় যদি ক্ষণ অবকাশ,
পড়িও আমার কবি-জীবনের শেষ ইতিহাস,—
ক্রন্দনের ছন্দে ভরা জীর্ণ এ সংহিতা,
বেদনার গীতা।

ম্রিয়মান
মৃত্যুমুখী প্রাণ
অসহন প্রতীক্ষার দীর্ঘ দণ্ড গণি'
দূরে ও নিকটে যেন শোনে শুধু তব পদধ্বনি!

মালঞ্চের ফুলগন্ধ মাঝে মাঝে সঙ্গিহীন ঘরে মোর আসে
ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, বসিলে কি রোগ শয্যা পাশে?
শুধাই বিশীর্ণ দু'টি ব্যগ্র বাহু মেলে,
এতদিনে এলে?

ভাঙ্গে ভুল,
হৃদয় আকুল,
আর্ত্ত আঁখি খুঁজে দেখে তুমি আস নাই;
অন্তরের শূন্যতলে হতাশার ব্যাকুল সানাই।—
সায়াহ্নের স্বর্ণলেখা বহুক্ষণ মুছে গেছে দিগন্ত কিনারে,
নিদ্রার স্বপন বহি' অন্ধকার নামে চারিধারে।
অন্তিম ঘনায় টানি' কৃষ্ণা যবনিকা,
কাঁপে ক্ষীণ-শিখা॥

(পূর্বানুবৃত্তি)
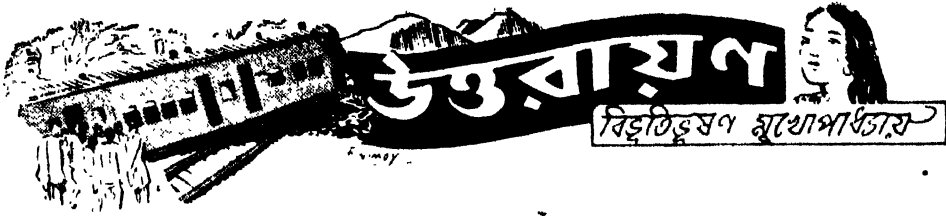
একটা সুবিধা হোল, কথা রইল অনেকখানি এগিয়ে, দুজনের মন আজ অনেকখানি কাছাকাছি এসে গেছে। এইবার, যে-কথাটি বলবার জন্য আটকে যাওয়া—সেটা কি করে বলবে তারই সুযোগ খুঁজতে-লাগল সুকুমার।

বাগানে বেড়ানোর মতো চা-পর্বও শেষ হোল বিলম্বিত লয়ে। আজ ওদের তাড়া নেই, শুধু পরস্পরকে পাওয়া, অবসরের চাদর বিছিয়ে দুজনে মুখোমুখি হয়ে ব'সে থাকা। যতই সময় যাচ্ছে কথা কওয়ার ভাগ আসছে কমে, এমন অবস্থায় সুকুমারই অনুযোগ ক'রে—"আজ যে বড় কথা কইছ কম সরমা?"···আজ কিছু করলে না, ওর সেই সময়টুকু আসছে এগিয়ে।

দূরে পাহাড়ের নীল তরঙ্গের ওপর একটি সোনালী রেখা টেনে দিয়ে সূর্য অস্ত গেল। সামনে ঝিলের গায়ে একটা রাঙা আভা এসে পড়েছে; ওপারে যে কাজ হচ্ছে তার কোলাহল আসছে কমে, যেটুকু আছে, একটা ক্লান্ত উদাস পুরবীর মতো আকাশের গায়ে আছে লেগে।··· বুধাই আর দুলা হৈ হৈ করতে করতে বাসায় এল, রাঙা-মাকে ডাকাডাকি করতে করতে। রুম্মা বললে—"তাঁরা নেই, দুজনে কলের দিকে বেড়াতে গেছেন।"···রুম্মা এই ধরণের দুষ্টামি করে মাঝে মাঝে দুজনকে নিয়ে, অবশ্য এই রকম আড়াল আর দূরত্বের সুযোগ পেলে।···সরমা লজ্জার জন্যই না বলে পারলে না—"দেখতো রুম্মার শয়তানিটা?···উঠবে?" সুকুমার প্রতিপ্রশ্নই করলে—"উঠবে তুমি?"

সরমা শরীরটি যেন একটু গুটিয়ে নিয়ে বললে—"হাওয়াটি এখানে বড় মিষ্টি···এস যদি হাসপাতালে যাও; এঁরা সব বোধহয় এসে গেছেন।"

সুকুমার বললে—"তার চেয়ে এইখানেই ভালো।··· ভিড়ের মধ্যে হারিয়েই যেতে হয়, নয় কি?"

সরমা শুধু একটু হাসলে।

এর পরে যে বিরতিটুকু এল, তাতে সন্ধ্যার ছায়া একটু গাঢ় হয়ে এল নেমে। রাত্রির যবনিকা নয়, সন্ধ্যার এই অর্ধ-অবগুণ্ঠন, এ-ই অবসর। সুকুমার বললে—"সরমা, আজ তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার আছে, আমি একটা অপরাধ করেছি···অনেকদিন থেকেই···"

সরমা যেন চমকে উঠল, বললে—"কি অপরাধ?··· ক্ষমার কথা কি হয়েছে?"

"আজ আর লুকুলে চলবে না বলেই বলছি—যখন তুমি টের পেলে আমি এসেছি হাসপাতাল থেকে, তার অনেক আগেই আমি এসেছি আজ: তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে।"

সরমা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে সুকুমারের পানে চেয়ে রইল, তাতে লজ্জা আর ভয়ের সঙ্গে আরও কিছু আছে মেশানো। তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে দৃষ্টি সহজ হয়ে এল, কি একটা যেন চেষ্টা করছে, বললে—"তা না হয় এসেছিলে, কি হয়েছে তাতে? জাগালেই পারতে।"

সুকুমার ঠিক ও-কথাটার উত্তর দিলে না, প্রশ্ন করলে —"তুমি কাঁদছিলে?"

সরমা একেবারে সোজা হয়ে গেল, বললে—"কাঁদব কেন?···কাঁদবার কি হয়েছে?···কাঁদতে কখন দেখলে তুমি···বাঃ!"

সুকুমার টেবিলের ওপর ডান হাতটা বিছিয়ে দিলে, বললে—"যদি দেখেই থাকি, সে-অপরাধের জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি না সরমা, এসেও যে গিয়েছিলাম তার জন্যেও নয়, কেননা দুটোই না জেনে করা। আমি ক্ষমা চাইছি, কাজের মধ্যে ডুবে তোমার ওপর যে অন্যায় করেছি তার জন্যে। কিন্তু আমিই বা কি করি বলো? আমার জীবনের একদিকটা ভোলবার জন্যেই আমায় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। তুমি এ-কথাটা বুঝবে, কেননা তোমার জীবনেরও এই ট্রাজেডি; কিন্তু উপায় কি?···আমি চাই অনেক কিছুই সরমা, তবে এমন কিছুই চাই না যাতে তোমার অকল্যাণ আছে। কিন্তু এখনও তোমার জীবনে

-অন্ধকারটুকু আটকে আছে, সেটুকু না গেলে কিসে তামার কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ—"

সরমা ঝিলের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল, আর পারলে না। দুহাতে মুখ ঢেকে, টেবিলে সুকুমারের হাতের ওপরই মাথাটা চেপে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল। তারই মধ্যে ভেঙে ভেঙে বলতে লাগল—

"আপনি পারবেন না—হাজার চেষ্টা করলেও পারবেন না।...আমার এ যে কী অন্ধকার, কী অভিশাপ, আপনি জানেন না।...উপায় নেই আমায় বাঁচাবার...আমায় ঘিরে ধরেছে...এত ভয়ে ভয়ে আমি কি করে থাকি টেঁকে?... আমায় নিয়ে আপনি নিজের জীবন কতখানি বিপন্ন করেছেন বুঝি না কি?...আরও কত বিপন্ন হবার সরঞ্জাম যে রয়েছে চারিদিকে!...আমায় ছেড়ে দিন, শুধু আদেশ না নিয়ে যেতে পারছি না বলেই আছি পড়ে, আপনি পায়ের ধুলো দিয়ে আমায় বিদায় করুন—যাবার অনেক পথ আছে। বিশ্বাস করুন, এ অন্ধকারের ভয় আর আমার সহ্য হচ্ছে না—সত্যি সহ্য হচ্ছে না আমার..."

সুকুমার বাঁ হাতটা সরমার মাথার ওপর তুলে দিলে, বললে—"চুপ করো সরমা। তোমায় আমি বিদায় দোব কেন? তাহলে আমার জীবনেই বা কি থাকবে আর বলো। ...তোমার জীবনে যে অন্ধকারটুকু আটকে আছে তাও একদিন কেটে যাবে, ক'মাসই বা আমরা এসেছি এখানে? ...যদি ধরো নাই কাটে, তোমার জীবনের ওদিকে কি আছে না-ই পারি জানতে, ক্ষতি কি? যেটুকু জানতে দিলেন ভগবান, আমার পক্ষে তাই তো যথেষ্ট।...তুমি ভয় কোরনা মোটেই, অন্ধকার যতই গাঢ় হোক, আমি তোমার পাশে আছি, থাকবও জেনো। চুপ করো সরমা; যে-ভুলটুকু হচ্ছিল, সেটুকুও হতে দোব না আর, তোমায় কথা দিচ্ছি।"

উনিশ

ওদিককার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। যতটা আন্দাজ করা গিয়েছিল তার চেয়ে একটু বেশি সময় লাগল, জ্যৈষ্ঠমাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাহলেও মৃন্ময় কাজ

মৃন্ময়ের হাতে আবার অবসর ফিরে এসেছে, সেই সঙ্গে সরমার জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলটা। কর্মের সাফল্যে মনে একটা উদারতা এনে দিয়েছে, ওর একটা প্রতিষ্ঠাও হয়ে গেছে এ জায়গায়, ঠিক করেছিল সরমার কথাটা বাদ দিয়েই চলবে এবার থেকে, কে জানে তার কৌতূহলী দৃষ্টির ওপর কার দৃষ্টি কখন্ যাবে পড়ে।...জায়গাটা ভালো, থাকতেই ইচ্ছা করছে এখানে।

কিন্তু আর সে-রকম যাচাই করার দৃষ্টিতে না চাইলেও, চিন্তার হাত থেকে একেবারে মুক্তি পাওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না। একটি মুখ, দেখা অথচ কোথায় দেখা মনে পড়ছে না, এতে এমনি একটা অস্বস্তি জাগায়, আর এ তো হাজারে একটা বিশিষ্ট মুখ, প্রতিদিনের পরিচয়ে মনের ওপর ছাপটা গভীরতম হয়ে উঠছে, ঠেলে রাখবার চেষ্টা করলে আরও বেশি করে মনটা অধিকার করেই বসে।

এর ওপর একদিন নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা ব্যাপার হয়ে গেল।

সেদিন ব্রাহ্মদের কি একটা ছোট উৎসব ছিল, হয়তো কারুর জন্মতিথি; সেইটিকে বেশ বড় করে তুলে সন্ধ্যার পর মাস্টারমশাইয়ের বাসায় একটা অনুষ্ঠান ছিল—সমবেত প্রার্থনা, আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সংগীত, তারপর প্রীতিভোজ। এখানে ব্রাহ্ম বলতে দুটি পরিবার, মাস্টার-মশাই আর সুকুমার—সরমা, সেই জন্যে সরমার ওপর অনুষ্ঠানের, বিশেষ করে গানে তালিম দেওয়ার ঝোঁকটা পড়েছিল বেশি। চমৎকার হয়েছিল। তার সাফল্যের একটা আনন্দ আছে, তার ওপর ওই থেকেই বীরেন্দ্র সিঙের মাথায় একটা নূতন আইডিয়া এসে পড়েছে; হাইড্রো-ইলেকট্রিকের কাজ চালু হয়ে গেছে, আর উপায় নেই; কাপড়ের কল উঠতে এখনও অনেক দেরি, ঠিক হোল তার শুভ উদ্বোধনটা এই রকম একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে করতে হবে, শুধু এর চেয়ে ঢের বড়, সমস্ত লখমিনিয়ার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে। কি কি হবে তা এখনও ঠিক হয় নি, অনুষ্ঠানের শেষে আলোচনাটা যখন আরম্ভ হোল তখন এদিকে আবার টের পাওয়া গেল, আকাশে হঠাৎ কখন্ মেঘ জমে উঠেছে। বাসায় ফেরবার একটা তাড়া পড়ে

নাট্যাভিনয়। মোটরে ওঠবার সময় বীরেন্দ্র সিং বলে গেলেন—"বিঠিয়া, তুমি কাল থেকেই লেগে যাবে। অবশ্য সময় আছে যথেষ্ট, কিন্তু লখমিনিয়ার মতন জায়গায় একটা ভাল্লো জিনিস দাঁড় করাতে চারটে মাস আবার খুব বেশিও নয়—যা আমরা আন্দাজ করছি।"

সরমার মনটা বেশ উৎফুল্ল, আজকের সাফল্যের যশটা তারই বেশি প্রাপ্য বলে মনের ভাবটাকে সাধ্যমত চেপে রাখবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু সেটা ক্রমাগতই প্রকাশের পথ খুঁজছে।···ওরা বেরুলো তিনজনেই, একদিকেরই পথ, ওরা দুজন আর মৃন্ময়। যেখানে পথটা আলাদা হয়ে মৃন্ময়ের বাসার দিকে চলে গেছে সরমা দাঁড়িয়ে পড়ে বললে—"আপনিও আমাদের ওখানেই চলুন না মিস্টার চৌধুরী, কি আর এমন রাত হয়েছে?"

সুকুমারের দিকে চেয়ে বললে—"কি গো?"

সুকুমারও একটু জোর দিয়েই অনুরোধ করলে; ওরও চেষ্টা থাকে—কি করে এই আনন্দের মুহূর্ত্তগুলি রাখে বাড়িয়ে, কেননা সেদিনকার ঘটনার পর থেকে ও আগেকার চেয়ে একটু চিন্তাকুলই থাকে বেশি, বললে—"হ্যা, আসুন না, আজকের আসরটা যেন হঠাৎ গেল ভেঙে—কেমন দিব্যি জমে উঠেছিল। আসুন, যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে, আপনাকে তো আরও একলা চুপচাপ করে বসে থাকতে হবে।"

মৃন্ময় আজ আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল মাঝে মাঝে। "যদি জোরে বৃষ্টি নামে, বেশি রাত পর্য্যন্ত···" বলে কাটিয়ে দিতে যাচ্ছিল, ঝিরঝির করে আরম্ভই হয়ে গেল বৃষ্টি। তিনজনকে একটু একটু করে ছুটেই চলে আসতে হোল বাসায়।

বারান্দায় উঠে সরমা বললে—"ভাগ্যিস বৃষ্টিটা এলো!"

সুকুমার মৃন্ময়ের দিকে চেয়ে হেসে বললে—"সরমা ছোটবার লজ্জাটা এইভাবে চাপা দেবার চেষ্টা করছে মিষ্টার চৌধুরী।"

সরমা আজ রহস্যপ্রবণাও হয়ে উঠেছে; লজ্জার অভাব নয়, তবে সঙ্কোচটা যেন একেবারেই গেছে চলে। "বাঃ, পালাবো তার আবার লজ্জা!"—বলে এমন গাম্ভীর্যের ভাব করলে যে ওরা দুজনে হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর সুকুমারকে বললে—"তুমি লোকসানটাই দেখ, লাভের দিকে চোখ পড়ে না; বৃষ্টি না নামলে উনি আসতেন?···তুমি একখানা বই মুখে করে একধারে বসে থাকতে, আমি বোধহয় খানিকটা ক্রচেট সুতো নিয়ে অন্য ধারে···"

মৃন্ময়ের মুখের পানে চেয়ে থেমে যেতে মৃন্ময় হেসে বললে—"শেষ করুন না; আমি একরকম আইবুড়ো মানুষ, সবই বিশ্বাস করবো, হোক্‌গে না বাদুলে রাত।"

সুকুমার হো হো করে হেসে উঠল। যাওয়া-আসায়, আহার-আলাপনে অন্তরঙ্গতা বাড়লেও এ ধরণের রসিকতা মৃন্ময় বোধ হয় এই প্রথম করলে। সরমা অন্যদিন হোলে নিশ্চয় একেবারে আপনার মধ্যে গুটিয়ে যেত, আজ কিন্তু বেশ সহজভাবেই উত্তরও দিলে—"আইবুড়োদের কল্পনাই সম্বল তো?—সুতরাং বিশ্বাসে আর বাধা কি?—নিজের মনে যা ভেবেছেন তাই সত্যি তাঁদের কাছে।"

সুকুমার প্রচণ্ডবেগে হেসে উঠল এবার, মৃন্ময়ও মুক্তকণ্ঠে যোগ দিলে। সরমা রুম্মাকে ডাক দিলে। এই প্রসঙ্গটা শেষ করে দেবার জন্যেই ডাকা, এসে দাঁড়ালে—কিন্তু কি বলবে হাতড়াতে লাগলো, তারপর ওর মুখের গম্ভীর ভাব দেখে তার মাথায় আবার একটা রহস্যের আইডিয়া এসে গেল, বললে—"একি, তুই টের পেয়ে গেছিস নাকি?"

রুম্মা একটু মূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলে—"কি টের পেয়ে যাবো?"

মুখটা তোলো-পানা করে রয়েছিস বলে মনে করলাম পেয়েছিস বুঝি—"পাস নি তা হলে; কল খোলবার যে উৎসবটা হবে তাতে সাঁওতালী ডান্সের ব্যবস্থা হচ্ছে, বুবুয়া বলেছেন।···না গা?"

সুকুমারকে সাক্ষী মানলে, সে গম্ভীরভাবে দৃষ্টি নিচু করে বললে—"বললেন তো।"

রুম্মার বুঝতে দেরি হয় না, উত্তর করলে—"বেশ তো, তাতে আমার কি?"

"তুই ও নাচবি।"

"আমি তো বাঙালী—দেখব, নাচের জন্যে জাত খোয়াতে যাব নাকি?"

তিনজনেই হেসে উঠল। সরমা তারই মধ্যে বললে—"জাতে আর পুরোপুরি কই উঠতে পেরেছিস যে খোয়াবি?

রাত্তিরে ঝংড়ু সর্দারের কাছে তো আবার যে সাঁওতাল সেই সাঁওতালই হ'য়ে থাকিস তুই।"

"তার কাছেই নাচব তবে।"

এবারে সবাই আরও উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, শুধু রুম্মা ছাড়া, সে রাগের ভান করেই ফিরে যেতে যেতে বললে —"একটা কাজ করছিলাম, মিছি মিছি ডেকে শুধু বাজে কথা!"

সরমা বললে—"না শুনলে সব কথাই তোর বাজে কথা হয়ে যাবে; একটু চা কর, করবি?"

মৃন্ময় বললে—"চা তো এইমাত্র খেয়ে এলাম মাস্টার-মশাইয়ের ওখানে।"

রুম্মা টিপ্পনী কাটলে—"ঐ নাও, বাজে কথা নয় যেন!"

সরমা মৃন্ময়ের দিকে চেয়ে বললে—"বেশ তো! আমি ভালোমানুষী করে চা করতে বললাম আপনার জন্যে, আপনি আমার শত্রুর দিকে হয়ে গেলেন!···সে-চায়ের পর তো বর্ষা নেমেছে।"

মৃন্ময় রুম্মার দিকে চেয়ে বললে—"তা হলে করোগে। আজকের রাত্রির হিরোইন্ সরমা দেবী, ওঁর অবাধ্য হওয়া চলবে না।"

রুম্মা যাবার জন্যে আবার ঘুরতে সরমা বললে—"আর শোন্, আমার চায়ে চিনি একেবারে কম দিবি।"

"কেন? তুমি তো বরং একটু বেশিই খাও।"

"এক গাদা প্রশংসার সঙ্গে খেতে হবে যে!"

আবার একটা হাসি উঠল, তারপরে সরমা বললে—"না, সত্যিই বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে। ব'সে ব'সে গুণগান শুনলেও আমার চলবে না মৃন্ময়বাবু, বুবুয়া যা বোঝাটা চাপিয়েছেন। আমাদের আশ্রমের দিক থেকে প্রোগ্রামটা কি রকম হবে একটা ঠিক করে ফেলি আসুন।"

এরপর সেই আলোচনাই চলল। রুম্মা যতক্ষণে চা তোয়ের ক'রে নিয়ে এল—ততক্ষণে আর সব একরকম ঠিক হয়ে গেছে, একটু বাধা পড়েছে নাটক নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের দিকেই ঝোঁক তিনজনের, কিন্তু সে তো আর সবার জন্য নয়, এখানকার কটা লোকেই বা বুঝবে?

অনেক জল্পনা-কল্পনার পর ঠিক হোল, নাটক হবে দুটো—একটি নটীর পূজা, আর কোন হিন্দী নাটক। মৃন্ময় এলাহাবাদের ছেলে, হিন্দী বেশ ভালো জানে, সেই বেছে ঠিক করবে। করবে আশ্রমের ছেলেমেয়েরাই, কিছু যাবে মৃন্ময়ের দিকে, কিছু সরমার দিকে।

সুকুমার বললে—"ভালোই হোল, দুজনের রেষারেষিতে জিনিষ দুটো ভালো দাঁড়াবে মাঝখান থেকে।"

সরমা বিস্ময়ের অভিনয় করে বললে—"রেষারেষি!—উনি ইন্‌জিনিয়ার, হাতুড়ী বাটালি নিয়ে ওঁর কাজ, ওঁর সঙ্গেও অভিনয়ের মতো সূক্ষ্ম জিনিষ নিয়ে যদি রেষারেষি করতে হয়···"

মৃন্ময় বললে—"দেখাই যাবে 'কামাল কিয়া', 'কামাল কিয়া' বলে কত হাততালি কার দিকে পড়ে!"

সরমা উত্তর করলে—"হাততালি দেওয়ার মত জঞ্জাল আপনার দিকে ঠেলে দেবার জন্যেই তো এই ব্যবস্থা।"

হাসি গড়িয়েই চলেছে। মৃন্ময় বললে—"না সরমা দেবী, মাফ করবেন, আপনাকে চটালে আমার উদ্ধার নেই।"

সরমা সন্দিগ্ধভাবে একটু আড়ে চেয়ে বললে—"হঠাৎ এত বেশি নরম হয়ে গেলেন?

"উগ্র দেখলেনই বা আমায় কখন?"

"তবু···?"

"তালি যে আমার একচেটে হবে সেইটেই আমার ভয়। আমার বিশ্বাস আপনার তালিম দেওয়া নাচ গোটাকতক থাকলে মাঝে মাঝে তাদের উৎকট তালির তাল কেটে যেতে পারে। নয়তো আর কিছু না হোক, ওরকম একটা রন্ধ্রহীন শব্দের ব্যূহ ভেদ করে আমার নাটক এগুবে কি কোরে?—মাঝে মাঝেও একটু ফাঁক চাই তো?"

আবার প্রশংসা এসে পড়ছে। সরমা সেটাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যই একটু হেসে বললে—"তা এত বড় উপকার যে করবো আমার পুরস্কার?"

একটি যে চমৎকার দিন এসেছিল—মনে হচ্ছিলো আর ফুরুবে না—এইখানে এসে সেটা একেবারেই গেল শেষ হয়ে হঠাৎ।

মৃন্ময় বললে—"আমি ভার নিচ্ছি আপনার স্টেজের—শুধু স্টেজ নয়—ড্রেসিং, পেন্টিং, সবকিছুই···অবশ্য সত্যিই মনে করবেন না যেন নাচ শেখাবার বদলে এটা। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে—মিলের কাজেই

কোলকাতা যাচ্ছি, ড্রেসার, পেন্টার, ডেকরেটার সব ব্যবস্থা করে আসব।"

—ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সেই আলোই যেন ঠিকরে এসে পড়লো সরমার মুখে, বললে—"সত্যি নাকি? বড় চমৎকার হয় তাহলে।... শুনলে গা?—উনি কোলকাতা যাচ্ছেন—ড্রেসার, পেন্টার, ডেকরেটার সব ব্যবস্থা করে আসবেন।...কবে যাচ্ছেন?"

"বোধ হয় সপ্তাহখানেকের মধ্যেই যেতে হবে।"

তারপর কোন রকম উপকার করতে পারার লোভেই, নিতান্ত সহজভাবে বললে—"আপনাদের নিজেদের কোন কাজ-টাজ থাকে তো তাও বলুন না—কিম্বা বাড়িতে কিছু খবর-টবর দেওয়ার থাকে তো—কারুর সঙ্গে দেখা করবার...কি ঠিকানাটা আপনাদের?"

সমস্তদিনের সঞ্চিত দীপ্তিটা একমুহূর্ত্তেই মিলিয়ে গেল মুখে। কতকটা সামলালে সুকুমার, বললে—"থার্‌টিন্ বাই ওয়ান বি কিরণ হালদার লেন, কালীঘাট।...যদি যান তো বড় ভালই হয়, অনেকদিন চিঠি পান নি কোন।"

সামলালে, কিন্তু সে উত্তর দিয়েছে বলেই তার দিকে চেয়ে মৃন্ময় দেখলে, ঠিক এতটা না হোলেও, তার মুখও বেশ নিষ্প্রভই।

সময় পেয়ে সরমাও একটু সামলাবার চেষ্টা করলে, বললে—"কিন্তু যা জায়গা, পারবেন কি খুঁজে নিতে উনি? মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া।"

আসলে সামলালে আকাশের দেবতা। তাদের মিনিট দু'তিন অস্বস্তিতে কাটাবার পর বৃষ্টিটা গেল থেমে, যেমন আচমকা এসেছিল, মৃন্ময় বললে—"আর দেরি করা নয় সুকুমারবাবু সরমা দেবী, আমি, বেশ কাটলো খানিকটা।"

তিনজনেই উঠে পড়লো। সুকুমার বললে—"হ্যাঁ, যেমন মনে হচ্ছে, এরপরে বোধ হয় আরও জোরে নামবে।"

কথাবার্ত্তা খুব কম হোল দুজনের মধ্যে। একবার সুকুমার শুধু সহজভাবে বলবার চেষ্টা ক'রে বললে—"নম্বরটা যা বললাম ওঁকে মনে করে রেখো।"

সরমা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলে—"কিন্তু এরকম করে কতদিন চলবে?" (ক্রমশঃ)

ভারতের দক্ষিণে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সত্য কথা বলতে কি রামেশ্বরের আহার পর্ব্বটা সকলের মনঃপূত হয়নি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই খানা এসে গেল—চিকেনকারীর রূপ অবর্ণনীয়, কী সোণালী রঙ—কিন্তু সে কারী মুখে দিয়ে চোখের জল সংবরণ করা দুরূহ হয়ে উঠল। সেই দিগন্তব্যাপী লঙ্কার ক্ষোভের দৃশ্য মনশ্চক্ষে ফুটে উঠ্‌ল কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে সে কারীও পড়ে রইল না। বোঝা গেল ক্ষুধার আগুনে সবই সহনীয়।

ট্রেণের বেগ মন্দ নয়—ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ মাইল। এইভাবে ত্রিচিনপল্লী যেতে রাত সাড়ে আটটা বাজবে। বিকালবেলা একটা ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌ল—নাম চিদাম্বরম্। ষ্টেশনের প্লাটফরমের গায়েই একটা সুন্দর বাড়ী। আমরা কয়েকজন বলাবলি করছি যে—এ বাড়িটা কার? রেলের যে নয় তা এর আকৃতি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান, তবে এটা যে রেলের সংশ্লিষ্ট তাতেও কোনও সন্দেহ নেই—তা না হলে প্লাটফরমের গায়ে এ ভাবে বাড়ী হয় কি করে? আমরা বাড়িটার ভিতর প্রবেশ করব—কি করব না, এই রকম একটা ভাব প্রকাশ করছি এমন সময় এক ভদ্রলোক—বেশ লম্বা, সুদৃশ্য—আমাদের ডেকে বললেন—আপনারা স্বচ্ছন্দে বাড়িটা দেখে আসুন; কোনো চিন্তা করবেন না। আপনাদের ফেলে ট্রেণ চলে যাবে না। তাঁর কথামতো আশ্বস্ত হ'য়ে বাড়িটা পরিদর্শন করা হল—বাড়িটা সুন্দরভাবে সাজান। দুধারে দুটো শোবার ঘর; বেশ বড় মাপের সঙ্গে বাথরুম ও ড্রেসিংরুম। মধ্যে বসবার ঘর এবং পাশে ডাইনিংরুম। সামনে ও পাশে চওড়া বারান্দা। মেঝে ও দেয়াল—মার্বেল মোড়া। বাথরুমে অতি উচ্চ শ্রেণীর আধুনিক সজ্জা। শোবার ঘরের আসবাবপত্রও খুব উন্নত ধরণের এবং মহার্ঘ্য। এ বাড়িটা স্থানীয় রাজার দান—বিশিষ্ট অতিথিদের বাসভবন এবং বাড়িটা দেখবার জন্য যিনি আমাদের আহ্বান করেছিলেন—তিনিই এখানকার রাজা। বাড়িটা তাঁর সুরুচির পরিচায়ক।

যথাসময়ে ত্রিচিনপল্লী ষ্টেশনে পৌছান গেল—রাত সাড়ে আটটায়। বিরাট ষ্টেশন—ইলেকট্রিক আলোকে উদ্ভাসিত। নানাপ্রকারের নির্দেশ পত্রে গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ চিত্রিত। লাউড্‌স্পীকার সাহায্যে যাত্রীদের বিভিন্ন ট্রেণের গতিবিধি সম্বন্ধে সচকিত করে দেওয়া হচ্ছে

…ভাষায় সাহায্যে—ইংরাজী, হিন্দিও স্থানীয়। পূর্ব্বাহ্নে রিটায়ারিং … র জন্ত আবেদন করা হয়েছিল। খবর নিয়ে দেখা গেল—আমাদের দুটী ঘর রাখা আছে। বেশ বড় ঘর—সামনে চওড়া বারান্দা, পিছনে …ওড়া বারান্দা ও বাথরুম—দেশী ও বিলাতি দু'রকমের ব্যবস্থাই …।

স্নান সমাপন করে—ষ্টেশনের খানা-ঘরে নৈশ ভোজন সমাপন করা …। ষ্টেশনের খানা-ঘরটী দু'তলায়—অনেকটা আসানসোল ষ্টেশনের …-ঘরের অনুরূপ।

ত্রিচিনপল্লী সহরটীর একটা ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে, তা ছাড়া এই …টী দক্ষিণ ভারত রেলপথের প্রধান আস্তানা ও কর্ম্মশালা। কর্ম্মশালাটী …ট এবং সারা ভারতে খ্যাতিসম্পন্ন। ত্রিচিনপল্লীর স্থানীয় নাম তিরি-…ল্লী। কথাটা ত্রিশূরপল্লী কি ত্রিচূড়পল্লী বলা শক্ত। এ বিষয়ে …ক মাথা না ঘামিয়ে একটী কর্ম্মসূচী স্থির করা হল—সকালে তাঞ্জোর …রঙ্গম দর্শন। প্রাতঃস্নান ও ভোজন শেষ করে ষ্টেশনের হাতাতেই …নি ট্যাক্সি—দরদস্তুর করে ঠিক করা গেল। তাঞ্জোরের দূরত্ব মাত্র

তাঞ্জোর মন্দির

মাইল—রেলেও যাওয়া যায় কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ। পথ মন্দ নয়। …রে প্রচুর তেতুল গাছ ও কলা বাগান। পথে যেতে যেতে মাঠের … সারি সারি লোহার চৌকোনা কাঠাম দেখা গেল—বিদ্যুতের তার … করে দাঁড়িয়ে আছে—মাদ্রাজের সহর ও গ্রামে জল উৎপাদিত …ত সরবরাহের জন্য। বার কয়েক রেল লাইন পার হ'য়ে তাঞ্জোর …গান গেল। মাদ্রাজ প্রদেশে মাদক নিবারণ আইনের ফলে আমাদের …র চালক, লক্ষ্য করা গেল—পথে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঘন ঘন আস্তানা …কায় করে নিজেকে সুস্থ বা অসুস্থ করে নিচ্ছিল। চালকের পাশে থাকার ফলে লক্ষ্য করলাম যে তার পানীয়ের গন্ধ একটু বিশিষ্ট …রের। মাদক নিবারণ আইনের প্রহসন হিসাবে ব্যাপারটা মন্দ নয়। …ক দেখানো বাহাদুরী, আর সত্যকার উন্নতির প্রচেষ্টায় তফাৎ এমনি …ই বোঝা যায়।

তাঞ্জোর মন্দিরের চূড়া বহুদূর হতে দেখা যায়। সহরের প্রবেশ মুখে একটী খালের উপর সেতু অতিক্রম করে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়ান হল। সহরের এ অংশটী পুরাতন—পথ ধূলিময় ও অপরিসর। অথচ শোনা ছিল—তাঞ্জোর দক্ষিণ ভারতের উদ্যান নগরী। ঠিক এই ধারণার উপযুক্ত কোনো নিদর্শন পাওয়া গেল না। তা না পাওয়া যাক—তাঞ্জোরের মন্দির দেখে বেশ তৃপ্ত হওয়া গেল। মন্দিরের আকৃতি দ্রাবিড়ীয় অন্যান্য মন্দির হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঞ্জোরের গোপুরমের উচ্চতা মাত্র ৯০ ফুট এবং মন্দিরের উচ্চতা ২১৬ ফুট, মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই প্রথমে নজরে এল—এক বিরাট নন্দী মূর্ত্তি (বৃষমূর্ত্তি), বৃষটার উচ্চতা ১২ ফুট এবং লম্বা ১৬ ফুট। একটী কালো পাথর কেটে নির্ম্মিত হয়েছে। প্রত্যহ তৈল মর্দ্দনের ফলে পাথরের গাত্র অত্যন্ত মসৃণ—সহসা ব্রোঞ্জ বলে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।

মন্দিরের বিমান ও মণ্ডপ বিচিত্রভাবে অলঙ্কারিত। মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য্য নিদর্শনে—কাঠের খোদাইয়ের লালিত্য ও সূক্ষ্মতা বর্ত্তমান। মন্দির
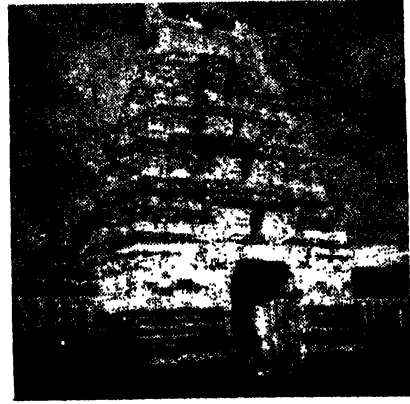
শ্রীরঙ্গমের গোপুরম

প্রাঙ্গণের উত্তর পশ্চিম কোণে সুব্রহ্মণ্য কার্ত্তিকেয়র মন্দির—ছোট হলেও সুন্দর। প্রত্যেকটী স্তম্ভের অলঙ্কার নিখুঁতভাবে খোদিত।

মন্দির প্রাঙ্গণে দেবী দুর্গার একটী মণ্ডপ আছে, তবে প্রধান মন্দিরের দেবতা—বৃহৎ ঈশ্বর শিবলিঙ্গ। বৃহদীশ্বর শিব যে বৃহৎ সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। শিবের মাথায় জল ঢালতে হলে দু'তলা প্রমাণ সিঁড়িতে উঠতে হয়। যথারীতি স্বল্প ব্যয়ে পূজা সমাপন করে—তাঞ্জোর দুর্গ পরিদর্শনে অগ্রসর হওয়া গেল।

তাঞ্জোর দুর্গটী মন্দিরের কাছেই—সেকালে প্রাসাদ ও দুর্গ একত্রে অবস্থিত—বিরাট চত্বর—কিছু অংশ ভেঙে গেছে। ইটের তৈরী বাড়ী ঘর। যে অংশ এখন ও দাঁড়িয়ে আছে সে অংশে সরকারী নানাপ্রকারের আপিস, স্কুল ও গুদাম। প্রাসাদের মধ্যে একটী অংশ "মহারাষ্ট্র দরবার।" কাঠের স্তম্ভ ও ছাদ। দেয়ালে কয়েকটী পুরোনো ছবি আছে। শিল্প হিসাবে সেগুলি খুব উচ্চ শ্রেণীর না হলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

সরকারী কৃষিবিভাগের দপ্তরের পাশে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের একটী ফলক দেখে তার মধ্যে প্রবেশ করা গেল, কিন্তু সেখানে একটী পিওন ছাড়া

আর কোনো কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। সুতরাং ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসায় ক্ষান্ত হ'য়ে, আমরা বাজারে প্রবেশ করলাম স্থানীয় শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করার জন্য। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর মনের মতো কিছু না পেয়ে এবং খরচ বেঁচে যাওয়ায় উৎফুল্ল চিত্তে প্রত্যাবর্তন করা গেল—শ্রীরঙ্গমের দিকে।

শ্রীরঙ্গম মন্দিরের অবস্থান একটী দ্বীপের মধ্যে। দ্বীপটী কাবেরী ও কলেরুণ নদীর সঙ্গম স্থলে—দৈর্ঘ্যে ১৭ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় দুই মাইল। ত্রিচিনপল্লীর প্রান্ত থেকে দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। নদীর ওপর রেল ও রাস্তার কয়েকটা সেতু ত্রিচিনপল্লী ও শ্রীরঙ্গমের মধ্যে চলাচলের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

শ্রীরঙ্গম সহরটী ছোট হলেও সুন্দর—আর মন্দিরটী বিরাট। দক্ষিণে প্রথমে একটী গোপুরমের পাদপীঠ—অসমাপ্ত বলে মনে হয়। সমাপ্ত হ'লে এই গোপুরমটী যে দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ গোপুরমের স্থান অধিকার করত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গোপুরমের পাদপীঠের মাপ, উচ্চতায় ৪৮ ফুট—১০০ ফুট গভীর। মধ্যের খিলানটী একখানা পাথরে তৈরী—২৯ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা, ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া এবং ৮ ফুট পুরু। ধারের পাথরের স্তম্ভগুলি ৪০ ফুট উঁচু; গ্রানাইট পাথরের তৈরী এই পাদপীঠের উপর যদি যথারীতি গোপুরমটী নির্ম্মিত হত—তাহ'লে তার উচ্চতা হত—৩০০ ফুট।

প্রথম তোরণটী পার হলেই—বাজার ও দোকান। পাওয়া যায় না এমন জিনিষ নেই। কাপড়-চোপড়, খেলনা, বাসন, শিল নোড়া, হোটেল, চুল ছাঁটার দোকান, দরজির দোকান। শচারেক ফুট পরে আর একটী তোরণ, চারপাশে প্রায় ২০ ফুট উঁচু প্রাচীর। এই ভাবে চারটী তোরণ পার হয়ে এলে তবে মন্দির।

মন্দিরের প্রভু রঘুনাথস্বামী। আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করলাম তখন বেলা তিনটা—প্রভুর বিশ্রামের সময়, মন্দিরের দরজা বন্ধ। উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেবতা দর্শন করা গেল না। তখন পাণ্ডার শরণাগত হলাম। তিনি বল্লেন—প্রভুর একটী প্রতিমূর্ত্তির শোভাযাত্রা বেলা তিনটায়—তার পরেই আমাদের দর্শনের ব্যবস্থা হবে। এই সময়টুকু আমরা মন্দিরের চারপাশের দ্রষ্টব্য নাটমন্দির প্রভৃতি ঘুরে দেখতে লাগলাম। 'মন্দিরের পুবদিকে একটী সহস্র স্তম্ভ দালান আছে, আজ তার ভগ্ন অবস্থা—গোশালায় পরিণত হয়েছে। দুর্গন্ধে সেখানে অবস্থান করাও দুরূহ। দেখে আশ্চর্য্য হলাম—যে এই অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টিগুলিকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা নেই। বর্ত্তমানে যে রকম অনাদৃত অবস্থায় এগুলি আছে—আর কিছুদিন এভাবে থাকলে—এগুলির আর চিহ্ন পাওয়া যাবে না।

বাইরের প্রাকার পরিদর্শন শেষ করে আবার মন্দিরে প্রবেশ করা গেল। রঘুনাথস্বামীর মন্দিরটী ছোট। মন্দিরের গম্বুজটী সোনার গিল্টি করা। মন্দিরের সামনে পিতলের দুটী দীপ স্তম্ভ আছে—প্রকাণ্ড। দাতার নাম বড় বড় অক্ষরে খোদিত। দীপস্তম্ভ দুটীর মধ্যে একটী প্রতিযোগীতা ছিল তা এদের আকার থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। দেবতার স্থানেও মানুষের অহংকারের প্রকাশ—বড় দৃপ্ত বলে মনে হল।

রঘুনাথস্বামী—বৈষ্ণব ভক্তদের উপাস্য—মূর্ত্তিটী ছোট কিন্তু সুন্দর। খুব কাছে গিয়ে দেবতা দর্শন হল। পূজারী মানুষটী বড় ভাল। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আমাদের দেয় পূজা দেবতাকে নিবেদন করলেন।

মন্দিরের কাছাকাছি অনেকগুলি মণ্ডপ—আকারে সেগুলি রঘুনাথ-স্বামীর মন্দির থেকে বড়। সে সব মণ্ডপের স্তম্ভগুলিও বেশ কারুকার্য্যময়। কিছুটা সময় এই মণ্ডপগুলি পরিদর্শন করে, আমরা জম্বুকেশ্বরের মন্দির দেখতে গেলাম।
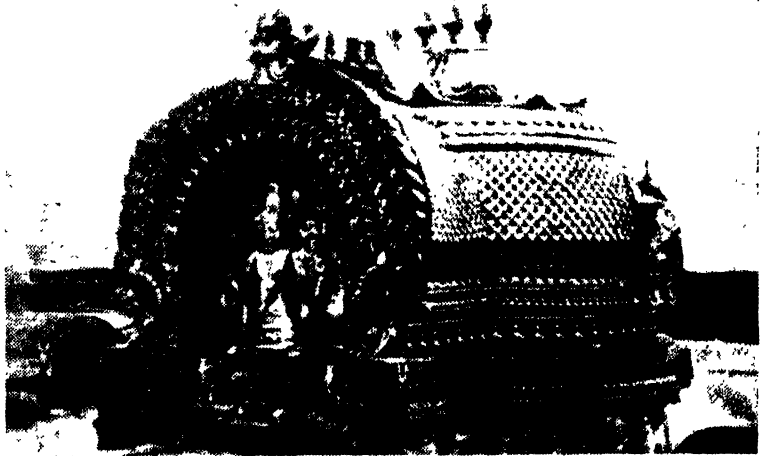
শ্রীরঙ্গমে সোনালী গম্বুজ

জম্বুকেশ্বরের মন্দির শ্রীরঙ্গম থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে। আয়তনে ছোট হলেও সৌন্দর্য্যে এ মন্দিরটী শ্রীরঙ্গমের মন্দির থেকে কোনো অংশে ন্যূন নয়। মন্দিরটী এক সময়ে ভেঙে পড়েছিল, এখন তার মেরামতি কাজ চলেছে। জম্বুকেশ্বর—শিবলিঙ্গ। একটী খুব পুরানো জাম গাছ আছে—তারই নাম থেকে দেবতার নাম।

শ্রীরঙ্গমের তুলনায় সমারোহ অত্যন্ত কম—যেন কোনও রকমে দিন চলে যায়। মন্দিরের মধ্যে টেপ্পাকুলম বা পুষ্করিণী। তার তীরে মণ্ডপ

ভীড় না থাকাতে, অল্প সময়ে স্বচ্ছন্দে মন্দির পরিদর্শন শেষ করে এরা চললাম—"রকটেম্পল" উদ্দেশ্যে। নামেই প্রকাশ মন্দিরটী পাহাড়ের চূড়ায়। দক্ষিণ ভারতে ইংরাজী ভাষার প্রচলন বেশী থাকায়—"রকটেম্পল" কথাটাই প্রচলিত। মন্দিরে উঠবার প্রবেশদ্বার সহরের বাজারের মধ্যে। সন্ধান পেতে হ'লে জিজ্ঞাসা করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রবেশ পথের দুধারে কাপড়, বাসন ও উপকরণাদির দোকান। কটা অগ্রসর হলেই উপরে যাবার সিঁড়ি—বেশ প্রশস্ত কিন্তু ধাপগুলি খুব উঁচু। শতাধিক ফুট সোজা উঠে মোড় ফিরেছে। সোপানাবলি ঢাকা—মধ্যে মধ্যে আলোকিত করার জন্য ফোকর আছে। সিঁড়ির সংখ্যা তিনশ'র ও বেশী—এক সঙ্গে অতিক্রম করা কষ্টকর।

সারাদিন ঘুরে বেড়াবার পর এতগুলি ধাপ অতিক্রম করা প্রায় স্বর্গে যাওয়ার মতো। কিন্তু ওপরে উঠে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে এ পরিশ্রম সার্থক মনে হয়। কাবেরী নদী অর্দ্ধচক্রাকারে চলেছে—দূরে শ্রীরঙ্গমের

রক মন্দির—ত্রিচিনপল্লী

মন্দিরের চূড়া—দুটী কালো রেখার ওপর দিয়ে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গাড়ী খেলার গাড়ীর মতো চলেছে। পাহাড়ের খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, শেষ পঞ্চাশ ফুট ওপরে "গণপতির" মন্দিরে ওঠা গেল। মূর্ত্তিটী বেশ বড়। সর্ব্বাঙ্গ রূপার খোলসে ঢাকা। আমরা যখন দর্শন করছি তখন দেবতার এই রৌপ্যময় আবরণ উন্মোচনের সময়। ফলে তাঁর প্রস্তরমূর্ত্তিও আমাদের নয়নগোচর হল।

গণপতির মন্দিরটী পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায়। মন্দিরটী বড় নয় কিন্তু ব্যবস্থা বেশ ভাল। মন্দিরের চারধারে বেশ চওড়া বারান্দা। এখান থেকে সহরের দৃশ্য অতি পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। কয়েকটী গির্জ্জার চূড়া নজরে পড়ল। মাদ্রাজ প্রদেশে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচার এই গির্জ্জার সংখ্যা

বিলম্ব না করে আমরা নেমে এলাম—পথের দু'ধারে সুসজ্জিত বিপনী শ্রেণী—ফ্লুরোসেণ্ট আলোয় ঝলমল করছে—কিনি বা না কিনি অন্তত দর না করে চলে আসাটা অন্যায় ভেবে কিছুটা সময় দোকানে দোকানে অতিবাহিত করা হল। কিছু দ্রব্য যে সংগ্রহ না হল এমন নয়, কিন্তু তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়।

ষ্টেশনে যখন ফেরা হল তখন রাত ৮টা। ৯-১৫ মিঃ মাদ্রাজের ট্রেণ—ইণ্ডোসিলোন একস্‌প্রেস্। এখান থেকে একটী গাড়ী জুড়ে দেওয়া হয়। আগে থেকে বলে রাখার ফলে আমাদের ছজনের স্থান সে গাড়ীতে হল। বাকী কজনের অন্য কামরায় ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এখানে বলে রাখা ভাল—যে ত্রিচিনপল্লী ষ্টেশনের ব্যবস্থা ভারী সুন্দর। অনুসন্ধান আপিসে মহিলারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সকল রকম প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। ষ্টেশনের প্লাটফরমে টিকেট কালেকটার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যাত্রীদের সাহায্য করার জন্য উন্মুখ—আমাদের এখানে হাওড়া বা শিয়ালদায় ঠিক এই ধরণের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি বলে মনে হয় না।

ইণ্ডোসিলোন এক্সপ্রেস্—এই লাইনের প্রধান গাড়ী। সুতরাং তাতে যাত্রী সংখ্যা খুবই বেশী, কিন্তু তবুও অল্প সময়ের নোটিশে সেই গাড়ীতে স্থান পাওয়ায়—রেল কর্ম্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অহেতুক বলে মনে করি না।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের গাড়ীগুলি সত্যই ভাল। বেশ গুছিয়ে বিছানা পাতা গেল—ট্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রা। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন দেখি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে একটী ষ্টেশনে—চেহারাটা চেনা চেনা। ফলকে ষ্টেশনের নাম লেখা চিঙ্গলপুট। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই মাদ্রাজ—সুতরাং কাল বিলম্ব না করে বিছানা বেঁধে নামবার জন্য তৈরী হওয়া গেল—এগমোর ষ্টেশনে।

ষ্টেশনে চা-পান করে স্থির করা গেল—সেইদিনের কার্য্যসূচী, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ব্যবস্থা হল—সোজা মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের রিটায়ারিং রুমে গিয়ে স্নানাদি সেরে অন্য সব ব্যবস্থা। দু'খানি গাড়ীতে জিনিষপত্র চাপিয়ে মাদ্রাজ সেণ্ট্রালে উপস্থিত হওয়া গেল—কিন্তু রিটায়ারিং রুম পাওয়া গেল না। আগে থেকে খবর না দিলে এ ধরণের ব্যর্থতা অনিবার্য্য। তখন স্থির করা হল—ষ্টেশনের কাছে কোনো হোটেলে উঠে আশ্রয় নেয়া। ইতিমধ্যে দেখা গেল যে মামার সুটকেশটী পাওয়া

যেতে পারে এই উদ্দেশ্যে মামা এগমোর ষ্টেশনে রওনা হলেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা আমরা যে ট্যাক্সিতে এসেছিলাম—সেই ট্যাক্সিওয়ালা পথিমধ্যে মামাকে দেখে তাঁর গাড়ী থামিয়ে "সুটকেশটা" ফিরিয়ে দিয়ে বললে—এটা তার গাড়ী থেকে নামান হয়নি। মাদ্রাজের ট্যাক্সিওয়ালার এ সাধুতায় আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হলাম।

সানন্দ চিত্তে মামা ফিরে এলেন। বিনয়দা তখন ঘোষণা করলেন—যে সারাদিন নষ্ট না করে কাঞ্চিভরম ঘুরে আসা যেতে পারে। কাঞ্চিভরমের দূরত্ব মাদ্রাজ থেকে ৬০ মাইল। মোটরে যাবার রাস্তা ভাল। সকাল সকাল মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে, একটা ষ্টেশন ওয়াগন নিয়ে বার হওয়া গেল। মনে পড়ল যে একবার টমাস কুকের আপিসে যাওয়া প্রয়োজন—কলকাতায় ফেরবার বন্দোবস্ত তাঁদের করতে বলা হয়েছিল।

সেদিন শনিবার। আপিসে পৌঁছে দেখা গেল দরজা বন্ধ। বেলা তখন দেড়টা। ভরসা করে দরজায় ধাক্কা দিতেই বেয়ারা দরজা খুলে দিল। দেখা গেল—তখনও দু'একজন ভিতরে কাজ করছেন। আমাদের যাবার ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতে শোনা গেল—সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত। আমরা এতক্ষণ না আসায় ম্যানেজার বলে গেছেন—ট্রেণের সময় টমাস কুকের লোক আমাদের কাগজপত্র নিয়ে ষ্টেশনে হাজির থাকবে। সে কষ্ট থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিয়ে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমরাই তখন কাগজপত্র নিয়ে নিলাম। রাত সাড়ে আটটায় ট্রেণ সেই রাত্রে। শুধু তিনকড়িদা রাত্রের হাওয়াই জাহাজে যাবেন, কেননা পরদিন রবিবার সকাল দশটায়—রোড-কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তাঁকে অভিভাষণ দিতে হবে।

বেলা পৌনে দু'টায় কাঞ্চিভরমের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া গেল। ৬০ মাইল পথ—২ ঘণ্টায় যাওয়া হল। রাস্তা আমাদের বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের মতো—পিচ্ মোড়া। পথে বিশেষ ভাড় নেই—মধ্যে মধ্যে গরুর গাড়ী আছে।

পথের শেষে কাঞ্চিভরমের রেল লাইন পার হওয়া গেল। হাতে সময় থাকলে—ট্রেণেও কাঞ্চিভরম আসা যায় চিঙ্গলপুট ষ্টেশন হয়ে। মাদ্রাজ থেকে কাঞ্চিভরম ট্রেণে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা—সারাদিনে গাড়ীর সংখ্যা খুব কম। একদিনে ফিরে আসা কঠিন।

কাঞ্চিভরম সহর যে বেশ পুরানো তা এখানকার বাড়ীঘর দেখলে বেশ বোঝা যায়। মন্দিরের সংখ্যা প্রচুর—দাক্ষিণাত্যের কাশী বলে এর যে প্রসিদ্ধি আছে তা অহেতুক নয়। কাঞ্চিভরমের দুটী অংশ—এক শিবকাঞ্চি, অপরটী বিষ্ণুকাঞ্চি। দুটীর দূরত্ব প্রায় দু' মাইল।

শিবকাঞ্চিতে যখন আমরা উপস্থিত হলাম তখন দেবাদিদেবের বিশ্রামের সময়, কিন্তু আমাদের মতো ভক্তদের পেয়ে নিশ্চয়ই তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহ হয়েছিল কেননা পাণ্ডা প্রভুকে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্দিরের দরজা খুলে আমাদের দর্শনের ব্যবস্থা করে দিলেন। মন্দিরটী বেশ পুরানো কিন্তু আয়তন বা শিল্প সৌন্দর্য্য কোনো দিক থেকেই এর বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা গেল না ; শুধু এইটুকু মনে হল—যে এর মন্দির

এখান থেকে বিষ্ণুকাঞ্চিতে যাওয়া গেল। মন্দিরটী আয়তনে বিশেষ বড় নয় তবে এর কিছু বিশেষত্ব আছে। আসল মন্দিরটী ত্রিতলা, বিষ্ণুদেব দোতলায় অবস্থান করেন। একতলার স্তম্ভগুলিতে বিষ্ণুর নানা অবতারের মূর্ত্তি খোদিত আছে।

মন্দির দেখে আমরা তাড়াতাড়ি বার হয়ে এলাম, কারণ জানা ছিল যে কাঞ্চিভরম সাড়ির জন্য বিখ্যাত। কাঞ্চিভরমে—একাম্রনাথ, কামাক্ষি, বরদারাজস্বামী প্রভৃতির মন্দিরও বিখ্যাত এবং দ্রষ্টব্য, কিন্তু আমরা সেদিকে সময় সংক্ষেপ করে—তন্তুবায়শালার দিকে মনসংযোগ করা স্থির করলাম। তন্তুবায়শালায় সাড়ী পছন্দ করে দেখি—তার মূল্য স্থির হয় দাঁড়ি পাল্লার সাহায্যে। তাঁতির বাড়ী ও কাপড়ের দোকান ঘুরতে ঘুরতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। আর দেরী করা সমীচীন নয় ভেবে কাঞ্চিভরম দর্শন সমাপ্ত করে মোটরে ওঠা হল। পথেই সন্ধ্যা হয়ে এল। গাড়ীর হেড লাইট জ্বালাতে গিয়ে দেখা গেল—বাতি ঠিক জ্বলে না। গাড়ীর চালক গাড়ী থামিয়ে মধ্যে মধ্যে বিজলী বাতি মেরামতের চেষ্টা করতে লাগল। এই ভাবে চলতে চলতে যখন সাতটা বাজল তখনও মাদ্রাজ সহর ১৪ মাইল দূরে। অথচ আমরা সেই রাত্রেই মাদ্রাজ ত্যাগ করব ৮-৩৫ মিঃ গাড়ীতে।

নির্জ্জন পথ—মধ্যে মধ্যে এক আধখানা গাড়ী যাওয়া আসা করছে। আর ড্রাইভার আমাদের আশা দিচ্ছে—যে এখুনি তার গাড়ী ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের মানসিক অবস্থা তখন আশা নিরাশায় দোদুল্যমান। এমন সময় সেখানে একখানি সরকারী বাস উপস্থিত হল। আমরা গাড়ীর আশা ত্যাগ করে বাসে উঠলাম। বাসের চালককে আমাদের প্রয়োজনের কথা বলায় সে জানালে যে বাস জোরে চালাবার হুকুম নেই তবে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি—মাদ্রাজ সহরের সীমানায় সে ঠিক আটটায় আমাদের পৌঁছে দেবে। বাসের চালকের কথায় নির্ভর করে চুপ করে থাকা গেল। ঠিক আটটা দু'মিনিটে আমরা সহরের সীমানায় ট্যাক্সি ষ্টাণ্ডের সামনে পৌঁছালাম। সামনেই দু'খানা ট্যাক্সি, কিন্তু তার চালক অনুপস্থিত—সন্ধান নিয়ে দেখা গেল চালকদ্বয় রাস্তার অপর পারে হোটেলে নৈশ-ভোজনে রত। আমাদের অনুরোধের ফলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁদের আহার সমাপ্ত হল।

ট্যাক্সির একটা ছুটল—ষ্টেশনের দিকে মহিলাদের বহন করে, অপরখানি গেল হোটেলের দিকে জিনিষপত্র সংগ্রহের জন্য। মতলব এই যে ষ্টেশনে কোনো ক্রমে পৌঁছতে পারলে—গাড়ী ছাড়ার সময় কিছুটা পেছিয়ে দিতে পারা যাবে। ষ্টেশনের ঘড়িতে তখন ৮-২৫ মিঃ—প্লাটফরমে পৌঁছতে আরও দুতিন মিনিট সময় গেল। শ্রীগুহ ও তাঁর শ্রীমতি ও পুত্র—শ্রীমান জগন্নাথ আগে এসে সোজা গাড়ীতে বসেছিল। সুতরাং গাড়ী খোঁজার কষ্ট ভোগ না করে মহিলাদের বসিয়ে কন্‌ডাক্টার গার্ডকে খুঁজে বার করে অনুরোধ করলাম—গাড়ী ছাড়তে কয়েক মিনিট দেরী করতে হবে—যতক্ষণ আমাদের দলের আর একটা অংশ এসে না পৌঁছায়। কথা বলতে বলতে অপর দল মালপত্র নিয়ে এসে হাজির—

বলা হল যে যার জিনিষ বুঝে নাও। গার্ডকে বলা হল যে এখন গাড়ী ছাড়া যেতে পারে। গার্ডের হুইসিল বেজে উঠল—এমন সময় কালাচাঁদ বলে উঠল—তার বিছানার একটা বাণ্ডিল পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায়—কালাচাঁদের ইচ্ছা তখনি প্লাটফরমে নেমে সন্ধান করে, কিন্তু আমরা তাকে প্রবোধ দিলাম—বোধ হয় কোন বেঞ্চির তলায় পড়ে আছে—এখুনি খুঁজে পাওয়া যাবে। আর যদি না পাওয়া যায়—চলন্ত গাড়ী থেকে তিনকড়িদাকে চেঁচিয়ে বলা হল—একবার হোটেলে খবর করতে যদি সেখানে পড়ে থাকে।

গাড়ী দ্রুত চলতে সুরু করে দিল। মামা ভাগ্নীকে প্রবোধ দিলেন—"হোটেলের ঘর আমি নিজে দেখেছি, সেখানে কিছু পড়ে ছিল না। নিশ্চয়ই পথে আসতে বিছানার বাণ্ডিল পড়ে গেছে।" সকাল বেলার সুটকেশ হারানোর পর গাড়ীর ভিতর ভাল করেই দেখা হয়েছিল। মামা আবার টিপ্পনী কাটলেন—"এত বড় একটা টুরের শেষে এরকম এক আধটা দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। এজন্য সকলেরই খুব কড়া নজর রাখা উচিত।" বিনয়দা চুপ করে রইলেন। যেন তাঁরই দোষ, সকলেই স্তব্ধ। ভক্তিময়ী শান্তকণ্ঠে বললেন—বিছানা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মামা আবার প্রশ্ন করলেন—কিগো, বিছানার মধ্যে নতুন কেনা কাপড়-টাপড় নেইত! উমা দেবী জানালার বাইরে চেয়ে বসে রইলেন।

স্তব্ধতার গুমোট কাটবার জন্য বিনয়দা বললেন—বিছানা হারিয়েছে বলে উপোস করে লাভ কি? খানা ঘর থেকে যে খাবার দিয়ে গেছে তাকে ঠাণ্ডা হ'তে দেওয়া উচিত নয়। সকলে চুপচাপ খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা সাড়ে সাতটা—আকাশ অল্প মেঘাচ্ছন্ন। গাড়ী একটা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—নাম ইলোর। ষ্টেশনটী মন্দ নয়। প্লাটফরমে নেমে প্রাতকালীন চায়ের হুকুম দেওয়া হল। গত রাত্রির বিছানা হারানোর শোক অনেকটা কমেছে। সকলেই দিব্য হাসিমুখে গল্পগুজব সুরু করে দিলেন। পাশের কামরা থেকে মামা ও রায় সাহেব এসে উপস্থিত। অক্ষয়দা তাঁর কামরা থেকে এক বাক্স লজেন্‌জেস্ পাঠালেন। বিনয়দা একেবারে স্নানাদি সেরে প্রাতরাশ খেতে বসলেন। খাওয়া শেষ করে মামা ও রায় সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন—কাল উপোস গেছে কি বলেন? আজ তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত। তারপর সুরু হল—ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই খাবার জিনিষ কেনা—কলা, ডাব, কফি প্রভৃতি।

উমা দেবীর ঝুলিতে তখনও কিছু মেওয়া পড়েছিল। বেলা বারোটা নাগাদ—ডজন তিনেক কলা, গোটা দশেক ডাব, ডিমের অমলেট, রুটী মাখন, চা, বিস্কুট, কফি ও মেওয়া গলাধঃকরণ করা হল। বিনয়দা শান্তকণ্ঠে বললেন—এরপর দুপুরে কিছু খাওয়া চলবে কি?

রায় সাহেব নিমলিত নেত্রে বসেছিলেন—চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করে বললেন—দুপুরের খাওয়া ত বেলা দেড়টায়—সেত এখন ঢের দেরী! এরপর কোনো কথা নিষ্প্রয়োজন। বিনয়দা খানা কামরার চাপরাসিকে আর বাকী কজনের জন্ত ছুটী। খানা এল টুনি ষ্টেশনে—বেলা পৌনে একটায়। গড়িমসি করে স্নান করার উদ্যোগ করা গেল। সকলেরই যেন একটা অবসাদ এসেছে—গত তিন সপ্তাহ নিরন্তর ভ্রমণের প্রতিক্রিয়া। ধীরে সুস্থে স্নান ও আহার শেষ করে যখন খানা বাসনগুলি সরিয়ে রাখা হল—তখন দেখি বেলা সাড়ে তিনটা। গাড়ী পুব মুখে চলেছে। বাঁয়ে পাহাড়ের শ্রেণী—দূরে মাস্তুলের মতো একটা পাহাড়ের চূড়া, ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনের চিহ্ন ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

গাড়ী ষ্টেশনে থামতে অক্ষয়দা ও ভক্তিময়ী নেমে পড়লেন। সঙ্গে নামলেন বিনয়দা—এর আগে ওয়ালটেয়ার দেখা হয়নি। মামা ও রায় সাহেব নেমে পড়লেন—বললেন, সীমাচলম্ দেখাটা এই সঙ্গে হয়ে যাক। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী সেন, অক্ষয়দাকে নিতে এসেছিলেন—তাঁরা উমা দেবীকে নামতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সীমাচলমের মহিমা উমা দেবীকে আকর্ষণ করতে পারলে না।

দল ভেঙে অর্দ্ধেক হয়ে গেল। কামরা বদল করে কালাচাঁদ ও উমা দেবী আমাদের কামরায় এলেন। ঝাড়ুদার ডেকে ঘর সাফ করান হল। সঙ্গের জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখা হল—যাতে বাকী পথটা নিশ্চিন্তে যাওয়া যায়।

শ্রীগুহ বেজওয়াদাতে নেমে নিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী গুহ ও শ্রীমান জগন্নাথ সোজা কলকাতায় চললেন। তার এত ঘোরাঘুরি ভাল লাগেনা। ছোট ছেলে সে আমাদের এই দৌড়ঝাঁপ সহ্য করবে কি করে?

ওয়ালটেয়ারে গাড়ীর স্থিতি ৫৫ মিঃ। ট্যাক্সি পাওয়া গেলে—চকিতে বিশাখাপওন বা ভাইজাগ বন্দর দেখে আসা যায়। এতক্ষণ থাকার ফলে গাড়ী যখন ছাড়ে তখন প্লাটফরমের জনতা পাতলা হয়ে এসেছে। বেলা সাড়ে চারটায় রোদের তেজ কমে এসেছে। ট্রেণ কিছুটা পথ একই লাইনে ফিরে এসে উত্তরমুখে দৌড় সুরু করে দিল। একঘণ্টা পাঁচ মিনিট দৌড়ের পর—ভিজিয়ানাগ্রাম ষ্টেশন—সাড়ে পাঁচটায় সন্ধ্যার অন্ধকার প্লাটফরমে নেমে পড়েছে। এতক্ষণ সকলে প্রায় ঝিমিয়ে ছিল—গাড়ী থামতে মনে হল—এক কাপ "চা" এখন খাওয়া যেতে পারে। মনে পড়ল —বিনয়দা নেই, প্লাটফরমে সঞ্চরমান খানা কামরার "বয়"কে চায়ের হুকুম করা হল। চা দিয়ে বয় রাতের খাবারের বরাত আদায় করে নিয়ে গেল—বলে গেল পৌনে আটটায় নৌপাদা—সেখানে ডিনার।

রেলের চায়ে সাধারণত কোনো স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু এতদিন বাদে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে রেলও ইচ্ছা করলে ভাল চা দিতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই মনকে বোঝান হল—যে চায়ের প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি—এ চায়ের স্বাদের জন্য রেল কোম্পানী দায়ী নয়—দায়ী দক্ষিণ ভারতে চায়ের অপ্রচলন। উমাদেবী বললেন—এদিকে চা ভাল না পাওয়া গেলেও কফিটা খুব সুন্দর। কলকাতায় ফিরে এ রকম কফি কিন্তু পাওয়া যাবে না। শ্রীমতী শান্তা শ্রান্তিবিজড়িত ক্লান্তস্বরে এ কথা সমর্থন করলেন—দেখা গেল সকলেরই একমত সুতরাং তর্ক করার মতো আর কিছু পাওয়া গেল না। নৌপাদায় ডিনার খেয়ে বয়কে

রুমে ঘড়ি দেখা হল—রাত ৯টা মাত্র, বাইরে চাঁদের আলোয় চলন্ত দৃশ্য অতি অদ্ভুত মনে হচ্ছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। শুধু রেলের চাকার ঘর্ষণের শব্দ ও মধ্যে মধ্যে এঞ্জিনের সতর্ক হুইসেল। গাড়ীর দোলানিতে চোখ বুজে এল। পরদিন চোখ যখন চাইলাম দেখি—দুপাশের দৃশ্য অতি-পরিচিত—গাড়ীর গতি মন্থর হতে মন্থরতর। পয়েন্টস্ ও ক্রসিংয়ের ঘট্‌ঘট্ আওয়াজ শেষ করে গাড়ী থামল অতি দীর্ঘ প্লাটফরমের শেষে—খড়্গপুরে। নামটা শুনে সকলেই উচ্চকিত হয়ে উঠল। মনে হল যেন বাড়ী এসে গেছি। উৎসাহ ভরে উঠে বিছানা বাঁধা সুরু করা গেল। স্নান করা হবে কিনা তা নিয়ে তর্ক জুড়ে দেওয়া গেল। সে কী উত্তেজনা! প্রশ্ন হল—স্নান না করে কী করা যায়। সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা সময় কাটাই কী ভাবে। যাবার সময় যে পথ অতিক্রম করতে দু'ঘণ্টা ও লাগেনি—ফেরার পথে সেখানে ৩ ঘণ্টা ৩৮ মিঃ সময় লাগে। ভারী বিরক্তিকর মনে হয়। শেষে টেলিগ্রাফের পোল পর্য্যন্ত গুনতে গুনতে—হাওড়া ব্রীজের মাথা দেখা গেল এসে; পড়ল চাঁদমারী ব্রীজ—বাকলণ্ড ব্রীজ—হাওড়া প্লাটফরম। মনে হল আমাদেরই অতি পরিচিত কুলীর দল সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে—আমাদেরই জন্য। জনতার কলরোল যেন আমাদেরই অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। গাড়ীর জানালা থেকে দেখতে পাওয়া গেল—কালাচাঁদের পুত্র ও কন্যা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে। গাড়ী থামতেই তারা জানালে—তিনকড়ি মিত্র টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে তিনি তোমাদের বিছানা নিয়ে এসেছেন।

উমাদেবীর মুখে ফুটে উঠল হাসি। বললাম সব ভাল যার শেষ ভাল। কলকাতার রাজপথ পুরানো বন্ধুর মতো সকলকে আহ্বান করলে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

রাসেলের বস্তুবাদ

The Problems of Philosophy (১৯১১), Our knowledge of the Physical World এবং The Analysis of Mind এই তিন গ্রন্থে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলিতে রাসেলের দর্শনের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম গ্রন্থে রাসেল যে মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত মতের সাদৃশ্য অতি সামান্য। ইহার সহিত প্রত্যয়বাদেরই অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

বার্কলের মতে আমাদের প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছুরই জ্ঞান আমাদের নাই। রাসেল বলেন, In (মধ্যে) শব্দের দ্ব্যর্থে প্রয়োগ হইতেই এই মত উদ্ভূত হইয়াছে। যখন কোনও ব্যক্তি আমার মনের মধ্যে আছে (in my mind), এই কথা বলি, তখন সেই লোকটি নিজে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছে, ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার চিন্তা আমার মনের মধ্যে আছে, ইহা বলাই আমার অভিপ্রেত। সেই লোকটি ও তাহার চিন্তা দুইটি ভিন্ন বস্তু। বস্তু ও তাহার চিন্তার মধ্যে পার্থক্য যদি মনে রাখা না হয়, তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে আমাদের প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছুই আমরা জানিতে পারি না। এই মতকেই Solipsism বলে। তর্কদ্বারা এই মতের খণ্ডন অসম্ভব। কিন্তু ইহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবারও যথেষ্ট যুক্তি নাই। চিন্তা এবং তাহার বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা ধরিয়া লইয়াই আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। আপনা হইতে করিতে হইবে। মনের এই সংজ্ঞানুসারে মনঃ এবং তাহা হইতে ভিন্ন অন্য এক বস্তুর মধ্যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধই জ্ঞান। এখন এই সম্বন্ধ কি, তাহা দেখিতে হইবে।

এই সম্বন্ধ দ্বিবিধ—পরিচয়মূলক জ্ঞান (knowing by acquaintance), এবং বর্ণনামূলক জ্ঞান (knowing by description)। অব্যবহিতভাবে যাহা আমরা জানিতে পারি, তাহারই পরিচয়মূলক জ্ঞান হয়। সেই বস্তু ও মনের মধ্যে তাহার জ্ঞানের উৎপাদক অন্য কিছু যখন না থাকে, তখন যে জ্ঞান হয়, তাহাই পরিচয়মূলক জ্ঞান। তাহার মধ্যে অনুমানের অথবা সত্যের জ্ঞানের স্থান নাই। বস্তু যখন মনের সংস্পর্শে আসে, তখন সোজাসুজি এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন কোনও টেবিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন যে জ্ঞান হয়, তাহা কতকগুলি ইন্দ্রিয়বিষয়ের জ্ঞান—বর্ণ, আকার, কাঠিন্য, মসৃণতা প্রভৃতির জ্ঞান। যখন টেবিল দেখি ও স্পর্শ করি, তখন এই সকলের সহিত আমার অব্যবহিত পরিচয় হয়। টেবিলের বর্ণ, কাঠিন্য প্রভৃতির প্রকৃতি-সম্বন্ধে জ্ঞান এই অব্যবহিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহে। বর্ণ ধূসর হইতে পারে, কালো হইতে পারে, সাদা হইতে পারে, কিন্তু বর্ণের প্রকৃতির জ্ঞান এই জ্ঞান হইতে ভিন্ন। বর্ণের প্রকৃতির জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই বর্ণের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

কিন্তু টেবিলের জ্ঞান এই সকল ইন্দ্রিয়-বিষয়ের জ্ঞান হইতে ভিন্ন। তাহা অব্যবহিত জ্ঞান নহে। ইন্দ্রিয়-বিষয়দিগের জ্ঞান হইতে টেবিলরূপ প্রাকৃতিক বস্তুর জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে ভিন্ন টেবিল নামে কোনও বস্তুর অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায়, কিন্তু যে সকল সংবেদন অব্যবহিত-

জ্ঞান বর্ণনামূলক। "যে প্রাকৃতিক বস্তুদ্বারা ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলি উৎপন্ন হয়, তাহাই টেবিল"—এইভাবে ইন্দ্রিয়-বিষয়দ্বারা টেবিলের বর্ণনা করা যায়। টেবিলকে জানিতে হইলে টেবিলের সহিত আমাদের অব্যবহিত জ্ঞানের বিষয়ীকৃত বস্তুর সম্বন্ধসূচক সত্যের জ্ঞানের প্রয়োজন। আমাদের জানা প্রয়োজন, যে অমুক অমুক ইন্দ্রিয়-বিষয় একটি প্রাকৃতিক বস্তুদ্বারা উৎপন্ন হয়। টেবিলের অব্যবহিত জ্ঞান সম্ভবপর নহে। টেবিল-সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা "সত্যের" জ্ঞান—টেবিলসম্বন্ধীয় সত্যের জ্ঞান। টেবিল নিজে আমাদের জ্ঞানের বিষয় নহে। কোনও একটা বর্ণনা একটিমাত্র বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সত্য, ইহা যখন আমরা জানি (যদিও সেই বস্তু আমাদের অব্যবহিত জ্ঞানের বিষয় নহে), তখন সেই বস্তুর জ্ঞান বর্ণনামূলক জ্ঞান। এই বর্ণনামূলক জ্ঞানকে রাসেল "সত্যের জ্ঞান"ও বলিয়াছেন।

বস্তুর জ্ঞান এবং সত্যের জ্ঞান উভয়ই পরিচয়ের ভিত্তির উপর স্থাপিত। যে সকল বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় আছে, তাহাদের স্বরূপ কি? ইন্দ্রিয়-বিষয়গণের সহিতই যে আমাদের অব্যবহিত পরিচয়, তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-দত্ত জ্ঞান যদি একমাত্র পরিচয়মূলক জ্ঞান হইত, তাহা হইলে বর্তমানে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্তমান, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুর জ্ঞান সম্ভবপর হইত না। অতীত-সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান আমাদের থাকিত না। অতীত বলিয়া যে কিছু আছে, তাহাই জানিতে পারিতাম না। আমাদের ইন্দ্রিয়-বিষয়-দিগের সম্বন্ধে কোন সত্যও আমাদের জ্ঞানগোচর হইত না। কেননা সমস্ত সত্যের জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক জাতীয় পদার্থের জ্ঞানের প্রয়োজন। ইহাদিগকে বস্তুত্ব বর্জিত প্রত্যয় (abstract ideas) বলে। রাসেল তাহাদিগকে "সার্বিক" নামে (universals) অভিহিত করিয়াছেন। সার্বিক ভিন্ন আরও পদার্থ আছে, যাহাদের সহিত আমাদের অব্যবহিত পরিচয় সম্ভবপর।

প্রথমতঃ স্মৃতির সাহায্যে পরিচয়ের কথা বিবেচনা করা যাউক। যাহা আমরা দেখিয়াছি, অথবা শুনিয়াছি, অথবা যাহা অন্য প্রকারে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহারা আমাদের স্মৃতিতে অনেক সময় থাকিয়া যায়। যাহা আমরা স্মরণ করি, তাহাও আমাদের অব্যবহিত জ্ঞানের বিষয়—তাহা অতীতরূপে প্রতিভাত হইলেও, বর্তমানের জ্ঞানে অব্যবহিতভাবে বর্তমান। অতীত সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎস স্মৃতি হইতে উদ্ভূত এই অব্যবহিত জ্ঞান। এই জ্ঞান না থাকিলে অতীতের কোনও জ্ঞান অনুমান হইতে উদ্ভূত হইতে পারিত না। কেননা অতীতের অস্তিত্বই আমরা জানিতে পারিতাম না।

দ্বিতীয়তঃ—আমাদের মনের পর্যবেক্ষণ হইতে উদ্ভূত পরিচয়-মূলক অব্যবহিত জ্ঞান। আমরা যে কেবল বস্তুকে জানি, তাহা নহে, আমাদের যে সে জ্ঞান আছে, তাহাও আমরা অবগত আছি। যখন সূর্য্যকে দেখি, তখন সূর্য্যকে যে দেখিতেছি, ইহাও জানি। "আমার সূর্য্যদর্শন" রূপ পদার্থের সহিত আমার পরিচয় আছে। যখন খাদ্য পরিচয় ঘটে। আমাদের সুখ ও দুঃখবোধের সহিত এবং আমাদের মনের মধ্যে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনার সহিতই আমি পরিচিত। এই প্রকার পরিচয়কে "স্বয়ং-সংবিদ" বলে। স্বয়ং-সংবিদ যাবতীয় মানসিক পদার্থের জ্ঞানের উৎস। এই জ্ঞান অব্যবহিত জ্ঞান। অন্যের মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে, তাহার জ্ঞান তাহাদের শরীরে যে সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহার জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত হই। আমাদের মনের মধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহার জ্ঞান যদি আমাদের না থাকিত, তাহা হইলে অন্যের মনের মধ্যে কি আছে, তাহা কল্পনা করিতে পারিতাম না। তাহাদের মনঃ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহাও জানিতে পারিতাম না।

আমাদের স্বয়ং-সংবিদের মধ্যে কি আছে, তাহা আমরা জানি; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের "আমি"র (self) সহিত আমাদের পরিচয় আছে কিনা, তাহা বলা সহজ নহে। মনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও অনুভূতির সহিত আমাদের পরিচয় হয়, কিন্তু, যে "আমি" এই সকল চিন্তা ও অনুভূতির আধার, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় না। তবুও সেই "আমি"র সহিত যে আমাদের পরিচয় আছে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। ইহার পরে রাসেল যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার বর্ণনা প্রয়োজনীয় নহে।

উপরি বর্ণিত ব্যাখ্যা হইতে দেখা গেল, (১) সংবেদন হইতে বাহ্য-ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত আমাদের অব্যবহিত পরিচয় ঘটে, (২) মনের পর্য্যবেক্ষণ হইতে অন্তরিন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত অর্থাৎ চিন্তা, অনুভূতি, কামনা প্রভৃতির সহিত অব্যবহিত পরিচয় হয়, (৩) যাহা পূর্ব্বে বাহ্যেন্দ্রিয় অথবা অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়াছে, স্মৃতিতে তাহাদের সহিত অব্যবহিত পরিচয় হয়, (৪) ইহা সম্ভবপর যে "আমি"র সহিত আমাদের অব্যবহিত পরিচয় হয়। এই সকল ব্যতীত আর একপ্রকার অব্যবহিত জ্ঞান আছে, তাহা সার্বিক জ্ঞান। এই সার্বিক জ্ঞানের প্রকৃতি কি?

প্লেটো সার্বিকদিগের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সামান্যবাদে সার্বিকদিগের প্রকৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "সুবিচার" কি, তাহা জানিতে হইলে, সুবিচারমূলক সকল কর্ম্মের মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা জানিতে হয়। "শ্বেতবর্ণ"দ্বারা যত শ্বেত বর্ণের বস্তু আছে, তাহাদের সকলের মধ্যেই যাহা আছে, তাহাকে বুঝায়। যাহা বহু-বস্তু-সাধারণ, যাহা বহু বস্তুর প্রত্যেকের মধ্যে আছে, যাহা না থাকিলে কোনও বস্তু যাহা, তাহা হইত না, সেই 'সার' অথবা 'রূপ' (essence or form)কে প্লেটো idea অথবা সামান্য বলিয়াছিলেন। সামান্যগণ মনের মধ্যে অবস্থিত নহে, যদিও মনে তাহাদের জ্ঞান হয়। সামান্য কোনও বিশেষ বস্তু নহে বলিয়া ইন্দ্রিয়ের জগতে তাহার স্থান নাই। তাহা ক্ষণস্থায়ী পরিণামী পদার্থও নহে। তাহা সনাতন, অবিনাশী ও পরিণাম-বিহীন। সামান্য জগৎ ইন্দ্রিয়াতীত; এই অতীন্দ্রিয় জগৎ ইন্দ্রিয়-জগৎ অপেক্ষা অধিকতর সত্য; ইন্দ্রিয়-জগতের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, তাহা এই সামান্য জগৎ হইতে প্রাপ্ত।

সামান্যগণ দেশ ও কালে অবস্থিত নহে, ইন্দ্রিয়দ্বারাও তাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই জন্য ইহাদের সত্তার প্রকৃতি বুঝাইতে "অস্তিত্ব"

ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ঐ অর্থবোধক শব্দ নাই। রাসেল সামান্য শব্দস্থলে 'সার্বিক' শব্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা সামান্য শব্দ দ্বারা মানসিক অবস্থা সূচিত হইতে পারে। কিন্তু প্লেটোর সামান্য মানসিক অবস্থা নহে।

ভাষায় যত শব্দ আছে, রাসেলের মতে তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিবাচক নাম (Proper nouns) ব্যতীত আর প্রায় সকল শব্দই সার্বিক-বাচক। এমন কোনও বাক্য গঠন করা সম্ভবপর নহে, যাহার মধ্যে অন্ততঃ একটি সার্বিক-বাচক শব্দ নাই। ক্রিয়াপদ ও Prepositionও সার্বিক-বাচক। করা, খাওয়া, হাঁসা, যুদ্ধকরা সকলই সার্বিক। কেননা এই সকল ক্রিয়াদ্বারা একই প্রকারের বহু কাজ বুঝাইয়া থাকে; সেই সকল কার্য্য সাধারণত্ব-বাচক একটি ক্রিয়াপদ দ্বারা প্রকাশিত হয়। "In" একটি Preposition। এই Preposition দ্বারা যে সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়, তাহা বহুক্ষেত্রে বর্ত্তমান। ভাষায় অধিকাংশ শব্দই যে সার্বিক-বাচক, দার্শনিকেরা ভিন্ন অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। দার্শনিকদিগের মধ্যেও অনেকেই বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ ভিন্ন অন্য কোনও পদ যে সার্বিক, তাহা স্বীকার করেন নাই। দর্শনে ইহা হইতে গুরুত্বপূর্ণ ফল উদ্ভূত হইয়াছে। বিশেষণ পদ এবং শ্রেণীবাচক বিশেষ্য পদ দ্বারা বস্তুর গুণ অথবা ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়; Preposition এবং ক্রিয়াপদ দ্বারা দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়। Preposition এবং ক্রিয়াপদদিগকে সার্বিক বলিয়া গণ্য না করার ফলে, Preposition দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আরোপিত হয়, মনে করা হইয়াছে। তাহারা যে একাধিক বস্তুর সম্বন্ধবাচক, তাহা লক্ষ্য করা হয় নাই। সুতরাং বস্তুদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বলিয়া কোনও পদার্থ আছে, তাহা স্বীকার করা হয় নাই।

কেহ কেহ জগতে একাধিক বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা বহু বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করিয়াছেন, কেননা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং সম্বন্ধের অস্তিত্ব অসম্ভব। প্রথমোক্ত মত স্পিনোজা ও 'ব্রাডলের'; ইহা অদ্বৈতবাদ। দ্বিতীয় মত লাইবনিট্জের। ইহার নাম মনাদ-বাদ।

Prepositionগণ যে সার্বিক, তাহা প্রমাণ করিতে রাসেল এই উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। "এডিনবরা লণ্ডনের উত্তরে" (to the north of), এই বাক্যে "উত্তরে" শব্দের অর্থ কি? ইহার যে একটা অর্থ আছে তাহা নিশ্চিত, কেননা 'উত্তরে' স্থানে 'দক্ষিণে' বসাইলে বাক্যের অর্থ-বিকৃতি ঘটে। (২) 'উত্তরে' শব্দের অর্থ এডিনবরা শব্দের অন্তর্ভুক্ত নহে, 'লণ্ডন' শব্দেরও অন্তর্ভূত নহে। (৩) "উত্তরে" শব্দের অর্থ আমার মনের সৃষ্ট নহে। কেননা আমি না থাকিলে অথবা আমার মৃত্যুর পরেও, এডিনবরা লণ্ডনের 'উত্তরে' থাকিবে। সুতরাং 'উত্তরে' শব্দের একটা অর্থ আছে। এই অর্থ একটা 'সার্বিক' পদার্থ। কিন্তু 'ইহা দেশ ও কালে অবস্থিত নহে।' ইহা চিন্তাও (thought) নহে।

রাসেলের দর্শনের এই প্রথম ক্রমে চতুর্বিধ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে: (১) জ্ঞাতা মনঃ, (২) ইন্দ্রিয় দত্ত (ইহাদের জ্ঞান হয় পরিচয় দ্বারা) (৩) সার্বিক (ইহাদেরও জ্ঞান হয় পরিচয় দ্বারা) (৪) প্রাকৃতিক বস্তু (ইহাদের জ্ঞান হয় বর্ণনা দ্বারা)। ইহার পরবর্ত্তী ক্রমে রাসেল এই তালিকা হইতে "প্রাকৃতিক বস্তু" বর্জন করিয়াছেন।

একই বাহ্যবস্তু একই সময়ে দুই ব্যক্তির নিকট, অথবা বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির নিকট কিরূপে বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতে পারে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইয়া অনেক দার্শনিক বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; কেহ কেহ বলিয়াছেন, বাহ্যবস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞেয়। রাসেল এই সমস্যার সমাধানে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তথাকথিত প্রাকৃতিক বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি যাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা মনের বাহ্য, কিন্তু যাহাকে প্রাকৃতিক বস্তু বলা হয়, তাহা নহে। যে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব রাসেল স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়দত্তদিগের (sense data) দ্বারা গঠিত। ইন্দ্রিয়দত্তগণ প্রাকৃতিক বস্তু নহে। কিন্তু তাহারা "বস্তু"। যে রূপ-রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের পরিচয়মূলক জ্ঞান আমাদের আছে। সংবেদনের মধ্যে তাহাদের অব্যবহিত জ্ঞান আমরা লাভ করি। ইন্দ্রিয়-দত্তদিগকে রাসেল "ইন্দ্রিয়-গম্য বিষয়" (Sensible objects) বলিয়াছেন। তিনি সংবেদন (sensation) এবং ইন্দ্রিয়-গম্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করিয়াছেন। সংবেদন একটা মানসিক ঘটনা, ইন্দ্রিয়-গম্য বিষয়ের অবগতিই সংবেদন। এই সংবেদনদ্বারা যাহার অস্তিত্ব আমরা অবগত হই, তাহাই "ইন্দ্রিয়-গম্য বিষয়"। রাসেল লিখিয়াছেন, যখন "ইন্দ্রিয় গম্য বিষয়ের কথা আমি বলি, তখন আমি টেবিলের মত কোনও (প্রাকৃতিক) বস্তুর কথা বলি না। যে বর্ণসমষ্টি টেবিলের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিগোচর হয়, অথবা যে বিশিষ্ট কাঠিন্য টেবিলে চাপ দিবার সময় অনুভূত হয়, অথবা যে বিশিষ্ট শব্দ টেবিলে আঘাত করিলে শ্রুতিগোচর হয়, ইহাদের প্রত্যেককেই আমি ইন্দ্রিয়-গম্য বলি। ইহার জ্ঞানকে বলি সংবেদন"। রাসেলের ইন্দ্রিয়-গম্য ও সাংখ্যের পঞ্চতন্মাত্র একই বলিয়া প্রতীত হয়।

Our knowledge of the External World গ্রন্থে রাসেল উপরিউক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। Problems of Philosophy গ্রন্থে তিনি টেবিলরূপ প্রাকৃতিক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি ইন্দ্রিয়ে যাহা প্রাপ্ত, তাহা ভিন্ন অন্য কোনও শ্রেণীর বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু ইন্দ্রিয়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা ক্ষণস্থায়ী, এবং সংবেদনের শেষ হইলে হয়তো তাহার অস্তিত্ব থাকে না, থাকিলেও খুব সামান্য সময়ের জন্যই থাকে। তাহা হইলে যে টেবিলের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই, সে টেবিল কোথায় যায়? রাসেল বলেন, টেবিল বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র বস্তুই নাই। টেবিল একটা ন্যায়ের

ইন্দ্রিয়-দত্ত যেরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইতেই টেবিলের জ্ঞানের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক লোকে যে স্থান হইতে জগতের উপর দৃষ্টিপাত করে, তাহা অন্যের স্থান হইতে ভিন্ন। এই জন্য প্রত্যেকের দৃষ্ট জগৎ অন্যের দৃষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন। বিভিন্নতা সত্ত্বেও, এই সকল জগতের প্রত্যেকটি যেমন দৃষ্ট হয়, তেমন ভাবেই তাহার অস্তিত্ব আছে যদি দেখিবার কেহ না থাকিত, তাহা হইলেও তাহা ঐরূপই থাকিত। সুতরাং যতস্থান হইতে জগৎকে দেখা সম্ভবপর, ততসংখ্যক জগতের অস্তিত্ব আছে ; এবং সেই সকল স্থানে দ্রষ্টা কোনও লোক থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক স্থান হইতেই জগতের এক বিশিষ্ট রূপ থাকিবে। সুতরাং সকল সম্ভাব্য স্থান হইতেই দ্রষ্টব্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে,—সে সকল স্থানে দেখিবার কোনও লোক না থাকিলেও থাকিবে। সুতরাং এই সকল রূপের প্রত্যেকটি মনঃ-নিরপেক্ষ। এই ভাবে রাসেল বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই ন্যায়ের সৃষ্টি কি প্রকার? যে কোন স্থান হইতে জগতের যে রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, রাসেল তাহাকে "পরিপ্রেক্ষিত" বলিয়াছেন। যে স্থানে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট কোনও জীব আছে, সে স্থান হইতে জগতের যে রূপ দৃষ্ট হয়, তাহাকে বলিয়াছেন "নিজস্ব জগৎ"। বিভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট জগতের যত রূপ, তাহাদের সংস্থানকে রাসেল "পরিপ্রেক্ষিতের সংস্থান" (system of perspectives) নাম দিয়াছেন। পরস্পরের নিকটে অবস্থিত দুই ব্যক্তির পরিদৃষ্ট পরিপ্রেক্ষিতদ্বয় প্রায় একরূপ, এবং তাহাদের বর্ণনায় তাহারা একই ভাষা ব্যবহার করিতে পারে। তাহাদের দৃষ্ট দুই রূপের মধ্যে পার্থক্য এতই কম, যে তাহারা একই জগৎ দেখিতেছে বলিতে পারে। যে টেবিল তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকে একই বলিতে পারে। যে যে স্থান হইতে তাহারা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে যে দূরত্ব, তাহা অপেক্ষাও কম দূরত্ব-বিশিষ্ট স্থান এই দুই স্থানের মধ্যে আছে। সেই সকল স্থান হইতে, জগতের যে সকল রূপ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সাদৃশ্য আরও অধিক। এই সকল পরস্পর-সম্বন্ধ পরিপ্রেক্ষিত লইয়াই "দেশ" (space) গঠিত।

এখন "প্রাকৃতিক বস্তু" কি দেখা যাক্। উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিত সকলের একটির মধ্যস্থ একটি বিষয়, অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতের একটির সহিত সম্বন্ধ—অর্থাৎ সেই 'বিষয়ের' সদৃশ 'বিষয়' অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যেও আছে। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যস্থ এই সকল সদৃশ বিষয়ের সংস্থানই 'প্রাকৃতিক বস্তু'—আমাদের সাধারণ জ্ঞানে যাহা 'বস্তু' বলিয়া প্রতীত হয়। কোনও বস্তু বিভিন্ন স্থান হইতে যে যে রূপে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের এক একটি রূপ সেই সকল রূপ-সংস্থানের অন্তর্গত। কিন্তু কোনও স্থান হইতে কোনও বস্তুর যে রূপ দৃষ্টিগোচর, সেই রূপ সেই বস্তু নহে। রূপ অব্যবহিতভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা কতকগুলি ইন্দ্রিয়দত্তের সমষ্টি, আর সেই বস্তু—যাহা সম্ভাব্য যাবতীয় পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে প্রকাশিত,—যাবতীয় ইন্দ্রিয়-দত্তদিগের সংস্থান—তাহার কোনও বাস্তব সত্তা নাই, তাহা একটা ন্যায়ের সৃষ্টি। মানব (জাতি) বলিতে যেমন মানবজাতির (humanity) অন্তর্গত সমস্ত মানবের সংস্থান বুঝায়, অথচ ব্যক্তি-মানব হইতে স্বতন্ত্র মানবজাতি বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই, ইহাও তেমনি। প্রাকৃতিক বস্তু বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে বর্ত্তমান সাদৃশ্য-বিশিষ্ট বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-দত্ত-সমষ্টির সংস্থান মাত্র, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

(ক্রমশঃ)

চরণিকা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বুদাপেস্তের পথে বেড়াচ্ছিলুম···লক্ষ্যহীন ঘোরা···হঠাৎ চোখে পড়লো, আগে চলেছে দু'খানি পা···সঞ্চরিণী লতা-পল্লবের মতো। সে দু'খানি পায়ের যেমন সুঠাম গড়ন, তেমনি বর্ণচ্ছটা···ক্ষিপ্র গতি! মনে হলো, সুরের দোলা যেন!

চিরদিন আমি রূপের পূজারী···কিশোরীর চরণের মাধুরীটুকুও আমার মনে সুদৃঢ় রেখা আঁকে। মনে হলো, এমন ললিত-সুঠাম যাঁর চরণ—তাঁর মুখ না-জানি কত মধুময়! তাঁর অধর···আঁখির তারা কেমন লীলা-বিচিত্র··· মাথার খোঁপায় [illegible]···

ও মুখ না দেখলে জীবন যেন মিথ্যা হয়ে যাবে! চপল-দু'টি চরণ লক্ষ্য করে' আমিও চললুম কিশোরী চরণিকার পিছনে-পিছনে।

কি ক্ষিপ্র ও দুই চরণের গতি···আমাকে বেশ জোর-পায়ে চলতে হলো।···এক জায়গায় শর্ট-কাট করে এগিয়ে যেতে গিয়ে এক মোটা ফেরিওয়ালীর সঙ্গে ধাক্কা··· বেশ জোর-ধাক্কা···বেচারী আমার ধাক্কায় পড়ে গেল। তার পশরা ছিট্‌কে পথে পড়ে ভেঙ্গে তচ্‌নচ্! গা-ঝাড়া দিয়ে মুটকী তখনি উঠে দাঁড়ালো···উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে [illegible]

যেন পাথরকুচি ছুঁড়ে মারছে! ভিড় জমলো তামাসা দেখতে। কোনো মতে পরিত্রাণ পাবার জন্য পকেট থেকে একখানা নীল নোট···দশ ক্লোরিণের নোট বার করে মুটকীর দিকে দিলুম ছুঁড়ে। নোট পেয়ে সে থামলো···থেমে ছড়ানো পশরা কুড়িয়ে ঝুড়িতে তুলছে···সেই ফাঁকে আমি সরে' পড়লুম···চরণিকার উদ্দেশে।

গোলযোগে-ভিড়ে চরণিকাকে প্রায় হারিয়ে ফেলে-ছিলুম· ·জোরে পা চালিয়ে ধরে ফেললুম, ঐ যে!···আমার পানে ফিরে তাকালেন! অপরূপ রূপসী···আমাকে লক্ষ্য করেছেন, মনে হলো!

একটা গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ড···ভাড়াটে কখানা ফীটন দাঁড়িয়ে···চরণিকা মুহূর্ত্তের জন্য ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়ালেন···তার পর একখানা ফীটনে উঠে বসলেন। ফীটন চললো। আমিও একখানা ফীটন ডেকে তাতে উঠে বসলুম···কোচম্যানকে বললুম—চলো ঐ ফীটনের পিছু-পিছু!

রূপের পিছনে আমি···আগুন লক্ষ্য করে পতঙ্গের ছোটা! এ ছোটার মাশুল লাগলো আরো পাঁচ ক্লোরিন!

দু-গাড়ীর কোচম্যানরা যেন রেশ করছে···দুজনেই গাড়ী ছুটিয়ে দেছে নক্ষত্রের বেগে!···

পথের উপর একটা বড় দোকান···নামজাদা দোকান···যত ধনী বনিয়াদী খরিদ্দার নিয়ে দোকানের কারবার। চরণিকার ফীটন থামলো সেই দোকানের সামনে। গাড়ী থেকে চরণিকা নামলেন···নেমে সেই দোকানে ঢুকলেন। আমাকেও ফীটন থামিয়ে নামতে হলো···নেমে আমিও ঢুকলুম দোকানে···আলোর পিছনে ছায়া!

দোকানের মধ্যে চার চক্ষুর মিলন···আমার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চরণিকা চাইলেন—আমার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করলেন।···ভালো করে' আমিও তাঁকে দেখে নিলুম। যা ভেবেছিলুম···দেখলুম, চরণ দু'খানির চেয়ে···তাঁর মুখ ঢের বেশী রূপময়, মধুময়···মুখের চেয়ে চোখ দুটি আবার আরো সুন্দর···এবং মুখ চোখ···মাথার কেশ···সব মিলিয়ে তাঁর দেহ···সে একেবারে যেন টেক্কা! সে দেহ-সৌষ্ঠবের কমনীয়তা···তার আর তুলনা নেই!

দু-দণ্ড দেখবো···তা হলো না। দোকানের এক

আমি একেবারে থ···তাইতো!···কি চাই! কোনো-মতে বললুম—হ্যাঁ, মানে···আমি চাই···

লোকটা বললে—সিল্ক?

ওস্তাদ!—তার কথায় কূল পেলুম যেন···বললুম—হ্যাঁ, সিল্ক···

নিজের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলুম! আমার কণ্ঠ? বললুম—দেখাও···কি-রকম সিল্ক আছে? সব কোয়ালিটির···

এ্যাসিষ্টাণ্ট বললে—কি রঙের?

ভালো জ্বালা! আবার বলে, রঙ! বললুম—কালো···

চরণিকার উপর চোখ পড়লো···বিস্ময়ে আমার পানে তিনি চেয়ে! তাঁর কালো কেশ···চোখের কালো দুটো তারা···আমার মনে লেগে চেপে লেপে আছে···দুনিয়ার আর সব রঙ সে কালো রঙের সায়রে যেন ডুবে গেছে! তাই বোধ হয় কালো রঙের কথা কণ্ঠে ফুটলো···

চরণিকা···মনে হলো, ভেনাস যেন জীবন্ত দৃষ্টি ধরে আমার চোখের সামনে উদয় হয়েছে!

টেবিলের উপর এ্যাসিষ্টাণ্ট জড়ো করে' ধরে দিলে কালো সিল্কের পাহাড়···এটা নেড়ে ওটা খুলে—প্রশ্নের পর প্রশ্ন···

কিনলুম বহু সিল্ক। কেনা শেষ হলে দেখি, চরণিকা তখনো জিনিষপত্র দেখছেন, কিনছেন—দরদস্তর করছেন। জিনিষ কিনে চুপ করে আমার দাঁড়িয়ে থাকা···খারাপ দেখাচ্ছে! ঘুরে ঘুরে আরো কতকগুলো যা-তা জিনিষ কিনতে হলো। কেনা-কাটার মধ্যে সমানে নজর রেখেছি চরণিকার উপর···উনি না চলে যান।

ওঁরও কেনা শেষ হলো। দোকানের এক বেয়ারা চরণিকার বাণ্ডিলগুলো নিয়ে তাঁর সঙ্গে এলো বাহিরে···আমিও গন্ধমাদন পর্ব্বত বয়ে বাহিরে এলুম। দুজনের কেউ ফীটন দুটো ছেড়ে দিইনি। চরণিকা উঠে বসলেন তাঁর ফীটনে—সওদা নিয়ে···আমি উঠলুম আমার গাড়ীতে। তার পর দু গাড়ী চললো। চরণিকার ফীটন আগে-আগে—আমার ফীটন ওঁর ফীটনের পিছনে।

এ পথ ও পথ—কটা পথ চলার পর মোড় বাঁকতে আমার গাড়ীর তলায় চাপা পড়লো একটা কুকুর। কেঁউ কেঁউ শব্দে···আমি স্বপ্নে বিভোর···কুকুরের চীৎকারে

আছে—কুকুরটা চাপা পড়েছে···হৈ-হৈ শব্দে লোকের ভিড় জমে গাড়ী ঘিরে আমার ফীটন থামিয়েছে। কোচম্যানকে টেনে তার কোচবাক্স থেকে নামাবে···কুকুরের মনিব এক দোকানী—সে এসে বলে—পুলিশে চলো—খেশারতী চাই!

চরণিকার গাড়ী চলেছে সামনে ঐ—এখনি চোখের আড়ালে, নাগালের বাহিরে হবে অদৃশ্য!···দিলুম দোকানীর হাতে একখানা পাঁচ গ্লোরিণের নোট গুঁজে··· তুফানে যেন তেলের পিপে উজাড়···তুফান থামলো! আশ্চর্য্য হলুম···মানুষ চাপা পড়লে কারো এতখানি দরদ দেখিনা! একটা কুকুরের জন্য এমন···

কোচম্যানকে বললুম—চালাও—জোরসে···আগের ফীটন ধরা চাই।

ফীটন চললো। চরণিকার ফীটন কোথায় কত দূরে গেছে এগিয়ে···

বুকখানা ধ্বক-ধ্বক করছে—হারালুম?···

পেলুম সে ফীটন—মস্ত একখানা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে···চরণিকা ফীটনে নেই···একজন দাসী নামাচ্ছে ফীটন থেকে চরণিকার জিনিষপত্র।

আমার ফীটন ছেড়ে দিলুম তার ভাড়া চুকিয়ে··· সওদার বস্তা নিয়ে ঢুকলুম। বাড়ীর সামনে পার্ক—সেই পার্কে।···ঐ বাড়ী?···কে? কে? কে এ রূপসী অপরিচিতা?

কাকে জিজ্ঞাসা করবো?···যদি বলে, কেন? সন্ধান নেওয়া হলো না। ঘণ্টাখানেক পরে একখানা চলতি গাড়ী ডেকে তাতে উঠে বাড়ী এলুম।

বাড়ী এসে ঐ সব চিন্তা···মনের মধ্যে রূপের হিল্লোল— দু-খানি চরণের চপল নৃত্য!

পরের দিন খবর পেলুম···আমার বেয়ারা জানেশি··· কথায় কথায় তার মুখে শুনলুম···ও বাড়ী সে চেনে। বাড়ীর মালিক কিশোরী বিধবা···তাঁর খাশ্ দাসী জুশি···জুশির সঙ্গে জানেশির খুব ভাব···দুজনে গভীর ভালোবাসা···বিয়ে করতে চায় ওরা···শুধু পয়সার সংস্থান নেই বলেই···জুশির মনিব হলেন জাকালভের বিধবা স্ত্রী।

জানেশির প্রণয় কাহিনী শুনলুম আগ্রহ জানিয়ে··· মনের আবেগ-চাপল্য—কি বলছি না বলছি, খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ জানেশি বললে—জুশির মনিবকে বলবো হুজুর? আপনি যদি···মানে, আমাকে টাকা-কড়ি দেন···তাহলে জুশির মনিবের সঙ্গে আমি কথা কয়ে তাঁকে জানাই আপনার মনের ইচ্ছা।

—পারিস? বললুম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। বললুম—দেবো আমি তোকে টাকা—খুশী হয়ে···আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা যদি করতে পারিস···তাহলে বুঝলি জানেশি··· তোকে আমি বেশ ভালো রকম বখশিস দেবো।

জানেশি বললে—হ্যাঁ হুজুর, আমি করবো সে ব্যবস্থা।

এর তিনদিন পরে জানেশি আমার হাতে দিলে একখানা লেফাফা। আমার নাম লেখা লেফাফা।

লেফাফা ছিঁড়ে বার করলুম চিঠি···জাকালভের কিশোরী বিধবার লেখা চিঠি! আমার বুকখানা দুলে উঠলো। চিঠি পড়লুম। চিঠিতে লেখা—

প্রিয় মহাশয়—আজ দুপুরবেলায় অর্থাৎ বেলা সাড়ে বারোটায় যদি আমার সঙ্গে আসিয়া দেখা করেন, অত্যন্ত সুখী হইব।

আপনার সখ্যকামী

শুম জাকালভের বিধবা।

এ চিঠি পেয়ে আমার আনন্দ···চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম আমি···আবেগভরে হয়তো জানেশিকে বুকে জড়িয়ে ধরতুম! বলতুম, ওরে আমার মায়াবী যাদুকর জানেশি···

কোনো মতে আত্মসংবরণ করে আমি বললুম—কি করে' ম্যানেজ করলি···এঁ্যা?

সলজ্জ সঙ্কোচভরে জানেশি বললে—আজ্ঞে, সে কথা বলতে আমার লজ্জা করচে, হুজুর···এখন আপনি গিয়ে দেখা করলেই···সিদ্ধি-লাভ!

জানেশির হাতে তখনি দিলুম একখানা দশ পাউণ্ডের নোট।

জানেশি বললে—বাকী ব্যবস্থাটুকু···ওঁর দাসী জুশি

• ঘড়ির কাঁটা দেখে বারোটা ত্রিশ মিনিটে সাজসজ্জা করে' আমি গিয়ে দাঁড়ালুম চরণিকার বাড়ীর দ্বারে··· বেল্ টিপলুম।

দাসী জুশি এসে দরজা খুলে দিয়ে বললে—দিব্যি হাসিভরা তার মুখ···আসুন···আপনার জন্য উনি অপেক্ষা করে বসে আছেন।

চমৎকার সাজানো ড্রয়িংরুম···ঘরে ঢুকে দেখি, আমার বাঞ্ছিতা বসে আছেন! রূপের প্রতিমা···তাঁর দুচোখ দীপ্তিতে জলজল করছে। মনে হলো ওঁর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে ঐ সুঠাম চরণ দুখানি বুকে চেপে ধরি··· ধরে তাতে বর্ষণ করি অজস্র চুম্বন···ওগো আমার চির-ঈপ্সিতা···চির-কামনার দেবী···

নিজেকে সম্বরণ করে' কম্পিত কণ্ঠে আমি বললুম— আমাকে ক্ষমা করবেন···আপনার বিরাম সুখে ব্যাঘাত···

—না···না···না··তিনি বলে উঠলেন—আপনি যে এসেছেন আমার চিঠি পেয়ে, এতে আমি কত খুশী হয়েছি। আপনি না এলে আমি নিজেই আপনার কাছে যেতুম।

আমার কাছে যেতেন! ভগবান, ভগবান···

চরণিকা বললেন—এ-ব্যাপারে আমাদের দুজনের সমান আগ্রহ···বুঝেচি।

বুঝেচেন! আমি চমকে উঠলুম।

বললুম,—আজ্ঞে, আপনি তাহলে সবই জানেন···মানে, এ ব্যাপার···

চরণিকা বললেন—জানি বৈকি···নিশ্চয় জানি। আপনার বেয়ারা জানোশ এসে আমার দাসী জুশিকে বলেছে···জুশি আমাকে সব কথা জানিয়েছে···এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে, বলুন!

আমি বললুম—আপনার মত আছে তাহলে?

—খুব মত আছে।···ভালোবাসা। আহা!

আবেশভরে চরণিকা চোখ বুজলেন···কম্পিত কণ্ঠে বললেন—ভালোবাসাকে কখনো ব্যর্থ মিথ্যা হতে দেওয়া নয়! দুনিয়ায় সব মেলে! দুর্লভ শুধু ভালোবাসা···তার অমর্য্যাদা···

কণ্ঠ তাঁর বাষ্প ভারে রুদ্ধ হলো।···একটু থেমে থেকে তিনি আবার বললেন—বিবাহ···এবং অবিলম্বে। ·আমি একান্তমনে তাই চাই ···

বিবাহ!···ভগবান···এ'কথা সত্যই আমি শুনলুম? না, এ আমার মনের বিভ্রম? আমি বললুম—বিবাহ?

—নিশ্চয়।

নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলুম না। তাঁর এক-খানি হাত আমি আবেগে চেপে ধরলুম নিজের হাতে··· তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললুম—আমার হৃদয়ভরা ধন্যবাদ মাদাম।

হাতখানা টেনে নিয়ে তিনি বললেন—ব্যাপার কি বলুন তো! আপনি এতখানি উচ্ছ্বসিত···

অপ্রতিভভাবে উঠে দাঁড়ালুম···বললুম—না ··কিছু না ··এমনি ··আমাকে ক্ষমা করবেন।

চরণিকা বললেন—না, না ··নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে! আপনার এমন বিচলিত ভাব···

আমি বললুম—তার কারণ, আপনি এক কথায় রাজী ···আমাকে বিবাহ করবেন অবিলম্বে···বললেন···

দুচোখে ভ্রূকুটি · চরণিকা বললেন—আপনাকে বিবাহ! এর মানে?

আমি!

আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। বললুম—কার বিবাহের কথা বলচেন তবে?

—কেন···জানেশির সঙ্গে জুশির···

চরণিকার কণ্ঠ বেশ সহজ শান্ত! উনি বললেন— —আমি শুনলুম ··জুশি এসে আমাকে বললে, ওরা দুজনে বিবাহ করতে চায়। জুশি অনাথা···এতটুকু বয়স থেকে আমার কাছে আছে···আমি ওকে দেখি ছোটবোনের মতো···ও যদি ঘরবাসী হতে পারে! শুনলুম, আপনি জানেশিকে টাকা কড়ি দেবেন···এবং এ টাকা দেবেন ওদের সংসার বাঁধতে!

আমি বললুন—ও···আপনি আমাকে এই জন্য চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—নিশ্চয়···এবং আমি চাই, এ বিবাহ অবিলম্বে। তার কারণ সামনের হপ্তায় আমি আবার বিবাহ করছি কি না!

কি করে' আমি আমার বাঞ্ছিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিলুম এর পর, জানি না! তবে বাড়ী এসে সবচেয়ে যে কথাটা পাথরের মতো মনে বেজেছিল···তা শুধু আমার খরচের হিসাব! বেয়ারার বিবাহে ঘটকালী করতে যে-টাকাটা খরচ করেছি কিন্তু না, সে-কথা আর কেন!*

(হাঙ্গেরিয়ান গল্প: আর্পদ বার্জিক)

কাশ্মীরে শ্রীঅমরনাথ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

দুই

শ্রীনগর সহরের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,২০০ ফিট হলেও গরম এখানে কম নয়। দিনে রাতে এখানকার উত্তাপ কলকাতার তুলনায় কিছু বেশীই হবে। কবে কে কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ আখ্যায় অভিহিত করেছিলেন তা জানি না, আমরা কিন্তু স্বর্গের কোন আভাসই এখানে পেলুম না। মাছি এবং মশার উৎপাত প্রচুর, ঝিলাম নদী একটা ছোট খালের মত, হাউসবোটের অধিবাসীদের উৎপাতে এর জল পরিষ্কার থাকতে পারে না। অবশ্য হাউসবোটে কমোড্ আছে বটে, কিন্তু একমাত্র স্থূল বস্তুটুকু ছাড়া যাবতীয় তরল পদার্থ, স্নান ও কাপড় কাচার জল, ফলের খোসা ইত্যাদি সমস্তই নদীতে বা ডাল হ্রদে পড়ে। আমাদের বোটে জলের কল এবং ইলেক্‌ট্রিক আলো ছিল। রাস্তা থেকে ঝোলানো তারে করে বিজলী গেছে এবং লম্বা রবারের পাইপ দিয়ে কলের জল গিয়েছে হাউসবোটের ছাতে রক্ষিত ট্যাঙ্কে, সেই ট্যাঙ্ক থেকে বোটের প্রত্যেক ঘরের সংলগ্ন স্নানাগারে জলের পাইপ গেছে। হাউসবোটের সামনে নদীর ধারের টিনের ঘরে হোটেলের ঠাকুর চাকররা থাকে এবং রন্ধনশালাও সেইখানেই। সেখান থেকেই হোটেলের আবাসিকদের খাবার দেওয়া হয়।

শ্রীনগরে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে কয়েকটি মাত্র। প্রথমতঃ রাজা হরি সিংহের রাজবাড়ী। বর্ত্তমানে রাজা আছেন নির্ব্বাসনে। যে রাজা হরি সিংহ কাশ্মীরের শত শত মাইল বিস্তৃত জলশূন্য ভূখণ্ডে উঁচু পাহাড়ীয়া নদীর জলধারাকে খাল কেটে নামিয়ে এনে উর্ব্বর ও শস্যপূর্ণ করেছিলেন, যে হরি সিংহ তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী শ্রীরামচন্দ্র কাকের সাহায্যে চুরী ও রাহাজানি একেবারে বন্ধ করেছিলেন, যে রাজশক্তি ১৯৩০-৩৩ সাল পর্য্যন্ত মুস্‌লিম লীগের কর্ণ্ণকর্ত্তা শেখ্ আবদুল্লাকে সায়েস্তা করতে দ্বিধাবোধ করে নি, সেই রাজা এবং মন্ত্রী ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালজীর কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়ে নিজেদের জন্মস্থান থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে দূরদেশে পড়ে আছেন। শুনলাম, রাজা হরিসিং আছেন বোম্বাই-এ এবং তাঁর মন্ত্রী আছেন কাশীধামে। এই রামচন্দ্র কাকের পরিচয় পেতে গেলে তাঁর ইংরাজী ভাষায় প্রণীত 'কাশ্মীর' নামক গ্রন্থ পড়তে হয়। গ্রন্থের ভাষার মধ্যেই রামচন্দ্রজীর দেশপ্রেমের পরিচয় মেলে, কিন্তু বোধ হয় তাঁর হিন্দু হওয়াটাই একটা বড় অপরাধ, সেইজন্য বৃদ্ধ বয়সে নিজের জন্মস্থানে মাথা গুঁজবার স্থানটুকুও তাঁকে দেওয়া হয় নি। পরিবর্ত্তে একচ্ছত্র আধিপত্য করছেন জনাব শেখ আবদুল্লা। যিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম তিন চারি বৎসর কাল উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দুর্ণাম কিনেছিলেন, পরে সমাজতান্ত্রিক বলে নিজেকে পরিচয় দিয়েছিলেন, শেষে ১৯৩৮ থেকে কংগ্রেসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এই শেখ আবদুল্লাই এখন প্রধান মন্ত্রী এবং কাগজে কলমে রাজা হচ্ছেন হরি সিংএর পুত্র করণ সিং। তার বয়স এখন বছর কুড়ি হবে। তিনি রাজবাটীতেই থাকেন এবং আবদুল্লা সাহেবের প্রেরিত কাগজপত্রে সহি দেন বলেই শোনা গেল।

ঝিলাম নদীর ওপোর বৃহৎ ও সুদৃশ্য রাজবাড়ী। রাজবাটীর মধ্যে এক সুন্দর মন্দির আছে। এ ছাড়া ঝিলামের তীরে তীরে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির ও কয়েকটি মসজিদ আছে। সহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে হরি পর্ব্বত নামক একটি ৫০০ ফিট উঁচু অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,৭০০ ফিট উঁচু পাহাড়ে পুরাতন কেল্লা। বর্ত্তমানে সেখানে যাওয়ার জন্য পারমিট লাগে, কিন্তু গিয়ে হতাশ হতে হয়, কারণ দ্রষ্টব্য সেখানে কিছুই নেই। শহরের অপরদিকে প্রায় হাজার ফিট উঁচু একটি পাহাড়ের ওপোর শঙ্করাচার্য্যের মন্দিরে বিরাট শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। সহরের অন্য দ্রষ্টব্য হচ্ছে শ্রীপ্রতাপ সিং মেমোরিয়েল মিউজিয়ম এবং তৎসংলগ্ন লাইব্রেরী। এই মিউজিয়ামে কাশ্মীরের শিখ ও ডোগরা রাজাদের আমোলের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র, মূল্যবান কাপড় শাল এবং পুরাতন ভাস্কর্য্যের কিছু কিছু রক্ষিত আছে। শ্রীনগরের পথে পথে কাশ্মীর আর্ট এম্পোরিয়মের বিজ্ঞাপন চতুর্দ্দিকে। আর্ট এম্পোরিয়মটি জি-পি-ওর নিকটে ইংরাজ আমোলের রেসিডেন্সি ভবনে স্থাপিত একটি সুবৃহৎ সরকারী দোকান। নানারূপ কাঠের, পশমের, সিল্কের, বেতের ও সোনারূপার, পিতলকাঁসার জিনিষ এখানে বিক্রয় হয়। বাজারের দামের তুলনায় এখানকার পণ্যের দাম কিছু বেশী। শ্রীনগরের অপর দ্রষ্টব্য ডাল্ হ্রদ। ঝিলাম নদী থেকে লক্ গেট দিয়ে একটি ছোট খাল আছে, তাকে বলে Lake approach; সেই খালের অপর প্রান্তে অর্থাৎ ডাল-এর মুখেও এক লক্ গেট। সেই গেটের অপরদিকে বিরাট এক জলাশয়, সেই জলাশয়টিই ডাল্ হ্রদ। এই হ্রদের মধ্যে ছোট বড় অনেক দ্বীপ আছে। দ্বীপের মধ্যে বড় বড় গাছ এবং স্থানীয় লোকের বাস্তুভিটাও আছে। ঝিলাম নদী, লেক এপ্রোচ্ এবং ডাল্ হ্রদের সর্ব্বত্রই অসংখ্য হাউস বোট বাঁধা আছে। এই বোটগুলির শতকরা ৯৯খানিতে লেখা আছে "To Let"। এবছর যাত্রী এতই কম যে, যে বোটখানির দৈনিক সরকারী কণ্ট্রোল ভাড়া ২৫৲ টাকা, সেখানে দৈনিক ২৲ টাকাতেও ভাড়া দিতে সেই বোটের মালিক স্বীকার করে। বলে, যা পাই তাই লাভ। এই সব জলপথে বেড়াবার জন্য শত শত ছোট ছোট আরামের নৌকা পাওয়া যায়, সেগুলিকে বলে 'শিকারা'। শিকারার ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় বারো আনা! এ বছর ছয় আনা আট আনাতেও পাওয়া গেছে, কারণ যাত্রীর অভাবে অধিকাংশ শিকারাই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে। এদেশে ফিরিওয়ালাদের উৎপাত বড় বেশী। এরা

পায়ে হেঁটে, ঠেলা গাড়ীতে এবং শিকারায় করে মাল নিয়ে ঘোরে। তাদের সঙ্গে দর করে জিনিষ কেনাও বড় শক্ত। একদিন দুপুরে বেলা বারোটায় সময় এক শিকারা এসে আমাদের হোটেলের হাউসবোটে ভিড়িয়ে দিলে। শাল, নামদা, কম্বল, কাঠের বাক্স এবং অন্যান্য অনেক জিনিষ দেখিয়ে নানা রকম দর বল্লে। তার মধ্যে একখানি নামদা আমরা পছন্দ করলুম। দর বল্লে ৩৫৲ টাকা। আমি তখন চালাক হয়ে গিয়েছি, দর দিলুম ৮৲ টাকা। সে গালাগালি করে মাল উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। তারপর সারাদিন ধরে সে যাতায়াত করতে লাগলো। বেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় সেই নামদা সে দিয়ে গেল সাড়ে বারো টাকায়। এই ভাবে দরদস্তুর করে এখানে জিনিষ কেনাবেচা হয়।

শ্রীনগর থেকে কাশ্মীরের দূরে দূরে নানা জায়গায় বেড়ানর বন্দোবস্ত আছে। একদিন টাঙ্গা করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম ক্ষীরভবানী নামক বিখ্যাত মন্দির দেখবার জন্য। এর দূরত্ব শ্রীনগর থেকে ১৭ মাইল। পথটি প্রধান মন্ত্রী শেখ আব্‌দুল্লার বাড়ীর পাশ দিয়ে। আব্‌দুল্লার বাড়ী দেখ্‌লুম। একখানি পুরাতন বাড়ী, যা ছিল শেখ আব্‌দুল্লার, বর্ত্তমানে শের-ই-কাশ্মীরের পৈতৃক ভিটে। সেই বাড়ীখানির আশে পাশে চার পাঁচখানি নতুন নতুন কংক্রীটের বাড়ী এখন উঠেছে। এগুলো সবই আব্‌দুল্লা সাহেবের সম্পত্তি। ক্ষীরভবানী দেবীমূর্ত্তি। বেশ প্রশস্ত চত্বরের উপর স্থাপিত। সিন্ধু নদের জলধারা এই মন্দিরের চারিদিক দিয়ে প্রবাহিত। অবশ্য এই সিন্ধুনদ অর্থে River Indus নয়, ইঁহা সিন্ধু নামেই কাশ্মীরে পরিচিত। রিভার ইণ্ডাস্ এখান থেকে বহু পূর্ব্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে গিয়েছে। এখানকার এই সিন্ধু নদের উৎপত্তি অমরনাথ পাহাড় থেকে। সেখানে এর নাম অমর গঙ্গা। সেখান থেকে এই নদের উৎপত্তি হয়ে নদটি যোজিলা গিরিবর্ত্মের উত্তর দিয়ে, বাল্‌টাল কঙ্গন, গন্ধর্ব্বলের ধার দিয়ে সাদিপুরে এসে ঝিলামের সহিত সংযুক্ত হয়ে ঝিলাম নামেই অভিহিত হয়ে বরমুলা, উরি, ডোমেলের ধার দিয়ে মজাফরাবাদ থেকে একেবারে দক্ষিণমুখী হয়ে মুরী, মীরপুর দিয়ে একেবারে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নেমে গেছে। কাশ্মীরের লোকালয়যুক্ত স্থানে সিন্ধুনদ বল্লে এই নদকেই বুঝায়।

ক্ষীরভবানীর পথে শ্রীনগর থেকে ১৪ মাইল দূরে গন্ধর্ব্বল একটি গ্রাম। এই গ্রামটি সিন্ধু নদের উপর অবস্থিত। এখানে ভালো ক্যাম্পি-এর জায়গা আছে। এখান থেকে যাওয়া হোল মানসবল নামক বিখ্যাত পদ্মফুলের হ্রদের পাশ দিয়ে সাদিপুরে। সাদিপুরে সিন্ধুনদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ঝিলাম নদী। স্থানীয় লোকের মতে এখানে সিন্ধুর সহিত ঝিলামের 'সাদি' অর্থাৎ বিবাহ হয়েছে। সেইজন্য এই স্থানের নাম সাদিপুর। সাদিপুরে সঙ্গমের স্থানে একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের ওপোর বিরাট এক চানার গাছের নিচে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। নৌকায় চড়ে যেতে হয়। নদীর তীরেও এক শিবমন্দির আছে। এদেশে ব্রাহ্মণ এবং মন্দিরের পাণ্ডাদের পণ্ডিত বলে। নদীতীরের শিবমন্দিরে পণ্ডিতরা ছিলেন। মন্ত্র পড়িয়ে পূজা করালেন, কিন্তু দ্বীপের ওপোর নেই। শুধু দর্শন করেই চলে এলুম। এদিনের যাত্রা এইখানেই শেষ হোল। অন্য দিন আমরা টুরিষ্ট বাসে Mogul Gardens বেড়িয়ে এলুম। চারিটি বাগানকে একত্রে মোগল বাগান বলে। সেই চারিটি যথাক্রমে হারোয়ান, শালামার, নিশাতবাগ ও চশমাশাহী। হারোয়ান শ্রীনগর থেকে ১২ মাইল দূরে, শালামার ৯ মাইল, নিশাত ৮ মাইল এবং চশমাশাহী ৫া৹ মাইল। হারোয়ানে একটি পরিষ্কার জলের হ্রদ আছে। এই হ্রদ থেকেই পাইপযোগে শ্রীনগরে কলের জল জোগান দেওয়া হয়। হারোয়ানের কাছেই হচ্ছে Fish Aquarium। এখানে ট্রাউট মাছের চাষ হয়। শালামার ও নিশাত বাগ্-এ ঝরণার খেলা খুব সুন্দর। চশমাশাহী অপেক্ষাকৃত খুবই ছোট। এই সব বাগানগুলি মোগল বাদশাহদের কীর্ত্তি। শালামার বাগানটি সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেছেন। নিশাতবাগ ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা আসফখানের দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিল। চশমাশাহী গঠন করেছেন সম্রাট সাজাহান ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে। এই সব বাগানগুলিতে ঝরণার খেলা খুব মনোরম। তা ছাড়া আপেল, বেদানা, আখরোট, আলুবোখারা ইত্যাদি ফলের গাছ এবং নানা রূপ ফুলের গাছও এই সব বাগানে প্রচুর আছে। বর্ত্তমানে কাশ্মীর সরকারের তত্ত্বাবধানে বাগানগুলি সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। এই সব মোগল বাদশাহগণ প্রতিবৎসর আগ্রা, দিল্লী ও লাহোর থেকে সদলবলে কাশ্মীরে আসতেন। তাদের ভয়ে স্বচ্ছল অবস্থার হিন্দুরা সহর ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে যেতেন। যে সব হিন্দুরা নিরুপায় হয়ে পড়ে থাকতো, মোগলদের কাছে চাকরী করতো, বাদশাহের অনুচররা তাদের কৃপা বিতরণ করতেন, তাদের মেয়েদের ওপোর অত্যাচারও হোত, তারপর শীত পড়ার পূর্ব্বেই বাদশাহ তার দলবল নিয়ে যখন চলে আসতেন, তখন পলাতক ধনী হিন্দুরা গ্রাম থেকে সহরে ফিরে এসে এই সব হিন্দুদের ঘৃণা করতো এবং শেষে তারা বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে যেত। এই ভাবে দুশো বছর ধরে ধীরে ধীরে আর্য্যভূম কাশ্মীর হয়েছে ইসলামে পরিবর্ত্তিত। তবে দরিদ্র জনসাধারণ মুসলমান হলেও হিন্দু রাজার প্রভাবে এখানে মুসলমানী ভাবধারা এতদিন পর্য্যন্ত উৎকটভাবে প্রকাশ পায় নি। তিন বছর আগে পর্য্যন্ত গোহত্যা নরহত্যার সমতুল্য অপরাধ বলে পরিগণিত হোত। এখন কি হয়, বড় কেউ বলতে পারলে না। কাগজে কলমে অবশ্য এখনও পূর্ব্বের আইনই বজায় আছে।

এই চারিটি বিখ্যাত বাগান ছাড়াও শ্রীনগরের ডাল হ্রদের পাশে পাশে আরও কয়েকটি ভালো বাগান আছে। পরদিন বেলা দশটায় আমরা এক শিকারা ভাড়া করে বেরিয়ে প্রথমেই যাই চিনার বাগে। তারপর রায়নাওয়ারীতে দুটি মন্দির দেখে নগিম বাগ, হজরতবলের বিখ্যাত কারুকার্য্যখচিত মসজিদ, নসিম বাগ, সোনা লঙ্কা ও রূপা লঙ্কা নামক অত্যন্ত ছোট দুইটি দ্বীপ, কবুতরখানা নামক অপেক্ষাকৃত বড় একটি দ্বীপ দেখে গাগ্‌রীওয়াল পয়েন্টে এসে শিকারা ছেড়ে টাঙ্গায় করে হোটেলে ফিরে আসি। শালামার ও নিশাত বাগ দেখার পর অন্যান্য বাগানগুলি নিতান্ত একঘেয়ে বলে মনে হয়, আর ডাল হ্রদের মধ্যবর্ত্তী এই দ্বীপগুলির

ভাসমান দ্বীপ আছে। অর্থাৎ গাছপাতা জমে পচে এক একটা চাপ্‌ড়া বেঁধে গেছে। সে জিনিষটা জলে নৌকার মত ভাসলেও তার ওপর ছোটখাটো অনেক গাছ হয়, মানুষ চলে ফিরে বেড়াতে পারে। এটা অন্যান্য হ্রদেও দেখেছি। মণিপুরের লোগ্‌তাক্‌ এবং উড়িষ্যার চিল্কাতেও ঠিক এই জিনিষই দেখা যায়।

শ্রীনগর থেকে দর্শকরা আরও অন্যদিকেও বেড়াতে যায়। শ্রীনগরের উত্তরে বিখ্যাত জায়গা জলমার্গ ও খিলান্‌মার্গ। শ্রীনগর থেকে ২৪ মাইল দূরে টাঙ্গমার্গ পর্য্যন্ত বাস যায়। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় ৪ মাইল দূরে গুলমার্গ, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৮,৭০০ ফিট এবং সেখান থেকে আরও ৪ মাইল দূরে খিলানমার্গ, উচ্চতা ১০,০০০ ফিট। এ জায়গাগুলি শ্রীনগরের তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা। এখানে কতকগুলি করে হোটেল আছে, আর আছে স্কী করবার উপযুক্ত বরফের জমাট চাপ। ভোরের সময় শ্রীনগর থেকে মোটরে টাঙ্গমার্গ গিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে গুলমার্গ ও খিলানমার্গ ঘুরে সন্ধ্যার পরে শ্রীনগরে ফেরা গেল। আর একদিনের যাত্রা হোল উলার হ্রদের দিকে। সেখানেও টুরিষ্ট বাস যায়। ডাল হ্রদ, মানসবল হ্রদ, উলার হ্রদ সর্ব্বত্রই পদ্মফুলের ছড়াছড়ি। শান্ত,শীতল, জনবিরল স্থান কবিদের পক্ষে মনোরম বটে, কিন্তু আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের কাছে বড়ই একঘেয়ে বলে মনে হয়।

শ্রীনগর থেকে উত্তর পূর্ব্ব দিকে আরও দুটো জায়গা আছে বেড়াবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সে দুটোর নাম হোল সোনমার্গ ও বাল্‌টাল্‌। বাল্‌টাল্‌ অবধি বাস্‌ যায়। এ জায়গাগুলো খিলানমার্গের মতই। সামান্য দু'চারিটা হোটেল, ছোট ছোট কাশ্মীরী গ্রাম, আর স্কী করার উপযুক্ত বরফের চাপ। এই বাল্‌টাল্‌ অঞ্চলটা মিলিটারীদের অধীনে। এই বালটাল থেকে অমরনাথও মাত্র ৯ মাইল দূরে। কিন্তু জায়গাটা মিলিটারীর অধীনে এবং রাস্তা এত বেশী বিপজ্জনক যে, একমাত্র পাব্বত্য পথে অভ্যস্ত মিলিটারী ছাড়া অন্য কোন যাত্রীকে এই পথে যেতে দেওয়া হয় না। যাত্রীদের যাওয়ার পথ তাই পহেলগাঁও দিয়ে। কিন্তু অমরনাথে কয়েকজন মিলিটারীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, যারা বালটালের পথ দিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন।

শ্রীনগর সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলা দরকার। এখানে স্থানীয় জিনিষপত্র ভারতের তুলনায় এখনও অনেক সস্তা আছে। ভালো খাঁটি ঘি ৪৲ টাকা সেরে পাওয়া যায়, দুধ টাকায় ৩৷৷০ সের। সে দুধের সঙ্গে বাংলাদেশের খাঁটি দুধেরও তুলনা করা চলে না। চাল, চিনি ও কেরোসিনের কট্রোল আছে বটে, কিন্তু আমাদের মত অচেনা এবং বিদেশী লোকেরও রেশান কার্ড করতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগে নি। রেশন দোকানে লাইন দিতেও হয় না, তা ছাড়া খোলা বাজারেও একটু বেশী দামে সব পাওয়া যায়। রেশনের মোটা চাউল নয় পয়সা সের। খোলা বাজারে চাউল মেলে আট-দশ আনা সের। কাশ্মীরীরা ভাত খায়, আটা তেমন পছন্দ করে না। তরী-তরকারীও খুব সস্তা। ভাল গোল আলু টাকায় আট সের। একদিন তিন আনার বাজার করেছিলুম, তাতে আলু, বাঁধা কফি, কড়াই শুটী, শালগম, বিট ইত্যাদি করে যা কিনলুম হিসেব করে দেখা গেল যে, কলকাতায় শীতকালেও তার দাম খুব কম করে ৩৲ টাকার মতো। এ দেশের গ্রামাঞ্চলে যাত্রীদের কাছেও ভালো আপেলের দাম দু' তিন পয়সা করে, যে আপেল কলকাতায় একটার দাম আট-দশ আনার কম নয়। গাছ-পাকা আলুবখরা ৵০ আনা সের, আঙ্গুর এ সময়ে নেই, কিন্তু শুনলুম ছয় আনা করে বিক্রী হয়। তবে আমদানী করা মালের দাম এ দেশে খুব বেশী। কারণ আমদানী মালের ওপর কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট গড়ে শতকরা ৩৫ টাকা হিসাবে শুল্ক নিয়ে থাকেন। কাশ্মীরে এখনও সেল ট্যাক্সের কোন ব্যাপার হয় নি। আর এ দেশের লোকেরা খাবারে এখনও তেমন কোন ভেজাল দিতেও শেখে নি, দুধেও বেশী জলটল দেয় না।

ক্রমশঃ

নির্মোক

দিবাকর সেনরায়

পার্কের কোণে খালি বেঞ্চের দেবদারু ঢাকা ছায়া,
আহ্বান করে অফিস-পীড়িত দুর্বল দেহমনে—
প্রাণ চঞ্চল ক্রীড়ারত শিশু—সাথে মাদ্রাজী আয়া,
রেলিংএর ধারে রিক্সওয়ালা বসে রোজগার গোণে।
চোখ বুজিতেই মনের সমুখে ভীড় করে এলো কারা—
সকলের মুখে একই কথা শুনি—'শোধ কি করেছ দেনা ?'
মনের গহনে অজানা বাউল বাজায় যে একতারা—
দৈন্য পীড়িত এ জীবনে যেন মনে হয় সুর চেনা!
মনে হয় যেন এ সুর ভুলেছি—(ভুলেছি কি তোমাকেও) ?
ভালোবাসা কেন কিনিতে পারিনি—সহজেই অনুমেয়—
হৃদয় ছিল তো বিত্ত ছিল না—তাই বেড়ে গেছে দেনা!
থাক্ থাক্ এই গ্রীষ্ম-নিশীথে গত স্মৃতি মন্থন,
গত জীবনের বিগত সুদিন—কি হবে সে সব ভেবে ?
কেতাবে পড়েছি—একবার গেলে যৌবন-কাল-ধন
ফেরেনাকো আর ; তাই কেবা বল ফিরিয়ে সেগুলো দেবে ?
যেটুকু পেয়েছি নয় মিছে নয়—অভিনয় তাহা হোক;
ছলনা করেও একবার যদি ভালোবেসে থাকো মোরে,
জীবন নাট্যে কিবা লাভ বলো খুলে দিয়ে নির্মোক—

ইতালীর পীঠস্থান

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আলিবাবার ভাই কাসেম দস্যু-গুহায় নিহত হবার পর তার স্ত্রী বাছা বাছা স্বপ্ন দেখেছিল পুনর্বিবাহের। অবশ্য সেটা সাহিত্যিক ক্ষীরোদপ্রসাদের কবি-কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু সকল দেশে সকল ধর্মের ধার্মিক নরনারী অনেক দৈব-স্বপ্নের কথা বলেছেন যেগুলা ঐতিহাসিক। আমি দৈব-বাণীর ফলে শাশ্বত সত্যের বিবৃতির কথা বলছি না। বহু বিশ্ব-বাণী ও বিশ্ব-ধর্মের তারা মূল এবং প্রামাণিক ভিত্তি। বেদ শ্রুতি। কোরাণের বাণী হজরতের অহি নজল বা সত্যের মাত্র চেতনা নয়, অবতরণ ও শ্রবণ। উক্ত আছে জয়দেবের গীত-গোবিন্দের-দেহি-পদপল্লব মুদারম্ দৈব-রচনা।

কুমারীর উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দির (ক্যারাভেগ্‌জিও)

আমি বলছি পীঠস্থানের কথা। প্রতি দেশে, বহু মন্দির, গির্জা, মসজিদ, পীরের আস্তানা ও পীঠস্থান বর্ত্তমান, যাদের প্রতিষ্ঠার মূলে আছে ভক্তের স্বপ্ন বা দৈব-নির্দেশ! ইতালীর পল্লীতে, সহরে, পথে ঘাটে সর্বত্র গির্জা এবং পীঠস্থান দৃষ্টি-পথে পড়ে। মাত্র ক্ষুদ্র দৈবস্থান নয়, বিশ্ব-বিশ্রুত ধর্ম ভবনগুলি সম্বন্ধেও ইতালীর গাইডরা স্বপ্ন ও দৈবনির্দেশের গল্প বলে। কেবল পরিদর্শকের মুখের কথা কেন, ইতালীয় ও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত বহু পুস্তকে সে সব স্বপ্ন, আকাশ-বাণী ও দিব্য-দৃষ্টির বিবৃতি আছে। সেন্ট-এঞ্জেলো রোমের সুদৃশ্য প্রকাণ্ড রোমক যুগের দুর্গ। সম্রাট হাড্রিয়ান ও তাঁর পরিবারের সমাধি-ক্ষেত্রের নাম বদল হয়ে কাস্টেল সেন্ট এঞ্জেলো নাম হয়েছিল পোপ গ্রেগরির দৈব-দর্শনের ফলে। ৫৯০ খৃঃ অব্দে রোমে ভীষণ মহামারী হয়েছিল। তার প্রশমণের জন্য পোপ স্বয়ং শোভাযাত্রার সম্মুখে থেকে নগর সঙ্কীর্ত্তন বার ক'রেছিলেন। হঠাৎ তীবর নদীর কূলের এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার শিরে তিনি দেখলেন সন্ত মাইকেল হাতের উন্মুক্ত অসি কোষের মধ্যে বন্ধ করছেন। তিনি

লরেটোর ধর্ম-মন্দির

সঙ্কেত বুঝলেন। সন্ত নরদেহে আবির্ভাব হয়ে অভয় বাণী শোনাচ্ছেন। তার পর মহামারীর মারাত্মক প্রকোপ প্রশমিত হল। হাড্রিয়ান সমাধির তাই নাম হ'ল কাস্ট্রেল সেন্ট এঞ্জেলো। তাঁর প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি দেখলাম সে সৌধ শিরে।

কারাভগ্‌জিও

আমরা একটি ক্ষুদ্র সহরে একটি সুন্দর গির্জা দেখেছিলাম—নাম ভারজিন ডি এপারিসন। ১৪৩২ খৃঃ

অব্দে কারাভগ ভ্রিয়োর একটি গরীব চাষার মেয়ে ঐ স্থলে ভারজিন মাতাকে দেখতে পেয়েছিল। সে কথা সে সকলকে জানালে। কিছুদিন পরে সেখানে হঠাৎ এক জলের উৎস উদ্ভূত হ'ল। মানুষ বুঝলে এটা লীলা উৎস। সে দৈব জল বহু রোগীকে নিরোগ করলে। দেশ-বিদেশ হ'তে লোক এলো তথায়। পরে মিলানের ডিউক সংবাদ পেলেন যে কুমারী মাতা স্বয়ং গিওভন্নেওকে আদেশ করেছেন তথায় গির্জা নির্মাণ করতে।

এ গির্জাটি সুদৃশ্য এবং সুগঠিত। এর বেদীটি বড় সুন্দর—কুমারীর আবির্ভাবের মূর্ত্তি আছে। প্রতি বৎসর ২৬শে মে এবং ২৯শে, সেপ্টেম্বর সেথায় মেলা হয়। ক্ষুদ্র

ধর্ম-মন্দিরের দক্ষিণ দিক

কৃষক কন্যার নিকট পবিত্র যীশু জননীর আবির্ভাব কি মিথ্যা স্বপ্ন?

সান্তিসিম্মা এন্নানজিয়াটা

ফ্লরেন্সে বহু পীঠস্থান এবং শিল্প-সম্পদ বিদ্যমান। সেদিন রবিবার। আমার হোটেলের সন্নিকটে ঘুরছিলাম। তিনটি মেয়ের হাত ধরে এক জননী পথপার হবার চেষ্টা করছিলেন। আমি হেঁসে একটিকে ধরলাম, পথের পরপারে নিরাপদে পার করে দিলাম। মহিলা হেঁসে বল্লেন—গ্র্যাসিও।

মহিলা ইংরাজি জানতেন। তিনি যাচ্ছিলেন, সান্তিসিম্মা এন্নানজিয়াটা গির্জায়।

ঐতিহ্য এবং শিল্প-সম্পদবহুল অনেকগুলি ধর্ম ভবন আছে ফ্লরেন্সে। ইতালীয় ভাষায় ফ্লরেন্সের নাম ফিরেঞ্জি। (Firenzie) ফিরেঞ্জিবাসীর নিকট ঐ গির্জাটিই বিশেষ জনপ্রিয়। আমি মহিলার নিমন্ত্রণে গির্জায় গেলাম। বাহিরের গঠন সাধারণ। ভিতরের বেদীটি রৌপ্য-নির্মিত। এর শিল্প-শোভা অনির্বচনীয়। অত বড়, অমন সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত বেদী বুকে করে আছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গির্জা, বাহির হ'তে সে কথা মনেই হয় না।

কিন্তু এ গির্জার পবিত্রতার অন্য কারণ বিদ্যমান। বাইবেল পাঠক মাত্রেই জানেন সেণ্ট লুক প্রথম অধ্যায় ২৬ শ্লোক হতে ৩৮ শ্লোকে কুমারী মেরীর সাথে নৈসর্গিক দূত গ্যাব্রিয়েলের সাক্ষাতের সমাচার আছে। যোশেফ পত্নী মেরীর নিকট আবির্ভূত হ'য়ে গ্যাব্রিয়েল তাঁকে সংবাদ দেন যে ঈশ্বরের পুত্র তাঁরই অনুকম্পায় শ্রীমতীর গর্ভে উদয় হবেন। এই সমাচার দান বা বিজ্ঞপ্তিকে ইতালী ভাষায় বলে অন্নানজিয়ার ইংরাজিতে বলে—এন্নানসিয়েসন। এনাউন্‌স্‌ নান্‌সিও সংস্কৃত নবতি বা নন্দতি শব্দের সঙ্গে এনানসিয়েসনের ধাতুগত সম্বন্ধ। ইতালীর প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ, বহু চিত্রকরের এনানসিয়েসন চিত্র সারা য়ুরোপের চিত্র-সংগ্রহ-শালাগুলিতে বিরাজিত। পবিত্র কুমারী বধূ অকস্মাৎ নিজের গর্ভ সমাচার পেয়েছেন। তাঁর মুখ-ভঙ্গি এক এক চিত্রকর এক এক ভাবে এঁকেছেন। গর্ভের সন্তানের মাহাত্ম্যকে কেহ কুমারীর উজ্জ্বল স্বর্গীয় কান্তিতে প্রকট করেছেন, কেহ ফুটিয়েছেন পবিত্রতার পট-ভূমিতে সাংসারিক সঙ্কোচ ও লজ্জা। সে সব চিত্রের পরিচয় পরে কোনোদিন দিব।

বলছিলাম ফ্লোরেন্সের গির্জার কথা। ৮ই সেপ্টেম্বর ১২৫০ খৃঃ অব্দে ফ্লোরেন্সের উচ্চবংশসম্ভূত সাতটি যুবক ঐ স্থলে অকস্মাৎ পবিত্র কুমারীর আবির্ভাব দেখলেন। তারা বংশ, মান, ধন ত্যাগ ক'রে সেথায় একটি মঠ নির্মাণ ক'রে সন্ন্যাসীরূপে বাস করতে আরম্ভ করলেন। একটি গির্জা নির্মিত হ'ল তথায়। সন্ন্যাসীরা গির্জা-প্রাচীরে এনানসিয়েসনের চিত্র অঙ্কনের ভার দিলেন এক চিত্রকরকে।

দূত গ্যাব্রিয়েল এবং কুমারীর দেহ অঙ্কন শেষ করলে। অবশিষ্ট রহিল মুখ দু'খানি।

যখন এঞ্জেলের মুখ আঁকবার জন্য সে তুলি হাতে নিলে, কে যেন তার হাত ধরে গ্যাব্রিয়েলের মুখটি এঁকে দিলে। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চিত্রকর বল্লে—আমি তো স্বর্গীয় দূতের মুখ আঁকিনি। ঈশ্বরই আমাকে মাত্র যন্ত্র ক'রে সে মুখখানি এঁকে দিয়েছেন।

এবার ভারজিন আঁকবার পালা। ক্লান্ত শিল্পী তুলিকা হাতে নিয়ে কাতরে নিদ্রাভিভূত হল। যখন ঘুম ভাঙ্গলো সে বিস্মিত হয়ে দেখলে যে কুমারীর মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হ'য়েছে। তাঁর পবিত্র আঁখি দুটি স্বর্গপানে চাওয়া। দেহ হতে অসম্ভব লাবণ্য বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে লোক ছুটলো এই স্বর্গীয় লীলা দেখতে। একশত বৎসর নাকি দৈবের পর দৈব শুভ নৈসর্গিক ঘটনা ঘটেছিল ঐ ধর্ম্ম-ভবনে।

মেমসাহেব বল্লেন—আজিও প্রায় সব ফিরেঞ্জির লোক এই শুভস্থলে আসে পুত্রকন্যার নামকরণ ও দীক্ষার জন্য।

তিনি আলাবাস্তারের পাত্র হ'তে জল নিয়ে গায়ে ক্রশ আঁকলেন, কুমারীরা আঁকলো। তার পর বেদীর সম্মুখে নতজানু হ'লেন। বালিকারাও প্রার্থনা করতে বসল।

আমি বাহিরে এলাম। মনের অন্তস্তল থেকে গুমরে উঠ্‌লো গান—তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

সত্যই পুণ্যাত্মা চিত্রকর।

লোরেটো

কলিকাতার বালিকা শিক্ষাসদন—লোরেটোর নাম সু-বিদিত। কিন্তু আসল লোরেটোর ইতিহাস এ-দেশের বেশী লোক জানেনা। এই পীঠস্থান ইটালীর মার্স প্রদেশের একটি শৈলে অবস্থিত।

১০ই মে ১২৯১ সালে মুস্লিমরা প্যালেষ্টাইনে অভিযান করে। সেখানে গ্যালিলি নজরেতেল প্রভু যীশুর ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। শিশুকালে হেরডের ভয়ে তাঁকে মিশরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে ত্রিশ বৎসর বয়স অবধি মাতা মেরীর এই গৃহে তিনি বাস করতেন। বিশেষ মেরীর ভবন বিজয়ী আরবের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে নিরাপদ রাখা যায় না। প্রবাদ আছে, রাতারাতি এঞ্জেলরা সেই বাড়িটিকে তুলে দালমেসিয়ার তারসেত্তো পাহাড়ে এনে স্থাপিত করলে। একথা ব্যক্ত হ'লে তখনকার পোপ এবং ডিউকেরা লোক পাঠিয়ে অনুসন্ধান ক'রে বুঝলেন সত্যই এ পবিত্র পরিবারের গৃহ। দূতেরা ফিরে এসে সমাচার দিলে যে গ্যালিলিতে তারা বাড়ির ভিত্তি দেখে এসেছে—বাড়ি ঠিক সেই মাপের।

কিন্তু তিন বৎসর পরে আবার পবিত্র গৃহ তারসেত্তো হ'তে উধাও হয়ে অড্রিয়তিকের কূলে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করলে। সে স্থানটি ছিল দস্যু-অধ্যুসিত। সেখান থেকে এঞ্জেলরা বাড়িটি সরিয়ে নিয়ে কিছুদূরে এক স্থানে স্থাপন করলে।

ক্যাস্টেল সেন্ট এঞ্জেলো

সে জমির মালিক সাইমন ও স্টেফেন—দুই ভাই। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কেবল ভারতের অভিশাপ নয়। কে এই পবিত্র গৃহের মালিক হবে, তাই নিয়ে দুই ভ্রাতার কলহ বেশ জমে উঠ্‌ল।

পরের জমিতে এমন সম্পত্তি রাখা বিপদ। তাই চতুর্থবার এঞ্জেলরা বাড়িটিকে এনে লোরেটোর এক পথের মাঝে বসিয়ে দিল। লোরেটো অড্রিয়তিকের সন্নিকটে।

তার পর দিক্‌দিগন্তে এ সমাচার ছড়িয়ে পড়ল। স্থানটি হ'ল পীঠস্থান। পরে ধনী এবং শিল্পীদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাকে ঘিরে এক প্রকাণ্ড গির্জা গড়ে উঠ্‌লো। তার ভিতরে শিল্পীরা অপরূপ মূর্ত্তি গড়লে, প্রাচীরে সুললিত

পরিহিতা মাতা মেরীর যে মূর্ত্তি আছে তার নকল সর্বত্র দেখা যায়। কলিকাতা লোরেটোতেও মূর্ত্তি ঐরূপ আছে।

এ স্থানের মাহাত্ম্যের খ্যাতি খৃষ্টীয় জগৎব্যাপী। দলে দলে রোগী আসে রোগ সারাতে। একখানা সাদা ট্রেণ কেবল রোগীদের জন্য আসে লোরেটোর সন্নিকটের ষ্টেসন এন্‌কোনোয়।

উক্ত আছে যে হেথায় প্রামাণিক দলিল আছে। সমসাময়িক লোকের সাক্ষ্য হতে এসব দৈবঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লোরেটোর সেই বাড়ি এখন বৃহৎ প্রাচীর ঘেরা প্রাসাদের মাঝে। সেখানে লেখা আছে—

"Hic Verbum Caro factum est."

প্রবাদ-বাক্য

ইটালীর সকল পীঠস্থানের বর্ণনা এ স্থলে অসম্ভব। বোলোনা, প্রামাণিক সত্য ঘটনা। পাদুয়া, সিয়েনা প্রভৃতি সকল সহর এবং বহু গ্রাম দৈব-স্বপ্ন, দেব-দর্শন, দেব-প্রকৃতি পুরুষ ও নারী, যাঁরা পরে সন্ত বিবেচিত হয়েছেন এবং অসাধারণ কাহিনী, ঐতিহ্য, কিম্বদন্তী প্রভৃতির গর্ব করে। ফ্রান্স এবং স্পেনেও তাদের অভাব নাই। ফ্রান্সে একদিকে যেমন বিলাসিতা এবং যৌন দুর্নীতির কথা শুনা যায়, অন্যদিকে তেমনি দৈবে বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল—বিশেষ মহিলা মহলে। আমি ইতালী বা ফরাসী দেশে যখনই যে কোনো ধর্ম-ভবনে প্রবেশ করেছি, দেখেছি অন্ততঃ দু'চারটি নারী নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করছে।

প্রটেস্টান্ট এ সব বিশ্বাসকে আমল দেয় না। আমাদের দেশে হিন্দু বা মোস্লেম পীঠস্থান সম্বন্ধে যারা প্রকাশ্যে নাসিকা কুঞ্চন করে, তারাও অনেকে নিরালায় একবার পীঠ-স্থানে একটা প্রণাম বা কুরনিস্ করে। কালীঘাটে, কাশীধামে বা আজমিরে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রকাশ।

শিক্ষার বোঝা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ, বি-টি, ডিপ-এড (এডিনবরা ও ডাবলিন)

হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানদের মালবহা গোরুর গাড়ীর সঙ্গে এখনকার শিক্ষার বোঝার কতকটা তুলনা চলতে পারে বলে মনে হয়। ফলভারাক্রান্ত তরুর মত এইভাবে ক্লান্ত স্কুলের ছেলেমেয়েদের উপর সকলেরই কমবেশী চোখ পড়ে; কেউ কেউ বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি দেখে অবাক হয়ে থাকেন। মোট কথা মালগাড়ীর গোরুর অবস্থার উপরে কতকটা কড়া নজর রেখে থাকেন Prevention of cruelty to animals society, কিন্তু Prevention of cruelty to children Societyর শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ আমল আছে বলে আমাদের জানা নেই। কাষ্যতঃ ঘি দুধ মাছের সংশ্রবহীন খাদ্যের উপর নির্ভর করে জগতের সর্বতোমুখী জ্ঞানভাণ্ডারে জ্ঞান আহরণে বেশীর ভাগ জীবনী শক্তি ক্ষয় করে। এই উগ্র জলবায়ুর দেশে, নানা আধি ব্যাধির প্রভাবের মাঝে স্কুলের সেই ক্ষুদে ভবিষ্যৎ 'প্রডিজিটী'কে মরণের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাঁচতে হয়, তারপর তার ভবিষ্যৎ অন্নসংস্থানেরও কোন নিশ্চয়তা নেই—যদি তার মামার জোর না থাকে, তার গুণপনা, দেশের জন্য ত্যাগ বা সমর শিক্ষা—কিছুই কাজে আসে না। 'সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এ দেশে' এই গানের উল্টা মানেটাই তার মনে জাগতে থাকে। এদিকে গম ভাঙান, ঔষধ আনা, জলধরা প্রভৃতি হতে সব কিছু বাড়ীর কাজও তাকেই করতে হয়। সেকালের সেদিন আর নেই যে সুশীল ও সুবোধ হয়ে সে সব সময়েই লেখাপড়া, নয়তো খেলা-পড়ায় মন দিবে।

তার বোঝা বহনযোগ্য করতে আমরা প্রথমেই বলতে পারি ইংরেজীতে তাকে মোটা ১০০ নম্বরের মত বোঝাই দিলেই তো চলে, আর কিছু কমেও তার পাশ মিলতে দোষ কি? ইংরেজী তোমার ঘরের ঠাকুরের মত চিরদিনই আমাদের পূজা পাওয়ার আশা করতে পারে না। কাকথা ইংলণ্ডের ইতিহাসের। অঙ্কের কথা পরে আসে। অবশ্য পূরাপূরি আঙ্কিক শক্তির দরকার জীবনের সব ক্ষেত্রে হয় না; দেখা গিয়েছে, শুধু অঙ্কের দক্ষতার অভাবে অনেক মৌলিক চিন্তাশীল ছেলে বিজ্ঞান পড়তে পায় না। এবিষয়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ পূরাপূরি অঙ্কজ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, কেউবা কাজচালান মত অঙ্ক শিখে থাকে—অবশ্য তাদের পাঠ্যতালিকার ব্যবস্থা মতই। আমার মনে হয় ছেলেদের মধ্যেও ন্যূন আবশ্যকমত অথবা পূরাদস্তুর পাঠের ব্যবস্থা অঙ্কের বেলায় চালু করা বিশেষ অসমীচীন নয়। এতে অন্য প্রাদেশিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় বিশেষ ক্ষতি দেখা যাবে বলে মনে হয় না। অথচ অঙ্কে বদ্ধি

খোলে না এমন একটা ছেলের দল বেশ স্বাধীনভাবেই নিজ বাছাই মত বিষয় পড়ে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিজভাবেই উন্নততর করবার সুযোগ পায়। তারপর ছেলেমেয়েদের স্কুলে প্রতি দিনের 'আটক' ও পাঠের সময় কমান যেতে পারে—তারা বিশ্রামের দিকটা যাতে খেলায় দিতে পারে : বিশেষতঃ ছোট ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ৩ টার বেশী স্কুলে রাখা উচিত নয় ; ৮ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের দৈনন্দিন স্কুল সময় ২টা পর্য্যন্ত হওয়া উচিত ; ফ্যাক্টরী সময়ের নিয়ম স্কুলমাষ্টারের উপর খাটাতে যাওয়া চলে না, তার খাটনি কমাবার ভয়ে ছেলে মেয়েদের দুর্ভোগ কেন ? দুঃসহ গরমের সময় গ্রীষ্মের ছুটির আরো পরে ২।১ মাস সকালে স্কুল করা মন্দ নয়—যদিও অন্যান্য অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ কাজ করতে অধ্যক্ষদের কিছুটা অসুবিধা হতে পারে তাতে। এতে শিক্ষার একঘেয়েমি কমিয়ে আনন্দ খানিকটা বাড়ান যায়। তবে ছাত্রশিক্ষক উভয়েরই অন্ততঃ সকালবেলার সদ্ব্যবহার শিখতে হবে। বিলাতে ছেলেমেয়েদের খেলা ও বেড়ানর মধ্যে দিয়ে আনন্দের দিকটার উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়। সেখানে রাগবি প্রভৃতি স্কুলে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার অর্দ্ধ-দিবসের কাজ হয়, কেন না ছেলেমেয়েরা দ্বিতীয়ার্দ্ধে বেশী খেলার আনন্দ উপভোগ করতে পাবে। সেখানে নীচের ক্লাসে অর্থাৎ শিশু-বিভাগে ২টার বেশী স্কুলে কাজ হয় না, তদূর্দ্ধ ক্লাশে ৩টার কাছাকাছি ছুটি হয় ; আর আমাদের টিফিন বা অবকাশের সেরকম ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও এ উগ্র জলবায়ুর দেশে ছেলে মেয়েদের "ঘানিতে দেওয়া"র মত ৪টা, কোন কোন স্থলে ৪।৪৫ পর্য্যন্তও রাখা হয় জ্ঞান বাড়বে ও পাকবে বলে ; কিন্তু এতে যে 'পিণ্ডিচটকান' হয় তা আমাদের মাথায় আসে না ; এজন্য আজ শিক্ষার জাঁতা হতে বছরে বছরে কত না দুর্বলাঙ্গ অপরিপুষ্ট দেহ-মন ছেলে-মেয়ে বার হচ্ছে, যারা জীবন সংগ্রামে অন্য প্রাদেশিক বা দেশিকদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না ; এ দোষ অঙ্ক বা ইংরাজীতে অথবা সকল বিষয়ে জ্ঞানের 'মাপ' বা ষ্টাণ্ডার্ড' কম—অভিনবত্বের ব্যাণ্ড বাজনা বাজালেও আমরা অনেকটা পিছনেই পড়ে আছি, গোরুর-গাড়ীর পুরাতন 'দিকেই' চলেছি, কারণ' সাত খাপরার ছাগলে'র মত আমাদের মনের মুক্তি এখনও আসে নি।

অন্যান্য প্রগতিশীল স্বাধীন দেশের মত শিক্ষার প্রকৃত আনন্দ আনতে সরকার, জনসাধারণ, মিউনিসিপ্যালিটি, জমিদার-ব্যবসায়ী-কর্ম্মী প্রতিষ্ঠানাদি সকলেরই সম্মিলিত ত্যাগ ও আপ্রাণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ছেলেমেয়েরাই জাতির সাধারণ প্রধান সম্পত্তি ও ভবিষ্যৎ'-এর সত্যতা উপলব্ধি করে জাতীয়তার গঠনে এখন আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে ; শিক্ষা দেশের অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির অপেক্ষা করে ; শিক্ষার ত্রিবেণী' উন্মোচনের পূর্ব পর্য্যন্ত আমাদের পরীক্ষার মাপকাটিটী শুধু উঁচু করে ধরে বসে থাকলেই চলবে না, জীবনের স্তরে স্তরে শেষ শিক্ষাক্ষেত্রে ধীরে ও সুবুদ্ধির সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়ঃ।

নিজেরে শুধাও

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নিজেরে শুধাও একলাটি নির্জ্জনে,
পেয়েছ কি তুমি ভালবাসিবার দাম,
কোথা কেহ নাই—ভেবে দেখ মনে মনে
পূর্ণ হয়েছে তোমার মনস্কাম ?
দিতে দিতে তুমি দিয়েছ অনেক খানি
বিনিময়ে তুমি কি পেয়েছ বুঝ নাই,
নারী মহিমায় তুমি যদি মহারাণী
তাহার যোগ্য আসনে পেয়েছ ঠাঁই ?
সুন্দরী তুমি তোমার মুখের 'পরে
যে দেখিল শুধু রূপের মহোৎসব
দেখিল না তব যে বেদনা অন্তরে
দুঃখ দহনে মানিয়াছে পরাভব।
ভাণ্ডার তব দিলে যে উজাড় ক'রে
তবে বল আজ তোমার সাজান ঘরে
ম্লান গোধূলির ছায়া কেন পড়িয়াছে ?
তুমি জানো ঠিক ? তোমারে আড়াল করি'
দস্যু করেনি লুণ্ঠন তব ধন ?
মাটি হ'তে যাহা কুড়ালে আঁচল ভরি'
তাই নিয়ে বৃথা ভরিতে চেয়েছ মন।
নারী মহিমায় একবার জাগো যদি
বিচার করিতে পারিবে অপরাধের,
মনেরে ভুলায়ে চলিবে কি নিরবধি,
সে বুঝার ভুল বোঝা হ'বে জীবনের।
হিসাবের ফাঁকি একদিন পড়ে ধরা
তোমরা যে নারী ক্ষমা গুণে দুর্ব্বল,
নিজেরে শুধাও—পুলকে ভুবন ভরা

ভারতরাষ্ট্রে নির্ব্বাচন—

ভারতরাষ্ট্রে পার্লামেণ্টে ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। কমনওয়েল্‌থ ভুক্ত স্বায়ত্তশাসনশীল, বিভক্ত দেশের ভারতরাষ্ট্রে নূতন শাসন বিধান গৃহীত হইবার পরে ইহাই প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে প্রথম নির্ব্বাচন। যদিও দেশে আজও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নহে—সুতরাং অশিক্ষিতের সংখ্যা ভয়াবহরূপ অধিক এবং সেই জন্য প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটে নির্ব্বাচনের সার্থকতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে ও থাকিবে, তথাপি এই নির্ব্বাচনের গুরুত্ব যে অসাধারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নির্ব্বাচন পরিচালিত করিতে সরকারের ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগের জন্য ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাও যে অন্ততঃ ১০ কোটি টাকা, তাহা অনুমান করা যায়।

নির্ব্বাচনে যে দুর্নীতির ও অনাচারের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও যেমন অস্বীকার করা যায় না, নির্ব্বাচনফল তেমনই অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। সরকারের প্রধান মন্ত্রী—সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা বলিয়া একটি রাজনীতিক দলের দলপতির পদ অধিকার করায় হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনে দুর্নীতির দোষ ঘটিয়াছে ; আবার তিনি যে দলের দলপতি হইয়াছেন—দলের জন্য প্রচার-কার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন, অনেক আশা দিয়াছেন, প্রতিশ্রুতিতে কল্পতরু হইয়াছেন, সেই দল ক্ষমতা, অর্থ ও সঙ্ঘবদ্ধতা লইয়াও যে পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোন কোন প্রদেশে তাঁহার (কংগ্রেস) দল আবশ্যক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। মাদ্রাজের নির্ব্বাচনফল বিশ্লেষণ করিলে এই কথার যথার্থ্য সপ্রকাশ হইবে। মাদ্রাজের মোট ভোটারের সংখ্যা—২,৬৮,৯৮,৯০২ এবং মোট আসনের সংখ্যা (রাজ্য পরিষদে) ৩৭৫। তথায় প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা মোট—১,৯২,২৯,৬৮৭। তথায় মোট ১৫টি দল হইতে প্রার্থী মনোনীত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজে—

(১) কম্যুনিষ্ট দলের ১৩১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৯ জন—২৪,২০,৫২৬ ভোট পাইয়া জয়ী হইয়াছেন।

(২) কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের ১৪৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৪ জন—১৯,২২,৯১৬ ভোট পাইয়া জয়ী হইয়াছেন।

(৩) কংগ্রেস দলের ৩৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫২ জন—৬৬,২৪,৪২২ ভোট পাইয়া জয়ী হইয়াছেন।

মোট আসন লাভ—

কংগ্রেস	১৫২টি
বিরোধী দলসমূহ	২২৩টি

মোট ভোট পাইয়াছেন—

কংগ্রেস	৬৬,২৪,৪২২
বিরোধী দলসমূহ	১,২৬,৭৫,২৬৫

কংগ্রেসবিরোধী দলসমূহে ঐক্য স্থাপন সম্ভব না হওয়ায় কংগ্রেস অপেক্ষাকৃত অল্প ভোট পাইয়াও অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক আসন লাভ করিয়াছে। এই জয়ের আর একটি দিক আছে—গণমত যদি ভোটে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে অধিকাংশ লোক কংগ্রেসবিরোধী।

ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে কংগ্রেসের পরাজয়ই ঘটিয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে অবস্থা অন্যরূপ। তথায় মোরারজী দেশাই পরাভূত হইলেও তথায় কংগ্রেসের জয় সুস্পষ্ট। তথায় কংগ্রেসী জয় বর্ত্তমান পরিষদে জয় অপেক্ষাও অধিক। কিন্তু সে প্রদেশেও কংগ্রেসের পক্ষে ভোটের সংখ্যা কংগ্রেসবিরোধী পক্ষের ভোট অপেক্ষা ৩.৯—বহু প্রার্থীর মধ্যে ভোট বিভক্ত হওয়াই কংগ্রেসের জয়ের কারণ। কংগ্রেস শতকরা ৮৬টি আসন লাভ করিলেও মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৮টির অধিক পায় নাই। আবার সোশ্যালিষ্টদল শতকরা ১১টি মাত্র ভোট পাইয়া শতকরা আড়াইটি আসন লাভ করিতে পারিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের নির্ব্বাচন-ফল কংগ্রেসের দলের পক্ষে মাদ্রাজের ফলের মত শোচনীয়ও নহে, বোম্বাই প্রদেশের ফলের মত উল্লাসজনকও নহে। তবে পশ্চিম বঙ্গেও যে কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেসবিরোধী মত বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহা কলিকাতা কেন্দ্র হইতে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে সপ্রকাশ ও সুপ্রকাশ। ঐ ৪টি কেন্দ্রের মধ্যে কেবল একটি কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী জয়ী হইতে পারিয়াছেন ; অবশিষ্ট কেন্দ্রত্রয়ে নির্ব্বাচিত—

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কম্যুনিষ্ট)

মেঘনাদ সাহা (কম্যুনিষ্ট-সমর্থিত)

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (জনসঙ্ঘ)

এই ৩টি কেন্দ্রেই কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীদিগের পরাজয় শোচনীয়।

বোম্বাই প্রদেশে স্বরাষ্ট্র-সচিব মোরারজী দেশাইএর পরাজয়ের উল্লেখ অন্য প্রসঙ্গে করিয়াছি। মাদ্রাজে পরাভূত সচিব—

কুমারস্বামী রাজা (প্রধান-সচিব)
হামিদ আলী (সহকারী সচিব)
গোপাল রেড্ডী (অর্থ সচিব)
কালা ভেঙ্কট রাও (স্বাস্থ্য-সচিব)
ভক্তবৎসলম (পূর্ত্ত-সচিব)
মাধব মেনন (শিক্ষা সচিব)
চন্দ্র মৌলী (স্বায়ত্ত-শাসন সচিব)

এইরূপ ৭ জন সচিবের পরাজয় পশ্চিম বঙ্গেও হইয়াছে।

রাজস্থানে প্রধান সচিব জয়নারায়ণ ব্যাস্ও পরাজিত হইয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গে পার্লামেন্টে সদস্য নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলের শ্রীমতী রেণুকা রায়ের হিন্দু মহাসভার মনোনীত প্রার্থী নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পরাজয়ও উল্লেখযোগ্য।

ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনা—ইহার মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় লোকের মনে সন্দেহ উদ্ভূত হইয়াছে। যে সরকার ভোটদাতাদিগের অঙ্গুলীতে কালীর দাগ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা ভোটদাতৃগণের সাধুতায় সন্দেহ করেন, ভোটদাতারা যদি সেই সরকারের সাধুতায় সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাহা কখনই অসঙ্গত বলা যায় না—বিশেষ, সরকারের কর্ত্তারাও ভোটদাতা ও ভোটপ্রার্থী। আবার ভোট গ্রহণের ও ভোটগণনার মধ্যবর্ত্তী সময়ে ব্যালট বাক্সগুলি সরকারের জিম্মায় ছিল।

নির্ব্বাচনে কতকগুলি নূতন দলের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে। এই কতকগুলি অসন্তুষ্ট লোক কৃষক মজদুর প্রজা দল গঠিত করিয়া নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা সমর্থকদিগের সন্দেহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হিন্দু মহাসভা, মুসলেম লীগ ও (মাদ্রাজের) জাষ্টিস পার্টি পুরাতন প্রতিষ্ঠান। সুভাষচন্দ্র ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে যে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠিত করিয়াছিলেন, তাহা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। রামরাজ্য পরিষদ ক্ষণজীবী দলের প্রতিষ্ঠান। জনসঙ্ঘ নূতন প্রতিষ্ঠান এবং তাঁহার নির্ব্বাচনী সফরে ও অন্যত্র প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু হিন্দু মহাসভা ও জনসঙ্ঘের উদ্দেশে বিষোদ্গার করিতে যেন ব্যাকুল ছিলেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই দলের নেতা এবং ইহা সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান।

নির্ব্বাচনে বামপন্থী দলসমূহের সমন্বয় সম্ভব হয় নাই। তবে কোন কোন স্থানে মার্কসিষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক কম্যুনিষ্ট দলের সহিত নির্ব্বাচনী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বামপন্থী দলগুলির প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত মুখপত্রের অভাব। তাহাদিগকে সভায় বক্তৃতার দ্বারা যে অসুবিধা যথাসম্ভব অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

প্রার্থীর পক্ষে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়া—ধনী ব্যতীত অপরের পক্ষে—বিড়ম্বনা, তাহার উল্লেখ আমরা গতবার করিয়াছি। তিনি দেখাইয়াছেন, আইন যেরূপ তাহাতে ধনী প্রার্থীর পক্ষে নির্ব্বাচন পিটিসনের ভয় দেখাইয়া সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরস্ত করাও সম্ভব। ভোটের বৈধতায় আপত্তি করিলে যে প্রতি ভোটের জন্য ১০ টাকা জমা দিতে হয়, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতায়- গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য—ভবিষ্যতে নির্ব্বাচনী নিয়মের সংশোধন করিতে হইবে।

এ বার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিদেশে গবেষণা হইয়াছে। ইংলণ্ডে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন' স্বীকার করিয়াছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল জয়ী হইলেও কম্যুনিজম যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। যদি কম্যুনিষ্টরা ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারত রাষ্ট্রের ক্ষতি করে, তবে তাহা অসহ্য হইবে। বিশেষ তথায় দীর্ঘ সমুদ্রকূল আছে—সুতরাং তথায় কম্যুনিষ্টদিগের আগমন হইতে পারে এবং তথায় আণবিক বোমার উপকরণ মোনাজাইট পাওয়া যায়। ঐ পত্র ভারত সরকারকে তথায় সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিয়া বিপদের আশঙ্কা দূর করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ভারতের সরকার হয়ত বৃটেনের সংবাদপত্রের মতের মর্য্যাদা রক্ষায় অবহিত হইবেন।

রুশিয়ায় 'ট্রুড' পত্র বলিয়াছেন—কম্যুনিষ্ট দল ও তাহার নেতৃত্বে সংহত দলগুলির জয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ পত্রের মতে—প্রতিযোগিতা ২ দলে হইয়াছে—"সরকারের দলে" আর কম্যুনিষ্ট দলে; বলা হইয়াছে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, আম্বেদকারের ফেডারেশন, কৃষক-মজদুর-প্রজা দল এ সবই "সরকারের সমর্থক দল", কারণ—"যে দিক হইতেই কেন দেখা যাউক না, এই সকল দলের মনোভাব একইরূপ; রাজন্যবর্গ, জমীদারগণ, ধনিক সম্প্রদায়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতির স্বার্থ ও সুবিধা রক্ষার জন্য—ইহারা চেষ্টা করিয়াছে।"

সে যাহাই হউক কংগ্রেস দলকে যে কম্যুনিষ্ট দলের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহা দেখা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন—

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ১৩জন সচিবের মধ্যে যে ১২জন নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ৭ জনের পরাভব—

খাদ্য ও কৃষি সচিব—প্রফুল্লচন্দ্র সেন।
সরবরাহ সচিব—নিকুঞ্জবিহারী মাইতী।
সেচ সচিব—ভূপতি মজুমদার।
রাজস্ব সচিব—কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ।
আইন সচিব—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।
শ্রম সচিব—কালীপদ মুখোপাধ্যায়।

এত—অর্থাৎ অধিকাংশ সচিবের পরাভব সচিব-সঙ্ঘের সম্বন্ধে লোকের অনাস্থার পরিচায়ক মনে করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে না। বিশেষ খাদ্য ও কৃষি, সরবরাহ, সেচ, রাজস্ব, আইন, শ্রম ও শিক্ষা এই সকল বিভাগের তুলনায় নির্ব্বাচিত সচিবদিগের বিভাগ সমূহের (আবকারী, মৎস্য, সমবায় ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন) গুরুত্ব অল্প। কাজেই পরাভূত সচিবদিগের পরাভব ব্যক্তিগত পরাভব মনে করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে। ব্যক্তিগত কারণ হয়ত ছিল ; যেমন—সরবরাহ সচিব রাজাকেও কাপড়ের ছাড় দিয়াছিলেন ; খাদ্য সচিব যে ভাবে ধান ধরিয়াছেন ও ধানের যেরূপ মূল্য দিয়াছেন, তাহাতে লোকের মনে অসন্তোষ উদ্ভব অনিবার্য্য ; আইন সচিব অপরাধীর প্রতি অযথা দয়া দেখাইয়াছিলেন ; শ্রম-সচিব উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনে অযথা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—ইত্যাদি। কিন্তু সে সকলও উপেক্ষা করা যায়। সেই জন্য মনে হয়, সচিব সঙ্ঘ যে নীতি পরিচালিত করিয়াছেন, লোক তাহার বিরোধী। সে নীতি প্রধান বিভাগগুলিতেই বিশেষ প্রকট হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনে অব্যবস্থা, কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বদুষ্ট ব্যবহার, বিহারের বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলের জন্য দৃঢ়তা সহকারে দাবী না করা, জমীদারী উচ্ছেদ না করিয়া জমীদারদিগকে মনোনয়ন দান ও সচিবসঙ্ঘে গ্রহণ, দুর্নীতি দমনে অক্ষমতা ; ধনিকপোষণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে অযথার্থ কথন প্রভৃতি ছিল। আর সর্ব্বোপরি ছিল, কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বায়ত্ত-শাসন হরণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্য্যাদায় পদাঘাত।

এ সকল বিবেচনা না করিলে ভুল করা হইবে। বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে পরাভবের গুরুত্ব কৈফিয়তে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা নিন্দনীয়। মেদিনীপুর জিলায় ৩৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১২টি মাত্র লাভ করিতে পারিয়াছে। অথচ তথায় কংগ্রেসের প্রচার-কার্য্য প্রবলভাবেই হইয়াছে। মেদিনীপুরে কংগ্রেসের শোচনীয় অবস্থার কারণ নির্দ্ধারণের চেষ্টায় কোন কংগ্রেস সমর্থনকারী পত্রে এক জন লেখক লিখিয়াছেন, কোন কোন স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা বলেন, বৃটিশের শাসনে মেদিনীপুরের অধিবাসীরা যে সরকার-বিরোধী মনোভাবের অনুশীলন করিয়াছিল, সেই মনোভাবের ফলেই তাহারা বর্ত্তমান সরকারেরও বিরোধিতা করিয়াছে! যেন ক্ষুদিরামের, সত্যেন্দ্রের, রাজা নরেন্দ্রলালের, হেমচন্দ্র দাশের, মাতঙ্গিনী হাজরার মেদিনীপুর বিদেশী শাসনে ও জাতীয় সরকারে প্রভেদ বুঝিতে পারে না! যাহারা সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—যাহাদিগের জিলায় স্বাধীনতা লাভের আগ্রহ পেডী, ডগলাস ও বার্জ্জ পর পর ৩ জন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিধন ঘটাইয়াছিল, সে জিলায় দেশাত্মবোধের বিকাশ হয় নাই! আবার এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের সফরের ফলে যে কংগ্রেসের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, মেদিনীপুরে জনসঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠানের সাফল্যই তাহার প্রমাণ। কারণ, মসলেম লীগের সময়ে সচিবরূপে ও হিন্দু মহাসভার নায়করূপে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে মেদিনীপুরের প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে তাঁহার সাহায্যদান প্রভৃতি মেদিনীপুর-শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে left handed compliment হইতে পারে, কিন্তু সত্য নহে। মেদিনীপুর স্বাধীনতা লাভের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রকৃত স্বাধীনতার মর্য্যাদাবোধ সুস্পষ্ট হইয়াছে। তবে ঐ লেখকও স্বীকার করিয়াছেন, ক্ষমতা লাভের পরে মেদিনীপুরের নেতারা কেহ বা সচিব হইয়াছেন, কেহ বা সরবরাহ বিভাগে পরামর্শদাতা হইয়াছেন, কেহ বা বর্গাদার বোর্ডে বা জিলা বোর্ডে গিয়াছেন—জনগণের প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়া সরকারের প্রতিনিধি হইয়াছেন। মেদিনীপুর মহিষাদল কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী কুমার দেবপ্রসাদ গর্গের জয় বিপুল ভোটাধিক্যে হইয়াছে। তাঁহাকে কংগ্রেসী মনোনয়ন প্রদানের যে মূল্য দাবী করা হইয়াছিল, তাহা কেবল কংগ্রেস সভাপতি নহেন, প্রধান সচিবও অবগত আছেন। সেরূপ সর্ত্ত কি কংগ্রেসের অপমানজনক নহে?

কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর নিকট পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বপ্রধান জমীদার বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের পরাভব নিশ্চয়ই কংগ্রেস দলকে জমীদারী উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ স্মরণ করাইবার জন্য।

গত নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক-মজদুর-প্রজা দল একরূপ মুছিয়া গিয়াছে—কেবল বর্দ্ধমানে স্থানীয়ভাবে কম্যুনিষ্ট দলের সহিত নির্ব্বাচনী সম্মিলন তাহার আত্মরক্ষার কারণ হইয়াছে। সে দলের যে ৩ জন পশ্চিম বঙ্গের সচিবসঙ্ঘে এক দিন প্রধান ছিলেন, তাঁহারা ৩ জনই পরাভূত হইয়াছেন—কোথাও কম্যুনিষ্টের দ্বারা, কোথাও কংগ্রেসীর দ্বারা—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্নদা চৌধুরী। সুরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল কোন প্রার্থী মনোনীত না করিয়া স্বতন্ত্র প্রার্থীকে সমর্থন করিয়া বিজয়ীর মাল্যদানের আশা করিয়াছিলেন। সে আশায় কম্যুনিষ্ট প্রার্থী সকলকে হতাশ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনে অবাঙ্গালী ভোটারদিগের গুরুত্ব উপেক্ষা করিলে নিদান নির্ণয়ে ভুল হইবে। আর মুসলমান ভোটারদিগের বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে। কলিকাতায় ও নানা শিল্পকেন্দ্রে অবাঙ্গালী ভোটারের সংখ্যা অল্প নহে—অধিক এবং তাহাদিগের নেতারা নির্ব্বাচনী সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন। শিখদিগের বিষয়ও উপেক্ষিত হয় নাই। বিশেষ কোন কোন অবাঙ্গালী সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান সরকারের সহিত সখ্য সর্ব্বজনবিদিত।

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনফলে বিভিন্ন দলের ও দলাতিরিক্ত প্রার্থীদিগের সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে :—

কংগ্রেস··· ··· ··· ···	১৫১
কম্যুনিষ্ট··· ··· ··· ···	২৮
কৃষক-মজদুর-প্রজা··· ··· ···	১৫
স্বতন্ত্র··· ··· ··· ···	১০
ফরওয়ার্ডব্লক (মার্কসিষ্ট)··· ···	১০
জনসঙ্ঘ··· ··· ··· ···	১০
হিন্দুমহাসভা ··· ··· ···	৪
গুর্খা লীগ ··· ··· ···	৩
অন্যান্য ··· ··· ···	৭

নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রধান্য ঘটিয়াছে।

মোট ভোট—

কংগ্রেসদলের	...	...	২৮,৪৬,৮৭৭
কংগ্রেসাতিরিক্ত	...	...	৪৪,০৪,১৫০

ইংরাজীতে যাহাকে Pyrrhic জয় বলে—কংগ্রেসের তাহাই হইল কিনা, তাহা পরে দেখা যাইবে। কারণ, নির্ব্বাচনের পরেও কোন কোন নির্ব্বাচিত সদস্য দলপরিবর্ত্তন করেন বা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কোন দলে যোগ দেন। কোন সংবাদপরিবেশক প্রতিষ্ঠান সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, দিল্লীতে যাইয়া ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের প্রধানদিগের পরাভবের পরে সেই দলের কোন কোন নির্ব্বাচিত প্রার্থী ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের সহিত একযোগে কাজ করিতে চাহিতেছেন। পরে ঐ সংবাদ অস্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐরূপ ঘটিতেও পারে।

নির্ব্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পরাভূত সচিবরা সকলেই "বর্ণহিন্দু" আর সচিবদিগের মধ্যে যে ৫ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন মুসলমান, একজন ব্রাহ্ম, ২ জন "তপশিলী" হিন্দু ও একজন "বর্ণহিন্দু"—এখনও ভারতরাষ্ট্রে নির্ব্বাচনে "তপশিলী" রাখা হইয়াছে বলিয়াই আমরা এই বিষয়ের উল্লেখ করিলাম; নহিলে করিতাম না।

কংগ্রেস দলের নিদ্ধারণ, পরাভূত ব্যক্তিরা উপনির্ব্বাচনে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইতে পারিবেন না, কিন্তু অন্য পথে তাঁহাদিগকে সচিব সজ্জে বা ব্যবস্থা পরিষদে গ্রহণ করা হইবে না। সুতরাং পরাভূত সচিব ৭ জনের আপাততঃ কোন আশা নাই।

নির্ব্বাচনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা যদি ব্যর্থ না হয়, ভালই হইবে। কারণ, অভিজ্ঞতার দ্বারাই ত্রুটি সংশোধন করা যায়। ত্রুটি যদি সংশোধিত না হয়, তবে তাহা সর্ব্বনাশের কারণ হয়।

যাঁহারা পরাভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্বন্ধে বিখ্যাত রাজনীতিক ব্রাইটের নির্ব্বাচনে পরাভবে 'টাইমস' পত্রের উক্তি আমাদিগের মনে পড়িতেছে :—

"Nothing can be more alien to our feelings than to insult these gentlemen by expressions of commiseration when the battle of life has for the moment turned against them."

দেশ আজ বিপন্ন, বিব্রত। গত ৪ বৎসরে স্বায়ত্ত-শাসনে যাহা হইয়াছে, তাহা লইয়া যিনিই কেন গর্ব্ব করুন না, তাহাতে গর্ব্ব করিবার অবসর অতি অল্প।

কিন্তু দেশের অভাব যেমন অধিক, দেশের লোকের অভিযোগ তেমনই প্রবল। সেই জন্য আন্তরিক চেষ্টা প্রযুক্ত করিয়া উন্নতিসাধন করা প্রয়োজন।

পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা অনেক—কঠোরতার দ্বারা যে সকল সমস্যার আগ্রহের প্রয়োজন। দেশে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। সেই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাজ করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে—বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রক্ষা না করিলে আর কেহ করিবে না।

নির্ব্বাচনের পরে কি ভাবে কাজ আরম্ভ হয়, তাহার উপরেই জাতীয় সরকারের সার্থকতা নির্ভর করিবে।

পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচনে

পশ্চিম বঙ্গ—

লোকসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্টে সদস্য সংখ্যা ৪০৯; তাহাতে পশ্চিম-বঙ্গের সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন। এই ৩৪টি আসনের জন্য ১৬৮ জন প্রার্থী হইয়াছিলেন। ২৪টি আসনে কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই ২৪ জনের প্রাপ্ত ভোট—৩২,০৫,১৬২। কম্যুনিষ্ট দল ৯টি কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন—৫টি কেন্দ্রে জয়ী হইয়াছেন। কম্যুনিষ্টদিগের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা—৭,২০,৩০৪টি। জনসঙ্ঘ ৭টি আসনের জন্য প্রার্থী মনোনীত করিয়াছিলেন—২টি আসন লাভ করিয়াছেন। সে দলের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা—৪,৫৭,১৪৮টি। হিন্দু মহাসভা ৬টি কেন্দ্রে প্রার্থী মনোনীত করিয়াছিলেন, একটি কেন্দ্রে জয়লাভ করিয়াছেন। হিন্দু মহাসভার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা—৩,২৪,৮৭০টি। "আর, এস, পি" দল ৩ জন প্রার্থী মনোনীত করিয়াছিলেন, এক জন জয়ী হইয়াছেন। সে দলের পক্ষে ভোট হইয়াছে—১,০৮,৮৮১টি। অন্যান্য দলের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে একজন জয়ী হইয়াছেন। ইনি সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী। এই সব দলের পক্ষে ভোটের সংখ্যা মোট—২,৬৭,৩৯৮টি। কৃষক-মজদুর প্রজা দলের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে এক জনও জয়ী হইতে পারেন নাই; তবে সে দলের প্রার্থীরা মোট ৬,৭৯,১৪৬টি ভোট পাইয়াছিলেন। অন্য কোন দলের প্রার্থীরা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হইতে পারেন নাই।

কলিকাতার ৪টি কেন্দ্র হইতে এক জন ব্যতীত কোন কংগ্রেস দল-মনোনীত প্রার্থী সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্ববার যাঁহারা সদস্য ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ৩ জন পরাভূত হইয়াছেন—শ্রীমতী রেণুকা রায়, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়।

এক কোটি ২৮ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ৭৭,৭৩,৩৫৪ জন ভোট দিয়াছিলেন।

ব্যাঙ্ক মিলন—

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর পার্লামেণ্টে ভারতের অর্থ-মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে ঐ সময় পর্য্যন্ত মোট ৮৪টি ব্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া কাজ বন্ধ করিয়াছে, সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। যে সকল ব্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় কাজ বন্ধ করিয়াছিল, সে সকলে মজুদকারীদিগের টাকার পরিমাণ—১২ কোটি

সকলের ঐ তহবিলের পরিমাণ—১৪ কোটি টাকা। ঐ সকল ব্যাঙ্কের সংখ্যা পশ্চিম বঙ্গে সর্ব্বাধিক—৩৪টি ; তাহার পরে মাদ্রাজে—১৬টি।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে লিখিত হয়, অনেকগুলি ব্যাঙ্কের মূলধন ও সঞ্চিত অর্থ—৫০ হাজার টাকারও কম ; অথচ ব্যাঙ্কিং আইনে সেরূপ ব্যাঙ্ক চালু থাকিতে দেওয়া যায় না। সেরূপ ব্যাঙ্কগুলিকে আইনের বিধান পালনের জন্য ৩ বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের শেষে ঐরূপ ১৫০টি কোম্পানী ছিল। ঐ সকলের শতকরা ৫০টিরও অধিক মাদ্রাজে, আর পশ্চিম বঙ্গে ৪৯টি।

যে সকল ব্যাঙ্কের মূলধন আইনে নির্দ্ধারিত মূলধন অপেক্ষা অল্প, সে সকলের পক্ষে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সম্মিলনই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবলম্বনীয় উপায় বলিয়া মনে হয়। আবার কোন কোন ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা অধিক। অনেক ছোট ব্যাঙ্কেরও শাখা অধিক দেখা যায়। অথচ বহু শাখার কার্য্য সম্বন্ধে আবশ্যক দৃষ্টি রক্ষা করা সহজসাধ্য নহে। মাদ্রাজে যে বহু ছোট ছোট ব্যাঙ্ক আছে তাহাই নহে, পরন্তু অনেকগুলি ছোট ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা অধিক। তথায় যদিও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ৫৪টি শাখা অফিস বন্ধ করা হইয়াছিল, তথাপি বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, তথায় ৯৮২টি শাখা অফিস ছিল। বোম্বাই প্রদেশে তাহার সংখ্যা ৬১২ ; যুক্তপ্রদেশে ৪৯৩ ; পশ্চিম বঙ্গে ৩৩০টি।

দেখা যাইতেছে, যে সকল সহরে অধিবাসীর সংখ্যা ১০ হাজারের কম, সে সকলে কোন ব্যাঙ্ক নাই। যে সকল নগরে অধিবাসীর সংখ্যা ৫০ হাজারের অধিক সে সকলের সংখ্যা ১৭৫—সে সকল ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৩৯৬টি অর্থাৎ ব্যাঙ্কের শতকরা ৪৭টি। আর যে সকল নগরে অধিবাসীর সংখ্যা ৫০ হাজার অপেক্ষা অল্প সে সকলের সংখ্যা ১৩৭০—আর সে সকলে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৬৮১ অর্থাৎ ব্যাঙ্কের শতকরা ৫৩টি। এইরূপ সংখ্যা-বৈষম্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। সহরে ব্যাঙ্কগুলি জমার জন্য পরস্পরের সহিত যে প্রতিযোগিতা করে, তাহার জন্য সুদের হার অনেক ক্ষেত্রে বাড়িয়া যায় এবং ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ হ্রাস হয়। সেই জন্য যদি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কতকগুলি সম্মিলিত হয়, তবে ভাল হয়। পশ্চিমবঙ্গে ৪টি ব্যাঙ্ক সেইরূপে সম্মিলিত হইয়া আত্মরক্ষা ও শক্তি-বৃদ্ধি করিয়াছে।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে পার্লামেন্টে অর্থ মন্ত্রী বলিয়াছেন, পশ্চিম-বঙ্গের ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার কার্য্য ক্ষিপ্রতা সংকারে করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত করার প্রস্তাব হইয়াছে এবং সেই সমিতির নিয়মাদি রচনা করা হইতেছে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের আইনের সংশোধনে ব্যাঙ্ক মিলনের নিয়মাদি সরল করা হইয়াছে। সুতরাং এখন সেরূপ মিলন সহজসাধ্য হইয়াছে। দুর্ব্বল ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলি যদি সেই পরিবর্ত্তনের সুযোগ গ্রহণ করে, তবে সেগুলি যেমন আত্মরক্ষা করিতে পারে, দেশের লোকও তেমনই কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

খাদ্য-সমস্যা অমীমাংসিত—

ভারত রাষ্ট্রের ভয়াবহ খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইতেছে না। প্রধান বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিবে না। তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে সেরূপ ভিত্তিহীন উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বলেন নাই বটে, কিন্তু ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পার্লামেন্টে খাদ্যমন্ত্রী বলেন—১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ভারত রাষ্ট্র খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া ত পরের কথা, সে বৎসর ভারত রাষ্ট্রে উৎপন্ন খাদ্যোপকরণের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায়ও কম হইবে। ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে ৪৫৬২ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্যোপকরণ উৎপন্ন হইয়াছিল ; পর বৎসর হইবে ৪১৬১ কোটি ৫০ লক্ষ টন। এই হ্রাসের কারণ—প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। ভারত রাষ্ট্রের মত বিশাল দেশে যে স্থানে স্থানে প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, পঙ্গপালের উপদ্রব প্রভৃতি হইতে পারে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান বৎসরেও যে ৬৮ লক্ষ টন ঘাটতী হইবে, তাহার কারণ কি ? গত ৮ই ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে বলা হইয়াছে এবার মোট ঘাটতীর পরিমাণ ৬৮ লক্ষ টন ; আর সেই ঘাটতী পূর্ণ করিবার জন্য বিদেশ হইতে ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিবার ব্যবস্থা হইয়েছে। এ বার ঘাটতী বোম্বাই প্রদেশে ১৭ লক্ষ টন, মাদ্রাজে ৯ লক্ষ ৫১ হাজার টন, পশ্চিমবঙ্গে ৮লক্ষ ৫৫ হাজার টন, বিহারে ৫লক্ষ ৬০ হাজার টন, উত্তর প্রদেশে ৪লক্ষ ১৯ হাজার টন, পঞ্জাবে ৮১লক্ষ টন ও আসামে ২লক্ষ ১৫ হাজার টন।

ইহার মধ্যে আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ হিসাবে প্রায় ১০লক্ষ টন গম ও মাইলো পাওয়া যাইবে ; কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২লক্ষ টনের কিছু অধিক গম পাওয়া যাইবে। অবশিষ্ট ৩৮লক্ষ টন খাদ্যশস্য কিনিতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। আমদানীর জন্য জাহাজ ভাড়াও অল্প পড়িবে না।

এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল গত ২৬শে মাঘ কলিকাতায় পরিপূরক খাদ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে বলিয়াছেন, দেশে শিল্পের প্রসারজন্য যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইবে। তাহার জন্য ব্যয় আছে। কাজেই বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। তিনি এ বিষয়ে লোককে, বিশেষ যাঁহারা সে কাজ করিতে পারেন তাঁহাদিগকে, যথাসম্ভব খাদ্যশস্য ব্যবহার হ্রাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহাকে বলিতে ইচ্ছা করি, লোক যে খাদ্যে অভ্যস্ত তাহা সহসা বর্জ্জন করিলে অসুস্থ হয়। সুতরাং সে কার্য্য সময়সাধ্য। কেবল তাহাই নহে, পরিপূরক অন্য খাদ্যোপকরণ সুলভ করা প্রয়োজন। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার তাহা করিতে পারেন নাই। মৎস্যের ত কথাই নাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রদেশপাল মহাশয়কে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিব, ইংলণ্ডে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের ফলে লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে ; কিন্তু এ দেশে তাহাতে লোকের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে কেন ? ইহা কি ব্যবস্থার ক্রটি হেতুই হয় নাই ও হইতেছে না ? দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভাপতি সার জন উডহেড আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ কথা কি সত্য যে,

সরকারী গুদামে যে আজও কীট ও ইন্দুরের উপদ্রব হইতে চাউল রক্ষার সুব্যবস্থা হয় নাই, তাহা কি লজ্জার বিষয় নহে ?

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সচিব প্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ২রা ফাল্গুনে ঘোষণা করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ চরম খাদ্য-সঙ্কটের সম্মুখীন। ইহার জন্য কি সরকারের কোন দায়িত্ব নাই? গত ৪ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে লোকের প্রধান খাদ্যোপকরণ ধানের ফসল বৃদ্ধির ও পরিপূরক খাদ্যোপকরণ উৎপাদনের কি কি চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহার ফল কি হইয়াছে, তাহা কি দেশের নিরন্ন লোকদিগকে বলা হইবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার—অন্যান্য প্রদেশের সরকারের মত—কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে অর্থ লইয়া সেচের জন্য নলকূপ বসান নাই, এই অভিযোগ ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সে অভিযোগ কি আজও সত্য ?

সরকারী হিসাবে, এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের অভাব হইবে—৮লক্ষ ৫৫ হাজার টন। ইহার মধ্যে কত টনের জন্য আশু ধান্যের জমীতে পাটের চাষ দায়ী তাহাও আজ পশ্চিমবঙ্গের লোক জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

কৃষককে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিরূপ উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে ও হইতেছে? বিদেশ হইতে যে মূল্যে (ও জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি ব্যয়ে) খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়, সে মূল্য কি দেশের কৃষক তাহার শস্যের জন্য পাইতেছে ? এ সকল কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

আমরা দেখিয়াছি, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গত ২রা ফাল্গুন ২৪পরগণা জিলায় মথুরাপুর প্রভৃতি স্থানে ধান্য "সিজের" ব্যাপারে পুলিসের গুলী চালনার অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন। সে অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে কেন সেরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। সরকারের অনুসৃত নীতি যে লোকপ্রিয় হয় নাই, তাহা নির্ব্বাচনে ৭জন সচিবের পরাভবে সপ্রকাশ হইয়াছে। সে নীতির পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা কেন সফল হয় নাই, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য আবার সমিতি নিযুক্ত করা হইতেছে! সে সমিতির কাজ বিচার করিবার জন্য আবার কোন সমিতি নিয়োগের প্রয়োজন হইবে না ত? •

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—

'মুর্শিদাবাদ সমাচার' পত্রে (২৯শে মাঘ) বহরমপুরের নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

"গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে কৃষিবিভাগের নিম্ন বেতনভুক্ কর্ম্মচারী শ্রীকালীপদ দাসের পত্নী পারুল দাস উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। উক্ত ভদ্রমহিলার স্বামী বর্ত্তমানে ছুটিতে থাকিলেও কৃষিবিভাগের স্থানীয় কর্ত্তাগণ তাঁহাকে গত চার মাস বেতনাদি দেন নাই। ইহা লইয়া কোনও ফললাভ করেন নাই। উক্ত বিষয় লইয়া মৃতা পারুল দাস স্থানীয় ও কলিকাতার সংবাদ পত্রাদিতে লিখেন এবং প্রচণ্ড অভাবের কথা জানাইয়া অনন্যোপায় অবস্থা ঘোষণা করেন। বেতন না পাওয়ার ফলে সপুত্রপরিবার তাঁহারা যথেষ্ট বিপন্ন হইয়া পড়েন। প্রকাশ, অভাবের প্রচণ্ডতায় ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হন।"

স্থানীয় সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতার সংগৃহীত এই সংবাদ সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান হইয়াছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সংবাদে সরকারের কৃষিবিভাগের সম্বন্ধে যে অভিযোগ আছে, তাহার গুরুত্ব যেমন অস্বীকার করা যায় না—পারুলবালার পত্র স্থানীয় ও কলিকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকিলে সরকারের বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের সে সম্বন্ধে উপেক্ষা তেমনই বিস্ময়কর অযোগ্যতার ও নির্ম্মমতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

দেখিতে দেখিতে বহুদিন অতীত হইয়া গেল—ভারতের লোকসংখ্যা গণনার বিবরণে সার হার্কার্ট হোপ রিসলী লিখিয়াছিলেন—এ দেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিতেছে। কৃষিজ পণ্যের মূল্য ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক বর্দ্ধিত হইয়াছে—নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কৃষিজ পণ্যের বর্দ্ধিত মূল্যে বা শ্রমিকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধিতে উপকৃত হয় না—অথচ নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের অধিক মূল্য দিতে বাধ্য হয়। তাহাদিগের সামাজিক কাজে ব্যয়ও অনেক। কাজেই তাহারা দিন দিন আর্থিক দুর্গতি ভোগ করিতেছে।

সেই অবস্থার পরিণতিতে এখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হইবার মত হইয়াছে। অথচ এই সম্প্রদায়ই শিক্ষায় অগ্রণী ও সংস্কৃতির বাহক ছিল।

বাঙ্গালা বিভক্ত হওয়ায় এই সম্প্রদায়কে নূতন আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। ইংরেজ সরকার সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। বর্ত্তমান অবস্থায়—বিশেষ খাদ্যোপকরণের ও বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার অবধি নাই।

নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব সহসা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহা প্রশমিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনকালীন প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্রে প্রচারকার্য্য বলিয়া বিবেচনা ও উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু নির্ব্বাচনান্তেও তিনি সেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তিনি যে সে জন্য কোন পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নগর নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে লোকের সুবিধা অপেক্ষা সরকারের (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) লোকের দিকেই অধিক মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহা সরকারের অভিপ্রেত দ্রুতভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে না। শুনিতেছি, সরকার পক্ষ হইতে এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথায় স্থানান্তরিত করিবার বিষয়ও বিবেচিত হইতেছে!

ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে হইবে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে ট্রেণ যাতায়াতের সুব্যবস্থাও করা হয় নাই। ফলে লোক কলিকাতায় কাজের সুবিধা পাইতেছে না। সেই জন্য কলিকাতায় জনসংখ্যা অবাঞ্ছিতরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে ও কলিকাতা অস্বাস্থ্যকর হইতেছে এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির উন্নতি সাধিত হওয়া ত পরের কথা—এক কালে সমৃদ্ধ কিন্তু বর্ত্তমানে অবজ্ঞাত গ্রামগুলিও পূর্ব্বগৌরব লাভ করিতে পারিতেছে না। উত্তরে হালিসহর ও দক্ষিণে হরিনাভি প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

যানের জন্য পথগুলিরও আবশ্যক সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইতেছে না।

বিদ্যালয় ও চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত যেমন গ্রাম সমৃদ্ধ করা যায় না, তেমনই শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত গ্রামে লোককে বাস করিতে আকৃষ্ট করা যায় না। গ্রামে যদি সমবায় নীতিতে নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সহজে ও অল্পব্যয়ে গ্রামের উন্নতি হইতে পারে এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সর্ব্বতোভাবে চাকরীজীবী না হইয়া থাকিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে চাকরীর বেতন সম্বন্ধে একটি কথা বলাও প্রয়োজন। যতদিন নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা না যাইবে, ততদিন কেবলই (স্থায়ী) বেতনের সঙ্গে (অস্থায়ী) ভাতা বাড়াইয়া চলিতে হইবে। ইহা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা—সুতরাং অস্থায়ী। তাহাকে স্থায়ী না করিয়া কিসে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় কমাইয়া ভাতা বর্জ্জন করা যায়, সেই দিকে অধিক মনোযোগ দানই সঙ্গত। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন কেবল যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ব্যয়ে সমতা রক্ষা সম্ভব হইবে না, তাহাই নহে; পরন্তু সরকারেরও আর্থিক ভিত্তি দৃঢ় হইবে না।

পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা

পূর্ব্ববঙ্গ এখন পাকিস্তানভুক্ত হইলেও তথায় অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা—বাঙ্গালা। যত দিন পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তানকবলিত হয় নাই তত দিনে তথায় বহু মনীষী বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালা বিভক্ত হইবার পরে খাজা নাজিমুদ্দীন যখন পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধান-সচিব, তখন তিনি তথায় ছাত্রদিগের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—বাঙ্গালার উচ্ছেদ সাধন করা হইবে না। সম্প্রতি তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও মসলেম লীগের সভাপতিরূপে ঘোষণা করিয়াছেন, উর্দ্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে। ইহাতে ঢাকার ছাত্র ও ছাত্রীরা এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার ঘোষণার প্রত্যাহার দাবী করিয়াছিলেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আগা খাঁন যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সদস্যরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলে তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে মাতৃভাষা বাঙ্গালার অনুশীলন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

in which the highest and noblest aspirations of man could be represcented and interpreted."

বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ প্রশংসা করিয়া তিনি বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন—তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় আবশ্যক ইসলামী পুস্তকসমূহের অনুবাদ করুন এবং যাহাতে বাঙ্গালার মুসলমানরা ইসলামের সংস্কৃতি, চিন্তা ও দর্শনের সহিত পরিচিত হইতে পারেন, সে জন্য পুস্তিকা প্রচার করুন।

পাকিস্তান যে উর্দ্দুকেই পূর্ব্ববঙ্গেরও রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহিতেছেন, তাহা যে তথায় হিন্দুদিগকে বিতাড়িত করিবার আর একটি উপায় হইতে পারে, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাহাতে যে তথায় মুসলমানদিগেরও আপত্তি আছে, ঢাকায় ছাত্রছাত্রীদিগের প্রতিবাদানুষ্ঠানে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। প্রতিবাদ দলিত করিতে পুলিস গুলী চালাইয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা বলেন, বাঙ্গালা অতি সমৃদ্ধ ও সুমিষ্ট ভাষা। সমগ্র পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী (শতকরা ৫৪ জন) যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহা অবজ্ঞা করিয়া উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা গণতান্ত্রিক মতের অবমাননা। গণতান্ত্রিক হিসাবে আইনতঃ ও ন্যায়তঃ বাঙ্গালা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা বাঙ্গালাকে তথায় অবিকৃত ও শিক্ষার বাহন রাখিতে কৃতসঙ্কল্প, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। এই অবস্থায় পাকিস্তান সরকার কি করিবেন, তাহা দেখিবার বিষয়। পূর্ব্ববঙ্গে উর্দ্দু যদি রাষ্ট্রভাষা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় পঠনপাঠন বন্ধ হয়, তবে তথায় অধিবাসীরা (হিন্দু ও মুসলমান) ক্রমে বাঙ্গালা ভুলিয়া যাইবে—বাঙ্গালা পুস্তক ত্যক্ত হইবে—বাঙ্গালার সংস্কৃতি বিস্মৃত হইবে। এই অবস্থা পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদিগেরও অভিপ্রেত নহে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান তরুণ-তরুণীদিগের এইরূপ মনোভাব যে সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। পাকিস্তান সরকার এই মনোভাব অবজ্ঞা করিয়া বাহুবলে যদি তাহা দলিত করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁহারা ভুল করিবেন। সে চেষ্টা যে বিহারে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাষাভাষী করিবার চেষ্টার মতই আপত্তিজনক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

উর্দ্দু মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ভাষাও নহে—সে ভাষা আরবী। তাহাও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদিগের উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন করিতে আপত্তির অন্যতম কারণ।

সভাপতির অভিভাষণ—

ইংরেজ কর্ত্তৃক ভারতে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পরে কয় বৎসর যে পার্লামেণ্ট কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহা ভারত রাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি অনুসারে গঠিত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান নহে; ইংরেজী মতে যাহাকে অস্থায়ী হেপাজৎকারী প্রতিষ্ঠান বলে, ইহা তাহাই। এ বার সংবিধান অনুসারে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টে আসন গ্রহণ করিবেন। গত ২২শে মাঘ পুরাতন পার্লামেণ্টের শেষ অধিবেশন

অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অতি সংক্ষেপে অবস্থা-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন এবং পৃথিবীর নানাস্থানে যে স্বাধীনতা "লাভ" চেষ্টা চলিতেছে, তাহার সাফল্য কামনা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকরাও যে নির্ব্বাচনে ভোট ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিলেও কয় জন মহিলা যে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে কম্যুনিষ্ট বলিয়া তিনি সেরূপ করিয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না। দেশের খাদ্য সমস্যা যে দুশ্চিন্তার কারণ, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই এবং বলিয়াছেন, সরকার "অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন কর" ব্যবস্থায় বিরত হইবেন না।

যে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সে সকলের উল্লেখ করেন নাই—নানা ব্যাপারে অপব্যয়ের ও দুর্নীতির জন্যও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন নাই।

বিদায়ী বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি আশার কথাই দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন। কিন্তু হতাশার কারণ বিশ্লেষণ ও সে সকল কারণ বর্জ্জন ব্যতীত যে ভুল অতিক্রম করিয়া প্রকৃত উন্নতির উপায় অবলম্বন করা যায় না, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্ট বন্দী—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের নানাস্থানে কারাগারে ২ শত ৭১ জন লোককে বিনাবিচারে (নিবারক আটক আইনে) বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থাৎ সরকারের কর্ম্মচারী বা কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে বলপ্রয়োগে সরকারের ধ্বংসকারী কার্য্যে যোগদানকারী সন্দেহ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদিগের বিচার-ব্যবস্থা করিতে সাহস করেন নাই। নির্ব্বাচনের সময় তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কিছুদিনের জন্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। মোট ২৮জন প্রার্থী কম্যুনিষ্ট দলের মনোনয়ন লইয়া পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তই ছিলেন। যাঁহারা কারাগার হইতে নির্ব্বাচনের সময় মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নির্ব্বাচনে জয়ী ৩ জনও পুনরায় বন্দী হইয়াছেন! অর্থাৎ জনমত তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আস্থা প্রকাশ করিলেও সরকার তাঁহাদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থায় তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা সঙ্গত কি না, সরকার নাকি তাহা বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঐ ৩জনকে মুক্তি দান করা অসঙ্গত। দেখা যাইতেছে, এ ক্ষেত্রে জনমতের সহিত সরকারের মতের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। সে অবস্থায় লোক সরকারের কার্য্য কি ভাবে ব্যাখ্যা করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ২ শত ৭১জন বন্দীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "অনেক চিন্তার পর" ৪৬জনকে মুক্তি দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতে অবশিষ্ট ২ শত ২৫জনকে মুক্তি দান করা সঙ্গত নহে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের বিনাবিচারে লোকের স্বাধীনতা হরণের সমর্থনে কি সন্দেহ ব্যতীত কোন কাহাকেও বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করিলে সে ব্যক্তি প্রকৃতই দোষী কি না, সে বিষয়ে যে লোকের মনে সন্দেহ ঘটে, তাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুস্পষ্টরূপেই বলিয়া গিয়াছেন।

ত্রিপুরা হইতে প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্তের পত্নী শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্ত তাঁহার স্বামীর গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, ত্রিপুরায় শিমনা তহশিলে মুথিঙ্গখানে তাঁহার স্বামীর বাস। তাঁহারা দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। তাঁহার ৫টি সন্তান। তাঁহার স্বামী কম্যুনিষ্ট প্রার্থী হইয়া পশ্চিম ত্রিপুরার মোহনপুর কেন্দ্রে নির্ব্বাচনী কলেজে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের জামানত জব্দ হইয়াছে—তিনি এত ভোট পাইয়াছেন। গত ২৭শে নভেম্বর তিনি মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে আগরতলায় গমন করেন। গত ২রা ডিসেম্বর তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৫ই ডিসেম্বর স্থানীয় থানার দারোগা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে কি বলিবেন—জানাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যা'ন। তথা হইতে তাঁহাকে আগরতলায় লইয়া যাইয়া কারারুদ্ধ করা হয়। তদবধি তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয় নাই। এ দিকে প্রমোদবাবু পরিবারে উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহাকে আটক করায় পরিবারের অর্থাভাব সহজেই অনুমেয়। শ্রীমতী নীলিমা লিখিয়াছেন, এ বিষয় তিনি কেন্দ্রী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে জানাইয়াছেন; কিন্তু প্রতীকার হয় নাই।

এ বিষয়ে কি কেন্দ্রী সরকার কোন কৈফিয়ৎ দিবেন? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, সরকারের একটি কৈফিয়ৎ রচনা করিতে কালবিলম্ব হয়; আর ততদিন যাঁহাকে আটক রাখা হয় তাঁহাকে ও তাঁহার স্বজনদিগকে কষ্টভোগ করিতে হয়। বিনা বিচারে লোকের স্বাধীনতা হরণের অধিকারের অপপ্রয়োগ হইবার সম্ভাবনা কি সরকার অস্বীকার করিতে পারেন?

বাঙ্গালা ও মুসলমান

পূর্ব্ববঙ্গের সরকার যখন বাঙ্গালা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছেন, তখন ছাত্রছাত্রীদিগের নেতৃত্বে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার আরম্ভেই পুলিসের গুলিতে আন্দোলনকারীরা হতাহত হইয়াছে—সেই সময়ে (গত ৩রা ফাল্গুন অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারী) কুমিল্লায় পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সমবেত মুসলমান সাহিত্যিকরা যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সম্মিলনের উদ্বোধনে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্যতম সচিব হবিবুল্লা বাহার বলেন, পূর্ব্ববঙ্গ বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু উপাদান দিয়াছে। তিনি সাহিত্যিকদিগকে অনুরোধ করেন, যাহাতে উভয় বঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে, তাঁহারা সেইরূপ রচনা করুন।

মাতরম' সঙ্গীত ভারতবাসীকে স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিত।"

তিনি বলেন, রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয় সহস্র সহস্র বৎসর কাল কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তরে জ্ঞানালোক, শান্তি ও প্রেরণা যোগাইয়া আসিয়াছে। তাঁহার উক্তি পাঠ করিলে স্বভাবতঃই মনে হয়, কোন য়ুরোপীয় লেখক বলিয়াছিলেন—য়ুরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদপত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বাঙ্গালায় কেবল রামায়ণ ও মহাভারতের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদানের প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়া বলেন, এই সকল মনীষী বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার বর্ত্তমান মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সাহিত্যিক ইব্রাহিম খাঁনের এই সকল উক্তি পাঠ করিলে মনে হয়, কতকগুলি মুসলমান একদিন 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে আপত্তি করিয়াছিল, আর তাহাদিগকে তুষ্ট করিবার চেষ্টায় কংগ্রেসও 'বন্দেমাতরম' খণ্ডিত করিয়া বহু বাঙ্গালীর অন্তরে বেদনা দিয়াছিল। অথচ সেই সকল মুসলমান তাহাতেও তুষ্ট হয় নাই। তাহারাই বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমানদ্বেষী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল এবং কোন কোন হিন্দুও তাহাদিগের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন!

সভাপতি খাঁন মহাশয় অভিভাষণে দেশবিভাগের পরবর্ত্তীকালের সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট দুর্দ্দিনের উল্লেখ করেন এবং বলেন, সেই দারুণ দুর্যোগের সময় যে সকল মুসলমান তাঁহাদিগের হিন্দু প্রতিবেশীদিগকে ও যে সকল হিন্দু তাঁহাদিগের মুসলমান প্রতিবেশীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সকল মুসলমানের ও হিন্দুর বীরত্বদীপ্ত সাহসের বিষয় গৌরবোজ্জ্বল করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের কার্য্যাবলম্বনে সাহিত্যিকদিগকে এখন নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে।

আমরা তাঁহার এই নীতির সমর্থন করিতেছি। যদি হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকরা—বিভক্ত বাঙ্গালার দুই ভাগে শান্তি ও সম্প্রীতির ভাব প্রচার করেন, তবে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা যে ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে, সাহিত্যের প্রলেপে তাহা দূর হইতে পারে এবং সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের আদর্শ অরবিন্দপ্রমুখ মনীষীরা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই ভারত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিলেই সাম্প্রদায়িকতার বিষের ক্রিয়া নাশ করা যায় না।

আমরা আশা করি, কুমিল্লায় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান সমাজে নূতন চেতনার সঞ্চার হইবে।

কাশ্মীর ও পাকিস্তান—

কাশ্মীর সমস্যায় পাকিস্তানের মনোভাব সকলেই অবগত আছেন। যদিও জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিও বলিয়াছেন, পাকিস্তানীরা কাশ্মীরে অনধিকার-প্রবেশকারী, তথাপি জাতিসঙ্ঘ তাহাদিগকে কাশ্মীর ত্যাগ চেষ্টা করেন নাই। জাতিসঙ্ঘের দরবারে ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীই মীমাংসার জন্য প্রথম গিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুদিগের অবস্থা শোচনীয়। সম্প্রতি নোয়াখালীতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিব যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে যে তাহাদিগকে আরও বিব্রত হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহারা (পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুরাও) কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির প্রতিবাদ করিয়া ও সে বিষয়ে পাকিস্তানের নীতি সমর্থন করিয়া পাকিস্তানের আনুগত্য প্রমাণ করুন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিব মিষ্টার নুরুল আমীন মনে করেন, ভারতরাষ্ট্রের কাশ্মীর সম্বন্ধীয় নীতি পাকিস্তান ধ্বংস করিবার জন্য কল্পিত এবং সেই নীতির সক্রিয় প্রতিবাদের কষ্টি-পাথরে তিনি পাকিস্তানবাসী হিন্দুদিগের রাষ্ট্রানুগত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন! হয়ত তিনি চাহেন যে, পাকিস্তানবাসী হিন্দুরা যদি, তাঁহার উক্তি অযৌক্তিক বুঝিয়াও, তাহার প্রতিবাদ করেন, তবে সেই "অপরাধে" তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিবার নূতন কারণ পাওয়া যাইবে।

যে সময় পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালাকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, সেই সময় মিষ্টার নুরুল আমীনের এই কথার উদ্দেশ্য হয়ত সহজে বুঝিতে পারা যায়। কারণ, হিন্দুদিগের বাঙ্গালাতেই রাষ্ট্রভাষা রাখার ইচ্ছা যেমন স্বাভাবিক, দাবী তেমনই সঙ্গত। সেই জন্যই তিনি হিন্দুদিগকে ভাষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনে যোগদানে বিরত রাখিবার এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, এমন মনে করা অসঙ্গত না-ও হইতে পারে। কাশ্মীর সম্বন্ধে অনাচারের প্রতীকার স্বয়ং না করিয়া—আপনার অধিকার আপনি রক্ষার অধিকার ত্যাগ করিয়া ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী জাতিসঙ্ঘের নিকট মীমাংসাপ্রার্থী হইয়া ভুল করিয়াছেন, এমন মত অনেকে পোষণ করেন। আবার জাতিসঙ্ঘ মীমাংসা করিতে যত বিলম্ব করিতেছেন, পাকিস্তান কাশ্মীরের একাংশে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ততই সুযোগ পাইতেছে। মিষ্টার নুরুল আমীন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি অতঃপর জাতিসঙ্ঘকে জানাইবেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুরাও পাকিস্তানের কাশ্মীর অধিকারের পক্ষপাতী। আর পাকিস্তানী হিন্দুরা যদি তাঁহার কথানুসারে কাজ না করেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া "অপবাদ" দিয়া বিতাড়িত বা দলিত করিবার সুযোগ পাইবেন।

পাকিস্তানে হিন্দুদিগের অবস্থা একেই শোচনীয়, মিষ্টার নুরুল আমীনের দাবীতে তাহা আরও শোচনীয় হইবে। প্রকাশ, পাকিস্তান দিল্লী চুক্তি অনুসারেও কাজ করিতেছে না—এই কারণ দেখাইয়া ভারত সরকারের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস পদত্যাগ করিতেছেন, অথচ দিল্লী চুক্তিতে পাকিস্তানে হিন্দুদিগের প্রাথমিক অধিকার রক্ষার চেষ্টাই ভারত সরকার করিয়াছিলেন। আজ যখন বিশ্বাস মহাশয়ও বলিতেছেন—দিল্লী চুক্তি ব্যর্থ হইয়াছে, তখনও কি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহা অস্বীকার করিবেন? ভারত সরকার কি এখনও—পাকিস্তানের প্রবর্ত্তক

বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে দেশবাসীর মত জানিবার চেষ্টা করিবেন? কাশ্মীর সম্বন্ধে আমীনের উক্তিকে আজ দেশের লোক তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন।

পারস্যের তৈল-সমস্যা

পারস্যের (ইরাণের) তৈল-সমস্যার সমাধান না হওয়ায় সে দেশের সরকারের ও লোকের যেমন, বৃটিশ সরকারেরও তেমনই ক্ষতি হইতেছে। বৃটিশ সরকার অ্যাংলো-ইরাণিয়ান তৈল কোম্পানীর শতকরা ৫৩ ভাগ মূলধনের অধিকারী এবং উহার তৈলই নৌবহরে ও বিমান বহরে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং তাহার অভাবে বিব্রত হইতেছেন। আবার পারস্য সরকারের জাতীয় বাজেটে আয়ের শতকরা ৪৩ ভাগ তৈলের রাজস্ব হইতে পাওয়া যাইত এবং তৈল শিল্পে ৭০ হাজার লোক অন্ন সংস্থান করিত। কিন্তু পারস্যে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব এমনই প্রবল যে, লোক আর্থিক ক্ষতিও উপেক্ষা করিতেছে এবং তথায় সংস্কৃতি সম্পর্কিত বৃটিশ প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ করিতে হইয়াছে—লোক বিদেশী প্রভাব নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিতেছে। পারস্য—ভারতেরই মত—কৃষিপ্রধান দেশ এবং অধিকাংশ লোক শিল্পের উপর জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নির্ভর করে না। সেই জন্য তৈলের আয় না পাইলে পারস্যের দারিদ্র্য বৃদ্ধি অনিবার্য হইলেও লোকের পক্ষে সে ক্ষতি সহ্য করা অসম্ভব হইবে না। তবে ঐ আয় বন্ধ হইলে নগরসমূহে অসন্তোষ বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং টুডে প্রভৃতি দল তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যখন পারস্যের তৈলের প্রয়োজন পৃথিবীতে রহিয়াছে তখন পারস্য সরকার কেন যে বৃটিশের সহযোগ বা কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ হইয়া সে শিল্প পরিচালিত করিতে পারিবেন না, তাহার কারণ বুঝা যায় না। কারণ, পারস্যে যে উহা পরিচালনের উপযুক্ত লোক নাই, এমন মনে করা অসঙ্গত। পারস্য সরকার বিদেশ হইতেও—প্রয়োজনে—বিশেষজ্ঞ আনিয়া কাজ চালাইতে পারেন।

"ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক" নাকি ন্যাসরক্ষক হইয়া তৈল শিল্প পরিচালিত করিতে সম্মত এবং পারস্য সরকারের নিকট সেই প্রস্তাব করিবার জন্য লোক পাঠাইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়, তাহার কারণ, পারস্যের তৎকালীন মন্ত্রিমণ্ডল বলিয়াছিলেন—পারস্য সরকার কেবল তৈল শিল্পের অধিকারীই হইবেন না, পরন্তু তাঁহারাই সে শিল্প পরিচালিত করিবেন। এ বার ব্যাঙ্কের প্রস্তাব—ব্যাঙ্ক পারস্য সরকারের আদেশেই কার্য্য পরিচালিত করিবেন। তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ইচ্ছানুসারে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং এমন মনে করা অসঙ্গত নহে যে, তাঁহারা সে পদে ইংরেজ নিয়োগ করিবেন না। পূর্ব্ববার চেষ্টার ব্যর্থতার আর এক কারণ—তখন পারস্য সরকার বৃটিশকে বাজার দরে তৈল বিক্রয় করিতে সম্মত ছিলেন অর্থাৎ বৃটেনকে যে দামে তৈল কিনিতে হইত, তাহাতে তাহার পক্ষে অন্যত্র তাহা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। ব্যাঙ্কের প্রস্তাব—বৃটেন তৈল কিনিয়া অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন—তবে সে জন্য অধিক দাম লইতে হইবে। যদি সমস্যার সমাধান হয়, তবে ভারতও তাহাতে উপকৃত হইবে; কারণ, ভারত ও বহু পরিমাণে পারস্যের তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। আর পারস্যের তৈল-শিল্পের মত বিরাট শিল্প বন্ধ থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে।

স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় সরকার এ দেশে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্প প্রতিষ্ঠার অধিকার দিতেছেন এবং এ দেশে পরিচালিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়কাল বর্দ্ধিত করিতেছেন। পারস্যের ব্যাপার যে তাঁহাদিগের পক্ষে বিবেচনার বিষয়, আমরা আশা করি, তাহা তাঁহারা মনে রাখিয়া কাজ করিবেন। ইংরেজ এ দেশে ব্যবসা করিতেই আসিয়াছিল এবং বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত করিয়া দেশকে তাহার আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছিল। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোক যদি ভবিষ্যতের পথিনির্দ্দেশে সহায় না হয়, তবে বিপদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা দূর হয় না। জাতির পক্ষে স্বাবলম্বন নীতি কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া রাজনীতিকোচিত কাজ বলা যায় না।

মিশর ও বৃটেন—

মিশর সরকার যে প্রত্যক্ষভাবে বৃটেনের সহিত মীমাংসার বিষয় আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছে, তাহা সুসংবাদ বলিয়া বিবেচনা করা যায়। এইরূপ আলোচনায় বিলম্বেই কায়রোয় বিক্ষোভ হইয়াছিল এবং তাহাতেই মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটিয়াছে। নূতন পররাষ্ট্র সচিব আলী মেহের পাশা এ বিষয়ে ইরাক, সৌদী আরব ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আলোচনা করিতে অস্বীকৃত হইয়া ভালই করিয়াছেন। সুয়েজ খালের সমস্যা সমাধান করা আমরা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। সম্প্রতি মিশর সরকার যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, বৃটেনের ভয়—পাছে রুশিয়া জলপথে ও আকাশ পথে মিশর আক্রমণ করে। রুশিয়া যদি তুরস্কের বা ইরাণের (পারস্যের) পথে অগ্রসর হয়, তবে তাহার মিশরে উপনীত হইতে প্রায় চারি মাস সময় লাগিবে বটে, কিন্তু বিমানবাহিনী কয় ঘণ্টার মধ্যেই মিশরে আসিতে পারে। সুতরাং খাল রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

মিশর চাহিতেছে যে, বৃটিশ এক বৎসরের মধ্যে খাল অঞ্চল ত্যাগ করুক; আর বৃটেনের কথা—সজ্জা চারি বৎসর সময় দেওয়া হউক; কারণ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে দুই দেশে যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহা ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কায়েম থাকিবার কথা। কিন্তু সুয়েজ খাল অঞ্চলের সমস্যার সহিত সুদানের সমস্যা জড়িত রহিয়াছে এবং মিশর সরকার রাজা ফারুককে সুদানের রাজা ঘোষণা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, দেশরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে মিশরের কর্তৃত্ব রাখিয়া মিশর সুদানকে স্বায়ত্ত-শাসন দিতে প্রস্তুত। বৃটেন কিন্তু সুদানকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। অর্থাৎ মিশর ত্যাগ করিতে হইবে বুঝিয়া বৃটেন ভারত ত্যাগের সময় যেমন পাকিস্তান রচনা করিয়া গিয়াছে, তথায় তেমনই সুদানের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে। এ সমস্যার কি হইবে?

পূর্ব্ব পাকিস্তানের শেষ সংবাদ—

বাঙ্গালাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, পাকিস্তান সরকার তাহা দমননীতির দ্বারা দলিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা তথায় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন স্থগিদ রাখিয়াছেন এবং যাঁহাদিগকে সন্দেহ করিতেছেন, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিচারে তাঁহাদিগকেই গ্রেপ্তার ও আটক করিতেছেন। মনে হয়, তাঁহাদিগের আশঙ্কা—পাছে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান এই আন্দোলন-সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তথায় অবাঙ্গালী মুসলমানদিগের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—যে ব্যবস্থা জাতির উদ্দীপ্ত দাবীর বিরোধী, বাহুবলে তাহা রক্ষা করা যায় না।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৮

(পূর্বানুবৃত্তি)

সপ্তশিরা পর্ব্বতের শীর্ষ দেশে একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য প্রকট হইয়াছিল। সপ্তশিরার উচ্চতম শৃঙ্গ সহসা বিগলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল স্বচ্ছ-নীরা সরোবরে এবং সেই সরোবরের মধ্যস্থলে একটি বিশাল শ্বেতপদ্ম আরও সাতটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শ্বেতপদ্ম দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্ন দেখিতেছিল। বস্তুত, মনে হইতেছিল ওই শ্বেতপদ্মগুলির অলৌকিক স্বপ্নই যেন জ্যোৎস্নারূপে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে। মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ শ্বেতপদ্মটির মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছিল একটি প্রদীপ্ত ভ্রমর, মনে হইতেছিল জ্যোৎস্না ও তুষারের সমন্বয়ে যেন তাহার দেহ গঠিত হইয়াছে। ভ্রমরের অশ্রান্ত গুঞ্জনে স্বচ্ছ-নীরা সরোবরে ঊর্ম্মিমালা শিহরিত হইতেছিল, শ্বেতকমলগুলির সৌরভে বায়ু মন্থর হইয়া আসিয়াছিল, আকাশের নক্ষত্রকুল যেন অধীর আগ্রহে কিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমস্ত চরাচর যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছিল, একটা ভাষাহীন প্রতীক্ষাই যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল চতুর্দ্দিকে। সহসা সেই প্রগাঢ় প্রতীক্ষাকে বিচলিত করিয়া বৃহৎ শ্বেতপদ্ম কথা কহিয়া উঠিল; ভ্রমরের গুঞ্জন বন্ধ হইয়া গেল। শ্বেতপদ্ম কহিতে লাগিল—

"হে আমার মানসপুত্রগণ, এতকাল তোমরা আকাশে সপ্তর্ষিরূপে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করছিলে। ধ্রুবের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি, ব্যক্ত কর। আমার মনে হল যে নক্ষত্ররূপে হয়তো আমি তোমাদের ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ করেছি, হয়তো ধ্রুব সম্বন্ধে তোমাদের কৌতূহল ম্রিয়মান হয়েছে, তাই আমি তোমাদের স্বৈরচর করে' দিয়েছি। তোমরা যা খুশী হতে পার। ইচ্ছে করলে পুনরায় তোমরা আকাশে নক্ষত্ররূপেও ফিরে গিয়ে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করতে পার। আমি শুধু জানতে চাই—বিষ্ণু-ভক্ত ধ্রুব সম্বন্ধে তোমরা কে কি ধারণা করেছ? বালক ধ্রুব যখন তপস্যাবলে বিষ্ণুর হৃদয় হরণ করেছিল তখন বিষ্ণুর অনুরোধে আমি ধ্রুবলোক সৃষ্টি করে' ওই বালককে স্থির নক্ষত্ররূপে তার মধ্যস্থলে স্থাপিত করেছিলাম। তোমাদের আমি সপ্তর্ষিরূপে সৃষ্টি করেছিলাম ওই ধ্রুবের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য। এইবার তোমাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল ব্যক্ত কর"

অত্রি কহিলেন—"আমার বিশ্বাস ধ্রুব স্থির নয়, চঞ্চল। তা নিস্তরঙ্গ সরোবরের সঙ্গে নয়, প্রবহমান স্রোতস্বতীর সহিত উপমেয়"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আমরা যে আপনার নির্দ্দেশে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করেছি আমার কাছে এইটেই একমাত্র ধ্রুব বলে মনে হয়েছে। অরুন্ধতীরও তাই অভিমত"

অঙ্গিরা ভিন্নমত পোষণ করেন দেখা গেল।

তিনি বলিলেন—"যে নামেই তাকে অভিহিত করুন, যে রূপেই তাকে প্রত্যক্ষ করুন একনিষ্ঠ তপস্যার ফলই যে ধ্রুব, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই"

পুলস্ত্য বলিলেন—"ভোগই ধ্রুব—তা' সে সুখভোগ দুঃখভোগ যাই হোক। আমার মনে হয় তপস্যার লক্ষ্য যে মুক্তি তা-ও একপ্রকার ভোগ। সেজন্য মনে হয় ধ্রুব ভোগেরই প্রতীক"

পুলস্ত্যের এই উক্তির পর একটা নীরবতা চতুর্দ্দিকে ঘনাইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে পুলহ বলিলেন—"ধ্রুব ধ্রুবই, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রতুও তাঁহার মত ব্যক্ত করিলেন।

তিনি বলিলেন, "ধ্রুব সৃষ্টিকর্ত্তার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। অসামান্য প্রতিভাশালী স্রষ্টার সৃষ্টি বলেই তা অনন্য, স্বতন্ত্র"

মরীচি উত্তর দিলেন সর্ব্বশেষে।

তিনি বলিলেন, "পিতামহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। অনেক সময় তারা পরস্পর-বিরোধী। আমার নিজের বংশেই সর্প ও সর্পশত্রু জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু আমি এইটেই উপলব্ধি করেছি, সৃষ্টির সর্ব্বপ্রকার বিকাশের শেষ লক্ষ্য ধ্রুবলোক। ধ্রুবের মধ্যেই সমস্ত বিরোধের অবসান। আমার বংশের শেষ নাগ ও গরুড় ধ্রুবলোকই সন্ধান করছে। ধ্রুব সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যের মিলনতীর্থ"

সপ্তর্ষিগণের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া শ্বেতপদ্মরূপী পিতামহ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এইটেই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। তোমরা যে সকলেই এক একজন গুরুগম্ভীর ঋষি হয়েছ তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই। একই রূপে একই পরিবেশে একই ধ্যানের কারাগারে বহু যুগ বন্দী থাকলে এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভবও নয়, পাষাণের পক্ষে জলের সাবলীলতা বা বায়ুর স্বচ্ছন্দতা অনুভব করা যেমন সম্ভব নয়। আমি তাই ইচ্ছা করেছি নূতন স্বৈরচর-বিশ্ব সৃজন করব। সম্পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্বাধীনতাই হবে সে বিশ্বের বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির প্রথম যুগে তোমরা সাতজনই ছিলে আমার মানস-পুত্র। তোমাদের মাধ্যমেই আমি সৃষ্টি-কল্পনাকে মূর্ত্ত করেছিলাম। সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, নাগবংশ, বালখিল্য, ঋষি-রাক্ষস সবই সম্ভব করেছ তোমরা। আমার নব-সৃষ্টিতেও তোমরাই অগ্রণী হও—"

অঙ্গিরা কহিলেন, "পিতামহ, আপনার সৃষ্টি তো নিত্য নবায়মান। মানব-প্রতিভায় আপনি যে রুচি-সৃষ্টি করেছেন তা তো নিত্য নূতনের পক্ষপাতী, তাহলে আবার—"

"বৎস, তুমি বহুকাল মানব সমাজচ্যুত হয়ে আকাশে বাস করছ। তুমি ভুলে গেছ অধিকাংশ মানবকে আমি পশু করেই সৃষ্টি করেছিলাম। তারা নানাভাবে তাদের পশুত্বকেই বাড়িয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত পশুর মতোই ভাবছে যে তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা। এই হাস্যকর অহমিকার নানা রূপই এখন নানা দেশের মানব সমাজ। তারা স্রষ্টাকে ভুলেছে, কিম্বা মানতে চাইছে না। [illegible]

জন্যেই মনে করেছি এ সব ছবি মুছে ফেলে এবার নূতন ছবি আঁকব…"

পিতামহের বাক্য শেষ হইতে না হইতে মহাকাশে এক প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইল। সুমিষ্ট হাস্য করিয়া পিতামহ বলিলেন; "সপ্তর্ষিদের আকর্ষণে যে সব নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সপ্তর্ষিরা অপসৃত হওয়াতে তারা কক্ষচ্যুত হয়ে পরস্পরকে চূর্ণ করছে—"

বশিষ্ঠ বলিলেন,"পিতামহ,ধ্রুবলোকে উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ একটি নীহারিকাকে বহুকাল ধরে' আমরা কৌতূহল সহকারে লক্ষ্য করছিলাম। সেটিও কি বিনষ্ট হয়ে যাবে?"

"তা মহেশ্বর জানেন। আমি যখন বাঘ সৃষ্টি করেছিলাম তখন অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে ছাগকুল বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মহেশ ছাগবংশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন নি। কিছু কিছু ছাগ আছে এখনও। স্বৈরচর সৃষ্টি করলে হয়তো তেমনি হবে। কেউ যাবে কেউ থাকবে। তোমাদেরই যদি ইচ্ছা হয় যে পূর্ব্বরূপ ধারণ করে' উক্ত নীহারিকার পরিণতি লক্ষ্য করবে স্বচ্ছন্দে তা করতে পার। যা খুশী হবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তো দিয়েছি তোমাদের। এই পদ্মরূপ তোমরা ইচ্ছা করলেই পরিহার করতে পার"

পদ্মরূপী পিতামহের অন্তর্নিহিত কৌতুক শ্বেতপদ্মের প্রতি পর্ণে ঝলমল করিতে লাগিল। প্রতিটি পর্ণ অপরূপ শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মনে হইল পিতামহ তাঁহার নব-রূপ-ধারী মানসপুত্রগণের উপর তাঁহার উক্তির প্রভাব কি হইল জানিবার জন্য স-কৌতুক আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন, যেন তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন তাহা এইবার ঘটিবে। ঘটিতে বিলম্ব হইল না। সাতটি শ্বেতপদ্ম সাতটি বৃহৎ খদ্যোতে রূপান্তরিত হইয়া ধ্রুব-লোকের উদ্দেশে উড়িয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশপটে পূর্ব্বের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া ধ্রুবলোক পরিক্রমায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ তুষারশুভ্র যে ভ্রমরটি এতক্ষণ পিতামহ পদ্মের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়াছিল সে আবার গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

"পিতামহ, আপনার মানসপুত্রগণ তো আপনার নব-সৃষ্টির পরিকল্পনায় নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারলেন না"

"[illegible] নূতন

অজানা পথে চলতে পারেন কেবল সৃষ্টিকর্তা নূতন সৃষ্টির আগ্রহে। এঁরা তো নিজেদের আগ্রহে স্বৈরচর হন নি, আমি জোর করে' কয়েকজনকে স্বৈরচর করে' দিয়েছি কি হয় দেখবার জন্যে। এই ঋষির দল সব বিষ্টুর পক্ষে, যা আছে তাই আঁকড়ে থাকতে চান। ধ্রুবকে পরিত্যাগ করে অধ্রুবের দিকে যাবার সাহস এঁদের নেই। কশ্যপের হয়তো কিছুটা আছে বলে' মনে হল। তাকেও স্বৈরচর করে' দিয়েছি। সে আমাকে সাহায্য করতে পারে"

"কিসে সাহায্য করবে"

"বিষ্টুকে একটু জব্দ করতে চাই। সে আমার নূতন সৃষ্টি-প্রেরণাকে ব্যাহত করছে। বিশ্বকর্ম্মাও জুটেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু ভাবছেন স্বৈরচর সৃষ্টি হলে' ওঁর নিজের শিল্প-কীর্ত্তি সব লোপ পেয়ে যাবে। আর বিষ্ণু ভাবছেন যেহেতু তিনি পালনকর্ত্তা সেই হেতু তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা, আমাকেও ওঁর তালে তাল রেখে চলতে হবে"

ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া বলিল, "বিষ্ণু পালন না করলে কিন্তু আপনার সৃষ্টি লোপ পেয়ে যেত"

"দেবি ভারতি, এমনিতেই আমার সৃষ্টি শুধু লোপ নয়, লোপাট হয়ে যাচ্ছে। তারই হিসেব আমি নিতে চাই বিষ্টুর কাছ থেকে। কিন্তু এমনি হিসেব চাইলে ও কি দেবে? প্যাচে ফেলতে হবে ওকে। কশ্যপ আসছে না কেন। তার তো এখানেই আসবার কথা ছিল"

"আমি কিন্তু আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না পিতামহ। আপনারও করা উচিত নয়। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের হাতখানাকে ওরা কাটতে আরম্ভ করেছে। এবার আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত"

"চল তাহলে আমরাই এগিয়ে দেখি কশ্যপের কি হল। বিনতাকে পেয়ে পুরোনো প্রেম উথলে উঠল না তো। ওরা যে হাত কাটতে শুরু করেছে তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি"

"কশ্যপকে যদি খুঁজতে যান তাহলে দেরি হয়ে যাবে"

"কিছু দেরি হবে না। এস এবার ভোল-পালটানো যাক"

পিতামহ কমনীয়-কান্তি যুবকে রূপান্তরিত হইলেন। ভারতী ভ্রমর-রূপ পরিহার করিয়া হইলেন একটি কিশোর বালক।

"আপনার ওই সব মুনিঋষিদের কাছে যুবতী-রূপে যাবার ইচ্ছে নেই"

পিতামহ বীণাপাণির নাকে ছোট্ট একটি টোকা দিয়া বলিলেন, "একটা কথা তুমি ভুলে যাও বারবার। নিজেকে তুমি কিছুতেই লুকোতে পার না। যে বেশই তুমি ধারণ কর না কেন—তোমার রূপ উথলে পড়বে তোমার সর্ব্বাঙ্গ থেকে। তুমি যে প্রকাশের দেবতা, তুমি নিজেকে কি লুকোতে পার?"

সপ্তশিরা পর্ব্বত হইতে উভয়ে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গিয়া বালক-রূপী বীণাপাণি সহসা বসিয়া পড়িলেন।

"এত ঢালু পাহাড় থেকে আমি নাবতে পাচ্ছি না"

"পট করে পাখী হয়ে উড়তে শুরু কর"

পিতামহ হাসিয়া উত্তর দিলেন।

"তা-ও হবার ইচ্ছে নেই"

"তাহলে?"

বালকরূপী সরস্বতীর নয়নে দুষ্টামিভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তিনি একটি শিশুতে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন।

"ও, বুঝেছি তোমার মতলব"

পিতামহ শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন, শিশু তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবতায় কাটিয়া গেল। তাহার পর শিশু পিতামহের কানে কানে বলিল, "লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল"

"কোথায়"

"কুবেরের অলকাপুরীতে"

"সেখানে তুমি কি করতে গিয়েছিলে"

"কুবেরের এক গণ্ড মূর্খ নাতিকে সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গম করবার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপক দরিদ্র, অর্থলোভে অসম্ভবকে সম্ভব করতে রাজি হয়েছিলেন, এখন ব্যাপার দেখে আমাকে ডাকাডাকি করছেন ব্রাহ্মণ"

"তুমি কি করলে"

"মূর্খকে কি করে' আপাত-বিদ্বান করা যায় তারই

স্থাপিত হলে হয়তো মূর্খরা ইচ্ছা করলেই বিদ্বান হতে পারবে, কিন্তু এখন তা হওয়া সম্ভব নয়। এখন—"

"যাক, ও কথা। লক্ষ্মী কি বললেন"

"আপনি যে বিষ্ণুকে জব্দ করতে চান তা তিনি টের পেয়েছেন। কি করে' পেয়েছেন তা জানি না। আমাকে তিনি অনুরোধ করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণুর এই কলহে আমরা যেন জড়িয়ে না পড়ি"

"তুমি কি বললে"

"বললাম কলহ যদি বাধে আমি তাঁর পক্ষে থাকব"

পিতামহের চক্ষু দুইটি হাসিতে ঝলমল করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্মিতমুখে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "হাঁসের পক্ষ দুটি, কিন্তু যখন সে ওড়ে তখন তার গতি এক দিকেই হয়। তোমার গতি যে কোনদিকে হবে তা আমি জানি সুতরাং আমার ভয় নেই"

পিতামহ 'উঃ' বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন।

"কি হল?"

"ওরা খুব জোর চুরি চালাচ্ছে"

"আপনার লাগছে না কি"

"লাগছে না? তোমার?"

বীণাপাণির শিশু-অধরে একটি মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল কেবল, তিনি ইহার কোনও উত্তর দিলেন না। প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"কশ্যপের তো কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।"

"এখানেই তার আসবার কথা ছিল। সপ্তর্ষিরা যে এত শিগগির রণে ভঙ্গ দেবেন, তা ভাবিনি। সেই জন্য তাকে বলেছিলাম মধ্য রাত্রিতে আসতে। মধ্য রাত্রির আর বেশী দেরিও নেই, চল ওই বড় পাথরটার উপর বসে' অপেক্ষা করা যাক। এই পথেই সে আসবে"

অদূরে একটি গোলাকার বিরাট প্রস্তর ছিল। উভয়ে তাহার উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রস্তরটি নড়িয়া উঠিল।

"এ কি"

প্রস্তর কথা কহিল।

"আমি কশ্যপ। প্রস্তর রূপ ধারণ করে' আপনাদের

পিতামহ বীণাপাণিকে কোলে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন।

"কি আপদ! এত জিনিস থাকতে তুমি প্রস্তররূপ ধারণ করতে গেলে কেন?"

কশ্যপ উত্তর দিলেন, "সমুদ্ররূপে বহুকাল অশান্ত ছিলাম। প্রস্তরের সুনিবিড় স্থৈর্য খুব ভাল লাগছিল পিতামহ"

"স্বৈরচর হওয়ার সুবিধাটা দেখ! যাই হোক বিনতা কি বললে"

"তাকে স্বৈরচর করে' দিলে গরুড়কে ঠিক টেনে আনবে। আমি গরুড় রূপ ধরে তার কাছে গিয়েছিলাম দেখলাম এখনও সে গরুড়ের জন্য উতলা।"

"সবাইকে তো আর চট করে' স্বৈরচর করা যায় না। দেখি দৌড়টা কতদূর"

"সে তপস্যা করছে"

"দেখা যাক"

পিতামহ সানন্দে লক্ষ্য করিলেন কশ্যপের মুখমণ্ডলে একটা গদগদ ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই তিনি চাহিতেছিলেন। সম্মোহিত ভক্তকেই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা সম্ভব। বিনতা-প্রসঙ্গেই আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল কিন্তু শিশু-রূপিণী বীণাপাণির নয়নের দিকে চাহিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন। মনে হইল কশ্যপকে তিনি বোধহয় কিছু বলিতে চান।

পিতামহ কশ্যপকে বলিলেন, "কশ্যপ তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি এই শিশুটিকে রেখে আসছি"

বীণাপাণিকে কোলে করিয়া পিতামহ পুনরায় পর্বতারোহণ করিতে লাগিলেন এবং কিছুদূর উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরমুহূর্তেই পর্বতগাত্রস্থ শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যে দুইটি অপরূপ নৈশ বিহঙ্গম কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল তাহারাই যে পিতামহ ও সরস্বতী তাহা কল্পনা করা কশ্যপের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

সরস্বতী কহিলেন—"আপনার কশ্যপকে একটু কাজে লাগাতে চাই পিতামহ"

"স্বচ্ছন্দে। কি করতে হবে বল। ও যে রকম মুগ্ধ হয়েছে ওকে এখন যা করতে বলব তাই করবে। কি

"আপনি বললে হবে না, আমি বলব। আপনি একটু অন্তরালে থাকুন"

"বেশ। আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি। তুমি বেশী বিলম্ব কোরো না। আমি বরং এক কাজ করি তারাকে নিয়ে আসি। তাকে একটু দরকার"

"কোন তারা"

"বৃহস্পতির বউ গো, চাঁদ যাকে নিয়ে পালিয়েছিল। বুধের মা"

"বুঝেছি। আচ্ছা, যান"

পিতামহ আলোক-রেখা-রূপে আকাশের দিকে চলিয়া গেলেন। বীণাপাণি কশ্যপের সমীপবর্ত্তী হইলেন শবরীর রূপ ধারণ করিয়া। (ক্রমশঃ)

বীজ সংগ্রহ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বীজ সংগ্রহ ব্যাপারে আমাদের দেশের কৃষকেরা খুবই উদাসীন এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন যত্ন গ্রহণ করেন না। গুদামে বীজ রক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়—সবল, সুস্থ, তেজালো, নীরোগ এবং পোকা মাকড় অনাক্রান্ত গাছের সবল, সুস্থ, পুষ্ট, নীরোগ ও পোকা মাকড় অনাক্রান্ত বীজই সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই সহজ কথাটা বুঝিবার জন্য বিশেষ

কুমিকুমির বীজ সংগ্রহ

বিদ্যা, বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। ক্ষেতের এইরূপ গাছ নির্ব্বাচন করিয়া তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিবার জন্য যে সময় যায় ও পরিশ্রম হয়, তাহার তুলনায় সেই বীজ হইতে পরবর্ত্তী বৎসর যে ফসল ও ফলন হয় তাহার মূল্য খুবই বেশী।

আমরা প্রায়ই "বৈজ্ঞানিক কৃষি" বলিয়া থাকিএবং আরও বলি যে [illegible] না করিলে কৃষির উন্নতি সুদূর পরাহত। কিন্তু অতি সাধারণ ও সহজ প্রণালীর সাহায্যে বীজ সংগ্রহ করিলে দেশের খাদ্য-ফসলের ফলন অনেক পরিমাণেই বাড়িয়া যাইবে।

পাশ্চাত্য দেশে কৃষি কার্য্যে যন্ত্রের প্রচলন খুবই অধিক হইয়াছে, এবং বীজ সংগ্রহ ব্যাপারেও যন্ত্রের প্রচলন আছে, কিন্তু এমন সব ফসল আছে যে তাহাদের বীজ সংগ্রহ যন্ত্রের সাহায্যে করা সম্ভব নহে। উদাহরণ স্বরূপ লাউ, কুমড়া, জাতীয় (Gourd Species) ফসলের কথা বলা যায়। ইহাদের বীজ হাতের সাহায্যেই সংগ্রহ করিতে হইবে। এই জাতীয় শস্যের বীজ সংগ্রহ করা কঠিন নহে, কিন্তু ইহাতে সময় বেশী লাগে এবং নিপুণতাও প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর শস্যের বীজ-সংগ্রহের জন্য মজুর বা কৃষাণ নিযুক্ত করিতে হয় না, ইহা "পরিবারের কাজ" বলিয়াই গণ্য হয়—এবং কৃষকের পত্নী, পুত্র, কন্যারাই এইরূপ ফসলের বীজ সংগ্রহ করেন, পাশ্চাত্য দেশের এই প্রথা প্রচলিত।

নিউজিল্যাণ্ডের টৌরাঙ্গা (Tawranga) নামক এক স্থানের একজন কৃষক বিলাতী কুমড়া ও "কুমি কুমি" (কুমড়া জাতীয় শস্য) শস্যের বীজ সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন এবং সেই হেতু বাজারে তাহার বীজের চাহিদা খুব বেশী ও উহা উচ্চতর মূল্যে বিক্রীত হয়। আমাদের দেশের কৃষকেরাও লাউ, কুমড়া প্রভৃতি জাতীয় শস্যের বীজসংগ্রহ ও রক্ষা সম্বন্ধে টৌরাঙ্গার কৃষকের ন্যায় যত্ন গ্রহণ করিলে খুবই লাভবান হইবেন।

টৌরাঙ্গার কৃষকটি প্রত্যেক বৎসর ৩ হইতে ৫ একর পর্য্যন্ত ভুট্টার চাষ করেন, ভুট্টার জমিতেই শীতকালে তাঁহার শূকর (pigs) বাস করে, এবং প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভুট্টার চাষ করেন। ভুট্টার সারির মাঝে মাঝে তিনি 'কুমি কুমি' রোপন করেন, একর প্রতি ভুট্টার ফলন ৮০ হইতে ১০০ 'কুশল' হয়। কুমিকুমির ফলনও বেশী হয়। ভুট্টার "মোচা" (cobs) তুলিয়া লইবার পর সেই জমিতে তিনি গরু ছাড়িয়া দেন, গরুগুলি ভুট্টার গাছ খায়, ইহার পরে কৃষকটি একটি ছুরির সাহায্যে অনেকগুলি কুমিকুমি চিরিয়া তাহার মধ্য হইতে শাঁসসমেত

লম্বালম্বি চিরিয়া দেন না, মাঝে চিরিয়া দেন। এই সকল কুমিকুমির বীজ হাতের সাহায্যেই বাহির করেন, বীজ বাহির করিয়া শাঁস ফেলিয়া দেন, মাঠের শূকরগুলি যে সকল কুমিকুমি চিরিয়া বীজ বাহির করা হইয়াছে সেই সকল কুমিকুমি খায়। ইহার কিছুদিন পর শূকরের জন্য পুনরায় আর একদফা কুমিকুমি চিরিয়া দেন; উৎকৃষ্ট ও পুষ্ট কুমিকুমি হইতেই বীজ সংগ্রহ করেন। শূকরগুলি চেরা কুমিকুমিগুলিই খাইয়া থাকে, যে কুমিকুমিগুলি চেরা হয় না শূকরগুলি তাহা খায় না, তাহারা এইরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কুমিকুমি হইতে বীজ সংগ্রহ করিবার পর বীজগুলির সহিত শাঁস, মাটি প্রভৃতি লাগিয়া থাকে তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে, পরে একটি বালতির ½ অংশ বীজের দ্বারা ভর্ত্তি করিতে হইবে, এবং ইহার উপর জোরে জল ঢালিতে হইবে, বালতি জলে পূর্ণ হইয়া যাইবার পর বীজগুলি উপরে ভাসিতে থাকে, এবং হাতের সাহায্যে উহাদের তুলিয়া অন্য একটি বালতিতে ঢালিতে হইবে। শাঁস এবং নিকৃষ্ট বীজগুলি জলের তলায় পড়িয়া থাকিবে। সাধারণতঃ এইরূপে বীজগুলিকে একবার ধুইলেই চলে, যদি বেশী পরিমাণ শাঁস বীজের সহিত লাগিয়া থাকে তবে আর একবার ধোয়ার প্রয়োজন হয়। ইহার পর তলায় বহু ছিদ্রযুক্ত একটি পাত্রে বীজগুলিকে ঢালিতে হয়, ইহাতে অবশিষ্ট জল বাহির হইয়া যাইবে।

বীজগুলিকে শুখাইবার সময়েও বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিতে হইবে, মনে রাখা দরকার যে বীজগুলি ভালভাবে না শুখাইলে উহাতে ছাতা ধরিয়া যাইবে। মাচার উপর পাত্রে (tray) বীজ শুখানোই ভাল। বীজগুলিকে পাতলা করিয়া পাত্রে ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং যতদিন না ভালভাবে শুখায় প্রত্যেক দিন নাড়িয়া দিতে হইবে। স্থানীয় আবহাওয়ার উপরেই বীজ কতদিনে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইবে তাহা নির্ভর করে। যদি রৌদ থাকে, মাচাগুলিকে দিনমানে বাহিরে রাখা যায়, এবং ১৫ দিনের মধ্যে বীজ ভালভাবে শুখাইয়া যায়, জলবায়ু যদি শুখাইবার পক্ষে অনুকূল না হয় তাহা হইলে ইহাপেক্ষা অধিকতর সময় লাগে, এ ক্ষেত্রে বীজগুলি প্রত্যহ ভালভাবে নাড়িয়া দিতে হইবে, তাহা না করিলে 'ছাতা' রোগের আক্রমণের খুবই আশঙ্কা থাকে। খটখটে আলো বাতাসযুক্ত স্থানে 'থলি' (openmesh bag) থলিতে বীজ রাখা উচিত।

একর প্রতি ৩৫০।৪০০ পাউণ্ড কুমিকুমির বীজ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার-এট-ল

(শ্রীশুক)

অতঃপর এইরূপ শুনিয়া বচন
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনকামী যত গোপীগণ
উপনীত তাহাদের সান্ত্বনার বাণী,
দিলেন উদ্ধব প্রিয় সমাচার আনি'।

(শ্রীউদ্ধব)

কি কৃতার্থ আপনারা লোকপূজ্য ভবে,
ভগবান্ বাসুদেবে চিত্তার্পিত সবে।
দান ব্রত তপ হোম স্বাধ্যায় সংযম,
জপ আদি ভক্তিলাভে বিবিধ নিয়ম।
উত্তমশ্লোকের প্রতি ভক্তি এই মত
মুণিদের ও সন্নিকটে দুর্লভ সতত।
পতিপুত্র দেহ সুখ স্বজন ভবন,
সব ছাড়ি স্মরি সবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ,
বরণ করেছ সেই পুরুষ পরম,
অধোক্ষজে এই ভক্তি জানি সর্ব্বোত্তম।
ভাগ্যবতী গোপীদের সুচির বিরহ,
আমারে করেছে জানি অতি অনুগ্রহ।
আনিয়াছি প্রিয়ের সংবাদ সুখাবহ,
ভর্ত্তৃরহস্কর আমি সে সন্দেশ লহ :—

(শ্রীভগবান্)

গোপীদের সাথে আমার বিয়োগ হয়নি কখন, হবার নয়,
আকাশ বাতাস সলিল পৃথিবী মহাভূতগুলি ভূতেই লয়।
আমিই সবার আত্মা জানিও, মনপ্রাণ ভূত ইন্দ্রিয়গুণ,
সকলেরই মাঝে আমি বিরাজিত আমিই আধার আমি অরুণ।
ভূতেন্দ্রিয় ও গুণরূপমায়া প্রভাবে সৃজন পালন নাশ,
আমি আপনাকে আপনাতে রচি চিরকাল করি লীলা প্রকাশ।
জ্ঞানময় এই আত্মাশুদ্ধ গুণের সহিত নাই মিলন,
স্বতন্ত্র তাই আত্মা সতত অপাপবিদ্ধ চির নূতন!
যত প্রসুপ্তি জাগরণ সুপ-স্বপ্ন সকল মানসমূলে।
বিশ্ব জ্যোতিঃ ও প্রাজ্ঞরূপেই প্রতীয়মান তা মায়ার ভুলে।
সুপ্তোত্থিত পুরুষ যেমন অলীক স্বপন সতত স্মরে,
যে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ স্মরণ করে,
যে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির বিশ্রাম উপলব্ধি হয়,
আলস্য ছাড়ি সে মন সতত দমন করা কি উচিত নয়?
যথা নদ নদী সাগরে বিলীন মনীষিগণের বেদ অধ্যায়,
যোগ তপস্যা ত্যাগ ও সত্য সাঙ্খ্য ও দম লীন আত্মায়।
আমি তোমাদের নয়নের প্রিয় তথাপি আমি যে রয়েছি দূরে
অন্তরে যাতে একান্ত পাও ধ্যানলোকে মোরে মানসপুরে
প্রিয়তম যদি দূরে রয় তবে তার দিকে মন আরও ধায়,
নয়নাগ্রে নিকটে রহিলে কেহ নাহি তারে অধিক চায়।
মন দেবে মোরে সকল বৃত্তি ছাড়িয়া বাঁধিবে প্রীতির ডোরে,
নিত্য আমার ধ্যানে রত হও, শীঘ্র তা হ'লে লভিবে মোরে।
ব্রজে নিশাকালে বনে বনে যবে ছিলাম মগন রাসোল্লাসে
যারা অলব্ধ রাসবিহারেতে, স্মরণে লভেছে আমারে পাশে।

(ক্রমশঃ

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২

আফ্‌গানিস্তানের দূতাবাসে পৌঁছে পরিচয় দিতেই সেখানকার সকলে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সোভিয়েট রাজ্যে যাবার পথে তাঁদের দেশের মধ্য দিয়ে যাবো শুনে আরো বেশী খুশী হলেন তাঁরা। বার-বার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন ওঁদের দেশটাও যেন এই সুযোগে ঘুরে দেখে যাই! তাঁরা বললেন,—আফ্‌গানরা আমাদের ভারতকে প্রতিবেশী এবং অন্তরঙ্গ-বন্ধুর মতই ভালবাসে এবং আমরা ভারতবাসী বলেই আমাদের উপর তাঁদের এ অনুরোধের দাবী।

কথাটা খাঁটি। ভারতের সঙ্গে আফ্‌গানিস্তানের সখ্য সম্পর্ক শুধু এই আজ নয়···বহু-বহু যুগ থেকে এ দুই দেশের সম্পর্ক শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে নয়···রাজনৈতিক এবং কৃষ্টি সামাজিকতারও রীতিমত লেন-দেন ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায়! মহাভারতের গান্ধার দেশের অর্থাৎ আজকের কান্দাহারেরই রাজ-কন্যা শত-পুত্রবতী গান্ধারী ভারতের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাণী। কোন সুদূর অতীতে আফগানিস্তানের বন্ধুর পার্বত্যমালা পার হয়েই আর্যজাতি এসে একদা বাসা বেঁধে ছিলেন এই ভারতভূমিতে! তাছাড়া গ্রীক-বীর আলেকজান্দারও সসৈন্যে ভারত অভিযানে এসেছিলেন এই আফ্‌গানিস্তানেরই দুরূহ পথ পার হয়ে। তাঁর এই বিজয় অভিযানের পর মৌর্য্য-বংশীয় বীর চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের যুদ্ধে হারিয়ে আফ্‌গানিস্তানের অনেকাংশ নিজ-রাজ্যভুক্ত করেন; তার পরেও বহুদিন ধরে আফ্‌গানিস্তান ভারতেরই অঙ্গীভূত ছিল। সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার-ফলে ভারতের ভিক্ষু-শ্রমণরা গিয়েছিলেন সুদূর আফ্‌গানিস্তানে। বৌদ্ধ কৃষ্টি-কলা-ধর্ম্মের কিছু কিছু চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায় আফ্‌গান্ রাজ্যে! কুশান সম্রাটদের রাজ্যকালেও রাজা বিম্ শক্ এবং কনিষ্ক আফ্‌গানিস্তানে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন—কাশ্‌গড়, খোটান্, ইয়ারকন্দ্, পেশোয়ার পর্য্যন্ত! এমন বহু নিদর্শন থেকে জানা যায় বহু যুগ যুগান্ত ধরে ধর্ম্ম, রাজনীতি, কলা-কৃষ্টি আর সামাজিক-সম্প্রীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল আফ্‌গানিস্তানের সঙ্গে ভারতের! আফ্‌গান্ দেশেরই বীর ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মোগল-সাম্রাজ্য! মোগল-শাসকদের আমলে এই দুটি প্রাচ্য দেশের মধ্যে স্থান-কাল-আদর্শের ভেদাভেদ, দূরত্ব ঘুচে গড়ে উঠেছিল মধুর মৈত্রী সম্পর্ক! সে মৈত্রী-বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল হয়েছিল শুধু প্রতীচ্যের বিদেশী অভ্যাগতদের ভেদ নীতির রাজনৈতিক-চক্রান্তের ফলে। সৌভাগ্যক্রমে আজ সে ভেদ-নীতির কুটিল চক্রান্তের হয়েছে অবসান। নবজাতক স্বাধীন ভারত আজ আবার সেই পুরোনো বন্ধুত্বের সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে আফ্‌গানিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে। ভারতবাসীকে তাই আজ আফ্‌গানিস্তানের অধিবাসীরা মন থেকেই ভালোবাসে···বন্ধু বলেই জানে এবং প্রতিবেশী-আত্মীয় হিসাবে মানে। আমাদের প্রতি দিল্লীর আফ্‌গান দূতাবাসের বন্ধুদের শিষ্ট মধুর ব্যবহার সেই কথারই পরিচয় দিলে বিশেষ করে!

আপ্যায়িত হলেও আফ্‌গানিস্তানের পথে চলবার Visa বরাতে জুটলো না সেদিন! আফ্‌গান-রাজদূত কার্য্যান্তরে দিল্লীর বাইরে বেরিয়েছেন সফরে···তাঁর সই দস্তখৎ না হলে মঞ্জুর হবে না পথ চলবার মঞ্জুরনামা! পরের দিন মধ্যাহ্নে দিল্লীতে ফিরবেন তিনি সফর সেরে···তবে সেদিন রবিবার···ছুটির দিন···আফ্‌গান্-দূতাবাসও বন্ধ থাকবে! সুতরাং সোমবার সকালে আমাদের আর একবার আসতে হবে—পথ চলার Visa সংগ্রহ করে নিতে। দূতাবাসের বন্ধুরা জানালেন ব্যবস্থা ঠিক থাকবে···শুধু এসে নিয়ে যাওয়ার ওয়াস্তা!

আফ্‌গান্ দূতাবাসের বাইরে অপেক্ষমান আমাদের সেই ট্যাক্সিতে চড়ে রওনা হলুম 'আগ্রা হোটেলের দিকে! সারা সকাল এই চর্কি ঘোরার দরুণ ট্যাক্সির 'ট্যাক্‌সো লাগলো কড়কড়ে পঁচিশ টাকা!

হোটেলের বন্দোবস্ত ভালো···পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি! দক্ষিণাও সেরস্ত পোষা!

স্নানাহার সেরে একটু গড়িয়ে নেওয়া গেল। তারপর চিঠি-পত্র লেখার পালা সেরে আবার তৈরী হলুম বেরুবার জন্য। বেলা পৌনে চারটেয় ট্যাক্সিকে বলেছি আসতে—পাকিস্তান হাই-কমিশনারের অফিসে যাবো আমাদের পাকিস্তানী-পথের Visaগুলি সংগ্রহ করে আনতে। তারপর সেখান থেকে যাবো সোভিয়েট দূতাবাসে। সোভিয়েট-সহযাত্রী ভারতীয় ফিল্‌ম্ ডেলিগেশন্ দলের আর সব প্রতিনিধিরাও সেখানে আসবেন—তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সেরে, যাত্রার প্রয়োজনীয় কাগজ-

পত্রে সই-সাবুদ করিয়ে পথের ব্যবস্থাদি জেনে, নেবো বলে। সকালে শ্রীযুত সানদেস্কো এই কথা আমাদের জানিয়ে রেখেছিলেন।

ট্যাক্সি এলো চারটের সময়। সোজা গেলুম পাকিস্তানের হাই কমিশনারের দপ্তরে। নিমাই ঘোষও ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাজির হয়েছিলেন—পাশ্‌পোর্টের জন্য তাঁর সদ্য-তৈরী করানো ফটোর কপিগুলি নিয়ে। 'মহর্ষি'র আর আমার পাশ্‌পোর্টে পাকিস্তানের Visaর ছাপ পড়লো...নিমাই ঘোষের পাশ্‌পোর্টে ছাপ মিলবে সোমবার দুপুরে।

পাকিস্তানী দপ্তরের কাজ সেরে সোভিয়েট দূতাবাস। দরজার সামনেই দেখা হলো শ্রীযুত ভীকভের সঙ্গে...সমাদরে অভ্যর্থিত করে নিয়ে গিয়ে বসালেন সুসজ্জিত বসবার ঘরে। আমাদের তিন জনের পৌঁছুনোর কিছু পরেই এলেন শ্রীমতী দুর্গা খোটে। 'মহর্ষির' সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল ...স্মিতহাস্যে মধুর-বচনে ভাঙা-ভাঙা বাংলা ভাষায় 'দাদা' বলে নমস্কার জানিয়ে আলাপ জমালেন। আমার সঙ্গেও শ্রীমতী খোটের অল্প স্বল্প পরিচয় ছিল। হিন্দী 'মীরা', 'রাজরাণী মীরা' প্রভৃতি ছবিতে কাজের সময় যখন কলকাতায় ছিলেন, সে সময় কয়েকবার তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন চিত্র পরিচালক শ্রীদেবকী কুমার বসুর সঙ্গে। পুরোনো পরিচয়ের সূত্র ধরে আবার নতুন করে আলাপ জমে উঠলো আমাদের—বিশেষ আমরা সবাই যখন একই সোভিয়েট-পথের পথিক! আলাপ আলোচনার মধ্যেই এক ফাঁকে শ্রীযুত সানদেস্কোও এসে হাজির হলেন। সোভিয়েট যাত্রার বিষয়ে নানা আলোচনা জমে উঠেছে, এমন সময় এসে পৌঁছুলেন আমাদের সহযাত্রী মান্দ্রাজের চলচ্চিত্র-প্রতিনিধি তিনজন। মান্দ্রাজ থেকে প্লেনে আজ দুপুরে তাঁরা এসে পৌঁচেছেন দিল্লীতে। এঁদের দলের পাণ্ডা হলেন শ্রীযুত সুব্রহ্মণ্যম এবং তাঁর সঙ্গে এসেছেন শ্রীযুত কৃষ্ণণ এবং তস্য সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মথরম্। এঁদের মধ্যে শ্রীযুত সুব্রহ্মণ্যমই ইংরেজী-ভাষী, বাকী দু'জন মান্দ্রাজী এবং হিন্দী ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলেন।

প্রতিনিধিরা সকলে এসে পৌঁছুবার পর শ্রীযুত সানদেস্কো আমাদের আহ্বান জানালেন—সোভিয়েট-দূতাবাসের সুসজ্জিত বিরাট মন্ত্রণা-কক্ষে। দলের প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয়ের পর সুরু হলো আমাদের সোভিয়েট-যাত্রীদলের সভার কাজ। সে মিটিংএ আমাদের সকলের সম্মতিক্রমে দলের প্রবীণতম মনোরঞ্জনবাবুকে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে নির্ব্বাচিত করা হলো! 'মহর্ষি' তাঁর বার্দ্ধক্যের অজুহাত তুললেন...শ্রীযুত সানদেস্কো প্রস্তাব জানালেন যে নেতার কাজে-কর্ম্মে সহকারিতা করতে হবে আমাকে।

প্রাথমিক পর্ব্বের পালা শেষ করে শ্রীযুত সানদেস্কো এবার জানালেন, আমাদের পরিব্রাজনা-পথের পরিচয়! দিল্লী থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর সকালে এরোপ্লেনে উড়ে আকাশ পথে রওনা হয়ে আমরা প্রথমে যাবো পাকিস্তান-রাজ্যের লাহোরে। সেখানে বিখ্যাত 'ফেলেটিস্' হোটেলে' (Falletti's Hotel) স্নানাহার-বিশ্রামাদির পর সন্ধ্যার ট্রেণে যাত্রা হবে পেশোয়ারের অভিমুখে। সারা রাত ট্রেণে কাটিয়ে পরের দিন [illegible] পৌঁছবো পেশোয়ারে। [illegible] 'ডীন্স্ হোটেলে' (Dean's Hotel) স্নান এবং আহারের পালা সেরে সেদিন দুপুরেই মোটরে চড়ে পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে, খাইবার গিরি-বর্ত্মের মধ্য দিয়ে, আফ্‌গানিস্তানের গিরি-কান্তার পার হয়ে যাত্রা করবো সুদূর কাবুল শহরের পানে। পেশোয়ার অবধি আমাদের এই সুদীর্ঘ পথের সঙ্গী ও সহায় হবেন—দিল্লীর সোভিয়েট দূতাবাসের অন্যতম কর্ম্মী বন্ধুবর শ্রীযুত ভীকভ! তারপর পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্য্যন্ত আমাদের দেখাশোনার এবং অন্যান্য পথের জিম্মেদারীর ভার গ্রহণ করবেন কাবুলের সোভিয়েট দূতাবাসের বন্ধুরা। পেশোয়ারে পৌঁছে কাবুলের সোভিয়েট দূতাবাস থেকে আগত নতুন পথ-পরিদর্শক বন্ধুদের হাতে আমাদের সমর্পণ করে শ্রীযুত ভীকভ আবার ফিরে আসবেন তাঁর দিল্লীর দপ্তরে। পেশোয়ার থেকে কাবুলে নিয়ে যাওয়া এবং কাবুল থেকে সোভিয়েট রাজ্যে

সোভিয়েটের পথে ভারতীয় ফিল্ম প্রতিনিধি দল। উহাদের মধ্যে লেখক শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন [illegible]পাধ্যায় ও শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে [illegible] যাইতেছে

পৌঁছে দেবার যা কিছু ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত সবই করবেন আফগানিস্তানের সোভিয়েট-দূতাবাসের কর্ত্তারা। তারপর সোভিয়েট-রাজ্যের ভূমিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সব ভার নেবেন সেখানকার চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভার প্রতিনিধিবর্গ। এই হলো মোটামুটি ব্যবস্থা!

শ্রীযুত সানদেস্কোর বক্তৃতা শেষ হবার পর, আমাদের মধ্যে অনেকেই নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন তাঁকে—সোভিয়েট দেশ এবং সেখানকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে! একের পর এক সে-সব প্রশ্নের উত্তর দেবার পর শ্রীযুত সানদেস্কো সবিনয়ে জানালেন যে ভারতস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত

শ্রীযুত নোভিকভ্ আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের প্রত্যেককেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন আগামী সোমবার রাত্রে তাঁর দিল্লীস্থ ক্যানিং রোড-ভবনে গিয়ে আলাপ-পরিচয় এবং একত্রে নৈশ-ভোজন করবার জন্য। এমন সুন্দর প্রস্তাবে আমাদের চারজনের আপত্তি করবার কোনো কারণই ছিল না—কিন্তু অসুবিধা ঘটলো মাদ্রাজের সহযাত্রী-ত্রয়ের! কারণ, দিল্লীর মাদ্রাজী বাসিন্দারা এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার মদ্রদেশীয় সভ্যেরা মিলে সোমবার সন্ধ্যায় বিরাট এক সম্বর্দ্ধনা-সভার ব্যবস্থা করেছেন সোভিয়েট-গামী ভারতের চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের বিদায়-অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে…ভারত-গভর্ণমেণ্টের বেতার অনুসন্ধান দপ্তরের সচিব শ্রীযুত দিবাকর মহাশয় সভাপতিত্ব করবেন সে অনুষ্ঠানে এবং প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন সুবিখ্যাত দেশ-সেবক শ্রীযুত অনন্তশয়নম্‌ আয়েঙ্গার মহাশয়। তাছাড়া আরো অনেক হোমরা-চোমরা অতিথিরাও উপস্থিত থাকবেন সে সভায়। কাজেই সোভিয়েট-রাষ্ট্রদূতের সোমবার রাত্রের সাদর-আমন্ত্রণ মুলতুবী রাখতে হলো—ভবিষ্যত-সুযোগ সুবিধার আশায়! সোমবারে নিমন্ত্রণ-রক্ষা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় দেখে শ্রীযুত সানদেস্কো পুনরায় প্রস্তাব জানালেন মঙ্গলবার রাত্রের জন্য…কিন্তু এবারেও তাঁকে হতাশ হতে হলো। শ্রীযুত সুব্রহ্মণ্যম্ বললেন—মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লীর সুবিখ্যাত 'কন্‌ষ্টিটিউশান্ ক্লাবে' সোভিয়েট-গামী ভারতীয় চলচ্চিত্র দলের প্রতিনিধিদের জন্য আয়োজন হয়েছে আরো একটি সম্বর্দ্ধনা-সভার…সেখানে না গেলে চলবে না!

শ্রীযুত সানদেস্কো পড়লেন সমস্যায়…কারণ পরের দিন অর্থাৎ বুধবার ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রাতেই আমাদের দিল্লী ছেড়ে রওনা হতে হবে সোভিয়েট-রাজ্যের উদ্দেশে। সুতরাং মুস্কিল!…শেষ পর্য্যন্ত রফা হলো, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 'কন্‌ষ্টিটিউশান ক্লাবে' সম্বর্দ্ধনার পালা সেরে আমরা সবাই জমায়েৎ হবো সোভিয়েট-দূতাবাসে…তারপর সেখান থেকে যাবো রাষ্ট্রদূত শ্রীযুত নোভিকভের ক্যানিং রোড-ভবনে—তাঁর সঙ্গে আলাপ ও নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে! শ্রীযুত সানদেস্কো তাঁর সহকর্ম্মী শ্রীযুত জীকভকে আরো বলে দিলেন সোমবার সকালে আমাদের মধ্যে যাঁদের Visa সংগ্রহ হয় নি, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে পাকীস্তান আর আফগানিস্তান্ দূতাবাসের দপ্তরে গিয়ে সেগুলি সংগ্রহের ব্যবস্থা করে দিতে!

রবিবার কোনো কাজ ছিল না…ছুটি আর বিশ্রামের দিন। 'মহর্ষি' সারাদিনটা হোটেলে গড়িয়ে কাটিয়ে দিলেন, কেন না, তিনি সন্দিহান ছিলেন, সামনেই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, সে-সময় এমন অপরিমিত বিশ্রামের সুযোগ সম্ভবতঃ না জুটতে পারে! তাছাড়া সকালে স্নানের সময় বাথরুমের কাঠের পাপোষে হোঁচট লেগে তাঁর পায়ের কড়ে আঙ্গুলটি রীতিমত জখম হয়ে তাঁকে কাবু করে তুলেছিল Korean সমস্যার মতই স্বচ্ছন্দ-বিহারের অন্তরায় এক অচল-অনড় অবস্থায় 'কড়িয়ান্' দুর্ভোগ। কাজেই তিনি আর বেরুলেন না—আমি দিল্লীর কুতুব-মিনার হুমায়ুনের কবর প্রভৃতির ছবি তুলতে! কারণ, সোভিয়েট যাত্রাপথে রঙীণ ছবি নেবো বলে, colour-filmএর যে Rollsগুলি সঙ্গে এনেছি—দিল্লীর কাষ্টম্‌সের কর্ত্তা সেন-গুপ্ত মশাইয়ের কাছে শুনলুম, সেগুলি নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে পথ-চলায় বিভ্রাট ঘটতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই কাষ্টম্‌সের নিয়ম হলো—Undeveloped unexposed ফিল্ম নিয়ে যে কোনো রাজ্যে প্রবেশ করা চলে; কিন্তু Exposed অথচ Undeveloped ফিল্‌মের ফিতে নিয়ে বেরিয়ে আসা চলে না…রীতিমত বে-আইনী ব্যাপার। বিদেশী ভ্রমণকারীরা দেশ-ভ্রমণের সময় বিদেশের যে সব ছবি তুলে থাকেন—কাষ্টম্‌স্ বিভাগের কর্ম্মীরা দেশের স্বার্থরক্ষার খাতিরে প্রয়োজন বুঝলে সে-সবই দেখতে এবং কোনো গোলমালের গন্ধ পেলে আটক করেও রাখতে পারেন তাঁদের জিম্মায়! অতএব ছবি যা খুশী তুলুন না কেন, বিদেশী-পরিব্রাজকের দল…কাষ্টম্‌সের কর্ম্মীদের কাছে সে সবই দেখানোর ব্যবস্থা রাখতে হয়। কোনো কারণে Positive Print করা যদি একান্তই সম্ভব না হয়ে ওঠে—তাহলে অন্ততঃ develop করা Negativeখানাও দেখানো চলতে পারে এই সব দেশ-রক্ষা কাষ্টম্‌স্-কর্মীদের পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণার ব্যাপারে।

বরাতক্রমে আমার সঙ্গে যে colour-filmগুলি ছিল—সে-সবই Kodachrome—এবং সেগুলি পরিস্ফুটনার ব্যবস্থা আছে একমাত্র আমেরিকা, ইংলণ্ড, আর ভারতের বোম্বাইয়ের Kodak প্রতিষ্ঠান-গুলিতে। তাঁদের নিজস্ব বিশিষ্ট যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ছাড়া এ-ফিল্মগুলির developing যেখানে-সেখানে হওয়া সম্ভব নয়…এবং যে-হেতু সোভিয়েট-রাজ্যে Kodak প্রতিষ্ঠানের কোনো colour-film developingএর ব্যবস্থা নেই, সেই হেতু আমার তোলা exposed ফিল্মগুলি পরিস্ফুটন করারও অসুবিধা রয়েছে বিলক্ষণ! এই বিবেচনা করেই আমি স্থির করলুম, সঙ্গে-আনা colour-filmগুলিতে দিল্লীর নানা দ্রষ্টব্য স্থানের ছবি তুলে শেষ করে বোম্বাইয়ে পাঠিয়ে দেবো যথারীতি পরিস্ফুটনার উদ্দেশে এবং তার বদলে সোভিয়েট-যাত্রার পথে দিল্লীর দোকান থেকে কিনে নেবো সাধারণ সাদা-কালো ছবির Panchromatic filmএর কটা 'রোল্'! কাজেই রবিবারটা কাটালুম ছবি তুলে এবং ঘুরে বেড়িয়ে!

আগেকার ব্যবস্থামত সোমবার সকালে আবার গেলুম সোভিয়েট দূতাবাসে। দলের আর সকলের সঙ্গে দেখা করার পর শ্রীযুত জীকভ সোভিয়েট দেশে তৈরী দূতাবাসের সুদৃশ্য 'Pobeda' মোটর-গাড়ীতে 'মহর্ষিকে' এবং আমাকে নিয়ে বেরুলেন পাকীস্তান এবং আফগানিস্তানের দপ্তর থেকে আমাদের Visaগুলি সংগ্রহের উদ্দেশে! আমাদের সঙ্গেই মাদ্রাজের 'জেমিনী ষ্টুডিও'র অনুরাগী-বন্ধুদের মোটর-ভ্যানে চড়ে চললেন মাদ্রাজের সহযাত্রী-ত্রয় এবং নিমাই ঘোষ।

প্রথমেই আফগানিস্তানের দপ্তর…সেখানকার বন্ধুরা ইতিমধ্যে

গেল এখানকার! আফগান-রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও পরিচয় হলো…বেশ অমায়িক আলাপী লোক!

দুপুরে স্নানাহারাদির পর 'মহর্ষি' নিমগ্ন হলেন নিদ্রায়। আমি বেরুলুম Cine-filmএর সন্ধানে। সারা দিল্লী-সহরের দোকানপাঠ তল্লাশ করেও জোগাড় হলো না সাদা-কালো ছবি তোলবার Panchromatic filmএর এক টুকরো! যেখানেই যাই, দেখি রঙীণ ফিল্ম… শেষে হায়রাণ হয়ে হোটেলে ফিরে এলুম।

সন্ধ্যার আগেই মোটর ভ্যানে করে দিল্লীর বন্ধুরা এলেন—অভিনন্দন-সভায় আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। নয়া-দিল্লীর বহির্ভূত অঞ্চলে বিরাট আসর…প্রায় হাজার দেড়েক লোকের সমাগম। সুসজ্জিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের একাংশে প্রকাণ্ড পাকা রঙ্গমঞ্চ! আমরা সদলে গিয়ে পৌঁছুতেই ওঁরা আমাদের বসালেন রঙ্গমঞ্চের উপরে সাজানো আসনে। তারপর সুরু হলো অনুষ্ঠান,…মালাদান, অভিবাদন প্রভৃতি আনুসঙ্গিক ব্যাপার। ভারতের অন্যতম রাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত দিবাকর, ব্যবস্থাপক-সভার বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুত অনন্তশয়নলিঙ্গম্ প্রভৃতি দেশ-নেতারা সোভিয়েট-গামী ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলকে শুভেচ্ছা জানালেন সাধু সুবচনে।… আমাদের যাত্রা শুভ হোক্…নতুন দেশের নতুন মানুষের সঙ্গে মিশে নতুন নতুন জ্ঞান চিন্তা-ভাবধারা এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে আসি এই তাঁদের শুভ ইচ্ছা! আমাদের এই ভারতীয় চলচ্চিত্র দলের পরিভ্রমণের এবং পরিচয়ের মাধ্যমে সূচিত হোক্ ভারত ও সোভিয়েট দেশবাসীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সংস্কৃতি এবং মৈত্রী বন্ধনের শান্তিময় গৌরবোজ্জ্বল এক নতুন প্রগতি-অধ্যায়!

সভা শেষ হলো প্রায় রাত দশটায়। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা গেলুম যে যার নিজের আস্তানায়।

১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে বেরুলুম আবার Cine-filmএর চেষ্টায়। অনেক ঘুরে শেষে পুরোনো দিল্লীতে এক দোকানে সুপ্রচুর না হলেও কাজ-চলবার মত কয়েকটি রোল Cine.film জোগাড় হলো!

সন্ধ্যায় 'Constitution Club'এর অভিনন্দন-আসরে আর গেলুম না। মহর্ষি এবং সহযাত্রীরা সকলেই হাজির ছিলেন সেখানে। দিল্লীর বাসিন্দা হয়ে যে-সব আত্মীয়-বন্ধু বস-বাস করছেন এখানে—দেশ-ছাড়ার আগে তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করে নিলুম। তারপর এলুম সোভিয়েট দূতাবাসে! সহযাত্রী-বন্ধুরাও অভিনন্দন-আসর থেকে ফিরে একত্র জড় হবার পর শ্রীযুত ঝাঁকভ ও দূতাবাসের অন্য বন্ধুরা আমাদের সাদরে নিয়ে গেলেন সোভিয়েট-রাষ্ট্রদূত শ্রীযুত নোভিকভের প্রাসাদোপম ক্যানিং রোড-ভবনে। গাড়ী থেকে নামতেই সাদর-অভ্যর্থনা জানিয়ে শ্রীযুত সান্দেৎস্কো সকলকে নিয়ে গেলেন সুসজ্জিত বসবার ঘরে—সেখানে শ্রীযুত নোভিকভের সঙ্গে হলো আমাদের পরিচয়। নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে পরম আগ্রহে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ করলেন তিনি। তারপর তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট অভ্যাগত-অতিথি ভারতস্থ চৈনিক রাষ্ট্রদূত এবং চীন-দূতাবাসের নবীন দুই কর্ম্মীর সঙ্গেও আমাদের পরিচয় দোভাষী সহকর্ম্মীর মারফৎ খবর দিলেন ভারত ও চীনের দেশপর্য্যটনকারী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের! এমনি কথায়-কথায় অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ বেশ জমে উঠলো আমাদের। এ-আসরে দিল্লীর সোভিয়েট-দপ্তরের অন্যতম বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুত এব্‌জিন্‌, বোলশাকভ্‌ প্রভৃতি আরো অনেক নতুন নতুন বন্ধুদের সঙ্গেও আলাপ হলো। শ্রীযুত এব্‌জিনের সঙ্গে আমার অল্প একটু পরিচয় হয়েছিল ইতিপূর্ব্বে—কলকাতায় অনুষ্ঠিত সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসবের (Soviet Film Festival) সময়। তখন নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে বাংলার চলচ্চিত্র কর্ম্মীদের কাছে সুবিখ্যাত সোভিয়েট চিত্র 'Fall of Berlin'এর যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল- তাইতে ছবির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে ইংরাজীতে দোভাষীর কাজ করেছিলেন শ্রীযুত এব্‌জিন্‌…সেই উপলক্ষেই তাঁর সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল! সেই পুরোণো সূত্র ধরেই আবার নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া গেল আলাপটাকে…বিশেষ এবার যখন চলেছি তাঁদের দেশ এবং সেখানকার বাসিন্দাদের কৃষ্টি-কলা-প্রগতির প্রত্যক্ষ পরিচয় জানতে। কথাপ্রসঙ্গে সোভিয়েট দেশের বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের হদিশ্ দিলেন তিনি।

সুপ্রসিদ্ধ রাশিয়ান 'ক্যাভিয়ার' এবং টুকি টাকি মুখরোচক খাদ্যের টাকনা-চাখার সঙ্গে সঙ্গে গল্প সল্প জমে উঠেছিল। এমন সময় আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন, শ্রীযুত নোভিকভকে—সোভিয়েট রাজ্যের সেই বিশ্ব বিশ্রুত Iron Curtain বা 'লৌহ যবনিকার' বিষয়ে… অর্থাৎ, যে-সব বিদেশী যান্ সোভিয়েট-দেশ পরিদর্শনে—তাঁদের নাকি সেখানকার সত্যিকারের চেহারা দেখবার বা জানবার সুযোগ দেওয়া হয় না মোটেই। স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘুরে সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করে দেখবার, জানবার এবং পরিচয় পাবার কোনো উপায়ই নেই তাঁদের—এমনি কড়া-পাহারার পর্দ্দায় ঘিরে রাখা হয় তাঁদের সর্ব্বদা…তার ফলে, সোভিয়েট দেশের আসল-রূপ রয়ে যায় বিদেশীদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা এবং অজ্ঞানতার কুয়াশার আড়ালে আবছা অস্পষ্ট হয়ে। সোভিয়েট রাজ্যের দুঃখ-দারিদ্র্য-গ্লানিভরা যে আসল চেহারা…সে নগ্নরূপ নাকি সে-দেশের কর্ত্তা-কর্ত্তারা সযত্ন-সতর্কতার সঙ্গে গোপন করে রাখেন বিদেশীদের জ্ঞান-গোচরের বাইরে। শুধু ও-দেশের ভালো ভালো যে দু'চারটি কীর্ত্তি-কলাপ, তাই নাকি রঙীণ করে সাজিয়ে ফলাও করে তুলে ধরা হয় বিদেশী-পরিব্রাজকদের অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে। তাছাড়া বিদেশীদের পক্ষে সোভিয়েট-রাজ্যের যত্র-তত্র বিচরণ করে বেড়ানোও নাকি সম্ভব নয়—কেন না, সে-দেশের নিষ্ঠুর-নির্ম্মম গোয়েন্দা N.K.V.D. প্রহরীর দল আচরণে এবং ক্রূরতায় নাৎসী আমলের হিট্‌লারী-গেষ্টাপোদের চেয়েও নাকি ভীষণ ও ভয়ঙ্কর। ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা কেউ নাকি কল্পনাও করতে পারে না সেখানে…এমন কি বাইরের বিদেশীদের সঙ্গে বন্ধুর মত সহজ ভাবে কথা-বলা, হাসি-ঠাট্টা বা গল্প-গুজব করাও নাকি সোভিয়েট দেশের বাসিন্দাদের পক্ষে গর্হিত অপরাধ…

সঙ্গে ও-দেশীদের আলাপ-আলোচনা-মেলামেশায়! সোভিয়েট মতবাদের বিরুদ্ধ-সমালোচনাও নাকি ও-দেশের বিধানে শাস্তি পাবার মত অপরাধ··· নিজস্ব চিন্তা এবং সত্বাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে কলের পুতুল হয়ে মুখ বুজে দিনাতিপাত করাই হলো সোভিয়েট-বাসীদের জীবনের ধারা। এমনি অমানুষিক নির্ম্মম-কড়া বিধি-নিয়ম-নিষেধের-শিকল-বন্দী এবং শাস্তি-অত্যাচারের লৌহ-যবনিকার অন্তরালে ঘেরা আছে সোভিয়েট জীবন! এই লৌহ-যবনিকা বা Iron Curtain এর ভিতরে বিদেশীদের প্রবেশের সুযোগ বা অধিকার নেই একেবারেই। তাঁরা বরাবরই থাকেন এই আবরণের বাইরে-বাইরে—সোভিয়েট দেশ সম্বন্ধে যা কিছু দেখে বা জানে, সে-সব নাকি খাঁটি নয় আদপেই।

কৌতূহলী হয়েছিলুম এ-বিষয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের জবাবটা কি—তাই শোনবার আশায়! প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হেসে সহজ ভাবেই শ্রীযুত নোভিকভ্ জবাব দিলেন—এ-সম্বন্ধে আমার বলবার প্রয়োজন কি বলুন?···আপনারা তো দুদিন পরে হাজির হচ্ছেন সেই 'লৌহ যবনিকার' রাজ্যে···তখন নিজেরাই জেনে-বুঝে বিবেচনা করবেন এবং স্বচক্ষে দেখতে পাবেন আমাদের দেশে সত্য-সত্যই এ-সবের কোনো অস্তিত্ব আছে কি না! সুতরাং আগে থাকতে এ বিষয়ে ভালো মন্দ কোন কিছু মন্তব্য করে আপনাদের স্বাধীন দৃষ্টি-ক্ষমতা বা নিজস্ব বিবেচনা-বুদ্ধিকে এতটুকুন প্রভাবিত করতে চাই না আপাততঃ! আমাদের দেশে ঘুরে ফিরে, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো লোকের সঙ্গে মিশে আপনারা নিজেরাই যাচাই করে দেখুন,—এর আসল রহস্য!

খানা-কামরায় খাওয়া দাওয়া সেরে আবার বসবার ঘরে ফিরে এসে দেখি—দূতাবাসের অন্য সব কর্ম্মীরা পর্দ্দা এবং মেসিন খাটিয়ে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন সিনেমার ছবি দেখানোর জন্যে। সহযাত্রী শ্রীযুত সুব্রহ্মণম্ তাঁর পরিচালিত এবং শ্রীযুত কৃষ্ণণ ও শ্রীমতী মথুরমের অভিনীত কয়েকটি মান্দ্রাজী চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলী আর জেমিনী ষ্টুডিওতে প্রযোজিত 'চন্দ্রলেখা' চিত্রের কিছু বিশিষ্ট নৃত্যগীতাভিনয়ের দৃশ্য-সম্বলিত তিন-চারটি 'রীল' ফিল্‌ম্ সঙ্গে এনেছিলেন মস্কোতে সোভিয়েট চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভাকে উপঢৌকন দেবেন বলে! প্রথমে সেইগুলিই দেখানো হলো···তারপর দেখলুম—সোভিয়েট দেশের ফিল্ম 'Grey Neck' প্রভৃতি খানকয়েক রঙীণ 'কার্টুন'। সোভিয়েট ভাষায় এদের বলে Multiplication film এবং গোটা কয়েক Documentary ফিল্‌ম্।

সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল—বুঝতেও পারিনি! পরের দিন প্রাতে আমাদের পাড়ি দিতে হবে সোভিয়েট-রাজ্যের পথে···এবং নিজেদের আস্তানায় ফিরে গোছ-গাছ করে নেওয়ার প্রয়োজনও আছে প্রত্যেকের। কাজেই মন না সায় দিলেও সভা ভঙ্গ করে যে-যার ডেরায় ফিরলুম আমরা!

পরের দিন প্রত্যুষেই স্নান ও প্রাতরাশ সেরে যাত্রার জন্য তৈরী

সারথি—ক্ষিপ্রগতিতে লগেজ এবং আমাদের গাড়ীতে নিয়ে সোজা রওনা দিল্লীর উইলিংডন বিমান-বন্দরে।

আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে দিল্লীর অনেক বন্ধু এবং সোভিয়েট-দূতাবাসের সকলেই প্রায় এরোড্রোমে এসেছিলেন! আই, এন, এ প্লেনে যাত্রা। বেলা নটায় প্লেন ছাড়লো এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে পাকীস্তানের লাহোর এরোড্রোমে এসে আমরা নামলুম।

হাওয়া জাহাজ ছেড়ে ওখানকার কাষ্টমস্ অফিসের দিকে চলেছি—হঠাৎ পাকীস্তান-পুলিশের এক সশস্ত্র শান্ত্রী এসে জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় চলেছি এবং লাহোরে আমাদের অবস্থানের ঠিকানাটাই বা কি··· এই সব প্রশ্ন! এ-ধরণের প্রশ্নের প্লাবনে অবাক হলুম আমরা! কিন্তু অবাক হলে তো চলবে না—কাজেই তাকে দিল্লীর পাকীস্তান দপ্তরের ছাপমারা মঞ্জুরীনামা দেখিয়ে আমাদের সোভিয়েট-যাত্রার কথা জানালুম। কিন্তু দেখলুম জবাবটা যেন কেমন মনঃপূত হলো না শান্ত্রী-সাহেবের। সুতরাং কথা আর না বাড়িয়ে তাঁকে সটান্ পাঠিয়ে দিলুম শ্রীযুত জীবভের কাছে। তাঁর সঙ্গে শান্ত্রী-সাহেবের দূরে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কি যে হলো—কানে এলো না বটে, তবে দেখলুম সংশয় আর সন্ত্রাসের কালিমা মুছে গেছে শান্ত্রীর বদন থেকে।

কাষ্টমসের দপ্তরে এসে তাঁদের দেওয়া সরকারী-কাগজে নিজেদের নাম ধাম, কুল কুলুজী, ট্যাকের কড়ির হিসাব, গায়ের আবরণের ফর্দ্দ, কলম, ক্যামেরা প্রভৃতির লেখা-লিষ্ট এবং আরো নানা সব প্রশ্নের লিখিত-জবাব দিয়ে দিল্লীর পাকীস্তানী দপ্তরের ছাপমারা পাশপোর্ট ওখানকার কর্ম্মচারীদের হাতে সঁপে দিয়ে আমরা সবাই এলুম পাশের একটি ঘরে। সেখানকার কাষ্টমস্-কর্ম্মচারীদের সামনে আমাদের সুটকেশ, ব্যাগ ও অন্যান্য লাগেজ খুলে দেখাতে হলো—কোনো সন্দেহজনক জিনিষ আনছি কিনা, কিম্বা ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে কিছু পাচার করে পালাচ্ছি কিনা ওদের চোখে ধূলো দিয়ে! প্রত্যেকের বাক্স ব্যাগ সব কিছু ঘেঁটে-ঘুঁটে তন্ন-তন্ন করে তল্লাসী সেরে সন্দেহজনক কোনো জিনিষেরই সন্ধান না পেয়ে অবশেষে হৃষ্টমনে মোট-ঘাটগুলির ওপরে সাদা খড়ির দাগ মেরে কাষ্টমস্-কর্ম্মীরা তখনকার মত নিষ্কৃতি দিলেন আমাদের। Visa র ছাপমারা আমাদের পাশপোর্টও আমরা ফেরৎ পেলুম সেই সঙ্গে। কাষ্টমসের এ-হাঙ্গামা শুধু যে এখানেই ঘটে তা নয়—পৃথিবীর সব দেশেই সব কাষ্টমসের দপ্তরেই এই রীতি! যাত্রীদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হলেও দেশের মঙ্গলের জন্য দরকার এই কড়া-পরীক্ষার!

এরোড্রোমের হাঙ্গামা মিটিয়ে আই, এন, এ কোম্পানির বিরাট মোটর-বাসে চড়ে রওনা হলুম লাহোরের সুবিশাল ফেলেটিস্ হোটেলে! পথে আসতে আসতে নজরে পড়লো—পাকীস্তানী-পুলিশের একখানি জীপ-গাড়ী আমাদের মোটর-বাস অনুসরণ করে পিছনে পিছনে আসছে আগাগোড়া ···যেন নজরবন্দী করে রাখতে চায় আমাদের অনুক্ষণ! সে জীপ-গাড়ীতে আসীন রয়েছেন দেখলুম আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত লাহোর বিমান বন্দরের সেই সংশয়াচ্ছন্ন শান্ত্রী-সাহেবটি এবং তাঁর একদল সশস্ত্র

...শুয়া শ্রীযুত জীকভকে জানালুম কথাটা। দেখলুম, তিনিও লক্ষ্য করেছেন বিষয়টি !

আঁকা-বাঁকা নানা পথে এসে লাহোরে বিখ্যাত 'ক্যানালের' পুল পার হয়ে সহরের বাঁধানো সড়ক বয়ে অবশেষে হোটেলে যখন পৌঁছলুম তখন পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি যে শাস্ত্রী-বোঝাই জীপগাড়ীখানিও আমাদের অনুসরণ করে হোটেলের প্রাঙ্গণে এসে থামলো !

ব্যাপার কি জানবার জন্য সকলেই আমরা রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। শেষে শাস্ত্রীদেরই প্রশ্ন করে জানা গেল যে সম্প্রতি কিছুদিন আগে নাকি সহরের কোথায় সামান্য কি একটু হট্টগোল হয়েছিল তাই আমরা ভারতের যাত্রী বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ হুঁশিয়ারী নজর রেখেছেন—পথ চলতে গিয়ে আমাদের গায়ে যাতে কোনো আঁচড়ই না লাগে এতটুকু। এই হলো আসল কথা···কিন্তু শাস্ত্রী-সাহেবের কর্ত্তব্য নিষ্ঠার আতিশয্যে, তিলের মত তুচ্ছ ব্যাপারটি ক্রমেই রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছিল অতিকায় তালেরই মত বিরাট আকারে !

যাই হোক্ এখানকার কানুন মাফিক আমাদের পাশপোর্টগুলি সব হোটেলের অফিসের জিম্মায় জমা দিয়ে এসে পরম আরামে স্নানাহার সেরে নেওয়া গেল। হোটেলের ব্যবস্থা খুব ভালো—বিলাতী ধরণের! আমাদের প্রত্যেক দু'জনের জন্যই ব্যবস্থা ছিল নিজস্ব বাথরুম সমেত একটি করে তিন-কামরাওয়ালা Suite !

লাহোরে থাকবো আমরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত— তারপর রাত্রে ফ্রন্টিয়ার মেলে চড়ে রেল পথে রওনা হবো পেশোয়ার। সুতরাং অবস্থানের এই স্বল্প কয়েকটি ঘণ্টা আমরা কাটাবো স্থির করেছিলুম লাহোরের দ্রষ্টব্য-স্থানগুলি ঘুরে দেখে। দলের মধ্যে শুধু শ্রীমতী খোটের এবং আমার লাহোর দেখা ছিল ইতিপূর্ব্বে, তবে সে অবশ্য ভারতবর্ষ বিভাগের আগে। দেখলুম আজকের লাহোরের সঙ্গে সেদিনের লাহোরের প্রভেদ ঘটেছে অনেকখানি ! জীকভ ছাড়া আমাদের সহযাত্রীরা কেউই লাহোরে আসেন নি এর আগে—তাই তাঁদের অসীম আগ্রহ ছিল সহরটি ঘুরে দেখবার কিন্তু সে বাসনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হলো আমাদের। খবর নিয়ে জানলুম, তখন সাম্প্রতিক হট্টগোল থেকেই নাকি ভারতীয়দের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় কোনক্রমে—সেজন্য ওখানকার কর্ত্তারা সাময়িকভাবে কড়া-কানুন জারী করেছেন ওখানে। অর্থাৎ, লাহোরে কর্তৃপক্ষকে খবর না জানিয়ে এবং আগে থেকে তাঁদের অনুমতি এবং রক্ষী সঙ্গে না নিয়ে লাহোরের পথে ভারতবাসীদের যথেচ্ছভাবে চলা ফেরা করা সাময়িক-ভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে যতক্ষণ না সাম্প্রতিক অবস্থার আগেকার মত স্বাভাবিক উন্নতি ঘটছে ; এমন কি ভারতের রাষ্ট্র-দূতাবাসের কর্ম্মীদের পক্ষেও লাহোরের পথে ঘাটে ঘুরে ফিরে বেড়ানো সম্ভব হলেও—বিনা-প্রহরায় সহরের এলাকার বাইরে দেড় মাইলের বেশী দূরে যাওয়া বারণ ছিল আমরা যখন ছিলুম সে-সময়···পাছে তাঁদের কোনো ক্ষতি হয়—এই আশঙ্কায়। তবে শ্রীযুত জীকভ বা অন্য অ-ভারতীয় বিদেশীদের পক্ষে এ-ব্যবস্থা ছিল না !

বাইরে বেরুনো হলো না দেখে ক্ষুণ্ণমনে হোটেলের কামরায় বসেই গুলতানী করছি আমরা—এমন সময় লাহোরে আমাদের আসার খবর পেয়ে স্ত্রী-কন্যা সহ দেখা করতে এলেন ওখানকার ভারতীয় হাই-কমিশনার দপ্তরের Press Attache শ্রীযুত পাঞ্জাবী। চমৎকার সদালাপী এবং মিশুক পরিবার···অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জমে উঠলো। অল্পক্ষণ বাদেই ওখানকার ভারতীয় ডেপুটী হাই কমিশনার শ্রীযুত এস, কে, বন্দোপাধ্যায়ের ভবনে আমাদের সবাইকার বৈকালিক জলযোগের সাদর-নিমন্ত্রণ জানাতে এলেন শ্রীযুত পাঞ্জাবীর দপ্তরের সহকর্মী শ্রীযুত বক্সী ! সাগ্রহে, সানন্দে গ্রহণ করলুম সে আমন্ত্রণ এবং শ্রীযুত জীকভ ও ভারতীয় দূতাবাসের সজ্জন বন্ধুদের গাড়ীতেই রওনা হলুম শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। হোটেল ছেড়ে পথে বেরুতেই চোখে পড়লো—পিছনেই আমাদের অনুসরণ করে আসছে শাস্ত্রী সজ্জিত সেই জীপ গাড়ীখানা।

শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওখানে চায়ের আসরে চমৎকার কাটলো বিকালটি—আলাপ পরিচয় এবং গল্প গুজবে ! শ্রীযুক্তা বন্দোপাধ্যায়ের আতিথেয়তা এবং সৌজন্যের স্বাদ তাঁরই পরিবেশিত সুস্বাদের মিঠাই মণ্ডা খাবার দাবারের মতই পরম উপভোগ্য ! দেশ ছেড়ে বিদেশের পথে পাড়ি দিয়ে চলেছি আমরা···লাহোরে ওঁদের এই স্নেহ যত্নের স্পর্শটুকু বড় মধুর বড় মনোরম লাগলো !

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল···আমাদের ট্রেণের সময়ও সমাগতপ্রায় ! কাজেই বিদায় নিয়ে সোজা রওনা হলুম লাহোরে রেল ষ্টেশনের দিকে··· যাবার পথে হোটেল থেকে তুলে নেওয়া হলো আমাদের সব মোট-ঘাট লগেজ ! ভারতীয় দপ্তরের বন্ধুরাও সঙ্গে এলেন আমাদের ট্রেণে তুলে দিতে ! বলা বাহুল্য, শাস্ত্রী-বোঝাই সেই জীপ গাড়ীখানি বরাবরই অনুসরণ করে ফিরেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে—অর্থাৎ যেখানে আমরা যাচ্ছি, যেখানে অপেক্ষা করেছি···এমন কি শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে চায়ের আসরে জমেছিলুম আমরা যতক্ষণ—ততক্ষণ এই সশস্ত্র শাস্ত্রীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদের প্রহরায় !

লাহোরের ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতেই আমাদের চারিপাশে গোল এক চক্রব্যূহ রচে ঘিরে দাঁড়ালেন এই শাস্ত্রীরা···যাতে আশপাশের লোকের এতটুকু ছোঁয়াচ না লাগে আমাদের গায়ে।

ফ্রন্টিয়ার-মেলে দু'খানি প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা ছিল আমাদের জন্য ! তার একটিতে আশ্রয় নিলেন মাদ্রাজের তিন বন্ধু এবং শ্রীমতী খোটে। অপরখানিতে আমরা তিনজন ও শ্রীযুত জীকভ ! কামরা দু'খানি ছিল একেবারে পাশাপাশি লাগোয়া !···

ট্রেণ যতক্ষণ লাহোর ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল, ততক্ষণ সামনে প্ল্যাট-ফর্ম্মের উপরে এবং পিছনে রেল লাইনের ধারেও সমানে প্রহরায় ছিল সশস্ত্র শাস্ত্রী···তারপর ট্রেণ চলতে সুরু হলে দেখলুম আমাদের কামরা দু'খানির দু'পাশে সরু সরু যে Servant's Compartment এর খালি কামরা দুটি, তাইতে চড়ে সহযাত্রী হয়ে সদলে আমাদের অনুসরণ করে চলেছেন সশস্ত্র শাস্ত্রী-সাহেব এবং তাঁর অনুচরেরা !

যথাসময়ে রাতের কালো অন্ধকার ভেদ করে ট্রেণ আমাদের নিয়ে ছুটে চললো সীমান্তের সহর পেশোয়ারের দিকে ! (ক্রমশঃ)

ঘারমণ্ডল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ন্যায়রত্নের তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অরুণার মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। দৃষ্টি দেখিয়া অরুণা আশ্বস্ত হইল, দৃষ্টিতে স্বাভাবিক চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। তবু সে আর একবার ডাকিল—দাদু!

ন্যায়রত্ন একটু হাসিয়া বলিলেন—তুমি ভীত হয়েছিলে? তন্দ্রাঘোরে আমি বোধ করি প্রলাপ বকেছি?

—হ্যাঁ দাদু। কি বলছিলেন যেন।

—প্রলাপ নয় ভাই। আচ্ছন্নতার মধ্যে অতীত কাল এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে। এসে দাঁড়াল যেন দৌলতহাজির বাপ, তার সঙ্গে পীরপুরের ঠাকুর সাহেব। বললে—ঋণ পাব—শোধ দিয়ে যাও। মনে মনে হিসেব করছিলাম পাওনার দাবী সত্য না মিথ্যে।

অরুণা বুঝিতে পারিল না। চুপ করিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ন্যায়রত্নকে সে বুঝিয়াছে তাহার কথা সাধারণ অর্থে বুঝিতে গেলে ঠকিতে হয়। ন্যায়রত্নের ঋণ—অর্থ সম্পদের ঋণ বিশ্বাস করিতেও তাহার অবিশ্বাস হইল। অর্থ ঋণ তিনি কখনও কাহারও কাছে করিয়াছেন বলিয়াও তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

ন্যায়রত্ন কিন্তু আর কথা বলিলেন না। চিন্তাকুল স্থির দৃষ্টিতে নীরবে উর্দ্ধলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন যে পাওনার কথা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে বলিলেন—সেই দাবীর হিসাব খতাইয়া দেখিতেছেন। স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পর বলিলেন—ওদের সঙ্গে বিশ্বনাথকে দেখলাম। সে তাদের পক্ষ সমর্থন করে সাক্ষী দিতে এসেছিল।

"অনেক কাল আগে—সেই আমাকে বলেছিল, বিশ্বনাথই আমাকে বলেছিল—দৌলতহাজির বাপের কাছে আমাদের ঋণ আছে। পীরপুরের ঠাকুর সাহেবকেও জান, তার কাছেও না কি আমাদের অনেক ঋণ।"

বিশ্বনাথ তখন রাজনীতি চর্চ্চা করতে সুরু করেছে। আমার কাছে গোপন রেখেছিল। আমাকে একদিন বললে—দাদু আমি এই অঞ্চলের ইতিহাস উদ্ধার করতে চাই। আপনি যদি কয়েক জায়গায়—অনুরোধ করেন, তা হ'লে তাঁদের বাড়ীর কাগজপত্র দেখতে পাই। পীরপুরের ঠাকুর সাহেবদের বাড়ীতে অনেক পুরাণো কাগজ আছে; পুরাণো আমলের তামার পাতে লেখা নানকারের সনদ আছে; সেগুলো থেকে জানতে পারব—অনেক—ইতিহাস। পীরপুরের ঠাকুর সাহেবদের বংশ প্রাচীনতম অভিজাত মুসলমান বংশ। প্রবাদ আছে ওঁরা হলেন—আরবের এক বিখ্যাত সাধকের বংশ। ভারতবর্ষে এসে দেশ পর্য্যটন করতে গিয়ে আসেন এই জংসনে। পীরপুরে তখন ছিলেন এ অঞ্চলের এক গুরুবংশ। আমাদেরই জ্ঞাতি বংশ। সেই বংশের সঙ্গে হয় তাঁদের বিরোধ। রাজা তখন মুসলমান। সুতরাং এই নিরীহ যজমানদের উপর নির্ভরশীল ব্রাহ্মণ বংশকে উচ্ছেদ করতে তাদের বেগ পেতে হ'ল না। সেই ভিটায় এই মুসলমান গুরু বাস করেন—বলেই তাঁদের উপাধি ঠাকুর। এঁরা মহদ্বংশ। আমাদের সঙ্গে পরবর্ত্তীকালে বিশেষ সম্প্রীতি জন্মেছিল; জীবন জগৎ—জগদীশ্বর নিয়ে বহু আলাপ আলোচনা হয়েছে। সাধকের বংশ, সর্ব্বজন-মান্য। দিল্লীর বাদশার প্রদত্ত বহু নিষ্কর এঁরা ভোগ করেন। এঁদের বাড়ীতে প্রাচীন কালের বহু নিদর্শন আছে। আমি পত্র লিখে দিলাম। বিশ্বনাথ তাঁদের বাড়ীর কাগজ ঘাঁটতে লাগল। একদিন এসে বললে—।

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইলেন। কথা বলিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

* * *

বিশ্বনাথ একদিন—বিচিত্র ইতিহাস বহন করিয়া ানিল।

. পীরপুরের ঠাকুর সাহেবদের ঘরে তামার পাতের উপর য় নিষ্কর জমির সনন্দ—তাহা—বাদশাহী-ফরমন নয়, াসলে সে সনন্দ দেবনাগরী অক্ষরে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রাঢ়ের ।ধিপতি—কোন এক পরম ভট্টারকের ব্রহ্মত্র প্রদানের নুশাসন। তাহাতে লেখা আছে—এই রাঢ়ভূমির—ত্যান্ত সীমায়—যেখানে অনার্য্য অধ্যুষিত অরণ্যভূমি ধর্ম বং পুণ্যের গতিরোধ করিয়াছে, যেখানে—ওই আরণ্যমের অনার্য্য-শবর নিশ্বাস—বায়ুর সহিত নিত্য আসিয়া লুষিত করে বায়ু মণ্ডলকে, যেখানকার ভাষায়—অনার্য্য ভাষার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়—যেখানকার মানুষের জিহ্বায় দেবভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয় না—সেই ভূখণ্ডে বেদরায়ণ দেবভাষা পারঙ্গম ধর্ম্ম ও সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টিসম্পন্ন রদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরান্তর্গত—মহা-উপাধ্যায় মশেখরেশ্বর দেবশর্ম্মাকে এই নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হইল। বং চন্দ্রার্কমেদিনী বর্ত্তমান থাকিবে—তাবৎ—স্বকীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া—এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ল্যাণে যজ্ঞাচরণ করিয়া এবং তাহাদের সকল অনাচারের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া—এই নিষ্করভূমিকে অধিকার রিয়া থাকিবেন।

এই অনুশাসন—মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের বংশের অনুাসন। মূল অনুশাসন ন্যায়রত্ন বা তাঁহার পিতাপিতামহ দেখেন নাই; তবে শুনিয়াছেন—তামার পাত্রে ঠিক এই থাই খোদিত ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই শ্লোকটি াঁহাদের ঘরে—প্রাচীনকালের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের সঙ্গে কখানি তুলোট কাগজে লেখা আছে। কুলপরিচয় হসাবেও এই শ্লোকটি এই বংশের বালকদের মুখস্ত করানো হত। বাল্যকালে ন্যায়রত্ন শিবশেখরেশ্বর লিখিয়াছিলেন এই শ্লোক; তিনিই শশীশেখর এবং বিশ্বনাথ বা চন্দ্রশেখরকে শখাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ উত্তেজিত হইয়াছিল—উত্তেজনা তাহার স্বাভাবিক।

ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—এতে বিস্ময়ের কি আছে ভাই? ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ যিনি আমাদের ওই জ্ঞাতি বংশকে উচ্ছেদ করেছিলেন—তাদের ঘর দ্বার অধিকার করেছিলেন বাহুবলে—তাঁরা ওখানা পেয়েছিলেন সেই দখলের সময়েই। তাঁদের বাড়ীর ধর্ম্মগ্রন্থ শাস্ত্রগ্রন্থ আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে, কিন্তু ওখানা তামার। তা ছাড়া তাঁদের অংশের জমিগুলিও তাঁরা দখল ক'রে নতুন বাদশাহী ফরমন নিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পর বিশ্বনাথ আসিয়া একখানি প্রাচীন পুঁথির নকল তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—পড়ুন—দাদু।

সংস্কৃত ভাষায়—শ্লোকে শ্লোকে রচিত পুঁথি।

কোন সুপণ্ডিতের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই; ভাষার লালিত্য, রচনা পারিপাট্য ও শুদ্ধতা-প্রশংসার যোগ্য। ন্যায়রত্ন পড়িয়া গেলেন।

প্রাচীন রাঢ়, দেবতা অধ্যুষিত স্থান। ব্রহ্মা কমণ্ডলু-বাসিনী, বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা পরম বৈষ্ণবী; শিবজটাবিহারিণী গঙ্গার ধারা এই ভূমির এক প্রান্ত। অপর প্রান্তে ঝাড়খণ্ড; এই ঝাড়খণ্ড অরণ্য ভূম, অরণ্য মধ্যে অনার্য্যের বাস; এই অনার্য্যভূমির সকল কলুষ নাশ করিয়া দেবাদিদেব ঝাড়খণ্ডেশ্বর বৈদ্যনাথ বিরাজিত। তাঁহার অঙ্গের বিভূতি বায়ুস্তরে মিশ্রিত হইয়া সুকল্যাণ বিতরণ করে সকল সময়ে। রোগ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাদেব-বিভূতি মহাত্ম্য-পূত এই বায়ুস্পর্শে রোগ নাশ হয়, শক্তি লাভ হয়। এই ভূমির গাভী সকল সুরভির বংশোদ্ভূতা। এই গাভী সকলের ঘৃতে দুগ্ধে পঞ্চগব্যে দেবতা পরিতৃপ্ত হন, যজ্ঞের সকল অগ্নি লেলিহান হইয়া এই ঘৃতের আহুতি গ্রহণ করেন এবং পূর্ণ ফল প্রদান করেন।

এই ভূমির মধ্যে সমাজপতি—ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরান্তর্গত মহামহোপাধ্যায়—শাস্ত্র জীবী—শেখরেশ্বর বংশোদ্ভূত আমি—এক শাখার শেষ শেখর দেবভাষায় এই শেষ রচনা করিতেছি।

জাতির ষড়যন্ত্র আমাকে অন্যায় রূপে—ধর্ম্মাচরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিল। জ্ঞাতিতে পাতিত্য দোষ ঘটাইল। যেরূপে ব্যাধে অরণ্যের তৃণভূমে সুবৃহৎ চক্রাকারে অগ্নি সংযোগ করে, সেই সুবৃহৎ চক্রের অভ্যন্তরস্থ নির্দ্দোষ কস্তুরী মৃগ আপন নাভির সুরভি-বিভোর হইয়া স্বপ্নাতুর থাকে; ওদিকে অগ্নি চক্র ক্রমশ গোলক গণ্ডীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া অগ্রসর হয়—এ ষড়যন্ত্র ঠিক তদ্রূপ। পরিত্রাণ নাই। দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হওয়া ছাড়া মৃগের আর পরিত্রাণ থাকে না।

আমার অবস্থা তদ্রূপ। এ ষড়যন্ত্র ঠিক একটি অগ্নিচক্র। দেবতাকে ধ্যান করিয়া—প্রাণপণে ডাকিয়াও নিষ্কৃতি নাই; দেবতার বিরূপতার হেতু বুঝিলাম না। মরীচিকাকে বারিপ্রবাহ ভ্রম করিয়া মরুভূমিতে আসন পাতিয়া যে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়; প্রচণ্ড তৃষ্ণার ক্ষণে বারি অন্বেষণে অগ্রসর না-হওয়া পর্য্যন্ত তাহার যেমন ভ্রম ভাঙে না। ঠিক তেমনি-ভাবেই আজিকার কঠিন বিপন্ন অবস্থায় আমার ভ্রম ভাঙিল। দেবতা মিথ্যা—অথবা পঙ্গু। শক্তিহীন। বহু পুরুষ ধরিয়া ব্যর্থ সাধনা ও মিথ্যা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি। আজ ভ্রম ভাঙিয়াছে।

আরব দেশের রুমী জালাল সাধু দ্বারমণ্ডলে আসিল। আমি কি তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম ?

দ্বারমণ্ডল—এই ভূখণ্ডের প্রবেশ দ্বার: সেই প্রবেশ-দ্বারে একদা এই যোগী আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। রাজশক্তির পতন ঘটিয়াছে। বাধা তাহাকে কে দিবে ?

এই দ্বারমণ্ডল দিয়া একদা মুণ্ডিতমস্তক ক্ষপণকেরা প্রবেশ করিয়াছিল। কে বাধা দিয়াছিল ? তাহারা সমগ্র ব্রাত্য সমাজের মধ্যে উদ্ধত অনাচার প্রচার করিয়াছিল ?

দ্বারমণ্ডলে জয়তারা আশ্রমের প্রবেশ পথের পার্শ্বে মহা-ভৈরব নাকি সমাসীন রহিয়াছেন। তিনিই নাকি মহাকাল। তিনিই নাকি তাঁহার মহাশূলাগ্রে—সকল অধর্ম্ম সকল অনাচারকে রোধ করিয়া আছেন। যদি তাহাই হয়, তবে ক্ষপণকেরা—কেমন করিয়া প্রবেশ করিল ? তবে কি ক্ষপণকেরা মহাকালের অপেক্ষাও অধিক শক্তিধর। তাহাদের ধর্ম্ম কি—তাহা হইলে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয় ? অথবা—মহাভৈরবের লিঙ্গ-মূর্ত্তি—নিতান্তই এক প্রস্তরখণ্ড ?

প্রস্তর খণ্ড তাহাতে সন্দেহ নাই, নিতান্তই প্রস্তর খণ্ড। দেবশক্তি যাহা একদা এই মূর্ত্তির মধ্যে আশ্রয় করিয়া অধিষ্টিত ছিলেন—সে শক্তি অদৃশ্য হইয়াছে। পরিত্যাগ করিয়াছে।

পতন ঘটিয়াছে—মহা অনাচার—কুটীল স্বার্থবুদ্ধি আশ্রয় করিয়াছে এখানকার সমাজকে—সমাজপতিদের কয়েক-জনকে। দেবতা তাঁহাদের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই দেবতার ইঙ্গিতেই আরব হইতে একেশ্বরবাদী—ইসলাম-ধর্ম্মের সাধক-রুমীজালাল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—এই ভূখণ্ডের প্রবেশ দ্বার—দ্বারমণ্ডলে।

দ্বারমণ্ডলের ঘাটে তখন অসংখ্য বাণিজ্য-তরী—নদীর তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হইতেছিল। বায়ুপ্রবাহে বিভিন্ন-বর্ণের অনুরঞ্জিত ধ্বজা পতাকাগুলি উড্ডীয়মান ছিল—শূন্যমণ্ডলে।

দামামায় আঘাত দিয়া সাধু রুমী জালাল—ঘাটে অবতরণ করিল। তাহার সঙ্গে—পঞ্চবিংশতিসংখ্যক শিষ্য। তাহাদের কটিদেশে বিলম্বিত ছিল—সুদীর্ঘ শাণিত কৃপাণ। পৃষ্ঠদেশে ছিল ঢাল। বাম হস্তে ছিল—সুদীর্ঘ ভল্ল।

রুমী জালাল—বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করিল—শাস্ত্রের বিচারে—সাধুত্বের বিচারে, অলৌকিক শক্তির বিচারে আমি সকলকে পরাভূত করিয়া প্রমাণ করিতে আসিয়াছি—পুত্তলিকা-উপাসনা মিথ্যাচার! এই উপাসনা যাহারা করে—তাহারা কাফের। আল্লাহতায়লা তাহাদের ক্ষমা করেন না; অমৃত-ময়ের মহিমা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। অনন্ত নরকে—দোজখে তাহাদের স্থান হয়।

দ্বারমণ্ডলে—যেন—যুদ্ধের দামামা বাজিল।

যুদ্ধ দাও বলিয়া তাহারা উপস্থিত হইল।

দ্বারমণ্ডলে—সমবেত জনতা ভয়ে অভিভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল।

জয়তারা আশ্রমের প্রবেশ দ্বারে—প্রস্তর খণ্ড নিশ্চল হইয়া রহিল। দেবতা চলিয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন এই পর্য্যন্ত পড়িয়া মুখ তুলিয়া বলিয়াছিলেন—এ পুঁথি তুমি কোথায় পেলে ?

ঠাকুর সাহেবদের বাড়ীতেই। খুব পুরনো একটি বেতের ঝাঁপির মধ্যে অনেক সংস্কৃত পুঁথি পেলাম। শুনলাম—ওদের সেই আদি প্রতিষ্ঠার কাল থেকে এই পেটি ওঁদের বাড়ীতে আছে। ওঁদের বিশ্বাস—ওর মধ্যে আছে এক হিন্দু সাধুর তপস্যার ফল। তিনি ছিলেন সিদ্ধ-পুরুষ। ওঁরা সংস্কৃত কেউ জানেন না। আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেলাম। দেখলাম—।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ব-ভারতীতে শ্রীনেহরু—

শান্তিনিকেতন-বিশ্ব ভারতী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আইনে তন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ায় শ্রীজওহরলাল নেহরু াহার আচার্য্য পদে বৃত হইয়াছেন। গত ৩রা মার্চ ়থম আচার্য্যরূপে শ্রীনেহরু বিশ্বভারতী পরিদর্শন রিয়াছেন। তাঁহাকে তথায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইলে ীনেহরু বলেন—"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে ান্তর্জাতিক মৈত্রীর মিলন ক্ষেত্ররূপে গঠন করিতে াহিয়াছিলেন—এই মিলন ক্ষেত্রে সকল দেশের লোক মবেত হইয়া আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বাণী বহন করিবেন—হাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। আশা করি, বিশ্বভারতী ই মহান আদর্শ সর্বদা স্মরণ রাখিয়া উহার পূর্ণতা সাধনের ন্য কাজ করিয়া যাইবে।" স্বাধীন ভারতে সকলকে সর্বদা াজের মধ্য দিয়া দেশকে উন্নত করিতে হইবে। শ্রীনেহরু কলকে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বলার জন্য সর্বদা শ-ময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

হিজলীতে শিল্প-শিক্ষা কলেজ—

মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুর রেল ষ্টেশন হইতে ৮ াইল দূরে হিজলীতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যে বিরাট শিল্প-শিক্ষা কলেজ খোলা হইতেছে গত ৩রা মার্চ প্রধান ন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু তাহার ভিত্তি স্থাপন উৎসব সম্পাদন রিয়াছেন। এ দেশে এতদিন উচ্চ ধরণের শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। আমেরিকায় াসাচুসেটস্-এ যে ধরণের বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, এ দেশে সেইরূপ পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা ইয়াছে। উৎসবে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার খোপাধ্যায়, প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। ার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ উক্ত নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও বাংলা দেশের এক প্রান্তে তাহা স্থাপিত হওয়ায় শুধু ঐ অঞ্চল শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে না, বাঙ্গালী জনগণও অধিক-ভাবে উপকৃত হইতে পারিবে।

সার-উৎপাদন কারখানা—

ধানবাদ হইতে ১৫ মাইল দূরে দামোদর নদের উত্তর ধারে সিন্ধ্রী নামক স্থানে এসিয়ার বৃহত্তম সার-উৎপাদন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর (১৯৫১) ৩১শে অক্টোবর তথায় কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী উহা যৌথ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। একটি ব্যতীত সমস্ত শেয়ার রাষ্ট্রপতির নামে আছে। শ্রীসি, সি, দেশাই

সিন্ধ্রীর সারোৎপাদন কারখানায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু—পার্শ্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীএন-ভি গাডগিল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ মহম্মদ আবদুল্লা

পরিচালক বোর্ডের সভাপতি; পরিচালক আছেন—শ্রীজে জে গান্ধী, শ্রীশ্রীরাম, শ্রীশ্রীনারায়ণ মেহটা, শ্রী কে-আর-পি আয়েঙ্গার ও শ্রী বি-সি-মুখোপাধ্যায়। বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যভাগ হইতে কারখানায় দিনে হাজার টন সার উৎপাদন সম্ভব হইবে। বৎসরে যে সার উৎপন্ন হইবে তাহার মূল্য হইবে ১৫ কোটি টাকা। ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে যে কারখানা নির্মিত হইয়াছে গত ২রা মার্চ প্রধান মন্ত্রী তাহার উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি তথায় বলেন—"এই কারখানা যে কেবলমাত্র জনগণের জন্য অধিক খাদ্য

উৎপাদনে সাহায্য করিবে, তাহাই নহে, ইহা তাহাদের জীবন-যাত্রার মান-উন্নয়নেও সাহায্য করিবে। আমি যে নূতন ভারতের স্বপ্ন দেখি তাহা গড়িয়া তুলিতেও ইহা অনেক সাহায্য করিবে।"

কর্মরত ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা—

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার নব নির্বাচিত ১৫০জন কংগ্রেসী সদস্য ও পুরাতন সদস্যগণকে এক সম্মিলনে ডাকিয়া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। বর্তমান বৎসরে অজন্মার জন্য শতকরা ৩০ ভাগ খাদ্য কম উৎপন্ন হইয়াছে। সে ঘাটতি পূরণ করার জন্য লোককে চাউল ও গম কম পরিমাণে খাইয়া অন্য খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেজন্য সকলেরই অধিক খাদ্য উৎপাদনে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ডাক্তার রায় বিধান-সভার সকল সদস্যকে এজন্য কাজে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। যে যে-প্রকারে পারে, তাহাকে সেই উপায়ে এই খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করিতে হইবে—নচেৎ এ বৎসর খাদ্যাভাব হইতে জনগণকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

শ্রীঅশোককুমার সেন—

অল-ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলিকাতা কেন্দ্রের ষ্টেশন ডিরেক্টার শ্রীঅশোককুমার সেন দিল্লীতে রেডিও'র প্রধান কেন্দ্রে ডেপুটী ডিরেক্টার-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন—১৯৩৫ সালে তিনি বেতার কেন্দ্রে যোগদান করিয়া দক্ষতা ও সাফল্যের সহিত কাজ করিয়াছেন। তিনি স্বল্পবয়স্ক এবং দিল্লী ও কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত।

অধ্যাপক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতার খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য ব্যবস্থায় 'জন-শাসন বিশেষজ্ঞ' নির্বাচিত হইয়া জেনেভায় গমন করিয়াছেন। জন-শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বহু গবেষণা করিয়া জ্ঞানার্জন করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান দ্বারা সমগ্র জগৎ, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ উপকৃত হউক, ইহাই আমরা কামনা করি। তিনি স্বর্গত দেশসেবক ও অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গত বৎসর আগষ্ট মাসে বৃত্তি পাইয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছেন ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করিতেছেন। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বহু সভাতেও তিনি বক্তৃতা করিতেছেন। ভারতের বাহিরে তাঁহার মত সুধী ব্যক্তির দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের ফলে ভারত অবশ্যই উপকৃত হইবে ও বিদেশে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি পাইবে।

সৌরাষ্ট্র রাজ্যে নূতন মন্ত্রি সভা—

২৮শে ফেব্রুয়ারী সৌরাষ্ট্র রাজ্যের রাজপ্রমুখ নবনগরের জাম সাহেব ৮জন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন—শ্রী ইউ-এন-ধেবর প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং শ্রী আর, ইউ, পারেখ, শ্রী এম-এম-শা, শ্রী জে-কে-মোদী, শ্রী জি-বি-কোটক, শ্রী ডি-টি-দাতে, শ্রী জি-সি-ওঝা ও শ্রী আর-এম-আদামী মন্ত্রী হইয়াছেন। নির্বাচনের পর কংগ্রেসী দলের জয়লাভে কংগ্রেস-নেতা শ্রীধেবরকে নূতন মন্ত্রি সভা গঠনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়—

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী এ বৎসরের জন্য কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ঐ পদ শূন্য হওয়ায় শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায় নূতন সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। সিংহ রায় মহাশয় বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত। বহু বৎসর রাজনীতিক জীবনের পর বর্তমানে তিনি বাণিজ্য ও শিল্প প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

মধ্যবিত্ত-বেকার সমস্যা—

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের (শ্বেতাঙ্গ বণিক সভা) বার্ষিক সভায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও চেম্বারের সভাপতি মিঃ এ-আর-এলিয়ট লকহার্ট উভয়েই মধ্যবিত্ত-বেকার সমস্যায় কথা আলোচনা করিয়াছেন। রাজ্যপাল বলিয়াছেন—গত মহাযুদ্ধের সময় ও পরবর্ত্তীকালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে মধ্যবিত্ত সমাজ দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। সেজন্য বেকার-সমস্যা বাড়িয়াছে। ইহার সমাধানের জন্য লোকের মনের পরিবর্তন প্রয়োজন। অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের স্কুল শিক্ষার জন্য ব্যস্ত না হইয়া যদি তাহাদের কারিগরী শিক্ষাদানে উৎসাহ প্রকাশ করেন, তবেই বেকার-সমস্যা দূর হইবে। সেজন্য শিল্পপতিদিগকেও উৎসাহী হইয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কার্য্যে বেঙ্গল চেম্বারের সদস্যগণ অবহিত হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে, শিল্পপতিরাও ক্রমে লাভবান হইতে পারিবেন।

বাস্তহারা ও রাজ্যপাল—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় রোটারী ক্লাবের এক উৎসব সভায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে আগত বাস্তহারা-গণের দুঃখ দুর্দশার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে বাস্তহারারা যে দারুণ দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে বাস করিতেছে, সে কথা সর্বজনবিদিত। রাজ্যপাল তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে বাস্তহারাদের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। বহুলোক খাদ্যাভাবের জন্য যে ক্রমে ক্ষয়-[illegible] তাহা তাহাদের দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সে জন্য তিনি রোটারী ক্লাবকে কতকগুলি জিনিষ সংগ্রহ করিয়া দুর্দশাগ্রস্ত বাস্তহারাদের মধ্যে বিতরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। বহু লক্ষ লোক আজ এই ভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন—ধনীরা কি সত্যই তাহাদের কথা চিন্তা করিয়া প্রতীকারের উপায় নির্ণয় করিবেন?

সন্দীপনী সংঘে কবি সম্বর্দ্ধনা—

গত ১১ই ফাল্গুন ২৪ পরগণা, বারাকপুর, নোনা-চন্দনপুকুর গ্রামে সন্দীপনী সংঘের পাঠাগারে অধ্যাপক ও কবি শ্রীআশুতোষ সান্যালের সম্বর্দ্ধনার জন্য এক উৎসব
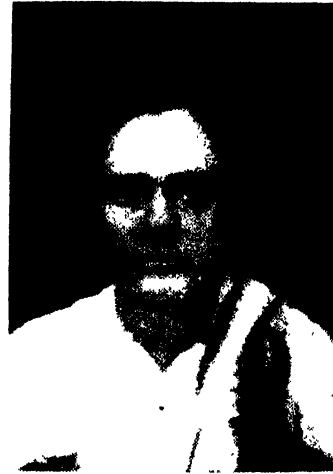
শ্রীআশুতোষ সান্যাল

হইয়াছিল। কবি রাজসাহী জেলার অধিবাসী, সম্প্রতি ঐ অঞ্চলে গৃহনির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। উৎসবে কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরণজিৎ সেন প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া কবির কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিভিন্ন সমিতির পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দন ও উপহার প্রদান করা হইয়াছিল। নানা সমস্যা সঙ্কুল জীবনে যাঁহারা এখনও কাব্যের সমাদরে উৎসাহী, তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

মধ্য ভারতে নূতন মন্ত্রিসভা—

৬ জন মন্ত্রী লইয়া মধ্য ভারতে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—(১) শ্রীমিসরীলাল গংওয়াল প্রধান মন্ত্রী (২)

্যামলাল পাণ্ডাভিয়া (৩) ডাঃ প্রেম সিং রাঠোর (৪) ‌মনোহর সিং মেটা (৫) শ্রীসীতারাম বাজু ও (৬) শ্রীভিবু-ভি ‌বিড়। তাঁহারা গত ৩রা মার্চ রাজপ্রমুখ গোয়ালিয়রের ‌রাজা সিন্ধিয়ার নিকট জয়ভিলা প্রাসাদে কার্য্যভার ‌ণ করিয়াছেন।

ীবিমলকুমার দত্ত—

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমল ‌ার দত্ত এম-এ, ডিপ-লিব, ভারত সরকার কর্ত্তৃক ‌ানীত হইয়া কমনওয়েলথ টেকনিক্যাল কো-অপরেশন ‌বস্থা অনুযায়ী অষ্ট্রেলিয়ার লাইব্রেরী সেমিনারে যোগ-

শ্রীবিমলকুমার দত্ত
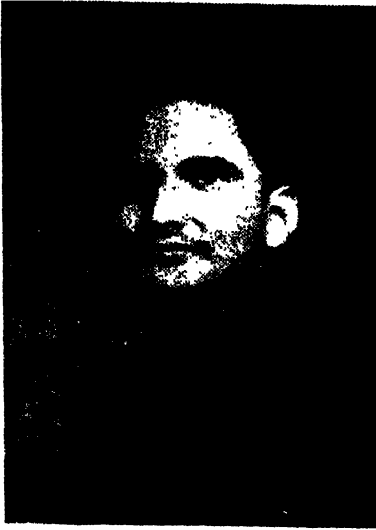
‌নের জন্য ২২শে ফেব্রুয়ারী বিমানযোগে সিডনী যাত্রা ‌রিয়াছেন। তিনি জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী সুলেখক ‌ীযুক্ত কালিদাস দত্তের পুত্র ও ভারতের গ্রন্থাগার ‌ান্দোলন এবং শিল্প সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট লেখক।

‌রাজস্থানে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ৩রা মার্চ রাজস্থানে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত ‌ইয়াছে। শ্রীটিকারাম পানিওয়াল প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন ‌এবং শ্রীমোহনলাল সুখদিয়া, শ্রীভোলানাথ মাষ্টার, ‌শ্রীভোগীলাল পাণ্ডিয়া, শ্রীরামকিশোর ব্যাস, শ্রীনাথুরাম-‌মিধা, শ্রীঅমৃতলাল যাদব ও শ্রীরামকরণ যোশী—৭ জন মন্ত্রী যোগদান করিবেন। শ্রীপানিওয়াল ও শ্রীসুখদিয়া পূর্বে মন্ত্রী ছিলেন এবং শ্রীঅমৃতলাল সহকারী মন্ত্রী ছিলেন।

তুর্ক সাংবাদিক প্রতিনিধি—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ভারতীয় সাংবাদিক সংঘ তুর্ক সাংবাদিক প্রতিনিধি মণ্ডলীকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। (১) আদাম আদবিয়ে যোনিক (২) ডাঃ আতমেৎ সুফকু এসমার (৩) ডোগান নাদি ও (৪) রফি সেবাং উন্নজয়—নামক ৪ জন খ্যাতনামা তুর্ক-সাংবাদিক ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে সুফকু এসমার বলেন—"তুরস্কের বহু স্বার্থ ও সমস্যার সহিত ভারতের স্বার্থ ও সমস্যার বেশ মিল আছে। উভয় দেশের পরস্পর জানাশুনার মধ্য দিয়া ও পরস্পরের অভিজ্ঞতার বিনিময়ে এই সব সমস্যার অধিকতর সহজ উপায়ে সমাধান হইতে পারে। তাহাদের ভাবধারার মধ্যেও বেশ মিল আছে—উভয় দেশ প্রজাতান্ত্রিক—উভয় দেশেই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপিত, উভয়েই গণতান্ত্রিক।" আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য সাংবাদিক সংঘের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

চারুকলা প্রদর্শনী—

গত ১৪ই ফাল্গুন বুধবার কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারুকলা ও চিত্র শিল্পের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছিল। রথীন্দ্রবাবু গত প্রায় ২০ বৎসর নীরব সাধনায় যে চিত্রাবলী ও চারু কলার সম্পদ-সম্ভার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেগুলি আর্ট কলেজের সুপ্রশস্ত প্রদর্শনী হলে রাখা হইয়াছিল। ৫৮ খানি চিত্র ও মোট ১৪৭টি দ্রষ্টব্য বস্তু সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। রথীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই প্রথম সাধারণকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পুত্রও যে পিতার বহুগুণের উত্তরাধিকারী, তাহা দর্শন করিয়া সকলে বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক নাগের জন্মদিবস—

গত ১০ই ফাল্গুন অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগের

কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোডে এক সভায় অভিনন্দিত করিয়াছেন। কলিকাতা ছোট আদালতের প্রাক্তন প্রধান-বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীমতী বাণী রায়, উড়িষ্যার মন্ত্রী শ্রীভৈরবচন্দ্র মোহান্তি প্রভৃতি তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করেন। অধ্যাপক নাগ ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ধার ও উন্নয়নে আজীবন যে সাধনা করিতেছেন, তাহাই তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

বুনিয়াদি ও জনশিক্ষা—

আগামী ৫ বৎসরে ভারতের সর্বত্র বুনিয়াদি শিক্ষা ও বয়স্ক (জন) শিক্ষা প্রচার ও প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া সকল রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ হইতে সে বিষয়ে আলোচনা হইবে ও পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করা হইবে। ১৯৫২-৫৩ সালে ঐ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ১ কোটি বা প্রয়োজন হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা ব্যয় করিবেন এবং রাজ্য সরকারসমূহও তাঁহাদের সাধ্যানুসারে ব্যয় করিবেন। জনসাধারণের সহযোগ ও সাহায্য ভিন্ন এই কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইবে না। সকল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির এ বিষয়ে অবহিত ও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য করার দাবী—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় প্রাচ্য বাণী মন্দিরে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের এক মহিলা সভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে—পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের অন্যান্য সমস্ত রাজ্যে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় সংস্কৃত যেন অবশ্যপাঠ্য করা হয়। লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী, ভিকটোরিয়া ইনিষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ শ্রীসুপ্রভা চৌধুরী, গোখলে মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী রাণী ঘোষ, সাউথ কলিকাতা গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনির্মলা সিংহ, উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ধীরেন্দ্র লাল দে, হুগলী উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীমীরা দত্ত গুপ্তা, মুরলীধর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী, প্রাচ্য বাণী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশ্বরী সরস্বতী প্রভৃতি সভায় এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ শ্রীসুনীতিবালা গুপ্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন ও কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে রঘুনাথ দত্ত—

কলিকাতার খ্যাতনামা কাগজ-ব্যবসায়ী রঘুনাথ দত্ত গত ২০শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সকালে কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী, ৮ পুত্র ও ৩ কন্যা বর্তমান। কিছুদিন হইতে তিনি মধুপুরে বাস করিতেছিলেন—মাত্র ১০ দিন পূর্বে

রঘুনাথ দত্ত

তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ভোলানাথ দত্ত কাগজের ব্যবসায় আরম্ভ করেন—১৯০৪ সালে কিশোর বয়সে রঘুনাথ সেই ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং নিজ অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মশক্তির দ্বারা ব্যবসায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শ্রীদুর্গা কটন মিলেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কাগজ ব্যবসায়ী সমিতি ও মিল মালিক সমিতির সভাপতিরূপে যেমন তিনি শিল্প বণিজ্যের উন্নতিতে অবহিত ছিলেন, তেমনই বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া জন-সেবা করিতেন। তাঁহার সহযোগিতায় দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার উন্নতি লাভ করিয়াছে। তিনি সাহিত্যালোচনা ও সাহিত্যিকগণের সহিত মেলা-

মেশার জন্য 'কলিকাতা সাহিত্যিকা' নামক সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে একজন শ্রেষ্ঠ সামাজিক ব্যক্তির অভাব হইল।

মহানদীর নিম্নে স্বর্ণ প্রাপ্তি—

সম্বলপুর হইতে খবর আসিয়াছে যে হীরাকুণ্ড বাঁধ-নির্মাণ সম্পর্কে ঐ অঞ্চলে মহানদীর তল খননের সময় মাটীর ভিতর প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদেরা এখন ঐ অঞ্চলে সোনার খনি সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। সুবর্ণরেখা নদীর নামের সহিত স্বর্ণ শব্দের যোগ রহিয়াছে। মহানদীর ঐ পার্ব্বত্য অঞ্চলে বহু খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। লৌহ ও তাম্র ঐ অঞ্চলের প্রধান সম্পদ। কাজেই তথায় স্বর্ণ লাভ আদৌ বিস্ময়ের বস্তু নহে।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

১০ জন মন্ত্রী ও ২ জন ডেপুটী মন্ত্রী লইয়া গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী আসামে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—(১) শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী প্রধান মন্ত্রী (২) শ্রীমতিরাম বোড়া (৩) রেভাঃ নিকোলাস রায় (৪) শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী (৫) শ্রীরামনাথ দাস (৬) শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম (৭) শ্রীমতলিব মজুমদার (৮) শ্রীঅমিয়কুমার দাস (৯) শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১০) শ্রীসিদ্ধিনাথ শর্ম্মা। ডেপুটী মন্ত্রী হইয়াছেন—শ্রীহরেশ্বর দাস ও শ্রীপূর্ণানন্দ চেটিয়া। ১০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৮ জন পূর্ব মন্ত্রি-সভায় ছিলেন; বৈদ্যনাথবাবু ও সিদ্ধিনাথবাবু নূতন।

পাটনা মেডিকেল কলেজ—

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পাটনা মেডিকেল কলেজের রৌপ্য জুবিলী উৎসবের উদ্বোধনে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় পাটনায় যাইয়া বলিয়াছেন—আজ সকলকে মহাত্মা গন্ধীর মত সত্যের সন্ধানে ব্রতী হইতে হইবে। সকলকে মনে রাখিতে হইবে—সকলেই দেশের সেবক—তবেই স্বাধীন ভারতকে উন্নততর করা সম্ভব হইবে।

কালিদাস ও কুমুদরঞ্জন—

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় মহাশয় সম্প্রতি কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাস-গ্রাম 'কোগ্রাম' দর্শন করিয়া আসিয়া কোগ্রাম সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করেন, তাহা গত মাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইলে কুমুদরঞ্জন কালিদাসকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন—"ভারতবর্ষে তোমার কবিতা 'কোগ্রাম' পড়িলাম। অসাধারণ কবিতা, অমর কবিতা। গ্রামকে তুমি নূতন গৌরব, নূতন সম্পদ দান করিয়াছ। অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা মঙ্গল-চণ্ডী ও লোচন দাস ঠাকুর বোধ হয় হাসি মুখে তোমার কবিতা শুনিয়াছেন, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তুমি গোটা গ্রামবাসীকে ধন্য করিয়াছ। আমরা উহা এক হাজার ছাপিয়া বিলি করিব স্থির করিয়াছি।"

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস—

এ বৎসর ২১শে হইতে ২৭শে জুলাই পর্য্যন্ত প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক বায়োকেমিক্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে উহাতে যোগদানের জন্য কলিকাতার বেঙ্গল কেমিকেলের সার প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস আমন্ত্রিত হইয়াছেন। কালমেঘের সক্রিয় উপাদানের রাসায়নিক প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের জন্য সুইজারল্যাণ্ডের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পল কারারের সহিত ইদানীং যে মূল্যবান্ গবেষণা করিয়াছেন উহাই সম্ভবতঃ ডক্টর বিশ্বাসকে এই সম্মানের অধিকার প্রদান করিয়াছে। ভারতে সর্বপ্রথম কুষ্ঠ রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ ডি ডি এস দেশীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি হইতে প্রভূত পরিমাণে এবং অতি সুলভে প্রস্তুতির পদ্ধতি আবিষ্কারও ডক্টর বিশ্বাসের অন্যতম বিশিষ্ট অবদান।

শিক্ষার সহিত উপার্জ্জন—

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী আলিগড়ে ভারতের টেকনিকাল স্কুল সমূহের প্রিন্সিপালগণের এক সম্মিলনে সভাপতি হইয়া খড়্গপুরস্থ ভারতীয় টেকনোলজিকাল ইনিষ্টিটিউটের পরিচালক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন—দেশের সর্বত্র এখন এমন সব টেকনিকাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যেখানে ছাত্ররা শিক্ষার সহিত অর্থার্জ্জন করিতে পারে। কলিকাতায় ছাত্ররা যাহাতে উপার্জনের সঙ্গে শিক্ষালাভ করে সে জন্য সন্ধ্যায় আই-এ, আই-এসসি, আই-কম, বি-এ, বি-এস্‌সি ও বি-কম পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও সর্বত্র যাহাতে টেকনিকাল স্কুলে পড়ার সময় ছাত্ররা উপার্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইলে দেশ আরও উন্নত হইবে।

পৃথিবীর বৃহত্তম চলচ্চিত্র মেলা—

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলায় যোগদানের জন্য ভারতে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে মাল্যদান

সম্প্রতি কলিকাতায় পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা এসিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা হইয়া গিয়াছে। গত ২৪শে জানুয়ারী ঐ মেলা বোম্বায়ে বসিয়াছিল—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় আরম্ভ হইয়াছিল। ৫টি মহাদেশের মোট ২৩টি রাজ্য মেলায় যোগদান করিয়াছে। পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রমোদ চিত্র

আসিয়াছে ৫০ খানিরও বেশী, আর ছোট প্রামাণ্য, তথ্য ও শিক্ষামূলক ছবি আসিয়াছে একশতেরও বেশী। ২৩টি দেশ হইতে ২৬টি ভাষার ছবি আসিয়াছে। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের ফিল্ম বিভাগ হইতে এই মেলার আয়োজন হইয়াছে এবং প্রধান প্রযোজক মোহন ভাবনানী-ই ইহার প্রস্তাবক। কলিকাতায় শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটী মেলার সাফল্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চলচ্চিত্র শিল্প দেশের কল্যাণ সাধন করিলেই উহার সার্থকতা হইবে।

হুগলী নদীর উন্নতি সাধন—

মাটি কাটা ও জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা হুগলী নদীর উজানের অংশের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে কিনা অথবা খিদিরপুর ডক হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত জাহাজ চলাচলের উপযোগী একটি খাল খনন দ্বারা ঐ অংশে জাহাজের পথ সংক্ষিপ্ত করা শ্রেয় কিনা নির্ধারণের জন্য পুণা পরীক্ষা কেন্দ্রে যে পরীক্ষা চলিতেছে, তাহা আরও ৪।৫ বৎসর চলিবে। ঐ সম্পর্কে হুগলী নদীর দুইটি মডেলের নির্মাণ কার্য্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি পাইলট মডেল নামে পরিচিত—উহা হুগলী নদীর বাঁশবেড়িয়া হইতে সাগর দ্বীপের ২৫ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত

উহা হুগলী নদীর কোন্নগর হইতে বজবজ পর্য্যন্ত অংশের মডেল। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে ৪।৫ বৎসর পরীক্ষা কার্য্য চালাইয়া যাইতে হইবে।

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী—

শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দপুরে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ মৃত্যু বার্ষিক উপলক্ষে ৪ঠা ফাল্গুন এক স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়াছিল, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত থাকেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শরৎ সাহিত্য আলোচনা করিয়া অমর সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র পাঠাগারের পরিচালকগণ পাঠাগারের জন্য ও স্মৃতি মন্দিরের সাহায্যের জন্য সকলকে আবেদন জানান।

নিখিল ভারত আলোকচিত্র প্রদর্শনী—

'ফটোগ্রাফি এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল' গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আগামী ২৭শে এপ্রিল হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত কলিকাতায় ১নং চৌরঙ্গী টেরাসে নিখিল ভারত [illegible] প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফটোগ্রাফি

এ্যাসোসিয়েশনের ইহা দ্বিতীয় উদ্যম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আলোকচিত্র শিল্পী এই প্রদর্শনীতে তাঁহাদের শিল্প-নিদর্শন পাঠাইয়া এ্যাসোসিয়েশনের সহিত সহযোগিতা করিবেন। আলোকচিত্রও যে একটি উচ্চাঙ্গের আর্ট, আজিকার প্রগতির যুগে ইহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দের এই প্রচেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয় এবং তাঁহাদের প্রদর্শন সর্বাঙ্গীণ সাফল্যমণ্ডিত হউক আমরা ইহাই কামনা করি।

দান—

কলিকাতা শেঠ সুখলাল-চন্দনমল কার্ণানী ট্রাষ্টের পরিচালক-ট্রাষ্টী শ্রীইন্দ্রকুমার কার্ণানী ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে মান্দ্রাজে অনাথ বালক-বালিকাদিগের আশ্রয়-প্রতিষ্ঠান

শ্রীইন্দ্রকুমার কার্ণানী

"বালমন্দিরে" ১২ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই ট্রাষ্টই কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে ১৭ লক্ষ টাকা দিয়াছেন এবং সেইজন্য ঐ হাসপাতালের নাম সুখলাল কার্ণানী হাসপাতাল হইতেছে।

শোক-সংবাদ—

পণ্ডিচারীতে পরিণত বয়সে চারুচন্দ্র দত্তের জীবনান্ত হইয়াছে। চারুবাবু কুচবিহারের দাওয়ান কালিকাদাস দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন—যৌবনে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিয়া ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে চাকরী গ্রহণ করেন। চাকরীয়া অবস্থায় ইনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া সরকারের বিরূপভাজন হন এবং কিছুদিন গৃহেই বন্দী থাকেন। ইনি শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনে ইহার দান স্মরণীয়। চারুবাবু কিছুদিন বিশ্বভারতীর সহিত সম্পর্কিত থাকিয়া পণ্ডিচারীতে গমন করেন ও তথায় আশ্রমে বাস করিতেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার বাঙ্গালা পুস্তকগুলিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও রচনানৈপুণ্যের পরিচয় সপ্রকাশ।

পরলোকে শ্রীশচন্দ্র নন্দী—

অবিভক্ত বঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী, কলিকাতার সেরিফ কাসিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডস্থ বাসভবনে ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, একটি কন্যা ও পত্নী বর্তমান। তিনি স্বর্গত দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পুত্র ছিলেন। ১৯১৭ সালে দীঘাপাতিয়ার রাজার কন্যার সহিত শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ হয় —যৌবনে এম-এ পাশ করিয়া তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ও ৫ বৎসর মন্ত্রীর কাজ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন। গত ৩০ বৎসর কাল বাংলার সমাজ-জীবনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

পরিবার নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার—

সম্প্রতি কলিকাতা আপার চিৎপুর রোডে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটীর উদ্যোগে একটি পরিবার-নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের উদ্বোধন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম স্থাপিত হইল। ভারতের জনসংখ্যা বৎসরে ৫০ লক্ষ বাড়িয়া যাইতেছে—সে বিষয়ে বরোদা জনসংখ্যা আলোচনাগারের পরিচালক ডাক্তার এস চন্দ্রশেখরম্ ঐ দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডাঃ সৌরীন ঘোষ বলিয়াছেন—কলিকাতায় পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—শতকরা ৪০জন গর্ভিণী রক্তহীনতা রোগে পীড়িত। সেজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা খাদ্য-সমস্যা সমাধান প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাঙ্গালা তথা কলিকাতায় বহু গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইলে লোক উপকৃত হইবে।

হায়দ্রাবাদে নূতন মন্ত্রিসভা—

৬ই মার্চ হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ১৩জন সদস্য লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ রাও প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং শ্রীদিগম্বর রাও বিন্দু, শ্রীবিনায়ক রাও বিদ্যালঙ্কার, শ্রীভি-টি-রাজু, শ্রীফুলচাঁদ গান্ধী, শ্রীকোণ্ডা ভেঙ্কটরঙ্গ রেডি, ডাঃ এম-চীনা রেডি, ডাঃ জে-এস-মেলকোট, শ্রীঅন্ন রাও, নবাব মেনি নবাব মৈন ইয়ার জং বাহাদুর, শ্রীদেবি সিং চৌহন, শ্রীজগন্নাথ রাও চানকায়কি, শ্রীশঙ্কর দেব (হরিজন) মন্ত্রী হইয়াছেন। বহুকাল পরে হায়দ্রাবাদে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় অলিম্পিক গেমস ঃ

মাদ্রাজে ভারতীয় অলিম্পিক গেমসের পঞ্চদশ অনুষ্ঠানে বাংলা দেশ কুস্তি প্রতিযোগিতায় মোট আটটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টিতে প্রথম স্থান এবং সাঁতারে ৫৭ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। বাংলার কুমারী নীলিমা ঘোষ হার্ডলসে ৮০ মিটার দূরত্ব ১৩·১ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে নতুন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন।

এ্যাথ্‌লেটিকসে বাংলা দেশ বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। পোলভণ্টে বাংলা থেকে এস কে চক্রবর্ত্তী প্রথম এবং ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণে হেমেন বসু এবং বলাই দাস যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন।

ফলাফল

এ্যাথ্‌লেটিকস প্রতিযোগিতা ঃ

পুরুষ বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ (১ম সার্ভিসেস (১০৮ পয়েণ্ট), ২য় পেপসু (৩৩ পয়েণ্ট), ৩য় বোম্বাই (২১ পয়েণ্ট) এবং ৪র্থ মাদ্রাজ (১৯ পয়েণ্ট)।

মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ ১ম বোম্বাই (৪১ পয়েণ্ট), ২য় মহীশূর (২২) এবং ৩য় বাংলা (২১ পয়েণ্ট)।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ ১ম বাংলা (৫৭ পয়েণ্ট), ২য় বোম্বাই (৪০) এবং ৩য় মাদ্রাজ (৮)।

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ঃ ১ম মাদ্রাজ (২২ পয়েণ্ট)।

জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতা ঃ দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ—১ম পাঞ্জাব (২৯২·৭৮), ২য় সার্ভিসেস (২৩৯·৮৯) এবং ৩য় বাংলা (২০৫·৫২)।

ডেকাথ্‌লন্‌ ঃ ১ম—এম কাউণ্ডস (বোম্বাই) ৫১৬০·৩৯ পয়েণ্ট, ২য় গুরনাম সিং (পাতিয়ালা) এবং ৩য় এ গোলাব (উত্তর প্রদেশ)।

ভলিবল ফাইনাল ঃ মহীশূর ১৫-১৩, ১৫-৭ ও ১৬-১৪ পয়েণ্টে পাতিয়ালাকে পরাজিত করেছে।

মাদ্রাজে ভারতীয় অলিম্পিক গেমসে পিণ্টো (বোম্বাই) দুইটি বিষয়ে নূতন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করে বিশ্ব-অলিম্পিকে ভারতীয় দলে নির্ব্বাচিত হয়েছেন ফটো : ডি, রতন

কপাটি ফাইনাল ঃ মাদ্রাজ ২৫-২১ পয়েণ্টে বাংলাদলকে পরাজিত করেছে।

দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা ঃ ৫ ফিট ৩ ইঞ্চির

কম উচ্চতায়—১ম অনিল রায় (বাংলা); ৫ ফিট ৩ ইঞ্চির বেশী উচ্চতায়—১ম পরিমল রায় (বাংলা); ৫´ ৬´´ থেকে ৫´ ৯´´ উচ্চতা বিশিষ্ট—১ম জনার্দ্দন রাও (অন্ধ্র); চতুর্থ গ্রুপে—১ম রুসি ইরাণী (বোম্বাই)।

ওয়াটার পোলো ফাইনাল: বোম্বাই ১১-৭ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে।

বাস্কেটবল ফাইনাল: মাদ্রাজ ২৯-১৯ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে।

বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের ১৯শ অনুষ্ঠানে এশিয়া মহাদেশ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পক্ষে জাপান অভূতপূর্ব্ব সাফল্য প্রতিষ্ঠা করেছে। জাপান তথা এশিয়ার পক্ষে এই প্রথম সাফল্য। জাপানের পক্ষে বড় কৃতিত্ব এই কারণে, প্রতিযোগিতায় যোগদানের প্রথম বছরেই জাপান চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ইতিপূর্ব্বে এই প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে এরূপ সাফল্য লাভ করেছিল হাঙ্গেরী। প্রতিযোগিতায় মূল ৭টি বিভাগের মধ্যে জাপান ৪টিতে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে—মেয়েদের কোর্বিলোন কাপে, পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডবলস এবং মহিলাদের ডবলসে। জাপানী খেলোয়াড়দের খেলার পদ্ধতি, তাঁরা কলম ধরার পদ্ধতিতে ব্যাট ধরে খেলেন। এই ধরণের পদ্ধতি পুরাতন এবং বহুকাল পরিত্যক্ত। কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা এই পুরাতন পদ্ধতিতে খেলা প্রাধান্য লাভের পক্ষে অন্যতম অন্তরায় মনে করেন। কিন্তু জাপানী খেলোয়াড়রা এই বাতিল পদ্ধতিতেই খেলতে অভ্যস্ত এবং শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ ক'রে আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ফলাফল সম্পর্কে ক্রীড়া-সমালোচকগণ যে ভবিষ্যৎবাণী ক'রেছিলেন তা সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন। ক্রীড়া সমালোচকগণ জাপানের সাফল্য কল্পনা করতেই পারেননি। জাপানীরা যোদ্ধার জাত, অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্য তাঁদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। খেলাতেও তাঁরা তা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা আত্মরক্ষামূলক খেলার ধার ধারেন না, তাঁদের খেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য আক্রমণাত্মক পদ্ধতি। কলম ধরার পদ্ধতিতে ব্যাট চালিয়ে এমনভাবে যে আক্রমণাত্মক খেলা যায় তা আগে কেউ ভাবতেই পারেননি। পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী সাটোর ব্যাট নিয়ে ক্রীড়ামহলে বেশ কৌতূহলের উদ্রেক হয়। কোন কোন বৈদেশিক খেলোয়াড় এবং সমালোচকের মতে, সাটোর এতখানি সাফল্যের পিছনে ছিল তাঁর ব্যাট। অর্থাৎ তিনি তাঁর ব্যাটের দৌলতেই জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর ব্যাটখানার অভিনবত্ব এই যে, ব্যাটের ওপর সাধারণ প্রচলিত ব্যাটের মত রবারের আবরণ নেই,
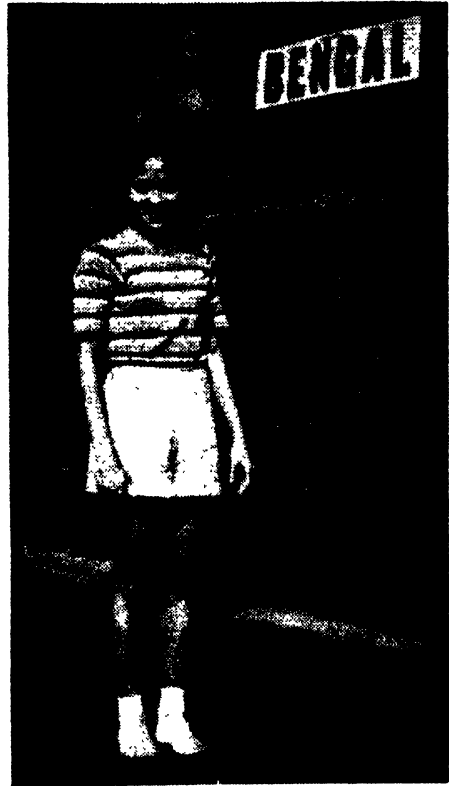
কুমারী নীলিমা ঘোষ—মাদ্রাজ অলিম্পিক গেমসে মহিলা বিভাগের ৮০ মিটার হার্ডলসে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে নূতন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন ক'রে আগামী বিশ্ব-অলিম্পিকে ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছেন। ফটো: ডি, রতন

পরিবর্ত্তে স্পঞ্জের আবরণ আছে। খেলার সময় সে কারণে কোন শব্দ হয় না। এক্ষেত্রে ভিক্টর বার্ণার অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্ণা টেবল টেনিসে বহুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানসীপ খেতাব পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'I watched Satoh many times carefully. His

timing was perfect, his half-volley implacable, his forehand devastating and he can chop as well if necessary. Probably his bat helps him a great deal, but I think he would be amongst top rankers, even if he were to use another bat.'

পুরুষদের ডবলসে ফুজী এবং হায়েসী এবং মহিলাদের ডবলসে নিশিহারা এবং নারাহারা স্পঞ্জ ব্যাটে না খেলে সাধারণ ব্যাটের সাহায্যেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন। সুতরাং স্পঞ্জ ব্যাটের ব্যবহারই যদি জয়লাভের পক্ষে বড় সুবিধা হ'ত তাহ'লে সকল জাপানী খেলোয়াড়রাই তা ব্যবহার করতেন না কি? সাটো ছাড়া অপরাপর জাপানীরা সাধারণ ব্যাটে খেলেছেন এবং তাঁদের বিরাট সাফল্যের কথা উল্লেখ ক'রে মিঃ বার্ণা উচ্চস্থান দিয়েছেন। সাটোর সাফল্যকে যাঁরা কটাক্ষপাত করেছেন তাঁদের মুখ হয়ত বন্ধ হবে কিন্তু গায়ের জ্বালা যাবে না। কারণ বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে শ্বেতকায় জাতিগুলিই একাধিপত্ব বজায় রেখে এসেছিলো, ১৯শ অনুষ্ঠানে তার ব্যতিক্রম ঘটলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জাপান দেশই অগ্রগামী হয়ে বিশ্বটেবল টেনিস ফেডারেশনের কাছে প্রতিযোগিতা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাব করেছিল, রবার দেওয়া ব্যাট ভিন্ন অন্য ধরণের ব্যাট নিষিদ্ধ করতে। কিন্তু এ প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

স্পঞ্জ ব্যাটের ব্যবহার টেবল টেনিস জগতে কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। পূর্ব্বে এর ব্যবহার ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা লোপ পায়। এর ব্যবহারে খেলায় যে একটা মস্ত কিছু সুবিধা লাভ করা যায় এমন কোন কারণ নেই বলেই এর ব্যবহার সম্পর্কে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় সাটো কোন খেলাতে না হেরে শেষ পর্য্যন্ত অপরাজেয় সম্মান নিয়ে স্বদেশে ফিরেছেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

সোয়েথলিং কাপ (পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ান-সীপ) : চ্যাম্পিয়ান—হাঙ্গেরী।

কোর্বিলিয়ম কাপ (মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ান সীপ) : চ্যাম্পিয়ান—জাপান।

সেণ্ট ব্রাইড ভেস : (পুরুষদের সিঙ্গলস) হিরাজি সাটো (জাপান) ২১-১৯, ২১-১৭, ২১-১ গেমে জোসেফ কুজিয়ান'কে (হাঙ্গেরী) পরাজি করেন।

গ্যাসপার গিষ্ট প্রাইজ (মহিলাদের সিঙ্গলস) এ্যাঞ্জেলিকা রোজেনু (রুমানিয়া) ২১-১৭, ১১-২১, ২১-১৮ ১৭-২১, ২১-১৪ গেমে গিজি ফার্কস'কে (হাঙ্গেরী পরাজিত করেন।

ইরাণ কাপ (পুরুষদের ডবলস) : ফুজী এবং হায়া (জাপান) ১২-২১, ৯-২১, ২১-১৮, ২১-১ , ২১-১২ গে জনী লীচ এবং রিচার্ড বার্গম্যান'কে (ইংলণ্ড) পরাজি করেন।

পোপ কাপ (মহিলাদের ডবলস) : নিশিমু এবং নারাহারা (জাপান) ২১-১১, ২১-১৭, ২১-১ গেমে ডায়না রো এবং রোজালিণ্ড রোকে (ইংলণ্ড পরাজিত করেন।

হেডুসেক কাপ (মিক্সড ডবলস) : সিডো (হাঙ্গেরী এবং রোজেনু (রুমানিয়া) ২১-১৯, ২১-১৩, ২১-২ গেমে লীচ এবং ডায়না রো'কে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন

জুবলী কাপ : বিজয়ী—ভিক্টর বার্ণা

পুরুষদের কন্‌সোলেসন সিঙ্গলস : রিজম্যান (আমেরিক

মহিলাদের কন্‌সোলেসন সিঙ্গলস : কুমারী সুলতা

সোয়েথলিং কাপ
(ফাইনাল তালিকা)

গ্রুপ 'এ'	খেলা জয়	খেলা হার	পয়েন্ট
ইংলণ্ড	৩৫	৬	৭
জাপান	৩২	৭	৬
ফ্রান্স	২৯	১২	৫
ভারতবর্ষ	২৩	২৩	৪
জার্মানি	২০	২৪	৩
পর্ত্তুগাল	১২	২৬	২
কাম্বোডিয়া	৮	৩২	১
পাকিস্তান	৬	৩৫	০

গ্রুপ 'বি'	খেলা জয়	খেলা হার	পয়েন্ট
হাঙ্গেরী	৩০	৪	৬
হংকং	২৭	৭	৫
ভিয়েৎনাম	২২	১২	৪
ব্রেজিল	১৮	১৭	৩
সিঙ্গাপুর	১২	২১	২
চিলি	৭	২৬	১
আফগনিস্তান	১	৩০	০

হাঙ্গেরী ৫-৪ গেমেতে ইংলণ্ডকে হারিয়ে সোয়েথলিং কাপ পায়। এই নিয়ে হাঙ্গেরী ১১ বার কাপ পেয়ে অধিকবার কাপ পাওয়ার রেকর্ড ক'রেছে।

কোর্বিলিয়ন কাপ

	খেলা জয়	খেলা হার	পয়েন্ট
জাপান	১৮	৫	৬
রুমানিয়া	১৬	৯	৪
ইংলণ্ড	১৩	৯	৪
হাঙ্গেরী	১২	১০	৩
	১২	১০	৩
হংকং	৭	১৭	১
ভারতবর্ষ	২	১৮	০

ভারতবর্ষ সোয়েথলিং কাপ প্রতিযোগিতায় ৪ পয়েন্ট পেয়ে ৪র্থ স্থান এবং কোর্বিলিয়ন কাপে কোন পয়েন্ট না পেয়ে সর্ব্ব নিম্ন স্থান পেয়েছে। কোর্বিলিয়ন কাপে তারা কোন দেশকেই হারাতে পারে নি।

এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বাৎসরিক এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে এশিয়ার কোন দেশই খেলবার যোগ্যতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া এই তিনটি দেশের খেলোয়াড়রাই ফাইনালে খেলেছে। পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে স্কোনেস্কি (পোল্যাণ্ড) এবং নাকোনা (জাপান) যথাক্রমে ১নং অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় সেজম্যান এবং বৃটিশ ডেভিস কাপ খেলোয়াড় মোট্রামের কাছে হেরে যান।

ভারতীয় এক নম্বর খেলোয়াড় নরেশকুমার কোয়ার্টার-ফাইনালে স্কোনেস্কি'র (পোল্যাণ্ড) কাছে ষ্ট্রেট-সেটে পরাজিত হ'ন। নরেশকুমার এবং দিলীপ বসু পুরুষদের ডবলসের কোয়ার্টার-ফাইনালে হেরে যান। পুরুষদের ডবলসে জাপানী খেলোয়াড় নাকোনা এবং মিয়াগি সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলেছিলেন।

সেজম্যান (অষ্ট্রেলিয়া) এবং ডরিস হার্ট (আমেরিকা) উভয়ই নিজ নিজ বিভাগের সিঙ্গলস এবং ডবলসে এবং মিক্সড ডবলসে জয়লাভ ক'রে প্রতিযোগিতায় 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন।
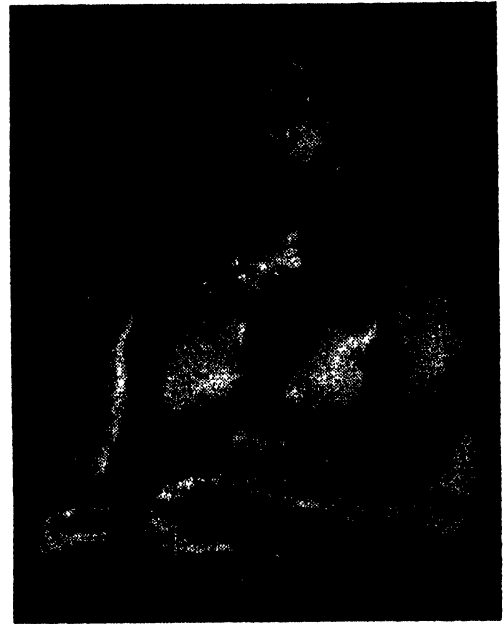
অনাদি দাস—মাদ্রাজে ভারতীয় অলিম্পিক গেমসে কুস্তির লাইট হেভী ওয়েট বিভাগে রাণার্স-আপ হয়ে আগামী বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতীয় দলে নির্ব্বাচিত হয়েছেন ফটো: মুরারী দত্ত

ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস: ফ্র্যাঙ্ক সেজম্যান (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৯-৭, ৬-০ গেমে টনি মোট্রাম'কে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: ডরিস হার্ট (আমেরিকা) ৬-৪, ২-৬, ৬-১ গেমে শার্লি ফ্রাই'কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস: সেজম্যান (অষ্ট্রেলিয়া) এবং ষ্ট্রেট

ক্লার্ক (আমেরিকা) ৩-৬, ৬-১, ১১-৯, ৬-৪ গেমে মোট্রাম এবং পাইস'কে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস : মিসেস হার্ট এবং ফ্রাই ১০-৮, ৬-৪ গেমে মিসেস ওয়াকার স্মিথ এবং মিসেস মোট্রাম'কে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : সেজম্যান (অষ্ট্রেলিয়া) এবং ডরিস হার্ট (আমেরিকা) ৬-০, ৬-১ গেমে ষ্টেট ক্লার্ক এবং মিস শার্লি ফ্রাই'কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পূর্ব্ব ভারত টেবল টেনিস ঃ

কলকাতায় ন্যাশানাল ক্রিকেট ক্লাবের ইন্-ডোর ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পূর্ব্ব ভারত টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় হায়াসি (জাপান), বার্জম্যান (ইংলণ্ড), আরলিচ এবং রুথফ্ট (ফ্রান্স) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড়রা যোগদান করেন। জাপানের পক্ষে একমাত্র হায়াসি প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে হায়াসি ভূতপূর্ব্ব বিশ্বটেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান বার্জম্যানকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত ক'রে এশিয়ার প্রাধান্য রক্ষা করেন।

ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : টি হায়াসি (জাপান) ২১-১৯, ২১-১৮, ২১-১৭ গেমে বার্জম্যান'কে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কুমারী সুলতানা (হায়দ্রাবাদ) ২১-৯, ২১-১১, ২১-৮ গেমে ই মোসেস'কে (কলিকাতা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : বার্জম্যান এবং থিরু ভেঙ্গাডাম (ভারতবর্ষ) ১৮-২১, ২১-১৫, ১২-২১, ২১-১৫, ২১-১৮ গেমে ভাণ্ডারী এবং কল্যাণ জয়ন্তকে পরাজিত করেন।

•মিক্সড ডবলস : ভাণ্ডারী এবং কুমারী সুলতানা ২১-১৪, ২১-১৭, ১৬-২১ এবং ২১-১৪ গেমে বার্জম্যান এবং মিস মোসেস'কে পরাজিত করেন।

ভ্রম সংশোধন ঃ

মাদ্রাজের পঞ্চম টেষ্টে ফাদকার ওভার-বাউণ্ডারী করেন। কিন্তু গত মাসে ছাপার ভুলে উমরীগড়ের নাম ছাপা হয়েছিলো। পাঠকদের পক্ষ থেকে সর্ব্বপ্রথম এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ মিত্র।

ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ড

(টেষ্ট ম্যাচ ফলাফল : ১৯৩২-১৯৫২)

স্থান	বৎসর	ইংলণ্ড জয়ী	ভারত জয়ী	ড্র	মোটখেলা
ইংলণ্ড	১৯৩২	১	০	০	১
ভারতবর্ষ	১৯৩৩-৩৪	২	০	১	৩
ইংলণ্ড	১৯৩৬	২	০	১	৩
ইংলণ্ড	১৯৪৬	১	০	২	৩
ভারতবর্ষ	১৯৫১-৫২	১	১	৩	৫
মোট		৭	১	৭	১৫

রেকর্ড

সেঞ্চুরী : ভারতবর্ষ—১১ : ইংলণ্ড—৮

	ভারতবর্ষের পক্ষে	ইংলণ্ডের পক্ষে
বৃহত্তম ইনিংস :	৪৮৫ (৯উই: ডিক্লে: বোম্বাই ১৯৫১-৫২)	৫৭১ (৮উই: ডিক্লে:, ম্যাঞ্চেষ্টার ১৯৩৬)
ক্ষুদ্রতম ইনিংস :	৯৩ (লর্ডস,১৯৩৬)	১৩৪ (লর্ডস, ১৯৩৬)
ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড :	৩ বার	৬ বার
৪০০ রান :	৩ বার	৬ বার
৫০০ „ :	০ বার	১ বার (৫৭১ রান)
মোট রান :	৬,৫১৯ (২৪৬ উই:)	৬,৭৮৮ (১৮৯ উই:)

ব্যক্তিগত সর্ব্বাধিক রান :

১৬৪ * (হাজারে, ১৯৫১-৫২) ১১৭ (হ্যামণ্ড, ১৯৩৬)

টেষ্ট সিরিজে সর্ব্বোচ্চ রান :

৩৮৭ (পঙ্কজ রায়,১৯৫১-৫২) ৪৫১ (ওয়াটকিন্স, ১৯৫১-৫২)

টেষ্ট সিরিজে সর্ব্বাধিক উইঃ :

৩৪ (মানকড়, ১৯৫১-৫২) ২৪ (বেডসার ১৯৪৬)

অধিকবার সেঞ্চুরী—৬টা (হাজারে) ২টো (হ্যামণ্ড)

আউট হবার হিসাব

	বোল্ড	কট্	এল-বি-ডব্লু	ষ্টাম্প	রান আউট	হিট-উই:	মোট
ভারতবর্ষ—	৭৮	১১৯	৩১	৯	৯	০	২৪৬
ইংলণ্ড—	৪৮	৯২	৩১	১৩	৩	২	১৮৯

১৯৫১-৫২ সালের টেষ্ট সিরিজে ৫টি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়। পূর্ব্বাপর টেষ্ট সিরিজে ৩টির বেশী টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয় নি।

এবার গাহিব আমি সুন্দরের জয় গান প্রিয়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমার সে কবি মনে দিয়াছো আহ্বান
আনিয়াছো ল'য়ে জয়-টীকা ,
আমার ঘুমন্ত প্রাণে জাগাইলে গান
যুগান্তের হে অভিসারিকা !

জীবনের ভীরুতার অক্ষম প্রকাশ
ঘটাইয়াছিলো বুঝি অবসাদ :
মানুষের মূঢ়তার কুৎসিৎ আভাষ
প্রত্যহের রূঢ় মিথ্যাবাদ।

দুরূহ পথের প্রান্তে রক্তাক্ত ধরণী—
দীনতার ঘৃণ্য পরিবেশ ;
সেথায় দাঁড়ায়ে শুনি জীর্ণতার জয়ধ্বনি,
ব্যর্থতার রিক্ত অবশেষ।

বিগত যৌবনের নগ্ন নশ্বররূপ—
বীভৎস—জীবন সন্ধ্যালোকে,
কদর্য্য জীবন যাহা বিষাক্ত বিদ্রূপ
মৃত্তিকার তন্দ্রাতুর চোখে !

ক্ষমি মোর অপরাধ ডাকিয়াছো ওগো রমণীয়—
এবার গাহিব আমি সুন্দরের জয়গান প্রিয় !

সাহিত্য-সংবাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "লাল মাটি"—৪৷৹
হুমায়ুন কবীর প্রণীত উপন্যাস "নদী ও নারী"—৪৷৹
বিজন ঘোষ দস্তিদার প্রণীত স্বরলিপি-গ্রন্থ "ভজনমালা"—২৷৹
শ্রীরাধারমণ দাস-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "হত্যাকারীর সন্ধানে"—২৲
শ্রীবনবিহারী ঘোষাল প্রণীত উপন্যাস "প্রতিশ্রুতি"—২৷৹
রসরাজ বৈদ্যরত্ন প্রণীত বিজ্ঞানালোচনা "সৃষ্টির শৃঙ্খল-মোচন"—৷৹
শ্রীসন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "অশ্রু-অর্ঘ্য"—৸৹
ডাঃ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "গীতি ও গাথা"—১৷৹
শ্রীচুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "পরাজিত বাঙলা"—১৲
সেখ আবদুল ওহাব প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "আগুনের বাঁশী"—৷৹
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পণ্ডিতমশাই" (১০ম সং)—২৲
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "তুমি কি সুন্দর !"—২৲
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "প্রতাপ-আদিত্য" (১৫শ সং)—২৷৹
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত "ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি" (১ম খণ্ড)—২৲
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত "আসল মনসা-মঙ্গল"—৸৹, "সিটি অব দি সান্ গড"—১৲
শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত "ছোটদের পদ্মপুরাণ"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নব বসন্ত"—২৲
ইয়ুসুফ প্রণীত রতি-শাস্ত্র "প্রেম ও প্রেমরতি"—২৲
শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ছায়ালোকের শ্রীমতীরা" (২য় পর্ব্ব)—১৸৵৹
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "নিশির ডাক"—১৸৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিল্পী—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা এম-এ

রাধার বিরহ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
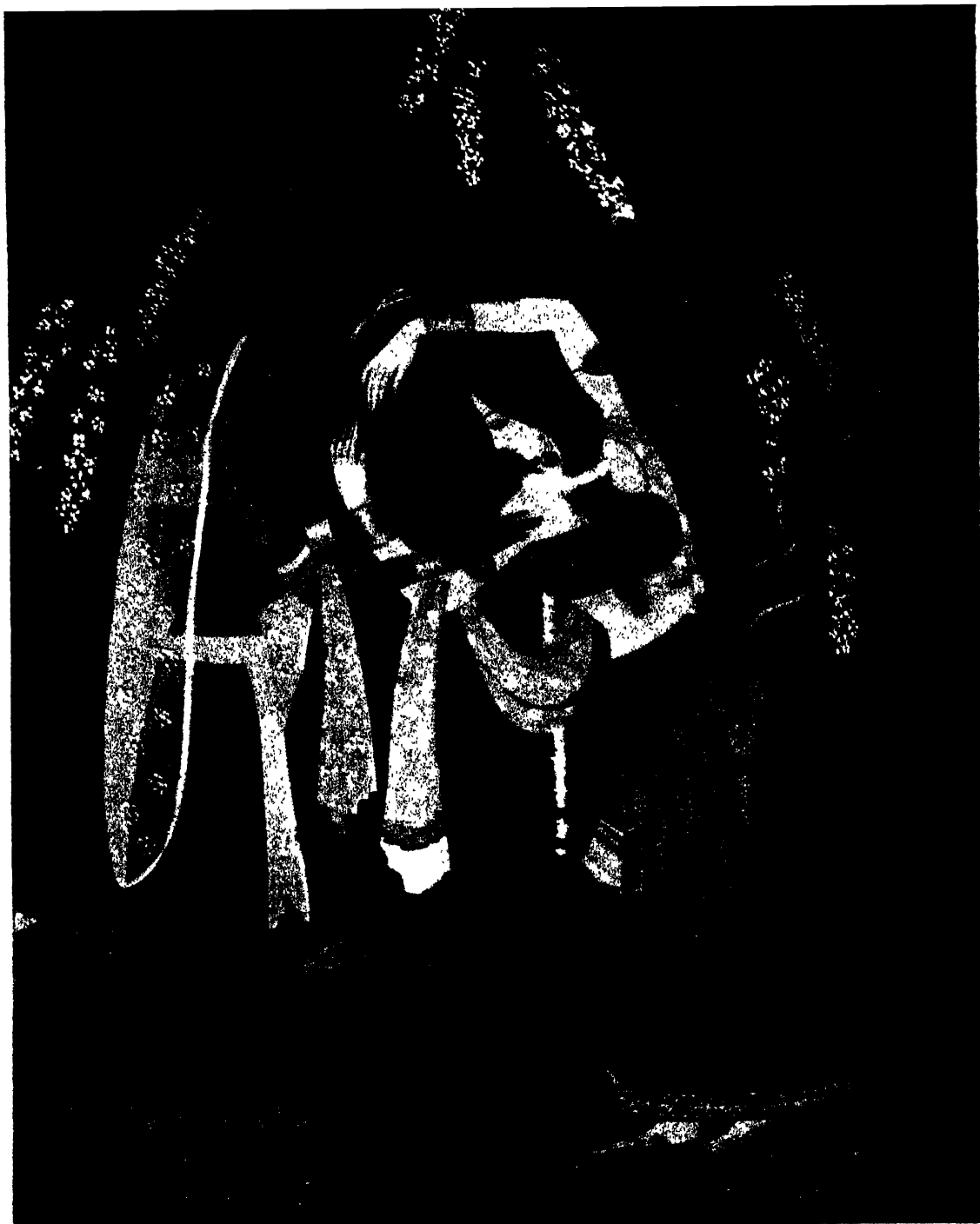
বৈশাখ—১৩৫৯

দ্বিতীয় খণ্ড | উনচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্য

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

শিক্ষাগৃহে ধর্মের প্রবেশ অনধিকার কিনা এ নিয়ে আমাদের দেশে যে সব আলোচনা চল্‌ছে তার কিছু কিছু শুনে বা পড়ে কেবলই মনে হয়—এ যেন নিতান্তই নিয়তির পরিহাস। শিক্ষা এল কোত্থেকে? প্রথম বিদ্যালয় কাঁরা স্থাপন করেছিলেন? কোথায় সে বিদ্যালয় বস্‌তো? সবাই জানেন কি পাশ্চাত্য দেশে কি আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের মূলে ছিল ধর্মপ্রচার। ধর্মগুরুরাই ছিলেন আদি শিক্ষক; প্রথম বিদ্যালয় বসেছিল কোন এক মন্দির প্রাঙ্গণে, কোন এক গির্জ্জার কোণে। অবশ্য ক্রমে ক্রমে শিক্ষা ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে চলে এল। শিক্ষা দেবার ও শিক্ষা পাবার অধিকার শুধু ধর্মগুরু ও তাঁদের শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না; জনসাধারণও সে অধিকার পেল এবং শিক্ষাগৃহ মন্দির বা গির্জ্জার প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি লোকালয়ে এসে পৌছাল। সঙ্কীর্ণতার পরিবর্তে প্রসারতা লাভ করে সেদিন শিক্ষা নূতন রূ ধারণ করলো বটে, কিন্তু শিক্ষা কোনদিনই ধর্মের প্রভা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি। শিক্ষার ভেত দিয়ে পৃথিবীতে যে সব বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ উঠেছে তার ভিত্তি ধর্মের ওপরে। হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি বল্‌তে যা বোঝায়—সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্ক চিত্রণ ইত্যাদি—তা হিন্দুধর্মের মধ্যে নিহিত যে প্র রয়েছে যুগ যুগ ধরে, তারই বিকাশ মাত্র। বৌদ্ধধ খৃষ্টধর্ম ও ইস্‌লাম ধর্মের ভেতর দিয়েও নিজ নিজ বিশেষ দিয়ে এক একটি অপূর্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গণ্য হও উচিত কিনা তা নির্ভর করে দৈনন্দিন জীবনে আমাদে ধর্মের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা তার ওপরে যাঁরা বলেন আমাদের জীবনে ধর্মের বিশেষ কোন স্থ

না প্রয়োজনীয়তা নেই সুতরাং বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থা নিতান্তই অবান্তর বা অবাঞ্ছনীয় তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। অধিকাংশই স্বীকার করে থাকেন জীবনের প্রতি মুহূর্তে ধর্মের আশ্রয় প্রয়োজন—মানুষের নিজস্ব শক্তি নিতান্তই সামান্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে অনেকে মনে করেন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা বাঞ্ছনীয় নয়। যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়েদের একত্র পড়াশুনা করার অধিকার রয়েছে, সেখানে কোনরূপ ধর্মশিক্ষা অসম্ভব। সুতরাং বিদ্যালয়ে ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ছেলেমেয়েরা ধর্মশিক্ষা পাবে বাড়িতে বাবা মা'র কাছ থেকে।

ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষার ভার দেওয়া হল বাবা মা'র ওপর চাপিয়ে, কিন্তু তাঁদের শিক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা হ'ল? আজকের যারা ছাত্রছাত্রী তারাই তো কালকের বাবা মা; বিদ্যালয়ে যদি তাঁরা ধর্মশিক্ষা নাই পেলেন, পরবর্তী জীবনেই বা ধর্মশিক্ষা পাবেন কোত্থেকে? বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করবো না অথচ আশা করবো ছেলেমেয়েরা বাবা মা'র কাছে ধর্মশিক্ষা পাবে—এ যেন ধরে নেওয়া হচ্ছে বাবা মা হলেই তাঁরা একদিনে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠবেন আপনা-আপনি। তা হ'লে তো এও ধরে নেওয়া যেতে পারে বাবা মা হলেই তাঁরা একদিন হঠাৎ শিক্ষিত হয়ে উঠবেন; ছেলেবেলায় তাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার কোনই প্রয়োজন নেই। সুতরাং বিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা না করে বাড়িতে ধর্মশিক্ষা আশা করা বাতুলতা মাত্র।

বিদ্যালয়ে একই ক্লাসে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা ক'রে থাকে। ধর্মশিক্ষা প্রদানে বিশেষ অসুবিধা এই যে এক ধর্ম হতে কোন কিছু শিক্ষা দিতে হলে হয় তো অপর ধর্মাবলম্বীদের ক্লাস ছেড়ে চলে যেতে হবে, বিশেষ করে যদি এরূপ শিক্ষা তাদের ধর্মবিরুদ্ধ হয়। যেখানে সবাই সমান অধিকার নিয়ে পড়াশুনা করতে এসেছে, সেখানে এমন কোন কিছু শেখান বাঞ্ছনীয় নয় যার ফলে অপর কাউকে ক্লাস ছেড়ে চলে যেতে হয়। ধর্মশিক্ষা দিতে হ'লে এমনভাবে দিতে হবে যেন সে শিক্ষা কারুরই ধর্মবিরুদ্ধ না হয়। প্রশ্ন উঠবে সেটা কতটা সম্ভব?

ধর্মের দুটো দিক, একদিকে বাইরের আচার ও অনুষ্ঠান, অপরদিকে ভেতরকার তত্ত্ব ও দর্শন। আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণই পারিবারিক বা সামাজিক ব্যাপার; বিদ্যালয়ে এর কোন স্থান নেই—বিশেষ করে যে বিদ্যালয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবারই বিদ্যা অর্জন করবার সমান অধিকার রয়েছে। তবে প্রত্যেক ধর্মেই এমন সব অমূল্য উপদেশ রয়েছে যা ছাত্রজীবন থেকে পালন করতে সচেষ্ট হলে ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্য লাভের পথ নিতান্তই সুগম হয়ে উঠবে।

ধরুন গীতার একটি শ্লোক—

> কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

মোটামুটিভাবে এর অর্থ হচ্ছে:—কাজ করে যাবে, চেষ্টা করে যাবে, কিন্তু ফলাফল কি হবে না হবে সেদিকে কোন নজর দিও না—কিন্তু তাই বলে কখন নিশ্চেষ্ট হয়েও বসে থেকো না।

কর্মজীবনে এর চেয়ে মূল্যবান কোন উপদেশ হতে পারে না। চেষ্টা করে আমরা কৃতকার্য হবার চেয়ে অকৃতকার্যই হয়ে থাকি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এবং এই প্রচেষ্টায় সফলতার আকাঙ্ক্ষা যার যত বেশী, ব্যর্থতার দুঃখও তার তত তীব্র; শুধু তাই নয়, একবার ব্যর্থ হলে পুনর্বার চেষ্টা করার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে। যে ছেলে পরীক্ষার ফল কি হবে না হবে তার দিকে বড় বেশী মাথা না ঘামিয়ে মাথা ঘামায় শুধু পড়াশুনা নিয়ে—সে ফেল করলেও হতাশ হয়ে পড়ে না। আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করে এবং পাশও করে। কিন্তু যে ছেলে পরীক্ষা দিয়েই বসে আছে পাশের আশায়, সে ফেল করলে একবারেই ভেঙ্গে পড়ে। আবার চেষ্টা করে পাশ করার মতন উৎসাহ আর তার বড় থাকে না।

অবশ্য আকাঙ্ক্ষা না থাকলে চেষ্টাই বা আসবে কোথা থেকে, চেষ্টার পেছনে যে প্রেরণা সেটাই তো ফললাভের আকাঙ্ক্ষা। পরীক্ষায় পাশ করবে—সেই আশা নিয়েই ছেলেরা রাত জেগে পড়াশুনা করে; ক্ষেত-ভরা পাকা ধানের স্বপন নিয়েই তো চাষীরা রাত না পোহাতে লাঙ্গল নিয়ে মাঠে ছোটে, এমন কি মা ও ছেলের গৌরবে

গরবিনী হবেন সেই আশা বুকে ধরে ছেলেকে মানুষ করেন। তবুও ব্যর্থতার এই ঘাত প্রতিঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার প্রধান উপায় নিজের মনকে যতটা সম্ভব ফলাফল থেকে সরিয়ে এনে শুধু চেষ্টার ভেতরই সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে রাখা।

আমরা ছেলেবেলা থেকেই যদি শিক্ষা পাই কাজ করে যাব, চেষ্টা করে যাব, ফলের দিকে তাকাবো না—সফল হই ভাল, না হই তাতেও কোন দুঃখ নেই, প্রয়োজন হলে আবার চেষ্টা করবো—আমাদের মনকে যদি ছেলেবেলা থেকেই এইভাবে তৈরী করতে চেষ্টা করি তা হলে ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের সফলতা লাভের যে অনেক বেশী সম্ভাবনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নেই। পাওয়া না পাওয়া সম্বন্ধে যাঁরা উদাসীন, তাঁরাই সাধারণত পেয়ে থাকেন; যাঁরা শুধু পাওয়ার পেছনেই ছোটেন তাঁরা বড় পান না।

ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের পক্ষে ছেলেবেলা থেকেই এ ধরণের শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ধর্মগ্রন্থ হতে এধরণের শিক্ষা দিতে হবে বলে যদি এরূপ শিক্ষা বাতিল করতে হয়, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ যে নিতান্তই ভয়াবহ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভাগবতীয় কৃষ্ণচরিত্র

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ব্রজলীলার অবসান

ভাগবতের নাটকীয় ভাব রাসলীলাতেই চরমে পৌঁছিয়াছিল। গোপীগণের পূর্ণমনোরথ সিদ্ধির অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অবসান। কংস যখন দেখিল কৃষ্ণনিধনার্থ প্রেরিত পুতনা ও বকাদি অনেক অসুর কৃষ্ণের দ্বারাই নিহত হইল, তখন তাহার কৃষ্ণবিদ্বেষ ও কৃষ্ণভীতি চরমে পৌঁছিল। তখন সে মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া কুবলয়পীড় নামক দুর্দ্ধর্ষ হস্তী বা চানুর মুষ্টিক প্রভৃতি বলবান মল্লের দ্বারা কৃষ্ণকে নিধন করিবে স্থির করিল। কৃষ্ণের মরণের পর সে কৃষ্ণপক্ষীয় সকলকে হত্যা করিয়া নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিবে। কৃষ্ণ আনয়নার্থ কংস অক্রুরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিল। অক্রুর যদুবংশীয় ছিলেন। তিনি ভয়ে কংসের বশবর্ত্তীভাব দেখাইলেও তাহার বিরোধী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণের শক্তি ও গুণগৌরবে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণই ভাবিয়াছিলেন। অক্রুর কৃত কৃষ্ণস্তোত্র—পুরুষসূক্তের ব্রহ্মস্তোত্রেরই অনুবাদ মাত্র। তিনি বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া কৃষ্ণের নিকট কংসের সমস্ত ভয়াবহ মন্ত্রণার কথা জ্ঞাপন করিলেন।

রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

অক্রুরের কথা শুনিতে শুনিতে যেন কিশোর কৃষ্ণ কয়েক দণ্ডের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তিতে উপনীত হইলেন। নিজের বিচিত্র জন্মবিবরণ, পিতামাতার দারুণ দুঃখ ও বিপদ, প্রিয় গোপ-গোপীদেরও বিপদাশঙ্কা, নিজ জ্ঞাতিবর্গের দুরবস্থায় কালযাপন—এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে বালকের যেন জীবনের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ব্যক্তির জীবন ও কর্ত্তব্য যেন রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের নিকট তুচ্ছ হইয়া গেল। রাষ্ট্র যদি সুরাষ্ট্র হয় তবেই ব্যক্তির জীবনে সুখ ও শান্তি হইতে পারে। আর রাষ্ট্র যদি কুরাষ্ট্র হয় তবে সেখানে ব্যক্তির স্বচ্ছন্দতা কোথায়? অতএব কুরাষ্ট্রকে সুরাষ্ট্রে পরিণত করাই ব্যক্তির জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ তাহার দ্বারাই জগতের অধিকাংশের উপকার হয়। এই চিন্তাধারার ফলে শ্রীকৃষ্ণ মহামন্ত্র পাইলেন—ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে হইবে। অত্যাচারী রাজগণের বিনাশ—ধার্ম্মিক রাজার রাষ্ট্র সংস্থাপন করিতে হইবে। এই চিন্তাধারার ফল—কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধাদি অসুর প্রকৃতি রাজগণের বিনাশ। বন্দী রাজা ও রাজকন্যাগণের উদ্ধার। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ সমর্থন। দুর্য্যোধন পক্ষ পরিবর্জ্জন।

তৎকালীন অন্যান্য অসুর প্রকৃতি রাজগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব ও বুদ্ধি নিজের সুবিধার জন্যই ব্যবহৃত হয় নাই। কংস বিনাশের পর তিনি নিজে রাজা হইলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম বা পিতা বসুদেবকে রাজা করিলেন না। কংস-পিতা উগ্রসেনকেই মথুরার রাজ্যে স্থাপিত করিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যশাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। সামান্য কার্য্য গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুনের রথের সারথি হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আর ব্রজে যাইতে পারেন নাই। রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কার্য্য তাহাকে একটার পর আর একটা টানিতে লাগিল। জরাসন্ধের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে যাদবদিগকে কৃষ্ণ সুদূর দ্বারকায় লইয়া গিয়া তথায় নূতন নগরী ও রাজ্য স্থাপন করিলেন। এই সকল রাষ্ট্র-ব্যাপার সহসা ও সহজে সংঘটিত হয় নাই। কৃষ্ণ ব্রজে নিজ ভক্ত ও পার্ষদ উদ্ধবকে পাঠাইয়া ব্রজের গোপ গোপীদিগের সন্তোষ সাধন করিলেন। তিনি

গোপীদিগের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে পাঠাইলেন। ভগবানের ধ্যান ও নাম এবং গুণকীর্ত্তন দ্বারাই জীবের শ্রেয়: লাভ হয়। উদ্ধব গোপ গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহারা কৃষ্ণস্মরণ ও কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনে বিভোর। উদ্ধব তাহা দেখিয়া বলিলেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্।

—নন্দ ও ব্রজস্ত্রীগণের পাদরেণু আমি পুন পুন বন্দনা করি। তাহাদের হরিকথা গীত ভুবনত্রয়কে পরিত্রাণ করিতেছে।

জীবের আত্যন্তিক কামনা

এইরূপে ভগবান জীবের আত্যন্তিক কামনা পূর্ণ করিয়া তাহাকে ক্রমশ: আত্মসাৎ করেন। জীবের আত্যন্তিক কামনার প্রকারভেদ অশেষ রকমের। ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণাদিতে ইহার বহু উদাহরণ আছে। অপমানিত রাজপুত্র ধ্রুবের নিকট ভক্তি বা মুক্তির উপদেশ কার্য্যকর হইল না। ধ্রুব উৎকৃষ্ট স্থান প্রার্থনা করিলেন। কৌরবদের দ্বারা অপকৃত অর্জুনকে ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যে বাস করিতে বলিলেও অর্জুনের তাহা প্রীতিকর হইল না। তিনি মর্ত্তে ফিরিয়া ভ্রাতৃগণের সহায়তা করাই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ভাবিলেন। কর্দম ঋষি প্রজাসৃষ্টির জন্য তপস্যা করিলেন। পুত্র কপিলদেব জন্মিবার পরই তাঁহার বাসনার শেষ হইল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থ মনোনিবেশ করিলেন।

নারদ মোক্ষ চাহিলেন না, তিনি ভগবানের ভক্ত হইয়া থাকিতে চাহিলেন। প্রলয়ে তিনি ভগবানে মিলিত হইলেন। কিন্তু প্রলয়ান্তে তাঁহার সেই সূক্ষ্ম বাসনা তাঁহাকে ভক্ত নারদ রূপেই পরিণত করিল।

বান রাজার বাসনা আরও অদ্ভুত প্রকারের। রুদ্রের বরে অতুল ঐশ্বর্য্য ও শক্তি পাইয়া তাঁহার এক ক্ষোভ রহিয়া গেল, সমকক্ষ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া সে যুদ্ধানন্দ ত লাভ করিতেছিল না। মহাদেবের নিকট সেই দুঃখ জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন, মৎসদৃশ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার দর্প নষ্ট হইবে। উষাহরণ ব্যাপারে বানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া বানের দর্প দূরীভূত হইল।

ভাগবতে ও পুরাণান্তরে বর্ণিত নারায়ণের দ্বারীদ্বয় জয়বিজয়ের কাহিনীও জীবের সূক্ষ্মবাসনা তাহাকে কিরূপ পথে লইয়া যায় তাহার সুন্দর উদাহরণ। জয়বিজয় বিষ্ণুর দ্বারী বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুর ন্যায়ই মূর্ত্তিধারী। সনকাদি ঋষিগণ যখন বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন তাহারা দর্পের সহিত তাঁহাদের গতি রোধ করিল। কুপিত ঋষিগণ তাহাদিগকে শাপ দিলেন, তোমরা অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। দ্বারীদ্বয় তখন ভীত হইয়া তাহাদিগকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলে ঋষিগণ বলিলেন তোমরা ভগবানের প্রতি বৈরভাব অবলম্বন করিয়া কয়েক জন্ম পরেই আবার বৈকুণ্ঠে আসিয়া স্বপদ প্রাপ্ত হইবে। ঋষিদের শাপ এক হিসাবে বর বলিয়াও গণ্য হইতে পারে। জয়বিজয়ের শক্তির অহঙ্কার হইয়াছিল। হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কংস-শিশুপাল জন্মে তাহারা অতুল ঐশ্বর্য্য ও শক্তির জন্য গর্ব্বান্বিত হইয়াছিল। আবার ঐ ঐশ্বর্য্য ও শক্তিপ্রাপ্তির অতুল দুঃখও তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভগবানের প্রতি নিরন্তর বিদ্বেষ করিয়া তাহাদের মন তন্ময় হইয়াছিল। তাহাতে তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিল।

শ্রীকৃষ্ণ কাম ক্রোধ লোভ ও দ্বেষহীন পুরাণাদিতে মহাদেবের ক্রোধ-প্রবণতার বর্ণনা আছে। রুদ্র রোষে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ। মদন ভস্ম। ভৃগু কর্ত্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পরীক্ষা।—ঋষি সভায় তর্ক উঠিল—কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ ভৃগুকে বলিলেন, আপনাকেই এ বিষয়ের মীমাংসার ভার দেওয়া হইল। ভৃগু তথ্য নির্ণয়ার্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। প্রথমে ব্রহ্ম লোকে গিয়া ব্রহ্মসভায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রহ্মা ভৃগুকে আদর করিয়া বলিলেন, পুত্র এস—তোমাকে দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলাম। ভৃগু কোনও রূপ প্রত্যভিবাদন না করিয়া দণ্ডায়মান থাকায় ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়না করিতে উদ্যত হইলেন।

ভৃগু সেখান হইতে পলায়ন করিয়া কৈলাসে শিবের সভায় উপনীত হইলেন। মহাদেবও তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু ভৃগু তাঁহার আচার ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করায় রুদ্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে প্রহারার্থ ত্রিশূল উদ্যত করিলেন। পার্ব্বতী মহাদেবকে শান্ত করিলেন। ভৃগুও সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

ভৃগু বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নারায়ণ নিমীলিত নয়নে শায়িত; লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। ভৃগু গিয়া একবারেই নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। নারায়ণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভৃগুকে বসাইলেন—বলিলেন, আমার কঠোর বক্ষের সংঘর্ষে আসিয়া নিশ্চয়ই আপনার পা আহত হইয়াছে এবং লক্ষ্মী নারায়ণ দুইজনেই আহতের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইলেন। ভৃগুর তখন দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল।

ভৃগু ঋষিসভায় গিয়া আপন কাহিনী বর্ণনা করিলেন।

ভক্তির দ্বারাই ভাগবতকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষ বিহীন। তিনি ভক্তবৎসল। এই ভাবে ভাগবত পাঠ করিতে থাকিলে ভাগবত নিজেই নিজেকে পাঠকের অন্তরে প্রকাশিত করিতে থাকেন।

(চিত্র-নাট্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

দ্বিতলে দিবাকরের ঘর। দিবাকর নিজের বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। নন্দার যে ফটোখানা সে চুরি করিয়াছিল, তাহাই ডান হাতে বুকের উপর ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ক্রমে তাহার চোখের পক্ষ মুদিয়া আসিল, ছবিখানা হাত হইতে খসিয়া বুকের উপর পড়িয়া রহিল। তন্দ্রার মধ্যে সে একবার অস্ফুট স্বরে বলিল—না না, নন্দা—তা হয় না।

নন্দা আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপাশে দাঁড়াইল, করুণ মধুর নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। দিবাকরের বুকের উপর উল্টানো ছবিটা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কার ছবি?

নন্দার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে অতি লঘু হস্তে ছবিখানা দিবাকরের বুকের উপর হইতে তুলিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের চট্‌কা ভাঙিয়া গেল, সে ধড়মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

দিবাকর: নন্দা—!

নিজের মুখে নন্দার নাম শুনিয়া সে নিজেই থতমত খাইয়া গেল! নন্দা ছবিটি দেখিয়া হাসি-মুখ তুলিল।

নন্দা: হ্যাঁ, নন্দা। চণ্ডীদাস কি বলেছেন জানো?

দিবাকর শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

দিবাকর: চণ্ডীদাস—?

নন্দা: হ্যাঁ গো, কবি চণ্ডীদাস, রজকিনী রামীর চণ্ডীদাস। গান শোনো নি? চণ্ডীদাস কয়, আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা!

দিবাকর: (অবরুদ্ধ স্বরে) নন্দা, আমি—

নন্দা: কখন ছবিটা চুরি করলে? উঃ, কি সাংঘাতিক চোর তুমি! আমার চোখের সামনে চুরি করলে তবু দেখতে পেলাম না!

দিবাকর: নন্দা, কেন তুমি জানলে? আমি বলতে চাইনি—

নন্দা: কিন্তু এখন ধরা প'ড়ে গেছ। এখন কি করবে?

দিবাকর: কি করব! আমি চোর—দাগী আসামী—

মুহূর্তে নন্দার মুখ গম্ভীর হইল; সে দিবাকরের মুখের উপর অপ্রগল্‌ভ চক্ষু রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

নন্দা: তুমি চোর, তুমি দাগী আসামী, আচ্ছা বেশ, কিন্তু আমি তবে কি? চোরের বোন। তফাৎ কতখানি? আমি কোন অধিকারে তোমাকে নীচু নজরে দেখব!

দিবাকর: না না, সে অন্য কথা। মন্মথবাবু প্রকৃতিস্থ নয়, তিনি কি করছেন তা নিজেই জানেন না। কিন্তু আমি যে শাদা চোখে জেনে শুনে অপরাধ করেছি—

নন্দা: কিন্তু এখন তো তুমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ।

দিবাকর: তা পেরেছি, কিন্তু নিজের অতীতকে ভুলতে পারছি কৈ? অতীতের দেনা যতক্ষণ না শোধ করছি ততক্ষণ যে আমার নিষ্কৃতি নেই নন্দা।

নন্দা: অতীতের দেনা?

দিবাকর: যা করেছি তার ফল ভোগ করতে হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

নন্দার মুখ পাণ্ডুর হইল; দাদুও তো ওই কথাই বলিয়াছিলেন। সে স্খলিতস্বরে বলিল—

নন্দা: প্রায়শ্চিত্ত! কী প্রায়শ্চিত্ত! কি করতে চাও তুমি?

দিবাকর একবার কপালের উপর দিয়া করতল সঞ্চালিত করিল।

দিবাকর: তা এখনও ঠিক জানি না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, না করলে শান্তি নেই। নন্দা, আর আমি এখানে থাকব না, চ'লে যাব।

নন্দা: কেন! কেন! তার কি দরকার!

দিবাকর: আমার দরকার আছে। তোমাকে ছেড়ে চ'লে যাওয়া আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রথম পর্ব।

নন্দার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া দিবাকর তাহার আরও কাছে আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—

দিবাকর: কেঁদোনা, নন্দা। আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও—

নন্দা গিয়া দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

নন্দা: না, তুমি যেতে পাবে না।

দিবাকর: (কাছে গিয়া) নন্দা, আমার মন বড় দুর্বল, আমাকে প্রলোভন দেখিও না। তুমি আমাকে মানুষ তৈরি করেছ, তুমি আমার পথ আগলে দাঁড়িও না, আমাকে মনুষ্যত্বের পথে হাঁটতে দাও। নন্দা, আমার কথা শোনো।

দিবাকর আঙুল দিয়া নন্দার চিবুক তুলিয়া ধরিল।

নন্দা: (অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে) চ'লে যাবে?

দিবাকর: আবার আমি ফিরে আসব। যেদিন আমার ঋণ শোধ হ'বে সেইদিন আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।

নন্দা: আসবে?

দিবাকর: আসব, শপথ করছি। কিন্তু তুমিও একটা শপথ কর। তুমি আমাকে সাহায্য করবে, আমার প্রায়শ্চিত্ত যাতে পূর্ণ হয় তার চেষ্টা করবে। তুমি সাহায্য না করলে আমি যে কিছুই পারব না নন্দা। বল, সাহায্য ক'রবে।

কান্নার বুজিয়া যাওয়া স্বরে নন্দা বলিল—

নন্দা: ক'রব।

দিবাকর তখন নন্দার হাত ধরিয়া পাশে সরাইয়া দিল।

দিবাকর: এবার আমি হাল্কা মনে যেতে পারব।— চললাম নন্দা, আবার দেখা হবে।

দিবাকর চলিয়া গেল। অশ্রুবাষ্পের ভিতর দিয়া নন্দা যেন দেখিতে পাইল, দিবাকর চলিয়া যাইতেছে; সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল; হল্ ঘর পার হইয়া বাগানের পথ দিয়া চলিয়াছে; ফটক উত্তীর্ণ হইয়া রাস্তায় নামিল; ঘনায়মান সন্ধ্যায় নগরের জনসমুদ্রে মিলাইয়া গেল।

ডিজল্ভ্।

রাত্রি আন্দাজ আটটা। লিলির ড্রয়িংরুম। লিলি সোফায় বসিয়া আছে, আর মন্মথ নতজানু অবস্থায় তাহার দিকে ঝুঁকিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। মানুষ যে অবস্থায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া প্রবৃত্তির খরস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে মন্মথর সেই অবস্থা। সে উন্মাদনার ঝোঁকে বলিতেছে—

মন্মথ: লিলি, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই—তোমাকে না পেলে আমি পাগল হ'য়ে যাব—

পুরুষকে প্রলুব্ধ করার কলাবিদ্যায় লিলি সুনিপুণা; কতখানি আকর্ষণ করিয়া কখন ঢিলা দিতে হয় তাহা তাহার নখাগ্রে। সে বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গী করিয়া ঠোঁটের কোণে হাসিল।

লিলি: সবাই ঐ কথা বলে। ও তোমাদের মুখের কথা।

মন্মথ: মুখের কথা! লিলি, তুমি জানোনা, তোমার জন্যে আমি নিজের বোনের গয়না চুরি করেছিলাম। তোমার জন্যে আমি কী না পারি। যদি হৃদয় খুলে দেখাতে পারতাম তাহলে বুঝতে।

লিলি: পুরুষদের হৃদয় নেই, শুধু ছলনা।

লিলি হঠাৎ উঠিয়া ব্যাল্কনিতে গিয়া দাঁড়াইল। নীচে অন্ধকার বাগান; লিলি রেলিংয়ের উপর কনুই রাখিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। মন্মথ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না যে ঠিক ব্যাল্কনির নীচে অন্ধকারে দিবাকর দাঁড়াইয়া আছে।

মন্মথ: লিলি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। তোমার জন্যে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, মানুষ খুন করতে পারি—

লিলি: ওসব কিছুই করবার দরকার নেই। তুমি আমাকে ভালবাসো কিনা খুব সহজে প্রমাণ করতে পার।

মন্মথ: (সাগ্রহে) কি করব বলো?

লিলি: কিন্তু সে তুমি পারবে না।

মন্মথ: একবার ব'লে ত্যাখো পারি কিনা। একবার মুখ ফুটে বল লিলি।

লিলি গম্ভীর মুখে মন্মথর দিকে ফিরিল।

লিলি : তুমি একবার ব'লেছিলে তোমার বাড়ীতে একটি সুন্দর রুবি আছে ; যদি সেই রুবি আমাকে এনে দিতে পারো, তবেই বুঝব তুমি আমায় ভালবাসো।

মন্মথর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল।

মন্মথ : রুবি—সূর্যমণি ! কিন্তু সে যে—সে যে আমাদের ঠাকুর, গৃহদেবতা। দাদু রোজ তার পুজো করেন—

লিলি : (মুখ বাঁকাইয়া) আমি জানতাম তুমি পারবে না। তুমি কেবল মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলতে পার।—সর, পথ ছাড়ো।

লিলি আবার কক্ষে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু মন্মথ হাত দিয়া তাহার পথ আগলাইয়া রহিল।

মন্মথ : লিলি, আমার একটা কথা শোনো—

লিলি : আর কি শুনব ? তোমার প্রেমের দৌড় বুঝতে পেরেছি। তোমার চেয়ে দাশুবাবু ফটিকবাবু ভাল, তারা অন্তত কৃপণ নয়।

মন্মথর মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল দাশু ফটিকের উল্লেখে তাহা দূর হইল সে তীব্র অনুরাগভরা চোখে চাহিয়া লিলির দুই কাঁধের উপর হাত রাখিল।

মন্মথ : লিলি, আমি যদি সূর্যমণি এনে তোমায় দিই, তাহলে তুমি আমার হবে ?

লিলি : তাহলে বুঝব তুমি আমায় সত্যিই ভালবাস।

মন্মথ : আর তুমি ? তুমি আমায় ভালবাস না ?

লিলি : (লজ্জার অভিনয় করিয়া) সেকথা মেয়েরা কি মুখ ফুটে বলতে পারে ?

মন্মথ : লিলি, চল দু'জনে পালিয়ে যাই। আমি সূর্যমণি চুরি ক'রে আনব, তারপর দু'জনে পালিয়ে গিয়ে নির্জনে বাস করব; কেউ জানবে না, শুধু তুমি আর আমি।—

লিলি : ডার্লিং !

মন্মথ : ডার্লিং ! আজ রাত্রে আমি আসব—দুপুর রাত্রে আসব—সূর্যমণি নিয়ে আসব যেমন ক'রে পারি। তুমি আমার জন্যে রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।

লিলি : আমি সারা রাত তোমার পথ চেয়ে থাকব।

বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া দু'জনে আবার ঘরে ফিরিয়া গেল। ব্যাল্‌কনির নীচে দাঁড়াইয়া দিবাকর অবিচলিত মুখে সমস্ত শুনিয়াছিল ; আর অধিক শুনিবার প্রয়োজন ছিল না।

ডিজল্‌ভ।

রাত্রি সাড়ে আটটা। যদুনাথের হল্‌ ঘরে কেহ নাই, কেবল নন্দা স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। নন্দা কাছেই ছিল, সে ক্ষণেক শব্দায়মান যন্ত্রটার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া যন্ত্রটি তুলিয়া কানে ধরিল। যদি দিবাকর হয় !

নন্দা : হ্যালো—

তারের অপরদিক হইতে কোনও শব্দ আসিল না।

নন্দা : হ্যালো হ্যালো—

কাট্‌।

কোনও অনির্দিষ্ট স্থানে একটি টেবিলের সম্মুখে দিবাকর টেলিফোন কানে দিয়া বসিয়া আছে ; তাহার মুখে স্নেহ-মধুর হাসি। কিছুক্ষণ শুনিবার পর সে নরম সুরে বলিল

দিবাকর : তুমি কথা বল নন্দা, আমি শুনি।

ওদিকে নন্দার মুখ উজ্জ্বল হইয়া আবার পাণ্ডুর হইয়া গেল।

নন্দা : তুমি—তুমি ! কোথা থেকে কথা বলছ ?

দিবাকর : তা জেনে কোনও লাভ নেই নন্দা। তার চেয়ে তুমি কথা বল', তোমার গলার আওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করছে।

নন্দা : (ধরা-ধরা গলায়) শুধু গলার আওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করছে ? আর—দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না ?

দিবাকর : ইচ্ছে হচ্ছে না !

নন্দা : তবে ফিরে আসছ না কেন ?

দিবাকর : বলেছি তো, নন্দা, আসব। কিন্তু এখন নয়। একটা কথা শোনো।—আজ রাত্রে তুমি সজাগ থেকো, ঘুমিও না।

নন্দা : (সাগ্রহে) তুমি আসবে ?

দিবাকর : তা ঠিক জানি না। কিন্তু তুমি জেগে থেকো।

নন্দা : আচ্ছা।—ও: !

নন্দার দৃষ্টি পড়িল, যদুনাথ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন।

নন্দা : (নিম্নস্বরে) দাদু আসছেন। দাদু তোমাকে বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্ছেন—

নন্দা টেলিফোনের শ্রবণ যন্ত্রটি টেবিলের উপর রাখিল, তারের সংযোগ কাটিয়া দিল না। তাহার ইচ্ছা যদুনাথ অন্যত্র চলিয়া গেলে আবার দিবাকরের সহিত কথা কহিবে। যদুনাথ কিন্তু চলিয়া গেলেন না, নন্দার সম্মুখে আসিয়া ক্ষুব্ধ মুখে বলিলেন—

যদুনাথ: সে নিজের ঘরে নেই, চ'লে গেছে। আমাকে না ব'লে চ'লে গেছে। (লাঠি ঠুকিয়া) আমি জানতে চাই এর জন্যে দায়ী কে? নিশ্চয় কেউ তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, নৈলে সে আমাকে না ব'লে চ'লে যাবে কেন?

টেলিফোনের অপর প্রান্তে দিবাকর যদুনাথের কথাগুলি শুনিতে পাইতেছে; তাহার চক্ষু বাষ্পোচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ওদিকে যদুনাথ আরও উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া চলিয়াছেন—

যদুনাথ: আমার কথার উত্তর কেউ দেবে? বাড়ীর সবাই যেন বোবা হ'য়ে গেছে। দিবাকর কোনও দিন আমাকে না জানিয়ে বাড়ীর বাইরে যায় না, আজ কোথায় চ'লে গেল সে! কেন চ'লে গেল? নিশ্চয় কেউ তাকে চ'লে যেতে ব'লেছে তাই সে চ'লে গেছে। আমি তো কোনও দিন তাকে একটা কটু কথা বলিনি। নন্দা, তুই তাকে কটু কথা বলেছিস?

নন্দা: (নত মুখে) না দাদু।

যদুনাথ: তবে অমন ভাল ছেলেটা কেন চ'লে গেল। নন্দা, সত্যি বল্, তুই তাকে তাড়িয়ে দিস নি?

নন্দা: (অধর দংশন করিয়া) না দাদু।

যদুনাথ: তবে আর কেউ দিয়েছে। সে তো অম্নি-অম্নি চ'লে যাবার ছেলে নয়—

এই সময় মন্মথ সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া যদুনাথ বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিলেন।

যদুনাথ: এই—মন্মথ! তুমি—তুমি—দিবাকরকে তাড়িয়েছ! তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

মন্মথ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল।

মন্মথ: কি হয়েছে? আমি তো কিছু জানি না!

যদুনাথ: এ বাড়ীর কেউ কিছু জানে না, সবাই ন্যাকা। সব্বাইকে তাড়িয়ে দেব আমি, দূর ক'রে দেব বাড়ী থেকে। যত সব চোর বাটপাড় গাঁটকাটার দল—

যদুনাথ আফসাইতে লাগিলেন। মন্মথ চোরের মত উপরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে সেবক আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে ভয়ে ভয়ে বলিল—

সেবক: বাবু—

যদুনাথ সিংহ বিক্রমে তাহার দিকে ফিরিলেন।

যদুনাথ: তোমার আবার কী দরকার?

সেবক: খাবার দেওয়া হয়েছে।

যদুনাথ: খাবার! খাব না আমি—ক্ষিদে নেই আমার—

তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

যদুনাথ: ভাল চাও তো ফিরিয়ে নিয়ে এস তাকে, যেখান থেকে পারো ফিরিয়ে নিয়ে এস। নৈলে—

তিনি দড়াম করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। সেবক ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া ইতি উতি চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। নন্দা আবার টেলিফোন তুলিয়া লইল।

নন্দা: শুনলে?

দিবাকর: শুনলাম।

নন্দা: তবু আসবে না?

দিবাকর: আসব নন্দা। আমি শপথ করেছি আসব। কিন্তু তুমি তোমার শপথ ভুলে যাওনি তো?

নন্দা: না।

দিবাকর: আজ রাত্রে সতর্ক থেকো, জেগে থেকো।

নন্দা: আচ্ছা। তোমার দেখা পাবার আশায় জেগে থাকব। কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া সে টেলিফোন নামাইয়া রাখিল।

ডিজল্‌ভ্।

রাত্রি বারোটা। যদুনাথের দ্বিতলের বারান্দা।

মন্মথ নিজের ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাহার গায়ে বিলাতী পোষাক, পায়ে রবারের জুতা। সে কান পাতিয়া শুনিল, কোথাও শব্দ নাই। তখন সে সন্তর্পণে নীচে নামিয়া গেল।

নন্দা নিজের ঘরে জাগিয়া ছিল। ক্ষীণ রাত্রি-দীপ জ্বালিয়া সে মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল; আশা করিতেছিল, দিবাকর আসিবে। মন্মথর বহির্গমন সে জানিতে পারিল না।

কাট্।

মন্মথ ইতিমধ্যে নীচে নামিয়া যদুনাথের শয়ন ঘরের দ্বারের কাছে

দাঁড়াইয়াছে। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, যদুনাথ নাসিকাধ্বনি করিয়া ঘুমাইতেছেন। মন্মথ তখন লঘু হস্তে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

যদুনাথের বালিশের পাশে চাবির গোছা রহিয়াছে, যদুনাথ বিপরীত দিকে ফিরিয়া ঘুমাইতেছেন। মন্মথ হাত বাড়াইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে চাবির গোছা ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিয়া লইল। যদুনাথ জানিলেন না।

বাহিরে আসিয়া মন্মথ চাবি দিয়া ঠাকুর ঘরের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ডিজল্ভ্।

কয়েক মিনিট পরে। যদুনাথের ফটক হইতে কিছু দূরে রাস্তার পাশে একটি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে; ট্যাক্সির চালক দাড়িওয়ালা শিখ গাড়ীর বনেট খুলিয়া খুটখাট করিতেছে।

মন্মথকে দ্রুতপদে বাড়ীর দিক হইতে আসিতে দেখা গেল। ট্যাক্সির পাশাপাশি আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

মন্মথ: ট্যাক্সি যায়গা?

চালক বনেট বন্ধ করিয়া ভাঙা গলায় বলিল—

চালক: যায়গা।

মন্মথ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, শিখ চালক গাড়ী চালাইয়া দিল। শিখ চালক যে ছদ্মবেশী দিবাকর, দাড়িগোঁফের ভিতর হইতে মন্মথ তাহা চিনিতে পারিল না।

ওয়াইপ।

উইলিয়ম কেরী হইতে মৃত্যুঞ্জয় পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলা সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হইল বলা চলে, কারণ ইহার পূর্ব্বে ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বলিতে লোকে কাব্য বুঝিত। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বাংলা সাধুভাষার গদ্যরীতি প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখনও সাধারণের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইবার মত ক্ষমতা বাংলা সাহিত্যের জন্মে নাই। বাংলা দেশে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হইল ইহার একটা বিশেষত্ব আছে, ইহা বৈচিত্র্যপূর্ণ অথচ জটিল।

শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি সাধনের প্রধান উদ্যোগ বলা চলে। এই শ্রীরামপুর মিশন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড নামক কয়েকজন মিশনারীর চেষ্টায় স্থাপিত হয়। তবে কেরীকেই ইহাদের মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া উচিত; কারণ কপর্দ্দকহীন অবস্থায় খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যতখানি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার জন্য বাংলাভাষা ও পরবর্ত্তী বঙ্গসমাজ তাঁহার ঋণকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিবে।

এই মিশনারীদের মিলিত চেষ্টায় শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হইল। বাংলা অনুবাদ ছাপা হইয়া বাহির হইল, কিন্তু এই অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধি আনয়ন করে নাই। ইহার অসম্পূর্ণ অনুবাদ, অবোধ্য ভাষা ও অশুদ্ধ ব্যাকরণ ইত্যাদি দেখিলে বোঝা যায় যে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল।

সেই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেই শ্রীরামপুর হইতে রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সেই রাম বসু পারসী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রথম বাংলা গদ্য পুস্তক বা প্রথম ঐতিহাসিক পুস্তক হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম গদ্য পুস্তক রচয়িতা হিসাবে সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য।

এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে Fort William Collegeএর প্রচেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কলেজে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী সাহেব বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রফেসারের পদে উন্নীত হইয়া কলেজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই পদপ্রাপ্তিতে কলিকাতার বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইল। তিনি এখন হইতে বাংলা ভাষাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য নিজে বাংলা শিক্ষা ও বাংলা পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একখানি ব্যাকরণ; দুইখানি পাঠ্যপুস্তক ও একখানি বাংলা-ইংরাজি অভিধান প্রণয়ন করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তৎকালীন বাঙ্গালী পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইয়াছিল। কেরী নাম যে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অমর হইয়া আছে—ইহা তাঁহার রচনাবলীর জন্য অথবা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের

অধ্যাপক হিসাবে নহে, কিন্তু তাঁহার গুণমুগ্ধ জনসাধারণ যে তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আদর্শ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইজন্ত।

Fort William Collegeএ ১৫জন পণ্ডিত ছিলেন, তন্মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রবীণ ছিলেন। ইনি কিছুদিন কেরীর পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাকে এবং উক্ত কলেজের আরও কয়েকজন—পণ্ডিত রামরাম বসু, রাজীবলোচন ও চণ্ডীচরণ প্রভৃতিকে কেরী অনুরোধ ও উৎসাহ দ্বারা বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী করেন। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ঐ কলেজের সহকারী লাইব্রেরীয়ান ; কেরীর পরামর্শ ও উৎসাহেই তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে Eng-Beng Vocabulary প্রণয়ন করেন। তাঁহার অনুরোধ ও প্রভাবে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল ক্রমান্বয়ে তাহার দৃষ্টান্ত দিতে যাওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে হয়—কিন্তু ইহার দ্বারা বোঝা যায় যে কি বিরাট ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব—তাঁর সমসাময়িকদের উপরে কত গভীর ছিল তাঁহার প্রভাব। যদিও কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রাজীবলোচন মুখার্জ্জী প্রভৃতির লেখা প্রায় একই সময়ে বাহির হইতে থাকে তথাপি আমরা কেরীর পুস্তক সম্বন্ধেই পূর্ব্বে আলোচনা করিব। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী একখানা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। সেই বৎসরই তাঁহার কথোপকথন বাহির হয়। ইহার ১১ বৎসর পরে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইতিহাস সমালোচনা রচনা করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বাংলা অভিধান বাহির হয়। এই চারিখানাই তাঁহার বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

কেরীর ব্যাকরণ Halhedএর ব্যাকরণ হইতে সাহায্য লইয়া লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু কেরীর পুস্তকে ভাষা সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং ইহাই কলেজের ছাত্রদের যথেষ্ট উপকারে আসিয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে একটি জীবন্ত ভাষা একটি বহুদিনের মৃত ভাষার নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না। অতীতের যোগসূত্র তাহাদের মধ্যে যতই থাকুক না কেন, বাংলা ভাষা শিক্ষার পক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলীই যথেষ্ট নয়, কেরী ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বাংলা কথ্য ও লেখ্য ভাষায় ও সংস্কৃতে যথেষ্ট অধিকার জন্মিয়াছিল। তাই তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া এই ব্যাকরণ রচনা করেন। তাঁহার কথোপকথন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। বাংলা কথ্য ভাষার উপর তাঁহার যে অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল তাহা এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও ইহার মধ্যে অনেকস্থলে ভুল আছে যাহা সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু ইহার বিস্তৃতি ও বিষয়বৈচিত্র্য বিভিন্ন অবস্থা ও শ্রেণীর লোক লইয়া। ইহাতে যে কথোপকথনের সৃষ্টি করিয়াছে ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে কত গভীর সহানুভূতিপূর্ণ সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া তিনি তৎকালীন বঙ্গসমাজের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার, ভাবধারা ইত্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। সেই অনুবাদের যুগে বাংলার চলিত মৌলিক ভাষায় লেখা এই পুস্তকখানি অত্যন্ত মূল্যবান। এই পুস্তকে অর্দ্ধ নাটকীয়ভাবে তিনি শতাব্দীর পূর্ব্বের বঙ্গদেশের সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই জাতীয় লেখক বাংলা ভাষায় প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'কথোপকথনের' কেরীকে ঠেকচাঁদঠাকুর এবং দীনবন্ধু মিত্রের Spiritual father বলা যায়, কারণ কেরীর মধ্যে সূক্ষ্ম নাটকের বীজ সুপ্ত ছিল।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের শুদ্ধ ও সহজ বাংলা রচনা কেরীর 'ইতিহাসমালা' বাহির হইল। ইহা তাঁহার কথোপকথন অপেক্ষা রচনা হিসাবে শ্রেষ্ঠ এবং রামবসু ও চণ্ডীচরণের রচনা অপেক্ষা অনেক নির্ভুল ও সুন্দর। মৃত্যুঞ্জয়ের "প্রবোধ চন্দ্রিকা" ও হরপ্রসাদ রায়ের "পুরুষ পরীক্ষা" ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত পুস্তক অপেক্ষা কেরীর "ইতিহাসমালা" শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাষা হইতে সংগৃহীত এই পুস্তকে একশত পঞ্চাশটি গল্প আছে। এই গল্পগুলি অতি মনোরম, রহস্যপূর্ণ ও নীতিশিক্ষাপ্রদ। কিন্তু পুস্তকখানার প্রায় অধিকাংশই অনুবাদ, ইহার বিশেষত্বই ইহার স্বচ্ছ ও সহজ গদ্যরচনা প্রণালী এবং ইহার রহস্যের ছাপ—যাহা তৎকালীন পুস্তকসমূহে বিরল। কেরীর ইহা অপেক্ষা শ্রমসাধ্য রচনা 'বাংলা অভিধান' ১৮১৫ সালে ছাপা হয়। ইহা লেখার সময় Forty Millerএর দুইখানা অভিধান হইতে তিনি হয়তো কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই পুস্তক দুইখানাই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ ছিল। তিনি ত্রিশ বৎসরের পরিশ্রম দ্বারা এই অভিধান প্রস্তুত করেন। যদিও তাঁহার রীতি ব্যাকরণের ন্যায়, এবং উহা সাহিত্য পর্য্যায়ে পড়ে না—একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতির পথে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

আধুনিক বাংলা ভাষার ইতিহাসে কেরীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে বলিতে হয় যে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার মৌলিকতা ও দৃষ্টিশক্তি ছিলনা, কিন্তু জ্ঞান বিস্তারে তাঁহার চেষ্টা অনন্যসাধারণ ছিল এবং তাঁহার প্রভাবও ছিল খুব বেশী। তাঁহার আত্মচেষ্টা ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের যত্ন দ্বারা বাংলা গদ্য সাহিত্যের যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তীকালে মঞ্জুরিত হইয়া বর্ত্তমানে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র ১৮০১ সালে বাহির হইল। প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থহিসাবে—ইহা অতি উচ্চস্থান পাইলেও পারসী ও উর্দ্দু ভাষার বাহুল্য থাকায় ইহাকে 'A kind of mosaic half-Persian, half-Bengali বলা হয়।

তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'লিপিমালা' বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখানা পত্রের সমষ্টি। ইহা ১৮০২ সনে বাহির হয়। পত্রগুলির বিষয়বস্তু ক তকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কতকগুলি ঐতিহাসিক এবং কতকগুলি কাল্পনিক উপাখ্যান-বস্তু লইয়া ('প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' যেমন পারস্য ভাষার-বাহুল্য দেখা যায়, লিপিমালায় তেমনি সংস্কৃত শব্দের আধিক্য বেশী)।

১৮০১ সালে লিপিমালার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গোলকনাথ শর্ম্মার "হিতোপদেশের" বাংলা অনুবাদ বাহির হয়। ইহার ভাষা এবং লিখিবার ভঙ্গী সহজ ও মনোজ্ঞ।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ মুন্সীর তোতা ইতিহাস এবং রাজীব লোচন

মুখোপাধ্যায়ের 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র" বাহির হয়। উভয় পুস্তক ভাষা ও লিখিবার পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত। 'তোতা ইতিহাস' যদিও পারসিক পুস্তক হইতে অনূদিত, তথাপি ইহার ভাষা এবং লিখিবার ভঙ্গী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র অপেক্ষা অনেক ভাল, তবে পারস্য ভাষার আধিক্য কিছু বেশী।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের স্থান সর্ব্বোচ্চ। ইনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন এবং কিছুকাল কেরীর মুন্সী ছিলেন। সংস্কৃত জ্ঞান তাঁহার অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহার বাংলা একদিকে যেমনই সহজ ও জোরাল, অন্যদিকে আবার সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ ও অলঙ্কার যুক্ত। তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে বাংলা রচনায় তিনি অনতিক্রমনীয় ছিলেন। তিনি চারিখানা পুস্তক লিখেন, তন্মধ্যে দুইখানা তাঁহার নিজস্ব রচনা ও দুইখানা অনুবাদ।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন' ও ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'হিতোপদেশ' প্রকাশিত হয়। এই দুইখানা পুস্তকই সংস্কৃতের অনুবাদ। বত্রিশ সিংহাসনের ভাষা বেশ সরল। মৃত্যুঞ্জয়ের এই পুস্তক যদিও তাঁহার পরবর্ত্তী রচনার ন্যায় আলঙ্কারিক বাংলায় পূর্ণ নহে, তথাপি ইহার সহিত সেই বৎসরে অথবা তৎপূর্ব্বের বৎসরে প্রকাশিত কেরীর 'কথোপকথন' বা রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালার' তুলনা হয় না। তাঁহার রচনায় বিদেশী শব্দের প্রাচুর্য্য আছে; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ভাষার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই, বা ভাষা অবোধ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই।

সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের রচিত পুস্তক দুইখানা 'রাজাবলী' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' অনূদিত পুস্তক হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে রাজাবলী তাঁহার লিখন পদ্ধতি ও বিষয় বস্তুর দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতর। রাজাদের কাহিনী লইয়াই এই পুস্তকখানা রচিত অর্থাৎ লেখকের ভাষায় "কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"। তবে ঐতিহাসিক সত্যতা অপেক্ষা প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারেই ইহা রচিত। যদিও ইহার মধ্যে ইতিহাসের বহির্ভূত অনেক উপাখ্যান আছে—তথাপি আখ্যায়িকার সম্বন্ধ বহির্ভূত পারম্পর্য্য ও সুবোধ্যতা লইয়া ইহা রচিত। ১৮০৮ সনে 'রাজাবলী' প্রকাশিত হয়। ইহার পরবর্ত্তী লেখা তাঁহার 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ১৮[illegible] খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। বিষয়বস্তুর দিক ছাড়িয়া দিলে এই পুস্তক ভাষা ও পদ্ধতির দিক দিয়া তৎকালীন পুস্তকাবলীর মধ্য দিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহা চারিশীটে বিভক্ত, একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ বিশেষ। এই অংশ চারিটিকে স্তবক বলা হইয়াছে এবং এই স্তবকগুলি পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া 'কুসুম' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কাব্য, অলঙ্কার, নীতি, দর্শন, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি একত্র হইয়া এই পুস্তকে স্থান লাভ করিয়াছে। বহু বিষয় ও বহুরীতির মধ্যদিয়া এই পুস্তকখানাকে একটি নাতিক্ষুদ্র জ্ঞানভাণ্ডার বলা চলে।

কিন্তু এই পুস্তকে কিছু দোষও আছে। লেখক বিভিন্ন বিষয়গুলি একে অন্যের সহিত মিশাইয়া অতি অশোভন ভাবে সাজাইয়াছেন। অতি গম্ভীর বিষয় কোন হাস্যকর বিষয়ের পাশে স্থান পাইয়াছে। কোথাও বা অতিরিক্ত অলঙ্কারযুক্ত কষ্টসাধ্য ভাষার পার্শ্বেই অতি-সাধারণ চলিত ভাষা স্থান লাভ করিয়াছে। 'প্রবোধচন্দ্রিকায়' তিনটি প্রধান বিভিন্ন রচনারীতি স্থান পাইয়াছে। প্রথম—মৌখিক রীতি, ২য়—সাধু বা সাহিত্যিক রীতি, ৩য়—সংস্কৃত রীতি। সাধুরীতির দ্বারাই পুস্তকখানির অধিকাংশ রচিত। সংস্কৃত হইতে অনূদিত অংশে এবং দার্শনিক বা আলঙ্কারিক তথ্যে বা বর্ণনায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় মৌখিক ভাষার রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কথ্যভাষামূলক রচনার অংশ মৃদু, সহজ ও অনাড়ম্বর। স্থানে স্থানে অবশ্য অশ্লীলতার গন্ধ আছে; কিন্তু তাহা রচনার সৌন্দর্য্যের হ্রাস না করিয়া বৃদ্ধি সাধন করিয়াছে।

তাঁহার সমসাময়িকদের সহিত তুলনা না করিলে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা পদ্ধতিতে একটি নিজস্ব বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার লেখার মধ্যে দেখিতে পাই, যেখানে লেখক কিছু গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছেন সেখানেই ভাষা কষ্টকল্পিত ও অলঙ্কারযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেরী, রামবসু ও চণ্ডীচরণের ভিতর যেমন আমরা কথ্যভাষার প্রতি একান্ত টান দেখিতে পাই, মৃত্যুঞ্জয়ের লেখায় সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃতরীতির প্রতি ইচ্ছাকৃত আকর্ষণ দেখা যায়। কেরী ইত্যাদি যেখানে ভাষাকে সরল লোকপ্রিয় ও ব্যবহারিক করিতে যত্ন করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় সেখানে তাঁহার রচনার মধ্যদিয়া বাংলাকে কথ্যভাষার ছেলেমি হইতে সাহিত্যের ভাষার গাম্ভীর্য্য ও সম্ভ্রম দান করিতে চাহিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে মৃত্যুঞ্জয়ের লেখার স্থানে স্থানে সংস্কৃতশব্দের বাহুল্য ও সংস্কৃত রীতির দ্বারা পদবিন্যাসের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে এবং রচনাপদ্ধতি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে, তবে আখ্যায়িকা অংশে এই রীতি অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে।

তৎকালীন বঙ্গসমাজে মৃত্যুঞ্জয়ের তুল্য লেখক একজনও ছিল না বলিলে বোধহয় মিথ্যা বলা হইবে না। তিনিই বাংলাভাষাকে রচনারীতির তুচ্ছতা হইতে উদ্ধার করিয়া উহাকে সাহিত্যের আসনে বসাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার দান বাংলা ভাষার অক্ষয় ভাণ্ডারে চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে এবং বাংলার ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসুদিগের নিকট তিনি চিরনমস্য হইয়া থাকিবেন। তাঁহাকেই প্রকৃতপক্ষে Father of Bengali prose বলা উচিত।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯২১ সালে প্রকাশিত The Analysis of Mind গ্রন্থে রাসেলের ইহা হইতে ভিন্ন আর একটি মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই গ্রন্থে রাসেল মনোবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ-ভঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞানের বিষয় 'মনঃ' এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় 'জড়'; উভয়ই যে অন্ত আর একটি বস্তুরই বিভিন্ন রূপ এবং সেই মূলবস্তু জড়ও নহে, চিৎও নহে. তাহা উদাসীন (Neutral), ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাসেল এই মূল বস্তুর নাম দিয়াছেন "উদাসীন বিশেষ।" ইহারা সংখ্যায় অগণ্য। তাহারা এক ভাবে বিন্যস্ত হইলে হয় মনোবিজ্ঞানের বিষয়, অন্যভাবে বিন্যস্ত হইয়া হয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়।

রাসেলের এই মত বিশেষ জটিল। ইহার ব্যাখ্যায় জন্য তিনি যে উদাহরণের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এই :

নির্মেঘ রজনীতে কোনও নক্ষত্রের দিকে যদি একখানা ফোটোগ্রাফের প্লেট উন্মুক্ত করিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সেই প্লেটের উপর নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। যে স্থানে প্লেট অবস্থিত, সেই স্থান ও নক্ষত্রের মধ্যস্থ সকল স্থানেই যে কোনও ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং সেই ব্যাপারের সহিত যে নক্ষত্রটির সম্বন্ধ আছে, প্রতিবিম্বটি দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। নক্ষত্রটি আরও বহুস্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল স্থানেই যে নক্ষত্রটির সহিত সম্বন্ধ কোনও ব্যাপার ঘটে তাহাতে সন্দেহ নাই, যদিও ফোটোগ্রাফের প্লেটের মতো কোনও বস্তু সে সকল স্থানে না থাকিলে, যে সকল ব্যাপার ঘটে, তাহারা ধরা পড়ে না। এই সকল ঘটনার ব্যবস্থা (System), অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে নক্ষত্রটির যে যে রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের বিন্যাসই নক্ষত্রটির সেই সময়ের রূপ।

যেখানে ফোটোগ্রাফের প্লেটটি আছে, সেখানে কেবল যে প্লেটটির উপর নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে, তাহা নহে। আরও বহু ঘটনা সেখানে ঘটিতেছে। অন্যান্য নক্ষত্রও সেখানে দৃষ্টিগোচর হইতেছে; আরও অসংখ্য বস্তুর আবির্ভাব হইতেছে, যদিও তাহাদের আবির্ভাব এত অস্পষ্ট, যে প্লেটে তাহাদের দ্বারা ধরা পড়িতেছে না। সুতরাং বিভিন্ন স্থানে নক্ষত্রটির বিভিন্ন রূপে আবির্ভাব ব্যতীত, সেই সময়ে যেখানে প্লেট অবস্থিত, সেখানে ঘটিতেছে এমন অনেক ঘটনা আছে। এই সকল ঘটনার মধ্যে নক্ষত্রটির আবির্ভাব একটি। নক্ষত্রটির আবির্ভাব যেমন এই দ্বিতীয় ঘটনাপুঞ্জের অন্তর্গত, তেমনি প্রথমোক্ত ঘটনাপুঞ্জেরও অন্তর্গত। ইহা হইতে প্রতীত হয়, যে প্রত্যেক বিশিষ্ট পদার্থ দুইটি বিভিন্ন শ্রেণী অথবা ব্যবস্থার অন্তর্গত। এক শ্রেণীদ্বারা একটি বিশেষ প্রাকৃতিক বস্তুর রূপ গঠিত হয়। অন্য শ্রেণীর মধ্যে থাকে কোনও বিশেষ স্থানে আবির্ভূত যাবতীয় বস্তুর রূপ।

এখন ফোটোগ্রাফের প্লেটের স্থলে একটি মনের অস্তিত্ব কল্পনা করিলে, সেই মনের নিকট নক্ষত্রটির আবির্ভাবকে সংবেদন বলে। সেই সময়ে মনে আরও অনেক সংবেদনের আবির্ভাব হয়। নক্ষত্রের সংবেদনসহ সেই সময়ে সঞ্জাত অন্যান্য সংবেদনের সমষ্টিই সেই সময়ের মন। নক্ষত্রের আবির্ভাব-জনিত সংবেদন আবার সেই সময়ে অন্য আর এক শ্রেণীরও অন্তর্গত, অর্থাৎ যে শ্রেণী-দ্বারা নক্ষত্রের রূপ গঠিত, তাহারও অন্তর্গত। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহা মনের সম্মুখে উপস্থাপিত "ইন্দ্রিয় বিষয়"-দিগেরও (Sense data—ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) অন্তর্গত। Our knowledge of the External world গ্রন্থে রাসেল ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও সংবেদনকে বিভিন্ন বলিয়াছিলেন। কিন্তু উপরে যে মত ব্যাখ্যাত হইল, তদনুসারে তাহারা অভিন্ন। যাহা সংবেদন, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। তাহারা প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু, বিভিন্ন সংস্থানের মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। মন ও তাহার বিষয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা বস্তুগত পার্থক্য নহে, বিন্যাসগত পার্থক্য। রাসেল সংবেদন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়দিগকে neutral particulars বা "অবিশেষিত বিশেষ" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই মতানুসারে প্রথমতঃ কোনও স্থানে যদি একটি মস্তিষ্ক ও তাহার সহিত স্নায়ুদ্বারা সংযুক্ত ইন্দ্রিয় থাকে, তাহা হইলে সেখানে কোনও বস্তুর আবির্ভাবই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ কোনও এক বিশেষ ক্ষণে কোনও বস্তুর যে সকল বিভিন্ন রূপ সকল স্থানে আবির্ভূত হয়—(যে রূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান তাহা এই সকলের অন্তর্ভুক্ত), তাহাদের সমষ্টিই সেই বস্তু। তৃতীয়তঃ—যে স্থানে স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত মস্তিষ্ক আছে, সেই স্থানে কোনও ক্ষণে যে সকল রূপ আবির্ভূত হয়, তাহাদের সমষ্টিই মন। Our knowledge of the External worldএর ভাষায় কোনও এক বিশেষ প্রকারের স্থান হইতে দৃষ্ট জগতের রূপই মন।

রাসেলের এই মতে মানসিক পদার্থ ও জড়ীয় পদার্থ দুইটি ভিন্ন জাতীয় পদার্থ নহে। সুতরাং মন হইতে স্বতন্ত্র জড়ের অস্তিত্ব আছে কিনা, এই প্রশ্ন এই মতে অবান্তর। সুতরাং ইহাকে বস্তুবাদ বলিবার কোনও সার্থকতা নাই। রাসেলের মতে যাহাকে আমরা জড় বলি ও যাহাকে মন বলি উভয়ের মূলে একই বস্তু—না জড়, না মন। তাহাদের সংখ্যা অনন্ত। তাহাদের কতকগুলি একভাবে বিন্যস্ত হইলে হয় মন। এই শ্রেণীর প্রত্যেকেই অন্য এক শ্রেণীরও অন্তর্গত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত অবস্থায় যখন তাহা মনের জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন তাহা হয় মনের পরিজ্ঞাত বস্তুর একটা রূপ। এই মতে মনের বিশেষ কোনও

গুরুত্ব নাই। ইহা দ্বারা ভ্রান্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হওয়া অসম্ভব। মনের যদি কোনও গঠনশক্তি না থাকে, কেবল কোনও অচিন্ত্য উপায়ে "অবগত হওয়াই" যদি ইহার একমাত্র কার্য্য হয়, তাহা হইলে বর্ণ-জ্ঞানহীন লোকে যখন সবুজ বস্তুকে নীলরূপে দেখে, তখন সেই নীলরূপকে ভ্রান্ত বলিবার কোনও কারণ থাকে না। যে সেই বস্তুকে সবুজ দেখে তাহার জ্ঞান, ও যে নীল দেখে তাহার জ্ঞান উভয় জ্ঞানকেই তুল্যরূপে সত্য বলিতে হয়। রাসেল ইহার উত্তরে বলেন যে ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই। ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্বপ্নে সংঘটিত হইলেও, তাহারা সত্য। তাহা যদি হয়, তবে স্বপ্নকে আমরা অলীক বলি কেন, এবং দৃষ্টিবিভ্রমের (hallucination) অস্তিত্বই বা স্বীকার করি কেন? ইন্দ্রিয়ের পরিজ্ঞাত সকল বস্তুই যদি তুল্য রূপে সত্য হয়, তাহা হইলে অলীক বস্তু এবং মনের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার কোনও বিশেষ ধর্ম্মের মধ্যে অলীকত্বের "নিদর্শন" পাওয়া যাইবে না; এই সম্বন্ধ সমস্ত অলীক বিষয় ও মনের মধ্যে বর্ত্তমান এবং সত্য বিষয় ও মনের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা যে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির, ইহা বলা চলিবে না। সুতরাং যে সকল বিষয়কে অলীক বলা হয়, তাহাদিগের এবং যাহাদিগকে সাধারণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, তাহাদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার মধ্যেই এই নিদর্শনের অনুসন্ধান করিতে হইবে। রাসেল বলেন, যে ইন্দ্রিয়ের বিষয়দিগকে তখনই সত্য বলা হয়, যখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত তাহাদিগের যে সম্বন্ধ, তাহা উভয়ের মধ্যে আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সম্বন্ধের সহিত—(যে সম্বন্ধকে আমরা স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সহিত) অভিন্ন। যখন অভিজ্ঞতা-লব্ধ সম্বন্ধের সহিত মিল হয় না, তখন তাহাদিগকে "মায়া" (illusion) বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয় বস্তুত মায়া নহে, কিন্তু তাহা হইতে যে অনুমান করা হয়, তাহাই মায়া। যখন স্বপ্ন দেখি আমি আমেরিকায় আছি, এবং জাগিয়া দেখি আমি ইংলণ্ডেই আছি, তখন সেই স্বপ্নকে মিথ্যা বলি, কেননা আমেরিকায় যাইতে হইলে সমুদ্রবক্ষে যে কয়দিন থাকিতে হয়, সে কয়দিন যে আমি সমুদ্রবক্ষে ছিলাম না, তাহা আমি জানি।

Problems of Philosophy গ্রন্থে রাসেল বহুসংখ্যক সার্ব্বিকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থসকলে এই মত বর্জ্জন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রাসেল যে যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বোঝা কঠিন। সার্ব্বিকদিগের অস্তিত্ব যে নাই, তাহা স্পষ্ট না বলিলেও তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন রাসেল অস্বীকার করিয়াছেন। এক শ্রেণীর যাবতীয় পদার্থের মধ্যে পরিদৃষ্ট সাধারণ গুণের ব্যাখ্যার জন্যই সার্ব্বিকের প্রয়োজন উপলব্ধ হয়। কিন্তু রাসেল বলেন, সাধারণ গুণের ব্যাখ্যার জন্য শ্রেণীর অস্তিত্বই যথেষ্ট; শ্রেণীর অতিরিক্ত কোনও কিছুর অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। রাসেল নিম্নলিখিতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যখন দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ, যে প্রথম বস্তুর সহিত দ্বিতীয়ের যে সম্বন্ধ, দ্বিতীয়ের সহিত প্রথমেরও সেই সম্বন্ধ, তখন সেই সম্বন্ধকে সুষম সম্বন্ধ বলে (symmetical)। ভ্রাতাদিগের মধ্যে এবং ভগিনীদিগের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ। 'ক' যদি 'খ'র ভাই হয়, তাহা হইলে 'খ' 'ক'র ভাই। পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অন্যপ্রকারের। যখন প্রথম বস্তুর সহিত দ্বিতীয়ের যে সুষম সম্বন্ধ, দ্বিতীয়ের সহিত তৃতীয়েরও সেই সম্বন্ধ, তখন সেই সুষম সম্বন্ধকে গতিমান (transitive) সুষম সম্বন্ধ বলে। 'ক'র যে নাম, 'খ'র যদি সেই নাম হয়, এবং 'গ'র যে নাম, 'খ'র যদি সেই নাম হয়, তাহা হইলে 'গ'র যে নাম, 'ক'রও সেই নাম। যখন বহু বস্তুর মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম্ম বা গুণ থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে গতিমান সুষম সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এই সম্বন্ধযুক্ত বস্তুসকল যে শ্রেণীর অন্তর্গত, সেই শ্রেণীর অস্তিত্বদ্বারাই তাহাদের সাধারণ ধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রয়োজন সাধিত হয়। শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন কোনও সন্দেহ নাই, এবং শ্রেণীর অতিরিক্ত সাধারণ ধর্ম্ম কিছু আছে কি না, সে সম্বন্ধে যখন সন্দেহ আছে, তখন শ্রেণীর অস্তিত্বস্বীকারই যথেষ্ট, সাধারণ ধর্ম্মের অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ইহাই সংক্ষেপে রাসেলের যুক্তি। রাসেল কেবল সংবেদন এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং সংবেদনও তাহার মতে মৌলিক "অবিশেষিত বিশেষ"দিগের বিশিষ্ট বিন্যাস মাত্র।

কিন্তু সার্ব্বিক সম্বন্ধে রাসেলের এই মত গ্রহণ করা কঠিন। তিনি সার্ব্বিক অথবা বস্তুর মধ্যে সাধারণ গুণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তাহার স্থানে যে "শ্রেণীকে" বসাইতে চাহেন সে 'শ্রেণী' কি? বহুসংখ্যক বস্তুর মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই তো তাহারা এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সাদৃশ্য সেই শ্রেণীর বহিস্থ বস্তুর সহিত নাই। এই সাদৃশ্যই তো একটা ধর্ম্ম অথবা গুণ। এই সাদৃশ্য না থাকিলে শ্রেণীই হয় না। শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যখন এই সাধারণ গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন, তখন এই গুণকে বর্জ্জন করিয়া "শ্রেণী"দ্বারা তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। এই গুণ না থাকিলে যখন শ্রেণীই হয় না, তখন 'গুণে'র কার্য্য শ্রেণীদ্বারা হয় না বলিতে হইবে এবং শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র ভাবে গুণের অস্তিত্ব আছে, এবং সার্ব্বিকদিগের বিশ্ব হইতে নির্ব্বাসন সম্ভবপর নহে ইহাও বলিতে হইবে। আবার সার্ব্বিকদিগকে যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিশ্ব যে কেবল ইন্দ্রিয়-বিষয় ও সংবেদন দ্বারা গঠিত তাহা বলা যায় না।

রাসেল 'ভ্রান্তি'-সমস্যারও সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়ের প্রকাশিত সমস্ত বস্তুই সত্য, রাসেলের এই উক্তি এক অর্থে সত্য। কিন্তু সেই অর্থে আমাদের স্বপ্ন ও কল্পিত বস্তুও সত্য। আবার ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং সংবেদন যদি একই পদার্থ (ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ) হয়, তাহা হইলে ভ্রান্তি অথবা মায়া বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না।

দুঃস্বপ্ন

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(৩)

আমার একটি ভোট ছিল কিন্তু সেটা যে এতবড় দুঃখ ও মনস্তাপের কারণ হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল—

ভারত স্বাধীন হইয়াছে, আমরা ভোটাধিকার বলে আমাদের প্রতিনিধিদ্বারা দেশশাসন করিব ইত্যাদি মুখরোচক কথা শুনিয়া প্রথমে খুবই উৎসাহিত হইয়াছিলাম; কিন্তু ফলং মড়কং—স্বাধীনতা আমার জীবনটাকে টানাহেঁচড়া করিয়া যে এমন দুর্বিসহ করিয়া তুলিবে তাহাত ভাবি নাই।

যে নির্ব্বাচন গণ্ডীতে আমার শারীরিক অবস্থান সেই স্থানে এমন রাজনৈতিক দল নাই যাঁহারা প্রার্থী খাড়া করেন নাই, তাহা ছাড়া স্বাধীনচেতা স্বতন্ত্র সমাজ-সেবকেরও অভাব নাই। এক সঙ্গে ডজন খানেক লোক মদীয় ক্ষুদ্র ভূখণ্ডকে সেবা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া পড়িয়াছেন।

সামান্য চাকুরী করি—ডেলি প্যাসেঞ্জার; ট্রেণ ধরিতে না পারিলে আফিসে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, ফিরিতে দেরী হইলে কয়লা ও কেরোসিনের খরচা বাড়ে কারণ সওদা লইয়া ফিরিতে হয়।

সেদিন যাইতেছি, পাড়ার থিয়েটার ও ফুটবলের পাণ্ডা গাবুল সদলে আমাকে গ্রেপ্তার করিল—শুনুন অনাদিবাবু, আপনার ভোটটা আমাদেরই দিতে হবে, কংগ্রেস এত লাঞ্ছনা সহ্য করে স্বাধীনতা এনেছে···

—ভাই, ট্রেণ ফেল ক'রবো—

—শুনুন এক মিনিট, যুক্তি ত মান্‌বেন···

ট্রেণ ফেল করিলাম—ফল যাহা হইল তাহা আপনারা বুঝিতেছেন।

পরদিন হাবুল ধরিল—কংগ্রেস কালোবাজারের মালিক, চোর, অন্নবস্ত্র চিনি লইয়া কিনা করিতেছে—হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ করিয়া সেই মুসলমানের সহিত মিতালি করিয়াছে।

ফলং ট্রেণ ফেল—

তাহা ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী অধর বাবু আমার দূর সম্পর্কের মেশোমশায়ের শালার ভায়রা ভাইএর বন্ধুর খুড়তুতো পিসেমশায়—আত্মীয়তাসূত্রে ভোটটা তাহার প্রাপ্য···ইত্যাদি।

ইহাই প্রাথমিক প্রচার—

তাহার পর নির্ব্বাচনী টেম্পো বাড়িতে লাগিল—গাবুল হাবুল বাবুল সকলেই পিছন হইতে যাহা বলিল তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে ভোট তাহাদিগকে না দিলে আঁধার রাত্রে তাহারা পিছন হইতে ডাণ্ডা মারিয়া মাথাটা ফাঁক করিয়া দিবে।

নির্ব্বাচনের দিন ঘনীভূত হইয়া আসিল—

ভয়ও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে রাখি? রাজনৈতিক একটা মতবাদ না ছিল এমন নয়, কিন্তু সেকথা এখন থাক। যদি এই চেলাচামুণ্ডার দল ক্ষেপিয়া যায় তবে ত গিয়াছি, ঘরে বয়স্থা মেয়ে, ছেলেগুলো স্কুলে পড়ে—

সেদিন বাসায় আসিয়া শুনিলাম, স্ত্রী বলিলেন—যতই বল কংগ্রেসকে ভোট দিতে পাবে না, যারা আমাকে হাফ্ প্যাণ্ট পরিয়েছে, বিবস্ত্র করেছে তাদের—

—কিন্তু গাবুল—

—পুরুষ মানুষ ভয় কি? কে দেখ্‌ছে···

পরিহাস করিলাম, কিন্তু হাফ্‌প্যাণ্ট না পরলে তুমি যে এত সুন্দর তা বুঝতেই পারতুম না।

—পোড়া কপাল তোমার—হিন্দুর ছেলে হিন্দুকে ভোট দিতে হবে—

চারিপাশের অন্যায় অবরোধে প্রাণে একসঙ্গে ভয়, ভাবনা, দ্বন্দ্ব দেখাদিল এবং অভ্যাস মত দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ফেলিলাম—

গাবুলের দল আমার ঘাড় ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া, দ্রুত অতি দ্রুত—শেষে হাওয়াই জাহাজের মত উপরে উঠিয়া। নিম্নে ভাগীরথী ও নারিকেল গাছগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল—অনন্ত নীলাম্বরে চলিয়াছি,

নীচে নীলাম্বুরাশি সফেন তরঙ্গে নাচিতেছে, কিন্তু গাবুল ঘাড় ছাড়ে নাই বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়াই আছে। গাবুল বজ্র-কণ্ঠে কহিল—দেখুন, এই আমেরিকা, দেখুন ডিমোক্রেসির দেশ—দেখুন স্কাইস্ক্রেপার—দেখুন চাষীরও মোটরগাড়ী, শ্রমিকের রেডিও, দেখুন বাড়ীঘর, রাস্তা পুল—কি মনে হয়?

আমি কহিলাম—ঘাড়টা একটু ছাড়ো, ঘুরে ফিরে দেখি, চোখে ত অন্ধকার দেখছি—

গাবুল কহিল—আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছি,—ঐ দেখুন কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক এটম বোমা, আর ঐ দেখুন হাইড্রোজেন বোমা সেলে এখনও ভরা হয়নি।

—বাবা গাবুল ওটা কবে ভ'রবে?

—যেই যুদ্ধ লাগবে অমনি ভরবে—দেখেছেন ডিমোক্রেসি হ'লেই এমনি সুখে থাকবেন।

—বাবাজীবন, একটু নীচে নামিয়ে দাও ভাল করে দেখে আসি—

নীচে নামিলাম, গাবুল দেখাইল—এই দেখুন খুড়ো, আপনার মত একজন কেরাণী তার গাড়ী, বাড়ী, রেডিও সব রয়েছে, তার স্ত্রী তার চেয়েও বেশী মাইনে পান, দেখুন তারা কত আনন্দে রয়েছে—

—বাবাজী, এখানেই ফেলে দাও ভাই, ঐ রকম একটির পায়ে ধরে পড়বো একটা হিল্লে হবেই, আর ফিরবো না—

—ঐ দেখুন কুমারী চাকুরিয়া, কি তার পোষাক, কি লিক্‌লিকে চেহারা—দেখুন হোটেলে কি খাচ্ছে?

—বাবা, ঐটির পদপ্রান্তে ফেলে দাও, ক্রীতদাস হ'য়ে থেকে যাই—তোমার খুড়ীর কাছে, ট্যাঁ ভ্যাঁর দেশে আর যাবো না—

—তবে যান্—গাবুল ঘাড় ছাড়িয়া দিল আমি বেগে নামিতে লাগিলাম অতি দ্রুত, এত বেগে নামিলে ভূপৃষ্ঠে প্রহৃত হইয়া ছাতু হইয়া যাইতে হইবে—তাই ইষ্টনাম জপ করিতেছিলাম। অকস্মাৎ নাম জপে বেগ প্রশমিত হইল, দেখি বাবুল চুলের মুঠী ধরিয়াছে—কোথায় যান্ খুড়ো, চলুন ঐ দিকটা দেখ্‌তেও ত হয়—

—কোন দিকটা—

—আমাদের দেশটা—মস্কো, ষ্ট্যালিনগ্রাড, ব্রাডি-ভোষ্টক—

—বুড়ো কালে এত দেখবার দরকার কি? যাই ঐখানেই, মেয়েটা কিন্তু বেশ না বাবাজীবন, রোজগারও করে যথেষ্ট—যদি কোনমতে ধর সাতপাকটা হ'য়ে যায়—.

বাবুল শূন্যে খানিক হাসিয়া কহিল—এটা সাতপাকের দেশ নয় খুড়ো, এদিক ওদিক করলেই তালাক, আর তা ছাড়া আপনার রং কালো। ঐ দেখুন কালোর জন্যে এদেশের ব্যবস্থা। কালো হ'য়ে শাদা মেয়ের গায়ে হাত দিলে লিনচিং হবে জানেন?

—সে কি বাবা বাবুল,—বি, আর, সেন ত আছে, দেশের ছেলে—

—জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে নেবে, ডাণ্ডা দিয়ে পিটে কিমা করে ফেল্‌বে—

—গাবুল বেটা এখানে ফেলে দিয়ে গেছে হায় হায়!

বাবুল কেশাকর্ষণ করিল—চলুন,—আমার সঙ্গে—

নিরুপায় হইয়া চলিলাম,—অনন্ত ব্যোম, অপার বারিধি, উষা দিশাহারা নিবিড় কুয়াশা-ভরা অনন্ত শূন্যে চলিয়াছে। বাবুল হঠাৎ থামিয়া কহিল—যান চলে, দেখে আসুন ব্যাপার কি!

নীচে গভীর কুয়াশা, কিছুই দেখা যায় না, তাহার ভিতর দিয়া ভয়াবহ বেগে নামিতেছি, মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়া ভাবিলাম আর ইষ্টনাম জপ করিয়া কি হইবে, মরিয়াত গিয়াছিই।

নামিয়া আসিলাম—

কয়েকজন সুবেশ পুলিশের হাতের মধ্যে আসিলাম,—তাহারা আমাকে পাকড়াইয়াছে—তাহারা প্রশ্ন করিল—পাস্‌পোর্ট—

—বাবারা সব, আমি পোর্ট পাস্ করি নাই, পাড়ার বাবুল ছেলেটা আমাকে চুলের ঝুটি ধরে এনে ফেলে গেছে—কুয়াশায় কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে—

—মাজী বল—আমরা মেয়ে পুলিশ—

—মা লক্ষ্মীরা, আমায় ছেড়ে দাও, ড্যাবলার মা কেঁদে খুন হবে, হাফ্‌প্যান্ট পরে হয়ত তুলসী তলায় মাথা কুটছে—

—তুলসীতলা, লক্ষ্মী, এসব দেবতাদের নাম উচ্চারণ করলে জেল হবে—চলো—

—কোথায়?

—চলো—বলিয়া হেঁচকা টানে আমাকে লইয়া চলিল। বুঝিলাম—ইহারা মহিষমর্দ্দিনীর কলি-সংস্করণ। আমাকে একহাতে তুলিয়া আছাড় দিতে পারে।···

অন্ধকার ঘরে বাতি জ্বলিতেছে—ঘন কুয়াসায় কিছু দেখা যায় না। একটা বড় টেবিলের সম্মুখে উপস্থিত করিল—প্রথমে দেখিলাম একজোড়া বৃহৎ বুট টেবিলে আসীন, একটু ভাল করিয়া দেখি স্বয়ং ষ্টেলিন পাইপ খাইতেছেন এবং গোঁফে তা দিতেছেন।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলাম—হুজুর—

একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি কহিলেন—বাড়ী কোথা?

—তারকেশ্বর লাইনে, হরিপালের থেকে দু'মাইল পদব্রজে—

—এখানে কেন? কার হুকুমে?

—বাবুল এনে ফেলে গেছে—আমি হুজুর নির্দ্দোষ—

—বোসো,—তোমাদের দেশে ত ভোটযুদ্ধ হচ্ছে—না?

—আজ্ঞে হাঁ—ডিমোক্রেসির দেশ।

তিনি সশব্দে হো হো করিয়া হাসিয়া টেবিল হইতে বুট নামাইয়া কহিলেন—ডিমোক্রেসি মানে কি? কিছু জানো, বোঝো কি?

—বুঝি বৈ কি? তৃতীয় শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলকাতায় চাকুরী করি, ডেলি প্যাসেঞ্জারী করি,—আমাদের চেয়ে বেশী বোঝে কে?

—মানেটা বল ত?

—জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা দেশ শাসিত হবে? A Government for the people, of the people, by the people.

—হেঁ হেঁ,Govt. by the people is as impossible as an army of fieldmarshals···ছোকরা লিখেছে বেশ—

—মানে প্রতিনিধি দ্বারা—

তিনি সহাস্যে উঠিয়া কহিলেন—এসো দ্যাখো, নির্ব্বাচন।

ছোটকালে এক পয়সা দিয়া "লাটসাহেবের বাড়ী দ্যাখো" দেখিতাম, তেমনি একটা বাক্সের সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া দিয়া কহিলেন—দ্যাখো দ্যাখো ভোটরঙ্গ—

একটি বাগ্‌দী মেয়ে যাইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মা কোন বাক্সে ভোট দিলে মা? মেয়েটি জবাব দিল—বাবু ত বলেছিল, কুঁড়ে ঘরে ভোট দেওয়া করবেক,কিন্তু ভোটের ঘরে যেয়ে ত গা ছম্ ছম্ করা করতে লাগল। দেখলুম জোড়া বলদ দু'টি বাবা বড় ভালো—আহা আমার বুধি আর চক্‌রার মত চেহারা, তাই সেই বাক্সেই ফেলে দিলাম—যা সগ্‌গে যা—বুধি আমার ধেড়িয়ে মরেলো গো—

বাগ্দী মেয়েটি তাহার চোখে আঁচল দিয়া স্বর্গত বুধি বলদের স্বর্গ কামনা করিয়া ভোট সেই বাক্সেই দিয়াছে—

ষ্ট্যালিন প্রশ্ন করিলেন—দেখ্‌ছো—

—আজ্ঞে হ্যা—

—আরও দ্যাখো—

একটি ডোম বৃদ্ধ লোক যাইতেছে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—কাকে ভোট দিলে বাবা?

বুড়োটি একগাল হাসিয়া কহিল—ঠিক বাক্সে দিয়েছি গো। আমি গ্রামের মোড়ল বটেক—আমি সামলাবেক বটে।

—কোন বাক্সে দিলে?

—মাষ্টারবাবু ব'ললেক, জোড়া বলদে দেওয়া করাবি। আমি আগে গেনু—জলে খুঁজি, জঙ্গলে খুঁজি, জোড়া বলদ আর মিল্‌লেক না—একটা বলদ দেখি দুই পা তুলে সোয়ার নিয়ে চলেছে,—হ্যাঁ বটে, জোড়া বলদের ঝাঁক মারলে বটে —দিলুম সেই বাক্সে ফেলে। পাড়ার তিনকুড়ি ভোটারকে বললু, ডান বগলের বাক্সে ঠ্যাং তোলা বলদে দেওয়া করবি —সব হিল্ হিল্ করে দিয়ে দিলে—ব্যস্।

মাষ্টারবাবুর কথামত সে ঠিক ঠিক ভোট দিয়া আসিয়াছে এই গর্ব্বে সে আত্মহারা হইয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিয়া গেল।

আবার দেখি—

বুড়ী একটি যাইতেছে—তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—সে কহিল—মণিবাবু ত বলেছিল হিঁদু.আমরা, ঘোড় সোয়ারে দিতে হবে, কিন্তু আমাদের চণ্ডীতলার গাছের চেয়ে জাগ্রত কে আছে? তাকেই ভোট দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলাম—আহা মা চণ্ডী—বাছার মঙ্গল হোক—

হোঃ হোঃ হোঃ—মঃ ষ্ট্যালিন কহিলেন—দেখলে ডিমোক্রেসি—সব বাবু মনিব যা বলেছেন তাই, তার পরেও বাক্স খুঁজে পাওনি—আর তুমি—

—আজ্ঞে আমি পালিয়ে এসেছি—গাবুল, হাবুল, বাবুল সব ভয় দেখাচ্ছে—

—আসবেই ত, আপেলের গাড়ী, একটা টান দিলে হুড় হুড় করে সব পড়বে। একজন বুদ্ধিমান লোক সব পারে, hundred fools cannot make a wise decision.

—আজ্ঞে, এ যে হিটলারী কথা বলছেন বাবা? ডিক্টেটরসিপ—

—শ্রীরামের মত যদি ডিক্টেটর হয়, সেই ত আহাম্মকের দলের চেয়ে ভাল—বুঝলে—বুঝলে—আমি যেমন—বুঝলে—

বীরদর্পে তিনি চুলের মুষ্টি চাপিয়া ধরিলেন—

—রক্ষে কর বাবা—

বেলা হইয়াছে—

এক বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্র ঘাড়ের উপর বসিয়া চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে।

—তবে আর ভোট দিয়া কি হইবে? ভাগ্যেরই জয় হোক্—

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে

শ্রীসুষমা মিত্র

সবে মাত্র দু'বছর অতীত হয়েছে আমরা 'সাত সমুদ্র তের নদী' পাড়ি দিয়ে ইউরোপের ও আমেরিকার দেশগুলি পরিক্রমা করে এসেছি। এরই মধ্যে আবার স্বামীর ডাক এল নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক ধাত্রীবিদ্যা সম্মেলনের কোন এক শাখায় সভাপতির আসন গ্রহণ করতে। এবার আমার ইউরোপ প্রবাসের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শেষে যখন স্থির হল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় যাওয়া হবে নিশীথরাতের সূর্যদর্শন করতে, তখন বিদেশযাত্রাটা বেশ একটু লোভনীয় হয়ে উঠল।

আকাশবিহার বৈজ্ঞানিক যুগের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলবার পথে মানুষ যাতায়াতের গতিবেগটাকেও ছুটিয়েছে দ্রুত হতে দ্রুততররূপে। আকাশপথচারীর কাছে তাই আজ এই সুবিশাল পৃথিবী সত্যই যেন ছোট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সময় সংক্ষেপ করতে আমরা এবারেও আকাশপথে পাড়ি দিলাম—সাতসাগরপারে পশ্চিমের দেশগুলি দেখতে।

১০ই মে, ১৯৫০ সাল। রাত ১২টায় দমদম বিমানঘাঁটী থেকে আমাদের যাত্রা সুরু হল। প্রায় ছাব্বিশঘণ্টা বিমানে কাটিয়ে বৃহস্পতিবার শেষরাত্রে লণ্ডনে পৌছলাম। দু'বছর আগে এই একই সময়ে যখন লণ্ডনে পৌছাই, তখন যেমন একটা অনিশ্চিত নতুনত্বের আবেগমাখা উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম, এবার সে অনুভূতি ছিল না। ১৯৪৭ সালে এপ্রিলের শেষে রাত তিনটায় সময় যখন লণ্ডনের হিট্রো বিমান-ঘাঁটিতে পৌছাই, তখন বাইরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় শরীরের হাড়গুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। এবারে মে মাসের মাঝে এসে ভোর রাত্রে নেমেও হাড়কাঁপুনি শীত না পেয়ে প্রথমেই একটা স্বোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লাম।

লণ্ডনের 'গ্রীণ পার্কে'র সামনে এথেনিয়ম কোর্ট (Athenium Court) হোটেলে এবার আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ বিকেলেই আমার স্বামী নিউইয়র্ক যাত্রা করবেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট আমাদের জন্য ডলার মঞ্জুর করেন নাই, তাই আমি ও কন্যা জয়শ্রী এই দশটা দিন লণ্ডনেই কাটাব।

আমাদের হোটেলের সামনেই 'গ্রীণ পার্ক'—সত্যিই শ্যামল শোভায় ঘেরা। সবুজ মাঠের মাঝে মাঝে নানা রংএর টিউলিপগুলি আরোও শোভা বর্দ্ধন করেছে। সারা শহর ঘুরে এসে এই পার্কে বসে বেশ আরাম হত।

লণ্ডনের অনেক ডাক্তার-পরিবারের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় ছিল। উনি আমাদের ফেলে নিউইয়র্ক গেছেন জেনে তাঁরা সব স্বামীস্ত্রীতে এসে আমাদের নিঃসঙ্গ লণ্ডনবাস কর্মমুখর করে তুললেন। ডাক্তার রিগ্‌লির (Dr Wrigly) বাড়ীতে চায়ের পার্টি, মিসেস রিগ্‌লির সঙ্গে সিনেমা যাওয়া এবং রিজেন্ট পার্কের উন্মুক্ত আকাশের নীচে সেক্সপীয়রের নাট্যাভিনয় দেখা—এ সবের ভিতর খুবই আনন্দ ও উত্তেজনা ছিল সত্য, কিন্তু আমাকে বড় শ্রান্ত করে ফেলতো। ডাক্তার-কন্যা জোয়ানা (Joana) জয়শ্রীর সমবয়সী; সে প্রায়ই জয়শ্রীকে ধরে নিয়ে যেত তার স্কুলে। স্বামীর ফিরবার আগের দিন এখানকার গাইস্ হাসপাতালের (Guy's Hospital) স্ত্রী-চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার ফ্র্যাঙ্ক কুক্ (Dr Frank Cook) সস্ত্রীক একরাশ সুন্দর গোলাপ নিয়ে এসে আমায় বল্লেন—"কাল ডাক্তার মিত্রকে একটি সারপ্রাইজ (surprise) দেব। আমি তার জন্য সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি। তাঁকে আমার হাসপাতালে একটি ক্যান্‌সার রোগী অপারেশন করতে হবে।"

এই সব পরিবেশের মধ্যে যখন সত্যিই হাঁপিয়ে উঠতাম, তখন সত্যিকার বিশ্রাম পেতাম অধুনা লণ্ডনবাসী ডাক্তার, আমার স্বামীর প্রাক্তন ছাত্র, শ্রীমান্ অমিয় বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রীর লৌকিকতাবর্জিত খাঁটি বাঙ্গালী ব্যবহারে। তাঁদের গাড়ীতে সবাই মিলে শহরের বাইরে গিয়ে উপভোগ করতাম গ্রামাঞ্চলের স্নিগ্ধ শোভা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম কেন্টের (Kent) মাঠেঘাটে শুনেছি বিহগকাকলী। সাউথ এণ্ডের

স্টকহল্‌মে হ্রদের ধারে ভারতীয় জাতীয় পতাকা

(South End) সাগরবেলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি সাগরবক্ষে সূর্যাস্তের আরক্তিম শেষ রশ্মিরেখা। প্রায় রোজই আমাদের রাত্রের আহারের ব্যবস্থা ছিল ডাক্তার-গৃহে। এঁদের আদর-যত্নে ভুলে গিয়েছিলাম যে, প্রবাসে একা আছি।

লণ্ডন ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে ওখানকার বেতারবার্তার ভারতীয় বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীমান্ কমল বোস এসে বল্লেন—B. B. C. থেকে কিছু বলতে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নিশীথ-সূর্য দেখে এসে বলবো বলে এবারের মত বিদায় নিলাম।

এই দু'বছরে লণ্ডনের কি অভিনব পরিবর্তনই না দেখছি! যুদ্ধোত্তর লণ্ডন যে এত শীঘ্র এমন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হত না। ইংরেজ জাত-ব্যবসায়ী বটে! এই ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতর দিয়েই আজ আবার এত শীঘ্র তারা ভাঙনের পথ থেকে ফিরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লণ্ডনের দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার, পথে-ঘাটে আলোর মেলা; শহর আমোদে সরগরম। খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট উন্নতি এখনও না হলেও পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে পুষ্টিকর খাদ্য সকলেই পাচ্ছে। শহরবাসীদের মুখ হাসিভরা। সারা দেশময় যেন আবার নতুন করে বাঁচবার সাড়া পড়ে গেছে। বিশ্বের মাঝে মানুষের মত বাঁচতে এরা বদ্ধপরিকর।

২৭শে মে, বেলা তিনটের সময় আমরা S. A. S. এর বিমানে ষ্টকহলম রওনা হলাম। আকাশ মেঘলা, বায়ু প্রতিকূলগামী। বিমান স্তরে স্তরে মেঘের স্তবকপুঞ্জ ভেদ করে 'নর্থ সী' পার হয়ে এল। দ্বীপবহুল ডেনমার্কের উপর দিয়ে উড়ে এসে সুইডেনের পশ্চিম তীরে 'গোটেবুর্ক' বন্দরে ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়াল। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর আবার উড়ে চলল আকাশ পথে সুদূর মেঘরাজ্যের মধ্য দিয়ে।

সুইডেন পার্বত্য প্রদেশ; অরণ্য, হ্রদ ও নদীতে ভরা। সারা দেশে চাষের সমতল জমি খুব কমই চোখে পড়ে। দক্ষিণ ভূভাগ উর্বর ও সমতল। স্কেন (Skane) প্রভিন্সের মাটী সবুজ আস্তরণে ঢাকা, ছোট ছোট ক্ষেতগুলি শস্যে পরিপূর্ণ। দেশের মধ্যভাগ অবধি হ্রদের ধার বরাবর শ্যামল ক্ষেতের সারি।

ঘণ্টা দু'এর মধ্যে আমরা ষ্টকহলমের মাটিতে নেমে দাঁড়ালাম। হোটেল প্লাজায় উঠেছি। দু'বছর আগে যে ঘরখানিতে ছিলাম, এবারেও সেই ঘরখানি পেয়েছি। পরিচিত ঘর পেয়ে জয়শ্রীর আর আনন্দ ধরে না।

২৮শে মে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙেছে। ঘড়িতে দেখি সবেমাত্র তিনটে বাজে। সুতরাং জানলায় পরদা টেনে সূর্যদেবকে ঢেকে দিয়ে আবার ঘুমবার চেষ্টা করলাম। বেলায় প্রাতরাশ খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। দেখি শহর প্রায় জনহীন। আজ "Whit Monday" —যীশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণ দিবস। তাই শহরবাসী গেছে গ্রামাঞ্চলে ছুটীর আনন্দ উপভোগ করতে।

আমরা প্রথমেই গেলাম প্রফেসার হেম্যানের (Prof. Heyman) কন্যা মিসেস থোরিয়ানের (Mrs. Thorean) সঙ্গে দেখা করতে। ছুটীর দিনে মিসেস থোরিয়ান স্বামী-পুত্র-কন্যা সহ বেশ আরাম করে প্রাতরাশ খাচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই আনন্দে উৎসাহিত হয়ে জয়শ্রীকে আদর করে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সংসার ও পুত্রকন্যার ভার স্বামীর উপর দিয়ে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মোটর লঞ্চে করে শহর ঘুরতে।

ষ্টকহলমকে বলা হয় 'উত্তরের ভেনিস'—হ্রদে গাঁথা শহর। ম্যালারণ হ্রদ ও বলটিক সাগরের মিলনস্থলে ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জের উপর শহর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জলে ও স্থলে উভয়পথেই শহর প্রদক্ষিণ করে আসা যায়। নয়নাভিরাম শহরের ছবি। মাধুর্যময়ী প্রকৃতি বুঝি সৌন্দর্যভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে এইখানে। মোটর বোট দ্বীপ ঘুরে ঘুরে চলল। তীরের উপর পাইন গাছের ছায়ায় ঘেরা কুঞ্জকুটীরগুলি দেখতে অতি মনোরম। শীতের পর বসন্তের আমেজ লেগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় সবুজ নেশার মাতামাতি। মলয় বাতাসের হিল্লোলে পল্লবী হেলে দুলে পাতার ঝঙ্কারের মাতন তুলেছে। শহরের স্থানে স্থানে কোথাও বা দু'টী হ্রদের মাঝখানে খাল কেটে জলপথকে যুক্ত করা হয়েছে বরাবর সাগর অবধি; স্থলপথকে যুক্ত করা হয়েছে উপরে অসংখ্য সেতু বেঁধে।

প্রাচীন ষ্টকহলমের পথ ঘাট খুবই অপ্রশস্ত। সরু অন্ধকার গলির দু'ধারে সাবেকী ধরণের ঠেসাঠেসি বাড়ী। নবনির্মিত শহরতলীতে এসে দেখি, দু'ধারে পাইনগাছের সুরম্য উদ্যান, তার ফাঁকে ফাঁকে গড়ে উঠেছে আধুনিক পল্লীগুলি। প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে মনোরম অট্টালিকার সারি। ছোট ছোট শিশুরা বাগানের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বাগানে বসে আছে সূর্যমুখীর মত ঊর্ধ্বে মুখ তুলে; তার গাত্রচর্মকে রৌদ্রতপ্ত করে পুড়িয়ে নিতে তারা সবাই বিশেষ ব্যস্ত।

শহরের এই নতুনপল্লীগুলিতে মুক্ত আলোহাওয়া চলাচল করে অবাধ গতিতে। প্রকৃতির এখানে মৃত্যু ঘটেনি, ঘটেছে মুক্তি।

শহর প্রদক্ষিণ করার পর মিসেস খোরিয়ান আমাদের এখানকার Stureby Homeটি দেখাতে নিয়ে গেলেন। এটি হল এ দেশের দুঃস্থ অকর্মণ্য বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শেষ জীবনের একটি আশ্রয়। এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ৭১০ জনের বাসের ব্যবস্থা ; তার মধ্যে ৩৩৬ জন একেবারে

বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শেষ জীবনের আশ্রয়

অকর্মণ্য শয্যাশায়ী রোগী এবং অবশিষ্টরা অপেক্ষাকৃত সুস্থকায় কিন্তু নিঃস্ব সহায়সম্বলহীন। এঁরা অল্প-স্বল্প বাগানের কাজ করে থাকেন এবং সেলাই, ধোলাই, রিপুকর্ম প্রভৃতি করে প্রতিষ্ঠানকে কিছু আয়ের সহায়তা করেন। এইভাবে বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ এই আশ্রমে বাস করে জীবনের শেষ ক'টা দিন শান্তিতে কাটিয়ে যান। ফলে, এইজাতীয় জরাজীর্ণ রোগীর ভিড়ে হাস-পাতাল আর ভরে ওঠে না।

কথা প্রসঙ্গে মিসেস থারিয়ান বল্লেন—এ দেশে এ ভিন্ন বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আরো বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে নতুন আদর্শে গঠিত গোল্ডন ওয়েডিং হোমটি (Goldden Wedding Home) আবার সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আশ্রমে নিঃস্ব ও বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী আপন সংসার পেতে পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে একত্রে বাস ক'রে বাকি জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। পৌরসঙ্ঘ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরো একটি আবাসকেন্দ্র। পেনসেনভোগী স্বল্পবিত্ত বৃদ্ধ দম্পতীর বসবাসের জন্য শহরের আশেপাশে ছোট ছোট কুটীর নির্মাণ করে নতুন পল্লী গঠন করা হয়েছে। কুটীরগুলি নাম মাত্র ভাড়ায় এই সব পরিবারের বাসের জন্য দেওয়া হয়। এই বাড়ীগুলির ভিতরে দেওয়া থাকে সমুদয় গৃহস্থলীর ব্যবহার্য বস্তু, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রটি হ'তে ইলেক্ট্রিক উনানটি পর্যন্ত।

প্রকৃতপক্ষে ষ্টকহলমে এখন আর কোথাও কোন স্থানে দরিদ্রপল্লী বা বস্তিপাড়া বলে কিছু নেই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও রুচি বদলে চলেছে। জীবনযাপনের মান উন্নীত হচ্ছে ক্রমেই। দেশবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টায়, গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ও পৌরসঙ্ঘের সততাপূর্ণ প্রচেষ্টায় দেশে দুঃখদারিদ্র্য বহুলাংশে দূরীভূত হয়ে এক কল্যাণকর সমাজ গড়ে উঠেছে।
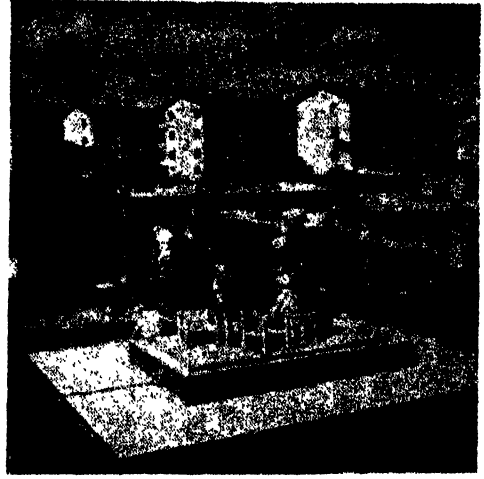
মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা নির্মিত নতুন শ্রমিকপল্লী

দেশের মানুষের জন্য যে দেশ এমনিভাবে প্রাণঢালা সেবাযত্ন করতে তৎপর—'দেশবাসীর জন্যই দেশ'—এ নীতি অক্ষরে অক্ষরে যে দেশ পালন করে, সে দেশ সত্যই সকলের আদর্শস্থানীয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শহরে পাছে বাসগৃহের অকুলান ঘটে, এই আশঙ্কায় পৌরপ্রতিষ্ঠান হতে বহুপূর্বেই নতুন পল্লীর নক্সা তৈরী হয়ে গৃহনির্মাণ কার্য সুরু হয়ে গেছে।

মিসেস খোরিয়ান বল্লেন—এ দেশে পৌরপ্রতিষ্ঠানের পৌরপরিষদের একশত জন সদস্যের মধ্যে বাইশ জন রয়েছেন মহিলা।

২৯শে মে। সকালে সবেমাত্র প্রাতরাশ শেষ হয়েছে, এমন সময় একখানি টেলিগ্রাম এল। জার্মানীর প্রফেসার মার্টিয়াসের (Prof. Martius) কাছ থেকে জরুরী নিমন্ত্রণ, যে ফিরবার পথে গোটিংএন ইউনিভার্সিটিতে (Gottingen University) ক্যানসার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে। সেখানে থাকবার ও যাতায়াতের ভার তিনিই নেবেন। টেলিগ্রাম পেয়ে উনি বেশ একটু উতলা হয়ে পড়লেন। জার্মানী যাবার পরিকল্পনা আমাদের প্রোগ্রামে ছিল না ; সেজন্য পূর্ব থেকে জার্মানীর 'ভিসা'ও নেওয়া হয় নাই। এখন এই 'ভিসা'র হাঙ্গামা করতে হলে এখানকার ভারতীয় দূতবাসে যেতে হবে, যার জন্য উনি একটুও ইচ্ছুক নন। লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব সুখপ্রদ ছিল না। লণ্ডন-প্রবাসের সময় পরিচিত অপরিচিত ভারতীয়ের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাই নাই। তবুও অবুঝ মন আমার একাকী লণ্ডনবাসের দিনগুলোতে ইংরেজ বন্ধুদের আতিথেয়তার চেয়েও দেশছাড়া ভারতীয় প্রবাসীর খোঁজ নেওয়ার জন্যই উন্মুখ হয়েছিল। ভারতীয় দূতাবাসের মহারথিবৃন্দকে বিশেষ কর্মব্যস্ত মনে করে উনি আর দূতাবাসে গিয়ে তাঁদের বিরক্ত করতে চাননি। স্বাধীন ভারতের ভারতীয় ভাব-ধারাটুকু যে বড় বড় সরকারি ইমারতের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, সেটা তখনও

ঠিক উপলব্ধি করি নাই। যা'হোক, শেষ পর্যন্ত আমরা এই সব দেশী বড় সাহেবদের খঁাটীগুলি একটু এড়িয়েই চলতাম।

এ-হেন অবস্থায় কি করা যায়—এই নিয়ে এখন আমরা জল্পনা কল্পনা করছি, এমন সময় আমাদের ইকহল্মের বন্ধুপরিবার মিষ্টার ও মিসেস হ্যারিস (Mr. & Mrs. Harris) এসে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ গল্প
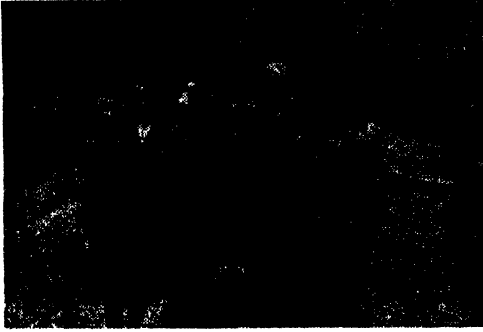
হ্যারিস পরিবারের সঙ্গে

করার পর তিনি আমাদের জার্মান যাবার 'ভিসা' নেই শুনে বল্লেন—"আপনাদের কিছুই করতে হবে না। আপনারা মিসেস হ্যারিসের সাথে স্ক্যানসন্ মিউজিয়াম (Skansen Museum) দেখতে যান। ফিরে আসবার পূর্বেই আপনাদের জার্মানীর 'ভিসা' আনিয়ে রাখব।"

স্ক্যান্সন মিউজিয়াম শহর থেকে বেশ একটু দূরে উন্মুক্ত পর্বতচূড়ায় অনেকখানি জমির উপর অবস্থিত। বহু শতাব্দী পূর্বে সাবেককালের মানুষের জীবনযাত্রার নিদর্শনস্বরূপ কাঠের গৃহগুলি সুইডেনের নানাস্থান হ'তে সংগ্রহ করে তুলে এনে এই অনাবৃত সংগ্রহশালায় সযত্নে রাখা হয়েছে। এই সব কুটীরগুলির ভিতরে গৃহস্বামীর যাবতীয় ব্যবহৃত আসবাব, ঘরকন্নার জিনিসগুলি যায় কাঠের কাঁটা চামচ থালা বাটী এমন কি পাতকূয়া হ'তে জলতোলার কাঠের বাল্‌তিটি পর্যন্ত যথাস্থানে সাজানো। সেকালের পোষাক-পরিচ্ছদে শোভিতা এক মহিলা ঘরের সব জিনিষপত্তর দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পুরাকালের কাঠের গৃহগুলি ঘুরে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে যেন কত শত শতাব্দীর আগের যুগে আমরা ফিরে গেছি। সামনেই দেখছি সেই প্রাচীন মানুষদের জীবনযাত্রা—তাদের সমাজব্যবস্থা, দেশাচার, রীতিনীতি—সুখদুঃখে জড়ানো সেই দিনগুলি। কল্পনাতীত অদ্ভুত এ পরিবেশ। মনের মাঝে ছাপ দিয়ে যায় অতীতকালের সেই মানুষের রূপটি। বহুকাল পূর্বে সে দিনের সে পৃথিবী আজকের এই পৃথিবীই ছিল, কিন্তু তখন মানুষের জীবনধারা ছিল কত অন্য ধরণের। এই স্ক্যান্সনে যেন সুইড্‌দের পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখে আজকের এই বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সমাজও প্রভূত আনন্দ পাচ্ছে।

সুইড্‌দের একটি সাবেকী প্রথা—লুসিয়া সেলিব্রেসন (Lucia Celebration) উৎসবটি আজও দেশে অনুষ্ঠিত হয়। 'লুসিয়া'—আলোর প্রতীক। ১৩ই ডিসেম্বর ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে প্রোজ্জ্বল-বর্তিকাকিরীটিনী এক সুন্দরী তরুণী সভা আলো করে উপস্থিত হন; নৃত্যে গীতে বাদ্যে মেতে ওঠে জনসভা।

আরেকটি প্রাচীন প্রথা হল—'May Pole' ঘিরে নৃত্যানুষ্ঠান। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে প্রচুর সূর্যালোকের মাঝে পত্রপুষ্পশোভিত May Poleটি ঘিরে মহানন্দে লোকনৃত্যের উৎসব চলে।

এখানকার কাঠের 'মোরা' গোলাবাড়ী (Mora farmstead) ওকটার্পের (Oktarp) খোড়ো ছাউনির ঘর ও কায়ার্কের (Kyrk) ঘাসের চাবড়ার ছাউনি ঢাকা কুটীরগুলি দেখে অতি ক্লান্ত হয়ে আহারের সন্ধানে রেস্টুরেন্টে গেলাম। পথে দেখলাম ল্যাপদের কাঠের তাঁবুটি। মিসেস হ্যারিস বল্লেন, শীতকালে একটি ল্যাপ-পরিবার এইখানে এই তাঁবুটিতে বাসও করে।

স্ক্যান্সনের রেস্টুরেন্টটি অতি চমৎকার। অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি শৈলশিখরের উপরে বড় বড় কাচের দরজা জানলা পরিবেষ্টিত সুন্দর একটি কাঠের বাড়ী; উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেও বহু চেয়ার টেবিল পাতা রয়েছে। চারিধারে ঝলমলে রংএর সতেজ গোলাপ, টিউলিপ, প্যান্‌জি ও ডালিয়া ফুলের বাগান, স্নিগ্ধ সৌরকিরণে আরো সজীব ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্যানাডায় নায়গ্রা জলপ্রপাতের সামনে টেরাস-রেস্টুরেন্টের ফুল-বাগানটি আমার খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু স্ক্যান্সনের এই উদ্যানটি তাকেও হার মানিয়েছে। সাবেকী ধাঁজের সুইডিশ পোষাকপরিহিতা আহার সরবরাহকারিণী উৎকৃষ্ট খাদ্য দিয়ে আমাদের তৃপ্ত করল।

অদূরে জমকালো ইউনিফরম্‌-পরা ব্যাণ্ড-বাজিয়ের দল শনৈঃ শনৈঃ আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে সুইডিশ পল্লীসঙ্গীত বাজিয়ে যাচ্ছে। ছুটীর দিনে এবং অবসর সময়ে এই মনোহর পরিবেশের মধ্যে অলসবিশ্রাম উপভোগ করা ও উন্মুক্ত শৈলশিখরে স্নিগ্ধ রৌদ্রতাপে শ্বেত অঙ্গকে তাম্রবর্ণ করে নেওয়া শহরবাসীদের বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ক্যান্সনে সারাবেলা অতিবাহিত করে বিকেলে হোটেলে ফিরে এলাম।

আজই রাতে আবার হ্যারিস-পরিবার আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন। সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁরা হোটেলে এসে উপস্থিত। মিষ্টার হ্যারিস গাড়ী চালিয়ে সকলকে নিয়ে চললেন প্রাচীন শহরের দিকে। অন্ধকারময় সরু পাথরের পথ, দু'ধারে বাড়ীর প্রাচীর। গলির পর গলি পেরিয়ে ছোট্ট একটি রেস্টুরেন্টের সামনে মোটর থামল। আমরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ছোট্ট সরু একটি কালো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ভূগর্ভে গুহার মধ্যে উপস্থিত হলাম। গুহায় জানলার বালাই নাই; শুধু ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মাঝে অসমান কালো গ্রেনাইট্ পাথরের দেওয়াল ঘিরে চারিদিকে জলছে সারি সারি ঝাড়বাতি; আলোর নীচে সাজানো রয়েছে ছোট ছোট খাবার টেবিলগুলি। ঘর ভরা লোক, সকলেই খেতে ব্যস্ত। খাদ্যগুলি অতি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু। আমাদের ঠিক সামনে দু'ধাপ নীচে আরেকটি গুহাতে বেশ বড় রকমের একটি ভোজপর্ব চলছে। ঘরের মাঝখানে লম্বা টেবিল ঘিরে বসে জন পঞ্চাশ পুরুষ ও

নারী আহারের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে মাঝে মাঝে সঙ্গীতলহরী তুলছেন। পাথরের দেওয়ালে দ্বিগুণ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সুরের ঝঙ্কার।

অতি প্রাচীন এই সরাইখানাটির নাম—"Den Gyldene Freden"—The Golden Peace ; সরাইখানাটি তিনশ' বছরেরও অধিক পুরাতন। সুপ্রসিদ্ধ কবি কার্ল মাইকেল বেলম্যানের (Carl Michœl Bellman) অতি প্রিয় খাবার ঘর ছিল এই 'Freden' সরাইখানাটি। এখানকার এই স্তব্ধ গুহার নিভৃতকোণের অভিনব রহস্যময়ী রূপটি কবিমনকে মুগ্ধ করত। কবি এইখানে বসে কাব্যরসে অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি করতেন কত গান, কত কবিতা, কত ছন্দ। কবি বেলম্যান 'Poet of Peace' শান্তিবাণীর কবি নামে খ্যাত। তাঁর রচিত গানগুলি আজও দেশবাসীর নিকট অতি প্রিয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কবির জন্মদিবসে প্রতি বৎসর দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, কবি ও সাহিত্যিকগণ শ্রদ্ধেয় কবির স্মরণার্থে এই সরাইখানায় সমবেত হন।

৩০শে মে। সকালে গেলাম 'সিটি হল' (City Hall) দেখতে। এ দেশের টাউন হলকে বলে 'সিটি হল'। এই 'সিটি হল' ষ্টকহলমবাসীদের বিশেষ গর্বের সামগ্রী। ম্যালারণ হ্রদের পাড়ে অনেকখানি জায়গার উপরে 'সিটি হল' প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের মাঝে দেশনেতা এঙ্গলব্রেষ্টের (Engelbrecht) বিরাট মর্মর মূর্তি স্থাপিত। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদেশী প্রভুর কবল হতে দেশকে মুক্ত করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। 'সিটি হলে' বিশিষ্ট সভাসমিতির জন্য বিভিন্ন রকমের বড় বড় হল রয়েছে। তার মধ্যে সোনালি মোজাইকের দেওয়াল গাঁথা জমকালো গোল্ডেন হলটি (Golden Hall) বিশেষ দ্রষ্টব্য। ঘরের একটা দিকে দেওয়াল জুড়ে আঁকা নারীমূর্তিটি ষ্টকহলমনগরীর প্রতীক। প্রিন্স ইউজেনের (বর্তমান রাজার খুল্লতাত) আঁকা বড় বড় তৈলচিত্র প্রাসাদের বিভিন্ন স্থানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে একটি বালিকা-বিদ্যালয় দেখতে গেলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পূর্বে কথা বলে বন্দোবস্ত করা ছিল। শহরের বাইরে খোলা মাঠের মাঝে বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষয়িত্রী সাদরে আমাদের বিদ্যালয় দেখালেন। ক্লাশের ছাত্রীরা নতুন দেশের মানুষ দেখে অবাক হয়ে তাকাল। এ দেশের শিক্ষাবিষয়ক বহু তথ্য শিক্ষয়িত্রীর নিকট শুনলাম।

সুইডেনে ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা আরম্ভ করতে হয় সাত বছর বয়সে। বাধ্যতামূলক পাঠ্যকাল ৭ বৎসর। জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আরো কত সহজলভ্য করা যেতে পারে সে বিষয়ে দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ বহু গবেষণার পর একটি নতুন শিক্ষাসংস্করণ খাড়া করা হয়েছে ; শীঘ্র তার প্রচলন সুরু হবে। এই নতুন নিয়মে প্রাথমিক শিক্ষার সময় ৭ বৎসরকে ৯ বৎসর করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে মাহিনা দিয়ে পড়তে হবে না ; পরন্তু কৃতী ছাত্রছাত্রী জলপানি পাবে। প্রত্যেককে বই খাতা পেনসিল দেওয়া হবে, টিফিন খেতে পাবে এবং যারা দূরে থাকে, তাদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্য এর অনেকগুলিই কমবেশী বহুদিন থেকে প্রচলিত রয়েছে কিন্তু সম্প্রতি নিয়মগুলি কার্যকরী করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হলে Gymnasium অর্থাৎ সিনিয়র হাই স্কুলের পরীক্ষা পাশ করতে হয়। এই পরীক্ষা এ দেশের সব চেয়ে কঠিন
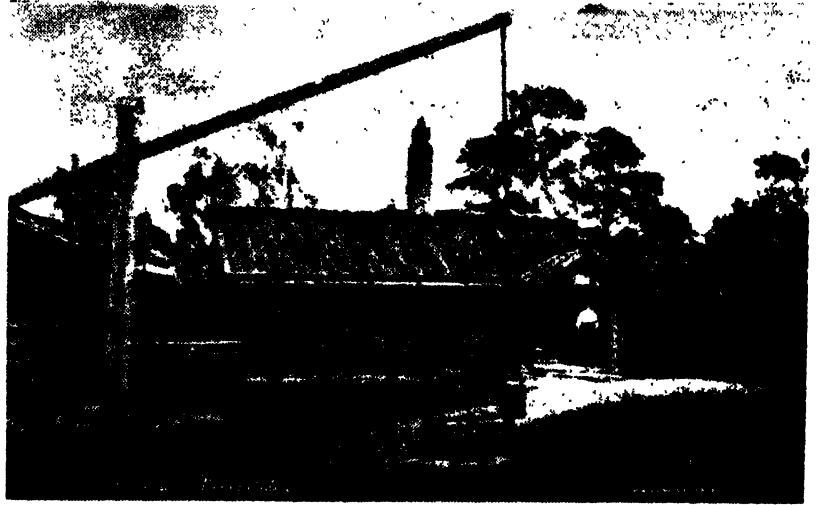
মোরা গোর্দবাড়ি

পরীক্ষা—আমাদের B.A. পরীক্ষার সামিল। এই পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রদের খুবই গর্বের বিষয়। বেশীর ভাগ ছাত্রই বিশ বছর বয়সে জিমনেসিয়াম্ পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়ে সরকারী ও বেসরকারী নানা বিভাগে ভালো চাকুরি পায়। শিক্ষয়িত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেবার সময় তিনিও উত্থাপন করলেন মেয়েদের সেই সনাতন সার কথা—সাড়ী ও গহনার উচ্চ প্রশংসা।

ফেরার পথে একটি রেস্টুরেন্টে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারা গেল। সাগরের নোনা মাছের ডিমগুলি খেতে অতি সুস্বাদু। সুইডদের অতিকায় দেহানুপাতে আহারের পরিমাণও তদনুরূপ। আমরা তো একটি ডিশ নিয়ে তিনজনে ভাগ করে খেয়েও শেষ করতে পারলাম না। দেখলাম, সামনের ভদ্রলোকটি পুরোপুরি ভুরিভোজন করে আহারান্তে খেলেন এক-বাটি আধসের পরিমাণ দই। এই Yogot অর্থাৎ দধি সুইডদের খুব প্রিয় খাদ্য।

আজ বিকেলে Sabbatsberg হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাক্তার ভেটারডলের গৃহে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ।

হাসপাতালে ভেটারডলের অস্ত্রোপচার দেখে উনি উচ্চ প্রশংসা করলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা জানা কমই ছিলেন। সকালে আমাদের স্কুল দেখার উৎসাহের কথা শুনে জনৈক ভদ্রমহিলা তাঁর নিজের নার্শারি স্কুলটি দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর কাছ থেকে এ দেশের শিশুকল্যাণ সমিতি ও নার্শারি স্কুলের বিবিধ ব্যবস্থার বিষয় শুনলাম।

এদেশে Child Welfare অর্থাৎ শিশুকল্যাণ সাধনের আন্দোলন কিছুকাল যাবৎ সারা দেশময় চলেছে। ১৯২৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যে, প্রত্যেক জেলার শিশু কল্যাণসাধনার্থে একটি করে শিশু কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকে যারা শিশু, কালে তারাই হবে ভবিষ্যৎ-জাতি; সুতরাং তাদের জীবন গঠনের দায়িত্ব দেশেরই। এই শিশু-জীবনের ভিতর দিয়ে মনুষ্যত্ব ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠলে তবেই গড়ে উঠবে আদর্শজাতি, নচেৎ জাতি নামবে অবনতির ধাপে।

এই শিশুকল্যাণ সমিতির একটি বিশেষ কাজ হল—বাড়ী বাড়ী গিয়ে শিশুদের লালনপালনের খবরাখবর নেওয়া, শিশুর মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানপালন সম্বন্ধে সৎপরামর্শ করা, প্রয়োজন ক্ষেত্রে খাদ্য, অর্থ, চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা সর্বতোভাবে সাহায্য করা। মাতাপিতা সন্তান-পালনে অযোগ্য হ'লে কিম্বা দুষ্টমতি সন্তানের পক্ষে গৃহে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব দেখলে সমিতির তরফ থেকে সেই সকল শিশুকে মাতাপিতার অমত সত্ত্বেও স্থানান্তরিত করা হয় প্রটেক্টিভ্ আপব্রিঙ্গিং হোমে (Protective Upbringing Home)। সমিতির এই কাজের পিছনে আছে গভর্ণমেন্টের পূর্ণ সহযোগিতা। শিশুকল্যাণ সমিতির অধীনে এ ছাড়াও Youth Home, Occupational Home-প্রমুখ বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে; সেখানে শিশুরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এদেরই সাহায্যে নানা বিভাগে চাকুরি লাভ করে। শিক্ষার অভাবে বা কুশিক্ষায় যে জীবন হেলায় হারাত, সে জীবন হয়ে ওঠে সফল কর্মরত। এমনি করে শিশু চরিত্রে ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। শিশু হয় পূর্ণ দায়িত্বশীল নাগরিক।

৩১শে মে। আজ সকালে সবাই গেলাম Carolinsk হাসপাতালে। উনি ডাক্তারদের সঙ্গে কাজে বসলেন দেখে আমরা মেট্রন মিস বোণ্টকে নিয়ে হাসপাতাল ঘুরে দেখতে গেলাম। Carolinsk হাসপাতালে রেডিয়াম্‌হেমেট্ (Radiumhemmet) ক্যানসার চিকিৎসাগারটি বিশ্ববিখ্যাত। প্রফেসার হেম্যান (Prof. Heyman) এবং প্রফেসার বেরভ্যানের (Prof. Bervan) সঙ্গে আমাদের এর আগেরবারই বেশ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। প্রফেসার হেম্যান আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধাত্রীবিদ্যা কংগ্রেস থেকে ওঁর সঙ্গে একই সময়ে ফিরেছেন। প্রফেসার বেরভ্যান্ এই রেডিয়াম্ হেমেটের ডিরেক্টর; সম্প্রতি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। এত বড় প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক ও শ্রেষ্ঠ ক্যানসার চিকিৎসক আমাদের সঙ্গ যেভাবে মেলামেশা করলেন, তাতে মনে হল যেন কতকালের পরিচিত এবং আমাদেরই একজন। মহত্বের প্রকাশই

Radium hemmet হাসপালের সম্মুখে Prof. Bervan—

অনন্যসাধারণ! প্রফেসারের ঘরে বসে চা পানের সময় দেশ-বিদেশের অনেক গল্পই শোনা গেল। মিস বোণ্ট তাঁর সোসাল-কর্মবিভাগের (Social Service) কার্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন। এ দেশের স্বাস্থ্যবিভাগ সম্বন্ধে অনেক কথাই বল্লেন।

শুধু এই ষ্টকহলমেই ৩০টি হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে সর্বসমেত রোগীর বিছানা হবে প্রায় সাড়ে তের হাজার। মাত্র সাত লক্ষ বাসিন্দার জন্য এতোগুলো হাসপাতাল এবং এতোগুলো বিছানা শুনে অবাক্ হলাম। সম্প্রতি আবার বারশত রোগীর বিছানাযুক্ত অতি আধুনিক ধরণের একটি হাসপাতাল তৈরী হয়েছে, তার নাম "Soderejukhuset"। এই হাসপাতালটি প্রগতিশীল আমেরিকার অভিনবত্বকেও হার মানিয়েছে। আর-সব চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, জনসাধারণের পক্ষে এই সব হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়া মোটেই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। দৈনিক সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার ক্রোণে অর্থাৎ আমাদের প্রায় চার টাকায় হাসপাতালে থাকা, খাওয়া এবং যাবতীয় চিকিৎসার সুবিধা যায় এক্সরে ছবি তোলা পর্যন্ত পাওয়া যায়। রোগী পিছু অবশ্য খরচ পড়ে এর চেয়ে বহুগুণ বেশী। কিন্তু এর জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ ব্যয় করেন বাৎসরিক সাত কোটি টাকা অর্থাৎ মাথা পিছু একশত টাকা করে।

মানুষের মন স্বভাবতই তুলনাপ্রয়াসী। আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগের সঙ্গে তুলনা করে যখন আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করি, উনি বল্লেন—"আজ থাক, হাজার বছর পরে তুলনা কোরো।" (ক্রমশঃ)

মধু ও স্বাস্থ্য

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

যদি এমন কোন খাদ্যের নাম করা যায়, যাহা একাধারে পথ্য ও ঔষধ, তবে মধুর নাম করা যাইতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সমাজে মধুর ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। মানুষ যখন বনে ও জঙ্গলে বন্য পশুর মত বাস করিত, তখন হইতেই তাহারা মধুর ব্যবহার অবগত ছিল। চাউল বা গমের প্রচলনের বহু পূর্ব হইতে মানব সমাজে মধুর প্রচলন হইয়াছে।

ভারতীয় ঋষিরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই মধুর উপকারিতা জ্ঞাত ছিলেন। প্রাচীনতম বৈদিক মন্ত্রের ভিতর মধুর অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে বহু ঔষধের সহিত মধু ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রাচীন মিসরেও এমন ঔষধ খুব কমই ছিল, যাহার সহিত মধু মিশ্রিত না করিতে হইত। প্রাচীন রোমেও নীরোর সময় মক্ষিকা-পালন, একটা প্রধান শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। য়ুরোপীয় চিকিৎসাবিধির প্রবর্তক হিপক্রেটাস প্রতিদিন নিজে মধু পান করিতেন এবং বলিতেন মধু পান করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। অনুসন্ধানের ফলে ইহা জানা গিয়াছে, প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন বহু লোক ছিল, যাহারা একশত হইতে একশত পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, ঐ সকল দেশে মধু ব্যবহারের যে প্রচলন ছিল, ইহাই তাহার কারণ। মহাপুরুষ মহম্মদও বলিয়াছেন, মধু সকল রোগের ঔষধ।

বর্তমান সময়েও মধু লইয়া যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের একটি স্বাস্থ্যনিবাসে কতগুলি ছেলেকে সাধারণ খাদ্যের সহিত কেবলমাত্র মধু খাইতে দিয়া কিছু দিন পর দেখা যায়, যে সব ছেলেকে মধু খাইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহারা অন্য ছেলেদের অপেক্ষা ওজনে, শক্তিতে, কর্মক্ষমতায় ও দেহশ্রীতে অনেক বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছে।

অষ্ট্রিয়ার একটা অনাথাশ্রমে ২৯ জন ছেলেকে সাধারণ খাদ্যের উপর দিনে দুইবার বড় চামচের এক চামচ করিয়া মধু খাইতে দিয়া দেখা যায়, কিছু কালের মধ্যে তাহাদের দেহে রক্তকণিকার সংখ্যা অন্য সকল ছেলের অপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিভিন্ন স্থলে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, কোন রোগের জীবাণুই মধুর ভিতর বিস্তার লাভ করিতে পারে না। একজন ডাক্তার মধুর ভিতর বিভিন্ন মারাত্মক রোগের জীবাণু ছাড়িয়া দেন। তাঁহার ধারণা ছিল, দুগ্ধ প্রভৃতির ভিতর জীবাণু যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পায়, মধুর ভিতরও তেমনি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হইয়া দেখেন যে, ঐ সকল জীবাণু প্রত্যেকটিই কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিনের ভিতর প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইহা তখন নিঃসঙ্কোচে বলা চলিতে পারে, যত প্রকার মিষ্ট দ্রব্য আছে, তাহাদের ভিতর মধুর মত উপকারী খাদ্য আর নাই, মধুর ভিতর ফল-শর্করা থাকে ৪০ ভাগ, গ্লুকোচ ৩৪ ভাগ, ইক্ষু শর্করা দুই ভাগ এবং তাহা ব্যতীত ইহাতে অল্প মাত্রায় লৌহ, ক্যালশিয়ম, ফসফরাস এবং বিভিন্ন ভাইটামিন থাকে। প্রতি পাউণ্ডে ইহার তাপমূল্য ১৬০০ ক্যালরি। এই জন্য মধু অত্যন্ত শক্তিপ্রদ খাদ্য।

বিভিন্ন জাতীয় চিনি ও শর্করা-খাদ্যের ভিতর মধুই সর্বাপেক্ষা সুপাচ্য খাদ্য। ইক্ষু শর্করা মুখে হজম হয় না, পাকস্থলীতেও হয় না এবং তাহার পর ক্ষুদ্রান্ত্রে যাইয়া পরিপাক হয়। যদি চিনি ভালভাবে পরিপাক না পায়, তবে তাহা কুপিত হইয়া উঠে এবং অম্ল, অজীর্ণ ও আমাশয় প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু মধুতে কখনই কোন রোগ উৎপন্ন হয় না। মধু এমন একটি খাদ্য যাহা পূর্ব হইতেই হজম করা থাকে। সুতরাং ইহা আর পুনরায় পরিপাক করিবার আবশ্যক হয় না। এমন কি জিহ্বা হইতেই ইহা দেহে শোষিত হয়। পাকস্থলীতে পৌঁছার পরও ইহা খুব সত্বরতার সহিত দেহের কাজে আসিতে আরম্ভ করে। ইহার শতকরা একশত ভাগই দেহে শোষিত হয়। অন্ত্রের পথে দিলেও ইহার শতকরা ৯৬% ভাগ পরিপাক পাইয়া থাকে। এই জন্য কঠিন রোগে অন্ত্রের পথে ইহা প্রয়োগ করিয়া রোগীর জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে। এই সকল কারণে শিশু, দুর্বল, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও শ্রান্ত লোকদের পক্ষে মধু একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

যাহাদের পরিপাক-শক্তি দুর্বল, তাহাদের পক্ষে মধু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহার ভিতর এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যাহা অন্য খাদ্য পরিপাকেও সাহায্য করে।

মধু হার্ট ও লিভারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ টনিক। কারণ মধুর ভিতর গ্লুকোচ থাকায় উহা হার্ট লিভারকে ভাল রাখে এবং উহাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মধু ব্যবহারে হার্ট ফেলিওর নিবারিত হয় এবং হৃদ্রোগীরা মধু খাওয়া অভ্যাস করিলে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়া যাইতে পারেন।

মধু একটি মৃদু-বিরেচক খাদ্য এবং ইহা প্রস্রাব পরিষ্কার রাখে। এই জন্য এক দিকে ইহা যেমন শক্তি ও পুষ্টি পরিবেশন করে, তেমনি ইহা দেহের বিভিন্ন আবর্জনা দেহের বিভিন্ন দ্বার পথে বাহির করিয়া দিয়া দেহকে সুস্থ রাখে।

এই সকল কারণে মধুকে কেবল একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নয়, ইহা একটি রসায়ন।

প্রকৃত পক্ষে ইহা দ্বারা শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়, অবসাদ ও ক্লান্তি কাটিয়া যায়, হার্টটি সবলতা লাভ করে, লিভার ভাল হয়, শীর্ণতা বিদূরিত হয় এবং রোগশূন্য দীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু মধু গ্রহণে স্বাস্থ্যই যে কেবল ভাল হয়, তাহা নয়। ইহা দ্বারা বিভিন্ন রোগ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। পরিপাক যন্ত্রের বিভিন্ন

রোগে ইহা ঔষধের মত কার্য করে। অজীর্ণ, অম্লরোগ, পাকস্থলীর শ্লেষ্মাধিক্য এবং পিত্তকোষের বিভিন্ন রোগে মধু অত্যন্ত ফলপ্রদ।

পাকস্থলীর ক্ষত একটি দুশ্চিকিৎস্য রোগ। কিন্তু মধু এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অল্প অল্প করিয়া দুধ বা ফলের রস সহ প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর রোগীকে মধু খাইতে দিলে ধীরে ধীরে রোগীর পেটের ক্ষত শুকাইয়া আসে।

টাইফয়েডকে পেটের রোগই বলা চলিতে পারে। এই রোগে রোগীকে জলের সহিত মধু দিলে পেটটি ভাল থাকে এবং পেট ফাঁপা নিবারিত হয়। সুস্থ শিশুদিগকেও মধু খাইতে দিলে কখনও তাহাদের পেট ফাঁপিয়া উঠে না।

সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি ও নিউমোনিয়া প্রভৃতি সর্ববিধ বুকের রোগে মধু গ্রহণে অত্যন্ত উপকার হয়। জলের সঙ্গে মধু মিশাইয়া অল্প অল্প করিয়া পান করিলে বুকের উত্তেজনা কমিয়া যায় এবং কাশি আপনি শান্ত হইয়া আসে। নিউমোনিয়াতে যখন হজম-শক্তি কমিয়া যায়, তখন রোগীকে পরিমিত মধু দিলে সহজে দুর্বলতা আসে না। যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক হিসাবে মধুর যথেষ্ট সুনাম আছে। পুরাতন যক্ষ্মায় ইহা রোগ আরোগ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

সর্বপ্রকার সন্ধিপ্রদাহ ও বাতব্যাধিতে মধু ঔষধের মত কার্য করে। ইহা যেমন রোগ আরোগ্য করে তেমনি রোগ প্রতিরোধও করিয়া থাকে। মাংসপেশির শুষ্কতা, স্নায়বিক রোগ এবং বিভিন্ন গ্রন্থি রোগেও ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

মধুকে লোকে গরম খাদ্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। যদি মধু আর কিছুর সঙ্গে না মিলাইয়া বা অল্প কিছু জিনিসের সহিত মিলাইয়া খাওয়া যায়, তখনই তাহা শরীর গরম করিয়া থাকে। কিন্তু দেড় পোয়া হইতে অর্ধসের জলে সরবৎ করিয়া খাইলে কখনই মধু শরীর গরম করে না। জল গরম বা ঠাণ্ডা যে কোন ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক গ্লাস জলের বা দুধের ভিতর মাঝারি চামচের দুই হইতে তিন চামচ মধু দিয়া তাহা ভালরূপে নাড়িয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। সাধারণত দিনে এবং ভোরের দিকে এইরূপ একবার গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু যাহাদের কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদের দিনে দুইবার গ্রহণ করা উচিত। রোগীদের অল্প অল্প করিয়া দিনের ভিতর কয়েকবার গ্রহণ করা আবশ্যক।

কিন্তু মধু সর্বদাই বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কৃত্রিম বা ভেজাল মধু খাইয়া খাঁটি মধুর উপকারিতা প্রত্যাশা করা মিথ্যা।

শুধাই তোমারে বন্ধু আমার

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নিবে যাবে দিন ডুবে যাবে রাতি
আলোক ছায়ার শেষ হবে খেলা।
তুমি শুধু র'বে মোর প্রিয়সাথী
ভাসায়ে নূতন জীবনের ভেলা।
ঘুমায়ে পড়িবে এধরার স্নেহ,
স্বপন-কুহেলি গুণ্ঠন টানি;
কণ্ঠে আমার শুনিবে কি কেহ
বিদায় বেলার শেষ গানখানি!

ভাঙ্গাঘরে মোর বিদায়ের ডালি
রহিবে ধূলায় বেদনা-বিধুর।
দীর্ণ হিয়ায় অশ্রু শেফালি
মুছিবে দ্বারের সিঁথির সিঁদুর।
কোন্ সুদূরের কোন পারাবারে'
তরীখানি মোর উঠিবে গো দুলি,
স্নেহের ছায়ায় রেখে যাবো যারে'
সে কি ভুলে যাবে মোর কথাগুলি!

হয়তো পরাণ হবে মাতোয়ারা
নতুন পাতার দোলনার দোলে।
ফুলফোটানোর পড়িবে কি সাড়া
সেদিন ফাগুনে কিশলয় কোলে!
লতালাবণ্যে ফুলের সুবাসে
উঠিবে বিকশি বসন্তনব:

আমি তো তখন কুসুমের মাসে
ধরার আড়ালে আনন্দে র'ব।

জনম আমার গ্রহে গ্রহে হবে'
সংসারে আর আসিব কি ফিরে!
তারকার মত উদিব কি নভে
ঝরিবে আলোক নিখিলের শিরে!
বরষে শরতে বসন্তে শীতে
বরষে বরষে হ'বে উৎসব।
মানব সমাজে কত সঙ্গীতে
কত রাগিনীর হবে উদ্ভব!

তারি মাঝে মোর স্মরণ গীতিকা
দুঃখ সুখের ক্ষণ সংসারে,
শুনাবে কি কারো পরাণ বীথিকা
কাকলী মুখর দিবসের ধারে!
রোধিতে পারে না কেহ ক্ষমতায়
মুছে যেতে চায় ধরণীর রেখা।
যাবার বেলায় মিছে মমতায়
কত না হিয়ায় কাঁদে কুহুকেকা!

দেহের ভিতরে আত্মার মত
এক হয়ে আছে এপার ওপার:
কেন তার মাঝে বিরহ নিয়ত
শুধাই তোমারে বন্ধু আমার!

কাশ্মীরে শ্রীঅমরনাথ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

তিন

পহেলগাঁও, চন্দনবাড়ী, শেষনাগ, বায়ুযান, পঞ্চতর্ণী

১৩ই আগষ্ট সোমবার (১৯৫১) সকাল আটটার বাসে শ্রীনগর থেকে রওনা দিলুম পহেলগাঁও-এর দিকে। দূরত্ব ৬০ মাইল। পুরাতন অভ্যস্ত পথ দিয়ে ৩৩ মাইল দক্ষিণে এসে খানাবল, সেখান থেকে বাঁয়ে মোড় ঘুরে উত্তর-পূর্ব্বে যাওয়া হোল। মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম এবং মার্ত্তণ্ড নামক বিখ্যাত প্রাচীন স্থান অতিক্রম করে বেলা এগারটা নাগাদ পহেলগাঁও পৌঁছানো গেল। এই ষাট মাইল পথ বাস তিন ঘণ্টায় আসে।

লম্বোদরী নদীর তীরে পহেলগাঁও একটি ছোট সহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা হোল ৭,২০০ ফিট। জায়গাটি অল্প ঠাণ্ডা এবং চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এখানে কলের জল আছে এবং মাত্র কয়েক মাস হোল ইলেক্‌ট্রিকও হয়েছে। অনেকগুলি হোটেল এবং স্থানীয় লোকের কিছু বাড়ীও আছে। একখানি বড় খাবারের দোকান, দুইটি ভাতের হোটেল, একটা পাউরুটী-বিস্কুটের দোকান, কতকগুলি কাপড় ও পশমী জিনিষের দোকান, একখানা কন্ট্রোলের রেশন দোকান, কতকগুলি তাঁবু ভাড়া দেওয়ার দোকান বড় রাস্তার দু'ধারে সারি সারি অবস্থিত। আমাদের পাণ্ডা শ্রীশম্ভুনাথ শ্যামলালজী পূর্ব্ব থেকেই আমাদের জন্য খাল্‌সা হোটেলে একখানা ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। সপরিবারে সেই ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া গেল। আমাদের পাশের ঘরে এক মাদ্রাজী পরিবার ছিলেন, তাঁরাও অমরনাথের যাত্রী। এই ভাবে পহেলগাঁও-এ অমরনাথের দর্শনাভিলাষী প্রায় চারিশত যাত্রী এবৎসর জমায়েৎ হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় তিনশত যাত্রী হলেন কাশ্মীর ও জম্মুর অধিবাসী, বাকী শ'খানেক সারা ভারত থেকে গিয়েছিল। পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় এবার বাইরের যাত্রী এত কম হয়েছিল।

দুপুরে হোটেলে আহারাদি সেরে আমরা সকলেই যাত্রার আয়োজন সুরু করে দিলুম। পথে কিছুই পাওয়া যাবে না, অতএব এইখান থেকেই চাল, চিঁড়া, ডাল, ঘি, আলু, কড়াইশুটী, পাউরুটী, বিস্কুট, গুঁড়ো দুধ, কেরোসিন তেল, দেশালাই, কাঠ-কয়লা সমস্ত কিনে তাঁবু ও ঘোড়া ভাড়া করে সর্ব্বস্ব গুছিয়ে নিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমার মালপত্র ও তাঁবুর জন্য দুটি মালের ঘোড়া, স্ত্রী ও পুত্রের চড়বার জন্য অপর দুটি সওয়ার ঘোড়া, মাতাঠাকুরাণীর জন্য পিট্টু, যাকে বদ্রীনাথের পথে বলে কাণ্ডি, এই সব বন্দোবস্ত করা হোল। আমি স্বয়ং পদব্রজেই যাব বলে স্থির করেছিলুম, কাজেই শ্রীচরণে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ১৩ই আগষ্ট সোমবার পহেলগাঁও-এর খাল্‌সা হোটেলে শয়ন করা গেল।

সারা রাত বৃষ্টি পড়তে লাগলো। সকালে বেশ শীত। রাস্তায় কাদা, যাত্রীদের অপার দুশ্চিন্তা। পাণ্ডা বলে, এই রকম বৃষ্টি চলতে থাকলে এবছর যাত্রাই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউই ছাড়লে না। বেলা আটটা নাগাদ সমস্ত বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে সপরিবারে মালপত্র সমেত ওয়াটারপ্রুফ ও রবার বুট চাপা দিয়ে নিজে এক হাতে ছাতা ও অপর হাতে লাঠি নিয়ে 'অমরনাথজীকি জয়' বলে বেরিয়ে পড়া গেল। এখানে পাহাড়ে ওঠবার উপযুক্ত তলায় লোহার আল্ দেওয়া লাঠি পাওয়া যায়, চার আনা করে দাম। আমি কিন্তু সে লাঠি কিনি নি, কারণ পশুপতিনাথ ও কেদার-বদ্রী ঘুরেছি যে গাছের ভাঙ্গা ডাল নিয়ে, সেই বহু স্মৃতি সমন্বিত লাঠিখানাই আমি কল্‌কাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলুম অমরনাথ যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সে লাঠিখানা ভদ্রসমাজে একেবারে অচল, আমি কিন্তু সেটাকে খুবই ভালোবাসি, কারণ সে আমাকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে এসেছে।

মাথার ওপোর বৃষ্টি পড়ছে কখনও টিপ্ টিপ্, কখনও টপ্ টপ্ করে, পায়ে ভীষণ কাদা ও নিদারুণ পিছল, রাস্তা সরু, তার একদিকে উঁচু পাহাড় অন্যদিকে ক্ষিপ্রগতি লম্বোদরী নদী, রাস্তাটা খালি চড়াই আর চড়াই, এইভাবে আট মাইল অতিক্রম করে কতকগুলো কাঠের নড়বড়ে অস্থায়ী সেতু পার হয়ে বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় এসে পৌঁছান গেল চন্দনবাড়ী নামক স্থানে। চন্দনবাড়ীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯,৫০০ ফিট। এক্ষণে লম্বোদরী নদীর তীরে গাছপালা ঘেরা খানিকটা সমতল ভূমি, তার দুই পাশে নদী, অন্য সব দিকে জঙ্গল। পহেলগাঁও-এর পরে প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত লোকালয় ছিল, কিন্তু এখানে আর কোন লোকালয়ের চিহ্ন নেই, খবরের কাগজ নেই, পোষ্ট অফিস টেলিগ্রামের কোন বালাই নেই। যাত্রীদের ক্যারাভ্যানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে চলন্ত হাঁসপাতাল, চলন্ত থানা, দোকান, চায়ের হোটেল, সরকারী প্রচার বিভাগ—সমস্তই ঘোড়ার পিঠে, সেই সঙ্গে একটা ব্যাটারী দেওয়া বেতার যন্ত্রও। সব আগে 'ছড়ি' অর্থাৎ কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান পুরোহিত অমরনাথজীর পূজার প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ দুইটি রৌপ্য দণ্ড চতুর্দ্দোলে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ১৭ই আগষ্ট প্রত্যুষে সেই ছড়ির পূজা দিয়ে অমরনাথজীর মন্দিরে প্রথম পূজার বৌনি হবে। এই ছড়ি প্রত্যহ ভোর ৫টার সময় বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকে কতকগুলি সন্ন্যাসী, তাদের পেছনে চলে ক্যারাভ্যান। বেলা ১১।১০ পর্য্যন্ত এইভাবেই যাত্রীরা প্রত্যহ অগ্রসর হয়ে থাকে।

চন্দনবাড়ীতে তাঁবু খাটিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উনান বার করে তাইতে কাঠকয়লা জেলে ভাত তরকারী রাঁধা হোল, গুঁড়ো দুধ দিয়ে চা ইত্যাদি তৈরী হোল। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসন মেজে অন্যান্য তাঁবুতে গল্প করতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। তখন তাঁবুর মধ্যে শয়ন করা গেল।

পরের দিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে প্রাতঃকৃত্য সেরে পাউরুটী এবং

গুঁড়ো দুধ গুলে খেয়ে মালপত্র সমস্ত বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে পুনরায় হণ্টন। দ্বিতীয় দিনে স্থানে স্থানে বরফ মিলতে লাগ্‌লো। একশ' গজ দেড়শ' গজ বরফের চাপের ওপোর দিয়ে হেঁটে একটা প্রচণ্ড উঁচু চড়াই পার হয়ে আরও সাত মাইল দূরে একটা পরিষ্কার জায়গায় এসে হাজির হওয়া গেল। এটাও লম্বোদরী নদীর তীরে অবস্থিত। জায়গাটার নাম শেষনাগ, একটি হ্রদ আছে, তার নাম শেষনাগ হ্রদ। কিন্তু এখানে কেউ তাঁবু ফেলে না।

শেষনাগ থেকে দূরে একটি বরফ ঢাকা পাহাড় চোখে পড়ে। শুনলাম, সেইটাই বিখ্যাত কৈলাস পর্ব্বত। শেষনাগ হ্রদ থেকে আরও প্রায় এক মাইল এগিয়ে এসে বায়ুজান নামক স্থান। এই বায়ুজানেই তাঁবু ফেলা হয়। এখানেও পূর্ব্বের অবস্থা। কন্‌কনে বরফ গলা জলই সম্বল, নিজের সঙ্গে যা আছে তাই দিয়েই জীবনধারণ। নদীর জল মাঝে মাঝে দেখা যাচ্চে, আর অধিকাংশই বরফে ঢাকা পড়ে আছে। সে বরফ এত জমাট যে, তার ওপোর দিয়ে মাল বোঝাই অশ্বশ্রেণী অবলীলাক্রমে চলে যাচ্চে। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ বুধবারে বৃষ্টি আর ছিল না, কাজেই রাস্তায় পিচল ছিল কম। বায়ুজানে এসে রান্না খাওয়া শেষ করে হাসপাতাল ক্যাম্পে বসে সামান্য গল্প করতেই রাত্রি হয়ে গেল।

পরের দিন যথারীতি মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা। এইদিন চড়াই বড়ই উৎকট। বরফও অনেক। অমরনাথজীর গুহা মন্দির যদিও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে বারো হাজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত, তবুও কিন্তু রাস্তাটি এখানে ১৪,০০০ ফিট ওপোর দিয়ে চলে গেছে। ঠাণ্ডায় একাদিক্রমে কোথায় সিকি মাইল, কোথাও আধ মাইল বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। এইভাবে পুনরায় আট মাইল পার হয়ে এসে উপস্থিত হওয়া গেল আর একটি তাঁবু ফেলার উপযুক্ত স্থানে, তার নাম পঞ্চতর্ণী। পাঁচটি সরু সরু জলের ধারা এখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্চে। পূর্ব্বের সেই লম্বোদরী নদী আর এখানে নেই। ধারে কাছে গাছ পালা বলে কিছুই নেই, পাহাড়ের ওপোর গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ও ছোট ছোট ফুল আছে। কোনরূপ পশু ত নেইই, এমন কি পাখীও একটাও নেই। চারিদিকে তুষার রাজ্য সুরু হয়ে গেছে। রান্না খাওয়া করতে গিয়ে সকলেরই এক অভিযোগ, ভাত সেদ্ধ হয় না। তিব্বতের অভিজ্ঞতা থেকে আমার জানা ছিল যে, এই সব উঁচু পাহাড়ের ওপোর সাধারণ জলে ভাত সেদ্ধ হয় না, এ সব জায়গায় ভাতের হাঁড়ীতে বেশ খানিকটা ঘি দিয়ে ঘি-ভাত করলে তবে সিদ্ধ হয়। সেই বুদ্ধিই করা গেল। কিন্তু তাতেও ভাত-ডাল বেশ ভালো সিদ্ধ হলো না। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, উঁচু জায়গায় আবহাওয়ার চাপ কম হওয়ায় একশ' সেণ্টিগ্রেড্‌ উত্তাপের বহু পূর্ব্বেই জল ফুটে যায়, কাজেই চাল ডাল ঠিক মত সিদ্ধ হয় না, তবে ঘি দিলে ঘি-এর ফুটমান তাপ অনেক বেশী বলে জলটা আরও কিছু গরম হয় এবং চালকে সিদ্ধ করতে কিছুটা সাহায্য করে। যাই হোক্‌, আধ-সেদ্ধ ডাল ভাত উদরস্থ করে ওভারকোট ও কান-ঢাকা টুপি পরে কম্বল চাপা দিয়ে তাঁবুতে শুয়ে পড়া গেল।

বৃহস্পতিবার রাত্রিতে প্রায় একটা নাগাদ একবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লুম। সত্যি, কবিত্ব করার মত জায়গা বটে! পূর্ণিমার চাঁদের আলো সমস্ত আকাশ ও পাহাড়কে ছেয়ে ফেলেছে। ঘন নীল তারাখচিত আকাশের মধ্যে মধ্যে মেঘ ভাসছে। চারিধারে বরফ-ঢাকা পাহাড়, আশে পাশে সাদা সাদা তাঁবুগুলি চাঁদের আলোয় ঠিক যেন মায়াপুরী সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের কোলে পাহাড়ী ঝরণা ও নীচে নদীর ছোট ছোট ধারাগুলি ছুটছে যেন গলান রূপার স্রোত, কোথাও কোন বিশেষ শব্দ নেই, কেবল জলস্রোতের একটানা কলকল প্রবাহধ্বনি। কোন কোন তাঁবুর মধ্যে হ্যারিকেন জ্বলছে, সন্ন্যাসীরা খোলা জায়গায় দলা পাকিয়ে কম্বল চাপা দিয়ে আধ-বসা আধ-শোয়া অবস্থায় রয়েছে, তাদের ধুনি থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে, আর মধ্যে মধ্যে ওভারকোট পরা প্রহরী লাঠী হাতে দাঁড়িয়ে সমস্ত জায়গাটায় নজর দিচ্ছে। কবিত্ব করার সুযোগ ওরা দিলে না। ওদের মধ্যে একজন কাছে এগিয়ে এসে বল্লে, বাইরে থাকার হুকুম নেই, 'তম্বুকা অন্দরমে যাইয়ে'। শীত সহ্য করে তবুও থাকা যায়, কিন্তু পুলিসের হুকুম অমান্য করে থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য মনে মনে আশ্বস্তও হলুম। আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা দেখে সত্যিই খুশি হলুম। কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগ্‌লো, এখানে চোর কোথায়? কে জানে, হয়ত যাত্রীদের মধ্যেও কেউ কেউ বাণিজ্য করতে এসেছে।

পরের দিন, অর্থাৎ শুক্রবার ভোর থেকে পুনরায় টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু হোল। বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই 'ছড়ি' বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টিতেই আমরা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে হাতমুখ ধুয়ে নিলুম। আজই শ্রীঅমরনাথজীর দর্শন মিলবে। অমরনাথ এখান থেকে মাত্র ৪ মাইল দূরে। কিন্তু প্রচণ্ড শীত। আর বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌লো। এখান থেকে ব্যবস্থা হচ্চে এই যে, তাঁবু ও মালপত্র এইখানেই পড়ে থাকে, বোঝাওয়ালা ঘোড়ার কুলীরা এই তাঁবু ও মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে, আর যাত্রীরা চার মাইল উপরে অমরনাথজীর দর্শন ও পূজা সমাপন করে এই পঞ্চতরণীতে ফিরে এসে রাত কাটায়। কারণ অমরনাথে রাত্রিবাসের উপযুক্ত কোন জায়গাই নেই।

বৃষ্টি মাথায় করে বেরুলাম। রাস্তায় ভীষণ পিচল হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে বরফের প্রকাণ্ড চাপ পার হতে হয়। সেগুলোও কম পিচল নয়। এক মাইল যাওয়ার পর এত বেশী পিচল ও সরু রাস্তা এত বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে যে, পুলিশ থেকে ঘোড়া, ডাণ্ডি, পাল্কী ইত্যাদি সমস্ত বাহন বন্ধ করে দিলে। যারা পায়ে হাঁটতে একেবারে অক্ষম, তাদের দেখেছি পথের ধারে দাঁড়িয়ে একেবারে অঝোরে কাঁদতে। এত কষ্টের পর মাত্র তিন মাইল দূর থেকে তাদের ফিরে যেতে হোল, দর্শন মিল্‌লো না। যারা এগোচ্ছে, তারাও যেন প্রতিপদে মৃত্যুর পরশ লাভ করছে। প্রতিবার পা ফেলার পর পা পিছ্‌লে এক বিঘত বা এক হাত দূরে সরে পুতে গিয়ে তবে দাঁড়ানো যাচ্চে, অথচ দু'হাত দূরেই পাঁচ ছ' হাজার ফিট গভীর খদ্‌। শুনলাম, আমাদের পূর্ব্বের কয়েকজন যাত্রী ঐ খদের অজ্ঞাত গহ্বরে শেষ আশ্রয় লাভ করেছে। আমার মাতা, স্ত্রী ও শিশুপুত্র একহাতে ঘোড়াওয়ালা বা পাণ্ডাদের হাত ধরে অপর হাতে লাঠী নিয়ে পদব্রজে এগিয়ে পড়েছিল। ওরা সকলেই বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে গেছে, আমরা সকলেই ভিজে মাথা ও ভিজে সোয়েটারে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা মেখে ছুঁচের মত ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লুম। যাত্রীদের সকলেরই এক অবস্থা, কেবল মধ্যে মধ্যে অমরনাথজীকি জয় চিৎকার করে যাত্রীরা তাদের অস্তিত্বকে সগৌরবে ঘোষণা করছিল।

(ক্রমশঃ)

নিরুপমা দেবীর "দিদি"

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি, ডি-এস্-ই

বঙ্গভাষার উপন্যাস-সাহিত্য আজ পুরুষ এবং নারী ঔপন্যাসিক—উভয়ের অবদানেই সমৃদ্ধ। অবশ্য প্রতিভা জিনিষটা স্ত্রীপুরুষ-নিরপেক্ষ হইলেও সাহিত্যিক প্রতিভার কথা খানিকটা স্বতন্ত্র। কারণ সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং ব্যক্তিগত জীবন-সমীক্ষা খানিকটা থাকিবেই। ফলে নারী ঔপন্যাসিকের রচনায় নারীর বিশেষত্ব খানিকটা থাকিয়া যাইবেই।

সাধারণ পুরুষ নারীকে হয় দেবী করিয়া মাথায় করিয়া রাখিয়াছে, না হয় অবহেলা করিয়া গৃহলালিত আশ্রিত জীবের মত পুষিয়া রাখিয়াছে। এই দেবী করিয়া রাখিবার জন্য নারীর তরফ হইতে প্রতিবাদের প্রয়োজন ততটা হয় না, যতটা হয় তাহাকে অবহেলা করিয়া পুষিয়া রাখার জন্য। সেই জন্য মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের মধ্যে একটা বিদ্রোহের সুর, অধিকার বৈষম্যের জন্য অনুযোগের সুর, নিজেদের দাবী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সুর শ্রুত হওয়াই স্বাভাবিক। ইংরাজী সাহিত্যে Charlotte Bronteর Jane Eyre প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে এই বিদ্রোহিণী নারীত্বের সুরটি আমরা পাই।

নিরুপমা দেবীর মধ্যে কিন্তু এই বিদ্রোহিণী নারীত্বের সুরটি আমরা পাই না। যে নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার লইয়া বিতর্ক করিয়াছে, যৌন-নির্ব্বাচনে পুরুষের সঙ্গে প্রতিস্পর্দ্ধা করিয়াছে, প্রাচীন সতীত্বের আদর্শকে প্রশ্ন করিয়াছে, সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, নিরুপমা দেবী তাহাদের দলের কেহ নহেন।

সেইজন্য তাঁহার উপন্যাসগুলিতে আধুনিকতার বিশেষত্ব নাই। তাহাতে কল-কারখানার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-ভূস্বামী আভিজাত্যের পতনের কাহিনী নাই, রাজনৈতিক আন্দোলনের বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের ইতিহাস নাই; দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, কালোবাজার, সাম্যবাদ, শ্রমিক ধর্ম্মঘট—কিছুই নাই। তাঁহার উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী, কিরণময়ী, কমল, বন্দনা জাতীয় নারী নাই, রবীন্দ্রনাথের অমিট্ রায়, সন্দীপ জাতীয় পুরুষ নাই। তাঁহার নায়িকারা চটুল প্রেমাভিনয় করেনা, বব্‌ছাঁটে চুল কাটেনা, সিগারেট খায়না, বিবাহকে প্রেমের অনাবশ্যক বন্ধন বলিয়া মনে করে না।

তাহা হইলে তাঁহার উপন্যাসের বিশেষত্ব কি? তাঁহার বিশেষত্ব হইতেছে শিল্পীর শিব-সুন্দরের আদর্শকে অব্যাহত রাখিয়াই ভারতের প্রাচীন হিন্দু-সমাজের আদর্শকে শ্রদ্ধার সহিত সমর্থন। আমাদের হিন্দুর দেবতা রামচন্দ্র স্বামী হিসাবে হয়ত সীতাদেবীর প্রতি আদর্শ স্বামীর কর্ত্তব্য করিতে পারেন নাই। তবুও আমাদের দেশের ছোট ছোট কুমারীর দল "সীতার মত সতী হইবার জন্য, রামের মত পতি পাইবার জন্য"—তাহাদের অন্তরের কামনা জানায়। আমাদের দেশের মেয়েলী ব্রতকথার মধ্যে "স্বামীর কোলে পুত্র দোলে, মরণ হয় যেন এক গলা গঙ্গার জলে"—এই কামনার মধ্যে ভোগের চেয়ে একটা ত্যাগের মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই ত্যাগ ও আত্মবিলুপ্তির আদর্শই হইয়াছে ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ। এই আদর্শ হয়ত চিরন্তন নাও হইতে পারে। তবে এই আদর্শেরই জয়গান নিরুপমা দেবী করিয়াছেন।

আমাদের সমাজের বিচ্যুতিগুলি যে তাঁহার চোখে পড়ে নাই, তাহা নহে। আমাদের সমাজে স্বামীপুত্রহীনা বিধবার নিরালম্ব নিঃসহায় অবস্থা, দুর্ভাগা রমণীর জীবনের ব্যর্থতা, দাম্পত্য জীবনে ভুল বুঝাবুঝির জন্য নারীর লাঞ্ছনা ও অবহেলা, এই সমস্ত নিরুপমা বেশ দরদের সঙ্গেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

কিন্তু তবুও তিনি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি দেখাইয়া তাহার বিরুদ্ধে আমাদের উত্তেজিত করেন নাই, প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নূতন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করেন নাই, সতীত্ব ও পত্নীত্বের আদর্শ ও অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নূতন নূতন মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করেন নাই। অথচ এই প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যে নারীর জীবনে কতখানি ট্র্যাজেডির উপাদান রহিয়াছে, তাহা তাঁহার রচনার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়। ঔপন্যাসিক হিসাবে এইখানেই তাঁহার নারীত্ব।

নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের সংখ্যা অধিক নহে। কিন্তু যে কয়েকটি উপন্যাস তিনি লিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। তাঁহার অন্নপূর্ণার মন্দির বিধিলিপি, শ্যামলী প্রভৃতি উপন্যাসগুলি অনুভূতির বিশ্লেষণে, ভাষার সংযত প্রকাশে, কবিজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গীতে, এবং সুচিন্তিত জীবন সমালোচনায় সমৃদ্ধ।

কিন্তু এই উপন্যাসগুলি সুন্দর হইলেও ইহাদের দিয়া নিরুপমা দেবীর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার "দিদি" উপন্যাসটির মধ্য দিয়াই পাইতে হইবে। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, ঘটনার বিন্যাস ও পারম্পর্য্যে, পরিণতির স্বাভাবিকতায়, প্রেমের বিরোধ এবং ভুল বুঝাবুঝির লুকোচুরি খেলায়, বিরোধের সমাধানের পথে জোয়ার ভাঁটার লীলায়, অভিমানের সহিত আত্মনিবেদনের রক্তাক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের বেদীমূলে অহঙ্কারের অনিবার্য্য আত্মসমর্পণে এই উপন্যাসটি একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়াছে। এই হিসাবে এই উপন্যাসটি দাম্পত্য-তন্ত্রের গীতা হইয়া থাকিবে।

উপন্যাসের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—দেবেন ও অমর দুইটি বন্ধু ছুটিতে শিকারের অভিযানে দেবেনদের গ্রামের দিকে যাইতেছে। এইখানে

চারুর সহিত ইহাদের দেখা হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম (love at first sight) যাহাকে বলে, তাহার মধ্যে সংস্কৃত কবি বর্ণিত "তারা মৈত্রী" বা জন্মান্তরপ্রসারী প্রেমের অনিবার্য্য ভবিতব্যতা হয়ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী ক্ষেত্রেই থাকে খানিকটা মোহ, খানিকটা চোখের নেশা। আদর্শবাদিতা দিয়া এই প্রথম দর্শনে প্রেম জিনিষটা সব সময়ে ঠিক সমর্থন করা যায় না। চারু ও অমরের মধ্যে এই প্রথম-দৃষ্টি-গত প্রেমদৃষ্টি হয় নাই। চারুর বালিকাসুলভ সৌন্দর্য্য অমরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং চারুকে তাহার ভালও লাগিয়াছিল।

দরিদ্র বিধবার কন্যা চারু পীড়িত হইল। ডাক্তারি কলেজের ছাত্র হিসাবে অমর তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিল, চারু ভাল হইয়া উঠিল। ফলে চারুর তরফ হইতে আসিল কৃতজ্ঞতা, আর অমরের তরফ হইতে অনুকম্পা। চারুর মা অমরকে একজন আত্মীয় এবং সমর্থ আশ্রয় হিসাবে পাইয়াছে এবং চারুর জন্য একটি যোগ্য পাত্র খোঁজ করিবার জন্য অমরকে অনুরোধও করিয়াছে।

পাড়ার ছেলে দেবেনের মুখে বিধবা মাতা এমন আশ্বাসও পাইয়াছে, অমরই চারুকে বিবাহ করিতে পারে।

ইতোমধ্যে অমর চারুকে কয়েক বার দেখিয়াছে এবং ক্রমশঃ—এই নিরাশ্রয়া সরলা সুন্দরী বালিকাটির প্রতি তাহার ভাললাগাটা ভালবাসায় পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। অমরের পিতা জমিদার হরনাথবাবু অন্য একজন জমিদারের একমাত্র কন্যা সুরমার সহিত অমরের বিবাহের কথা পাকাপাকি করিয়া ফেলিয়াছেন।

অমর তাহার পিতার নিকট তাহার হৃদয়াভিযানের গোপন কাহিনীটি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, অথচ সুরমাকে বিবাহ না করিবার স্পষ্ট কারণও কিছুই দেখাইতে পারে না। অগত্যা এই বিবাহে তাহাকে সম্মতি দিতে হইল।

সম্ভপরিণীত স্বামীর নিকট হইতে সাধারণ বধূ যতটুকু প্রীতির নিদর্শন পায়, সুরমার ভাগ্যে তাহা জুটিল না। সুরমা জানে না, কি অপরাধ সে করিয়াছে। কিন্তু তবুও অকারণেই সে উপেক্ষিতা হইল। ফুলসজ্জার রাত্রিতে বরবধূতে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত হইল না। কিন্তু সুরমাও উপেক্ষার পাত্রী নহে, সেও জমিদারের একমাত্র কন্যা, আদরের দুলালী। উপেক্ষা উপেক্ষাকে জাগ্রত করে, তাই অমরের নিকট উপেক্ষা পাইয়া সুরমাও অমরকে উপেক্ষা করিয়াও এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

এই বিবাহে অমরের তৃপ্তি ও সম্মতি ছিল না। সেইজন্য এই বিবাহের খবরটুকু সে তাহার বন্ধু দেবেনকে জানায় নাই। ইহার ফলে অমর ও সুরমার জীবনের জটিল গ্রন্থির জট্ আরও জটিলতর হইয়া উঠিল।

চারুর মাতা মৃত্যুশয্যায়। অমর তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। নিমজ্জমান ব্যক্তি যে ভাবে কুটিটিকেও অবলম্বন করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে, চারুর মাও অমরকে পাইয়া সেইরূপ চেষ্টা করিল। দেবেনের হাতে সে কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারে না, কারণ দেবেন ব্রাহ্মণ, আর তাহারা হইতেছে কায়স্থ। কিন্তু অমর তাহাদের স্বজাতি এবং পরিচিত—আত্মীয় স্থানীয়—চারুকে সে স্নেহও করে। কাজেই মৃত্যুর সময় অনন্যোপায় হইয়া সে চারুর হাতটি লইয়া অমরের হাতে সমর্পণ করিল। এই সমর্পণের অর্থ সুদূরপ্রসারী। অমর ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধু দেবেন সে বাধা মানিল না, চারু ত খারাপ পাত্রী নয়, বৃদ্ধা বিধবাও সে বাধা মানিল না। অমর বলিতে চাহিল যে সে বিবাহিতা, কিন্তু এই কথাটি উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা মারা যাইলেন।

চারু অমরের হাতে পড়িল। চারুকে লইয়া অমর পিতৃ-গৃহে উঠিতে পারিল না; তাহার কলিকাতার বাসায় লইয়া আসিল। এই খবরটিও সে পিতার নিকট পাঠাইতে পারিল না। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, পিতার নিকট খবরটি পাঠানো ততই লজ্জা ও অসুবিধার ব্যাপার হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম এই অসুবিধাটি ছিল অমরের দিক হইতে। এখন আবার চারুর দিক হইতেও অসুবিধা হইল। চারু অন্যত্র থাকিতে চায় না, অপরকে বিবাহও করিতে চায় না। ইহা অমরের প্রতি প্রলুব্ধা নাগরীর পূর্ব্বরাগ নহে। সে বালিকা-সুলভ অসহায় মনোভাব লইয়া অন্য অপরিচিতের আশ্রয়ে যাইতে সাহস করে না। শুধু তাহাই নহে, চারু জানিয়াছে তাহার মা তাহাকে অমরের হাতেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অমরই তাহার স্বামী।

এ ক্ষেত্রে চারুকে বিবাহ না করিলে সমস্যার সমাধান হয় না। কিন্তু এক একজন লোক এমনই একটা ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে এক জায়গার জট্ খুলিতে যাইলে তাহার জীবনের জট্ অন্য জায়গায় আরও গভীরতর ভাবে জড়াইয়া যায়।

অমরেরও তাহাই হইল। অমর চারুকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিল এবং সেই জন্য প্রথমা স্ত্রী সুরমা ও পিতার নিকট অনুমতি চাহিতে গেল।

পূর্ব্ব হইতেই একটা পরিচয় ও হৃদ্যতা থাকিলে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিয়াও আমরা হয়ত আত্মীয়ের অন্যায় অনুরোধও রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু অমরের সহিত সুরমার এমন একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই যাহাতে সুরমা অমরের এই অনুরোধটুকু রাখিতে পারে। যে স্বামী ফুল-সজ্জার রাত্রিতে একটি সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করে নাই, পরে নিজের স্ত্রীকে নিজের শয়ন কক্ষে দেখিয়া যে চিনিতে পর্য্যন্ত পারে নাই, সেই স্বামীটি যদি প্রথম সম্ভাষণে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে যে তাহার বর্ত্তমানে সে অন্য একটি স্ত্রী বিবাহ করিয়া একটি সপত্নী ঘরে আনিতে পারে কি না, তাহাতে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া প্রথমা স্ত্রীর যেরূপ উত্তর দেওয়া সম্ভব, সুরমা সেই-টুকুই দিয়াছিল।

আচার্য্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন "সুরমার মধ্যে অন্য সদ্‌গুণ যাহাই থাকুক না কেন, নববধূ সুলভ ও লজ্জা সঙ্কোচের একান্ত অভাব ছিল। প্রথম হইতেই একটা কর্ত্তৃত্বাভিমানের সুর, একটা অসঙ্কোচ বৈষয়িক আলোচনার ভাব মাথা উঁচু করিয়া প্রেমের রঙিণ স্বপ্নকে টুটাইয়া দিয়াছে। অমরও নিজ ব্যবহারের মধ্যে অপরাধীর লজ্জিত ভাবটি ফুটাইতে পারে নাই; একটা স্পর্দ্ধিত উপেক্ষার সুর তাহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে প্রকট হইয়া স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান

সুস্পষ্টতর করিয়াছে।" অমর সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য কথা, কিন্তু সুরমা সম্বন্ধে তাঁহার বিচার বোধহয় একটু কঠোর হইয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে অমরনাথই শুধু জমিদার-নন্দন নহেন, সুরমাও "রাজার নন্দিনী প্যারী", পিতার একমাত্র কন্যা, আদরের দুলালী। সে ও অনেক আশা করিয়াই স্বামীর গলায় মালা দিয়াছিল। সেই আশায় সে পাইয়াছে ব্যর্থতা এবং অপরাধী স্বামীর নিকট হইতে অপমান। কাজেই সে যখন অন্য নারীকে বিবাহ করিবার জন্য অমরনাথের প্রস্তাবটি শুনিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটি কোথায়?"

"মেয়েটি? চারু? সে আমার কলকাতার বাসায়"

"কলকাতার বাসায়? তা হ'লে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস থেকেই সে সেখানে আছে? কৈ এতদিন ত আমরা এর কিছুই জানি না।"

অমরনাথ একটু গরম হইয়া উঠিল। সুরমার কথায় যেন একটা কর্তৃত্ব ও তিরস্কারের ভাব মিশান বলিয়া অমরনাথের মনে হইল সে বলিল—"না জানাতে বেশী অন্যায়ের বিষয় কিছুই হয়নি!"

সুরমা কিন্তু এই যুক্তি মানিয়া লইতে পারিল না এবং এই বিবাহে সম্মতিও দিতে পারিল না। ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

এই বিরোধ এবং বিরোধগত ট্রাজেডির মধ্যে সুরমার চরিত্রগত ত্রুটি কিছু ছিলনা, ছিল শুধু ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি!

অমরনাথ চারুকে বিবাহ করিল—পিতা এবং সুরমার সম্মতি না পাইয়াই। ফলে সে পিতা হরনাথবাবু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। হরনাথের স্নেহ এবং সংসারের দায়িত্ব সুরমার উপর পড়িল। অমরনাথ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতে লাগিল।

ইহার পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। হরনাথবাবু এখন মৃত্যু-শয্যায়। তাঁহাকে দেখিতে আসিবার জন্য অমরের ডাক পড়িয়াছে। অমর চারুকে লইয়া পিতৃগৃহে আসিল।

পিতার মনে আঘাত দিয়া তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া চারুকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া অমর আজ আত্মগ্লানি ও অনুতাপে পূর্ণ—।

হরনাথবাবু মৃত্যুশয্যায় অমরনাথকে ক্ষমা করিলেন এবং তাহার নব-পরিণীতা পত্নী চারুকেও গ্রহণ করিয়া সুরমার হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিলেন। সুরমাও চারুকে বুকে টানিয়া লইল। কিন্তু অমরনাথকে ক্ষমা করিবার জন্য তিনি সুরমাকে কোনও অনুরোধ করিতে পারিলেন না। অমরনাথও সুরমার নিকট ক্ষমা চাহিতে পারিল না।

রোগীর সেবাশুশ্রূষার ব্যাপার লইয়া সুরমা অমরনাথের সঙ্গে প্রয়োজন-মত দুই একটি কথাবার্ত্তা কহে বটে, কিন্তু তাহার বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইহাদের মধ্যে হইল না।

হরনাথবাবুর মৃত্যু হইল। তাঁহার অসুখ উপলক্ষে সুরমা ও অমরনাথের বিচ্ছেদটুকু যেভাবে সংযুক্ত হইয়া আসিতেছিল, তাহা আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অমরনাথ বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সংসারের দায়িত্ব তাহারই, সুতরাং সুরমার তরফ হইতে সংসারের বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই। সুরমা সংসারের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু এ পরিবারে অমরনাথ অনেকদিন পর হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ সংসারের দায়িত্ব সে সামলাইতে পারিল না। হয়ত তাহার যোগ্যতাও নাই, চারুও বালিকা এবং অত্যন্ত সরলা। সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অমরনাথ বাধ্য হইয়া সুরমার সাহায্য চাহিল। কিন্তু সুরমা তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল।

কিন্তু চারু ছাড়িবার পাত্রী নহে, সে যেমন সরল, তেমনই নির্ভরশীল, গৃহিণীপনা তাহার ভাল লাগে না, ঝি চাকর তাহাকে মানে না, সে সুরমাকে দিদির মতই ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, সংসারের ভার সুরমাকে লইতেই হইবে। অগত্যা এই ছোট বোনটির জন্য সুরমাকে সংসারের ভার গ্রহণ করিতেই হইল। কিন্তু অমরনাথকে সে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করিল না, সে শুধু চারুর স্বামী, তাই চারুর দিদি সুরমা অমরনাথের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হিসাবে দূরে দূরে রহিল,—কামনা বাসনা ও মান-অভিমানের ঊর্দ্ধ লোক-চারিণী অনধিগম্যা দেবীর মত।

কিন্ত এই ঊর্দ্ধ লোক-চারিণী দেবীটি অমরনাথের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিপক্ব হইয়া প্রেমের আকর্ষণে পরিণত হইতে লাগিল।

চারুর নবজাত পুত্র অতুলও মায়ের চেয়ে সুরমাকেই বেশী চায়, তাহারই নিকট সে মানুষ হয়।

অতুলের অসুখের সময় সুরমা যেরূপ নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও স্নেহের সহিত তাহার সেবা করিয়াছিল, তাহাতে অমরনাথ সুরমার প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও প্রীতিতে আরও মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। পরে এই আকর্ষণ আরও তীব্র ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মুঙ্গেরে রোগশয্যার মস্তিষ্ক বিকারের সময় অমরের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়টি অসংশয়িতভাবে সুরমার নিকট প্রকাশ পাইল।

সুরমার নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। অন্তর্দ্বন্দ্ব নিজের বুকেও আছে;—অধুনা এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মিলনাকাঙ্ক্ষা অমরনাথের মধ্যেও আসিয়াছে। স্বামী জিনিষটি যে সুরমার নিকট কাম্য বস্তু নয়, তাহা নহে। কিন্তু যে চারুকে সে কিছুদিন পূর্ব্বে ছোট ভগিনী বলিয়া বুকে তুলিয়া লইয়াছে তাহারই সহিত সপত্নীত্বের আচরণ করিয়া স্বামী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। প্রেম তাহার অন্তরের সাধনা, কিন্তু প্রেমের স্বার্থকতা লইয়া স্বামীকে প্রেমের ফাঁদে ধরিবার জন্য প্রতিযোগিতা করা তাহার নিকট অত্যন্ত ঘৃণার ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। ইহা ছাড়া তাহার প্রাথমিক অভিমানটুকুও এখনও কাটিয়া যায় নাই। সেই জন্য অমরনাথের ব্যাকুল প্রেম নিবেদনকে সে অত্যন্ত রূঢ়-ভাবেই অস্বীকার করিল। এই অস্বীকার করার সময় হয়ত তাহার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও সে অমরনাথকে কঠোর আঘাত দিয়াই অমরনাথের সহিত কোনও সম্পর্কই স্বীকার করিল না। সে বলিল, শুধু চারুর স্বামী হিসাবেই অমরনাথের বন্ধুত্বকে সে স্বীকার করিয়াছে, ইহা ছাড়া অমরনাথের সঙ্গে আর কোনও বন্ধনই সে স্বীকার করে না।

ইহার পর সে অমরনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে পিতৃগৃহে বাস করিবার জন্য চলিয়া আসিল। এই বিদায়-গ্রহণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর উদারতা ও ব্রতচারিণীর কঠোর নিষ্ঠা যতখানি ছিল, খণ্ডিতা নায়িকার অভিমান-ক্ষুব্ধ অসহযোগিতা ও বিদ্রোহ ততখানিই হয়ত ক্রিয়াশীল ছিল।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইল। সুরমার আজ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লান্ত অবসন্ন। জীবনের ব্যর্থতা আর যেন সে বহন করিতে পারে না। তাই জীবন হইতে পলায়ন করিয়া স্নেহশীল পিতার বুকে বানবিদ্ধ পাখীর মত ফিরিয়া আসিয়াছে এবং দয়িত-সঙ্গ সুখ-বঞ্চিতা নারী তাহার হৃদয়ের অনাঘ্রাত প্রেম কুসুম দেবতার চরণে অর্পণ করিয়া এবং সাংসারিক কাজ-কর্মের মধ্যে আত্মবিলুপ্তি সাধন করিয়া, বুকের ক্ষত জুড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। চারু মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া চিঠি পত্র দেয়, দুই এক বার অতুলকে সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত দেখা করিতেও আসিয়াছে, কিন্তু সুরমার দুর্ভেদ্য নির্লিপ্ততা তাহাতে অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়।

এখানেও সুরমার সমস্যা অন্য দিক দিয়া দেখা দেয়। তাহার স্নেহাস্পদ উমা বালবিধবা। সুরমা দুর্ভাগা, আর উমা বিধবা। উমার ভাবী জীবনের ব্যর্থতা সুরমা অনুভব করে। উমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের হৃদয়রসকে সে পূজা অনুষ্ঠানের খাতে প্রবাহিত করাইয়া তাহার শুচিতাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টায় বাধা দেয় সুরমার বাল্যবন্ধু এবং দূরসম্পর্কীয় ভাই প্রকাশ। সে গোপনে উমার সহিত দেখা শুনা করে, মিষ্ট কথা বলে, হৃদয়াভিযান চালায়। বালিকা উমার তাহা ভালই লাগে, যদিও এই ভাললাগার পরিণাম কি সে জানে না। সুরমা ভীতা হইয়া উঠে, এই অবাঞ্ছনীয় মিলন সে ঘটাইতে দিতে পারে না। সে উমাকে চোখে চোখে রাখে, প্রকাশের অভিযানকে পদে পদে ব্যাহত করে, এবং শেষ পর্য্যন্ত এই অনীতিমূলক প্রেমকে নির্ম্মমভাবে বিনষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর হয়। শেষ পর্য্যন্ত সুরমারই জয় হইল। আজন্ম-বঞ্চিতা মাতুলালয়-প্রতিপালিতা প্রীতি-বুভুক্ষু-মন্দাকিনীর সহিত প্রকাশের বিবাহ দিয়া প্রকাশের উমামুখী প্রেমকে সে ভিন্ন মুখে প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত হয় নাই। প্রেমের শক্তি ও গতিবেগ প্রকাশ অনুভব করিয়াছে। উমার প্রতি দাবী সে সহজে ছাড়ে নাই। সে সুরমার সমবয়সী, তাই সহজে সুরমার ব্যবস্থায় আত্মসমর্পণ করে নাই। সে সুরমার সহিত তর্ক করিয়াছে এবং সুরমার হৃদয়ের নিরুত্তাপ অনাসক্তিকে ও ব্রতচারিণীসুলভ ব্রহ্মচর্যকে সমালোচনা করিয়াছে। সুরমা জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার মনে হইয়াছে যে স্বামীর প্রতি তাহার কোমলতাহীন আচরণ হয়ত ঠিক হয় নাই, হয়ত ইহার মূলে আছে অভিমান ও দম্ভ, হয়ত ইহার চেয়ে আত্ম-নিবেদনই ছিল নারীর শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য !

সুরমার এই আত্ম-জিজ্ঞাসা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বিক্ষোভটি মন্দাকিনীর আচরণে আরও আবর্ত্তসঙ্কুল হইয়া উঠে। প্রকাশ উমাকেই ভালবাসিয়াছিল, মন্দাকিনীকে নহে। কাজেই মন্দাকিনীর সহিত যখন তাহার বিবাহ হইল, সে তখন সোজাসুজি মন্দাকিনীকে ভালবাসিতে পারিল না। কিন্তু আজন্ম-সুখ-বঞ্চিতা আত্ম-সুখ-উদাসিনী প্রতিদান-কামনা-রহিতা মন্দাকিনী প্রকাশের নিকট হইতে স্নেহ ভালবাসার কিছুই না পাইয়াও যেটুকু মাত্র পাইল, তাহাতেই সে নিজেকে কৃতার্থা ও বহু ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সুরমার ইহাতে সশ্রদ্ধ বিস্ময় লাগে। স্বামীর প্রতি তাহার ক্ষমাহীন কঠোর আচরণের সহিত মন্দাকিনীর নিষ্কাম আত্ম-নিবেদনের ঠিক তুলনা হয় না।

প্রগতিবাদিনী নারীর পক্ষে পতি-প্রেম না পাইয়াও পতি-সেবা বা পতি-নিষ্ঠা জিনিষটা হয়ত আত্ম-মর্য্যাদার হানিকর। কিন্তু মন্দাকিনীর শিক্ষা দীক্ষা তাহাকে প্রগতিবাদিনী করিয়া পুরুষের সহিত সম-অধিকারের দাবীতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে নাই। যে অবহেলার মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে, তাহাতে স্বামীর এই উদাসীনতা তাহাকে নূতন করিয়া কিছু আঘাত দিতে পারে নাই, তাই সুভগা না হইয়াও সে শুধু "এয়োতির" গৌরবে, পত্নীত্বের গৌরবেই নিজেকে সুখী মনে করিতে পারিয়াছে। তাহার কামনা বেশী ছিল না ; কাজেই যেটুকু সে পাইয়াছে, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইয়াছে ; আর যেটুকু সে পায় নাই, তাহার জন্য স্বামীকে দোষ না দিয়া নিজেকেই অপরাধী বলিয়া মনে করিয়াছে। কাজেই তাহার ব্যবহার তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত না হইলেও মনোবিজ্ঞানের অনুমোদিত হইয়াছে। আর অমরনাথের প্রতি সুরমার যে আচরণ, তাহাও সুরমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল। তাহার আত্ম-গৌরববোধ, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার দম্ভ নিষ্ঠা ও শুচিতা তাহাকে অপরাধী স্বামীর স্পর্দ্ধিত উপেক্ষাকে উপেক্ষা দিয়াই প্রতিদান দিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

কিন্তু সুরমার এই আচরণ যতই যুক্তিযুক্ত হউক না কেন, যতই মনোবিজ্ঞানসম্মত হউক না কেন, সুরমা যতই নিজের আচরণের সহিত মন্দাকিনীর আচরণের তুলনা করে, ততই এই দরিদ্রা বঞ্চিতা তৃপ্তিময়ী নিষ্কাম প্রীতিস্নিগ্ধা বালিকার নিকট নিজেকে ছোট বলিয়া মনে করে। এখন তাহার মনে হয়, প্রেমের কারবারে পাওয়ার চেয়ে দেওয়া বড়, দাবীর চেয়ে দায়িত্ব বড়, সুখের চেয়ে সেবা বড়, দম্ভের চেয়ে আত্ম-নিবেদন বড়। সুরমার মনে প্রশ্ন জাগে—স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্যে নিজের অভিমানের জয়টাই কি এত গৌরবের ? স্বেচ্ছাকৃত পরাজয়ের কি কোনও গৌরবই নাই ? ভালবাসা পাওয়াটাই কি এত সুখের ? ভালবাসা দেওয়ার মধ্যে কি তাহার চেয়ে বেশী সুখ নাই ?

সুরমা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহার নিজের জীবন নিজের নিকট ব্যর্থ ও উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া মনে হয়, তাহার অভিমান ধ্বসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার সবল মন আর্ত্ত হইয়া উঠে, যে স্বামীকে সে চেষ্টা করিয়াও ক্ষমা করিতে পারে নাই, আজ তাহারই নিকট ক্ষমা চাহিবার জন্য তাহার মন যেন আতুর হইয়া উঠে।

ফলে চারুর অকৃত্রিম ভালবাসা ও সহস্র অনুযোগ অনুরোধ সুরমার যে উদাসীনতাকে টলাইতে পারে নাই, পুত্রপ্রতিম অতুলের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা যাহা করিতে পারে নাই, অমরের অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রেম-নিবেদন যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাই আজ সম্ভব হইয়া উঠিল। শেষ পর্য্যন্ত সুরমা অযাচিতভাবেই স্বামি-তীর্থে গমন করিল এবং "নিজেও কঠিন হৃদয়টিকে পথের ধারে" ফেলিয়া দিয়া "আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা" এই কথা বলিয়াই যেন সে আত্মনিবেদন করিল এবং চারুর সঙ্গেই পতিগৃহে তাহার স্থান বাছিয়া লইল।

চিরাশ্রিত বিরহ বেদনার এই ভাবে পরিসমাপ্তি হইল, পরস্পরের চোখের জলে ভুল বুঝাবুঝির পালা শেষ হইল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ফুলমণির বিয়ে

শ্রীবীণা দে

শের বাড়ীর মেয়ে শিমুল এসেছে বেড়াতে। বসে' গল্প করছি। রাত য় আটটা বাজে। শিমুল মেয়েটীর চোখ ঝল্‌সানো রূপ নেই—গুণ ছে যথেষ্ট। ছোটখাটো শ্যামলা রঙের মেয়েটী—একপিঠ চুল—মুখে সি—চোখে বুদ্ধির দীপ্তি—মুখে বিদ্যার প্রতিভা। অনাড়ম্বর মার্জ্জিত শভূষা। বি-এ পরীক্ষায় ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছে—সাহিত্য-রসিক —কবিতা লেখারও ঝোঁক আছে। কাজেই গল্প করে' সুখ ছে।

গল্প হ'চ্ছে—ফুলমণির গাঁয়ের—ফুলমণিকে নিয়ে। হঠাৎ না বলে' ঢুকে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল ফুলমণি। অবাক কাণ্ড!—সহসা ভূত দেখ্‌লেও লোকে এত চম্‌কায় না! "এ কী রে ফুলমণি—তুই এত রাতে" —কাঁধে হাত দিয়ে জিগেস করি—"ব্যাপার কী?"—

বলে—"চল্যে এল্‌হোম"

"চলে এলি তা' বেশ কর্‌লি, থাক্‌বি তো?"

ফুলমণি হেসে বলে—"না থাক্‌ব না—পালিং যেচি যে"—

"পালিয়ে যাচ্ছিস? সে আবার কী—একা একা—কোথায় পালাচ্ছিস্ এত রাতে?—তুই পালাবি তো আমার কাজ চ'ল্‌বে কী করে?"— একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করি আশঙ্কা উদ্বেগের সঙ্গে।

ফুলমণি বেশ হাসিমুখেই বলে—"না একা লয়—পালিং যেছি গুসকরা —উত্তর সাথেই—তু ক'দিন চালা কাজ কষ্ট করে'—আট ল দিন পরে ঠিক আস্‌ব কাজে—পালিং না গেলে পরে বিয়ে দিছে না"—

আমি তো থ। শিমুলের দিকে ফিরে হেসে বল্‌লুম—"এই সেই আমার ফুলমণি।" শিমুলও হেসে—"দেখা হ'য়ে গেল ভাল হ'ল"— ইত্যাদি বলে' নমস্কার করে' চলে' গেল।…

আমি ফুলমণির কাছ থেকে প্রশ্ন করে' করে' যা' মর্ম্মোদ্‌ঘাটন কর্‌লুম, তার সারমর্ম্ম হ'চ্ছে—

ফুলমণি লোপেশমাঝিকে ভালবেসেছে। লোপেশমাঝির বাড়ী ফুলমণির গাঁয়েই। ফুলমণি কাজ সেরে যখন রাইমণি আর দাসীর সঙ্গে বাড়ী ফির্‌ত, তখন প্রায় রোজই লোপেশ তার পিছু নিত! রাইমণি দাসী যেদিন 'কামাই' থাক্‌ত অর্থাৎ কাজে আস্‌ত না, সেদিনই লোপেশ ওর হাত ধরত—একদিন তো তালতোড়ীর বাঁধের ওধারে টেনেও নিয়ে গিয়েছিল।…

গেল বছর ফুলমণি যখন আমার বাড়ীর কাজ 'কামাই' করে' চন্দ্রামণির বুদ্ধিতে পড়ে' বর্দ্ধমানে ধান পুত্‌তে যায়—সেখানের জমী ছিল "দোষ-পাওয়া"—সেই "দোষ" ফুলমণিকে লাগে—ফুলমণি "বেহুঁস" হয়— তারপর থেকে রোজ জ্বর—খেতে পারে না—সে কী "জ্বালাপোড়া"— "মাথার মধ্যে কামারশাল"—তখন ঐ লোপেশ "ঝাড়ফুঁক" করে' "জড়ী বড়ী" দিয়ে সারায়। আসল কথা হ'চ্ছে—ফুলমণি এনেছিল বর্দ্ধমানের খাঁটি ম্যালেরিয়া, আমি খবর নিয়ে ফুলমণিকে আনিয়ে আশ্রমের হাসপাতাল আর সদাশয় বন্ধু ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হই। ডাক্তারবাবু রীতিমত ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করেন—যথেষ্ট পরিমাণে পেলুড্রিন খাওয়ান। কিন্তু হ'লে হবে কী—লোপেশমাঝির কপাল ভাল— যশোভাগ্য তারই! মোটকথা—ফুলমণির লোপেশমাঝিকে বিয়ে করা ছাড়া কোন উপায় নেই—বিয়ে ওকে করতেই হবে।…

এখন, লোপেশের বাড়ীতে চারটী ছেলেমেয়ে নিয়ে বৌ বিদ্যমান— বুড়ী মাও আছে। গাইবাছুর নেই, নিজের জমী নেই—একখানি বৈ ঘর নেই— পরের বাড়ী 'মাহিন্দার' খেটে আর একটু আধটু কোবরেজী করে' দিন চলে। কাজেই ফুলমণির মা বাবা গাঁয়ের মাতব্বররা সকলেই এ বিয়ে দিতে নারাজ। সবচেয়ে বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ফুলমণির ভাই বাদল। সে 'বাঁধ্‌লোডাঙ্গা'র হাড়ুরু মাঝিকে স্যাঙা করতে বল্‌ছে— হাড়ুরু মাঝি এঁড়ে বাছুর আর বারো টাকা 'নগদ' দিবে—প্রথম বিয়ের মতই। তা'ছাড়া তার চাষবাস জমাজমা আছে—তিনখানা ঘর আর দুটো 'বাখার' আছে। বাদল বল্‌ছে লোপেশমাঝিকে 'রা' কাড়্‌লে ফুলমণিকে মেরে ঘর থেকে তাড়াবে।

আজ বিকেলে কাজ থেকে ফুলমণি ঘরে ফিরে যাবার পর খুব 'কাজিয়া'—মানে কলহ হ'য়েছে—বাদল ফুলমণিকে মেরেছে—রাগ করে' শ্বশুরবাড়ী চলে' গেছে বৌ নিয়ে—যাবার সময় মা বাপকে বলে' গেছে— বাঁধলোডাঙায় স্যাঙা করে' ফুলমণি যতক্ষণ না বাড়ী থেকে বিদায় হবে, ততক্ষণ সে ফিরবে না। বাদ্‌লা চলে' যাওয়ায় মা বাপও কাঁদ্‌তে লেগেছে —ছোট ভাই হ'য়ে বাদলা ফুলমণিকে মেরেছে—কাজেই, ফুলমণির আজই পালানো ছাড়া আর উপায় নেই। পালিয়ে গিয়ে—লোপেশের সঙ্গে দুই এক রাত কাটাতে পারলেই মা বাবা বিয়ে দিতে বাধ্য হবে—গাঁয়ের লোকও না বল্‌তে পারবে না। ফুলমণির সতীন্ থাক্—ঘর মোটে একখানি হোক—লোপেশের ঘরে ভাত না থাক্—ফুলমণির লোপেশের উপর যখন 'মন' হ'য়েছে তখন বিয়ে ওকে ও কর্‌বেই।…

আমি প্রথমটা বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লাম তারপর বল্‌লাম—"তা মন যখন হ'য়েছে, তার উপর তো আর কথা নেই—বিয়ে কর্‌তেই হবে—কিন্তু খরচপত্র? লোপেশ বিয়ের 'পণ' দিতে পার্‌বে তো?"

ফুলমণি বল্‌লে—"ই তো আমাদের পেথম বিয়ে লয়—স্যাঙালো বিয়ে বটে—আমার পেথম বিয়ে ফুলডাঙাতে হয়—সে মাঝি মর্‌ল্যো গেল।… উওর সাথে পালিং যাব—খবর পেয়ে গাঁয়ের লোকে ধরে' এনে বিচার কর্‌বে—তখন পাঁচজনায় মিলে যা' সালিশী 'দাঁড়ম' করে' দেবে—ইত্তা দেবে মাঝি গাঁয়ের লোককে মদ খেতে।"

জিগেস ক'র্‌লাম—'দাঁড়্‌ম' অর্থাৎ দণ্ড কতটাকা পর্য্যন্ত হ'তে পারে?

বল্‌লে—"তা আর কত্ত হবে—আট ল' টাকার বেশী নয়—আর তাই যদি বেশী 'হাম্‌লা' 'হুজ্জুৎ' করে, তো তোর দেওয়া সেই এঁড়েটা বাপেরঘরেই তো আছে—ভাইকে দিয়ে দেব"—

বল্‌লাম—"যাবি যে, হাতে টাকা আছে তো?

বল্‌লে—"না, তোর কাছে আমার মাইনের যে টাকা আছে, তার থেকে আজ পাঁচটাকা দে—পথের খরচ—আর বাকি টাকা রেখে দে, ফিরে এসে নিব—দাঁড়ম লাগ্‌বে তো"—

লোপেশকে ফুলমণি সত্যিই ভালোবেসেছে।...

বল্‌লাম—"তা যাবি—এখনো ট্রেনের ঢের দেরী—রাত প্রায় এগারোটায় ট্রেন—খেয়ে যা—মাঝি কৈ?"

বল্‌লে—"হাই মাঠে বসে' আছে—এলনা—বল্‌লে তু বলে' চলে আয়"—

তখনও আমাদের রাতের খাওয়া হয়নি। উনুনে আগুন ছিল। ফুলমণিকে বল্‌লাম—তুই ভাত চড়িয়ে দে—আমি মাঝিকে ডেকে আনি"—

ফুলমণি উনুন খুঁচিয়ে দু'খানা কয়লা ফেলে দিয়ে বল্‌লে—"দাঁড়া আমি যেছি—আমি মাঝিকে ডেকে নিয়ে আন্‌ছি"—

সামনে মাঠের দিকে এগিয়ে দেখি—বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে এক প্রতীক্ষমান মূর্ত্তি।

ফুলমণি এগিয়ে গিয়ে ডাক্‌ল—"তোই বোওমা হোহোইদা"—অর্থাৎ এই বৌমা ডাকছে—।

উত্তরে মাঝি অস্পষ্ট স্বরে কী বল্‌ল বুঝ্‌লুম না। বোধহয় মৃদু আপত্তি জানাল। আমি এগিয়ে গিয়ে ডাক্‌লাম—"আয়রে মাঝি ঘরকে আয়—এখন গাড়ীর ঢের দেরী—এসে বসে' খেয়ে যা"—

ডাকতেই মাঝি ছোট্ট পুটুলিটা তুলে নিয়ে আমার পিছু পিছু গেটের মধ্যে ঢুক্‌ল। ততক্ষণে উনিও হাঁক ডাক সুরু করে' দিয়েছেন, কন্যাও পড়া ছেড়ে ফুলমণির বর দেখতে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে।...

এদিকে ফুলমণি ততক্ষণে আমাদের তিনজনের খাবার ঠিক করে'—নিজেদের ভাত চড়িয়ে, খাবার জায়গা করে' গুছিয়ে রাখল। ওঁর খাওয়া হ'য়ে গেলেই আমরা খেতে বস্‌লুম। মাঝিকে আগে ভাত বেড়ে পরিবেশন করে' খাইয়ে, তারপরে ফুলমণি খেতে বস্‌ল। খেয়ে উঠে বাসনমেজে, আমার ঘরদোর গুছিয়ে, খাবার ঘরের দোর জান্‌লা বন্ধ করে' দিয়ে—ফুলমণি যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।...

পরণে শাদা ধব্‌ধবে পরিষ্কার একখানি লাল নক্সাপাড় সাড়ী, পরিষ্কার করে' চুলটি আঁচড়ানো—গলায় রূপোর মোটা বিছে হার—হাতে শাদা ঝক্‌ঝকে রূপোর মোটা মোটা বেঁকী চুড়ী—কালো কুচকুচে সুঠাম সুন্দর দেহটী—ঝক্‌ঝকে শাদা দাঁতগুলি—নির্ম্মল মুখভরা হাসি নিয়ে বল্‌লে—"মা তবে যাই"—

মেয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর মতই একটা ব্যথা বুক ঠেলে উঠল।—হাতে টাকা ক'টা দিয়ে—পিঠে হাত বুলিয়ে—ব'ললাম—"আসবি তো ঠিক?"—

বল্‌লে—"হ্যাঁ মা দেখিস্ ঠিক আস্‌ব—আজ শনিবার আসছে শনিবার কিম্বা সোমবারে এসে নিশ্চয়ই কাজ ধর্‌ব"—

ফাল্গুনমাস—একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। বল্‌লাম—"একটা চাদর কিংবা কম্বল নিয়ে যা—রাতে কোথায় থাকবি—ঠিক নেই তো"—

মাথা নেড়ে বল্‌লে—"না নিব না—গুস্‌করা আমার বড়বাবার ব্যাটা খাছে,তার বাড়ীতে নয়তো উওর বুনের বাড়ীতে থাক্‌ব—চাদ্দর নিব না"—

আজ লোপেশমাঝিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়েছে। এর আগে দু'একবার ওকে দেখেছি—আমাদের বাগানের ছোট গেট ধরে' ফুলমণির ছুটী হ'বার ঠিক আগেই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে।—তখন দেখে একটু রাগ বা বিরক্তিই হ'ত।—সেই মলিন ছেঁড়া কাপড়—রুক্ষচুল—চোখের দৃষ্টিটা কেমন বুভুক্ষু—একটা দুষ্টগ্রহের মত মনে হ'য়েছে।—আজ বেশ চুকচুকে করে' তেল মেখেছে—মাথায় তেল পড়ে' চুলগুলো বেশ চক্‌চকে কোঁকড়া দেখাচ্ছে—পরণে একটা ফর্সা ছোট্ট কাপড়—চোখে মুখে বেশ একটা জয়ের আনন্দ—সজীব সপ্রতিভ ভাব—হাতে মোটা চক্‌চকে তেলমাখানো পাকা বাঁশের একটা লাঠি—তীক্ষ্ণ ছুঁচ্‌লোমুখ লোহার একটা শিক—তা'র ধরবার জায়গাটা বেশ গোল করে' বাঁকানো—শিকের ছুঁচলোমুখটাও চক্‌চক্ ক'র্‌ছে—লাঠির ডগায় লালগামছায় বাঁধা ছোট্ট একটা পুঁটুলি। বুকের ছাতিটাও আজ যেন বেশ চওড়া লাগছে।...

আমরা তিনজনেই ওদের সঙ্গে সঙ্গে বাগান পেরিয়ে গেট পর্য্যন্ত এসে দাঁড়ালাম।...বার বার করে' বলে' দিলাম, নিশ্চয় যেন ফিরে আসে। ফুলমণি বার কয়েক ফিরে ফিরে তাকাল।—তারপরে অনুসরণ করে' চ'ল্‌ল মাঝিকে।...

জ্যোৎস্না-ধোয়া মাঠের মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে' গিয়েছে সরু পায়েচলা পথ—শৈলদি'র বাড়ীর পাশদিয়ে—সরকারের দোকানকে বাঁয়ে রেখে—মজুমদারের কূপের ধার দিয়ে।—মাঝি চলেছে আগে আগে হাতে তার লাঠিটী—সূচাগ্র শিকটী—পিছনে চ'লেছে ফুলমণি—মাথায় তার সেই লাল গামছায় বাঁধা ছোট্ট পুটুলিটী। ফুলমণি চলেছে—চলার তালে তার ডানহাতটী দুল্‌ছে—অনাবৃত বাহুর উপর কাঁধের উপর চাঁদের আলো পড়ে' যেন পিছলে যাচ্ছে—আবার পড়ছে আবার পিছলে যাচ্ছে।...অপূর্ব্ব এক ছবি।...

যতদূর দেখা যায় চেয়ে রইলাম—ফাল্গুনী ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় যেন হাসিতে ভরে' গেছে—আমার চোখ দিয়ে কেন জানিনা টপ্ টপ্ করে' দু'ফোঁটা জল ঝরে' পড়ল।...ঝাপসা চোখ পরিষ্কার করে' যখন আবার একবার ভালকরে'দেখার চেষ্টা কর্‌লাম—কোথায় কতদূরে চলে' গেছে!...

মনের চোখে জেগে রইল শাশ্বত এক দৃশ্য—জ্যোৎস্না-ধোয়া বন্ধুর মাঠের বুকচিরে চলে' গেছে সরিসৃপের মত একপথ দিগন্তে লীন—সেই পথ ধরে' চলেছে বলিষ্ঠ এক পুরুষ, আর তাকে অনুসরণ করে' চ'লেছে কনিষ্ঠা এক নারী—কোন্ অনাদি অনন্তকাল হ'তে চিরন্তন এই যাত্রা!—নবপরিচিত মিলিত জীবনের অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে এই চলা—এ চলার আর শেষ নেই।...এ পথেরই বা শেষ কোথায়?

(পূর্বানুবৃত্তি)

৮

প্রজঙ্ঘের হস্তের পেশী শিরাসমূহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া লকুট অবশেষে চার্বাককে বলিলেন, "মহর্ষি, একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে। জানি না, আপনারও তা মনে হয়েছে কি না"

"কি বলুন"

"আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। শিরা-উপশিরা পেশী অস্থির গঠন ও স্থাপন নৈপুণ্য দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন কোনও বিরাট নগরী প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু সে নগরীর নির্মাতাকে প্রত্যক্ষ করতে হলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ তপস্যা করতে হবে, সেই কাপালিক যেমন করেছিল"

"এই ছিন্নভিন্ন শবের কাছে চোখ বুজে বসে' থাকবেন, তার মানে ?"

"বসে থাকলে ক্ষতি কি ?"

"সময় নষ্ট হবে, আর কিছু যদি না-ও হয়"

"মহর্ষি, আপনি তো একাধিকবার প্রত্যক্ষ করলেন যে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপ কাঠিতে অসম্ভব তা-ও সম্ভব হয়। আপনি আমাকে সর্পে রূপান্তরিত হতে দেখলেন, এই শবের মধ্যে মূর্তিমতী প্রাণ-দেবতাকে দেখলেন, তবু আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না যে—যা আমরা অসম্ভব বলে' মনে করি তার হেতু আমাদের বুদ্ধির অসম্পূর্ণতার মধ্যেই নিহিত ?"

"বিশ্বাস হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হচ্ছে যে এই অসম্পূর্ণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করাও তো নিরাপদ নয়। কোনও অজ্ঞাত কারণে আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে এইটে মেনে নিয়ে তাই আমি আপাতত চুপ করে' থাকতে চাই, আপনি যদি তপস্যা করতে চান করুন !"

"আপনি কি চুপ করে' বসে থাকবেন ? আপনিও যদি তপস্যায় ব্রতী না হন তাহলে আপনার উপস্থিতি আমার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হবে এবং বলা বাহুল্য, আমার তপস্যাও বিঘ্নিত হবে তাহলে"

"বেশ, আমি উঠে যাচ্ছি। চারিদিকে ঘুরে দেখি দেশটা কেমন। আপনি তপস্যা করুন"

"বেশ"

কালকূট নয়নযুগল মুদিত করিয়া বদ্ধপাণি হইতেই চার্বাকের অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার নয়নের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ, বিস্ময় ও করুণার এমন একটা সমন্বয় হইল যাহা প্রকৃতই চার্বাকীয়। নীরব ভাষায় সে দৃষ্টি যেন বলিতে লাগিল—'আহা, স্বল্পবুদ্ধি লোকগুলির কি দুর্দশা।' পরমুহূর্তেই' কিন্তু তাহার মনে হইল, 'আমিও তো কিছুক্ষণ পূর্বে মায়ানদীর তীরে বসে' অনুরূপ মূর্খতার পরিচয় দিয়েছিলাম। মানুষের কিসে কখন যে বুদ্ধিভ্রংশ হয় কিছুই বলা যায় না। তীব্র সুরাই হয়তো আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করেছে, কে জানে !' চার্বাক উঠিয়া পড়িল এবং উপল-বহুল পার্বত্য উপত্যকায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রূপসী সুরঙ্গমার অঞ্জন-সুন্দর খঞ্জন-নয়ন দুইটিও তাহার মানস প্রাঙ্গণে যেন কৌতুক ভরে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। চার্বাক পুনরায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—'চতুরাননের অনস্তিত্ব আমাকে প্রমাণ করতেই হবে। যে মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করেছে তা কিছুক্ষণ পরে অপসারিত হবে নিশ্চয়ই। উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে তখন আমি নিশ্চয় সত্যকে আবিষ্কার করতে পারব। সুরঙ্গমার বিশ্বাসকে বিচলিত করতেই হবে।' একটা ঝম ঝম শব্দে চার্বাকের

স্বগতোক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইল। চার্ব্বাক ঘাড় ফিরাইতে দেখিতে পাইল একটা বিরাটকায় শজারু তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সর্ব্বাঙ্গের কণ্টক সমুন্নত হওয়াতে তাহাকে এক চলমান বিরাট বিচিত্র কদম্ব ফুলের ন্যায় দেখাইতেছিল। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে সে দিকে চাহিয়া রহিল।

"চার্ব্বাক, আমি তোমারই অপেক্ষায় এখানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্চি"

"কে তুমি"

"আমি তোমার কৌতূহল"

"এ মূর্ত্তি কেন তোমার"

"আমি সংশয়-কণ্টকিত হয়েছি। শব-ব্যবচ্ছেদ করে' বিশেষ কোন লাভ তো হল না। কালকূটের তপস্যার ফলেও যে বিশেষ কিছু হবে—তা মনে হচ্ছে না। তোমার এই সন্ধান-লোকে নূতন আর কি পাওয়া যেতে পারে? কিসের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা?"

"ইচ্ছা করে' তো আমি এখানে অপেক্ষা করছি না, আমাকে এখানে বাধ্য হয়ে থাকতে হচ্ছে। এ দেশের নাম সন্ধান-লোক না অদ্ভুতলোক তা-ও আমি জানি না। আমার কৌতূহল কি উপায়ে যে আমার দেহের বাইরে এসে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে পারে তা-ও আমার বুদ্ধির অতীত। সংক্ষেপে যদি আমার মানসিক অবস্থা বোঝাতে হয় তাহলে বলতে হবে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি"

"আমি তাহলে এখন অন্তর্দ্ধান করি"

"তুমি বারবার রূপান্তরিত হচ্ছ কি করে"

"তা জানি না। আমি আপনা-আপনিই বদলে যাচ্ছি, বরফ যেমন জল হয়। অনুভব করছি আবার একটা পরিবর্ত্তন আসছে। এই দেখ—"

শজারু পিপীলিকায় পরিণত হইল।

"তুমি যতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকবে ততক্ষণ আমার বিশেষ কোনও কাজ নেই। আমি চললুম"

পিপীলিকা গর্ত্তে প্রবেশ করিল। প্রত্যক্ষজ্ঞান-বিলাসী চার্ব্বাক অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিল, "যে সব অনুমান-বাদী বেদবিৎ পণ্ডিতদের আমি এতকাল উপহাস করেছি তাঁরা যদি এখন আমার দুরবস্থা দেখতে পেতেন তাহলে আনন্দের কিছু খোরাক পেতেন নিশ্চয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছি ক্রমশ। মনে হচ্ছে—কিন্তু না, আমি নিশ্চয়ই অসুস্থ। বিকারের ঘোরে অসম্ভব প্রলাপকে সত্য বলে মনে করছি। দেখি এই বিকার আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে কতদূর বিকৃত করতে পারে। নির্ব্বিকার হয়ে সেইটেই যদি লক্ষ্য করতে পারি তাহলেও আত্মরক্ষা করতে পারব। কালকূটের কার্য্যকলাপই একটু অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করা যাক্ আপাততঃ। এ ছাড়া আর করবার তো কিছু নেই"

চার্ব্বাক পুনরায় সেই শবদেহের অভিমুখে গমন করিয়া দেখিতে পাইল যে কালকূট নিমীলিতনয়নে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। চার্ব্বাক নিকটস্থ একটি ঝোপে আত্মগোপন করিয়া নীরবে কালকূটকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল বর্ণমালিনী যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তা প্রমাণ করিবার জন্যে ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার প্রয়োজন কি। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাহার রূপের তুলনা করিয়া ক্ষুব্ধ হওয়াই বা কেন। পাতালনিবাসী রাজপুত্র? পাতালে কি জনসমাজ আছে? কি রকম রাজ্যের রাজপুত্র ইনি? কালকূটকে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ চিন্তা চার্ব্বাকের মস্তিষ্কে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পূর্ব্বে এক অদ্ভুত ঊর্ণনাভকে দেখিয়া তাহার মনে যে-জাতীয় বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল সেইরূপ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চার্ব্বাক ঘন ঝোপে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হইয়া গেল, চক্ষুদ্বয় ক্ষুদ্রায়িত হইল, নয়নের প্রখর দৃষ্টিতে মূর্ত্ত হইল কৌতুক ও করুণা।

৯

সপ্তর্ষিগণের সাময়িক অন্তর্দ্ধানে অন্তরীক্ষে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়াছে। সুধাকর সোম-দেবতার বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। নিজস্ব চন্দ্র-লোকে তিনি নির্ম্মল কৌমুদী বিস্তার করিয়া পুনরায় রোহিণীর মনোরঞ্জন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার হৃদয়ে ছায়াপাত হইল। মনে হইল যে জ্যোৎস্না-বিধৌত শুভ্র মেঘখণ্ডের অন্তরালে তারা দেবী আত্মহারা হইয়া স্বপ্নজাল রচনা করিতেছিলেন সেই শুভ্র মেঘখণ্ড সহসা গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত বিরাট এক মনুষ্যমুখে রূপান্তরিত হইয়া তারা দেবীর সহিত আলাপ করিতেছে। ঈর্ষ্যায় কলঙ্কীর

মুখমণ্ডল আরও কালো হইয়া গেল। তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন, বৃহস্পতি হয়তো কোনও দূত পাঠাইয়াছেন তারার কাছে। লোকটা এত অপমানিত হইল তবু ছাড়িবে না? হইতে পারে তারা তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, কিন্তু সে যখন তাঁহার কাছে থাকিতে রাজি নয়, সে যখন স্বেচ্ছায় আমার সহিত পলাইয়া আসিয়াছে, তখন ইহা লইয়া আর মাতামাতি কেন? তারার পুত্রবধ যে আমারই পুত্র ইহা তো সর্ব্বজনবিদিত। পিতামহ নিজে আমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরও বৃহস্পতি যদি···। চন্দ্রের চিন্তাধারা কিন্তু আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পাইল না। সেই মেঘনির্ম্মিত মনুষ্যমূর্ত্তি তাহারই দিকে সবেগে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্রদেব চমকিত হইলেন—একি, এ যে স্বয়ং পিতামহ!

পিতামহ নিকটস্থ হইয়া চন্দ্রদেবকে ঘিরিয়া অপরূপ শোভা-সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ওহে চাঁদ, আমি তোমার তারা দেবীকে নিয়ে চললাম। মেঘের আড়ালে যেটা রইল, সেটা তারার মতোই দেখাবে বটে, কিন্তু সেটা ওর কঙ্কাল—ওটার সঙ্গে প্রেম করতে যেও না, সুখ পাবে না"

চন্দ্র শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কোথা নিয়ে চললেন"

"মর্ত্ত্যলোকে। পাতালের এক পাগল রাজপুত্রকে ভোলাতে"

"ভোলাতে?"

চন্দ্র হতবাক হইয়া পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পিতামহ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, তোমার ভয় হচ্ছে, ও যদি নিজেই ভুলে যায় তাহলে তোমার দশা কি হবে। ভয় নেই, ও ভুলবে না। একটি পুরুষের পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করে' সারাজীবন তার দাসী হয়ে থাকার মতো মনোভাব এদের নয়। এদের আমি সৃষ্টি করেছিলাম অভিনেত্রী করে'। মোহিনী প্রেয়সীর অভিনয়ে এদের জোড়া নেই। তোমাকে কি ভাবে ভুলিয়েছিল মনে আছে তো? আমার বিশ্বাস পাতালের রাজপুত্র ওকে বাগাতে পারবে না। তোমার কাছেই ও ফিরে আসবে আবার। তুমি ওকে যথেষ্ট সুখে রেখেছ দেখছি—"

"কিন্তু পিতামহ, যদি না আসে—"

"তাহলে বৃহস্পতির যে দশা হয়েছে, তোমারও তাই হবে"

"কিন্তু পিতামহ—"

"দক্ষ রাজার সাতাশটি মেয়েদের উপর তো একাধিপত্য করছ! তবু তোমার আশা মিটছে না? এদিকে শুনছি যক্ষ্মা হয়েছে—"

রোহিণী অপ্রত্যাশিতভাবে বলিয়া উঠিল—"তারাকে নিয়ে যান আপনি। ওর কথা শুনবেন না—"

বাকী ছাব্বিশ জন দক্ষ কন্যাও সমস্বরে সমর্থন করিল সে কথার। পিতামহ অন্তর্দ্ধান করিতেছিলেন এমন সময় চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "একটা কথা শুধু বলে যান পিতামহ—"

"কি বল"

"তারাকে কার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে"

"মেঘমালতীর"

"সে আবার কে"

"স্বর্গের একজন অপ্সরী"

"কি করে' তা সম্ভব হবে পিতামহ। তারা কি তারা ছাড়া আর কিছু হতে পারে?"

"ওকে স্বৈরচর করে' দেব। ও যা খুশী হতে পারবে। আপাতত ওকে মেঘমালতী হতে হবে, আর প্রয়োজন মতো মাছিও হতে হবে মাঝে মাঝে"

"মাছি?"

"হ্যাঁ, কালকূটের সঙ্গে একা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ মেঘমালতী সেজে থাকবে, তারপর যেই তার বউ বর্ণমালিনীর সাড়া পাবে অমনি পট করে' মাছি হয়ে যাবে!"

"কেন"

"প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। নাগিনী বর্ণমালিনী নক্ষত্র-বধূদের মতো উদারচেতা নয়। সপত্নীর সান্নিধ্য সে সহ্য করতে পারবে না। সে মনোহারিণী, কিন্তু হিংসা বিষে পরিপূর্ণ, তার সুদীর্ঘ জিহ্বা ইস্পাতের মতো কঠিন ও সুতীক্ষ্ণ। যদিও নিজেকে সে বর্ণবিরোধী বলে' প্রচার করে, যদিও মুখে সে বলে' যে সমস্ত পৃথিবী একরঙা হয়ে যাক, কিন্তু নিজে সে বিচিত্রবর্ণা, কালকূটকে সম্পূর্ণভাবে সে

নিজে অধিকার করে' রাখতে চায়। সুতরাং তারাকে সাবধানে থাকতে হবে"

"এ সব বিপজ্জনক জটিলতার মধ্যে কেন ওকে নিয়ে যাচ্ছেন পিতামহ"

পিতামহ স্মিতমুখে কিছুক্ষণ শশধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "দেখ, আমার নিজের তৈরি খেলাঘরে আমার নিজের তৈরি পুতুল তোমরা। তোমাদের আমি যখন যেখানে খুশী রাখব, যখন যেমন খুশী সাজাব। তোমরা খেলাটাকে খেলার মতোই উপভোগ কর—তাহলে যেটাকে বিপজ্জনক জটিলতা মনে হচ্ছে, তাতেই আনন্দ পাবে। ওগো, তোমরা এই ছেলেমানুষটাকে একটু ভোলাও তো!"

পিতামহের কথা শুনিয়া সাতাশটি নক্ষত্রের সর্বাঙ্গে নব নব দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্বাতী হাসিয়া বলিল, "আপনি যান, আমরা ওকে সামলাব"

"আমার একটা নালিশ আছে পিতামহ"

রোহিণী আগাইয়া আসিল।

"কি হল তোমার আবার"

"কিছু হয় নি, কিন্তু আপনি মানুষ নামক যে জীব সৃষ্টি করেছেন তাদের এত বোকা করেছেন কেন বলুন তো"

"কেন কি করেছে তারা তোমার"

"একজন মানুষ জ্যোতিষী নাকি বলেছে যে আমার চেহারা ষাঁড়ের মুখের মতো! দেখুন দিকি কাণ্ড! অশ্বিনীকে বলেছে ঘোড়ামুখো, শতভিষাকে কুম্ভ, ধনিষ্ঠাকে মৃদঙ্গ—। আপনি ওদের বুদ্ধিটাকে একটু ঘসে' মেজে ঠিক করে' দিন"

"আমাকেই ওরা চতুর্মুখ বানিয়ে দিয়েছে। ওদের কাছে কি ঘেঁসবার জো আছে। ওরা নিজেদের বুদ্ধি, দৃষ্টি আর শক্তি দিয়ে নিজেদের মতো জগত সৃষ্টি করে' তাতে মশগুল হয়ে আছে। ওদের কিছু করা যাবে না। ওরা নিজেদের পথে নিজেরাই বদলাবে ক্রমশ"

"আমরা কিছু করব না?"

"আমরা মজা দেখব"

নক্ষত্র-রূপসীদের নয়নে অধরে কৌতুক হাস্য বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

চন্দ্রদেব পুনরায় কথা কহিয়া উঠিলেন, "পিতামহ, আমি কি তাহলে আর তারার দেখা পাব না?"

"যদি মাছি হয়ে পাতালে যেতে পার তাহলে পাবে। তারা যখন মাছি-রূপ ধারণ করবে, তখন তুমি মাছি-রূপে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারবে—"

"তা কি করে' সম্ভব"

"খুবই সম্ভব। এর নজীরও আছে অনেক। অশ্বিনী-কুমারদের জন্মের ইতিহাসটা স্মরণ কর না। মনে নেই?"

"আজ্ঞে, আমি তো কিছুই শুনিনি। বাইরের কোন খবর রাখবার অবসরই পাই না"

"পাবার কথাও নয়। সাতাশটি পত্নী, উপরিও দু' একটা আছে। ঘটনাটা শোন তবে। বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞার বিয়ে হয়েছিল সূর্য্যের সঙ্গে। দুটি ছেলে—বৈবস্বত মনু আর যম এবং একটি মেয়ে যমী হবার পর সংজ্ঞা কাবু হয়ে পড়ল। মার্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রেম সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল তার পক্ষে। সে তখন তার এক দাসী ছায়াকে পতিদেবতার কাছে এগিয়ে দিয়ে সরে' পড়ল বনে তপস্যা করবার জন্যে এবং সম্ভবত সূর্য্যের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অশ্বিনীরূপ ধারণ করে' তপস্যা করতে লাগল। কিন্তু সহস্রাক্ষ সূর্য্যের দৃষ্টি এড়ান সহজ কথা নয়। সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করে' হাজির হলেন তার কাছে গিয়ে। ফলে অশ্বিনীকুমারদের জন্ম হল। ইচ্ছা কর' তো তুমিও মক্ষিকারূপ ধারণ করে' তারার কাছে যেতে পার"

চন্দ্রদেব নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মক্ষিকা? তা পারব না পিতামহ"

"তাহলে বিরহ ভোগ কর কিছুদিন। আমি চললুম। আপত্তি না কর তো তোমার প্রেয়সীদের অধর সুধা চেখে যাই একটু"

"না, না, আপত্তি আর কি"

পিতামহ সাতাশটি নক্ষত্রকে একে একে চুম্বন করিয়া সূক্ষ্ম আলোক রেখা রূপে পুনরায় মর্ত্যের দিকে নামিয়া গেলেন।

"দেখ দেখ, কত বড় উল্কাপাত হল একটা"

ভরণী দেবী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন।

"ওটা উল্কা নয়। শ্রীমতী তারা পিতামহকে অনুসরণ করছেন। কত ঢঙই যে জানেন।"

চন্দ্রদেব ক্ষণকাল বিমর্ষ হইয়া রহিলেন, তাহার পর রোহিণীর দিকে ফিরিয়া যথারীতি প্রণয় নিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

দি রেফিউজ ও তার প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীনির্ম্মলকুমার বিশ্বাস

দয়া ও সেবাই যে মনুষ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা যুগযুগ ধরিয়া মনিষীগণ দ্বারা প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, সকল জীবের প্রতি সমভাবে দয়া করাই পরম ধর্ম্ম, স্বয়ং খৃষ্ট বলিয়াছেন, আপনার জন ভাবিয়া সকলকে প্রেম কর; স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ এই রেফিউজ যাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহার উদ্দেশ্যও ঐ একই আদর্শ অনুসরণ করিয়া।

রেফিউজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত কেন, কবে, কিরূপে ও কাহার দ্বারা হইল, তাহাই এস্থলে জ্ঞাতব্য।

রেফিউজ প্রতিষ্ঠাতা ৺আনন্দমোহন বিশ্বাস, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী এক সাধারণ গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, শৈশবকাল হইতেই তিনি পিতামাতার সৎ আদর্শে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং জীবনে বহু সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন যাহা দ্বারা তিনি পার্থিব জীবনে অনেক উন্নত হইতে পারিতেন। যেমন, শৈশবের একটা ঘটনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, একবার একজন ইউরোপীয় ডাক্তার শান্তিপুরে গিয়া আনন্দমোহনের পিতৃগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং আনন্দমোহনকে দেখিয়া তাহার উপর আকৃষ্ট হইয়া, তাহাকে উচ্চশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বদেশে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পিতা সম্মত, কিন্তু মাতার সজলনেত্র উক্ত ডাক্তারকে তাঁহার স্বীয় ইচ্ছা হইতে বঞ্চিত করে। উক্ত ঘটনাটি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের হিন্দু পেট্রিয়ট নামক ইংরাজী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

পিতা কলিকাতায় আসিলেন। বাল্য শিক্ষা পিতামাতার নিকট সমাপন করিয়া, আনন্দমোহন এক মিশন স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরে কেশব একাডেমি হইতে ৺প্রসন্নকুমার সেনের যত্নে ও চেষ্টায় এন্ট্রেন্স পাশ করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি হন। উক্ত সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে স্বীয় কলেজে ভর্ত্তি করিয়া লন। কলেজের পাঠ শেষ করিয়া একুশ বৎসর বয়সে একটি সরকারি চাকুরী গ্রহণ করেন।

ছাত্র-জীবন হইতেই পরসেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে সঞ্চা হইয়াছিল। কর্ম্মজীবনেও সকল কাজের মধ্য দিয়া অবসর পাইলেই জনহিতকর কার্য্যে আপনাকে লিপ্ত রাখিতেন। কিন্তু এভাবে তাঁহার মন তৃপ্ত হইল না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক পুজার ছুটিতে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত বোম্বাই শহরে ছুটি উপভোগ করিতে গিয়াছিলেন। উক্ত সময় সেখানে ভীষণভাবে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। দেশ অতি শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে। দৃশ্য অতি ভীতিপ্রদ। ইহা দেখিয়া আনন্দমোহনের কোমল হৃদয় দুঃখে কাতর হইয়া উঠিল। দেশে আরও কত লোক যে এই ভাবে নিরাশ্রয় হইয়া, রোগগ্রস্ত হইয়া সেবার অভাবে অকালে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হইতে দেরী হইল না। কিছুকাল পরে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অচিরেই চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন। দুঃখদৈন্যের হাত হইতে দীন দরিদ্রদের বাঁচাইবার জন্য তিনি উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন।

কোন এক সন্ধ্যায় স্বীয় পরিচ্ছদ ও পাদুকা ত্যাগ করতঃ গৈরিক ধারণ করিলেন এবং পিতামাতার চরণ স্পর্শ করিয়া স্বহস্তে ধুলি মাতার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মাতার প্রথম ভিক্ষা চারি আনা সম্বল করিয়া গৃহত্যাগী হইলেন। জানি না কাহার ডাকে!

কলিকাতা শহরের কোন এক রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন লক্ষ্যহীনভাবে। কতদূর আসিয়াছেন তাহার ঠিক নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, হঠাৎ পথিমধ্যে একটি গোঙানীর আওয়াজ তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল। ইতস্তত চাহিয়া দেখিতেই একটি ছিন্ন চটে বেষ্টিত একটি পদার্থ তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটা লোক প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া পড়িয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার সহিত আসিতে চাও? লোকটি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। তখন তিনি লোকটিকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। লোকটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছিল। মলমূত্রে তাহার সমস্তশরীর দুর্গন্ধপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু আনন্দমোহনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। রাত্রি অনেক হইয়াছে। কোথায় চলিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়া চালককে ডাকিলেন এবং ভাড়া লইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে সম্মত হইয়া তাঁহাকে গাড়ীতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল। কোথায় যাইবেন তাহার কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইল না। কি জানি ভগবানের কি লীলা!

গাড়ী চলিয়াছে বহুদূর, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চালক ও আরোহী উভয়েই নীরব। বহুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর চালক জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কোথায় যাইবেন? বাবু উত্তর করিলেন, তাতো জানি না। চালক আশ্চর্য্য হইল, কি উত্তর করিবে স্থির করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে বাবু বলিলেন, দেখ তো বাবা এখানে কোন বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় কিনা।

স্থান সিমলা। চালক অনেক অনুসন্ধানের পর একটা বাড়ীর খবর আনিল। বাড়ীর মালিক উক্ত বাড়ীর পাশেই বাস করিতেন। রাত্রি অনেক। অনেক ডাকাডাকির পর মালিক বাহির হইলেন, এক কথাতেই সম্মত হইয়া বাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। সেইদিন হইতেই ঐ বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। গাড়ী

চালককে ভাড়া দিতে হইবে কিন্তু সম্বল মাত্র সেই চারি আনা। ভগবানের ইচ্ছার জয় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, যদি তাঁর প্রতি সকল ইচ্ছা অর্পণ করা যায়। চালক বলিল, বাবু ভাড়ার আমার প্রয়োজন হইবে না। কেবল এই চারি আনা পয়সা গাড়ীখানা পরিষ্কার করিবার জন্য দিলেই হইবে। কারণ উক্ত রোগীর মলমূত্রে গাড়ীখানি অপরিষ্কার হইয়াছিল। যাহা হউক, বাবু চালককে চারি আনা পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। এই সময় হইতেই রেফিউজের সূত্রপাত হইল।

সেই সময় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সেন, ইঁহারা আনন্দমোহনকে পর-সেবায় যারপর নাই অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। কলিকাতার রাজপথ হইতে প্রায়ই একটি দুইটী করিয়া অন্ধ, খঞ্জ বা যে কোন রোগগ্রস্ত লোক দেখিলেই তিনি স্বীয় স্কন্ধে বাহিয়া স্বস্থানে আনিয়া তাহাদের সেবায় রত থাকিতেন। কথায় বলে, জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি। প্রত্যহ প্রত্যুষে তিনি সাধারণ ভিক্ষুকের বেশে মুষ্টি ভিক্ষায় বাহির হইতেন এবং প্রয়োজন মত চাউল বা অন্যান্য সামগ্রী যাহা পাইতেন, আনিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া উক্ত অক্ষমদিগকে আহার করাইয়া যদি তাহাদের উচ্ছিষ্ট কিছু অবশিষ্ট থাকিত তবেই তিনি তাহা প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেন। নতুবা ঐ দিন তাঁহার উপবাসেই কাটিত। একবার একটি অনাথ আহার করিতে না পারিয়া কিছু অন্ন নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয়। একমুষ্টি অন্নের অভাবে কত লোক যে উপবাসী তাহা চিন্তা করিয়া আনন্দমোহন একটি একটি করিয়া সমস্ত অন্ন নর্দ্দমা হইতে কুড়াইয়া, ধুইয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপে মাসের মধ্যে প্রায় দিনই তাঁহার আহার জুটিত না। এই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের সহৃদয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাসাশ্রম অচল হইয়া উঠিলে উক্ত আশ্রমের অনাথগণ আনন্দমোহনের আশ্রিত হইল।

ক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় স্থানাভাব হইল। সেই সময়ে তিনি কলিকাতার মহামান্য ব্যক্তিদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। পরমেশ্বরের মহাকৃপায় তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হন নাই। সেই সময়ে শিমলার বাড়ী ত্যাগ করিয়া প্রথমে দর্জ্জিপাড়ায়, পরে মাণিকতলায় স্থান পরিবর্তন করিলেন। সেখানে ক্রমে স্থানাভাব হইতে লাগিল। তখন তিনি নারিকেলডাঙ্গায় একটি বৃহৎ বাড়ী ভাড়া লইলেন। এই সময় প্রেসিডেন্সি পুলিশ কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ষ্টিফেনসন সাহেব, স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, যোগেন্দ্রনাথ বক্‌শি ইত্যাদি মহাপ্রাণ ব্যক্তিদিগের বিপুল সহানুভূতি লাভ করেন।

মহাত্মা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রেফিউজের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার সহানুভূতি ও পরিশ্রম জনকল্যাণের উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল।

এইভাবে অনাথ আতুরদের লইয়া কতকাল যাযাবরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান যায়। তাহাদেরও মাথা রাখিবার একটা নিজস্ব স্থানের প্রয়োজন। সর্ব্বশেষে নারিকেলডাঙ্গার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ১২৫ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে আসিলেন। কিছুকাল ভাড়ায় বাস করিবার পর ঐ বাড়ী ক্রয়ের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আনন্দমোহনকে কেহ কখনও কোন বিষয়ে অধীর হইতে দেখে নাই। তিনি সব সময়েই বলিতেন, যাঁহার ভাবনা তিনিই ভাবিতেছেন। আমি কে?

যাহা হউক উক্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের আপ্রাণ চেষ্টায় কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল।

সেই সময়ে মহামান্য রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর এক কালীন ৭৫০০০৲ হাজার টাকা ও কুইন মেরী ৫০০০৲ টাকা রেফিউজের বাড়ী ক্রয় করিবার জন্য দান করেন। অর্থ সংগ্রহ হইল এবং উপযুক্ত সময়ে ১৩৭৯৫০৲ টাকায় বাড়ী ক্রয় করা হইল।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামকরণ কি হইবে ইহা একটা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অনেক চিন্তার পর রেফিউজ কথাটি আবিষ্কার করিলেন এবং ইহাই যে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিঃসহায়ের সহায় ও নিরাশার আশা এই তিনের সম্মিলিত অর্থে রেফিউজ। তখন হইতে প্রতিষ্ঠানের নাম রেফিউজ হইল।

একটি গান তিনি প্রায়ই রেফিউজের অনাথদের লইয়া গাহিতেন :—

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন
এসেছে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন,
কাঁদে যারা নিরাশ্রয়, আঁখি যেন মুছে যায়
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন।

গানটি তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। একই পরমেশ্বর সকলের পিতা। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রকার অনাথ আতুরদের জন্যই রেফিউজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

দৈন্য-দারিদ্র্য হেতু দেশে ভিক্ষুক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তিনি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যাহাতে উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান আরো প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই।

রেফিউজ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনহিতকর কার্য্যের জন্য ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি K. I. H পদক ও অনার্স সার্টিফিকেট লাভ করেন।

প্রায় ত্রিশ বৎসর জনসেবায় জীবন অতিবাহিত করিবার পর তিনি অবসর লইয়া কৃষ্ণনগরে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন বুধবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় ইহলোক ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণনগরে অবসর কালেতেও তিনি বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। কোন না কোন কার্য্যে আপনাকে লিপ্ত রাখিতেন। কৃষ্ণনগরের বহু দরিদ্র সন্তানদের লইয়া স্বগৃহে স্কুল করিয়া পড়াইতেন এবং তাহাদের পড়িবার প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাহাদের জন্য সংগ্রহ করিতেন। কৃষ্ণনগরের দরিদ্র ভাণ্ডারের কার্য্যেও বহুদিন লিপ্ত ছিলেন।

আজ এই দুর্দ্দিনে কলিকাতায় উক্ত প্রতিষ্ঠান রাখা কত কষ্টসাধ্য তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। তথাপি যে সকল মহাত্মন ব্যক্তিগণ আজিও স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে জীবিত রাখিবার জন্য অবিচলিত চিত্তে পরিশ্রম করিতেছেন ভগবান তাঁহাদের পরিশ্রমকে সার্থক করিয়া তুলুন। যেন অনাথ সন্তানগণ শূন্য মনে ফিরিয়া না যায়, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

কুষ্ঠরোগ ও তাহার রাসায়নিক প্রতিষেধক

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানবসমাজে কুষ্ঠরোগ বিদ্যমান। আমাদের সুপ্রাচীন গ্রন্থ বেদে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলেও কুষ্ঠরোগের কথা দেখা যায়। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চালমুগরা তেল কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। এই তেল বিশোধিত অবস্থায় বা রাসায়নিক উপায়ে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত আকারে এখনও পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত।

মধ্যযুগে বিলাতে কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব ছিল। অবশ্য তাদের স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে উন্নত জ্ঞানের ও খাদ্যাদির পরিবর্তনের দরুণ এবং রোগীদের অপরের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখবার কঠোর ব্যবস্থার ফলে এখন সেখানে এই রোগ আর নেই। রুশদেশ, স্পেন, পর্তুগাল, বালটিক ও বলকান দেশগুলিতে এখনও কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। আফ্রিকার অধিকাংশ অংশে, দক্ষিণ আমেরিকায়, চীন, জাপান, কোরিয়া, ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, সিংহল ও ভারতবর্ষে বর্তমানে এই রোগের প্রাবল্য বেশী। ভারতের মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুরের সমুদ্রতীরবর্তী স্থান, উড়িষ্যা, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, হায়দারাবাদ, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় কুষ্ঠরোগ সবচেয়ে বেশী। ভারতের প্রায় ১০ লক্ষ লোক কুষ্ঠরোগে ভুগ্‌ছে বলে জানা যায়।

নরওয়ের জীবাণুতাত্ত্বিক গেরহার্ট আরামাওয়ের হানসেন ১৮৬৮ সালে কুষ্ঠের জীবাণু আবিষ্কার করেন। একারণ অনেকে আজকাল কুষ্ঠরোগকে 'হানসেন ডিজিজ' বা সংক্ষেপে এইচ্‌-ডি বলে থাকেন। কুষ্ঠ জীবাণু মনুষ্য দেহ ব্যতীত অন্যত্র জন্মিতে বা বংশবিস্তার করতে দেখা যায় না। কাজেই এর প্রতিষেধক তৈরি করে তার পরীক্ষা চালাতে হয় সরাসরি মানুষেরই ওপর। বলা বাহুল্য, মাত্রাধিক্যে বা নবাবিষ্কৃত ঔষধের বিষক্রিয়ার ফলে অনেক হতভাগ্যকে এর জন্য প্রাণ দিতেও হয়। ১৯২০ সালে জাপানী জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌ ডাক্তার মিটস্থুডা 'লেপ্রোমিন টেষ্ট' নামক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করায় রোগীর দেহে এই জীবাণুর অস্তিত্ব এবং পরিমাণনির্ধারণে ও তৎসঙ্গে চিকিৎসার অনেকটা সুরাহা হ'য়েছে। অনেকের ধারণা কুষ্ঠ বংশগত ব্যাধি। এখন জানা গেছে, কুষ্ঠ ছোঁয়াচে রোগ হলেও উহা বংশগত নয়। এক থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েরাই এই ব্যাধিতে সহজে আক্রান্ত হয়। কুষ্ঠরোগীর ছেলেমেয়েদের জন্মাবধি পিতামাতার নিকট থেকে নিয়ে অন্যত্র রাখলে সে ছেলেমেয়ের ঐ রোগ হ'তে দেখা যায় না। রোগের জীবাণু শরীরে গেলে কুড়ি পঁচিশ বৎসর পরেও রোগ আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কলকাতার সম্পন্নঘরের লোকেদের মধ্যেও আজকাল এই রোগ দেখা যায়। সম্ভবতঃ শিশুকালে কুষ্ঠাক্রান্ত (যদিও তার বেশী ঘা ইত্যাদি তখনও হয় নি) চাকরচাকরাণীর কোলে পিঠে থাকায় তাদের মধ্যে এই রোগের বীজাণু প্রবেশ করেছিল। সুতরাং শিশুপালন সম্বন্ধে সাবধানতা দরকার। পরিণত বয়সে এই রোগের সংক্রমণ আশঙ্কা অতিশয় কম। এই কারণে চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীদের এ ব্যাধি বড় একটা হ'তে দেখা যায় না। তারপর কুষ্ঠরোগীর এমন এক অবস্থা থাকে যখন তার শরীর থেকে বীজাণু বেরিয়ে অপরকে আক্রমণ করতে পারে। এমন অনেক রোগী আছে যাদের শরীরে রোগের বীজাণু থাকা সত্ত্বেও সে বীজাণু সংক্রমিত হতে পারে না। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে এ বিষয় জানতে পারেন।

প্রথম অবস্থায় হাত ও পায়ের নানাস্থানে দাগ দাগ বা ঘা হওয়া এবং সে সব জায়গায় চিমটি কাটলে বেদনা টের না পাওয়া (অসাড়তা), এই রোগের প্রধান লক্ষণ। কুষ্ঠ অনেক রকমের আছে। নিউরাল, টিউবারকিউলয়েড এবং লেপ্রোমেটাস এই তিন রকমের কুষ্ঠ দেখা যায়। কেবলমাত্র কুষ্ঠরোগে লোকে মরে কম—এর সঙ্গে প্রবল জ্বর, নিউমোনিয়া, রক্তাল্পতা প্রভৃতি যে সব উপসর্গ জোটে তাতেই সাধারণতঃ রোগী মারা যায়। অল্পদিন আগেও চাউলমুগরা তেল বা তদ্‌ঘটিত ঔষধ দিয়ে যাদের সবেমাত্র ঐ রোগ আক্রমণ করেছে তাদের সারিয়ে তোলা হ'ত। অবশ্য সেরে ওঠার পর আবার এই রোগ হ'তে দেখা যেত। লেপ্রোমেটাস শ্রেণীর কুষ্ঠ বেশী পুরাতন হ'লে এই ঔষধে আর কাজ হ'ত না। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে ভারত বা আফ্রিকাবাসী রোগীরা এই ঔষধে যতটা উপকার পায়—ইউরোপীয় বা মঙ্গোলীয় জাতির রোগীরা এতে ততটা উপকৃত হয় না।

আলকাতরাসম্ভূত মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য থেকে তৈরি সালফোন অ্যামাইড ও তদ্‌বর্গীয় ঔষধ অনেকদিন থেকেই বহু কৃচ্ছ্র ব্যারামে অদ্ভুত ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হ'য়েছে। কুষ্ঠরোগে এগুলির ব্যবহার করে চিকিৎসকেরা কোন ফল পান নি। ইতিমধ্যে সালফোন শ্রেণীর সিনথেটিক ঔষধের পরীক্ষা চলে। এর আসল দ্রব্য হ'ল প্যারা ডাই অ্যামিনোডাই ফিনাইল সালফোন বা সংক্ষেপে ডি ডি এস্‌। ইহা কুষ্ঠরোগে ফলপ্রদ হ'লেও এর ব্যবহার বিপজ্জনক বলে প্রথমতঃ চিকিৎসকেরা সরাসরি এর ব্যবহারে সাহস পান নি। ডি ডি এসকে প্রক্রিয়া-বিশেষের সাহায্যে তার বিষক্রিয়া কমিয়ে প্রথমতঃ ব্যবহার চলতে থাকে। পরে ব্রেজিল, নাইজিরিয়া, মাদ্রাজ, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের হাসপাতালে ডক্টর মুইর, ডক্টর লো, ডক্টর কোকরেন ও ডক্টর ধর্মেন্দ্র প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে অতি অল্পমাত্রায় ডি ডি এস রোগীরা সহ্য করতে পারে এবং তাতে আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায়। এতে একটি উপকার এই হল যে কুষ্ঠ চিকিৎসার খরচা গেল অসম্ভবরূপে কমে। একটি কথা বলা দরকার যে—ডি ডি এস এবং তৎসম্ভূত ঔষধগুলি কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে সমর্থ হলেও এই চিকিৎসা বড় সময়সাপেক্ষ। প্রায় এক বৎসর ঔষধ

খেলে বা ইনজেকশন দিলে রোগীর ঘাগুলি সেরে যায় বটে, তবে রোগীর দেহের সমুদয় জীবাণু নির্মূল হ'তে দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিত-ভাবে ঐ সব ঔষধ ব্যবহার করা দরকার হয়। সালফোন সাহায্যে কুষ্ঠ চিকিৎসা অনেকটা সহজ হলেও ঔষধটি তেজস্কর বলে চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে এই ঔষধ ব্যবহার করা নিরাপদ বা সমীচীন নয়।

কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের সুবিখ্যাত কুষ্ঠবিশারদ ডক্টর ধর্মেন্দ্র বহু পরীক্ষার পর স্থির করেছেন যে, একজন কুষ্ঠরোগীর জন্য এক বৎসরে ২৫ গ্রাম (প্রায় এক আউন্স) ডি ডি এস দরকার এবং তার দাম তিন টাকা চ আনা মাত্র। ভারতবর্ষে প্রায় ১০ লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে, সুতরাং সবচেয়ে সস্তা এই সালফোন দ্বারা চিকিৎসা করাতে বার্ষিক ১০ লক্ষ আউন্স বা প্রায় আটশত মণ ডি ডি এস দরকার। আমাদের দেশ এখনও রাসায়নিক শিল্পে অতিশয় অনুন্নত, একথা সকলেই জানেন। ঔষধপত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি এদেশে এখনও তেমন তৈরি হয় না। সালফোন অ্যামাইড ও তৎসম্পৃক্ত ঔষধপত্র এই কারণেই এদেশে এখনও প্রস্তুত হচ্ছে না। তবে আমরা এই মহা-উপকারী সালফোন ড্রাগ তৈরি থেকে কি বিরত থাকব? কুষ্ঠরোগের জন্য বার্ষিক অন্ততঃ ৩০ লক্ষ টাকার ঔষধও কি আমাদের বিদেশীর কাছ থেকে কিনতে হ'বে? এস্থলে জেনে রাখা ভাল যে ডিডিএস এর সবচেয়ে পরিচিত নিরাপদ ডেরিভেটিভ (নভোট্রোন) বটিকা আকারে খেলে প্রত্যেক রোগীর সাংবাৎসরিক চিকিৎসার খরচ হবে দেড়শ টাকার ওপর এবং নভোট্রোন ইন্‌জেকশন ব্যবহার করলে প্রত্যেক রোগীর একবৎসর চিকিৎসায় খরচ করতে হবে ৩৫৲ টাকা। সুতরাং সেরূপ ক্ষেত্রে মাত্র ১ লক্ষ রোগীর চিকিৎসাতেই দেড় কোটি টাকার নভোট্রোন বটিকা বা ৩৫ লক্ষ টাকার নভোট্রোন ইন্‌জেকশনরূপে ব্যবহার করতে হ'বে। আমাদের দেশে এই সব নতুন ঔষধ তৈরি না হ'লে প্রতি বৎসর কত কোটি কোটি টাকা যে এই ব্যপদেশে বিদেশে চলে যাবে তা সহজেই বুঝা যাচ্ছে।

ইয়োরোপীয়েরা ধর্মপ্রচার বা ধর্মের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করেন। কিন্তু এই অর্থব্যয়ের ফলও পরলোকে নয়, বরং ইহলোকেই যে তত্রত্য দেশের লোকে ভোগ করেন—তা কুষ্ঠরোগ থেকেই বেশ বুঝা যায়। অনেকেই জানেন ধর্মপ্রাণ ইয়োরোপীয় পাদরিগণই ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কুষ্ঠাশ্রম প্রধানতঃ পরিচালনা ক'রে থাকেন। এঁদের সহায়তায় ঐ সব দেশের কোনও নতুন ঔষধের পরীক্ষা এই সব আশ্রমে প্রথম চালানো খুবই সহজ। অনুন্নত দেশের কালা-আদমীদের জীবনের দামও বেশী নয়, সুতরাং পাশ্চাত্ত্যের যে কোনও নতুন ঔষধ অতি সহজেই এই সব স্থানে পরীক্ষিত হ'বার সুযোগ পায়। তবে সবচেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে যে পাদরীদের পরিচালিত হাসপাতালে বিদেশী ঔষধের ব্যবহারও অপ্রতিহত গতিতে চলতে পারে এবং তাতে করে পাশ্চাত্ত্যের ঔষধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠবার সুযোগ লাভ করে। আমাদের দেশে ঐ ঔষধ তৈরী হ'লেও পাদরীরা সহজে দেশীয় ঔষধ কিনবে না। ধর্মকার্য্যে নিয়োজিত অর্থ জাতীয় সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে ইহলোকেই কিরূপ কার্য্যকরী হয়, এ তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এখন এই মহাউপকারী ঔষধ প্রচুর পরিমাণে তৈরি করে দেশের চাহিদা মিটানো যায় কিনা দেখা যাক। প্রচলিত পদ্ধতিতে—যে উপায়ে বিলাত ও মার্কিন মুলুকে প্রস্তুত হয়—করতে গেলে গোড়াতেই যে দু'টি রাসায়নিক দ্রব্য দরকার—তা আমাদের দেশে এখনও উৎপন্ন হয় না। বিদেশ থেকে এগুলো আমদানী ক'রে এনে করতে গেলে বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো অসম্ভব। এই সমস্যা বাংলা-দেশের একজন কারখানার কেমিষ্টকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। ভাগ্যক্রমে জার্মানভাষায় তাঁর দখল ছিল। অনেকেই জানেন জার্মানরাই জৈব রসায়নশাস্ত্রের জন্মদাতা। সুতরাং তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডারে অনেক কিছুরই হদিস মেলে। আমাদের কেমিষ্ট তখন পুরাতন জার্মান রাসায়নিক নথিপত্র ঘুঁড়তে আরম্ভ করলেন। ১৮৯৪ সালের ও ১৯০৮ সালের জার্মান কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় এ বিষয়ের সন্ধান মিলল—দেখা গেল যে আমাদের দেশীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি থেকেই ডিডিএস করা যেতে পারে। তখন তিনি পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করলেন এবং পথে যে সব বাধা পেলেন সেগুলি ক্রমশঃ দূর করে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রচলিত দামী রি-এজেন্ট ব্যবহার না করে সস্তা জিনিসের সাহায্যে কিরূপে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যেতে পারে তার জন্য মাসের পর মাস চিন্তা, পড়াশুনা ও সঙ্গে সঙ্গে কাজ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত তিনি সফলমনোরথ হলেন। ডিডিএস প্রস্তুত করার পর তা থেকে তার সবচেয়ে নিরাপদ ডেরিভেটিভ (derivative) ও ইনি তৈরী করলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাংলাদেশে এই ঔষধগুলি তৈরি হওয়া মাত্রই বিদেশী কোম্পানীরা তাদের ঔষধের দাম যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে; অবশ্য তথাপি দেশীয় ঔষধের দাম তাদের চেয়ে কম রাখা হ'য়েছে। এই ঔষধ যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদেশী ঔষধগুলির চেয়ে আদৌ নিকৃষ্ট হয় নাই, বরং সর্বাংশে সমগুণসম্পন্ন হ'য়েছে ট্রপিক্যাল স্কুলের কুষ্ঠ বিভাগের অধিকর্তা ডক্টর ধর্মেন্দ্র গত ২ বৎসর যাবৎ রোগীদের উপর পরীক্ষা করে তা সপ্রমাণ করেছেন এবং তাঁর পরীক্ষার ফল বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ ক'রেছেন। ডক্টর কোকরেনের নির্দেশে, হায়দারাবাদের ইয়োরোপীয় কুষ্ঠ বিশারদ ডাক্তার কারাণ্টও বাংলাদেশে প্রস্তুত এই ঔষধের সপ্রশংস রিপোর্ট দিয়েছেন। দেশে যখন এই খাঁটি ঔষধ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে এবং চাহিদা অনুযায়ী এর প্রস্তুতি বৃদ্ধি করবারও সকলপ্রকার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন জাতীয় সরকারের সহানুভূতি ও সহায়তা পেলে সালফোন বর্গীয় ঔষধের জন্য ভারত আর পরমুখাপেক্ষী (পশ্চিমমুখী) থাকবে না—একথা জোর করেই বলা যায়। দুঃখের বিষয়, জাতীয় সরকারের কৃপাদৃষ্টি সম্যক-ভাবে এদিকে এখনও পড়ছে না কেন জানিনা। সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের অনেক মহৎ ব্যক্তির মধ্যেই সাহেব প্রীতি এখনও বিলুপ্ত হয়নি—তাই সাহেবরা এইসব ঔষধ এদেশে তৈরি করবার প্রস্তাবও তাঁদের কাছে পেশ করতে সাহস পাচ্ছে। দেশের আরব্ধ সম্ভাবনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলাই জাতীয় সরকারের সর্বপ্রধান কর্তব্য। শিল্প-

হবে—একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে না চললে আখেরে আপশোসের অন্ত থাকবে না। জৈব রসায়নশাস্ত্রের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ঔষধ প্রস্তুতিতে তেমন বিরাট আয়তনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। অ-জটিল আবশ্যকীয় যন্ত্র ও পাত্রাদি আমাদের দেশীয় কারিগরদের দ্বারাই তৈরি করে নেওয়া চলে। কাজেই বার্ষিক যদি লক্ষ লক্ষ টাকার এই ঔষধ এদেশে প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা হয় তবে তাতে করে অসংখ্য বেকার লোক কাজ পাবে—ফলে দেশের বেকার সমস্যারও কথঞ্চিৎ উপশম হবে। জলেই জল বাঁধে। এই একটি শিল্প দাঁড়িয়ে গেলে শিল্পপতিগণ এবং কেমিষ্টরাও মনে বল পাবেন—যাতে করে এইরূপ আরও মূল্যবান ঔষধ তাঁরা দাঁড় করাতে পারেন তার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর হবেন। জৈব-রাসায়নিক শিল্পে উচ্চ রাসায়নিক জ্ঞানের অধিকারী কৃতবিদ্যলোকের দরকারও অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। সুতরাং বহু উচ্চশিক্ষিত কেমিষ্ট এরূপ শিল্পে আত্মনিয়োগ করে জীবিকার্জনে সমর্থ হ'বেন। দেশ ক্রমশঃ অগ্রসর হ'তে থাকবে। যে দেশে জৈব-রসায়ন শিল্পের মূল পদার্থ পাথুরে কয়লার অফুরন্ত ভাণ্ডার বিদ্যমান, তাদের আবার অন্নবস্ত্রের ভাবনা কিসের? দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভারত সরকারের এবং নবজাগ্রত দেশবাসীর আন্তরিক সহায়তা ও প্রচেষ্টায় কুষ্ঠরোগে সুপরীক্ষিত সালফোনবর্গীয় ঔষধ-প্রস্তুতি ব্যাপারে ভারত স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করুক এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে জৈব-রসায়ন শিল্প—সিনথেটিক ঔষধাবলী, রঞ্জন পদার্থ ও গন্ধদ্রব্যাদির প্রস্তুতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে দেশ উন্নতির পথে ধাবিত হ'ক ইহা আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

রিভিয়েরা সাগর-বেলা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভূমধ্য-সাগরের ফরাসী সহর নীস্ হতে ইটালীর স্পিজিয়া অবধি সাগর তীরকে বলে রিভিয়েরা। আমরা গত অগষ্ট মাসে মোটরে ঐ সাগর কুলের উপর দিয়ে ইটালীর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। ফরাসী রিভিয়েরার প্রধান দুটি সহর নীস্ এবং মেণ্টন। একাধারে প্রখ্যাত এবং কুখ্যাত মণ্টিকার্লো ও মোনাকো এই দুটি সহরের মাঝে। ইটালীর রিভিয়েরার প্রধান সহর বরডিঘেরা, সানরেমো, রেপাল্লো, লেভাণ্টো এবং স্পিজিয়া। অবশ্য জেনোয়াও সাগর তীরে। কিন্তু তার খ্যাতির কারণ ভিন্ন। জেনোয়া বড় বন্দর, জনাকীর্ণ সহর এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর।

দক্ষিণ ফরাসীদেশের ভূমধ্য-সাগর তীরে মারসাই সহর অবশ্য সকল বিষয়ে বড়। পৃথিবীর সকল জাতির হেথায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কারণ সব জাহাজ এ বন্দরে আসে। নানা দোকান, বহু যাত্রীর ঘাঁটি। উপরে পাহাড়ের শিরে নোটারডাম গির্জা। ফরাসীদেশের অন্য সব গির্জার তুলনায় অবশ্য মার্শাই গির্জার অন্তরের শিল্প-শোভা বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু এর স্থিতি অতি সুন্দর স্থলে। শৈলশিরে দাঁড়িয়ে এ ধর্ম-ভবন ইতিহাসের বহু অধ্যায়ের সাক্ষ্য। আমরা খুব উপভোগ করেছিলাম পাহাড়ের উপর হতে বিশালতার দৃশ্য।

রিভিয়েরার সহরগুলির মধ্যে নীস্ এবং মণ্টিকার্লোর আকর্ষণ সর্বাধিক। গ্রীষ্মকালে যে হাজার হাজার লোক রিভিয়েরায় ভ্রমণ করে তাদের মধ্যে অধিকাংশ ভ্রমণকারী নীস্, মণ্টিকার্লো এবং মোনাকো যায়। এই ভ্রাম্যমানদের মধ্যে য়ুরোপের লোকই অধিক। আমেরিকীও দলে দলে রিভিয়েরা ঘোরে। কতক ভারতবাসী, চীন, মিশরী এবং তুর্কীর ছিটেফোঁটা জনতার মাঝে চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য যারা রেলে বা মোটরে ঘোরে তারা চায় আরাম এবং বিশ্রাম। কিন্তু বহু যুবক যুবতী এবং অতীত-যৌবন নর-নারী বাইক বা মোটর সাইকেলে ঐসব দেশ পরিভ্রমণ করে। তারা পাহাড়ের উপরে চড়ে, গিরিবর্ত্ম পার হয়। ইটালীতে মোটর-বাইকের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এক শ্রেণীর মোটর-বাইকের চাকা নীচু এবং সমস্ত যানটি চওড়া পাতের ওপর। এগুলা নিরাপদ, ফট্‌ফট্ শব্দও করে অল্প। এ সব যাত্রী ছাড়া হাইকার আছে। এরা পদচারী পরিব্রাজক। পিঠে আট্‌কানো থলের ভিতর বস্ত্রাদি আবশ্যক বস্তু থাকে। এরা পদচারী নামে—কারণ গাড়ি দেখলে বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় গন্তব্য দিক। যার গাড়ীতে স্থান থাকে সে সমাদরে হাইকারকে সহযাত্রী করে নেয়, কারণ সবার উদ্দেশ্য

আনন্দে আত্মোৎসর্গ ক'রে নিত্য জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দেওয়া। বেচারা হিক্-হাইকার পদচারী পথচারীর প্রাণে স্ফূর্তি আছে, রোমান্স আছে, হয়তো পকেটে পয়সা নাই। আনন্দের স্রোতে তাকে ভাসিয়ে না নিলে প্রাণে আত্মগ্লানির সুরের রেশ গুণগুণ করা অনিবার্য্য। আমি যতটুকু দেখেছি তা' হ'তে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, প্রত্যেক ভ্রাম্যমান বিশ্রাম-লালসার একটা উপায় ভাবে নিজেকে এবং পরকে যথা-সম্ভব সুখী করা। অবশ্য কদর্য্য আত্মম্ভর স্বার্থপর ব্যক্তি ছুটিতে রিভিয়েরা বা সুইজারল্যাণ্ডে ঘোরে না—এ কথা আমি বলছি না। মোটের ওপর লোকের সেই ভাব —যেটা দশাশ্বমেধ ঘাট বা হরকী-পয়রীতে দেখা যায়।
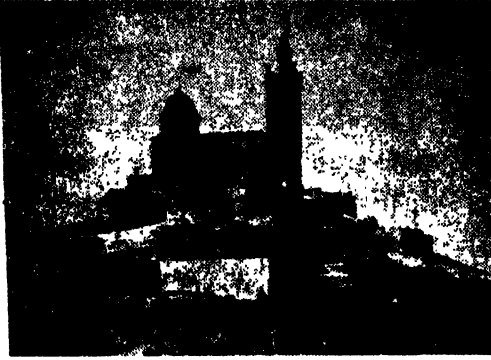
মার্সাই নোটারডাম

পাশ্চাত্য অত বেশী মিশতে পারেনা—কিন্তু অবকাশের দিনের য়ুরোপের নর-নারীর মেজাজ অসহ্য বা রূঢ় নয়।

পাহাড়ের নাম অল্পস্ হ'লেও তিনি মোটে অল্প নন, একথা ভূগোলে প্রত্যেক ছাত্র পড়ে। ফরাসীদেশে হট্ আল্পস্, মারিটাইম আল্পস্ প্রভৃতি পার হ'য়ে আমরা গ্রিমল্ডি হ'তে নীস্ পৌচেছিলাম। শৈল পথের দৃশ্য অপূর্ব। গিরিনদী, হ্রদ, দূরে তুষার-শির পাহাড়, পথের ধারে ফুল এবং থোকা থোকা দ্রাক্ষা ফল। এ পথে রোমাঞ্চ আছে, রোমান্স আছে। কিন্তু দুটি শিশু নিয়ে পাহাড়ের সুরঙ্গের পর সুরঙ্গ, নদীর পর নদী, ময়াল সাপের মত সর্পিল পথে পরিভ্রমণে মন অচঞ্চল থাকতে পারে না। তবে প্রত্যেক যাত্রী বিপদের হাত এড়াবার জন্য ব্যাকুল, তাই বিপথ-গামীর প্রাচুর্য্য নাই। প্যারিসের মোটরচালক কলিকাতার শিখ পাইয়াদের শুভ্র সংস্করণ। কিন্তু পাহাড়ে শান্তম শিবম্ সুন্দরমকে মানে সকল মোটরচালক। অবশেষে সাগর দর্শন ক'রে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নীসে ভূমধ্য-সাগরের শান্ত মূর্তি সূর্য্যালোকে যেন জ্বলে উঠেছিল। শান্ত হ'লেও সাগর তরল-তরঙ্গ-ভঙ্গে লীলা-চঞ্চল। শত শত নর-নারী তার কূলে কূলে বাগানের ভিতরে বাহিরে, বাঁধা ঘাটে, বাঁধের নিচে যেন রত্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি খুঁজছে তারা তা' জানেনা—কোথায় আমোদ, কোথায় প্রমোদ, কোথায় রগড়, কোথায় মজা! স্পষ্ট জানেনা তারা দেখতে চায় হাসি কি কান্না। এক জায়গায় অধিকক্ষণ স্থির হ'য়ে কেহ বসেনা, যেথায় একটা নতুন কিছু—ছোটে সেইখানে। কিন্তু সবার বাসনা এক—দেখে শুনে ঘুরে বসে নিজের দৈনিক জীবনের অনুভূতিকে স্ফূর্তির গলা টিপ্‌তে দেবেনা। মোট কথা, রিভিয়েরা সহরগুলি মানুষের সেই ভাবের পরিপোষক নয়, যার-আদর্শ—

সাগরকূলে বসিয়া বিরলে গণিব লহর মালা
মনোবেদনা কব সমীরণে জুড়াব মনের জ্বালা।

য়ুরোপের সকল সহর এবং প্রকৃতির মধুর লীলা-কোমল স্থান চায় পরিব্রাজক। তাতে সহরের দোকানী পশারীর লাভের পথ খুলে যায় এবং নিজের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি তার সম্প্রসারণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। আজও য়ুরোপীয় কর্ম্ম-কুশল। কাজেই প্রত্যেক স্থলকে সাজিয়ে রাখতে চায় পাশ্চাত্য। আমরা প্রকৃতির শোভাকে শিল্পের পরশ দিয়ে বাড়াতে চাই না। কিন্তু যেখানে খোদার ওপর খোদগারী করলে মানুষের মনস্তুষ্টির সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে য়ুরোপ কাটছাঁট ও দাগরাজি অনাবশ্যক ভাবে না। নদী শুকিয়ে গেলেই তার দুদিক ভরিয়ে দেয় তাই বালী-সৈকত বা কাদার কূল প্রায় চোখে পড়ে না। লণ্ডনের টেমস্, পারিসের সেন, ডবলিনের লিফি প্রভৃতি দুদিক বাঁধা খালের মত—পাড়ের নিচেই জল। বকচর জমি নাই, কাদা খোঁচা পাখি নাই।

নীসের সাগর-বেলার ঐ রূপ। অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাঁধা পাড় তাকে ঘিরে রেখেছে। জোয়ারে জল বাড়ে, ভাঁটায় জল কমে—কিন্তু বালু-বেলা পরে, অভিমানভরে আকুল-জলধি

আছাড়ি গুমরে না। সাগর কূলে বাঁধের উপর প্রকাণ্ড বাগান। সহরটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। তাকে পূবের পরশ দেবার জন্ম পাম গাছ। অবশ্য ফুলের বিকাশ পর্য্যাপ্ত।

নীসে সাগর-বেলার ধারে প্রায় সব জনপ্রিয় হোটেল, ক্যাশিনো প্রভৃতি অবস্থিত। বড় বড় দোকান এই প্রথম পথে অল্প। পিছনে সহর। নানা জাতি ফল, ফুল, প্রসাধন-দ্রব্য, স্নানের পোষাক এবং স্মারক খেলনা ও শিল্প-সম্ভারের বিপনী। আরও গভীরে স্থানীয় লোকের বাস। এখানে বড় গির্জ্জা আছে এবং সারাক্ষণই ফরাসী দেশের মেয়েরা কেহ না কেহ তার ভিতরে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে। নীসের বিশপ আছে। স্থানীয় লোকের জীবন-স্রোত, যাত্রীর লীলা-স্রোত হতে ভিন্নমুখ। স্থানীয় গৃহস্থ কিন্তু প্রবাসীর নিকট হ'তে বহু অর্থ উপার্জন করে—অবশ্য পণ্যের বিনিময়ে।

দিনের বেলা এ-সহরে মেয়েদের পোষাক স্বল্পাদপি স্বল্প। স্নানের অজুহাতে তারা নাইবার পোষাকে সারা সহর চোষে ফেলে। সবাই সমুদ্রে স্নান করে কিনা, সে তথ্য সম্বন্ধে আমি হ্যাঁ বা না কোনো কথা বলতে পারি না। প্রসাধনের মধ্যে ঠোঁটে লালরং এবং নখে টুকটুকে কিউটেক্স। মেয়েরা দল বেঁধে ঘোরে। একস্থলে মজা দেখতে দেখতে—দে ছুট। অন্যত্র সার্ক-রাইডিং দেখতে চলে যায়।

প্রথম বৈকালে, তখনও আমার পরিবারবর্গ প্রাজা হোটেলে ছিল। আমি একেলা ঘুরছিলাম প্রমেনাদ দি আংগ্লে নামক পথে—সমুদ্রের তীরে। চারিদিকে হাসি, সবার এক উদ্দেশ্য—রবিকরগুলা সটান এসে গায়ের চামড়ার ওপর পড়ে। আমি নতুন মানুষ, হাবভাব পথঘাট বোঝবার চেষ্টায় একটু হয় তো গম্ভীর হয়েই ঘুরছিলাম। পুরাতন দেহটায় ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে বিদেশে রোগে পড়বার ভয়ে শ্যাম অঙ্গ জামায় ঢেকে রেখেছি। সত্যিই বিসদৃশ দৃশ্য।

তিনটি অতি অল্পবস্ত্রালঙ্কৃতা শ্বেত-কুমারী ভাবলে—আহা বেচারা। আমি তখন জানতাম নীসের উচ্চারণ নাইস্ নয়, যদিও ছাত্রাবস্থায় শিখেছিলাম নাইস মানে সুন্দর এবং ফরাসী দেশের সহরের নাম। নীস মানে ভাইঝি, ভাগ্নি ইত্যাদি।

সৈকত পথ-যাত্রী

একটি যুবতী মধুর হেসে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের নীসকে আপনি কেমন পছন্দ করেন?

আমি অতি সরলভাবে তাদের তিনজনকে পরীক্ষা করে বল্লাম—তুষ্পিত হলাম। আপনাদের পরস্পরের সম্পর্ক জানি না। কে আন্টি কে নীস্। কিন্তু আপনারা তিনজনই পরমা সুন্দরী।

উল্লাসে তারা হাসলে—নাচের ভঙ্গিমায় স্যাণ্ডালের গোড়ালীতে ভর দিয়ে এক পাক ঘুরে গেল।

—না না নীস্ না নীস্—এই জায়গা।

আমি বল্লাম—ওঃ! আন্টির ব্যাপার নয়। হ্যাঁ

ইংরাজি ভাষায় বলতে পারি এটি নাইস্। তারা পরীর মত উড়ে গেল, তাদের হাসির রোল আমার কাণে রেশটুকু রেখে গেল।

এই হ'ল্ নীসের অবকাশের দিনের প্রমোদ।

আর একদিনের কথা বলি। সাগরকূলে চেয়ারে বসে জীবন্ত চলচ্চিত্র দেখছি। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। বহু নর-নারী পোষাক পরেছে, রাতের আমোদের জন্য। অমন স্থলে লজ্জা করতে লজ্জা আসে। হাসিমুখ, স-প্রতিভ সবজান্তা ভাব। হঠাৎ এক আর্টিষ্ট যুবক আমার মুখ আঁকবার অনুমতি চাহিল। আপত্তি কি? চালাক তুলি।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। আগন্তুক ব্রাউন লোকের ব্রাউন পেপারে ছবি আঁকা হচ্চে, এ একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। শিল্পী প্যারিসের মোমার্টের চিত্রকর। একটা ছোটখাট
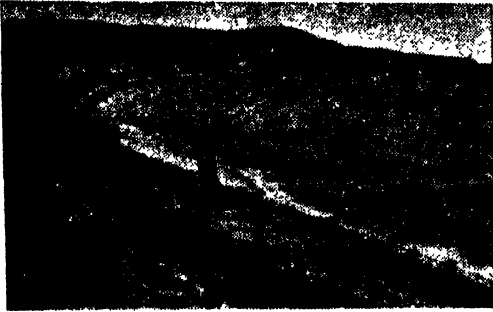
নীস-সৈকত

জনতা শিল্পীকে ও শিল্প-বস্তুকে ঘিরলে। অন্য লোক হলে মূর্চ্ছা যেত বা টাকার থলি ফেলে এসেছি বলে আসন ছেড়ে পিট্টান দিত। বহু বর্ষের পুলিস্ কোর্টের আবহাওয়া যে আমার স্নায়ুকে এত শীতল করেছে, সে সন্দেহ পূর্বে আমার নিজেরই ছিল না। হাসি মুখে বসে রইলাম। ওপরচাল সাধারণ। ফরাসী ভাষায় নানা রকম মন্তব্য চল্‌লো। কিন্তু শিল্পী নিজের মনে খড়িমাটি ও ক্রেয়োঁর রেখা চালিয়ে গেল। বোধ হয় তার তৃপ্তি হচ্ছিল।

কিন্তু সুখের লাগিয়ে যে ক'রে পীরিতি দুঃখ যায় তার ঠাঁই। তার শিল্প-প্রেম চোট খেলে—যখন এক পুলিস এসে ভীষণ অবোধ্য ফরাসী ভাষার স্রোত ছোটাল। ইংলণ্ডে কেহ পুলিসের সঙ্গে তর্ক করে না। কিন্তু সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দেশ এ বিষয়ে সদ্য-স্বাধীনতা পাওয়া ভারত হ'তে অধিক দূরে অগ্রসর হয়নি।

কী কাণ্ড! ব্যাপার কি? কিসের অভিনয়?

একটি উদার-মতি যুবতী টেলিগ্রাফের ইংরাজিতে আমাকে নাটকের সারাংশ বুঝিয়ে দিলে—শিল্পীর লাইসেন্স নাই। জেণ্ডারম পছন্দ করে না। ওকে যেতে বলা হচ্চে।

একজন বেশ পরিপাটি পোষাকে বিভূষিত ভদ্রলোক ভাল ইংরাজিতে বল্লেন—তবে আপনি ওকে বাঁচাতে পারেন—যদি বলেন যে এটা প্রীতির শ্রম (লেবার অফ্ লাভ)।

আমার নিজের লাভের স্বার্থে আমি বল্লাম—নিশ্চয়। এটা বন্ধুত্বের ব্যাপার।

ভদ্রলোক বল্লেন—এটা আপনি প্রকাশ্যভাবে বলে দিন আমি অনুবাদ করছি।

আমি বল্লাম—মঁসো অফিসার, আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে প্রধান শিল্পী ভগবানের হাতে গড়া আমার এ মুখ শিল্পের নমুনা স্বরূপ। তাই উনি বিনা পারিশ্রমিকে শিল্প-তৃষা মেটাচ্ছেন।

সশ্রদ্ধভাবে জেণ্ডারম্ শুনলে আমার প্রশ্ন। সে কুর্ণিশ ক'রে স্বীকার করলে আমার বিবৃতির সমীচীনতা। সভাস্থ নরনারীর হাসির রোল সাগরের হাওয়ার পিঠে চড়ে বহুদূর ছুটলো।

আমি বল্লাম—শীঘ্র আপনি এ চিত্র লুভ সংগ্রহশালায় দেখতে পাবেন।

কিন্তু শোনে কে? হাসতে হাসতে পুলিস প্রভু সরে পড়লো। আর নিমেষের মধ্যে ভিড় হাওয়ায় উড়ে গেল। কারণ অদূরে কাঠে চড়ে একজন সমুদ্রে সার্ফ রাইড্ করতে করতে জলে পড়ে গেল। অবশ্য যে মোটর বোট তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সে সাঁতার কেটে তার ওপর আশ্রয় নিলে। আমি আর শিল্পী বাকী রহিলাম। বাধা পাওয়া হাত আমার সুন্দর মুখের মাত্র একটা বিকৃত ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করলে।

আমি এসব ঘটনা বিশদভাবে দিচ্ছি—রিভীয়েরার জীবনের ছবি দেবার জন্য। পুরী প্রভৃতি দেশে ছুটির দিনে আমরা আনন্দ করি, কিন্তু নিজেদের আমোদের

সরোবরে ডুবিয়ে দিই না। পুরীতে নুলিয়া আছে, বিরাট ঢেউ আছে, কিন্তু ঢেউ সওয়ার বা সার্ফ রাইডার নাই। আর আছে এ-দুদিনেও ভারতীয় নারীর অঙ্গে শাড়ি।

আমি চাহিনা পাশ্চাত্যের এ অনুকরণ। আমাদের আনন্দের ধারা ভিন্নমুখ। আনন্দে আত্মসমর্পণ দেহ ও মন উভয়ের পক্ষে হিতকর অবকাশের দিনে। তবে যেদিন নগ্নদেহে প্রাচ্যের মহিলা শ্যামবর্ণ মুখে রঙ্ মেখে, ঠোঁট মা কালীর মতো ভীষণ রক্তবর্ণ ক'রে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াবে, এ-দুর্ঘটনা প্রাচ্যের বিশেষত্বকে নষ্ট করবে। নারী লক্ষ্মী—এদেশের এই বাণী। পাশ্চাত্যের অভিনব ধারণা স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্যের আদর্শে তার কর্মধারার নিন্দা নিন্দনীয়, কিন্তু আজ এই অনশন-ক্লিষ্ট দেশে লক্ষ্মীরা যদি সন্ধ্যার পর ক্লাবে পর-পুরুষদের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নৃত্য-করেন এবং জুয়াখেলে অর্থ ও স্বভাব নষ্ট করেন, ভারত ভারত থাকবে না—অন্য দেশ হ'বে। সে অবস্থা ভালো হ'বে কি মন্দ হ'বে, সে বিবেচনা করবে দেশের চিন্তাশীল নরনারী।

নীস প্রভৃতি স্থানের রাত্রের আমোদ ভিন্ন রকমের, তথায় তিনটী প্রমোদ গৃহ আছে—তাদের বলে ক্যাসেনো। ক্যাসেনোতে নৃত্য হয়, গীত হয়, মাঝে মাঝে অভিনয় হয় এবং প্রতি রাত্রে দ্যূতক্রীড়া চলে। ইংরাজি এবং আধুনিক দেশী আইনে ক্লাবে নিজেদের সভ্যদের মধ্যে জুয়া নিষিদ্ধ নয়। কেবল ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাহিরের লোক নির্দিষ্ট স্থলে বাজি রাখতে পারে। কিন্তু ক্যাসিনোতে অবাধে জুয়া চলে, হাজার হাজার টাকা একজনের পকেট হ'তে অন্য পকেটে যাত্রা করতে পারে রুলের চাকায় চড়ে। অন্য ঘরে নাচ চলে।

নীসে তিনটি বড় ক্যাসেনো বিদ্যমান। একটি মুনিসিপাল, একটি ক্যাসেনো লা জেটি, অন্যটি প্রকাণ্ড—ক্যাসেনো প্যালে ডি লা মেডিটারেনিয়ন।

নৃত্যের সহচর সহচরী সাধারণতঃ নিজের পরিচিতের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন মানুষ থাকে যে নিঃসঙ্গ। তার পক্ষে নৃত্য যদি হয় আমোদ-জনক, প্রমোদ-গৃহ চাহে না তার কাছে টিকিটের মূল্য নিয়ে তাকে মাত্র অতৃপ্ত দর্শক ক'রে বসিয়ে রাখতে। একদল নারী থাকে প্রমোদ-গৃহের বেতন-ভোগী, যাদের নৃত্য-সঙ্গিনী হিসাবে পাওয়া যায়। এরা নৃত্য-কলা-পটীয়সী, অনেকে ভাল বংশের মেয়ে। প্রচার হিসাবে একদিন যুরোপ জাপানের গেইসা-নারীর নিন্দা করেছিল। কিন্তু দূরবীণ ঐ দেশেরই যন্ত্র। একদিক দিয়ে দেখলে পদার্থকে বড় দেখায়, অন্য দিক দিয়ে দেখলে দ্রব্যের আয়তন কমে যায়। যেমন নিঃসঙ্গের নাচের ব্যবস্থা আছে, আমোদ বিতরণের কর্ম-সূচীতে নিঃসঙ্গিনীরও সহচরের বিধান বিদ্যমান। এরা বেশ সুদৃশ্য বলিষ্ঠ পুরুষ, নাচতে পারে ভালো, সহচর-বিহীন মহিলাদের এরা নাচায়। এদের বলে গিগোলো।

বলা বাহুল্য দ্যূত-ক্রীড়ার হরিহরছত্রের মেলা মণ্টি-কার্লোতে। আমরা দিনের বেলায় সে সহর হতে

স্নানের আয়োজন

মেণ্টন গিয়েছিলাম। এ জায়গার কথা বিলাতী বহু পুস্তকে বিবৃত। অন্যত্র লোক যায় অবকাশের জন্য, ফাঁক পেলে একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে ক্যাসেনোয়। কিন্তু শুনলাম মণ্টি কার্লোতে বহু লোক জুয়া খেলাকে যাত্রার প্রধান লক্ষ্য ক'রে সেখানে যায়। অনেক লোক আছে যারা নিজেদের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য মণ্টি কার্লোয় জুয়া খেলেছি এই গাল-ভরা সমাচার দেয়। কিন্তু সত্যই এখানে একদল লোক যায়, যাদের জীবনের প্রধান বৃত্তি ও আমোদ দ্যূত-ক্রীড়া। এখানে একদল মহিলা আছে যাদের পেশা ধনী শীকার—তাদের অর্থে জুয়াখেলা এবং তাদের রোলস্ রয়েসে চড়ে ঘুরে বেড়ানো।

ইতালীর জুয়ার একমাত্র বৈধ ক্যাসিনো স্থান

রেমেতে। ইটালীর রিভিয়েরার বাকী স্থলে সরকারী ক্যাসেনো নাই জুয়ার জন্য। একবার বহু লোকসান দেওয়া এক ইতালীয় আমায় বলেছিল—ইংরাজিতে তিনটি শব্দ ওয়াইন, উওমেন এবং ওয়েজারকে বলে তিন ডবল ইউ। কিন্তু মাদকতায় ওয়জারিঙের কাছে বাকি ছুটি ছেলেখেলা।

অবশ্য অন্যমত ও শুনেছি। যাক।

মোনাকো বা মন্টি কার্লো সুদৃশ্য সহর। বহু সমৃদ্ধ দোকান, অট্টালিকা প্রভৃতি সাগর কূলে। কিন্তু রাস্তা সরু। প্রকৃতির শোভা নষ্ট হয়েছে মানুষের হাতে।

নীস্ ছেড়ে ইতালীর দিকে যাবার পথ অপূর্ব সুন্দর। একদিকে নীল সাগর, অন্যদিকে শৈল শ্রেণী। কূলে পথ। পথের পাশেই আল্‌পসের নীচু অনতিউচ্চ পাহাড়-শ্রেণী আকাশের নীলকে যেন বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। নীস এবং মন্টি কার্লোর মাঝের একটু পথকে বলে কার্ণিস। সেখানে কোল ডিজ (Col D'zze) নামক একটি পুরাতন গ্রাম আছে পাহাড়ের গায়ে। মধ্য যুগে সেটি সারাসেন দস্যুদের আবাসভূমি ছিল। একটি প্রকাণ্ড সেতু পার হয়ে রাস্তা নেমে গড়িয়ে পড়লো মন্টি কার্লোয়।

মেণ্টন ফ্রান্সের শেষ রিভিয়েরার সহর। এই সাগর-কূলের রাস্তা ধ'রে ইতালীর লিজুরিয়া হতে রোমক সৈন্য গল হিসপেনিয়া ও ব্রিটেন জয় করেছিল। এ রাস্তা রোমের গড়া। আবার এই পথেই রোমের বর্বর শত্রু গিয়েছিল, পরে গিয়েছিল বোনাপার্টি ইতালী জয় করতে। পথের এক অংশের নাম কোয়ে বোনাপার্টি। খাল কাটলে জলও আসে, কুমীরও আসে।

চাকরি-ক্ষেত্র

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মিনারলজি বা খনিজ-বিদ্যাটা মশগ্রেভিয়াস পরিবার একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি করে ফেলেছে !

এ পরিবারের জর্জেশ মশগ্রেভিয়াস হলেন স্বনামধন্য পুরুষ···এ বংশে প্রতিষ্ঠাকে তিনি এনেছেন রাজ-লক্ষ্মীর মতো জয় করে'। ফ্রেঞ্চ আকাডেমিতে খনিজ-বিভাগের কর্তার আসন তিনি অধিকার করে' আছেন আজ ত্রিশ বছর··· এ বিভাগের সেই গোড়া-পত্তনের দিন থেকে। তাঁর বড় ছেলে হ্যাঁ মশগ্রেভিয়াস মিউজিয়ামে মিনারলজির অধ্যাপক-- সেজো আঁরি নর্মাল-স্কুলে মিনারলজির ক্লাশে লেকচার দেন; বড় জামাই পীরি দোনো সরবোণ কলেজে মিনারলজির অধ্যাপক; মেজো জামাই চার্লশ বোনিগুঁয়ে এ পরিবারের স্বজন বলে মিনারলজির অধ্যাপনা করেন কিন্তু চাকরি ছোট···তুলোঁ ফাকাল্‌টিতে লেকচারার মাত্র।

এজন্য মেজো মেয়ের মনে অস্বস্তির সীমা নেই। স্বামীর আসন দাদাদের এবং বড় জামাইয়ের মতো উঁচু নয়··· স্বামীর সঙ্গে সুদূর গ্রামে তাকে থাকতে হয়। মা মাদাম মশগ্রেভিয়াসেরও সেজন্য মনে খুব ক্ষোভ—ছুটী-ছাটা হলে মেজো মেয়ে আর মেজো জামাই আসে তাঁর কাছে··· ছুটী মেলে মেজো জামাইয়ের বছরে তিনটিবার মাত্র। স্বামীকে তিনি নিত্য তাগিদ দেন—তোমার এক-চোখোমি···সেজোকে ফ্রেঞ্চ আকাডেমিতে আনাবে না! স্বামী গভীর কণ্ঠে বলেন—এখানে জায়গা কোথায় আর ?

এমনি অভিযোগ-অশান্তির মধ্যে দিন কাটছে।

হঠাৎ গভর্ণমেণ্ট স্থির করলে—সরবোর্ণে মিনারলজির জন্য আর একজন অধ্যাপকের আসন পাতা হবে।

মাদাম মশগ্রেভিয়াস স্বামীকে ধরলেন—এ কাজটা আমার চার্লশের পাওয়া চাই-ই···না, আমি কোনো ওজর শুনবো না! সবাই ভালো ভালো চাকরি করছে···আমার চার্লশই শুধু···

জর্জেশ বললেন—হুঁ···কিন্তু মিনিষ্টার নিজে লোক বাছাই করবেন! তাঁর কে ক্যাণ্ডিডেট আছে!

—না, তাঁকে তুমি বলবে, চার্লশ তোমার জামাই···তুমি এত কালের পুরোনো লোক···বলতে গেলে তোমার দৌলতেই মিনারলজি-ডিপার্টমেণ্টটা চলছে।

জর্জেশ বললেন—কিন্তু মিনিষ্টারের নিজের লোক··· তার ব্যবস্থা করবার জন্যই এ চেয়ার খোলা হচ্ছে!

মাদাম বললেন—কিন্তু চার্লশ এতদিন মিনারলজি পড়াচ্ছে, তার দাবী তো অগ্রাহ্য করা চলে না! তাছাড়া এ তো মিনিষ্টারের পৈত্রিক জমিদারী নয় যে নিজের লোককে বসাতে হবে!···সে লোক কাঁচা···তার কি এক্সপিরিয়েন্স আছে?···না, আমি শুনবো না···তুমি যাও, গিয়ে মিনিষ্টারকে বলো চার্লশের দাবীর কথা।

মাদামের কথায় যেতে হলো। মিনিষ্টারকে জর্জেশ জানালেন চার্লশের দাবীর কথা।

মিনিষ্টার বললেন—কিন্তু ও-চেয়ারের জন্য লোক আমি ঠিক করে' ফেলেছি, জর্জেশ···সুপিরিয়র-কৌন্সিল সে লোকের দরখাস্ত মঞ্জুর করেছে।···তোমার এ লোকটি কে, শুনি?

—চার্লশ বোনিগুঁয়ে···মিনারলজিতে চমৎকার জ্ঞান।

—তোমার জামাই না সে?

—হ্যাঁ।

মিনিষ্টার বললেন—আমি চার্লশের কথা শুনেছি—কিন্তু না, আমি আশা দিতে পারছি না, জর্জেশ! তাকে নমিনেট করা···উঁহু, অসম্ভব।

—কেন? কিসে অসম্ভব? তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলেছে?

—না, না, না···তা নয়!

জর্জেশ বললেন—তবে? সে মেধাবী ছাত্র···তার ইউনিভার্সিটি রেকর্ড···ব্রিলিয়াণ্ট। মিনারেল্‌স্ সম্বন্ধে সে যে সব প্রবন্ধ লিখেছে, আকাডেমি-অফ-সায়েন্সেস সে-সব প্রবন্ধের কী সুখ্যাতি করেছে!

মিনিষ্টার বললেন—চার্লশের কৃতিত্বের বা জ্ঞানের সম্বন্ধে আমার মনে এতটুকু দ্বিধা নেই!

তবে কেন তার দাবী অগ্রাহ্য হবে?

মিনিষ্টার একটা নিশ্বাস ফেললেন—নিশ্বাস ফেলে বললেন—এ-কথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো।···তার যোগ্যতা সম্বন্ধে কৌন্সিলে কারো মনে সংশয় নেই···সেদিক দিয়ে তার দাবী সবার চেয়ে বেশী! কিন্তু···

—কিসের কিন্তু?

—বলবো?

—নিশ্চয় বলবেন।

—তার দাবী গ্রাহ্য হবে না শুধু একটি কারণে এবং সে কারণ, সে তোমার জামাই!

—আমার জামাই বলে' তার যোগ্যতা আপনারা উপেক্ষা করবেন!

মিনিষ্টার বললেন—মিনারলজি ডিপার্টমেণ্টটা তোমার জমিদারীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে জর্জেশ! তুমি আছো—তোমার দুই ছেলে আছেন—তোমার এক জামাই আছেন—মানে, এ ডিপার্টমেণ্টটাতে তোমরা একচেটিয়া অধিকার কায়েমি করেছো···বাহিরের অন্য লোক এ ডিপার্টমেণ্টে মাথা গলাবে সে উপায় নেই! কাজেই কৌন্সিল এ সম্বন্ধে সুবিচার করতে চায়। এ যেন তোমরা একটা ডাইনাষ্টির পত্তন করেছো! নয়?

জর্জেশ বললেন—কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত আরো আছে।

মিনিষ্টার বললেন—সে সব দৃষ্টান্তে আমার প্রয়োজন নেই।···এ ষ্টেটের কোনো ডিপার্টমেণ্টে এ রকম ফেভরিটিস্‌ম্···আমি অন্ততঃ সহ্য করবো না। যেখানে এমন ব্যাপার দেখবো—তার বিরুদ্ধে আমি ফাইট করবো, আমার পণ! ফ্যামিলি-প্রোভিসন্স···না, মোটে নয়!

নিশ্বাস ফেলে জর্জেশ বললেন—খুব ভালো কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে ভীষণ অবিচার করা হবে না? যোগ্য লোকের উপর অবিচার?···এ পণ রক্ষা করবার জন্য আপনাকে অযোগ্য লোক নিতে হবে!

—অযোগ্য! তুমি ভাবো তোমার ছেলে, জামাই এঁদেরই শুধু যোগ্যতা আছে? যোগ্যতার জন্যই চাকরি করছেন—আর বাকী সকলে অযোগ্য?

জর্জেশ বললেন—তা নয়। মানে, চার্লশের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ হবার আগে চার্লশ ছিল আকাডেমিতে আমার ছাত্র—এবং বেশ মেধাবী ছাত্র!

মিনিষ্টার বললেন—যে-ছোকরাকে এই নতুন চাকরিতে নিচ্ছি, তার যোগ্যতা সম্বন্ধে কেউ একটি প্রশ্ন করতে পারবে না, জর্জেশ···তার নাম বললে তুমিও স্বীকার করবে সে অযোগ্য নয়।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জর্জেশ তাকালেন মিনিষ্টারের পানে।

মিনিষ্টার বললেন—এ ছোকরার নাম পল গ্রাঁজি, এ এখন নর্মাল স্কুলে চাকরি করছে !

জর্জেশের ভ্রূ হলো কুঞ্চিত। চার্লশ বললেন—পল গ্রাঁজি ?

—হুঁ। তার থীশিস পড়েছো ?

—পড়েছি।

—কেমন লিখেছে ?

—চমৎকার !

মিনিষ্টার বললেন—তার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট আমি পেয়েছি,…খুব ভালো।

—হুঁ—কিন্তু বয়সে ছোকরা !

—ভালোই তো! শিক্ষা-বিভাগে আমরা তরুণ কিশোরদেরই চাইছি। যখন তোমার জামাইকে না নিয়ে পলকে আমরা নিচ্ছি, তখন নিশ্চয় অযোগ্যের নির্বাচন হচ্ছে…এ কথা বলবে না, নিশ্চয় !

—কিন্তু আমার স্ত্রী মনে ভারী আঘাত পাবেন।

—সেজন্য আমি খুব দুঃখিত। কিন্তু সরকারী চাকরিতে লোক বাহাল করতে হলে তার যোগ্যতার দিকে নজর রাখতে হবে, মাদাম মশগ্রেভিয়াসের মনের কথা ভাবলে চলবে না! চার্লশের দাবী অস্বীকার করছি না।

—চার্লশ যে এ-চাকরি পেলো না, সেজন্য আমি খেশারতী দাবী করতে পারি না? তার কোনো ব্যবস্থা ?

—চার্লশ আকাডেমিতে চাকরি করছে না ?

—সে আছে তুলোঁয় আজ ছ' বছর। ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছে…বয়স পঁয়ত্রিশ বছর…এখনো স্কুল-মাষ্টারী করছে। তাকে প্রোফেশর করে' নিতে পারেন না? তুলোঁয় অধ্যাপকের চেয়ার নেই।…সেখানে একটা চেয়ারের ব্যবস্থা?…তাহলে বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর গঞ্জনা থেকে আমি রেহাই পাই।

মিনিষ্টার কি ভাবলেন, ভেবে তিনি বললেন—বুঝেছি। বেশ, আমি কথা দিচ্ছি—চার্লশের জন্য আমি সে ব্যবস্থা করবো।

জর্জেশ বললেন—শুধু কথার উপর নির্ভর করা যায় না। আমি পাকা ব্যবস্থা চাই।

মিনিষ্টার বললেন—পাকা কথা দিতে হলে তার আগে সুপিরিয়র কৌন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন।

—আপনি মনে করলেই পারেন এখনি পাকা কথা দিতে। ফ্যাকালটি, সুপিরিয়র কৌন্সিল—এরা আপনার কোনো কথায় 'না' বলতে পারবে না—আমি জানি।

—আমার কথায় নির্ভর রাখতে পারো জর্জেশ।

জর্জেশ বললেন—তাহলে ফিরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে আমি কি বলবো ?

মিনিষ্টার বললেন—বেশ, পাকা কথা দিচ্ছি, তোমার জামাই চার্লশকে মাসখানেকের মধ্যেই প্রোফেশার গদি দেবো।

মিনিষ্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—জর্জেশও উঠলেন। মিনিষ্টার বললেন—পলকে এ চাকরি দেওয়া হচ্ছে বলে এখন তোমার মনে খেদ বা অভিমান তো নেই আর ?

জর্জেশ বললেন—না, না। আপনি যোগ্য লোককেই এ চাকরি দিচ্ছেন। আমার স্ত্রীও আপনার এ নির্বাচনে খুব খুশী হবেন। কারণ পলের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ের বিবাহ হচ্ছে…বিবাহের কথা পাকা।*

* (ফরাসী গল্প, পল ক্লেশিয়ো)

শ্রীরামদাস বাবাজি

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

পরম পূজ্যপাদ, বঙ্গের বৈষ্ণবগণের মুকুটমণি, শ্রীল রামদাস বাবাজি মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরের নাম স্মরণ করি—যাঁহাদের পরম করুণার বলে এমন একজন মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। নামসর্বস্ব এই বদান্য বৈষ্ণবচূড়ামণি যে জগতের কি মঙ্গলসাধন করিতেছেন, তাহা আমরা অনেক সময়ে প্রণিধান করি না। সর্বপ্রকার পাপে পঙ্কিল এই ধরণীতে ইঁহারাই ধর্ম, পুণ্য ও সাধু আদর্শের বৈজয়ন্তী আপ্রাণ চেষ্টায় উড্ডীন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলি-যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম নামসঙ্কীর্ত্তন—এই সত্য সম্মুখে রাখিয়া বাবাজি মহারাজ বহু বৎসর যাবৎ এই নামব্রতে ব্রতী আছেন। অক্লান্তভাবে নামের মহিমা প্রচার করিয়া, অহিংসা ও প্রেম ভক্তির আদর্শ বিশ্বে স্থাপন করিয়া, অগণিত লোকের পারমার্থিক জীবন-গঠনে সহায়তা করিয়া, নানা দেবস্থানের উদ্ধার ও সংস্কার সাধন করিয়া তিনি আমাদিগকে যে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন, তাহার শতাংশের এক অংশ ঋণও আমরা কখনও শোধ করিতে পারিব না। এই সাধন-ভজনশীল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব কাহারও প্রশংসাবাদ বা স্তবস্তুতির অপেক্ষা রাখেন না। একনিষ্ঠভাবে নামব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তিনি পুণ্য জাহ্নবী ধারার ন্যায় আপনমনে বহিয়া চলিয়াছেন, জগতের নিন্দা বা প্রশংসা তাঁহাকে স্পর্শ করে না। একমাত্র নামই তাঁহার আশ্রয়, নামই তাঁহার আরাধ্য এবং তিনি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করেন যে নাম হইতে সর্বসিদ্ধি হয়। অশেষ পাপ-কলঙ্কিত কলিযুগের এই একটি মহৎ গুণ যে কলিযুগে নাম-সংকীর্ত্তনের প্রসাদে লোক উদ্ধার পাইতে পারে। তন্ত্রে উল্লিখিত আছে :

> কলে র্দোষ সমুদ্রস্য গুণ একো মহান্ যতঃ।
> নাম্নাং সংকীর্ত্তনেনৈব চাতুর্বর্গ্যং জনোহশ্নুতে ॥

শাস্ত্রকর্তারা আরও বলিয়াছেন :

> কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
> যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥—ভাগবত।

আর্য অর্থাৎ স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যাঁহারা গুণজ্ঞ এবং ভগবৎ-সেবাপরায়ণ—তাঁহারা কলিযুগের সমাদর করিয়া থাকেন, এই কারণে যে কলিযুগে মাত্র হরি-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সকল বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়।

বৈষ্ণব মহাজনেরা অকুণ্ঠভাবে বলিয়াছেন :

> যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
> নামের সহিতে ফিরেন আপনি শ্রীহরি ॥
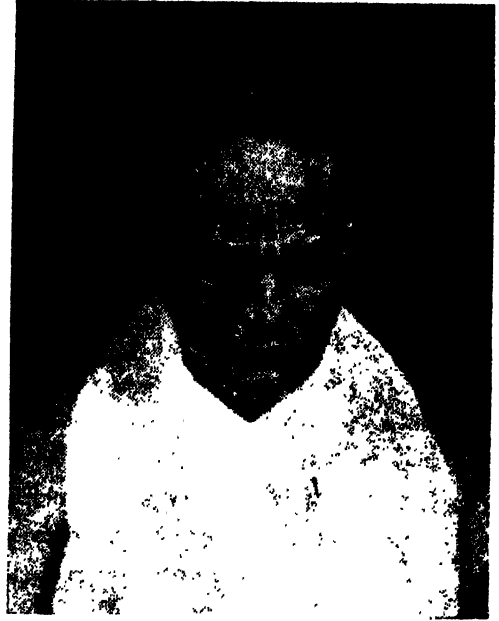
শ্রীরামদাস বাবাজি

এই যে মধুর 'মধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং' এই চিন্তামণি-মন্ত্র নাম সাধন যাঁহার যজ্ঞ, তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করি আমার এমন কি সাধ্য? শ্রীভগবানের নাম এদেশের আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, শাস্ত্রে সঙ্গীতে শিল্পে গাঁথা হইয়া আছে, এমন সৌভাগ্যবহুল পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদের নামে রুচি হইল না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালেও যে

সব মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নাম মাহাত্ম্যের কথা বলিয়াছেন এবং নামের শক্তি অসন্দিগ্ধ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীবিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা, শ্রীপ্রভু জগবন্ধু, শ্রীসন্তদাস বাবাজি মহারাজ ইঁহারা প্রত্যেকেই নামের অলৌকিক শক্তির কথা বলিয়াছেন। পরমহংসদেব বলিতেন, সকালে ও সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে হরিনাম করো—তা হলে সব পাপ তাপ দূর হয়ে যাবে। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে যেমন গাছের সব পাখী উড়ে যায়, সেইরূপ হাততালি দিয়ে হরিনাম করলেও সমস্ত অবিদ্যা রূপ পাখী উড়ে পালায়।

কিন্তু অজ্ঞ লোক আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। মিথ্যা সভ্যতার অভিমান লইয়া দম্ভের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া রহিয়াছি—অভিমানে উপেখিলুঁ কানু গুণনিধি। তাঁহাকে ডাকিলাম না, নাম করিতে জিহ্বা আকৃষ্ট হইল না। শ্রীরূপ গোস্বামীর উচ্ছ্বসিত নাম প্রশংসা মনে পড়ে। বলিতেছেন :

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলি লব্ধয়ে।

কোটী রসনা হইত, কৃষ্ণনাম করিয়া সাধ মিটাইতাম! শ্রীমন্মহাপ্রভু সদাসর্বদা কৃষ্ণনাম করিতেন, সেজন্য তাঁহাকে লোকে আখ্যা দিয়াছিল হরিনাম মূর্ত্তি। আজ আমরা আমাদের মধ্যে সেই জাজ্বল্যমান আদর্শ দেখিয়াও শিখিলাম না, বুঝিলাম না, পরকালে কি উপায় হইবে একবার ভাবিয়া দেখিলাম না।

তাই শ্রীবাবাজি মহারাজ আপামর সাধারণের মধ্যে এই হরিনামরূপ বীজ ছড়াইতেছেন। তাঁহার অশ্রু-বিপ্লাবিত কণ্ঠে এই মধুর নাম যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বিচলিত না হইয়া পারেন নাই। কিন্তু মায়ামোহময় সংসারের এমনি প্রভাব যে গলায় ফাঁসি পরাইয়া আবার এই বিষয় গহ্বরে টানিয়া আনিয়া ফেলে।

ইতিহাসের পটভূমিকায় পুরীর শ্রীক্ষেত্র

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(একটি ঐতিহাসিক পত্র)

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুধীপ্রবর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ও সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত উমেশ মিশ্র মহাশয়ের যুগ্ম সম্পাদনায় জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত কয়েকটি সংস্কৃত দলিল ও চিঠিপত্রাদি এলাহাবাদ গঙ্গানাথ ঝা গবেষণা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতে মুঘলসাম্রাজ্যের পতন ও ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের বিচিত্র কাহিনীর মূল সাক্ষ্য হিসাবে এতদিন আমরা ফার্সী ও ইংরাজীতে লিখিত দলিল দস্তাবেজের উপরই বেশী নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। তাহার প্রধান কারণ কোম্পানীর নিজস্ব দলিল ও বিবরণী-গুলি ইংরাজীতে লিখিত হইত এবং পতনোন্মুখ দিল্লী বাদশাহীর ও ভারতের অন্য সামন্ত বা স্বাধীন নরপতিদের নিজেদের মধ্যে পত্র চলাচলের বাহন হিসাবে ফার্সীই রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্য্যাদা পাইয়াছিল। অভিজাতবংশের মধ্যেও ফার্সীতে পত্র লেখাই বেশী প্রচলন ছিল। অবশ্য মারাঠী, বাংলা, উর্দ্দুতে লিখিত পত্রাদিরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাহার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মর্য্যাদাও আছে। ডাঃ সেন ও মহামহোপাধ্যায় মিশ্র দেবভাষা সংস্কৃতে লিখিত পত্রের সন্ধান দিয়া আর এক নূতন দিকে আলোকপাত করিলেন। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত কথ্য ভাষা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু জ্ঞানী ও গুণীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে, শাস্ত্রীয় তর্ক-বিচারে, ব্যবস্থাদানে ও রাজা মহারাজাদের সম্মান জ্ঞাপনে সংস্কৃতের যে বিশেষ প্রচলন ছিল তাহা সকলেই জানেন। বাংলা দেশে এখনও শ্রাদ্ধাদিতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

এইরূপ একটি ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যসম্পন্ন একটি পত্রের সামান্য পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই পত্রটি পুরীর জগন্নাথদেবের পুরোহিত, সেবাইত ও ভক্তদের দ্বারা ১৮০৪ খৃঃ অব্দ জুলাই মাসে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারল লর্ড ওয়েলেসলীকে লিখিত এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্ণেল হারকোর্ট কর্তৃক কটক হইতে কলিকাতায় বড়লাট বাহাদুরের কাছে প্রেরিত হয়।

উড়িষ্যা হইতে মারাঠাদের বিতাড়িত করিয়া ইংরাজ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও দেশে সুশাসনের ব্যবস্থায় প্রীত ও কৃতজ্ঞ "সমস্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রবাসী" "শ্রীমতাং সতাং মহতাং" সমস্ত বৈষ্ণবরা রাজগুরু প্রভৃতিরা, ব্রাহ্মণরা এবং "ষট্‌ত্রিংশনিয়োগনায়ক" কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র প্রভৃতি প্রধানরা একযোগে লর্ড ওয়েলেসলীকে অভিনন্দন জানান্। এই পত্রের স্বাক্ষর বেশীর ভাগই দেবনাগরীতে। উড়িয়া ভাষায় একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্রের

স্বাক্ষর আছে। বাংলা লিপিতে আছে "শ্রীরাধাকৃষ্ণ" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেব গোস্বামী, শ্রীনীতলানন্দ দেবস্য গোস্বামী, শ্রীগোপীনাথ দেব গোস্বামিনঃ। শেষোক্ত দুইজনের স্বাক্ষর মৈথিল ভাষায় লিখিত বলিয়া সম্পাদকদ্বয় স্থির করিয়াছেন। কিন্তু মূল দলিলের কটোতে অবিকল বাংলা লেখা বলিয়াই মনে হয়। ইহা ছাড়া কানারিজ, রাজস্থানী ও তেলেগুতেও স্বাক্ষর আছে দেখা যায়। এই পত্র হইতে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সার্বজনীন ঐতিহ্যের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ভারতের প্রত্যেক দেশ হইতে এখানে ভক্তেরা আসিয়া মিলিত হইতেন—"তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া বা রাজ্যের ভাঙাগড়া"—তাহারই নিদর্শন দেখি।

পত্রলেখকদের মতে ওয়েলেসলী শুধু "ইংরাজ কুলকমল প্রকাশৈক-ভাস্কর" ছিলেন না, "দেবদ্বিজবব্রাহ্মণরক্ষাদীক্ষিত"ও ছিলেন। এই পত্রে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় পত্রটি রচিত হইলেও ওয়েলেসলীকে তাঁহারা যে সব বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে আছে "নবাব মুস্তভাব মালি অলকার অসরফ অল অসরাফ"। পত্রের প্রথমেই শ্রীস্বামী জগন্নাথজী সহায় বলিয়া পুরুষোত্তমকে বন্দনা করা হইয়াছে। পত্রলেখকরা বলিতেছেন "অধুনা আপনার শাসনে আমরা সর্বপ্রকারে সুখে আছি। আমাদের আন্তরিক কামনা এই যে—যেরূপ রক্ষা প্রভৃতি দেবতারা ধর্ম্ম স্থাপিত করিয়াছিলেন সেরূপ আপনিও করিবেন এবং ইংরাজ বাহাদুরের সতর্কতায় আমাদের সকলের প্রাণ ও ধন রক্ষার সংবাদ শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবন, বারাণসী, রামনাথ, দ্বারিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে সকলে এখানে আগমন করিবেন এবং ভগবদ্দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। আমরা সকলে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে ইংরাজ বাহাদুরের শাসন চিরস্থায়ী হউক, শ্রীভগবান আপনাকে প্রত্যহ স্বচ্ছায়ায় স্থাপন করিয়া উত্তরোত্তর আপনার শ্রীবৃদ্ধি করুন এবং আমরা আপনার শুভার্থীরা আপনার শাসনে নির্ভয়ে জগন্নাথ দেবের সেবায় নিযুক্ত রহি।"

দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধের সময় পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে ওয়েলেসলী যে উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সমর্থনযোগ্য ও ইতিহাসসম্মত। তিনি সেনানায়ক কর্ণেল ক্যাম্বেল ও কমিশন মিঃ মেলভিলকে যে আদেশ দেন (Cons 1 March 1804, No 46, Paras 6-12) তাহা সম্পাদকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখা, তাহাদের নিরাপত্তার দায়িত্বগ্রহণ, তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার (most ample protection…with every mark of consideration and kindness) তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এ ছাড়া তাঁর নির্দেশ ছিল যে মন্দিরের বা মন্দিরসংক্রান্ত সেবাইত, পুরোহিত বা তীর্থযাত্রীদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়। "You will Employ every possible precaution to preserve the respect due to the Pagoda and to the religious prejudices of the Brahmins and Pilgrims. You will furnish the Brahmins with such guards as shall afford perfect security to their persons, rites and ceremonies and to the sanctity of religious edifices." ইহা ছাড়া কঠোর নির্দেশ ছিল যে (১) জগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গীকৃত বা সেবাইতদের দেবোত্তর সম্পত্তিতে যেন কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা না হয় (২) ঐ সব সম্পত্তি (স্থাবর, বা অস্থাবর) যেন সৈন্যদল কর্তৃক লুণ্ঠিত বিজেতার অংশ (Prize money) বলিয়া গৃহীত না হয় (৩) মারহাট্টা সরকারকে দেয় কর অপেক্ষা অধিক কর আদায় করা না হয়। যাত্রীদের নিকট হইতে প্রাপ্য পার্ব্বণী সম্বন্ধেও ওয়েলেসলী বিস্মৃত হন নাই। তিনি একদিকে যেমন পাণ্ডাদের প্রাপ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হন নাই, অপরদিকে যাত্রীদের উপর অযথা পীড়ন না হয় সে বিষয়েও বিশেষ সতর্ক ছিলেন, অথচ তিনি শাসনভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডাদের সহানুভূতি হারাইতেও রাজী ছিলেন না। এই বিষয়ে তাহার অনুজ্ঞা উল্লেখযোগ্য "Any measures calculated to relieve the exactions to which pilgrims are subjected by the rapacity of the Brahmins would necessarily tend to exasperate the persons whom it must be our object to conciliate. You will therefore signify to the Brahmins, that it is not your intention to disturb the actual system of collections of the Pagoda and at the sametime not to limit the powers......to make such arrangement with respect to that pagoda or to introduce such a reform of Existing abuses and vexations, as may hereafter be deemed advisable."

এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় যে সুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ইংরাজদের স্বপক্ষে পুরীর ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের একটি পত্র দেন। সম্পাদকেরা এই পত্রের মূললিপি অনুসন্ধান করিয়া পান নাই, কিন্তু অন্যত্র তাহার উল্লেখ দেখিয়াছেন। এমন কি ইংরাজদের স্বপক্ষে শুধু মর্ত্যের জগন্নাথ নন্ স্বর্গের জগন্নাথও রায় দিয়াছিলেন "That the Brahmins at the Holy temple had consulted and applied to Juggernaut to inform them what power was now to have his temple under its protection and that he had given a decided answer that the English Government was in future to be his guardian."

মারাহাট্টা রাজত্বে অত্যন্ত দরিদ্র ব্যতীত প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে ১১৲ টাকা করিয়া যাত্রীকর ও দুইটাকা করিয়া মন্দির কর দিতে হইত। ওয়েলেসলী যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই কর রহিত করিয়া দেন।

ওয়েলেসলীকে লিখিত পত্রের শেষে শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ধর্মজ্ঞান, কবিত্বশক্তি ও ভগবদ্ভক্তি মিলিত হইয়া ইহাকে শুধু সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে নাই, এক অপূর্ব সহজ সাম্যমন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়াছে।

"ভোগোপি সাধয়তি যোগ ফলং হি যত্র, জাতিং
বিশোধয়তি ভোজনব ব্যবস্থা, এতাদৃশস্তু মহিমা

পুরুষোত্তমস্ত দাসীপদদ্বয়রজাং পুনন্তি দেবান্।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং গহনো হি পন্থাঃ বৃথামুধাবত কিং শ্রমেণ
ন্যগ্রোধমূলে লবণোদতীরে ব্রহ্মামৃত লোচনপেয়মস্তি।
কুক্কুরস্ত মুখাদভ্রষ্টং যদন্নং পাবনং মহৎ, ব্রহ্মাদ্যৈরপি
ভোক্তব্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে।
যোগিনাং যো হৃদাকাশে বিদ্যুদ্বর্ণঃ প্রকাশতে
স এব দারুরূপেণ নীলাদ্রৌ ভাসতে মহঃ।
ব্রহ্মাদিশ্বপচান্তানাং যৎ প্রসাদান্ন ভোজনে ন চ
পংক্তে হি ভেদোস্তি জগন্নাথায় মঙ্গলং।"

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের এতাদৃশী মহিমা যে ভোগ ও যোগফল দান করে, ভোজন ব্যবস্থা জাতিকে শোধিত করে, দাসীর পদদ্বয়ের ধূলিকণাও দেবতাদের পবিত্র করে।

শ্রুতি ও স্মৃতির গহন পথে জ্ঞানিগণ বৃথাই ধাবিত হইয়াছেন, এ পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? সমুদ্রতীরে বটবৃক্ষতলে লোচনপেয় অমৃতময় ব্রহ্ম রহিয়াছেন।

কুক্কুরমুখভ্রষ্ট পবিত্র মহান্ন যদি ভাগ্যবশতঃ লাভ হয় তবে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদেরও তাহা ভোক্তব্য।

যোগীদের চিত্তাকাশে যিনি বিদ্যুৎরূপে প্রকাশিত হন তিনি আবার কাষ্ঠরূপে নীলাচলে উদ্ভাসিত হন। যাঁহার প্রসাদান্নভোজনে ব্রহ্মাদি কুক্কুরাহারী পর্য্যন্ত সকলের শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়—সেই জগন্নাথদেবের মঙ্গল হউক।

একখানি কিশোর পত্রিকার কথা

অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম-এ

বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানচর্চ্চা" শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক পুরাতন কথা বর্ত্তমানের পাঠক-পাঠিকাগণকে শুনাইয়াছেন। তিনি বিশেষ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ইং ১৯০৯ সালে প্রকাশিত শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু পরিচালিত "বিজ্ঞান-দর্পণ" পত্রিকাখানির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকার আবির্ভাবের দেড় বৎসর পূর্ব্বে আর একখানি কিশোর পত্রিকা মারফৎ ছাত্রগণের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার সন্ধান বোধ হয় যোগেন্দ্রবাবুর জানা নাই। আমারও পক্ষে বিস্মৃতপ্রায় সেই পত্রিকাখানির বিবরণ বর্ত্তমানে প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। ইহাতে "বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা"র ইতিহাস হয়ত আরও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে।

প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখনকার দিনে বিশেষ করিয়া স্কুলের ছাত্রদের জন্ম কোন পৃথক পত্রিকা ছিল না, এখনও যে আছে তাহা মনে হয় না। স্কুল কলেজসমূহ হইতে বর্ত্তমানে যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহা প্রধানতঃ ছাত্রগণের মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহ দানের জন্ম ও তাহাদের রচনাশক্তির স্ফুরণের জন্ম পরিকল্পিত। ছাত্রগণই ঐ সকল পত্রিকার লেখক, মাঝে মাঝে অবশ্য শিক্ষকেরাও এক আধটা লেখা দিয়া তাহাদের উৎসাহিত করেন। আমি যে পত্রিকার কথা বলিতে যাইতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ছিল অন্তধরণের। অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীদের লিখিত বিবিধ প্রবন্ধের দ্বারা ছাত্রগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ জাগ্রত করা এবং শিক্ষণীয় সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত ও অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করা। তখনকার দিনের বহু খ্যাতনামা শিক্ষক ও অধ্যাপক এই স্বল্পকালস্থায়ী কিশোর পত্রিকাখানির উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং অনেকেই লেখা দিয়া ইহার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বর্গত। মনে হয়, সে দলের একমাত্র আমি এই ৮২ বৎসর বয়সেও বাঁচিয়া আছি।

প্রবল স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমভাগে, ১৩১৪ সালের আশ্বিন (১৯০৭ অক্টোবর) মাসে স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের উপকারার্থে "ছাত্র-সখা" মাসিক পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক প্রবেশিকাশ্রেণীর ছাত্র ষোড়শবর্ষীয় কিশোর পূর্ব্বোক্ত শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ বসু। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক হিসাবে জনৈক স্কুল-শিক্ষকের নাম মুদ্রিত হয়। কিন্তু ঐ সংখ্যায় তাঁহার কোন লেখা ছিল না। সূচনা লিখেন, হিন্দু স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "উৎকলের গল্প" বাহির হয়। আমি "প্রাণি-বিজ্ঞান" প্রবন্ধ আরম্ভ করি। রাজপুত ইতিহাস হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী 'অসি-পূজা' লিখেন। শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় (পরে ডাক্তার) লিখিত দেশাত্মবোধ উদ্দীপক "আহ্বান" কবিতা ও অন্যান্য তিনটি কবিতা ছিল। "সহজ শিল্প" প্রবন্ধে রসায়ন-শিল্পের টুকিটাকি বাহির হয়। শ্রীমান নরেন্দ্রনাথের লিখিত দুইটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ "বঙ্গীয় যুবকগণের কর্ত্তব্য" ও "ব্যায়াম" বিনা নামে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্রিকাখানির আকার ছিল ফুলস্কেপ আট পেজী—সাধারণ এক্সার-সাইজ বুকের মত। ভিতর দেশী মিলের মোটা কাগজে এবং কভার হাতে তৈয়ারী হরিদ্রা বর্ণের তুলোট কাগজে মুদ্রিত। ষোল পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই ক্ষুদ্র মাসিক-পত্রখানির প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল মাত্র দুই পয়সা এবং বার্ষিক সডাক এক টাকা। যাহাতে স্কুলের ছাত্রেরা সহজে কিনিতে পারে, সেই কারণে এইরূপ কম মূল্যই ধার্য্য করা হইয়াছিল।

ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় সংখ্যা হইতেই আমার নাম উহাতে সম্পাদকরূপে মুদ্রিত হয় এবং আমাকে পত্রিকাখানির দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমি সে সময় জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউশনের (বর্ত্তমান স্কটিশচার্চ্চ কলেজ) শারীর-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং উহারই স্কুলবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলাম।

"ছাত্র-সখা"র দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্ত্তিক ১৩১৪) সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম" (পালি জাতকের গল্প) আরম্ভ হয়। শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী "ছাত্র-জীবন বা ব্রহ্মচর্য্য" লিখিয়াছিলেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিত কাহিনী "ঠাকুরদাদার ভোগ" বাহির হয়। "প্রাণি-বিজ্ঞান" ও 'অসিপুঞ্জ' প্রবন্ধের পূর্ব্বানুবৃত্তি চলে। এই সংখ্যার বিশেষত্ব যে, ইহাতেই সর্ব্বপ্রথম খ্যাতনামা গণিত-অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের "একটি অঙ্ক" ও তাহার কষিবার প্রণালী বাহির হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় রচিত একটি কবিতা ছিল।

তৃতীয় সংখ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "ভূ-তত্ত্ব" লিখিতে সুরু করেন। আমার "প্রাণি-বিজ্ঞান" এবং শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী (পরে রিপন কলেজের অধ্যাপক) লিখিত "আলোক" এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দুইটিও বাহির হয়। অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে "দুইটি অঙ্ক" দিয়াছিলেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "সদরআলার পরিবার ও নব্য-সমাজ" কাহিনী লিখেন। শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় রচিত একটি এবং অপর একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল। শ্রীমান নরেন্দ্রের লিখিত "লক্ষ্মীবাই" ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও চারিটি "ধাঁধা" ছিল কিন্তু কোথাও তাহার নাম প্রকাশিত হয় নাই।

যতদূর মনে আছে, এই সংখ্যা প্রকাশের পরই একটি হাঙ্গামা বাধে। পত্রিকার প্রকাশক নরেন্দ্রনাথ বসুর নামে কলিকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস হইতে "বিনা অনুমতিতে পত্রিকা প্রকাশের জন্য কেন তুমি অভিযুক্ত হইবে না, তাহার কারণ দর্শাও"—এক শমন আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বদেশী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সম্পাদিত ইংরাজী "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার অফিস গৃহের মধ্যেই কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে "ছাত্র-সখা"র ক্ষুদ্র অফিসটি ছিল। আমি কোনদিন সেখানে যাই নাই। পোষ্ট অফিসে রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে, অথচ যেটা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য (ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ডিক্লারেশন দেওয়া), সেটা যে হয় নাই এ খবর জানিতাম না। প্রবলপ্রতাপ বিখ্যাত কিংসফোর্ড সাহেব তখন চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি বাঙ্গলার তরুণদের আদৌ সুনজরে দেখিতেন না। এই ঘটনায় কিশোর নরেন্দ্র কতকটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

আমার স্বর্গত কনিষ্ঠ সহোদর মনোজমোহন বসু তখন পুলিশ কোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল। ঘটনাটি তাহাকে জানাইতে, সে-ই যথাযোগ্য ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র ছিলেন চিফ্ কোর্ট ইন্সেপেক্টর, তিনিও তরুণদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন না। কিন্তু মনোজমোহনের খাতিরে "ছাত্র-সখা" প্রকাশকের হাঙ্গামাটি মিটাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

একদিন পরেই মহাপাত্রের নির্দ্দেশমত যথারীতি আবেদনপত্র পূরণ করিয়া নরেন সশরীরে কিংসফোর্ড সাহেবের সম্মুখে হাজির হইল। তিনি একবার মাত্র তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নরেনের দিকে চাহিয়া এবং তাহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর শুনিয়া তৎক্ষণাৎই আবেদন নামঞ্জুর করিলেন। ইতিপূর্ব্বে নরেন কখনও পুলিশকোর্ট দেখে নাই, কোর্টের রীতিনীতিও তাহার কিছুই জানা ছিল না। আদেশ শুনিয়াও নির্ভিক কিশোর কাঠগড়া হইতে না নামিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এটি ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য প্রকাশিত পত্রিকা, ইহার সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব তাঁহার ইহাতে বাধাদিবারও কোন কারণ নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন অন্য ফাইলে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, কোর্ট ইনেস্পেক্টর ধমক দিয়া উঠিলেন,—"ছোকরা, তুমি

শ্রীমন্মথমোহন বসু

ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডারের ওপর আবার কথা কইছ।" নিজের অন্যায় হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া নরেন তখনই কোর্ট হইতে বাহির হইয়া আসিল। বৈকালেই আমি খবর পাইলাম যে, নাবালক বলিয়া কিংসফোর্ড সাহেব নরেনের এপ্লিকেশন্ রিজেক্ট করিয়া দিয়াছেন।

পরদিন প্রাতেই সকল দৈনিক কাগজে আবেদন না-মঞ্জুরের সংবাদটি বাহির হইয়া যায়! "Young Publisher," Young Applicant, ও "Application Refused" এইরূপ বিভিন্ন হেডিংএ 'অমৃতবাজার' "বেঙ্গলী" ও "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তবে কোন কাগজে ঠিক কোন হেডিং ছিল, তাহা এতদিন পরে আর স্মরণে নাই। কোর্ট-রিপোর্টারের ভুলে নামের উল্লেখে তিনটিতেই নরেন্দ্রনাথের জায়গায় নগেন্দ্রনাথ ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু বৈকালে "সন্ধ্যা" কাগজে ঠিক নাম নরেন্দ্রনাথ বসু-ই বাহির হয় এবং ছাত্রদের পত্রিকার প্রকাশককে

অনুমতি না দেওয়ার জন্ম কাজি কিংকর্দ্দকে ('সন্ধ্যা' কিংসফোর্ডের এই বিকৃত নামকরণ করিয়াছিল) দোষারোপ করা হইয়াছিল।

যাহা হউক, ভ্রাতা মনোজমোহনের পরামর্শ মত, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একটি বন্ধুর দ্বারা ডিক্লারেশন দিয়া একদিন পরেই কিংসফোর্ডের নিকট হইতেই নরেন পত্রিকা প্রকাশের সম্মতি আদায় করিয়া লইয়াছিল।

"ছাত্র-সখা"র চতুর্থ সংখ্যায় অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "ভূ-তত্ত্ব" (দ্বিতীয় পাঠ) এবং অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দের "একটি অঙ্ক" বাহির হয়। শ্রীশরচ্চন্দ্র দে "বাংলা সাহিত্যে রাজা রামমোহন

ছাত্র-সখা পত্রিকার এক পৃষ্ঠা

রায়" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার "কুন্তী" কাহিনী আরম্ভ করেন। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ "হায়দার আলি ও টিপু-সুলতান" এবং দুইটি কবিতা, তন্মধ্যে একটি শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত রচিত এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সমাধানের জন্ম "চারিটি প্রশ্ন" (গণিতের) এবং নূতন ধাঁধা ও গতমাসের ধাঁধার উত্তর প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম সংখ্যায় অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের "ভূ-তত্ত্ব" (তৃতীয়পাঠ) এবং শ্রীউমাপতি বাজপেয়ীর "জগতের উপাদান" (ক্রমশঃ প্রকাশ্য), এই দুইটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রীশরচ্চন্দ্র দে তাঁহার লিখিত "বাংলা সাহিত্যে রাজা রামমোহন রায়" প্রবন্ধ শেষ করেন। "হায়দার আলি ও টিপুসুলতান" প্রবন্ধ ও "কুন্তী" কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ বাহির হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের কবিতা "সারস্বত সাধনা" এবং "চারিটি প্রশ্নের উত্তর" "নূতন ধাঁধা" ও পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছিল।

ষষ্ঠ সংখ্যা (ফাল্গুন, ১৩১৪) "ছাত্র-সখা" পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম" (দ্বিতীয় অংশ) প্রকাশিত হয়। বোলপুর হইতে শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "আকাশের কথা" লিখিয়াছিলেন। শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল "আরণ্যকানন" মধ্যে চারটি কাহিনী প্রকাশ করেন। শ্রীজগদীশ বাজপেয়ীর "ভারতে মুসলমান" ঐতিহাসিক আলোচনা। শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত (পরে ডাক্তার) "রাক্ষস বৃক্ষ" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় আরম্ভ করেন এবং "বৈজ্ঞানিক হুজুক" প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দুরাকাঙ্ক্ষার বিষয় আলোচিত হয়। এতদ্ব্যতীত এই সংখ্যায় গণিত বিষয়ক "চারিটি প্রশ্ন" দেওয়া হইয়াছিল।

"ছাত্র-সখা" পত্রিকার ছয় সংখ্যায় কবিতা, কাহিনী, গণিত ও ধাঁধা ইত্যাদি বাদে প্রকাশিত মোট তেইশটি প্রবন্ধের মধ্যে বারটিতেই বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

বহু শিক্ষাব্রতী ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই কিশোর পত্রিকাখানির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্মরণ আছে, বন্ধুবর মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সপ্তম সংখ্যার জন্ম একটি প্রবন্ধ প্রদান করেন, কিন্তু তাহা আর প্রকাশিত হয় নাই। "ছাত্র সখা" হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়।

"ছাত্র সখা" বন্ধ হওয়ার কাহিনী অতি করুণ। মাতৃভাষার প্রতি অসীম অনুরাগ এবং অসামান্য উৎসাহ থাকিলেও, কিশোর নরেন্দ্রনাথের তখনও লোকচরিত্র সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। "ছাত্র-সখা"র পরম হিতৈষী সাজিয়া জনৈক পুরাতন জুয়াচোর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা দেখাইয়া, পত্রিকা পরিচালনার জন্ম তাহার সংগৃহীত যে সামান্য অর্থ ছিল তাহা কয়েকদিনের মধ্যেই অযথা ব্যয় করাইয়া দেয়। নরেন্দ্রনাথ সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের সন্তান, পিতৃহীন কিশোর। অভিভাবকদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে সে এই অসমসাহসিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। উপরোক্ত আকস্মিক দুর্ঘটনায় নরেন বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে এবং তাহাকে বাধ্য হইয়াই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কয়েকবার ডাকিয়া পাঠাইলেও, এই ঘটনার ছয় মাসের মধ্যে, অসফলতার লজ্জা লইয়া নরেন আর আমার সঙ্গে দেখা করে নাই। সময়ে দেখা করিলে, হয়ত তখন "ছাত্র-সখা"কে রক্ষা করিতে পারিতাম।

কুড়ি

(পূর্বানুবৃত্তি)

শুধু কালীঘাট কেন, সমস্ত কলকাতায় তের বাই এক, বি কিরণ হালদার লেন পাওয়া গেলনা। পাবে যে না-ই একরকম ভালো ক'রে জেনেই চেষ্টা করা, তবু মৃন্ময় মনকে সামান্তও ফাঁকি দিলে না, এতটুকু সন্দেহের অবকাশ রাখলে না। পোষ্টাফিসে খোঁজ নিয়ে কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে ষ্ট্রীট ডাইরেক্টারিটা ভালো ক'রে উটকে উটকে দেখলে; নম্বরের কথা দূরে থাক, কিরণ হালদার লেন বলে কোন জিনিসই নেই কলকাতায়।

একটা চাপা উল্লাসে ভরে উঠছে মনটা, খুব একটা বড় আবিষ্ক্রিয়ার মুখে একজন বৈজ্ঞানিকের মুখে সে উল্লাসটা উঠে তাকে আহার নিদ্রা ভুলিয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।...ওর আবিষ্ক্রিয়ার এতটুকু প্রশ্ন থাকতে দেবেনা মৃন্ময়;—নূতন নূতন বস্তি উঠছে, রাস্তা বেরুচ্ছে, এমনও হতে পারে কিরণ হালদারের গলির নাম এখনও ষ্টট বা টেলিফোন ডাইরেক্টারিতে স্থান পায় নি। দরকার কি ওটুকু খুঁৎই বা রেখে?...এ ধরণের সন্দেহ বোধ হয় সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়; ওর হয়েছেও তাই, সামাজিক ভাবে; দুটো দিন ও ঘুরে ঘুরে তন্ন তন্ন করে সমস্ত কালীঘাটটা খুঁজলে, কাছাকাছি ভবানীপুর, বালিগঞ্জ আর টালিগঞ্জেরও খানিকটা।

একেবারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে নিরাশ হয়ে ওর মনটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই উল্লাসটা, সামান্ত একটু সন্দেহের নিচে যেটা চাপা ছিল সেটা ঠেলে বেরুতে চাইছে।

উল্লাসকে কি করে মুক্তি দিতে হয় ভালোভাবেই জানা আছে মৃন্ময়ের; একটা বিলাতী হোটেলে গিয়ে লখমিনিয়ার এত দিনের সংযমকে শৃঙ্খল-মুক্ত ক'রে দিলে, পান, আহার, ডান্স—যা হাতের কাছে পাওয়া গেল; ইংরাজীতে যাকে বলে 'সেলিব্রেট্' (Celebrate) করা তাই করলে সে। তারপর আফিসের কাজকর্ম সেরে, থিয়েটারের সাজগোজের ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এল লখমিনিয়ায়।

আবার সেই লুকোচুরি হোল আরম্ভ।

ফিরে এসে লক্ষ্য করলে দু'জনের মুখ শুকনো—বিশেষ করে সরমার। আর সেবারের মতো বাড়ি ব'য়ে এসে সম্মুখ-রণ দেবার উৎসাহ একেবারেই নেই, যে-কোন মুহূর্তে নিদারুণ কথাটা মৃন্ময় বলে বসবে এইরকম একটা চাপা আতঙ্কে যেন অহর্নিশ কাটিয়ে যাচ্ছে কোন রকমে—যতটা সম্ভব তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে। বার দুই যেন মনে হোল ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, অর্থাৎ উদ্বেগটা আর সহ্য করতে পারছে না, নিজেই এগিয়ে প্রশ্নটা করবে। একবার সামলে নিলে নিজেকে। দ্বিতীয়বার একেবারে পুরো বৈঠকের মধ্যে—হাসপাতালের প্রাঙ্গণে মাষ্টারমশাই, বীরেন্দ্রসিং, সুকুমার, অপর ডাক্তারটি, আশ্রমের স্কুলের যাঁরা নিয়মিত মেম্বর; আসন্ন উৎসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, বেশিভাগ সরমাকে উপলক্ষ করে, এমন সময় সরমা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই মৃন্ময়ের পানে চেয়ে বলে উঠল—"হ্যাঁ, একটা কথা!..."

ঠিক সেই সময় মাষ্টারমশাই তাঁর একটা সেই প্রচণ্ড হাসি হেসে ফেললেন। ওঁর এই রীতি, এক এক সময় হাসিই আগে আসে, তারপর তার ঝড় ঠেলে বক্তব্য হয় উপস্থিত।

খানিকক্ষণ ওঁর গল্পই চলল।

মৃন্ময় বুঝেছে। ঠিকানা-সংক্রান্ত ব্যাপারটা সরমার কাছে এত উদ্বেগের হয়ে উঠেছে যে সে আর সহ্য করতে পারছে না, তাই মরিয়া হয়ে এত লোকের সামনেই সেই প্রশ্নটা তুলে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চায়। এও এক ধরণের মস্তিষ্ক-বিকৃতি, কলকাতায়—যার জন্য, সব জেনেশুনেও মৃন্ময় ঠিকানাটা বের করবার চেষ্টায় প্রাণ দিচ্ছিল।

যতক্ষণ গল্প হাসি চলল, মৃন্ময় মনে মনে অবস্থাটা বেশ ভেবে নিলে। অবশ্য বাইরে বাইরে গল্প শুনতে শুনতে, হাসির কোরাসে যোগ দিতে দিতে—ভেবে দেখলে এ ধরণের খেয়াল আর চলে না; এত যে মরিয়া তার নিশ্চয় ভেঙে পড়বারই অবস্থা। কিন্তু তাহলে তো কিছুই হোল না; মৃন্ময় মাত্র এইটুকুই জানতে পারলে যে যখন ভুল ঠিকানা দেওয়ার এই অদ্ভুত প্রবঞ্চনা, তখন গলদ যে আছেই একটা এটা ঠিক; কিন্তু গলদটা কোথায়—অর্থাৎ এই চেনা-চেনা মুখটা কার, কোথায়, কি পরিবেশে দেখা—তার তো কিছুই টের পাওয়া গেলনা।

ভাবতে লাগল; ভেবে ঠিকও করলে, না, এখন ওকে ভড়কে দেওয়া চলবে না। দুজনেই ধূর্ত্ত, একটা কিছু উত্তর ঠিক না করে প্রশ্নটা করতে হয়তো নাও এগিয়ে থাকতে পারে সরমা; হয়তো ও আর সুকুমার—দুজনেরই ঠিক করা উত্তর, এখন সেই উত্তরটা দিয়ে সামলে নেবে, তারপর বোধ হয় সকলেই দেখবে শিকার পালিয়েছে।

মাষ্টার মশাইয়ের গল্পটা শেষ হয়ে হাসির হররা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোজা সরমার মুখের ওপর দৃষ্টিটা রেখে প্রশ্ন করলে—"হ্যাঁ, কি যেন আপনি জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন সরমা দেবী?"

সরমাও গল্পের অবসরে একটা ঠিক ক'রে নিয়েছে—কাজ কি খুঁচিয়ে ঘা করে—হয়তো ঠিকানার কথা ভুলেই গিয়ে থাকবে মৃন্ময়, বললে—"এই দেখুন! ভুলেই গেলাম কি জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম।…যা দাদুর গল্প!"

—একটু হেসেই বললে কথাটা।

আর সবার ত খেয়াল নেই, তবে চকিতে একবার সুকুমারের পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে মৃন্ময় দেখলে সে তীব্র উৎকণ্ঠায় সরমার পানে চেয়ে আছে।…বড় কৌতুক লাগছে মৃন্ময়ের—সব হিসাব মতো ঠিক আছে, পাই-পয়সা ক'রে একেবারে।

বললে—"আপনি সেই বাড়ির ঠিকানার কথা জিগ্যেস করছিলেন না তো?"

হাসির ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে সরমার মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল; মৃন্ময় চকিতে একবার সুকুমারের দিকেও চেয়ে নিলে; অনুরূপ অবস্থা।

এ কিন্তু শিকার নিয়ে একটু খেলা, মৃন্ময় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দিলে—"সে আমার মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে—তার জন্যে আপনাদের দুজনের কাছে ক্ষমা চাইবারও মুখ নেই আমার। ডবল ভুল বলা চলে—প্রথম তো খোঁজ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতে পারি নি, একেবারেই সময় পাইনি, তারপর এসেও বলা হয় নি কথাটা—অত্যন্ত লজ্জিত আমি…"

একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে চেয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল—তার দৃষ্টির পেছনেও যে আর একটা দৃষ্টি আছে তাই দিয়ে—কতদিনের জমাট একটা কালো ছায়া দুজনেরই মুখ থেকে অপসারিত হয়ে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মুখ দুটি; বিশেষ করে সরমার মুখ, যেন রাহুমুক্ত চন্দ্র।

সরমাই আগে কথা কইলে, সুকুমারের দিকে চেয়েই আরম্ভ করলে—"এই নাও! কী এমন দোষ হয়েছে?…" তারপর মৃন্ময়ের দিকেই ঘুরিয়ে নিয়ে এল কথাটা—"আমাদেরই ভয়ানক লজ্জায় ফেললেন যে! যাচ্ছিলেন,—ঠিকানা দিয়েছিলাম, এমন কিছুই কাজ ছিলনা আমাদের তো—তাও আপনিই আগ্রহ করে নিলেন ঠিকানাটা—দয়া ক'রে।—যেতে পারেন নি, তাতে হয়েছে কি?…এই তো সেদিন চিঠি পেয়েছি তাঁদের…না আপনি মোটেই কুণ্ঠিত হবেন না…এসে বলেন নি—কী সে এমন বলবার কথা!…আমরাই বা কোন্ জিগ্যেস করেছি? সেজন্যে লজ্জা পাবার কথা বরং আমাদেরই, দাদু নিশ্চয় মনে মনে ভাবছেন—দেখো, নাতনীর বাড়ির ওপর টান!"

—মনটা অতিরিক্ত হালকা হয়ে গেছে, নৈলে একসঙ্গে এতকথা কয়না সরমা।

মাষ্টারমশাই মুখিয়েই থাকেন, বললেন—"কিছুই ভাবছেন না দাদু, নাতনীর মনটা চারিদিক থেকে গুটিয়ে যতোই তাঁর কাছে এসে জড়ো হয় ততোই তাঁর লাভ।"

—একটা যে দমকা হাসির তোড় উঠল, তাতে বাতাসটা একেবারে নিঃশেষ ভাবেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

একুশ

এর পর যা বাকি রইল, অর্থাৎ কবে কোথায় দেখা সরমাকে—সেইটুকু নির্ণয় করবার জন্য মৃন্ময় উঠে পড়ে লেগে গেল। অবশ্য আরও সন্তর্পণে, শিকার ধরার মুখে

যেমন আরও সাবধান হয়ে যায় শিকারী। একটা সুবিধা, প্রচুর অবসর এখন। সামনে মাত্র কাজ এখন শুভ-উদ্বোধনের অনুষ্ঠানটা, তারই উদ্যোগপর্ব চলছে এটা। সন্ধ্যার খানিকটা পরে, আড্ডাটা ভেঙে গেলে সরমা স্কুলের একটা ঘরে মেয়েদের নিয়ে বসে, মৃন্ময় তার নিজের বাসাতেই বসে তার হিন্দী নাটকের ছেলেদের নিয়ে। এই সময়টুকু যা একটু অন্যমনস্ক থাকে মৃন্ময়, বাকি সময়টা সে ঐ চিন্তা নিয়েই থাকে; অথবা যদি সরমা থাকে তো কথাবার্তার মধ্যে তার যে ভাবভঙ্গিমা ফোটে সেগুলি মনে গেঁথে গেঁথে নেয়। যখন একলা থাকে, আফিসেই হোক বা বাড়িতেই হোক, স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সেগুলি বের করে মেলাতে থাকে।…একটা দলিলের পাঠোদ্ধার চলছে, যদি হয় সফল তো তারপরে আছে সম্পত্তি অধিকারের প্ল্যান, এক একটা রাত তার মাদকতায় অভিভূত হয়েই কেটে যায় মৃন্ময়ের।

কিন্তু যতই চেষ্টা, যতই অতন্দ্রিত অভিযান সেই স্মৃতিটুকুর জন্য, ততই যেন পেছিয়ে যাচ্ছে সেটা। সুকুমারের ভয় হয় শেষ পর্যন্ত একেবারেই হারিয়ে ফেলবে না তো?—এই বহুদিন নানা রকমে দেখার অরণ্যে সেই একটি দিন একটি ভঙ্গিতে দেখাটুকু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না তো!

এই তীব্র উদ্বেগের ফাঁকে ফাঁকে অবসাদও আসে মাঝে মাঝে, সন্দেহ হয় সবটাই ভুল নয় তো! মুখে কোথায় একটা মিল, সে তো এমনিও হতে পারে। না হয়, তার সঙ্গে দুজনের মুখের আতঙ্ক, একটা গোপন চেষ্টা, কিন্তু এও তো অনেক অজ্ঞাত কারণে হতে পারে, আর সে কারণটা কদর্যই হতে হবে তার মানে কি?

মনে এই রকম প্রশ্ন উঠলে মৃন্ময় ছেড়ে দেয় তার গোয়েন্দাগিরি—একজন গৃহস্থ-বধূকে নিয়ে এই রকম একটা ব্যাপারে তার নিজের মনটাই যেন ঘিন্-ঘিন্ করতে থাকে। কে জানে, লখমিনিয়ার বায়ুমণ্ডলে সাধারণ ভাবে যে একটা শুচিতা আছেই সেটা বোধহয় অজ্ঞাতসারে ওর মনটা করে প্রভাবিত।…কিন্তু টেঁকে না এ-ভাবটা, হদ্দ দুটো দিন, তারপর আবার সেই কুটিল সংসার, সেই লুব্ধ অনুসন্ধিৎসা।

এবার কিন্তু এই সঙ্গে একটা অন্য রকম ঘটনা হয়ে গেল।

মৃন্ময়ের ফটোগ্রাফির সখ আছে। জার্মেনীতে থাকতে দুষ্প্রাপ্য। একটা কি খুঁৎ হয়ে এতদিন পড়েছিল, এবার কলকাতায় যখন যায় নিয়ে যায়। বোধহয় কলকাতার বিশিষ্টতার জন্যই সঙ্গে সঙ্গেই সারিয়ে নিয়ে আসতে পারেনি, সেদিনের ঘটনা সেইদিন সকালের ডাকে এসে হাজির হয়েছে।

সরমা প্রায় সমস্ত দিন বাসায় ছিল না। কাল সন্ধ্যায় বীরেন্দ্র সিঙের পুত্রবধূ তার পিতৃগৃহ থেকে এসেছে, সরমা সকালে গিয়ে একেবারে আটকা পড়ে গেল। ফিরল একেবারে বিকেলে বীরেন্দ্র সিঙের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে। হাসপাতালের প্রাঙ্গণে গাড়ি প্রবেশ করবার আগেই দূর থেকে দেখলে অন্য দিনের মতো চেয়ারগুলো আজ আর গোল করে সাজানো নয়, লম্বালম্বি দুই সারি, সব ভর্তিও হয়ে গেছে, শুধু সামনের সারিতে মাঝখানের দুটি চেয়ার খালি। প্রশ্ন করতে যাওয়ার মুখেই মোটরটা একটু ঘুরতে ওর নজর পড়ে গেল একটু তফাতে ষ্ট্যাণ্ডের ওপর কালো কাপড় চাপা ক্যামেরার ওপর এবং সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন্দ্র সিং বলে উঠলেন—"এই দেখো বিটির ভুলটা! আমাদের জন্যেই ওঁরা অপেক্ষা করছেন—আজ ফটো তোলবার কথা ছিল যে!—সেই কখন্ ব'লে পাঠিয়েছিলেন আমায়…"

নিজেই চালাচ্ছিলেন, একটু জোর করে দিলেন।

সরমা বললে—"কৈ, আমায় তো বলেন নি বুবুয়া…"

"কৈ আর বলেছি!…বলব বলব করে ভুলে গেছি। নাঃ, আমার আর পদার্থ নেই…"

এইটুকু কথাবার্তার মধ্যেই মোটর এসে দাঁড়াল, চেয়ার ছেড়ে সবাই এলোমেলোভাবে এগিয়ে এলেন একটু, তারপর আবার যে-যার চেয়ারে ফিরে গেলেন। সরমার স্থান মাস্টারমশাই আর বীরেন্দ্র সিঙের মাঝখানে, বীরেন্দ্র সিং বসতে বসতে একটু অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—"এমন রাগ হচ্ছে নিজের ওপর!—আমার দোষে বিটিয়া যে একটু পছন্দমতো কাপড়-চোপড় পরে আসবে তাও হোল না, একেবারেই ভুলে বসেছিলাম কথাটা।"

মাস্টারমশাই বললেন—"এ তোমার অন্যায় কথা বীরেন্দ্র, পছন্দমতো কাপড় চোপড়ের জোরেই যে আমার নাতনীর পদ্মন্দসই ফটো উঠতে পারে, নচেৎ নয়, একথা বললে…"

সরমা একটু গুছিয়ে বসতে বসতে গ্রীবাটা তুলে বললে

—"হাতে হাতেই প্রমাণ, এবার খুলছে আপনার নাতনীর আসল রূপ, থামুন না।…ভালোই হোল বুবুয়া, মেকি গুমোর যত শীগ্‌গির ভাঙে দাদুর…"

এ পর্যন্ত বেশ হোল, এর পর মুহূর্তেই কিন্তু সামনের দিকে নজর পড়ার সঙ্গে সরমা চেয়ার ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন ভূত দেখেছে—চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে, মুখটা গেছে ফ্যাকাসে হয়ে, সম্মোহিতের মতো দৃষ্টি যেন ফেরাতে পারছে না।

অথচ দ্রষ্টব্য তেমন কিছুই নেই—মৃন্ময় এতক্ষণ পিঠ পর্যন্ত কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে ফোকাস্ ঠিক করছিল, বেরিয়ে বাইরে থেকে একবার দেখে নিচ্ছে।

সবার দৃষ্টি সরমার দিকে গেল, বীরেন্দ্র সিং, মাস্টারমশাই, আরও দু'এক জন এক সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলেন—"কী হোল?…কী হোল সরমা দেবী?"

সরমা একটা অবুঝ ছোটমেয়ের মতো আবদারের জিদে বললে…"আমি ফটো তোলাব না…না, তোলাব না ফটো—কোন মতেই না।…"

কয়েক সেকেণ্ড সবাই একেবারে নির্বাক, তারপর মাস্টারমশাই বললেন—"হঠাৎ কি হোল? না হয় তুমি কাপড় চোপড় পালটেই এসো, এখনও আলো থাকবে কিছুক্ষণ।"

উত্তরে সরমা কয়েক পা সরে দাঁড়াল নিজের চেয়ার থেকে, যেন আগে ফটোর ব্যবস্থাটা ভেঙে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। চোখ আছে ক্যামেরার দিকেই, বললে—"না, না—ফটোই তোলাব না আমি…ও আমার ভালো লাগেনা…হঠাৎ এসে ফটো তোলার মধ্যে বসতে হবে!…আপনি আগে বললেন না বুবুয়া—জানলে আমি কখনই আসতাম না…"

ব্যাপারটা বড়ই বিসদৃশ হয়ে উঠল; বীরেন্দ্র সিংের ওপর অনুযোগটা সবার কানেই অত্যন্ত কর্কশ শোনাল। মাস্টারমশাইও অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর রসিকতার সঙ্গে ব্যাপারটার সম্বন্ধ আছে ভেবে, বীরেন্দ্র সিংের প্রতি রূঢ়তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন; কি করে যে সামলাবেন ব্যাপারটা যেন মাথায় আসছে না। সরমা যেন আরও কিছু বলে না বসে এই ভয়েই এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরলেন, বললেন—"বেশ, তা তোমার ইচ্ছে না থাকে না-ই তোলা হবে ফটো, তাতে আর কি?…বসবে চলো।"

"আগে উনি সরিয়ে নিন…আপনি ওটা নিন না সরিয়ে!"

বেশ একটু বিরক্তি আর হুকুমের টোনেই কথাটা ব'লে সরমা আবার পা বাড়াতে বাড়াতে বললে—"না হয় তুলুন, আমিই যাচ্ছি সরে।"

মৃন্ময়ও যেন প্রস্তর মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, তাড়াতাড়ি স্ট্যাণ্ড থেকে ক্যামেরাটা আলাদা করে, সবগুলি গুটিয়ে সুটিয়ে নিয়ে এগিয়ে এল। সে-ই ব্যাপারটা বুঝেছে, এগিয়ে এসে বললে—"সরি, সরমা দেবী, যদি কোন কারণে আপনার বিরক্তির হেতু হয়ে থাকি।"

মাস্টারমশাই তার পিঠে একটা মৃদু আঘাত দিয়ে বললেন—"বাঃ, তুমি গা পেতে নিচ্ছ কেন?—এক এক জনের হয় না এরকম?…এই তো বড় হওয়া পর্যন্ত আমারও মনে ভয় ছিল—ওর মধ্যে বুঝি কি যাদু করে টেনে নেয় মানুষকে।"

হেসে বাতাসটা লঘু করে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউই যোগ দিতে না পারায় যেন আরও বেশি অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। লখমিনিয়ার কেউ এমন একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়েনি এ-পর্যন্ত।

ঠিক এঁদের মতো অস্বস্তিতে পড়েন নি শুধু বীরেন্দ্র সিং আর সুকুমার, সেটা কিন্তু আর কেউ অত বুঝতে পারলে না। সবার অলক্ষিতে ওঁরা দুজনে পরস্পরের সঙ্গে কয়েকবার দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। শেষকালে বীরেন্দ্র সিং বললেন—"আপনি বিটিয়াকে না হয় বাড়ি নিয়ে যান ডাক্তারবাবু; আসলে ওর শরীরটা আজ ভালো নেই বলছিল—সোজা এখানে নিয়ে আসাটাই ভুল হয়েছে আমার।"

—সামলাবার যে একটা ব্যর্থ চেষ্টা সেটা সবাই বুঝলে, কিন্তু বুঝছে জেনেও বীরেন্দ্র সিংের বুদ্ধিতে এর বেশি কিছু এল না সত্য সত্য।

আসল কথাটা কিন্তু বুঝলে মাত্র মৃন্ময়। এই অদ্ভুত ফটো-আতঙ্ক মৃন্ময়ের সন্দেহের আর একটা প্রমাণ হয়ে

রইল—একটা বড় প্রমাণই; কিন্তু ব্যাপারটা এত কুৎসিৎ আকারে এসে পড়ল যে ওকে এ গোয়েন্দাগিরির পথটাই আপাতত ছেড়ে দিতে হোল। বীরেন্দ্র সিং বা সুকুমার নাই-বুঝুক, ওর মনে তো এই সঙ্কোচটাই হওয়া স্বাভাবিক যে সবাই এইটেই ভেবে নেবে—মৃন্ময়ের হাতে ফটো তোলানোতেই সরমার যত আপত্তি; এর পাশেই তো ওর সম্বন্ধে একটা কুটিল প্রশ্ন ওঠবার কথা।

সরমার ওপর প্রতিক্রিয়াটা হোল বড় উৎকট রকমের। ওর আতঙ্কটা হঠাৎ বড় উৎকট হয়েই দেখা দিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল বিরক্তি, যাতে ওর সামঞ্জস্য-বোধটা একেবারেই নষ্ট ক'রে দিয়েছিল, নৈলে সে এমন একটা কাণ্ড করে না। বাড়ি গিয়ে সত্যই সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার পরদিন একভাবেই কাটল, মাথাব্যথা, জ্বরভাব, কথা বার্তায় একেবারেই অনিচ্ছা। সুকুমার ভেতরে ভেতরে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে উঠল—আবার তার আসল অসুখটা না মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। এ দিক দিয়ে বীরেন্দ্র সিংও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, দুজনে গোপনে খানিকটা পরামর্শও হোল।

পরদিন থেকেই কিন্তু সে আবার বেশ সামলে উঠল। নিয়ম মতো সকালের সমস্ত কাজ মায় স্নান পর্যন্ত সেরে যখন চায়ের টেবিলে এসে বসল তখন বেশ সুস্থ। সুকুমারের সঙ্গে প্রথম কথাই হোল—"পরশু মাথায় হঠাৎ কী ভূত যে চেপে বসল!···কী ভাবলেন সবাই জানিনা—দাদু কি ভাবলেন, বুবুয়াই বা কি ভাবলেন!···"

চা ঢালতে ঢালতে বলছিল, সুকুমার চেয়ে চেয়ে একটু দেখলে, বললে—"কেন চাপল ভূত?"

সে কথা তো সুকুমারকেও জানানো চলে না; সরমা উত্তর করলে—"তা কি জানি?—তা জানতে হোলে তো ভূতের নাড়ী-নক্ষত্র জানতে হয়। আমি ভাবছি এখন সামলাই কি ক'রে ব্যাপারটা। কাকে কি বলেছি তাও মনে পড়ছে না ভালো করে যে ক্ষমা চাইব।"

সুকুমার একটু ভেবে নিয়ে বললে—"তোমার বুবুয়ার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না, মাস্টারমশাইয়ের কাছেও নয়, তবে মৃন্ময়বাবু একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন।··· অবশ্য এমন কিছু বলনি তাঁকে—যার জন্যে তোমায় লজ্জিত হতে হবে; ব্যাপারটা তুমি যতটা বড় করে দেখছ তেমন কিছু হয়ওনি।"

শেষের কথাগুলো বললে ডাক্তার হিসাবে—আবার শক না লাগে মনে। মস্তিষ্কের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে।

এর পর নিঃশব্দেই প্রাতরাশ শেষ হোল, সরমা রইল নতদৃষ্টিতেই। সুকুমারও কিছু বললে না, শুধু দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার দেখলে; বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

শেষ হোলে সরমা বললে—"চলো, ওঠ।"

"কোথায়?"

"মৃন্ময়বাবুর ওখানে।···একটু সাহায্যও করো, ডাক্তার মানুষ তো—কী অসুখ হোলে হঠাৎ অমন মতিচ্ছন্ন হয় মানুষের।—একটা নাম ঠিক করে রাখো।"

বাইশ

দিনকতক পরে বীরেন্দ্র সিং বাড়িতে একটি ছোটখাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন।

উদ্বোধনের দিনটা প্রায় এসে পড়েছে, নাটক দুটি তৈরি, একবার স্টেজ রিহার্সেল দিয়ে-দেওয়ার কথা উঠল। ওঁর প্রাসাদের সঙ্গেই একটা ছোট প্রেক্ষাগৃহ আর স্টেজের ব্যবস্থা আছে, রিহার্সেলটা সেইখানেই হবে।

এই উপলক্ষে একটা ছোটখাট গার্ডেন-পার্টিরও ব্যবস্থা করেছেন। এও এক হিসাবে রিহার্সেলই, অনুষ্ঠানের সময় যা হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। প্রভেদ এইটুকু যে এটা তাঁর নিজের বাড়িতে ব'লে, আর মাত্র আশ্রম, কল-হাসপাতালের কয়েকটি অন্তরঙ্গ ব্যক্তি আর পরিবারকে নিয়ে ব'লে, বাড়ির মেয়েদের দিক থেকে বীরেন্দ্র সিংয়ের স্ত্রী ও পুত্রবধূও আছেন উপস্থিত।

ঠিক এই ধরণের অনুষ্ঠান ওঁদের বাড়িতে এই প্রথম। যখন থেকে প্ল্যান আঁটা হচ্ছিল তখন থেকেই কথাবার্তার মধ্যে বোঝা গেল যে সরমার এ বিষয়ে বেশ ধারণা আছে, তাই তার ঘাড়েই প্রায় সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন বীরেন্দ্র সিং। সুকুমারের হাসপাতাল, তার সময় নেই, তবে সরমাকে সাহায্য করছে মৃন্ময়, তারও বেশ আইডিয়া আছে। তা ভিন্ন সময় আছে প্রচুর। স্টেজ-সম্বন্ধীয় সব কিছুই তৈরি, অল্প অল্প যা বাকি আছে, আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ হয়ে আসছে; পাঁজি দেখে শুভদিন ঠিক করা, তাড়াহুড়ার বালাই নেই।

মৃন্ময়কে ডেকে নিয়েছে এক হিসাবে সরমাই। ফটোগ্রাফির ব্যাপারটার পর থেকেই ওর চেষ্টা—যাতে মৃন্ময়ের মন থেকে গ্লানিটুকু মিটে যায়। এর জন্ম অবশ্য ক্ষমা চায়নি; সেদিন ক্ষমা চাইবার জন্ত তাড়াতাড়ি ভোয়ের হোলেও ভেবে দেখলে তাতে ব্যাপারটা আরও ঘাঁটিয়ে তোলা হবে মাত্র। এমন কি গেলও না সদ্য সদ্য; ঠিক করলে একটু সজাগ থাকবে, তারপর যেমন যেমন সুবিধা হবে, কিছু ক'রে বা কিছু ব'লে চেষ্টা করবে যতটা হয় পরিষ্কার।

প্রথম সুযোগটা করে দিলেন বীরেন্দ্র সিং। সেইদিন বৈকালে যখন সরমা হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হোল—একটু যেন বিষণ্ণই—তিনি ডেকে নিয়ে বললেন—"এসো বিটিয়া, এখন শরীরটা আছে কেমন?"

সরমা পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললে—"ভালোই তো বুবুয়া, কী হয়েছিল আমার?···ও! কাল—সে সামান্য একটু মাথা ধরেছিল···ও তো লেগেই আছে।"

একটু চুপচাপ গেল। শুধু মৃন্ময় একটু উসখুস করলে, যেন কি একটা বলতে গিয়ে চেপে গেল, হয়তো আবার ক্ষমা চাইতে গিয়েই। এর পর বীরেন্দ্র সিং একটু অনুতপ্ত-কণ্ঠেই আবার বললেন—"মেয়ের কাছে কেউ ক্ষমা চায় না বিটিয়া, কিন্তু তা হ'লেও যা দোষের তা দোষেরই; তুমি অনুষ্ঠানের জন্যে কলকাতা থেকে ফটোগ্রাফার আনাবার কথায় বৌমা আর তোমার মাইয়াকে যখন বললে ও-জিনিসটা তুমি একেবারে পছন্দ কর না—মানুষের চেহারা নিয়ে হৈ-চৈ করা—তখন আর কিছু না হোক তোমায় জানিয়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল যে সেদিন ফটো তোলবারই ব্যবস্থা হয়েছে এখানে। আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হোল, ভাবলাম যা পছন্দ নয় তারই মাঝখানে বসিয়ে বিটিয়াকে একটু ফ্যাসাদে ফেলা যাক্—ওর যখন এটা আর একটা খামখেয়ালি মাত্র।···তোমার যে এতখানি অশ্রদ্ধা তা জানলে···"

কৃতজ্ঞতায় সরমার গলায় যেন কান্না ঠেলে উঠছিল, কেননা এর সমস্তটুকুই বানানো—পরশুর ব্যাপারটা সামলে নেবার জন্য।—অথচ রহস্য-ছলেও কখনও একটা মিথ্যা বলতে শোনেনি বীরেন্দ্র সিংকে। ব্যথিত কণ্ঠে বললে—"কিন্তু একটু বাড়াবাড়ির অশ্রদ্ধা নয় বুবুয়া?···ফটো আমি তোলাই না—হয়তো মাত্র বার দুই তুলিয়েছি জীবনে, কেন না জিনিসটা আর্ট না হয়েও আর্টের দাবি করে।··· কিন্তু আমরাও তো ভদ্র না হয়ে ভদ্রতার দাবি করি বুবুয়া।"

এই অনুতাপের বেদনাটুকুতেই মনে হোল সেদিনকার গ্লানি তিন ভাগ পরিষ্কার হয়ে গেল, এ নিয়ে কথা আর এরপর বেশি হয়নি, বাকি যেটুকু অস্বস্তি ছিল, সেটুকু ক্রমে মেলামেশায় কেটে গেল।

(ক্রমশঃ)

রাইমণি

সতীন্দ্রনাথ লাহা

বাগ্‌দি পাড়ার চাল্‌তা তলায় ভীড় জমেছে সকালে
হঠাৎ এখন কার কি হ'ল! মরল কি কেউ অকালে?
মরণ আর কি কথার ছিরি! গান জুড়েছে বষ্টমী
মুখের বাহার ফোঁটা তিলক চোখের কোনে দুষ্টুমি।
কর্ত্তা নাচে পায়েল পায়ে তান ধরেছে কীর্ত্তনে।
পয়সা ছোঁড়ে কোঁচ্‌কে হুড়ে, মোড়ল মজে নৃত্যনে॥
খঞ্জনিতে মন্ টানিতে বেশ শিখেছে রাইমণি।
কোন রসিকে দিচ্ছে পেলা আড় চোখে তা' নেয় গণি'॥

কাজ ভুলেছে কেজো লোকে রাঁধ্‌বে কখন রাঁধুনী?
তারিফ্ করে দুলিয়ে মাথা এমনি গানের বাঁধুনী।
"রাইএর পায়ে পরাণ সঁপি" পালা শেষের বন্দনা।
খুন্‌তি হাতে খ্যান্ত মাসী খাস্ত করে রন্ধনা॥
কলসী কাঁকে পথের বাঁকে চাল্‌তা গাছের আড়ালে,
দাঁতে মিশি পদ্ম পিসী মুচ্‌কি হাসি দাঁড়ালে॥
শিশি হাতে নিশি ঠাকুর কখন যাবে গঙ্গায়?
কখন পুজো করবে শেষ নিয়ম কানুন লঙ্ঘায়।

এমনি করে ক'দিন ধ'রে সাঁঝ সকালে জমছে বেশ।
গান মাতালে পয়সা ঢালে এমন নেশার হয় কি শেষ?

ব্যবসার বাজারে চাঞ্চল্য—

সম্প্রতি ভারতবর্ষের ব্যবসার বাজারে যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছে, তাহা অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত। যদি খাদ্যশস্য চাউল ও গম বাদ দেওয়া যায়, তবে বলিলে অত্যুক্তি হয় না—তৈল-শস্য হইতে সুবর্ণ পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যের মূল্য এত কমিয়া যায় যে, লোক যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ সম্বন্ধে অনেক জল্পনা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন—যুদ্ধের জন্যই ইহা হইয়াছে। যুদ্ধ "শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।" ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নভেম্বর যখন সংবাদ প্রকাশিত হয়, ইংলণ্ডে রণসজ্জা হইতেছে, তখন বোম্বাই নগরে সঙ্গে সঙ্গে সূতার কলের "শেয়ার" ২০ টাকা, ব্যাঙ্কের "শেয়ার" ৫ টাকা "কোম্পানীর কাগজ" ৬ আনা কমিয়া যায়। এবার যুদ্ধ না হওয়ায় দ্রব্যের মূল্য কমিয়াছে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, কোরিয়ার যুদ্ধ—বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করিবে। সেই জন্য ব্যবসায়ীরা মাল বাঁধাই করিতেছিল—দর বাড়িবে। তাহা হইল না। ও দিকে আমেরিকা পাট ক্রয় কমাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে, অবস্থা বিবেচনা করিয়া, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে প্রাপ্য পরিশোধের জন্য তাগাদা করিতে লাগিল। ব্যবসায়ীরা, বাধ্য হইয়া, বাঁধাই মাল বাজারে ছাড়িতে লাগিল—দর পড়িয়া গেল। বোম্বাই সহরে ব্যবসা অধিক, তথায় সোনার দাম ৮১ টাকা দাঁড়াইল, কলিকাতায় ব্যবসা অপেক্ষাকৃত অল্প তথায় ৮৪ টাকার নিম্নে পড়িল না; বোম্বাই সহরে চিনি ৭ আনা সের হইলেও কলিকাতায় ১৪ আনা দাম বজায় রহিল।

ভারত সরকার যে মাল বাঁধাই বন্ধ করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ—এ বার বাজারে মাল বৃদ্ধি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যখন খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, তখন এক এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে যে মামলা হয়, তাহাতে জুরী ব্যবসায়ীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলে জজ লর্ড কেনিয়ন জুরারদিগকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"You have conferred by your verdict almost the greatest benefit that ever was conferred by any jury."

এ দেশে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শাসন-ক্ষমতা লাভের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন বটে, ক্ষমতা পাইলে তিনি চোরাবাজারীদিগকে ফাঁসি দিবেন, কিন্তু ক্ষমতা পাইয়া আর তাহা করেন নাই—চোরা বাজার কেবলই শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ী উত্তরোত্তর পণ্যমূল্য বৃদ্ধিতে কখন প্রতিবাদ না করিয়া কেবল লাভের পথ পাইয়াছে, তাহারাই মূল্য-হ্রাসে প্রতীকারজন্য সরকারকে প্রতীকার করিতে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রৌপ্যের দর কমায় ভারতবর্ষ রৌপ্য রপ্তানী করিতেও পারে—এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা শিল্পপতিদিগের ক্ষতির কারণ হয় নাই, সাধারণ লোকের সুবিধাজনক হইয়াছে; কেবল মজুতদারী ব্যবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

অবশ্য উঠানামার পরে বাজার স্থির হইবে। তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে। অতর্কিত মূল্য হ্রাসের প্রধান কারণ যে ফাটকার খেলা, তাহা বলা বাহুল্য। যদি গত ৪ বৎসরে ভারত সরকার দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, তবে যে এই মূল্য-হ্রাস জনগণের অশেষ কল্যাণের কারণই হইত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। যে সকল ব্যবসায়ী ভারত সরকারের বাজেটে কর হ্রাসের আশা করিয়াছিল এবং বাজেট পেশের অব্যবহিত পূর্ব্বে চটের রপ্তানী শুল্ক হ্রাসে মনে করিয়াছিল, অন্যান্য রপ্তানী শুল্কও কমিবে—তাহারা হতাশ হইয়াছে। মূল্য-হ্রাস যেমন অতর্কিত ভাবে হইয়াছে, তাহার গতি তেমনই দ্রুত হইয়াছে। যাঁহারা সরকারকে প্রতীকার করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন—

(১) গত নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্কের সুদের হার বৃদ্ধিতে যে সময় ব্যবসায় তেজ থাকে, সে সময় অর্থাভাব দেখা গিয়াছে।

(২) তৈল শস্য, তৈল ও কাপড়ের উপর রপ্তানী শুল্ক সঙ্কুচিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবৃতিতে দেখা যায়, গত বৎসর অক্টোবর হইতে জানুয়ারী এই কয় মাসে ব্যবসায়ে ঋণের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। এই কয় মাসে নোটের ব্যবহারও পূর্ব্ব বারের ২৫ কোটি টাকার স্থানে ১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ব্যবসায়ে অর্থের অভাব ঘটে নাই।

সুতরাং সরকারের ব্যবস্থায় ফাটকাবাজারই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ, প্রতীচীতে অস্ত্রসজ্জাবৃদ্ধি ও মাল মজুদ করা—এই সকল কারণে বাজারের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। গত বৎসর এপ্রিল মাস হইতেই তুলা, তেল বীজ প্রভৃতির মূল্য

াস হইতেছিল,—কারণ, বিদেশে চাহিদা কমিয়া আসিয়াছিল। তাহা
অনিবার্য্য বুঝিয়াই ভারত সরকার পণ্যমূল্য যুদ্ধপূর্ব্বকালীন হইবার পথে
কোন বাধা সৃষ্টি করেন নাই। বাস্তবিক জনগণের ও যে সকল শিল্প
—তুলা, নারিকেল তৈল প্রভৃতি উপকরণের উপর নির্ভর করে সে সকলের
জন্য ঐ সকল উপকরণের মূল্য-হ্রাস বাঞ্ছনীয়।

ভারত সরকার যে সকল উন্নতিকর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, পণ্যমূল্য
হ্রাসে সে সকলের কোন অসুবিধা ঘটিবে না। বলা বাহুল্য, অবস্থার প্রতি
সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

এ দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। অবশ্য পণ্যমূল্য হ্রাসের
সঙ্গে সঙ্গে চাউলের ও গমের মূল্য হ্রাস না হওয়ায় তাহারা উপকৃত হইবে
না। তাহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা যে সকল
ভূমিজ কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে মনোযোগী হইয়াছিল, সে সকলের মূল্য হ্রাস
হইলে তাহারা যে খাদ্যশস্যোৎপাদনে অধিক মনোযোগ দিবে, তাহাতে
সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পক্ষে বিপদ এই যে, সরকারের সংগ্রহনীতি নানা-
রূপ ত্রুটিতে পূর্ণ ও দুর্নীতিদুষ্ট। তাহা যদি সংশোধিত না হয়, তবে
কৃষক ও সরকারী কর্ম্মচারী দুই দলে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইবে। যাহারা
চোরাবাজারের চাউল বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়, তাহাদিগের লাভে
লোভপরবশ হইয়া সকলেই সেই পথ অবলম্বনে প্রলুব্ধ হইবে। পশ্চিমবঙ্গের
আর একটি অসুবিধা আমরা আশঙ্কা করিতেছি। গত বৎসর ভারত
সরকারের নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গে অনেক আশু ধান্যের জমীতে পাটের চাষ
প্রবর্তন হইয়াছিল। এ বার পাটের দাম কম হইয়াছে। আবার আশু
ধান্যের বীজও কম পাওয়া যাইতেছে। তাহার অন্যতম কারণ, সরকারের
ধান্যসংগ্রহ কার্য্যের জন্য অনেক কৃষক আমন ধান্য লুকাইয়া রাখিয়া
অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের আশু ধান্য দিয়াছে। আর এক আশঙ্কা, এ বার
চিনি সম্বন্ধে সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে গুড়ের মূল্য কমিয়া
গিয়াছে; সুতরাং আগামীবার অনেক কৃষক ইক্ষুর চাষ করিতে ভয়
পাইবে এবং ফলে চিনির মূল্য বর্দ্ধিত হইবে ও চিনির কলওয়ালারাই
লাভবান হইবে।

দ্রব্যমূল্য হ্রাসে ভালই হইয়াছে, এমন মনে করা অসঙ্গত নহে।
কারণ, যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা কেবল অসঙ্গত নহে—অন্যায়ও
বটে। এই প্রসঙ্গে আমরা এক বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করিয়া দিতে
ইচ্ছা করি, মূল্য হ্রাসের ফলে যদি কোন ব্যাঙ্ক বিব্রত হয়, তবে সম্ভব
হইলে যেন তাহাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

মূল্য হ্রাস যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে খাদ্যোপকরণের
উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমরা বার বার দেখাইয়াছি, তাহা
অসম্ভব নহে। কিন্তু আবশ্যক মনোযোগের ও উপায়-অবলম্বনের
অভাবেই আজও তাহা করা যায় নাই। অথচ তাহারই প্রয়োজন
সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সরকারের অপব্যয়—

নানাকার্য্যে ভারত সরকারের অপব্যয় সম্বন্ধে নানা অভিযোগ
উপস্থাপিত হইয়াছে এবং সে সকল অপব্যয় যে নিবার্য্য ছিল ও সময় সময়
দুর্নীতিদ্যোতক তাহাও জানা গিয়াছে। আমরা সেরূপ অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত
মধ্যে মধ্যে দিয়াছি। শেষে ভারত সরকার, লোকমতের মর্য্যাদা রক্ষা
করা প্রয়োজন বুঝিয়া, "পাবলিক একাউণ্টস কমিটী" গঠিত করিয়া
ছিলেন। সে কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সে রিপোর্টে
যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের পক্ষে কেবল অসন্তুষ্ট
নহে, পরন্তু আতঙ্কিত হইবারও সম্ভাবনা। আমরা কয়টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত
করিতেছি—

(১) কাগজের থলিয়ায় সার আমদানীতে বহু টাকার মাল অব্যবহার্য্য
হইয়াছে;

(২) এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার পরে রেল লাইন নির্ম্মাণ
পরিত্যক্ত হইয়াছে;

(৩) বৃটেন হইতে যে দুগ্ধের গুঁড়া আমদানী করা হইয়াছে, তাহা
আমদানী করা সঙ্গত হয় নাই।

ইহাতে সরকারের অর্থাৎ জনগণের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পরি-
কল্পনার ত্রুটিহেতু কি দুর্নীতিপ্রসূত, তাহা কে বলিবে?

কেবল তাহাই নহে, দেখা গিয়াছে, সরকারের কার্য্য পরিচালনা ও
সরকারী কার্য্যে অর্থব্যয় আজ যেরূপ অধিক দাঁড়াইয়াছে পূর্ব্বে কখন
সেরূপ দেখা যায় নাই। অথচ এত দিন আমরা বিদেশী সরকারকেই
ব্যয়বাহুল্যের জন্য নিন্দা করিয়া আসিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছি,
স্বদেশী সরকার মিতব্যয়ী হইলে দেশের সম্পদ বর্দ্ধিত হইবে। আজ
সরকারের দপ্তরখানায় কর্ম্মচারীর বাহুল্য ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারেও
আমরা এই অবস্থা লক্ষ্য করিতেছি। বাঙ্গালা বলিতে যখন বাঙ্গালা,
বিহার ও উড়িষ্যা বুঝাইত তখন যে দপ্তরখানায় কর্ম্মচারীদিগের স্থান-
সঙ্কুলান হইত, এখন আর তাহাতে কুলায় না—কর্ম্মচারীর সংখ্যা, বোধ
হয়, দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে, অথচ বাঙ্গালা এখন সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র
প্রদেশ! দেশ বিভাগের ফলে বহু ইংরেজ কর্ম্মচারী বিদায় লইয়াছেন—
তাহাদিগের স্থানে অপেক্ষাকৃত তরুণ অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারীরা দায়িত্বপূর্ণ পদে
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যোগ্যতার অভাব ও ব্যয়ের বাহুল্য হইয়াছে। কমিটী
বলিয়াছেন—যে স্থানেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সরকারের অর্থ ব্যয়িত হইবে,
যে স্থানেই অর্থের নিবার্য্য অপব্যয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইবে, যে স্থানেই
দেখা যাইবে কোন কর্ম্মচারীর ত্রুটিতে সরকারী অর্থের অপব্যয় হইয়াছে,
সেই স্থানেই কর্ম্মচারীকে ও মন্ত্রিমণ্ডলের যে অংশ সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত
তাহাকে দোষী মনে করিয়া দায়ী করিতে হইবে। সরকার কেবল
কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াই কর্ত্তব্যশেষ করিতে পারিবেন
না, পরন্তু সে জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিবেন। আমরা কিন্তু লক্ষ্য
করিয়াছি, কোথাও কোথাও কোন অপরাধী কর্ম্মচারীকে মামলা সোপর্দ্দ—
এমন কি পদচ্যুতও করা হয় নাই; তাহাদিগের কার্য্যের অর্থাৎ অপরাধের
গুরুত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টাই হইয়াছে। দায়ী কর্ম্মচারীদিগকে অবিলম্বে
দণ্ড না দিলে অব্যবস্থা অবসান ও অপরাধের সংখ্যা হ্রাস হইবে না—
হইতে পারে না।

কমিটী মন্তব্য করিয়াছেন, দেখা গিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা

কর্ম্মচারীদিগের অপরাধ "ধামা চাপা দিবার" জন্ম ব্যস্ত—অথচ সেই অপরাধে সরকারের বহু অর্থের অপব্যয় হইয়া গিয়াছে! মন্ত্রীরা অনেক ক্ষেত্রে অসঙ্গত কৈফিয়তেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে মন্ত্রীদিগের অপরাধের সহিত সহানুভূতি বা অপরাধীর সহিত যোগ সম্বন্ধে যে লোকের মনে সন্দেহের উদ্ভব অনিবার্য্য হয়, তাহা বলা বাহুল্য। মন্ত্রীরা কৈফিয়ৎ দেন, কর্ম্মচারীটি কার্য্যভারে পীড়িত ছিলেন, তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায় ছিল না, হিসাব পরীক্ষা করিবার সময়ের অভাব ঘটিয়াছিল, নিয়মে ত্রুটি আছে—ইত্যাদি!

আমাদিগের মনে হয়, অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কেবল অপরাধী কর্ম্মচারীদিগকে অবিলম্বে দণ্ড দিলেও শৈথিল্য দূর হইবে না—যে সকল মন্ত্রীর কর্ত্তব্য-শৈথিল্য প্রতিপন্ন হইবে, তাঁহাদিগকেও সে জন্ম ফলভোগ করিতে হইবে। বিদেশে দূতাবাসের ব্যয় সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে, সে সকলের জন্ম কি বিদেশীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও দায়ী নহেন? তাঁহার অসতর্কতা কি অপব্যয়ের প্রশ্রয় দেয় নাই?

কমিটী বলেন, দেখা গিয়াছে—

(১) পরিকল্পনার ব্যয় অসঙ্গতভাবে হিসাব করা হয়;

(২) এক বাবদে যে অর্থ লওয়া হয়, তাহা অন্ম বাবদে ব্যয় করা হয়;

(৩) আবশ্মক কাজ বন্ধ রাখিয়া অপেক্ষাকৃত অনাবশ্মক কাজ সম্পন্ন করা হয়।

এই সকল অপরাধ হইতে কি মন্ত্রীরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন?

কেহ কেহ মনে করেন, মন্ত্রীরা আজকাল সফরে অধিক মনোযোগী থাকায়—কার্য্যালয়ে বসিয়া নথীপত্র মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে সময় পা'ন না; সুতরাং তাঁহাদিগের সফর হ্রাস করা প্রয়োজন। মন্ত্রীদিগের এই সফরে আর্থিক লাভ আছে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

কমিটী কয়টি বিভাগে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে "পাপলিক ওয়ার্কস" বিভাগ অন্মতম। সে বিভাগসম্বন্ধে কমিটীর মন্তব্য—

"The state of affairs prevailing in the Central Public Works Department should be improved as it was considered to be most unsatisfactory."

অর্থাৎ এই বিভাগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই উক্তির অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ভারত রাষ্ট্র আর্থিক হিসাবে এমন নহে যে, ইহাতে অপব্যয় উপেক্ষা করা যাইতে পারে। যদি কোন পরিকল্পনায় লক্ষ টাকাও ব্যয়সঙ্কোচ করা যায়, তবে তাহাতে হয়ত কোন ছোট পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা যায়; হয়ত কোন বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগারের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এই অবস্থায়ও যে কোটি কোটি টাকা অপব্যয়িত হইতেছে [illegible]

বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানীতে বৎসর বৎসর রাষ্ট্রের সম্পদ ছিদ্রকুম্ভে জলের মত বাহির হইয়া যাইতেছে। কমিটী বলিয়াছেন—জাহাজে মাল আমদানী, জাহাজ হইতে মাল খালাস, আমদানী শস্ম গুদামে সংরক্ষণ—এই সকল বিষয়ে যে ব্যবস্থা বর্ত্তমান তাহার সংশোধন জন্ম কয় জন লোক লইয়া একটি সমিতি গঠন করা কর্ত্তব্য। অল্পদিন পূর্ব্বেও ব্রহ্ম হইতে আমদানী চাউল সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। ভারত রাষ্ট্র, দুর্ভাগ্য বশতঃ, প্রতিবৎসর শত শত কোটি টাকার খাদ্যশস্ম বিদেশ হইতে আমদানী করিতেছে। সে অবস্থায় সেই শস্ম যদি কোন কারণে নষ্ট হয়, তবে তাহা যে বিশেষ ক্ষতির কারণ তাহা বিবেচনা করিয়া কাজ করা অবশ্মই সরকারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। এই শস্ম সরকারী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ক্রয় করা ও গুদামজাত করা হয়—গুদাম হইতে বিক্রয়ের স্থানে প্রেরিতও হয়। পশ্চিমবঙ্গে কি ভাবে খাদ্যশস্ম নষ্ট হয়—তাহাতে সরকারের কত আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কীটের উপদ্রবে ও সতর্কতার অভাবে যে শস্ম নষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ বিবেচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

কমিটীর মন্তব্য হয়ত সরকারের মন্ত্রীদিগের মনঃপূত হইবে না। কিন্তু দেশের লোক—যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত ও পিষ্ট হইতেছে, তাহারা চাহিবে—কমিটীর নির্দ্ধারণ যেন কোনরূপে অবজ্ঞাত না হয়।

আমেরিকান মূলধন—

লর্ড রথারমিয়ার ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন—বৃটেনের সহিত ভারতের সম্বন্ধের ফলে বৃটেনের প্রত্যেক লোকের আয়ের ১৫ টাকার মধ্যে ২ টাকা উদ্ভূত। লর্ড কার্জ্জন স্বীকার করিয়াছিলেন, ভারতে ইংরেজের শাসনের দুইদিক—শাসন ও শোষণ। বৃটেনের বহু টাকা মূলধন হিসাবে ভারতে শিল্পে প্রযুক্ত হইত। ইংরেজের শাসনের অবসান হইলেও শোষণের অবসান হয় নাই। স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতের সরকার বিদেশী মূলধন অধিকার করেন নাই। বর্ত্তমানে বৃটেনের আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে তাহার পক্ষে আর ভারতের মূলধন প্রযুক্ত করা সম্ভব নহে। কিন্তু আমেরিকা তাহা করিতেছে এবং ভারত সরকারও তাহা সমর্থন করিতেছেন!

ভারত সরকারের নীতির পরিচয় "ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর" সহিত চুক্তিতে পাওয়া গিয়াছে। সেই চুক্তি অনুসারে কোম্পানী যে সকল সুবিধা সম্ভোগ করিবেন, সে সকলের মধ্যে ২টি এইরূপ—

(১) কোম্পানী বিনা শুল্কে অপরিশুদ্ধ তৈল আমদানী করিতে পারিবেন।

(২) ২৫ বৎসরের মধ্যে ভারত সরকার কোম্পানীর শিল্প জাতীয় করিতে পারিবেন না।

হয়ত—পারস্ম্যে তৈলশিল্প জাতীয়করণের পরে—আমেরিকার মনে

বলিয়াছেন—আমেরিকার যে সকল ধনী শিল্পী ও মূলধন দিয়া ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায় হইবেন, ভারত সরকার তাঁহাদিগকে সাদরে সুবিধা দিবেন।

এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে :—

(১) বোম্বাই প্রদেশে সুরাটের সান্নিধ্যে ভারতে প্রথম বিরাট ঔষধের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কারখানার নাম "অতুল প্রডাক্টস"। আমেদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালা কস্তুরীভাই লালভাই আমেরিকার সায়েনামাইড কোম্পানীর সহিত একযোগে এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। আমেরিকান কোম্পানী কারখানা নির্ম্মাণের ভার লইয়াছিলেন। অর্থাৎ নির্ম্মাণের লাভও আমেরিকায় যাইবে—ভারতীয়রা কেবল শ্রমিকের কাজ করিবে। আমেরিকান কোম্পানী মূলধনের শত করা ১০ ভাগ দিয়াছেন। কারখানা এক কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কারখানায় "সালফাড্রাগ" ঔষধ ও রং (কৃত্রিম) উৎপন্ন করা হইবে।

(২) আমেরিকার সাহায্য লইয়া ভারতে কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজনও হইতেছে। ভারতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করিবার জন্য বংশ ব্যবহৃত হয়। এখন কথা হইতেছে, ইক্ষুদণ্ডের ছিবড়া হইতেও মণ্ড প্রস্তুত করা হইবে।

এইরূপে আমেরিকার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিয়া যে সকল শিল্প ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সে সকলের উপযোগিতা যত অধিকই কেন হউক না, সে সকলে একদিকে যেমন লাভের একাংশ বিদেশে যাইবে, আর এক দিকে তেমনই ভারতকে বহু পরিমাণে বিদেশের জালে জড়িত হইতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গে সরকার বিদেশী কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর আয়ুকাল বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ভারত সরকার যে ভাবে আয়করের গোপন অর্থ পাইতেছেন, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী মূলধনের অভাব নাই। দেশে শিক্ষিত লোকেরও অভাব নাই। সে অবস্থায় কি দেশীয় মূলধনে—দেশীয়ের পরিচালনায় দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করাই দেশীয় সরকারের কর্ত্তব্য নহে?

সারের কারখানা—

বিহারে (সিঁদরী) ভারত সরকার যে সারের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা শেষ হইয়াছে, তাহাতে যেমন দেশের লোক স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিবে, তেমনই তাহার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় যে শেষে ৩০ কোটি টাকায় শেষ হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চিন্ত হইবার অবসর পাইবে। এ দেশে—এই কৃষিপ্রাণ দেশে—খাদ্যশস্য বৃদ্ধির জন্য যে সারের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু যে ভাবে এই কারখানার প্রতিষ্ঠায় ব্যয় পড়িয়াছে, তাহাতে লোকের মনে নানা সন্দেহ উদ্ভূত হইবে এবং ২ শত ৫০ টাকায় এক টন সার বিক্রয় করা যাইবে। এ সকল অবশ্য সেই সরকারের কথা, যে সরকার ইহার ব্যয়ের হিসাবে "গোড়ায় গলদ" করিয়াছিলেন। এখন বলা হইতেছে, যে হিসাব লোককে দেখাইয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহাতে ধরা হয় নাই যে—কারখানার জন্য একটি সহর রচনা করিতে ঐ জল সরবরাহের জন্য গোয়াই নদীতে বাঁধ দিতে হইবে। হিসাবে এই দুই দফা বাদ দেওয়া যদি ইচ্ছাকৃত অর্থাৎ ব্যয় কম দেখাইবার জন্য না হইয়া থাকে, তবে যাঁহারা ভুল হিসাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কি সে জন্য ভবিষ্যতে হিসাব করিবার কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইবে।

কারখানায় যে পরিমাণ সার উৎপন্ন করা যাইবে এবং উৎপন্ন সার যে মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে বলা হইয়াছে, তাহা নির্ভরযোগ্য কি না, তাহা পরে দেখা যাইবে। সরকারী হিসাব যে অনেক স্থলে নির্ভরযোগ্য হয় না, তাহা পশ্চিমবঙ্গে সরকারের যান বিভাগ সৃষ্টিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

হিসাবে দেখান হইয়াছে, উপকরণের মূল্যবৃদ্ধিতেই ৫ কোটি টাকা অধিক ব্যয়িত হইয়াছে!

সরকার প্রজার ৩০ কোটি টাকায় এই কারখানা করিলেও ইহাতে যদি লাভ হয়, তবে সে লাভের সম্পূর্ণ ভাগ প্রজারা পাইবে না। কারণ, সরকার কারখানা পরিচালনের কাজ চালাইতে আপনারা অক্ষম বুঝিয়া একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীকে সে ভার দিয়াছেন; লাভের সিংহভাগ কোম্পানী পাইবেন কি না জানা যায় নাই এবং সে কোম্পানীর মালিক কাহারা তাহাও প্রকাশ পায় নাই। যিনি কোম্পানীর পরিচালক—ম্যানেজিং ডিরেক্টার—তিনি বলিয়াছেন—কোম্পানীকে পরিচালন ভার প্রদানও পরীক্ষামাত্র—

"It is essentially an experiment in combining what is best in business efficiency with the highest traditions of public service—for the attainment of public good."

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে আমরা ব্যবসায় দুর্নীতি ও সরকারী চাকরীতে অযোগ্যতা যে লক্ষ্য করিতে পারি না, এমন নহে। যদি পরিচালনভার কোম্পানীকে প্রদান করাই সরকারের অভিপ্রেত ছিল এবং কারখানায় লাভ সম্বন্ধে সরকার নিঃসন্দেহ ছিলেন, তবে কেন কোম্পানীকে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে দিয়া সরকার তাহাতে অর্দ্ধেক বা ঐরূপ অংশ ক্রয় করিলেন না? পারস্যের তৈল কারখানা সম্বন্ধে বৃটিশ সরকার সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। সুয়েজখাল সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল।

ভারতে সার উৎপাদন জন্য বড় কারখানার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সার ব্যতীত কৃষিজপণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি অসম্ভব এবং সার সম্বন্ধে ভারতরাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, ইহাই অভিপ্রেত। সেই জন্য আমরা এই কারখানা প্রতিষ্ঠা সমর্থন করি। দুঃখের বিষয়, পরিকল্পনায় যে ত্রুটি হইয়াছে, তাহা যেমন শোচনীয়,

পূর্ব্ববঙ্গে "বাঙ্গলা"—

পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীতে যে আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার সমাধান হয় নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসী মুসলমানরাই তাঁহাদিগের মাতৃভাষার দাবী উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং মুসলমান তরুণগণই সেজন্য আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছেন। পাকিস্তান সরকার আন্দোলন দলিত করিবার জন্য বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই বহু লোকের মধ্যে হিন্দুই অধিক। তাঁহারা বলিতেছেন, এই আন্দোলনের মূলে হিন্দুদিগের প্রেরণা আছে এবং ভারত রাষ্ট্র হইতেই হিন্দুরা ইহা পরিকল্পিত করিয়াছেন ও পরিচালিত করিতেছেন! শহিদ সুরাবর্দ্দীও পাকিস্তান সরকারের এই কথা অসত্য বলিয়া মত প্রচার করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন, ইহা পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দু-বিতাড়নের উপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর কলিকাতায় যে দোহা পুলিসের কর্ম্মচারী থাকিয়া বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য "প্রসিদ্ধি" লাভ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে পূর্ব্বপাকিস্তান সরকারে সমাদৃত তিনি বলিয়াছেন—যে সকল লোক ভারত রাষ্ট্র ও পূর্ব্ব পাকিস্তানে যাতায়াত করে, তাহারাই যত অনর্থের মূল; সুতরাং পাকিস্তানের পুলিস ও আনসার বাহিনী যেন তাহাদিগের উপর খর দৃষ্টি রাখে। ইহাতে স্বভাবতঃই বুঝিতে হয়, যে কারণেই কেন হউক না, যে সকল হিন্দু এখনও পাকিস্তানে গতায়াত করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে গতায়াত বিপজ্জনক হইবে।

লর্ড কার্জ্জন যখন বাঙ্গালাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন, তখন ইংরেজ সরকারের কর্ম্মচারীরা মুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন, বিভাগের ফলে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদিগের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা তাহারা মুসলমান শাসকদিগের শাসনকালের পরে আর কখন সম্ভোগ করে নাই। তখনই ছোটলাট ব্যাম্‌ফাইল্ড ফুলার মুসলমানদিগকে তাঁহার "সুয়ো বিবি" বলিয়াছিলেন। পাকিস্তান গঠনের দাবী লইয়া যে সকল মুসলমান পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" রব তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা এ রবের ফলে বিব্রত জনগণকে সেই আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানরা দেখিতেছে, তাহারা "যে তিমিরে সে তিমিরে"। তাহাদিগের ভাত-কাপড়ের অভাব দূর হয় নাই—বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাহাদিগকে করভারে পূর্ব্ববৎই পীড়িত হইতে হইতেছে, যে কারণেই কেন হউক না, পাটের দাম কমায় কৃষক সম্প্রদায় বিপন্ন হইয়াছে—ইত্যাদি। তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। আবার তাহারা দেখিতে পাইতেছে, পূর্ব্বপাকিস্তানে পঞ্জাব ও বিহার হইতে আগত মুসলমানরা সরকার কর্ত্তৃক অধিক সমাদৃত। তাহার উপরে তাহাদিগকে মাতৃভাষার স্থানে উর্দ্দু ব্যবহারে বাধ্য করা হইতেছে। এইরূপ কারণে তাহারা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং সেই বিক্ষোভ মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রাখার দাবীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাকিস্তান সরকার সে আন্দোলনকে হিন্দুর অনুপ্রেরণায় সঞ্জাত বলিতেছেন—এমন কি বলিতেছেন [illegible]

বর্ত্তমান সরকারের বিরোধী হওয়া এক কথা—আর রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়া অন্য কথা। সরকারের বিরোধিতা করিবার অধিকার গণতন্ত্রশাসিত দেশে লোকের আছে—রাষ্ট্রদ্রোহিতা অপরাধ।

পাকিস্তান সরকার যে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা-সম্বন্ধীয় আন্দোলনের জন্য বহু হিন্দুকে বন্দী করিয়াছেন ও বলিতেছেন, আন্দোলন ভারত রাষ্ট্র হইতে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতেই পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের প্রতি ও ভারত রাষ্ট্রের প্রতি পাকিস্তানের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা উপেক্ষা করা ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে সঙ্গত হইবে না।

রেলপথে আয় ও ব্যয়

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে পার্লামেন্টে মন্ত্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গার রেল বাজেট পেশ করিয়া বেলান, ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে রেলপথে ব্যয় বাদ দিয়া ২৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ভারত সরকার পাইবেন। অথচ কয়লার ভাড়া শতকরা ৩০ টাকা হারে বর্দ্ধিত করা হইবে! এই বৃদ্ধিতে আয় ৬ কোটি টাকা অধিক হইবে এবং তাহার মধ্যে রেলের জন্য ব্যবহার্য্য কয়লার ভাড়া ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বাদ দিলে শিল্প ও সাধারণ লোক যে কয়লা ব্যবহার করিবে, তাহার জন্য ভাড়া—৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা হইবে। অর্থাৎ রেলে প্রভূত লাভ হইলেও তাহাতে শিল্প ও সাধারণ লোক কোনরূপে উপকৃত হওয়া ত পরের কথা—তাহাদিগের (কয়লার জন্য) ব্যয় বর্দ্ধিত হইবে। যাত্রীরা যে সকল সুখ-সুবিধা তাঁহাদিগের প্রাপ্য হিসাবে দাবী করিতে পারেন, সে সকলের কোন আশা নাই। সাধারণ হিসাবে আশা করা সঙ্গত—এইরূপ লাভের ফলে মালের ও যাত্রীর ভাড়া হ্রাস করা হইবে এবং যাত্রীদিগের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চেষ্টা দেখা যাইবে। কিন্তু তাহাই হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা বাজেট পেশ করিবার সময় জানা যায় নাই বটে, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে ট্রেণে শ্রেণী বিভাগ পরিবর্ত্তিত করিয়া অকারণ ব্যয়ের পরে সরকার আবার পূর্ব্ব প্রচলিত ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ বার রেলের কেন্দ্র ভাগ করা হইতেছে। তাহাতে যে লোকের কোন সুবিধা বা লাভ হইল বা হইতে পারে এ বিশ্বাস আমাদিগের নাই। কিন্তু প্রদেশ বিশেষের লাভ হইতে পারে।

গোপালস্বামী আয়েঙ্গার গত ২১ মার্চ জানাইয়াছেন—রেলের যে ৩টি কেন্দ্র পরিবর্ত্তন অবশিষ্ট ছিল, সে কয়টি ১৪ই এপ্রিল হইতে করা হইবে। নূতন ব্যবস্থায় গোরক্ষপুরে উত্তর-পূর্ব্ব রেলপথগুলির প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদ বিভাগ, লক্ষ্ণৌ বিভাগ ও মোরাদাবাদ বিভাগ ঐ কেন্দ্রের অধীন করা হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের ৩টি বিভাগ নর্দ্দার্ণ রেলওয়ে কেন্দ্রে যাইবে; নর্থ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে উহার একটি বিভাগ এবং ইষ্টার্ণ রেলওয়ে উহার অবশিষ্ট বিভাগসমূহ ও বেঙ্গল-নাগপুর রেল লইবে।

প্রথমে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কেন হইয়াছে তাহা [illegible] বলিতে পারা যায় :—

"আমরা এলাহাবাদ বিভাগ নর্দ্দার্ণ রেল ভুক্ত করিবার জন্ত যুক্ত-প্রদেশের সরকারের দাবী মানিয়া লইয়াছি। আমরা রেলের একটি কেন্দ্র গোরক্ষপুরে রাখিতে সম্মত হইয়াছি। গোরক্ষপুর হইতে শিয়ালদহ বিভাগ পরিচালনে আমরা সম্মতি দিয়াছি।"

ইহার নির্গলিত অর্থ এই যে, যুক্তপ্রদেশের সরকার যাহা চাহিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে।

গোরক্ষপুর হইতে পরিচালন-ব্যবস্থায় যে কলিকাতা ও পাণ্ডু হইতে বহু কর্ম্মচারীকে তথায় যাইতে হইবে—তাহা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উত্তর—বহু লোককে স্থানান্তরিত করিতে হইবে না। তাহার কারণ অবশ্য সহজেই বুঝা যায়—কলিকাতায় ব্যবসা কমিবে না, সে জন্য ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য—

(১) কলিকাতার বন্দরে যে ব্যবসা হয়, তাহার শত ভাগের এক ভাগও গোরক্ষপুরে হয় না—কখন হইবে না। তবে কলিকাতা হইতে কেন্দ্র স্থানান্তরিত করা সঙ্গত কি না?

(২) কলিকাতায় কার্য্যালয় প্রভৃতি বহুদিনে বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। সে সব ফেলিয়া গোরক্ষপুরের নূতন কার্য্যালয় প্রভৃতি নির্ম্মিত করিতে কত কোটি টাকা ব্যয় অনিবার্য্য?

কলিকাতার ক্ষতি করিয়া যুক্তপ্রদেশে নূতন বড় সহর নির্ম্মাণ করা হইবে। কিন্তু টাকাটা যুক্তপ্রদেশ দিবে না। এই ব্যয় অপব্যয় কি না, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ভারত সরকারের বাজেট—

ভারত রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি অনুসারে যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আগামী বৎসরের জন্য আয়-ব্যয়ের অনুমানিক বাজেট নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা রচিত ও নূতন প্রতিনিধিদিগের দ্বারা অনুমোদিত হইলে তাহাই সঙ্গত হইত। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রে তাহা হয় নাই। যে মন্ত্রিমণ্ডলের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াছে, সেই মণ্ডলের দ্বারাই বাজেট প্রণীত হইয়া যে পার্লামেণ্টের অবসান ঘটিয়াছে তাহাতে পেশ হইয়াছে। এই বাজেটের বৈশিষ্ট্য—

(১) বর্ত্তমান অর্থাৎ ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে উদ্‌বৃত্ত—৯২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা—

(২) ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে উদ্‌বৃত্ত—১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা

আর—

(১) বর্ত্তমানে করের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

(২) দেশ রক্ষার খরচ বাড়িয়া এ বৎসর ১৮১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা হইতে আগামী বৎসর ১৯৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা হইবে।

(৩) প্রদেশসমূহকে এককালীন ব্যয়ের জন্য ঋণ বাবদ ব্যয়ের মধ্যে আছে এ বৎসর ৭৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ও পরবৎসর ৮২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা

(৫) আমেরিকা হইতে ঋণ বাবদে প্রাপ্ত গমের মূল্য ও কলম্বো পরিকল্পনায় লব্ধ সাহায্য হইতে এক স্বতন্ত্র উন্নতিকর তহবিল গঠিত হইল।

ভারতবাসী যে করভারে পীড়িত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—যাহাতে সাধারণ লোকের করভার লঘু করা যায়, সে বিষয়ে চেষ্টাই সরকারের কর্ত্তব্য। ভারত সরকারের বাজেটে সে চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। ভারত রাষ্ট্রে করের ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে সহজেই দেখা যায়—কর অসমভাবে ধার্য্য করা হইয়াছে এবং কর আদায়ের পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ; যে স্থানে অধিক কর ধার্য্য করা সঙ্গত সে স্থানে তাহা হয় নাই—ফলে সাধারণ লোকের করভার দুঃসহ হইয়াছে। আর কর আদায়ের পদ্ধতি যে ত্রুটিপূর্ণ তাহার প্রমাণ—অসাধু ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দিতে পারিয়াছে এবং তাহাদিগকে অব্যাহতি দানের প্রলোভন দিয়া সরকার প্রাপ্য করের কতকাংশ পাইয়াই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। যাহারা কর গোপন করিয়াছিল, তাহারা তাহার কতকাংশ দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছে—কোনরূপ দণ্ড ভোগ করে নাই! যাহারা এইরূপে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তাহারা আবার—অনেক ক্ষেত্রে—সরকারের মন্ত্রী প্রভৃতির নিকট সমাদৃত। সমাজে ইহার ফল কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেশরক্ষার জন্য ব্যয় যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য ক… বিষয়। বিদেশী শাসনে এই বাবদে ব্যয় অত্যধিক ও অসঙ্গত বলিয়া সমালোচনা করা হইত। এখন ব্যয় বৃদ্ধির কারণ কি? এই ব্যয়-বৃদ্ধিকে কি বুঝিতে হইবে, ভারত-রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র কর্ত্তৃক আক্রমণের বা স্বরাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইয়াছে?

প্রদেশসমূহকে প্রয়োজনে ঋণদানের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু প্রদেশসমূহ যদি লোকের আস্থাভাজন হয়, তবে যে তাহারা আবশ্যক অর্থ ঋণ বাবদে সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা অবজ্ঞা করা সঙ্গত নহে।

খাদ্য সম্বন্ধে সাহায্যে বুঝা যায়—খাদ্য বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই, আগামী বৎসরে হইবার আশাও নাই।

বাজেট বিচার করিলে মনে হয়, উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

কোন ক্ষেত্রেই ২৩ কোটি টাকালাভ হইবে মনে করিয়া ৯২ কোটি টাকারও অধিক লাভের সৌভাগ্য অপর কোন দেশের হয় না। ভারত রাষ্ট্রে কেন তাহা হইয়াছে তাহা বিবেচ্য। দুই কারণে ইহা হইয়াছে—

(১) রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি

(২) আমেরিকা কর্ত্তৃক প্রদত্ত গম ঋণ

ভারত সরকার রপ্তানী পাটজাত পণ্যের উপর কর অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। বৃদ্ধির ফলে বিদেশে সে সকল পণ্যের চাহিদা হ্রাস হওয়ায় সরকারকে কর অর্দ্ধেক করিতে হইয়াছে। ঐ কর যে ভারত সরকারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

যে সময় বিদেশী পণ্যের মূল্য বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই সময় অবিচারিত-চিত্তে বিদেশী পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক বর্দ্ধিত করা যে সঙ্গত নহে,

ছিলেন। তাহাতে অনেক অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে লোককে বিরত হইতে হইয়াছিল।

পরোক্ষ কর যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আমদানী শুল্কের উপর যে অতিরিক্ত কর যোগ করা হইয়াছিল, তাহা বাতিল করা সঙ্গত কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই।

প্রয়োজনহেতু আয়-কর ও বিক্রয়-কর যে ভাবে বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল—তাহার পরিবর্ত্তন না করা সমর্থনযোগ্য বলা যায় না।

সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে—বর্ত্তমান বাজেট অনুসারে যখন মাত্র ৫ মাস কাজ চলিবে, তখন বিশেষ বিবেচনার সময় নাই। কিন্তু সে কথা স্বীকার করা যায় না। লোককে যতটুকু সুবিধা দেওয়া সম্ভব ছিল, ততটুকুও না দেওয়া সরকারের কর্ত্তব্যচ্যুতি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারত সরকার ঋণ করিয়া আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না এবং সেই জন্য তাঁহাদিগকে স্থায়ী কার্য্যের জন্য ব্যয়ে রাজস্ব ও বিদেশ হইতে গৃহীত ঋণের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে সরকার এক শত কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ৫০ কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং বোধ হয়, সেই জন্যই বারবার মাত্র ২৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। অথচ এ বারও স্থায়ী কার্য্যের জন্য ব্যয় ১৫১ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। স্থায়ী কাজ যখন লাভজনক, তখন উহার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, তাহা বা তাহার অধিকাংশ ঋণ করিয়া সংগ্রহ করাই সঙ্গত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। সেই জন্যই লোককে করভারে পীড়িত করা হইতেছে এবং বিদেশ হইতে ঋণ গৃহীত হইতেছে। ইহাতে দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

বিদেশীরা এ দেশে যে টাকা ঋণ দিতেছে, তাহার মূলে কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, তাহা বিবেচনা না করিলেও বলা যায়, বিদেশী ঋণের উপর নির্ভর করিয়া দেশে উন্নতিকর কার্য্য করা নিরাপদ নহে। বিদেশের নিকট আর্থিক ব্যাপারে আস্থাভাজন হওয়া অপেক্ষা স্বদেশে আস্থাভাজন হওয়া যে অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহাও বলা বাহুল্য। ভারত রাষ্ট্রে যে অর্থের অভাব আছে, এমন মনে করিবার কারণ যখন নাই, তখন যদি ভারত সরকার এ দেশে উন্নতিকর কার্য্যের জন্য মূলধনের প্রয়োজনে আবশ্যক অর্থ ঋণরূপে সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে তাহা কখনই সরকারের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। বিশেষ ঋণের জন্য সুদ হিসাবে যে টাকা দিতে হয়, তাহা দেশে থাকিলে তাহাতে দেশের যে উপকার হয়, তাহা বিদেশে যাইলে সে উপকার সাধন সম্ভব হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট—

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে এ বার ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ঘাটতী দেখান হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দের বাজেট পেশ করা ব্যতীত সরকার ১৯৫১-৫২ [illegible]

বিষয়	অতিরিক্ত ব্যয়
বহু কার্য্যের জন্য নদী-পরিকল্পনায় প্রযুক্ত মূলধনের সুদ	১,২৭,০০০ টাকা
বহু কার্য্যের জন্য নদী পরিকল্পনার অন্যান্য ব্যয়	২,৭৮,০০০ ,,
পুলিস	৪২,১৯,০০০ ,,
পোতাশ্রয় ও পোত পরিচালন	১,৪৬,০০০ ,,
বৈদ্যুতিক পরিকল্পনার জন্য	২০,০০০ ,,
পূর্ত্ত বিভাগে	১,৩৫,০০০ ,,
দুর্ভিক্ষ বাবদে	২,৭১,০০০ ,,
আকস্মিক ও রাজনীতিক ভাতা	১০,০০০ ,,
অবসর-প্রাপ্তদিগের ভাতা ও পেন্সন	১১,০০০ ,,
মাসিক পেন্সনের পরিবর্ত্তে এককালীন টাকা দেওয়া	৮,১১,০০০ ,,
কাগজ প্রভৃতি	৫,২৭,০০০ ,,
বিশেষ ব্যয়	৬৫,৭১,০০০ ,,
প্রাদেশিক সরকারের পরিচালিত ব্যবসায়ে প্রযুক্ত	৭,১৩,৫৪,০০০ ,,
চলতি ঋণ	১৩,০০,০০,০০০ ,,
ইণ্ডিয়ন সরকার হইতে ঋণ	১২,০০,০০০ ,,
মোট—	১৭,৫৪,৮০,০০০ টাকা

আগামী বৎসরের বাজেটে নিম্নলিখিত বাবদে ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়াছে—

(১) শাসন-কার্য্য

(২) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

স্থানচ্যুত ব্যক্তিদিগের জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ হ্রাস করা হইয়াছে।

দ্বাদশ মাসের বাজেট পেশ করা হইলেও ৫ মাসের জন্য ব্যয় (বাজেট অনুসারে) মঞ্জুর করিতে বলা হয়। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থা পরিষদ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে ঐ প্রার্থনা পূর্ণ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বাবদে ব্যয়ের আলোচনার সুযোগ প্রদত্ত হয় নাই।

বর্ষশেষে অতিরিক্ত ব্যয়ের যে দাবী পেশ করা হয়, তাহাতেই পশ্চিমবঙ্গে ব্যয়বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার দুই কারণে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের আয় কমিয়া গিয়াছে—

(১) আয়করের পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ভাগের পরিমাণ হ্রাস। অধি-

[illegible]

করা ২০ টাকা পাইতেন। বাঙ্গালা বিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মাত্র শতকরা ১২ টাকা দেওয়া হইতেছে।

(২) পূর্ব্বে রপ্তানী পাটের উপর যে শুল্ক আদায় হইত বাঙ্গালাকে তাহার শতকরা ৬২ টাকা ৮ আনা দেওয়া হইত ; এখন মাত্র ২০ টাকা দেওয়া হয়। অথচ এখনও পাট-উৎপাদক প্রদেশসমূহের মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের স্থান প্রথম এবং চটকলগুলি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত।

আর এক বিষয়ে উন্নতিকর কার্য্যের জন্য ভারত সরকার যে টাকা দিতেছিলেন ও দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। উন্নতির কার্য্য ব্যতীত প্রদেশের লোকের সমৃদ্ধি ও প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব বর্দ্ধিত হয় না। সুতরাং সে সকল কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই ভাল। সেই জন্য পশ্চিমবঙ্গের অভিযোগ—কেন্দ্রী সরকার এক দিকে তাহার আয়-কর ও পাটের রপ্তানী কর—উভয়ের অংশ কমাইয়া দিয়াছেন, অপর দিকে আবার তাহাকে উন্নতিকর কার্য্যের জন্য যে অর্থ দিতেছিলেন, তাহার পরিমাণ হ্রাস করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের যে বাজেট পেশ হইল, তাহা যখন পরবর্ত্তী সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে, তখন যে কর-বৃদ্ধি হইবে না, এখনও বলা যায় না।

আপাততঃ লক্ষ্য করিবার বিষয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও প্রয়োজন অনুসারে ব্যয়-সঙ্কোচের পন্থা অবলম্বন করেন নাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ব্যয়-সঙ্কোচ করা যে সহজসাধ্য তাহা সহজেই বলা যাইতে পারে। নানা বাবদে—কলিকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপন, সমুদ্রে মৎস্য আহরণ, বাস পরিচালন প্রভৃতি নানা কার্য্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ভাবে অর্থ ব্যয় করিয়াছে, তাহা যে অর্থের অপব্যয়,তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপব্যয় ও অপচয় যে পশ্চিমবঙ্গে নানা দিকে লক্ষিত হইতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু প্রতীকার নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি—ইংরেজের পন্থানুসরণ করিয়া—ব্যয়-সঙ্কোচের উপায় সন্ধান করিবার জন্য কমিটী গঠিত করেন এবং প্রত্যেক সরকারী বিভাগে বেসরকারী পরামর্শ সমিতির সাহায্য গ্রহণ করেন, তবে যে নানা বিষয়ে ব্যয়-সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি—

বহুদিন পরে কলিকাতায় কংগ্রেসের নিখিল-ভারত সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা অখণ্ড বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায়—ইংরেজের শাসনকালে। সে অধিবেশনের স্থান—ওয়েলিংটন স্কোয়ার। তাহা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তখন কংগ্রেসে—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যেমন হইয়াছিল তেমনই—অগ্রগামীদিগের সহিত মধ্যপন্থীদিগের বিরোধ দেখা দিয়াছিল এবং প্রথম দলের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। সেই অধিবেশনে যাহা হইয়াছিল, তাহার ফলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করায় মণ্ডপে বিক্ষোভ দিয়াছে হয় এবং পাছে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কোনরূপে অপমানিত লইয়া গিয়াছিলেন। আজ আর সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কাহারও ভ্রান্ত ধারণা পোষণের অবকাশ নাই এবং কলিকাতায় রাজভবনে শ্রীমান অতুল বসুর অঙ্কিত সুভাষচন্দ্রের চিত্র প্রতিষ্ঠাকালে পণ্ডিত জওহরলাল যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচনশেষে কংগ্রেসী প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্যের পরে এই অধিবেশন। সুতরাং ইহাতে যদি সাজসজ্জা প্রভৃতিতে ব্যয়বাহুল্য হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়।

সে যাহাই হউক, ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিধি রচিত ও গৃহীত হইবার পরে—পাকিস্তানের সীমান্তস্থিত জাতীয়তার-উদ্ভাবক বাঙ্গালার ভারত-রাষ্ট্রস্থিত অংশে এই অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ইহার কার্য্য বিবরণে দেখা যায়, ইহাতে কংগ্রেসের নীতির কোন পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয় নাই—হয়ত কংগ্রেসের পরিচালকগণ তাহার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ইহাতে কংগ্রেসকে সমবায়-গণরাষ্ট্রে বিশেষ-ভাবে প্রযুক্ত করিবার কথাই বলা হইয়াছে। বোধ হয়, কংগ্রেসের কর্ত্তারা মনে করিয়াছিলেন, কংগ্রেসের যে নীতি কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহে গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই—কেবল নির্ব্বাচনফলে দেশের লোকের কংগ্রেসে যে আস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসের দায়িত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সেই দায়িত্ব পালন জন্য অধিক উদ্যম ও শ্রম প্রযুক্ত করিতে হইবে। কোন কোন কেন্দ্রে যে কংগ্রেস নির্ব্বাচনে জয়ী হয় নাই, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছিল। এ বার নির্ব্বাচনে যে কম্যুনিষ্ট দল শক্তিশালী প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আলগুরাই শাস্ত্রী প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, দেশের খাদ্য ও শিল্প সমস্যাসমূহের আলোচনার জন্য কংগ্রেসের সভাপতি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করুন। সভাপতি তাহাতে বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সভাপতিকে যাহা করিবার করিতে বলা হউক। যদি এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তবে হয়ত পরে সরকারের কার্য্য পরিচালনারও সুবিধা হইতে পারে ; কারণ—(১) যখন জনগণের কল্যাণই সকলের উদ্দেশ্য তখন একান্ত প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহের সমাধানে সম্মিলিত চেষ্টা সম্ভব হইতে পারে, (২) সহযোগ ব্যতীত সরকারের দৈনিক কার্য্যের পথ বিঘ্নবহুল হয়। খাদ্য ও শিল্পসমস্যা দলবিশেষের সমস্যা নহে, সমগ্র জাতির সমস্যা।

বলা হইয়াছে, "জাতির প্রগতির পথ, যে সকল কায়েমী স্বার্থ বিঘ্নাস্তৃত করে, সে সকল দূর করিতে হইবে।" ইহা ভাল কথা। কিন্তু কি ভাবে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে, তাহাই বিশেষ বিবেচ্য। আমাদিগের এ বিষয়ে সরকারকে ও কংগ্রেসকে সতর্ক করিয়া দিবার কারণ—বলা হইয়াছে—

(১) জমীদারী, জায়গীরদারী ও অনুরূপ যে সকল ব্যবস্থা আছে, সে সকল অবিলম্বে উচ্ছেদ করিতে ও সেই সকল কার্য্যের দ্বারা ভারতে কৃষি-বিপ্লবে শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে।

করিয়া যাহাতে সকলেই কাজ পায় (অর্থাৎ কেহ বেকার না থাকে) তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু রুশিয়া প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছে, কৃষি-বিপ্লবে অচিরে বেকার-সমস্যার সমাধান না হইয়া বরং সে সমস্যা বর্দ্ধিত হয়। আবার সকল দেশই—তাহার বিপুল সম্পদ থাকিলেও—প্রগতির রথে কৃষি-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবের মত দুইটি বেগবান অশ্ব যুক্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে ভয় পায়। এ দেশেও দেখা যাইতেছে, গত চারি বৎসরে সরকার জমীদারীপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন নাই, পরন্তু জমীদারদিগকে বর্জ্জন করিয়া সচিবসঙ্ঘ গঠন করিতে পারেন নাই এবং বড় বড় জমীদারকেও নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়াছিলেন। দেশের ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন এবং জোৎদারের উচ্ছেদসাধন ব্যতীত প্রজার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব নহে। আবার প্রজা সন্তুষ্ট না হইলে উৎপাদন বৃদ্ধিতেও তাহার আগ্রহ হইবে না। কিন্তু সে কাজ সাবধানে করিতে হইবে।

খাদ্য-সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব এ বার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও অধিক হইবে—এ কথা খাদ্য-সচিব যেমন—রাষ্ট্রপালও তেমনই বলিয়াছেন। ইহাতে যে লোক আতঙ্কিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে লোক জিজ্ঞাসা করিবে, বৎসরের পর বৎসর কেন খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইতেছে না?

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য ও কৃষি-মন্ত্রী বলিয়াছেন—অতঃপর সে দেশে খাদ্যোপকরণ ও অন্য কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন—দেশরক্ষা ও কয়লা উৎপাদনের সহিত সমান গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি বলেন, অষ্ট্রেলিয়া খাদ্যোপকরণ উৎপাদন দেশরক্ষা পর্য্যায়ভুক্ত বিবেচনা করে এবং সে উৎপাদন কেবল দেশের লোকের প্রয়োজনের জন্যই নহে, পরন্তু অপর দেশকে উপযুক্তরূপ সাহায্যদানের জন্যও বটে।

অষ্ট্রেলিয়ার সরকারের এই উক্তি ভারতের সরকারের বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ দেশে কৃষিকার্য্য পর্জ্জন্যের কৃপার উপর নির্ভর করে এবং সেইজন্য কৃষক "এক সালে আমীর, আর সালে ফকীর।" অথচ এ দেশ কৃষিপ্রধান। কেবল তাহাই নহে—ইহার শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যও কৃষিজ উপকরণ প্রয়োজন।

ভারত রাষ্ট্রে এখনও অনেক আবাদযোগ্য জমী "পতিত" আছে—পশ্চিম বঙ্গেও তাহা লক্ষ্য করা যায়। কোথাও বা সেচের জলের অভাব—কোথাও বা জমী জলবদ্ধ। ইটালী প্রভৃতি দেশে লোক পাহাড় কাটিয়া সমতল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চাষ করে, দেখা গিয়াছে। আর এ দেশে সমতল ভূমিতেও চাষ হয় না!

যে সময় দেশে ও প্রদেশে খাদ্যোপকরণের অভাব, সেই সময়েও যে খাদ্যোপকরণ সরকারের ত্রুটিতে নষ্ট হইয়াছে, ইহা একান্তই পরিতাপের বিষয়।

কত দিনে দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণ হইবে এবং ফলে পশ্চিম বঙ্গের একাংশ বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া কৃষিকার্য্য পরিচালিত করিতে পারিবে, তাহা মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আর যে একাংশ সেই জলে উপকৃত হইবে, তাহাতেও জমীতে কৃষকের অধিকার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে ঈপ্সিত ফললাভ হইবে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণীতে' লিখিয়াছিলেন :—

"যতদিন আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায় এখানকার মত অজ্ঞ, নিরন্ন, অর্থহীন, এবং বহুসংখ্যক থাকিবে, ততদিন এ দেশের নিস্তার নাই, ততদিন কৃতবিদ্য ভদ্র-সমাজের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে। যতদিন কৃষকে দেশের অবস্থা না বুঝিবে, যতদিন কৃষক জোর করিয়া আপনার স্বত্ব বজায় করিতে না পারিবে, ততদিন এ দেশের উন্নতি নাই। আর যতদিন এখানকার অপেক্ষা অল্পসংখ্যক কৃষকে অধিকতর পরিশ্রমে এখনকার হইতে অনেক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করিতে না পারিবে, ততদিন এ দেশের মঙ্গল নাই।"

দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার পরেও এই অবস্থা অপরিবর্ত্তিত।

বিজ্ঞান যে সব সুবিধা দেয়, সে সকলও যে এ দেশে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইতেছে না, তাহা এ দেশে কৃষির দুর্দ্দশার অন্যতম প্রধান কারণ।

২১।১২।৫৮

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

তবু এই অন্ধকারে
বারে বারে
আলোকের সাড়া দিয়ে যায়,
নিবিড় শঙ্কিত নিরাশায়।
কবে সেই আলোকণা
বিচ্ছুরিত হয়ে চারিদিকে
রেখে গেল পঁচিশে বৈশাখে,—
আজো তার নেই ক্ষয়,
হারানো পথের প্রান্তে যেনো জেগে রয়
একটি আলোর শিখা জাগায়ে বিস্ময়!

জানি, এ গভীর রাত্রি হ'য়ে যাবে শেষ
হয় তো বা দিয়ে যাবে পথের নির্দ্দেশ,—
ঘুঁচিবে আঁধার রাত্রি
মুখরিত হ'বে নিশিদিন—
সূর্য্যের আলোকপাতে বেদনার হ'বে সবি লীন

লাহোরের হোটেল থেকে প্যাকেট মুড়ে রাতের খাবার আনা হয়েছিল··· চলন্ত-ট্রেণের কামরায় বসে তার সদ্ব্যবহার করলুম !

আহারাদির পর শ্রীযুত জীকভের সঙ্গে চললো সোভিয়েট দেশের সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ! তারই ফাঁকে-ফাঁকে নোট-বুকে আমি টুকে নিলুম রুশ-ভাষার নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ের প্রতিশব্দ ! ওদেশে গিয়ে পথে ঘাটে বাজারে চলতে ফিরতে বা হোটেলে বাস করতে, ওখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া সহজ হবে এবং ও দেশের বাসিন্দাদের সঙ্গে মনের আদান প্রদানের ব্যবস্থা হবে সহজ।

এমনি গল্প-সল্পের মধ্যে রাত বেশ গভীর হয়ে উঠেছে—বুঝতে পারিনি সেটা ! হুঁশ হলো, আমাদের ট্রেণ যখন থামলো পাকিস্তানের লালামুশা জংশনে ! রাত প্রায় এগারোটা···ট্রেণ এখানে থামে মিনিট পনেরো। ট্রেণ থামতেই পাশের ছোট-ছোট কামরা দু'টি থেকে রক্ষী প্রহরীর দল নেমে টহল পাহারা শুরু করলেন আমাদের কামরা দু'খানির চারিপাশে···কেউ প্ল্যাটফর্ম্মে, কেউ বা লাইনের উপরে ! আমরা সচকিত হয়ে উঠলুম ! এমনি পাহারা দিয়ে আসছেন এই প্রহরীরা বরাবর—সব ষ্টেশনে—যেখানেই ট্রেণ থামছে !

পাশের কম্পার্টমেণ্টে আমাদের অন্য চারজন সহযাত্রী আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন। লাহোর থেকে যে প্রহরী-শাস্ত্রীরা সঙ্গে আসছিলেন, আমাদের এ-কামরায় তখনও বাতি জ্বলছে দেখে, তাঁদের একজন ট্রেণের জানলার ধারে এগিয়ে এসে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—লিমনেড, চা বা সিগারেট কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা ? প্রয়োজন থাকলে ষ্টেশনের ফেরীওয়ালাকে ডেকে কেনবার ব্যবস্থা করে দেবেন !

ব্যবহারটা বিচিত্র ঠেকলো !···লাহোর এরোড্রোমের পর থেকেই নজরবন্দী হয়ে চলেছি। পাকিস্তানের পথ—সেখানে পরদেশীর প্রতি প্রহরীর এই প্রীতি-ভাষণ···মনে খট্‌কা লাগবার কথা !

প্রশ্ন করে জানলুম—যে হেতু আমরা ক'জন ভারতবাসী পাকিস্তানের পথ-যাত্রী 'মেহ্‌মান'···তাই ওখানকার কোনো মন্দ লোক মন্দ-মতলবে আমাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার না করে—তারই পাহারাদারী করে সঙ্গী হয়ে চলেছেন এই প্রহরীর দল ! নিরাপদে অক্ষত-অবস্থায় আমাদের পেশোয়ারে পৌঁছে দিয়ে তবে এঁদের ছুটী মিলবে। এ-ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নেই এই পাহারাদারীর পিছনে।

ট্রেণ লালামুশা ছাড়লো। কামরার বাতি নিভিয়ে আমরা যে যার শয্যায় আশ্রয় নিলুম।

ঘুম ভাঙলো ভোরে···দিনের আলো তখন সবে ফুটতে শুরু করেছে। ট্রেণ দাঁড়ালো ক্যাম্বেলপুর জংশনে।

পাশের কামরা থেকে প্রহরী-বন্ধু এসে আমাদের কাছে বিদায় নিলেন···এখানে শেষ হলো তাঁদের পাহারার পালা। এর পর থেকে আমাদের চৌকি দেবার ভার নেবেন অন্য একদল সশস্ত্র পাকিস্তানী-প্রহরী···বাকী পথটুকু পাহারাদারী করে তাঁরা পৌঁছে দেবেন পেশোয়ারে। নতুন প্রহরীদলের সর্দ্দারের সঙ্গে পরিচয় হলো···তিনি দেখলুম আরো সদালাপী।···আমাদের কোনো রকম 'তক্‌লিফ্‌' ঘটলেই তিনি তা বিদুরিত করবেন—আশ্বাস দিলেন বার-বার।

ট্রেণ চললো এগিয়ে···পথের দু'পাশে উঁচু-নীচু পাহাড়-জমির চড়াই আর উৎরাইয়ের ঢেউ ! মাঝে মাঝে ষ্টেশনে ট্রেণ থামলেই, পাশের কক্ষ থেকে প্রহরী-বন্ধু এসে খপর নিয়ে যান, আমাদের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা ! কি করে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবেন, সেজন্য এ-বন্ধুটির দেখলুম বিশেষ আগ্রহ। এঁরই সহায়তায় শ্রীযুত জীকভ আমাদের চা ও প্রাতরাশের ব্যবস্থা করলেন, এমন কি সকালের খপরের কাগজও জোগাড় হলো !

এমনি করে নৌশরা জংশন পার' হয়ে পেশোয়ারে এসে আমাদের ট্রেণ থামলো বেলা প্রায় আটটা নাগাদ ! ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে হোটেলে নিয়ে যেতে এসেছিলেন কাবুলের সোভিয়েট-দূতাবাসের দু'জন কর্ম্মী শ্রীযুত আভাকভ্‌ আর শ্রীমান্‌ প্যাভেল ! আগের দিনে এঁরা কাবুল থেকে মোটর-ভ্যান্‌ নিয়ে এসেছেন, সে-গাড়ীতে আমাদের তুলে আফ্‌গানিস্তানের রাজধানীতে পৌঁছে দেবেন বলে। দু'জনেই বয়সে তরুণ···বেশ মিশুক···অল্পক্ষণের মধ্যে আলাপ জমিয়ে তুললেন। তবে বিভ্রাট ঘটলো—তাঁদের দু'জনের ইংরাজী বা হিন্দী-উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ জ্ঞান নেই তেমন···জানেন শুধু পুস্তু, ফার্সী, জার্ম্মানী আর রুশ ভাষা ! অথচ ও-ভাষা ক'টির অ-আ, ক-খ আমাদের

কারো জানা নেই। আমরা ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, মারাঠি বা মাদ্রাজী যে ভাষাতেই কথা বলি, ওঁরা তার মানে বোঝেন না—আবার ওঁরা ওঁদের পুস্তু, ফারসী, আর্ম্মানী আর রুশ-ভাষায় যা বলেন আমরাও তার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারি না এতটুকু। সুতরাং হাবে-ভাবে, ইশারা-ইঙ্গিতে আর মূকাভিনয়ের মুদ্রা-বিন্যাসে চললো দু'পক্ষের আলাপ-পরিচয়! ভাগ্যে শ্রীযুত জীকভ ছিলেন সঙ্গে—তাই রক্ষা! দু' তরফের কথাবার্ত্তার তিনিই মুস্কিল-আসানকারী দোভাষী হয়ে রচে দিলেন সহজ আলাপের সেতু!

ট্রেণ থেকে মাল-পত্র নামানো হলে ষ্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান মোটর-ভ্যান্ এবং ট্যাক্সিতে চড়ে সোভিয়েট বন্ধু-ত্রয়ের সঙ্গে আমরা রওনা হলুম পেশোয়ারের সুবিখ্যাত Dean's Hotelএর অভিমুখে! বলা বাহুল্য—প্রহরীর পাহারা বাহাল রইলো সঙ্গে-সঙ্গে—যেমন ছিল লাহোরে পদার্পণ করার পর থেকে।

হোটেলটি খাসা! ছবির মত বাগানের কোলে কোলে দাঁড়িয়ে আছে বাংলো-ধরণের টালির ছাদ-দেওয়া কামরার সার—আগাগোড়া বিলাতী কায়দায় সাজানো। তারই ক'খানি সুসজ্জিত তিন কামরাওয়ালা Suiteএ ছিল আমাদের প্রত্যেকের বিরামের ব্যবস্থা!

আমাদের আগমনে বিরাট গুম্ফ-শোভিত হোটেলের ম্যানেজার সাদর-অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন! আমাকে দেখেই তিনি অবাক্!

…আরে, তুমি এখানে!…

ভালো করে চেয়ে দেখি, সুদীর্ঘ পাঠানী ছাঁদের গুম্ফের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছেন—আমার বিশিষ্ট আত্মীয় বন্ধু ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়! কলকাতার বাসিন্দা তিনি এবং সেখানেই ছিল আমাদের নিত্য মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা! তবে, তিনি বাংলা দেশ ছেড়ে কার্য্যব্যপদেশে এখানে এসে হোটেলের পরিচালনা-ভার নিয়ে বাস করার দরুণ ইদানীং আর দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেনি! তাছাড়া পাঠান-দেশে বাস করে বন্ধুবর এমন বিরাট গুম্ফ এবং পাঠানী-ছাঁদে বপু রচনা করে তুলেছেন যে চট্ করে তাঁকে বাঙালী বলে চেনা শক্ত! যাই হোক্, এতদিন পরে আজ অকস্মাৎ আমাদের এমন দেখা হয়ে যাওয়ায় দু'জনেই খুব উৎফুল্ল হলুম। নানা কথার মধ্যে আমাদের সোভিয়েট-যাত্রার খবরও তিনি নিলেন এবং পরিক্রমা-শেষে দেশে ফেরবার পথে তাঁর এখানে ক'দিন কাটিয়ে আসবার আমন্ত্রণও জানিয়ে রাখলেন! সুদূর প্রবাসে দেশের বন্ধুকে পেয়ে রীতিমত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি এবং পেশোয়ারে যে ক'ঘন্টা ছিলুম, তার সবটুকু সময়ই তিনি রইলেন পাশে-পাশে।

বৈদেশিক-রীতি অনুযায়ী পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই পেশোয়ারের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমাদের পাশপোর্টের মঞ্জুরীনামা-গুলিতে আর এক দফা দস্তখৎ করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন—তাই তাড়াতাড়ি স্নানাদির পালা সেরে সোভিয়েট-মোটরভ্যানে চড়ে প্যাভেল আর আমি ছুটলুম সোজা পেশোয়ারের সরকারী-দপ্তরে। শ্রীযুক্ত জীকভ আর আস্তাকভ্ আগেই বেরিয়েছেন পেশোয়ারের বাজারে—আমাদের আরামে কাবুল-যাত্রার জন্য আরো একখানি সুবৃহৎ মোটর ভ্যানের ব্যবস্থা এবং পথের আহার্য্য সওদা করে আনতে।

দপ্তরের দস্তখৎ সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। হোটেলে ফিরে দেখি, জীকভ আর আস্তাকভ ফিরে এসেছেন, নতুন মডেলের সুবৃহৎ একখানি মোটর-ভ্যান্ ভাড়া করে। পথের আহার্য্য হিসাবে রুটি, মাখন, জ্যাম্, ডিম, আপেল, নাশপাতি, আঙুর প্রভৃতি এত এনেছেন যে, গোগ্রাসে গিললেও আমাদের পক্ষে সাত দিনে তা শেষ হবার নয়!

কাবুলের সন্নিকটে একটি অতিকায় স্তম্ভ—ইহার পাদদেশে মানুষকে ক্ষুদ্রতম দেখা যায়

বেলা বেড়ে উঠছে…রোদের তাত বেশ কড়া! সামনে সুদীর্ঘ দুর্গম পথ…পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই পার হয়ে চলতে হবে! তাছাড়া পাকিস্তানে পথ-চলার মঞ্জুরীনামার মেয়াদ আমাদের মাত্র দু'দিনের…তার মধ্যে পেশোয়ারে পৌঁছুতেই দেড় দিন প্রায় অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং এ-রাজ্যের সীমান্ত আমাদের অতিক্রম করে যেতে হবে আর বাকী ক'ঘন্টার মধ্যে

মঞ্জুরীনামা মঞ্জুর করিয়ে নিতে হবে আবার প্রত্যেকের জন্য, পাকিস্তানে পড়ে থাকার দরুণ !

কাজেই পেশোয়ারে আর দেরী করা চললো না ! দিল্লীর আফ্‌গান্‌-দূতাবাসের মারফৎ আমাদের খপর পেয়ে পেশোয়ারস্থ আফ্‌গানী রাষ্ট্রদূত মশায় ইতিমধ্যে তত্ত্ব-তল্লাশ করতে এসেছিলেন

দুই শত ফিট লম্বা আর একটি অতিকায় মূর্তি। মূর্তির সম্মুখে উপবিষ্ট উপাসকদের অতিক্ষুদ্র জীবের মত দেখা যায়। মূর্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সাধারণ মানুষের অপেক্ষা উচ্চ

হোটেলে—তিনিও তাড়া দিতে লাগলেন চট্‌পট্‌ পাকিস্তান-সীমান্ত পার হয়ে যাবার জন্ত !

বন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুব্যবস্থায় হোটেলের সুসজ্জিত বিরাট মধ্যাহ্ন-ভোজনের পালা। তারপর মোটর-ভ্যান্‌ দু'খানিতে আমাদের তল্পী-তল্পা সব তুলে, বেলা একটা নাগাদ রওনা হলুম কাবুলের পথে ! হোটেলের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শ্রীযুত শ্রীকন্ত আর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বিদায় জানালেন ! পুরোনো বন্ধুদের পিছনে ফেলে রেখে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আমরা এগিয়ে চললুম, নতুন পথে নতুন দেশের নতুন-নতুন বন্ধুদের পরিচয় পেতে !

পেশোয়ার থেকে যে সুবৃহৎ মোটর-ভ্যান্‌টি ভাড়া করে আনা হয়েছিল—তাতে সওয়ারী ছিলেন আমাদের দলের প্রায় সকলেই ; আর কাবুলের সোভিয়েট দূতাবাসের 'ষ্টেশন-ওয়াগন' ভ্যান্‌টিতে বোঝাই ছিল আমাদের মাল-পত্র এবং খাবার-দাবার প্রভৃতি ! সে-রথে সারথি ছিলেন প্যাভেল, আর যাত্রী ছিলুম আভাকভ্‌, নিমাই এবং আমি। ভাষার বিভ্রাট ঘটলেও আলাপের আসর বেশ জমেছিল ইশারা-ইঙ্গিত আর পরস্পরের কথার ভাবার্থ বোঝবার ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে।

হোটেল ছেড়ে পেশোয়ারের পথে বেরুতেই নজরে পড়লো লাহোরের সেই শাস্ত্রীবাহী জীপগাড়ীর মতই সশস্ত্র প্রহরী-বোঝাই একখানি মোটর-বাস্‌ আমাদের অনুসরণ করে পিছনে-পিছনে আসছে সারা পথ ! ব্যাপারটা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে—তাই আর বিশেষ বিচলিত হলুম না কেউ !

মোটর চললো ছুটে পেশোয়ার সহর পার হয়ে ! পথের দু'পাশে রুক্ষ ধূলি-ধূসর বিশুষ্ক পাহাড়ী প্রান্তর···সেই মরুময় প্রকৃতির মাঝে মাঝে এধারে-ওধারে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে টুকরো-টুকরো সবুজ-শ্যামল মাঠ, বাট, গাছ আর তরুলতার কুঞ্জ ! তারই ফাঁকে-ফাঁকে ওদেশী ছাঁদে তৈরী পাথরের চাঙড় আর কাদা-মাটি দিয়ে গড়া বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট, কাফিখানা, সরাই-চটি প্রভৃতিও চোখে পড়ছিল কিছু-কিছু।

খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক···দুপুরের খট্‌খটে রোদ—তাপ যেমন কড়া, আলোর তেমনি প্রখর জৌলুশ। সে ঝাঁজে দেহ এবং চোখ দুইই প্রায় ঝলসে যাবার দাখিল ! সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতে চলেছে—অথচ গরমের আমেজ রয়েছে বেশ কড়া ! এ-অঞ্চলের আবহাওয়াই এমনি··· গরমের সময় টেম্পারেচার চড়ে একশো ডিগ্রীরও অনেক উর্দ্ধে এবং শীতের সময় ঠাণ্ডা পড়ে তেমনি প্রচণ্ড—বরফে সাদা হয়ে জমে থাকে তখন এখানকার পথ ঘাট-প্রান্তর ! এদেশের গ্রীষ্মকালে এই তীব্র গরমে, অনেকেরই সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়। তাছাড়া শীতকালে হিম-শীতল ঠাণ্ডায় জমে প্রাণ হারিয়েছে এমন দুর্ভাগা গরীবের সংখ্যা এ-অঞ্চলে বড় কম নয়। তাই শীত-গ্রীষ্ম সব সময়েই এদেশের লোকও বিশেষ হুঁশিয়ার থাকে কড়া-আবহাওয়ার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে ! এর সঙ্গে আছে আবার প্রকৃতির পরিহাস···অর্থাৎ দারুণ গ্রীষ্মে এক-পশ্‌লা বৃষ্টি-ঝড়ের পরই দেখা যায় শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডার প্রকোপ···হু-হু বাতাসে হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

শীত-গ্রীষ্মের এই দারুণ প্রখরতার মধ্যেই জীবন-ধারণ করে এদেশের বাসিন্দারা। অনুর্ব্বর রুক্ষ উদাসীন প্রকৃতির সঙ্গে চিরন্তন-সংগ্রাম করে

ঘোড়ার অনুরূপ এবং আচার-ব্যবহার আর মানসিক কাঠামোও বেপরোয়া, বুনো আদিম-ভাবাপন্ন! মৃত্যুকে এরা ভয় করে না... প্রাণে মায়া এদের কম—কারণ রুক্ষ প্রকৃতির উপেক্ষা-ঔদাসীন্যে আর অভাব-অনটন-রিক্ততার মাঝে প্রতিটি মুহূর্ত্ত জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে কঠোর লড়াই করে এদের বাঁচতে হয়; কঠোর জীবন-সংগ্রাম কঠোর ভাবেই গড়ে তুলেছে এদেশের বাসিন্দাদের! তবে এই পরুষ-কাঠিন্যের মধ্যেও দেখা যায় আদিম-সারল্য, আর বন্ধুত্বের অপরূপ বৈশিষ্ট্য! বাইরে রুক্ষ, নির্ম্মম, কঠোর হলেও মনের ভিতরকার মোলায়েম ভাব আজও মুছে যায় নি!

পেশোয়ার ছেড়ে আসার কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গতি হলো রুদ্ধ! পথের উপর সামনেই কাষ্টমস্ বিভাগের দপ্তর...সেখানকার কর্ম্মীরা আমাদের পাশপোর্ট প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর মঞ্জুর হলো আমাদের পথ-চলা! রাস্তা বন্ধ রাখা হয়েছিল—রেলের লেভেল-ক্রশিং-এর সামনে যেমন লোহার-শিক দিয়ে তৈরী লম্বা বেড়া-ফটক থাকে—তেমনি ব্যবস্থা এখানে। পেশোয়ারে প্রবেশ এবং সেখান থেকে প্রস্থান করবার আগে প্রত্যেক যাত্রীকে এখানে দেখাতে হয় তাঁর পথ-চলার পরোয়ানা... পণ্য-পশারীদের দিতে হয় তাঁদের পশরার দরুণ পণ্য কর এই দপ্তরের।

কাষ্টমসের ঝামেলা মিটিয়ে আবার আমাদের চলা হলো সুরু! পেশোয়ার থেকে কাবুল সুদীর্ঘ দুশো মাইলের পথ। অসীম অনুর্ব্বর রুক্ষ মরুময় পার্ব্বত্য-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'খাইবার পাস্' পার হয়ে বিশাল 'সফেদ কো' পাহাড়ের দুরূহ চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে বন্ধুর পথ এঁকে-বেঁকে গিয়ে মিশেছে আফগানিস্থানের রাজধানীতে! একদিনে এ দীর্ঘ-দুরূহ পথ পাড়ি দিয়ে কাবুলে পৌঁছুনো, বিদেশীদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার...তবে ও-দেশীদের কাছে এ-সাধ্য কিছুই নয়! আজকাল মোটর গাড়ী, লরী এবং ভ্যানের সাহায্যে হামেশাই তাঁরা এ-পথ অতিক্রম করবেন অতি সহজে এবং দ্রুত! তবে যুগ-যুগান্তের প্রাচীন-প্রথায় পণ্যবাহী উটের সার বা ঘোড়া-গাধা-খচ্চরের পিঠে বাণিজ্যের পশরা-সম্ভার নিয়ে যে সব বণিকের দল আজও এ-পথে আসা যাওয়া করেন, তাঁদের গতি মন্থর...সাধারণতঃ অনেক দিন লেগে যায় পাহাড় পর্ব্বত পার হয়ে কাবুল, বোখারা, কান্দাহার, সমরখন্দ, তাশকান্দ, তাতার, তুর্কী কিম্বা পেশোয়ারে পৌঁছুতে। নিজেদের পণ্য বেচা-কেনার পর আরাম-বিরামের দিকে নজর রেখে খোশ্-মেজাজে তাঁরা পথ চলেন ধীর-মন্থর গতিতে—যে রেওয়াজ চলে আসছে এদেশে, ইতিহাসের সেই আদিম যুগ থেকে! পথ চলবার সময় এদেশের আধুনিক এবং প্রাচীন—দু'রকমের পথ-যাত্রী চোখে পড়লো। এঁদের মধ্যে কেউ চলেছেন মাল-বোঝাই মোটর লরীতে বোঝার ওপর চড়ে, কেউ চলেছেন ঝরঝরে জীর্ণ যাত্রী-ঠাসাই মোটর-বাসের সওয়ারী হয়ে—আবার কেউ চলেছেন পণ্য-বোঝাই সার-সার উটের পাশে বণিক-দলের সহযাত্রী হয়ে পায়ে হেঁটে!

ধূ-ধূ প্রান্তর বয়ে অজানা পথে আমরা চলেছি এগিয়ে! সামনে দিগন্তব্যাপী বিশাল মরুময় প্রান্তরের প্রান্তে দূরে মাথা উঁচু করে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অভ্রভেদী বন্ধুর 'সফেদ-কো' পর্ব্বতমালা...তার মাথায় বরফের সাদা মুকুট...দুপুরের রোদ পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছে! ঐ পর্ব্বতমালার পিছনে—অপর পারের অন্তরালে অদৃশ্য রয়েছে আমাদের গন্তব্যস্থান—আফগানিস্তানের পাহাড়ী উপত্যকা রাজ্য! সামনে দূরের ঐ বিরাট দুরূহ পাহাড় পার হলে, তবে সে-দেশের দর্শন পাবো!

কিন্তু সে দর্শন সহজে মেলবার নয়! দুরূহ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমাদের এখনও এগিয়ে চলতে হবে অনেকখানি। পার হতে হবে খাইবার গিরিবর্ত্ম—পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত, সব চেয়ে সেরা, সব চেয়ে কড়া-পাহারায় ঘেরা সীমান্ত অঞ্চল...ইংরাজের আমলে এটি ছিল তাঁদের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার সব চেয়ে বড় এবং সব চেয়ে মারাত্মক ঘাঁটি। রূপকথার ভাষায় বলা চলে—এখানেই রাখা ছিল ভারতবর্ষে ইংরাজ আধিপত্যের জীয়ন-কাঠি আর মরণ-কাঠি! খাইবার পথের বাইরে ভারতের প্রতি লোলুপ লালসায় ওৎ পেতে আছে কত বহিঃশত্রু—এপাশে আফগান্, ওপাশে রুশ, সে পাশে চীন এবং আশে পাশে ঘিরে চারিদিকে আফ্রিদী, শিনওয়ারী, বেলুচ, পাঠান আর পেশোয়ারীর দল;

খাইবার গিরিবর্ত্ম

তার উপর ভারতের বুকে ইংরাজ চক্রান্তের বিষবাষ্প ধূমায়িত দেশের অগণ্য মুক্তিকামী কংগ্রেস-কর্ম্মী আর বিপ্লবী বোমারুদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাধনায়! তাই বাইরের বৈদেশিক আক্রমণের প্লাবনের ধাক্কায় ভারতে ইংরাজ-আধিপত্যের বাঁধ যাতে ভেঙ্গে ভেসে লুপ্ত হয়ে না যেতে পারে এবং বাইরেকার সেই বেনো জল ঢুকে যাতে ভিতরটাকে না মজিয়ে দেয়—সেই মহান্ উদ্দেশ্যেই আমাদের তৎকালীন ব্রিটিশ প্রভুরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে ভারতকে সুখে-সম্পদে-শান্তিতে বাঁচিয়ে রাখার অজুহাতে ভারতেরই তহবিল থেকে বিপুল অর্থ এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে একনিষ্ঠ সাধনায় দিনে দিনে বানিয়ে তুলেছিলেন এই সুদৃঢ় সীমান্ত-অঞ্চল...গড়, পাহারা, কাঁটা তার, অস্ত্র শস্ত্র, গুলি-বারুদ, কামান-বন্দুক, উড়ো-জাহাজ, বোমা-বর্ষণ, হুম্‌কী-শাসানী—আর প্রয়োজন মত ঘুষ-তোষামোদ, অর্থ সাহায্য, উপহার উপঢৌকন এবং খেতাব-নজরানা বিতরণের ঢালাও ব্যবস্থা করে। কিন্তু ও-সব আলোচনা এখন থাক্... অনেক পথ পার হয়ে আমাদের চলতে হবে!...

মোটর চলেছে ছুটে। পথ ক্রমে হয়ে এলো জন-বিরল…পথযাত্রী যান-বাহন মানুষের ভিড় গেল কমে! দু'পাশের রুক্ষ-প্রান্তরের চেহারারও খানিক রূপান্তর ঘটলো। এতক্ষণ যে সীমাহীন ধূ-ধূ রুক্ষ অনুর্ব্বর সমতল পার্ব্বত্য-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আসছিলুম—এবারে তার চেহারা বদলালো। দু'ধারেই উঁচু নীচু অসমতল পাথরের ঢিবি…তারই মাঝে চড়াই-উৎরাই-ভরা আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ—কখনও আকাশে উঠে গেছে, কখনও নেমেছে পাতালে! পথের পাশে পৃথিবীর মূর্ত্তি আরো রুক্ষ, আরো বিশুষ্ক…দেখলে মনে হয় যেন বহুকাল ধরে বৃষ্টির অভাবে প্রখর তপন-তাপে জ্বলে-পুড়ে শুকিয়ে গেছে ঘাস পাতা গাছের সব কিছু সবুজ রং! জলের চিহ্নও মেলে না বড় আশে পাশে…জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য! কচিৎ কখনো চোখে পড়ে পথের ধারে গেরুয়া মাটি গোলা ঘোলাটে দু'একটা ছোট্ট ডোবা! জমির রঙ লালচে গেরুয়া—প্রায় পোড়া-মাটির সামিল…পাহাড়ের গায়ের রঙও শুকনো ঘাসের মত, নয়তো বা কালো—তৃণ-লতাগুল্মের চিহ্ন নেই তাদের অঙ্গে! চারিদিকেই যেন কেমন উদাসী বাউল-বৈরাগীর ভাব…ত্যাগের আভাস! মনে

জামরুদ দুর্গ

হয় এই জনহীন রুক্ষ মরুময় কান্তারে দুর্গম পাহাড়ের প্রান্তে এসে রূপ রস বর্ণ-গন্ধে বীতস্পৃহ নিরাসক্ত প্রকৃতি, যোগিনী সেজে প্রয়োপবেশনে নির্ব্বিকল্প-যোগ সাধনা করছেন বাসনা বিবর্জ্জিত ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে! তাঁর জাগ্রত-চেতনার এতটুকু নিদর্শন মেলে না এ অঞ্চলের কোথাও—এমনি মরুময় বিশুষ্ক বন্ধুর চারিধার!

এমনি ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা চলবার পর আমরা পৌঁছুলুম জামরুদে…পেশোয়ার থেকে ঠিক সাড়ে দশ মাইল দূরে এ-জায়গায়। বিখ্যাত খাইবার গিরিবর্ত্মের পূর্ব্ব-সীমানায় শেষ প্রান্তে এই জামরুদ; খাইবারের পথ কিন্তু আসলে সুরু হয়েছে জামরুদ ছাড়িয়ে আরো মাইল দুই আগে…এখানে সেই সুদীর্ঘ বিরাট ঐতিহাসিক পার্ব্বত্য-পথের শুধু সূচনা মাত্র। পেশোয়ার থেকে খাইবার-পাসের মাঝে জামরুদই হলো একমাত্র পাহারা ঘাঁটি! এখানে পথের ধারেই সদর্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাথর আর শক্ত কাদা-মাটি দিয়ে গড়া নাতিবৃহৎ এক দুর্গ…অতীতের ইতিহাসে এর অপরূপ সব কীর্ত্তি-কাহিনী তার বিচার দেশের ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়…তবে, যেটুকু জানতে পেরেছি, সেইটুকুই বলবো এই প্রসঙ্গে!

আজ থেকে প্রায় একশো পঁচিশ বছর আগে, ভারতে ইংরাজ-অভ্যুদয়ের আমলে, পাঞ্জাব-কেশরী শিখ-রাজা রণজিৎ সিংহের বীর-সেনাপতি হরি সিং পাঠানদের যুদ্ধে পরাজিত করে জামরুদের এই দুর্গটি অধিকার করেন। দুর্গ-অধিকারের পর তিনি তাঁর সীমান্ত-সৈন্যের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এটির আমূল-সংস্কার সাধন করেন। হরি সিংএর এই সংস্কার-কার্য্যের পর জামরুদ-দুর্গের বিশিষ্ট যে-রূপ তখন দাঁড়িয়েছিল, তা ছিল অনেকটা আমাদের আধুনিক-কালের রণ-তরীর মত। পরবর্ত্তীকালে ইংরাজদের হাতে অল্প সল্প পরিবর্ত্তন হলেও দুর্গের সেই প্রাচীন-চেহারাই নাকি বজায় রয়েছে আজও! যাই হোক, তারপর ভাগ্যচক্রের ঘূর্ণীতে শিখ-প্রাধান্যের অবসান ঘটলো ইংরাজদের হাতে এবং তার ফলে জামরুদের এই অভিনব দুর্গটিও চলে এলো বিদেশী-শাসকদের দখলে। শিখদের মত ইংরাজরাও এ-দুর্গে মোতায়েন রাখলেন তাঁদের প্রহরী-ঘাঁটি—কারণ আফগানি-স্থানের দুর্দ্ধর্ষ আমীর তখন দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে তুলে ছিলেন ভারত-আক্রমণের হুমকীতে! বহিঃশত্রু আমীরের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং আশপাশের নির্ম্মম পার্ব্বত্য-পাঠান উপজাতিদের অত্যাচার উপদ্রব শায়েস্তা করে রাখার উদ্দেশ্যেই সদা সর্ব্বদা সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েনের ব্যবস্থা ছিল কড়া রকম। তাছাড়া পরেও যখন ভারতের বাইরেকার বৈদেশিক-শত্রুর অভিযান-আশঙ্কায় সীমান্তের ঘাঁটি আগলে থাকতে হতো তখন খাইবার গিরিবর্ত্মের পূর্ব্ব-প্রবেশ-পথের মুখে এই জামরুদ-দুর্গই ছিল তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট সেনা-নিবাস, অস্ত্রাগার, এবং সৈন্য বিভাগের কার্য্যালয়! এখন পাকিস্তানী আমলেও শুনলুম এখানে অনুরূপ ব্যবস্থাই চালু রয়েছে!

জামরুদ-দুর্গের কিছু দূরে চোখে পড়লো কাদা-মাটি দিয়ে গড়া ও-দেশী ছাঁদে তৈরী উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বিরাট এক সরাইখানা। শুনলুম, উট, গাধা, খচ্চর আর ঘোড়ার পিঠে বসন, বাসন, সরাব, মেওয়া, পশম, তুলো, কার্পেট, চামড়া প্রভৃতি বিচিত্র বাণিজ্যের পশরা চাপিয়ে সুদূর দেশ বিদেশ থেকে নদী গিরি কান্তার অতিক্রম করে যে সব ব্যবসায়ী পথযাত্রীর দল তুর্কী, তাতার, তাশকান্দ, খোরাশান, বোখারা, সমরখন্দ, হিরাট, কান্দাহার, কাবুল আর পেশোয়ারের বাজারে নিত্য আনাগোনা করে, সন্ধ্যা-সমাগমে পথ-শ্রমের ক্লান্তি অপনোদন এবং এবং আশ পাশের লুণ্ঠন-গৃধ্নু পাহাড়ী দস্যু তস্করদের রাহাজানী উপদ্রব অত্যাচারের হাঙ্গামা থেকে প্রাণ বাঁচাতে রাতের মত এসে আশ্রয় নেয় এই সব পান্থশালার প্রাঙ্গণে! বাইরের অন্ধকার রাত, দুর্গম অজানা পথ—আর সে পথের অতর্কিত আক্রমণ এ সবের বিপদ থেকে তাদের পশু, পশরা এবং প্রাণ সবই রক্ষা যায় এই সুদৃঢ় পান্থশালার ভেতরকার সজাগ সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায়! পান্থশালার সুউচ্চ পাঁচিলের ওপরে সদাই সজাগ পাহারায় থাকে প্রহরী…দূরে কোনো রকম বিপদ বা

সঙ্কেত জানায় তাদের আশ্রিতজনদের…আত্মরক্ষার জন্যে পান্থশালার সবাই যাতে হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে আক্রমণ রোধ করার জন্যে! এখানে রাতটুকু নিশ্চিন্তে নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই আবার যে যার বাণিজ্য বেসাতীর অভিযানে যুগ যুগ ধরে এমনিভাবেই আসে যায় পথযাত্রীর দল—সেকালেও যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনি…চিরন্তন একই ধারা!

জামরুদ পার হয়ে দুস্তর পথের বাঁ দিকে এগিয়ে চললুম—খাইবার গিরিবর্ত্মের অভিমুখে। দু'পাশে উঁচু পাহাড়ের সারি…তারই মাঝে সাপের কুণ্ডলীর মত এঁকে বেঁকে গিরি-গাত্র বয়ে পথ উঠে গেছে খাড়াই…সঙ্কীর্ণ হলেও পীচ-কংক্রীটে বাঁধানো সড়ক—একসঙ্গে দু'খানি মোটর বাস পাশাপাশি আসা-যাওয়া করতে পারে অনায়াসে। মোটর যাতায়াতের পথের ঠিক নীচেই চোখে পড়ে উপলাকীর্ণ আরো একটি পথ—সর্পিল ভঙ্গীতে সেটিও আগাগোড়া এগিয়ে চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। এ পথে সারি দিয়ে আসা-যাওয়া করে বিদেশ-যাত্রী যত পণ্য-ব্যবসায়ীর দল—উটের পিঠে, গাধার পিঠে তাদের বাণিজ্য-সম্ভারের বিচিত্র বোঝা চাপিয়ে! এছাড়াও কখনো আমাদের পাশে কখনো ঊর্দ্ধে আবার কখনো বা আমাদের চলবার রাস্তার নীচে দিয়ে এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা বয়ে চলে গেছে—সুদীর্ঘ রেল-পথ পেশোয়ার থেকে সীমান্তের শেষে লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত—সীমান্ত-রক্ষী সৈন্যদের এবং উট বা মোটর-বিহীন যাত্রীদের এই দুর্গম গিরিবর্ত্মে চলবার আর প্রাণ-ধারণের রসদাদি একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান জোগান দেবার সুবিধার জন্য। এই রেল আর মোটর চলাচলের পথ দুটি আধুনিক কালের সৃষ্টি—ইংরেজের হাতে গড়া! এর আগে পেশোয়ার থেকে ভারতের বাইরে কাবুল বা অন্য কোনো দেশে পাড়ি দিতে হলে প্রাচীন-আমলের ঐ উট-চলার উপলাকীর্ণ পথটিই ছিল যাতায়াতের একমাত্র উপায়…সে পথের অবস্থা এবং ব্যবস্থাও এ-যুগের মত এতখানি ভালো এবং সুসংরক্ষিত ছিল না। তখনকার দিনে এ-পথে যাতায়াত করা ছিল রীতিমত বিপদজনক ব্যাপার। অভাব-অনটনের চাপে কিম্বা লোভ-লালসা-উত্তেজনার ঝোঁকে আশপাশের বুনো পাহাড়ী-অধিবাসীরা প্রায়ই লুঠতরাজ ও আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়তো। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে এ-পথের যাত্রী এবং ব্যবসায়ীর দল শুধু যে তাদের ধন-সম্পত্তি বাণিজ্য-সম্ভার, উট-ঘোড়া খুইয়েই ক্ষত-বিক্ষত সর্ব্বস্বান্ত হতেন তাই নয়…অনেক সময় প্রাণটুকুও পর্য্যন্ত হারাতেন চিরদিনের মত! আজকের দিনেও যে এ-পথে এ-সব বিপদ একেবারে ঘটে না, এমন নয়…তবে, সেকালের তুলনায় অনেক কম। এই লুঠতরাজের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে ইংরাজ-আমলে ব্যবস্থা হয়েছিল সশস্ত্র পাহারাদার পার্ব্বত্য-ফৌজের—তাদের কাজই ছিল দস্যু-বাটপাড়ের অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিরীহ লোকদের ধন-প্রাণ বাঁচানো। পাহারার কড়া-ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্তে এ-পথে চলা-ফেরা করতে অনেকেরই দারুণ আশঙ্কা—তাই সেকালের মতই আজকের দিনের অতি-সাহসী পায়ে-চলার যাত্রীরা এখনও সংখ্যায় ভারী হয়ে, দল বেঁধে পাড়ি দিয়ে থাকেন এই সব বিপদসঙ্কুল দুর্গম-অঞ্চলে! এ-অঞ্চলের রক্ষণ-ভার পাকিস্তানী-শাসকদের হাতে গেলেও আজও এপথে কড়া-পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে ইংরাজ-আমলের প্রথা অনুযায়ী। খুন-রাহাজানীর আশঙ্কা কমানো ছাড়াও আরো একটি বিশেষ উপকার সাধিত হয়েছে, রেল, এবং মোটর যাতায়াতের পথ দুটি তৈরী হবার দরুণ। পুরাকালে এ দুর্গম পথে আসা যাওয়ায় দীর্ঘ সময় লাগতো এবং অপরিসীম দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করতে হতো যাত্রীদের…কিন্তু নতুন পথ-নির্ম্মাণ এবং দ্রুতগামী যান-বাহন চলাচলের ফলে আজকাল সে সব কষ্টের লাঘব হয়েছে অনেকখানি…রেল এবং মোটরের সাহায্যে যাত্রীরা পরম আরামে অনায়াসেই পরিভ্রমণ করেন এই দীর্ঘ-দুরূহ পথ। তাছাড়া গণ্ডগোল বা যুদ্ধবিগ্রহ যদি বাধে এই সীমান্ত-অঞ্চলের কোথাও—তাহলে সেখানে সৈন্য অস্ত্র পাঠানোরও আর বিলম্ব বা অসুবিধা তেমন ঘটে না কোনো—আগেকার আমলে যেমন ঘটতো! নতুন দুটি পথ নির্ম্মিত হবার পরেও যে অতীতের পুরোনো পথটিকে এখনও বজায় রাখা হয়েছে, তার সার্থকতা আছে বিশেষ কারণে। অর্থাৎ প্রাচীন-পথে চলা-ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে, মোটর-চলবার বাঁধানো নতুন সড়কে যদি আধুনিক যান বাহনের পাশাপাশি পণ্যবাহী উট, গাধা, ঘোড়া আর খচ্চরের সারি চলতে সুরু করে, তাহলে ঐ সঙ্কীর্ণ দুরারোহ বিপদসঙ্কুল-পথে যে ভীড় এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, তাতে পথের বিপদ আরো বাড়বে বৈ, কমবে না। তাছাড়া যান্ত্রিক মোটরের হর্ণের বিকট আওয়াজে পশুরা উট বা খচ্চরের দল যখন আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে দল ভেঙ্গে ছুটোছুটি মাতন সুরু করে দেবে—তখন যে উদ্ভট পরিস্থিতি দাঁড়াবে, তা সামলাবে কে?…সে-বিশৃঙ্খলার ফলে হয় গাড়ী, নয় মানুষ, নয় তো বা পশুরা পথ থেকে পা পিছলে গড়িয়ে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারাবে সুউচ্চ পাহাড়ের অতল খাদের তলায় তলিয়ে গিয়ে! এমন মারাত্মক 'এ্যাক্সিডেণ্ট' হামেশাই ঘটতে দেখা যায় এ অঞ্চলে। তাই আজ এদিকে কায়েমী কড়া সরকারী নিয়ম জারি হয়েছে যে, উট এবং পশুরা সারি দিয়ে চলবে উপলাকীর্ণ পুরোনো পথে, রেল চলবে রেল-পথ বেয়ে এবং দ্রুতগামী আধুনিক মোটর-যান যাতায়াতের জন্যে নির্দ্ধারিত এই বাঁধানো নয়া-সড়ক।

এ-পথে আরো একটি বিশেষ ব্যাপার নজরে পড়লো! এ-অঞ্চলের প্রত্যেক পথ-চারীর সঙ্গেই দেখলুম বন্দুক, রাইফেল…নয়তো অন্য যাহোক একটা না একটা হাতিয়ার রয়েছে! সবাই যেন লড়াই করতে চলেছে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে—এমনি এক ভাব! শুনলুম, এই হলো নাকি এ-অঞ্চলের রেওয়াজ!

(ক্রমশঃ)

। পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।

বিশ্বনাথ আবিষ্কার করিয়াছিল।

সে আবিষ্কার মিথ্যা নয়। পীরপুরের বিখ্যাত মুসলমান ঠাকুর সাহেবদের বংশ মহাগ্রামের বিখ্যাত হিন্দু গুরু-বংশের জ্ঞাতি। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান স্পর্শ দোষে পতিত হইয়াছিলেন, পতিত করিয়াছিলেন—মহাগ্রামের হিন্দু গুরু বংশ—অর্থাৎ জ্ঞাতিরা। তাঁহারাই ছিলেন অগ্রণী। আরব দেশের রুমী জালাল সাধু দ্বারমণ্ডলে আসিয়াছিলেন—সশস্ত্র শিষ্যমণ্ডলী সঙ্গে লইয়া। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—হয় আমাকে বিচারে পরাস্ত কর—অথবা আমার নিকট পরাজয় মানিয়া আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

পচিশজন দীর্ঘদেহ সশস্ত্র শিষ্য উচ্চকণ্ঠে জয় ঘোষণা করিয়াছিল। দ্বারমণ্ডলের অধিবাসীরা ভীত হইয়া উঠিয়াছিল; পচিশজনের পশ্চাতে পাচশত বা পাচ সহস্রের অস্তিত্ব অনুমান করিতে তাহাদের বিলম্ব হয় নাই। বাংলা দেশে তখন মুসলমান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফৌজদারের অধীনে আছে ফৌজ, কাজী আছেন—স্থানে স্থানে। বিচার আছে—বিচারে ন্যায় আছে, কিন্তু ধর্ম্ম ন্যায়ের অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। পচিশজন—শিষ্য এখানকার সহস্র মানুষের কাছে কিছু নয়, কিন্তু—সে সংবাদ কাজী অথবা ফৌজদারের নিকট পৌছিবামাত্র পাচশত বা সহস্র অশ্বারোহীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিতে দ্বারমণ্ডলের আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

পীরপুরের ঠাকুর সাহেবদের পূর্ব্বপুরুষ—ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরান্তর্গত মহাউপাধ্যায় বংশোদ্ভব বিধুশেখরেশ্বর এই সাধু রুমী জালালকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া বাসস্থান ও আহার্য্যে পরিতুষ্ট করিয়া দ্বারমণ্ডলের এই আসন্ন বিপর্য্যয় নিবারণ করেন। মহা-উপাধ্যায় মাত্র দেবভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন না—রাজভাষা আরবী-উর্দু ভাষাতেও পারঙ্গম ছিলেন।

রুমী জালালের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বিধর্ম্মী গ্রাম্য গুরুর মুখে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শুনিয়া উচ্চ চীৎকারে উল্লাস প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—সূর্য্যালোকের মত দিব্য ভাষা এই অন্ধকারের মধ্যেও আসিয়া আপনার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। জিন্দাবাদ-ধ্বনিতে সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরাক্ষীতটে দ্বারমণ্ডল বন্দর মুখরিত হইয়া উঠিল।

সেদিন বিধুশেখরেশ্বর এই সমগ্র অঞ্চলে পরিত্রাতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। যে শ্রদ্ধার তিনি অধিকারী ছিলেন—সে শ্রদ্ধা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। রুমী জালালের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ক্রমশ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। বিধুশেখর শুধু পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন যোগ-পারঙ্গম। যে যোগাভ্যাসে দেহ স্বাস্থ্যলাভ করে আয়ু দীর্ঘ হয়, সেই যোগে তাঁর পারঙ্গমতা ছিল অসাধারণ। বন্ধুত্বের ভিত্তিতে স্বাভাবিকভাবেই সাধন-তত্ত্বের আলোচনায় এই যোগবিদ্যার শক্তি এবং তত্ত্ব রুমী জালালের কাছে তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। রুমী জালালের ছিল উদরের পীড়া। মধ্যে মধ্যে কঠিন যন্ত্রণায় তিনি চীৎকার করিতেন, শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতেন। মহা-উপাধ্যায়—যোগপারঙ্গম বিধুশেখরেশ্বর যোগাভ্যাসে অন্ত্রধৌতির পন্থায় অভ্যস্ত করিয়া সেই কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করেন। রুমী জালালের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না, শুধু তাই নয়—যৌগিক সাধনতত্ত্বে তাঁহার অনুরাগ হইয়া উঠিল গাঢ় হইতে গাঢ়তর। তিনি গোপনে যোগ শিক্ষায় বিধুশেখরেশ্বরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

অন্যদিকে বিধুশেখরেশ্বর রুমী জালালের সাহচর্য্যের ফলে—মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় রত হইলেন। স্থানীয়

কাজীর দরবারে—ফৌজদারের কাছারীতে তিনি নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে দেখা গেল—আরবী ফার্সী উর্দ্দু বয়েত আওড়াইয়া তিনি জগত ও জীবন রহস্যের তত্ত্ব নিরূপণে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। বিধুশেখরেশ্বরের অঙ্গে ক্রমে নামাবলীর পরিবর্তে কাশ্মিরী শাল উঠিল—তাঁহার পুত্র কাজীর দরবারে উকীল নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার পরিধানে মুসলমানী পোষাক উঠিল। অগুরু চন্দনের গন্ধের পরিবর্তে আতরের গন্ধ তাঁহার নিকট প্রিয়তর হইয়া উঠিল। একদা ভাগবতপাঠের আসরে বসিয়া সাধুবাদ দিতে গিয়া অভ্যাসের বশে ভ্রমক্রমে 'কেরামত কেরামত' বলিয়া ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। আশ্চর্য্যের কথা গুরুজনের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তিনি লজ্জা প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সে লজ্জা কপট লজ্জা বলিয়াই প্রতিভাত হইল।

সেইদিনই প্রথম সংঘষ বাধিল।

বিধুশেখরেশ্বরের জ্ঞাতিভাই মহাগ্রামের শেখর বংশের জ্যোতিশেখরেশ্বর বলিলেন—বিধুশেখরের কুলধর্মই শুধু বিপন্ন হয় নাই—এই আচরণের দ্বারা জ্ঞাতিধর্ম্মও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তোমার পুত্র কাজীর দরবারে দাসত্ব করিয়া আমাদের কুলধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং বিচ্যুতির ফল তোমার অবশ্যই অজ্ঞাত নয়। তাহার ফল সুদূরপ্রসারী। আশঙ্কা হয়—ভবিষ্যতে জ্ঞাতিধর্ম্মকেও বিপন্ন করিয়া—বিরোধী আচার এমন কি আহার গ্রহণেও বিরত হইবে না।

বিধুশেখর পুত্রের আচরণে মনে মনে ক্ষুব্ধ হন নাই ইহা সত্য নয়, ক্ষুব্ধ তিনি হইয়াছিলেন; কিন্তু এমনি প্রকাশ্যভাবে অপরের নিকট হইতে এই অভিযোগ শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষ করিয়া জ্ঞাতির নিকট হইতে। পাণ্ডিত্যে এবং জ্ঞানে তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং এই সময়ে প্রতিষ্ঠায় আধিপত্যে তিনি এই অঞ্চলে ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। আরও তিনি জানিতেন যে, এই জ্ঞাতিবংশ তাঁহার এই প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষান্বিত। সাধু কমী জালাল এই বংশের প্রধান জ্যোতিশেখরেশ্বরের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু জ্যোতিশেখর সসম্ভ্রমে তাঁহার সংস্রব এড়াইয়া চলিতেন। বলিতেন—আমার কাছে আপনি কি পাইবেন? যোগপথে আমার পারঙ্গমতা নাই, জ্ঞানমার্গে আমার অধিকার বিধুশেখরের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। আমার যাহা সম্বল...তাহা ধ্যানযোগে উপলব্ধির সামগ্রী। সে কেহ কাহাকেও দিতে পারে না—আপনার সাধনায় অর্জ্জিত হয়। আমি সামান্য।

একথা কমীজালাল বিধুশেখরের নিকট গোপন রাখেন নাই। বিধুশেখর হাসিয়া বলিয়াছিলেন—জ্যোতিশেখর মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বলিয়াছে। অবশ্য এটুকু তাহার চারিদিক সত্যের মহিমা নয়—ঈর্ষাবিষ-দুষ্ট। ঠিক এই সব কারণেই সেদিনের এই সাবধান বাক্য শুনিয়া তিনি অন্তর্নিহিত ঈর্ষাকে স্পষ্ট অনুভব করিলেন এবং তাঁহার ক্ষোভ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি কঠিন হাসি হাসিয়া বলিলেন—কূলের জীবন যখন ক্ষীণ হয় তখনই কুলধর্ম্মের কুলবন্ধন, তাহার রক্ষাকবচ, সেই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে, তখন তটবন্ধন ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়ার তাহার শক্তিও থাকে না। কিন্তু কূলের জীবনে যখন গঙ্গোত্রী হইতে প্রবাহ নামে—ভরিয়া যখন ওঠে—তখন কুলবন্ধন তাহার পর অনাবশ্যকই নয়—তাহাকে চালাইয়া চারিদিকের শুষ্ক শীর্ণ বিলখাল কৃষিক্ষেত্র জলে ভরিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে কুলবন্ধনকে রক্ষাই করে সে। প্রসারিত করিয়া লয় কিছুটা। সেটা দোষের নয়।

আমার বংশে এখন গঙ্গোত্রীর প্রবাহ নামিয়াছে। এখন কুলবন্ধন আমার বংশকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চারিপার্শ্বের সকলভূমি—শ্মশান হইতে দেবস্থল পর্য্যন্ত সমস্তই লেহন করিয়া সমস্ত কিছুকেই আপন মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে। ইহাতে শঙ্কিত হইবার কিছু নাই। কুলধর্ম্ম বাহির হইতে সঞ্চয়নে সমৃদ্ধ হইতেছে, জ্ঞাতিধর্ম্মেরও কোন শঙ্কার কোন কারণ নাই। সমাজের সমক্ষে যে অভিযোগ তুমি করিলে—তাহা নিতান্তই ঈর্ষাপ্রসূত বলিয়া আমি মনে করি।

জ্যোতিশেখরেশ্বর বলিয়াছিলেন—ঈর্ষার অভিযোগ যখন করিলে তখন আমি আর কিছু বলিব না। কিন্তু কূট তর্কের বা উপমার সাহায্যে সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা যায় না।

বিধুশেখরেশ্বর বলিয়াছিলেন—যাহা কূটস্থ তাহাই স্থির; কূটস্থের অর্থ অবশ্য তোমার জানা আছে। চিরস্থির যাহা স্থির তাহাই সত্য।

বলিয়াই তিনি স্থানত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাইতে যাইতেও আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—শব্দ ব্রহ্ম। শব্দ অর্থে মাত্র দেবভাষার শব্দই একমাত্র বলিয়া আমি মনে করি না। ইহা ভ্রান্তি। তুমি নিতান্ত কূপমণ্ডুকের মত নিজের রব ছাড়া অপর কোন বা কাহারও রব শ্রবণ কর নাই। সেই কারণেই এই ধারণার তোমার সৃষ্টি হইয়াছে। যে আরবী শব্দ তোমার পুত্র উচ্চারণ করিয়াছে সে শব্দের অর্থে সে সৎকে অসৎ বা অসুন্দরকে সুন্দর বলে নাই। সুতরাং ইহাতে এতখানি আশঙ্কার কি আছে? যাহা অনুদার—তাহাই সংসারে শঙ্কার বস্তু। শঙ্কা আমার জন্য নয়, শঙ্কা তোমার জন্য। চিন্তা করিয়া দেখিয়ো।

জ্যোতিশেখরেশ্বর আর কোন কথা বলেন নাই। প্রতিষ্ঠাবান এবং পণ্ডিত বিধুশেখরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং ভয় দুইই ছিল। সমাজের অভ্যন্তরেও এই লইয়া ফাটল ধরিল। বিধুশেখরেশ্বরের শিষ্যমণ্ডলী, গুরুর প্রতিষ্ঠায় এবং আধিপত্যে স্বাভাবিকভাবেই গৌরব অনুভব করিত। রাজদ্বারে কাজীর বিচারালয়ে ফৌজদারের কাছারীতে গুরুর কল্যাণে তাহারা অধিকতর সুবিধা পাইত। ইহা ছাড়াও সামাজিক আচার ও বিচারের কঠোরতা শিথিল হওয়ায় তাহারা এক ধরণের মুক্তির আস্বাদও অনুভব করিত। অন্যদিকে জ্যোতিশেখরের শিষ্যমণ্ডলী ঈর্ষাবশেও বটে এবং গুরু জ্যোতিশেখরেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস বশেও বটে, বিধুশেখরেশ্বরের শিষ্যমণ্ডলীর এই আচরণের নিন্দা করিত, সে নিন্দা ক্রমে ঘৃণায় পরিণত হইল। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় আচারে আচরণে তাহারা হইয়া উঠিল কঠোর হইতে কঠোরতর। অবশেষে একদা চরম সংঘর্ষ বাধিল।

* * * *

জ্যোতিশেখরেশ্বরের ব্রাহ্মণ-শিষ্য জমিদার রামনারায়ণ রায়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। তাঁহার স্বগ্রামবাসী একজন দরিদ্র কৃষিজীবী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল। ফৌজদারের কাছারীতে সে ছিল একজন চাকর। পলান্নের সুগন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া সে গোপনে ফৌজদারের গৃহে পলান্ন আহার করিয়াছিল এবং একদা মাদকের প্রভাবে [illegible] সে নিজেই কথাটি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর ছিল না। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সে তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যাকেও তাহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়া ফৌজদারের আশ্রয়ে নূতন সংসার পাতিবার সংকল্প করিল। কিন্তু জ্যোতিশেখরেশ্বরের জমিদার শিষ্য রামনারায়ণ বাধা দিলেন। ওই কৃষিজীবীর কয়েকজন বন্ধু সে বাধা কৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়া গোপনে ওই পরিবারটিকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিল। রামনারায়ণ কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন এই সাহায্যকারীদের। এই তিল-প্রমাণ কারণ ক্রমে পর্ব্বত-প্রমাণ হইয়া উঠিল। জ্যোতিশেখরেশ্বরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। তিল প্রমাণ কারণ পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া উঠিল যাঁহাদের কর্ম্মে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি দুইজন, একজন বিধুশেখরেশ্বর নিজে—অপরজন তাঁহার পুত্র ফৌজদার কাছারীর কর্ম্মচারী। বিধুশেখর মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—এ অধিকার রামনারায়ণের নাই। তিনি সমাজপতি নহেন। তিনি শক্তি ও সম্পদের দম্ভে ন্যায়-আচরণের নামে অন্যায় এবং অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন। আর কোন সমাজপতিরও কাহারও স্বেচ্ছায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধা দিবার বা গ্রহণ করিলে সমাজে পাতিত্য দণ্ড ছাড়া কোন দণ্ড দিবার অধিকার নাই। তিনিই সাক্ষী মানিলেন এখানকার অন্যতম সমাজপতি জ্যোতিশেখরেশ্বরকে। জ্যোতিশেখরেশ্বরকেও এ কথা স্বীকার করিতে হইল।

অপমানে ক্ষোভে রামনারায়ণ উকীল লইয়া গেলেন দিল্লী। সেখান হইতে সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া যখন ফিরিলেন তখন তিনি নিজেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এক মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বপ্রথম এক নিজের 'মা' ছাড়া অপর সকলকেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তাহার মধ্যে ছিলেন বিধুশেখরের ভাগিনেয়ী রামনারায়ণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সংবাদ না দিয়াই তিনি গ্রামে ফিরিয়াছিলেন, নহিলে বিধবা হয়তো 'পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতেন। শুধু তাই নয়, বিধবা ভ্রাতৃবধূকে তিনি বিবাহ করিলেন।

বিধুশেখর ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলেন! ফৌজদার ডাকিয়া তাঁহাদের [illegible] [illegible]; ফৌজদার

স্থানান্তরে বদলী হইয়াছেন, এখানকার ফৌজদার হইয়া আসিয়াছেন—মালিক নাসির খাঁ। তিনি আর কেহ নহেন—তিনি রামনারায়ণ রায়।

মালিক নাসির খাঁ—বিধুশেখরেশ্বরের কোন অসম্মান করিলেন না। সসম্মানে আসন দিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—আপনি কূপমণ্ডুক নহেন—আপনি সকল ধর্ম্মের সার-গ্রহণের পক্ষপাতী। আপনি কি ওই সর্ব্বভাগ্য বঞ্চিতা যুবতী ভাগিনেয়ীর নিষ্ফল জীবন—এবং অন্যায় বঞ্চনাকে সমর্থন করেন? এবং আপনার ভাগিনেয়ী যদি স্বেচ্ছায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন—তবে আপনার অসমর্থন বা প্রতিবাদ করিবারই বা অধিকার কি?

নতমস্তকে বিধুশেখর স্থান ত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পরেই কাজীর আদালতে বিধুশেখরের পুত্র অভিযুক্ত হইলেন। অভিযোগকারিণী মালিক নাসির খাঁর বিধবা ভগ্নী। তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া পরিশেষে বিধুশেখরের পুত্র নাকি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইহার পর বিধুশেখরেশ্বরের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর কি ছিল? কিন্তু ইহার জন্য বিধুশেখর এবং রামনারায়ণ উভয় পক্ষেরই আক্রোশ পড়িল—জ্যোতিশেশ্বরেশ্বরের উপর।

* * * * *

ন্যায়রত্ন বলিলেন—ইরসাদ মল্লিক—রামনারায়ণ রায়ের বংশধর। বিশ্বনাথই তাকে জানিয়েছিল এ কথা।

তিনি হাসিলেন।

স্বপ্নে দেখলাম—ইরসাদও এসেছে ঋণ শোধ নিতে।

(ক্রমশঃ)

দিলওয়ারা মন্দিরের মিস্ত্রী

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

পাষাণে পরাণ হেথা চেয়েছিনু সৃজিতে নিভৃতে
রচিতে মরম গাথা মোর সাধ্য মতন রীতিতে,
চাহিনি শ্রমের মূল্য জীবিকার দাম,
শুধু আর্ত্ত অন্তরের মৌন পরিণাম
এঁকেছিনু মর্ম্মের মর্ম্মরে,
লৌহ যন্ত্রে সূচীসূক্ষ্ম সুচারু অক্ষরে।

আমি বিশ্বে নিঃস্ব শিল্পী, সৃষ্টির আনন্দে
দিবাযামী মূল্যহীন অঙ্গুলীর ছন্দে
রচে গেছি স্বপনের ফুল;
বিশ্বাস বিপুল
দিত আশা দিত ভাষা মোর বাটালীতে
দেব-দেহলীতে
খুঁদি' যবে ধর্ম্মের কাহিনী
অপ্সরার বিভ্রান্ত চাহনী
নৃত্যপর কিন্নরের আত্মভোলা গান
বসন্ত কাকলীসম মহা ঐক্যতান;
শুধু তাহাদের রূপে হেরেছিনু আপনার ছায়া
চিত্তরূপ মায়া।

ছিল না আমার সংঘ, সঙ্গ দিত শিল্পীর আকুতি
ছিল না বিশ্রাম দাবী, বিরামেতে দিত অনুভূতি,
চাইনি মজুরী পণ, কর্ম্মই ত ছিল তার দাম,
তারি আনন্দের মাঝে নিতি লভিতাম
সুন্দরের সুকান্ত পরশ। আজ তার মাঝে
শিবেরে হেরিতে চাও, সত্যেতে বিরাজে
যে দেবতা তারে খোঁজ, অনুর্ব্বর দেশে কত ব্যয়
হ'ল শুধু অকারণে, কত অপচয়
তাহারো হিসাব কষো—শুধু ত দেখনা
মোর স্বত উৎসারিত সৃজনের আনন্দবেদনা।
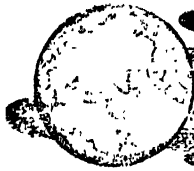
কংগ্রেসের পুনর্গঠন ব্যবস্থা—

২১শে মার্চ্চ হইতে ২ দিন কলিকাতায় লেক ময়দানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে কংগ্রেসের পুনর্গঠন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাবটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কংগ্রেসের উপর যে নূতন দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার বিবেচনায় কংগ্রেসের পুনর্গঠন এবং কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

কংগ্রেস মণ্ডপ-অভিমুখে শ্রীজহরলাল নেহরু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও ডাঃ কাটজু ফটো—পান্না সেন

"বিগত কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্য্য প্রধানতঃ উহার পুরাতন কর্ম্মিবৃন্দের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল কর্ম্মীর উপর গুরুতর দায়িত্ব চাপিয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষে এখন এমনভাবে কার্য্য করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যাহাতে কংগ্রেসের সাধারণ নীতি ও কর্ম্মসূচীতে আস্থাশীল নবাগতগণ কংগ্রেসে সাদরে গৃহীত হন এবং তাঁহারা ফলপ্রসূভাবে কার্য করিবার সুযোগ পান। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষে একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য করিবার প্রয়োজনও রহিয়াছে। বিভিন্ন প্রস্তাবাবলী ও নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেসের যে নীতি ও আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে, সুশৃঙ্খল

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ (উত্তর প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী) ও শ্রীবিজয় সিং নাহার কংগ্রেস মণ্ডপ অভিমুখে ফটো—পান্না সেন

কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সদস্য সেই আদর্শ ও নীতির প্রতি আস্থাবান থাকিয়া তাহা অনুসরণ করিবেন।

"কংগ্রেসের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে উহার গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অবিলম্বে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও উহাতে নূতন কর্ম্মপ্রেরণা সঞ্চারের

প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি পন্থা সুপারিশ করা হইয়াছে :—

(১) সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীর বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং পূর্ণাঙ্গ নির্ব্বাচনে নতন নির্ব্বাচক তালিকা প্রণীত হওয়া সাপেক্ষে, প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাগণকে নূতন করিয়া নিয়োগ করিতে হইবে এবং যে সকল স্থানে রাজ্য কংগ্রেস কমিটি ও জেলা কংগ্রেস কমিটিসমূহ তাহাদের কার্য্যকরী সমিতিসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায়

শ্রীজগজীবন রাম—কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইতেছেন ফটো—পান্না সেন

তাহাদের পুনর্গঠন করিতে হইবে। কমিটিগুলিকে যতদূর সম্ভব প্রতিনিধিমূলক করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(২) কংগ্রেসের সম্মুখে এখন কর্ত্তব্য হইতেছে লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসকর্ম্মীর ও অপরাপর যাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্যের সহিত যুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া উহাতে সমন্বয়বিধান করা। বিগত নির্ব্বাচনে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সুযোগ

দানের জন্য তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিবার, তাঁহাদের সহযোগিতা আদায়ের ও তাঁহাদিগকে কার্য্য করিবার সুযোগদানের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) নির্ব্বাচনের সময় অনেক লোক বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থীদের অনুকূলে কার্য্য করিয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে কয়েকজন কোনও কংগ্রেস কমিটিরই সদস্য ছিলেন না। ইঁহাদিগকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী সদস্যরূপে কার্য্য করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহা ছাড়া যে সকল লোক সক্রিয়ভাবে কার্য্য করিতে

কংগ্রেস মণ্ডপ অভিমুখে শ্রীপট্টভি সীতারামিয়া এবং ট্যান্ডনজী ফটো—পান্না সেন

ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকেও কংগ্রেসের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রের এই সকল এড-হক্ বা অস্থায়ী কর্ম্মিদলের নির্বাচনের কোনও প্রয়োজন নাই। কার্য করিবার ইচ্ছা ও দক্ষতাই হইবে এই সকল কর্ম্মিদলের সদস্যপদের মাপকাঠি। এই সকল এড্ হক্ কমিটি স্বভাবতঃই স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলির সহিত সহাযাগিতা করিয়া কাজ করিবেন। যে সকল স্থানে নির্বাচনের জন্য এইরূপ কোন বিশেষ কর্ম্মিদল নাই,

(৪) এই সকল এড্ হক্ কমিটি ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিসমূহ নিজ নিজ এলাকায় গঠনমূলক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। বিশেষতঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সড়ক, কূপ, জলাশয়, স্কুলগৃহ ও অন্যান্য আবাস-গৃহাদি নির্মাণ ও খননাদির কার্যে নিজেদের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। ছোটখাট সেচ পরিকল্পনার কার্যেও ইহাদের অংশ গ্রহণ করা উচিত।

কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান মানসে ডাঃ সৈয়দ মামুদ এবং মৌলনা আবুল কালাম আজাদ গমন করিতেছেন ফটো—পান্না সেন

(৫) কেন্দ্রের ও রাজ্য-সমূহের আইন-সভাগুলির কার্যকরী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলির সহিত যোগাযোগ সাধন করিবেন।

(৬) কার্য সহজ করিবার জন্য এবং গণ-সংযোগ স্থাপনের জন্য কংগ্রেস কমিটিগুলিকে 'মণ্ডলসমূহে' অথবা ২৫।৩০টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত অনুরূপ এলাকায় অথবা পরিষদীয় নির্বাচনের অঞ্চলগুলিতে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক প্রদেশে বা রাজ্যে সর্বক্ষণের জন্য জাতির সেবাকারী কর্মিদল গড়িয়া তুলিতে হইবে। আবশ্যক মত এই সকল কর্মীকে জীবন-যাত্রার উপযোগী ভাতাও দিতে হইবে। এই সকল কর্মীকে কংগ্রেসের নীতি ও কর্মপন্থা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ ট্রেণিং বা শিক্ষাদান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বৃহত্তর দলগুলির জন্য তথ্যানুসন্ধান মণ্ডল বা ষ্টাডি সার্কেলসমূহ স্থাপন করিতে হইবে।

(৮) কংগ্রেসের গঠনমূলক ও অন্যান্য কার্যাবলীর ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। যে স্থানেই সম্ভব সে স্থানেই কংগ্রেস কর্মিগণের, বিশেষতঃ আইন-সভাসমূহ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিসমূহের সদস্যগণের মাসিক চাঁদা

কংগ্রেস মণ্ডপের দিকে অগ্রসর শ্রীবি-জি-খার (বোম্বায়ের প্রধানমন্ত্রী), শ্রীমুরারজী দেশাই এবং শ্রীএস-কে-প্যাতিল ফটো—পান্না সেন

(৯) অবিলম্বে কংগ্রেস কমিটিসমূহকে যে কার্যে হাত দিতে হইবে, তাহা হইতেছে ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ। এই সদস্যসংগ্রহ কার্যে পক্ষপাতিত্ব বর্জন করিতে হইবে। আইনসভাসমূহের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকা সংশোধন করাইতে হইবে, বিশেষতঃ উপরোক্ত এড হক্ কমিটিসমূহের দ্বারা সংশোধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে।

"প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটিকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গণ-সংযোগ স্থাপন ও গঠনমূলক কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কার্য করিয়া কোন্ কমিটি কতদূর ফললাভ করিল, তাহার দ্বারাই উহার কার্য বিচার করা হইবে। কংগ্রেসের কার্যকরী প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল সদস্য এই সকল কাযের জন্য সময় দিতে পারেন না, তাহাদের কর্তব্য সরিয়া দাঁড়াইয়া সময় দিতে সক্ষম ব্যক্তিগণের জন্য স্থান করিয়া দেওয়া। কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি আস্থা রাখিয়া এবং যাঁহারা সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া কংগ্রেসের কার্য্য চালাইতে হইবে।

কংগ্রেস অধিবেশন ফটো—পান্না সেন

জনসেবামূলক কার্যে হিংসাত্মক মনোভাব দেখা দিতেছে, কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এরূপ মনোভাবে উস্কানী দিতেছে। এমতাবস্থায় শান্তিপূর্ণ এবং সহযোগিতামূলক পন্থার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে; জাতির উন্নতির পক্ষে এই পন্থাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

"কংগ্রেস কমিটিসমূহে আইন-সভাসমূহের কংগ্রেসী দলগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপদল গঠন করা চলিবে না। বিশেষতঃ প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, এক কথায় বৈষম্যমূলক কোনও মনোভাবকেই স্থান দেওয়া হইবে না। কমিটি বা পার্টির মধ্যে আলোচনা ও সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে; কিন্তু যে সিদ্ধান্তই শেষ পর্যান্ত গৃহীত হইবে তাহা মানিয়া চলিতেই হইবে। কংগ্রেস সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিয়া যাইবে, জনসেবামূলক কাযের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা অপর কোনপ্রকার বিরোধকে আমল দিবে না। বক্তৃতামঞ্চে বা সংবাদপত্রসমূহে পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা চলিবে না।

"প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলি কখনও কোনও কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবে না। কোনও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি তাহাদের কোনও অভিযোগ থাকে, তবে তাহারা উহা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড বা ওয়ার্কিং কমিটিতে জানাইবে, ইঁহারাই সত্বর যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

"এই প্রস্তাবে উল্লিখিত বিধানবলী কার্যকরী করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সমেত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার দেওয়া হইতেছে।"

স্বয়ংসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, খাদ্য সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা এ, আই, সি, সি উপলব্ধি করে এবং অধিক খাদ্য উৎপাদনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রত্যেক নাগরিককে সহযোগিতা করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছে।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন তাহার মূল বিষয় হইতেছে, কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যের চাঁদার বর্তমান হার এক টাকা হইতে কমাইয়া পূর্বের ন্যায় চার আনা

ধার্য করা। সক্রিয় সদস্যদের প্রাথমিক চাঁদার উপর অতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে।

২ দিনের অধিবেশনে মোট ১১টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ও ৩৯জন বক্তা বক্তৃতা করিয়াছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর ১৮০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন ও

কংগ্রেস পতাকাতলে বক্তৃতারত শ্রীজহরলাল নেহরু

ফটো—পান্না সেন

তিনবারের (শনিবার ১বার ও রবিবার ২বার) অধিবেশন মোট ১১ ঘণ্টা সভা হইয়াছিল। অধিবেশনের প্রথমেই শ্রীনেহরু ১ ঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা করিয়া দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা সকলকে জানাইয়া দেন।

স্বাধীন সরকার ও সঙ্গীত চর্চা—

স্বাধীন ভারতের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ২৮শে মার্চ ভারতের ৪জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞকে ১হাজার টাকা করিয়া নগদ ও ৫শত টাকা মূল্যের একখানি করিয়া কাশ্মীরী শাল দান করিয়া সঙ্গীত শিল্পের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। সরকারী শিক্ষা বিভাগ এইভাবে সকল প্রকার কলা-শিল্পীদের উৎসাহদান করিবেন। সঙ্গীত

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান্

ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন

বিদ্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন—(১) ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ—সারঙ্গ বাদক—বয়স ৮০ বৎসর (২) খেয়াল গায়ক ওস্তাদ মস্তাক হোসেন—বয়স ৭৩ বৎসর (৩) কর্ণাটক

সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ করাইকুদী সম্বশিত আয়ার, বয়স ৬৫ বৎসর ও (৪) প্রসিদ্ধ কর্ণাটক গায়ক আরাইকুদী রামানুজ আয়েঙ্গার (বয়স ৬২ বৎসর)। কেন্দ্রীয় সরকারের এই কার্য্য সকলেরই প্রশংসা লাভ করিবে। রাজ্য সরকারগুলিরও এই ভাবে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি কলা-শিল্পীদিগকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

পরলোকে প্রমদা দেবী—

অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী প্রমদা দেবী ৬৪ বৎসর বয়সে গ্যাষ্টিক আল্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১১ই মার্চ্চ মঙ্গলবার

প্রমদা দেবী

দোলপূর্ণিমা রাত্রিতে বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যশোহর জেলার এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। আদর্শ হিন্দু রমণীর ন্যায় তিনি তাঁহার স্বামীর দীর্ঘ কর্মজীবনের সমস্ত সামাজিক কার্য্যের সহিত আন্তরিক-ভাবে যুক্ত ছিলেন। বহু সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার ভক্তি ও সেবা পাইয়াছেন। বহু দুস্থ আত্মীয় বালকদিগকে স্বগৃহে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় স্বহস্তে খাদ্য বিতরণ করিয়াছেন। দলে দলে যখন বাস্তুহারারা আসিয়াছে, রাসবিহারী এভেনিউএর শিবিরে তাঁহাকে অক্লান্ত সেবায় ব্যস্ত দেখা গিয়াছে। ৺সরোজ-নলিনীর তিনি সহকর্ম্মিণী ছিলেন। বারাসতে অবস্থানকালে তিনি দুস্থা বিধবাদের জন্য Co-operative Society স্থাপন করিয়াছিলেন। বালীগঞ্জের মহিলা মিলন মেলার তিনি সভানেত্রী ছিলেন। শুধু সংগঠনের মধ্য দিয়াই নয়, যিনিই তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন তাঁহাকেই তিনি স্নেহমুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার পল্লীর সকলেই তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাঁহার মৃত্যুতে তাহারা সকলেই আত্মীয় বিচ্ছেদ ব্যথা অনুভব করিতেছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

বিধান পরিষদে সদস্য মনোনয়ন—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গত ৪ঠা এপ্রিল নিম্নলিখিত ৯জনকে বিধান পরিষদের (রাজ্যের উচ্চতর আইন সভা) সদস্য মনোনীত করিয়াছেন—(১) ব্যারিষ্টার শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২) প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) চাটার্ড একাউণ্টেণ্ট শ্রীগুরুগোবিন্দ বসু (৪) নারী সম্মেলনের সংগঠক শ্রীমতী শান্তি দাস (৫) ঝাড়-গ্রামের রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব (৬) নারী সম্মেলনের জনশিক্ষা কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত (৭) ভূতপূর্ব মন্ত্রী জনাব মুশারফ হোসেন (৮) কলুটোলার ব্যবসায়ী জনাব মহম্মদ জান ও (৯) ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি শ্রীপান্নালাল সারোগী। সকলেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করিয়া সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনয়নে সাহিত্যিক সমাজকে গৌরবদান করা হইয়াছে।

রাজ্য পরিষদে মনোনীত সদস্য—

গত ২রা এপ্রিল রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ নিম্নলিখিত ১২জনকে দিল্লীর রাজ্য পরিষদের (কাউন্সিল অব্ ষ্টেট) সদস্য মনোনীত করিয়াছেন—(১) আলিগড় বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ জাকির হোসেন (২) ভারতীয় ঐতিহাসিক ডাঃ কালিদাস নাগ (৩) প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (৪) শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি শ্রীমৈথিলী শরণ গুপ্ত (৫) আইন-বিশেষজ্ঞ আহলাদী কৃষ্ণ-স্বামী (৬) টাটা সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান পরিষদের ডিরেক্টর ডাঃ জে, এম, কুমারাপ্পা (৭) প্রসিদ্ধ সমাজ-সেবক কাকাসাহেব কালেলকার (৮) সমাজকর্ম্মী অধ্যাপক এ-আর—মানকাজি (৯) বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (১০) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংসদের ডাঃ সাহেব সিং (১১) অভিনেতা শ্রীপৃথ্বীরাজ কাপুর (১২) নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রুক্মিনী দেবী। ১২ জনের মধ্যে তিন জন বাঙ্গালী—ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ক'লকাতায় ১৯৫২ সালের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা প্রদেশ ২-১ গোলে গত তিন বছরের চ্যাম্পিয়ানদল পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশকে হারিয়ে 'রঙ্গস্বামী কাপ' বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে বাংলা দেশ ৩বার চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। ফাইনালে খেলেছে ৫বার। পূর্ব্বাপর জয়লাভ ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালে। রানার্স-আপ পেয়েছে ২বার, ১৯৩২ ও ১৯৪৯ সালে। পাঞ্জাবদল এই নিয়ে ৯বার ফাইনাল খেলেছে, চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে ৬বার—১৯৩২, ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৯, ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে। রানার্স-আপ ৩বার—১৯৩০, ১৯৪২ ও ১৯৫২ সালে।

বাংলাদল ৭-০ গোলে বরোদাকে হারিয়ে আলোচ্য বছরের খেলায় সর্ব্বাধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করার রেকর্ড করেছে। দু'জন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় 'হ্যাট-টিক' করার রেকর্ড করেছেন—গুরুং (বাংলা) বরোদার বিপক্ষে এবং ডি'মেলো (বোম্বাই) পেপসুর বিপক্ষে। তৃতীয় রাউণ্ডে বাংলা মাত্র ১-০ গোলে উত্তর প্রদেশকে হারায়। উত্তর প্রদেশের পক্ষেও জয়লাভ, অপ্রাসঙ্গিক হ'ত না। অপরদিকে দ্বিতীয় রাউণ্ডে মাদ্রাজের বিপক্ষে পাঞ্জাবের মাত্র ১-০ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ বিজয়ীদলের পক্ষে খুব বেশী কৃতিত্বের পরিচয় হয়নি।

বোম্বাই ০-৩ গোলে পূর্ব্ব পাঞ্জাবদলের কাছে সেমি-ফাইনালে হেরে যায়। বোম্বাইদলের পক্ষে এ শোচনীয় পরাজয় খুবই দুঃখের কথা। কারণ বোম্বাই দলে ১৯৪৮ সালের বিশ্ব অলিম্পিকগামী পাচ জন খেলোয়াড় খেলেছিলেন। পাঞ্জাবদলের তুলনায় বোম্বাই দলের খেলোয়াড়দের 'ষ্টিক-ওয়ার্ক' খুবই উন্নত ; তাদের খেলা যেমন সৌষ্ঠবময়, পাঞ্জাব দলের খেলা তেমনি 'লকড়ীবাজী'—অত্যন্ত গায়ের জোর দিয়ে খেলা। মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন নামকরা খেলোয়াড়রা এরকম দলের সঙ্গে তাঁদের স্বাভাবিক খেলা দেখাতে পারেন না এবং বেশীর ভাগ সময়ই খেলায় হার স্বীকার করতে হয়। বোম্বাই দলের পরাজয়ের এ একটা অন্যতম কারণ ছিল।

বাংলা ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব দলকে দু'দিন ফাইনাল খেলতে হয়, প্রথম দিনের খেলা ড্র যাওয়াতে। প্রথম দিন দু' দলই একটা ক'রে গোল করে। প্রথম দিনের খেলায় পাঞ্জাবদলের তিনজন খেলোয়াড় মারাত্মকভাবে খেলার জন্য রেফারী কর্ত্তৃক সতর্কিত হ'ন। বাংলা দলের জনসন, দুবে এবং ডালুজ খেলায় আহত হ'ন ; জনসনের আঘাতই বেশী ছিল, চোখের ওপর আঘাত পড়ায় জামার অনেকখানি রক্তে ভিজে যায়। খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে প্রথমার্দ্ধে বাংলাদল এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে পাঞ্জাবদল। হরজিন্দরসিং (বাংলা) এবং ধরমসিং (পাঞ্জাব) নিজ নিজ দলের পক্ষে গোল করেন। গত তিন বছরের চ্যাম্পিয়ান শক্তিশালী পাঞ্জাবদলের আক্রমণভাগকে বাংলাদল যে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল তার জন্য রাইট-হাফ ক্লডিয়াস এবং গোলরক্ষক মেণ্ডিজ-এই দু'জনই কেবল প্রশংসা লাভের যোগ্যপাত্র ছিলেন। ক্লডিয়াস কেবল নিজ দলের মধ্যে নয়, সারা মাঠে সেদিন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেছিলেন। বহুবার তাঁরই জন্য বাংলাদল গোল খেতে খেতে বেঁচে যায়।

দ্বিতীয় দিনের খেলাতেও ক্লডিয়াসের শ্রেষ্ঠত্বের সমান দাবী অপর কেউ দেখাতে পারেননি।

বাংলাদলের পক্ষে অধিনায়ক ডালুজ প্রথম গোল

দেন। পেনাল্টি বুলি সম্পর্কে আইন ভঙ্গের ফলে বাংলা দলের দ্বিতীয় গোল হয়। বাংলা ২-০ গোলে এগিয়ে থাকে। ধরমসিং সর্ট-কর্ণার থেকে একটি গোল শোধ করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাংলাদলের আক্রমণভাগে রাজবীর সিংকে বসিয়ে কারাপিটকে দলভুক্ত করা হয়—ফলে আক্রমণভাগের খেলাও প্রভূত উন্নত হয়।

বাংলা: মেণ্ডিজ; রবিদাস ও দেবুপাল; ক্লডিয়াস, যশবন্ত এবং ডা লুজ; দুবে, গুরুং, কারাপিট, জনসন এবং হরজিন্দর সিং।

পাঞ্জাব: রামপ্রকাশ; ত্রিলোচন সিং এবং ধরম সিং; গুরুচরণ সিং, সাহেব সিং এবং দাতু; রামস্বরূপ, বকসিস সিং, বলধর সিং, উধম সিং এবং রঘবীর।

ইংলণ্ডগামী ভারতীয় ক্রিকেট দল:

আগামী ইংলণ্ড সফরে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ ভারতীয় ক্রিকেট দলে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ১৯৪৬ সালের ইংলণ্ড সফরে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে হাজারে, সারভাতে এবং সিন্ধে এই ৩ জন মাত্র বর্ত্তমান সফরে স্থান পেয়েছেন। হাজারে দলের অধিনায়ক এবং অধিকারী সহ-অধিনায়ক পদ লাভ করেছেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটি দলে অধিক সংখ্যক তরুণ খেলোয়াড়দের স্থান দিয়েছেন। দলটি খুবই ভার-সাম্য হয়েছে, একমাত্র দলে শক্তিশালী ফাষ্ট স্লো-বোলার নেই। প্রবীণ খেলোয়াড়দের মধ্যে দলের পক্ষে মানকড়ের প্রয়োজন এখনও যে শেষ হয়নি তার প্রমাণ আমরা হাওয়ার্ডের নেতৃত্বে এম সি সি দলের বিপক্ষে পেয়েছি। কিন্তু ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাসায়ার লীগ খেলায় হেসলিংডনদলের দলের পক্ষে টেষ্ট খেলাতেও পাব না। আলোচ্য দলে তিনজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন—পঙ্কজ রায়, নিরোদ চৌধুরী এবং প্রবীর সেন। প্রথম বাঙ্গালী খেলোয়াড় সুঁটে ব্যানার্জি দলভুক্ত হয়েছিলেন ১৯৩৬ সালের ইংলণ্ড সফরে এবং ১৯৪৬ সালের ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দলে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি টেষ্ট খেলার সৌভাগ্য লাভ করেননি।

ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতবর্ষ এ বার পাঁচ দিন ব্যাপী টেষ্ট খেলায় প্রথম যোগদান করবে, মোট টেষ্ট ম্যাচ খেলবে ৪টে। এপ্রিল মাসের ২২শে ভারতীয়দল 'চাটার্ড প্লেনে' ক'রে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করবে, ইংলণ্ডে প্রথম ম্যাচ খেলবে ওরসেষ্টারে মে মাসের ৩রা।

জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান বাঙ্গলা দল ফটো: পান্না সেন

ভারতীয় দলে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়:

বিজয় হাজারে (অধিনায়ক), হেমু অধিকারী (সহ-অধিনায়ক), দাত্তু ফাদকার, পলি উমরীগড়, প্রবীর সেন, সি ডি গোপীনাথ, পঙ্কজ রায়, নিরোদ চৌধুরী, জি এস রামচাঁদ, হীরালাল গাইকোয়াড়, এম কে মন্ত্রী, এন জি সিন্ধে, সি টি সারভাতে, রমেশ ডিভেচা, ভি এল মঞ্জরেকার,

মহিলাদের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলাদের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় ১-০ গোলে বাংলাদলকে হারিয়ে লেডী রতনকাপ বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে বাংলা প্রদেশের ষষ্ঠবার ফাইনাল খেলা। প্রথম দিনের খেলায় বাংলাদল ১-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। খেলা ভাঙ্গবার পাঁচ মিনিট আগে বোম্বাই দল গোলটি শোধ ক'রে খেলা ড্র করে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষ মিনিটে গোল দিয়ে বোম্বাই ১-০ গোলে জয়ী হয়। এই নিয়ে বোম্বাই দল পাঁচবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো। পূর্ব্বাবার জয়লাভ—১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯ এবং ১৯৫১।

অলিম্পিকগামী ভারতীয় ফুটবল দল ঃ

হেলসিঙ্কিতে আগামী বিশ্ব অলিম্পিক গেমস প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ ভারতীয় ফুটবল দলে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। গোল: এণ্টনি (বাংলা) ও ভরদ্বাজ (মহীশূর)। ব্যাক: শৈলেন মান্না—অধিনায়ক এবং ব্যোমকেশ বসু (বাংলা) এবং আজিজ (হায়দ্রাবাদ)। হাফ-ব্যাক: লতিফ, চন্দন সিং, এস রায়, এবং এস সর্ব্বাধিকারী (বাংলা) এবং নূর (হায়দ্রাবাদ)। ফরওয়ার্ড: ভেঙ্কটেশ, রুনু গুহঠাকুরতা, সাহু মেওয়ালাল, সত্তার, এণ্টনি, সালে এবং আমেদ (বাংলা) এবং মৈন (হায়দ্রাবাদ)।

ষ্ট্যাণ্ড-বাই:—সঞ্জীব ও প্যাপেন (বোম্বাই), টি আও এবং ধনরাজ (বাংলা), সম্মুখম (মহীশূর), কে বরদলৈ (আসাম), বি ঘোষ (ইউ পি), লায়েক (হায়দ্রাবাদ) এবং পূরণ বাহাদুর (সার্ভিসেস)।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৫২ সালের জাতীয় ক্রিকেট 'রঞ্জি ট্রফি' প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দল ৫৩১ রানে গত বছরের বিজয়ী হোলকার দলকে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। বিগত ১৮ বছরের খেলায় বোম্বাই দল ৬ বার কাপ পেয়েছে। প্রবীণ টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কর্ণেল সি কে নাইডু, হোলকার দলের নেতৃত্ব করেন। কিন্তু শেষের ক'দিন খেলায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

বোম্বাই ঃ ৫৯৬ (রামচাঁদ ১৪৯, মানকড় ১৪১, আপ্তে ৯৮, মন্ত্রী ২৪, মোদী ৬২) ও **৪৩৮** (মন্ত্রী ১৫২, মোদী ৮২, মঞ্জরেকার ৭৬, রামচাঁদ ৫৩)।

হোলকার ঃ ৪১০ (সারভাতে ৭০, সি কে নাইডু ৬৬, জগদল ৫৯, ফাদকার ১০৯ রানে ৭ উইকেট, মানকড় ৭২ রানে ২ উইকেট) ও ৯৭ (মানকড় ২১ রানে ৪ এবং গুপ্তে ৪১ রানে ৪ উইকেট)।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত কাব্যনাট্য "শ্রীচৈতন্য"—৩৷৹
ইন্দিরা দেবী প্রণীত গানের বই "শ্রুতাঞ্জলি"—৫৲
শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "যুগ-ঝঙ্কার"—২৷৹
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ভজহরি"—২৷৹
তারাপদ ঘোষ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "শমন-দূত"—১৲
শ্রীরামকৃষ্ণ পাবলিশার্স-প্রকাশিত "শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রাবলী"—৷৹
শ্রীসুধাকান্ত দে প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রহস্যময় চোর"—২৷৹
শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত "জাহানারার আত্মকাহিনী" (২য় সং)—৩৷৹
শিশির ভট্টাচার্য্য ও দিলীপ মালাকার-সম্পাদিত জীবনী-গ্রন্থ "অচেনা দার্শনিক বিনোদ চক্রবর্ত্তী"—১৲
শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব"—৬৷৹
শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী প্রণীত "জপসূত্রম্" (দ্বিতীয় খণ্ড)—৫৲
নেপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পদক্ষেপ"—১৷৹
শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "সিরাজদ্দৌলা" (১৫শ সং)—২৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিন্দুর ছেলে" (২০শ সং)—২৲, "পথ-নির্দ্দেশ"—১৲, "শ্রীকান্ত" (৩য় পর্ব—১৩শ সং)—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

শিল্পী—মণি গাঙ্গুলী

রাম-সীতা
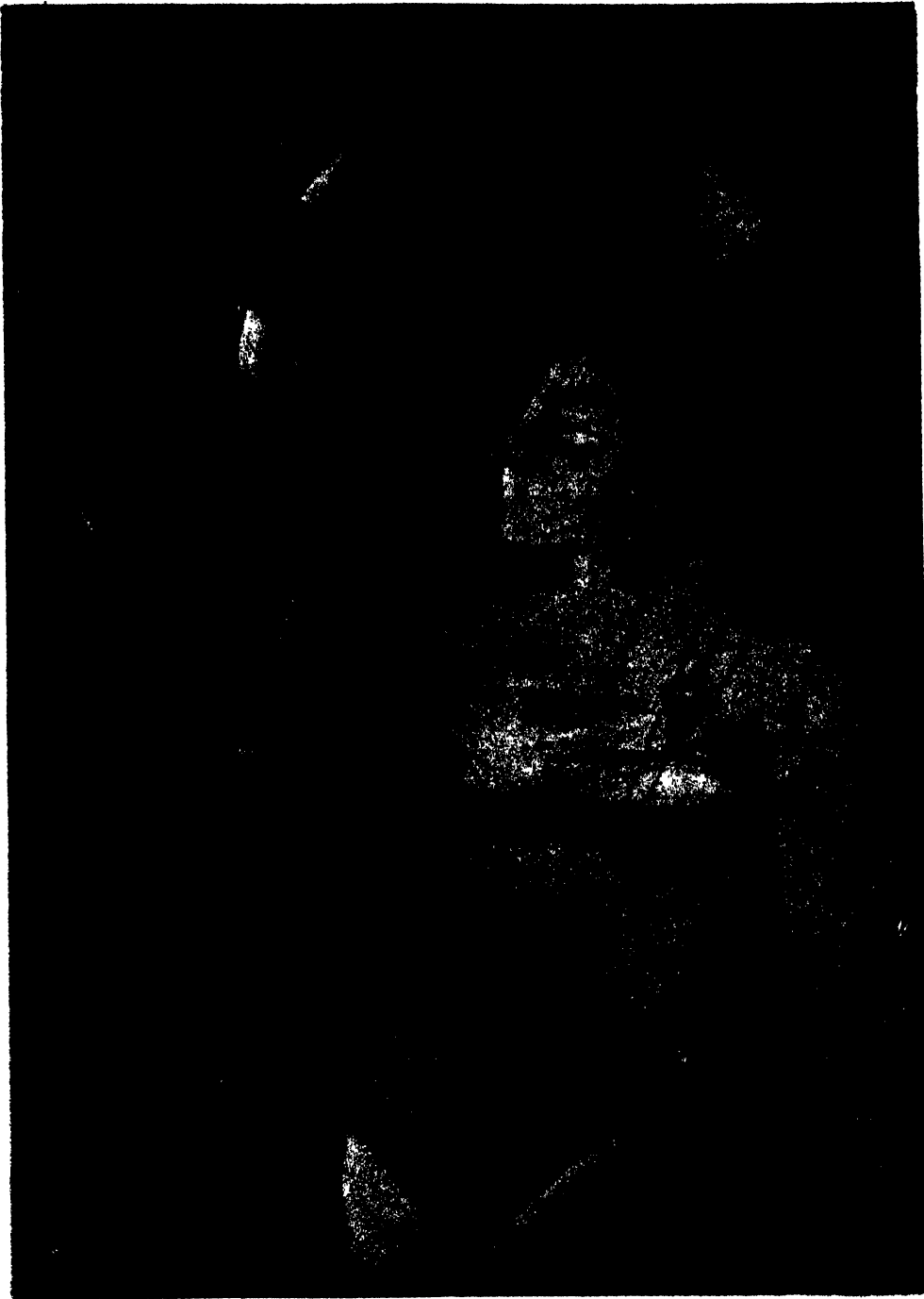
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৯

দ্বিতীয় খণ্ড | উনচত্বারিংশ বর্ষ |

ষষ্ঠ সংখ্যা

রথী

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

আজকালকার দিনে একটা মটরের মত যন্ত্র চালাবার অধিকার পেতে হলে চাই, রীতিমত পরীক্ষা দিয়ে সংগ্রহ করা একটি লাইসেন্স, যা বলে দেবে যে—যে ব্যক্তির সপক্ষে এই লাইসেন্স দেওয়া হল সে মটর চালাতে জানে এবং এই গুরু দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। সমাজের কল্যাণের খাতিরে এইরূপ সতর্কতার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা সকলেই স্বীকার করবেন। মটর চালান একটা গুরুতর দায়িত্ব। ঠিক পথে ঠিক মত না চালাতে পারলে যারা তার আরোহী তাদের জীবনের আশঙ্কা আছে, অপর পক্ষে অন্য আরোহী বা পথচারীরও বিপদের সম্ভাবনা রয়ে যায়। সেই কারণেই এই সাবধানতার প্রয়োজন। রীতিমত অভ্যাস করে দীর্ঘ সময়ের সাধনার পর ব্যক্তিবিশেষ যন্ত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার অর্জ্জন করে এবং তবেই তাকে মটর চালানর অধিকার-সূচক লাইসেন্স দেওয়া হয়।

মানুষের দেহ ও মনকে নিয়ে যে বস্তুটি গঠিত তাও একটি যন্ত্র। মটরের সহিত তুলনায় তা অত্যন্ত জটিল। তার কর্ম্ম করবার ক্ষেত্র বহু প্রশস্ত, তার কর্ম্ম করবার রীতির কোন দিশা পাওয়া যায় না। এমনি তা জটিল। সাংসারিক জীবনে অহরহ প্রতিটি মানুষকে এই দেহ-মন-রূপ যন্ত্রটিকে পরিচালিত করতে হয়। তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতি তার জীবনের পথটিকে আরও বন্ধুর, আরও জটিল করে তুলেছে। অথচ তা পরিচালনার জন্য কোন লাইসেন্স-এর ব্যবস্থা দেখি না। লাইসেন্স কে দেবে? নাই দিক, মানুষকে সভ্য জগতে বাস করবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার জন্য শিক্ষা বলে একটা জিনিষের সভ্য সমাজে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দেহ মনকে পরিচালিত করা যায় কিরূপে, তাকে ঠিক মত নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি কৌশলে, তার

কোনো ব্যবস্থা কোনো জাতির শিক্ষা প্রণালীতে দেখতে পাই না।

মোট কথায় নীতিশিক্ষার কোন ব্যবস্থার বর্ত্তমান জগতের সভ্য সমাজ প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, এইরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হবে না। সেকালে ধর্ম্ম-শিক্ষার একটা ব্যবস্থা ছিল, সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে খানিকটা পরিমাণ নীতি শিক্ষাও হয়ে যেত। অবশ্য তার ভিত্তি খুব সদ্বুদ্ধি সম্মত নাও হতে পারে। তবু নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ত ভাল। এখন যে কাণা মামাও জোটে না। যাঁদের ওপর মানুষকে শিক্ষা দেবার ভার, এ বিষয়টির গুরুত্ব তাঁদের চোখেই পড়ে না।

অথচ ব্যাপারটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। রীতিমত শিক্ষা না করে মটর চালান নিষেধের নির্দ্দেশের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুভূত হয়, কারণ তার কুফল কত মারাত্মক হয় স্থূলদৃষ্টিতেই তা সহজে চোখে পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে দেহ মনকে নিয়ন্ত্রণ করবার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজকাল আমাদের চোখে পড়ে না, কারণ তার পরিণতি উপলব্ধি করতে একটু জটিল চিন্তাশক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন। তাই বলে তার গুরুত্ব বেশী বৈ কম নয়। যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে না, সে নিয়তই জীবন পথে চলতে ভুল করে বসে। তার সদ্বুদ্ধি তাকে যে পথে নিয়ে যেত সে পথে না গিয়ে, প্রবৃত্তি তাকে যে পথে নিয়ে যায় সেই পথে সে যায়। ফলে সে নিজের জীবনকে সার্থকতামণ্ডিত করতে পারে না এবং অন্যের স্বার্থের হানি সাধন করে তার জীবনকেও পরোক্ষ-ভাবে সঙ্কুচিত করবার কারণ হয়। অনেক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে স্বার্থের সংঘর্ষ লেগে দুটি মানুষেরই জীবন নষ্ট হয়ে যায়। তার পরিণতি দুটি মটরের সংঘর্ষের ফলে দুটীর আরোহীরই জীবন-নাশের সম্ভাবনার সঙ্গে বেশ তুলনার যোগ্য।

সে কালে কিন্তু এমন ছিল না। সে কাল মানে আমি অতি প্রাচীন কালের কথা বলছি। সেটা একেবারে সেই উপনিষদের কাল। এখন থেকে দু হাজার বছর আগে খৃষ্ট জন্মেছিলেন। স্বাধীন ভারত-সরকার যাঁর চক্রকে জাতীয় পতাকায় ধারণ করে গৌরব বোধ করেন, সেই রাজা অশোক এ দেশে রাজত্ব করতেন তারও প্রায় ৩০০ বছর পূর্ব্বে। ভগবান বুদ্ধ এদেশে অবতীর্ণ হন তারও দুশ' বছর আগে। উপনিষদ তারও পূর্ব্বেকার জিনিষ। সেই উপনিষদে দেখি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে কি উপায়ে অর্জ্জন করা যায় সে বিষয় চিন্তা করে কিছু সারগর্ভ উপদেশও উপনিষদের বচনে স্থান পেয়েছে।

আমরা দেখি, কঠ উপনিষদে দেহ, আত্মা, মন ও ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট মানুষকে অশ্ব, সারথি ও আরোহীযুক্ত একটি রথের সহিত তুলনা করা হয়েছে। তার একটু বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া আমাদের প্রয়োজন হবে। বচনটি এই :

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তে-ত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

রথের পক্ষে থাকে রথ, তাকে টানবার জন্য অশ্ব, সেই অশ্বকে আয়ত্ত রাখার জন্য প্রয়োজন প্রগ্রহের এবং চালিত করবার জন্য সারথির। এই সব কিছু আয়োজনের উদ্দেশ্য আরোহীকে ঠিক পথে পৌঁছে দেওয়া। এইবার মানুষের সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের শরীর এখানে রথের সঙ্গে তুলনীয়, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব-স্বরূপ, তারা দেহকে বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট করে। সদ্বুদ্ধি এখানে সারথি—তা নির্দ্দেশ করে কোন পথে যেতে হবে। মন প্রগ্রহের স্থান গ্রহণ করে, কারণ তার সাহায্যেই ইন্দ্রিয়-গুলিকে আয়ত্ত রাখা যায়। এই মনের এখানে একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে যেটি পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। মন মানে আমাদের যে বৃত্তি চিন্তা করে তা নয়, তার অর্থ মনো বল, মনো বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় ইচ্ছা-প্রণোদিত শক্তি (will) তাই। এটি ইচ্ছাপ্রণোদিত শক্তি, কারণ এটি সেই শক্তি যা একটি বিশেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য কোনও মানুষকে একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। বল্গা বা প্রগ্রহের কাজও তাই, তা অশ্বকে তার প্রবৃত্তি অনুসারে এপাশে ওপাশে হেলতে দেয় না, সারথির ইচ্ছা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট যে গন্তব্য পথ তাতেই পরিচালিত করে।

তুলনাটি যে কতখানি সুসঙ্গত হয়েছে তা এখন আমরা বুঝতে পারব। প্রতিটি মানুষের আছে একটি দেহ, বুদ্ধি-

শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও খেয়াল মত বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তির অধীন কতকগুলি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিষয় ভোগে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিশক্তি চিন্তা করে,' ঠিক করবার ক্ষমতা রাখে কোন পথে গেলে ব্যক্তি বিশেষটির কল্যাণ সাধিত হবে। তখন তার ইচ্ছাশক্তি এই নির্দ্ধারিত পথে ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করে। এই ভাবেই প্রতিদিন নিয়ত মানুষ তার ইচ্ছাধীন কর্ম্মগুলিকে পরিচালিত করে। সুতরাং এই বুদ্ধিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় এই সবগুলি দিয়ে গঠিত একটি সমগ্র মানুষ বা ভোক্তাকে পাই (আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তে-ত্যাহুর্মনীষিণঃ)।

এখনকার দিন হলে বোধ হয় উপনিষদকার রথের সঙ্গে মানুষের তুলনা দিতেন না। রথ এখন অচল, মটর এখন তার স্থান নিয়েছে। কাজেই তিনি হয়ত মটরের সঙ্গে তুলনা দিতেন। দেহ তখন মটরের সঙ্গে তুলনীয় হত, সারথি চালকের সঙ্গে, গাড়ীর গমনশক্তি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং টিয়ারিং হুইল প্রবাহের সঙ্গে।

মানুষের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যত কিছু কাজ আছে সেগুলি সম্পর্কে এই কথাগুলি খাটে। মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য—যাকে দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় পুরুষার্থ—তার কথা বাদ দিলাম। তা একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব অবতারণা করে। এমন কি ব্যক্তিবিশেষের ছোট-খাটো আশা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলেও মানুষের এই বৃত্তিগুলির সাহায্য নিতে হয় এবং বুদ্ধিশক্তি বা ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্দিষ্ট পথে সংযতভাবে পরিচালনার উপরেই তার সিদ্ধি নির্ভর করে।

এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। কোন মানুষের ইচ্ছা হল সে ভাল টেনিস খেলোয়াড় হবে। এই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য, তাই হল তার এক্ষেত্রে বিশেষ গন্তব্য পথ। তার জন্য তার প্রয়োজন নিয়ত তার ইচ্ছাধীন কর্ম্মগুলিকে সংযত করা এবং এরূপ ভাবে পরিচালিত করা, যাতে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সহজ হয়। তার স্বভাবত ইচ্ছা জাগতে পারে আলস্য করে সময় কাটানর, সে প্রবৃত্তিকে দমন করতে হবে। নিয়মিতভাবে তার মাঠে যেতে হবে, টেনিস খেলা অভ্যাস করতে হবে। অত্যধিক পরিশ্রম হবে, স্বভাবত বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা আসবে, তাকে দমন করে কঠোরভাবে সাধকের মনোভাব নিয়ে খেলে যেতে হবে। একান্ত একাগ্রচিত্তে বলের উপর মন নিবদ্ধ রাখতে হবে। পাশে কি ঘটছে দেখবার জন্য মন ছুটতে চাইবে, তবু তাকে সংযত করে বলের দিকেই নিবদ্ধ রাখতে হবে। খেলার শেষে কোন সঙ্গী হয় ত সিগারেট খেতে দেবেন। তামাক সেবন করলে স্নায়ুর শক্তি কমে যায়, অতএব এ প্রবৃত্তিকে দমন করে, যতখানি ভদ্রতার সঙ্গে সম্ভব সে দানটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এমনিভাবে ধীরে ধীরে বহু দিনের সাধনার পর, বহু পরিশ্রম ও অনেক সংযম অভ্যাসের ফলে তিনি একদিন পাকা খেলোয়াড় তৈয়ারী হয়ে উঠবেন। এমনি করেই প্রতি উদ্দেশ্যকে বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারিত পথে এবং ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণে নিজেকে চালিত করে ব্যক্তিবিশেষ চরিতার্থ করে।

এইরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে মানুষ নিয়তই একটি দোটানার মধ্যে পড়ে। সিদ্ধির পথ দুর্গম, সিদ্ধির পথ কষ্টসাধ্য। পথে অনেক বিপথ মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। তারা আপাতমধুর, তারা মানুষকে বিপুল আকর্ষণে টানে। ফলে সিদ্ধির পথ হতে মানুষকে অনেক সময় তারা ভ্রষ্ট করে। এই দোটানার ভাবকে বুঝাবার জন্য কঠ উপনিষদে দুটি সুন্দর পরিভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। তারা হল 'শ্রেয়' ও 'প্রেয়'। আমার বিশেষ উদ্দেশ্যটি হল 'শ্রেয়'। তা আমার লক্ষ্য বস্তু—তা আমার গন্তব্য স্থল। তা কষ্টসাধ্য, তা দুর্গম, তা বর্ত্তমানে সুখকর নয়, কিন্তু তাই হল কল্যাণের পথ। যা বর্ত্তমানেই সুখ-কর, যা আপাতদৃষ্টিতে মধুর, যা ইন্দ্রিয়কে বিপথে পরিচালিত করবার জন্য টানে তা প্রেয়। তা আপাত-দৃষ্টিতে মধুর, তা মনকে সহজেই ভোলায়, তাই তা প্রেয়। তা আমাদের সিদ্ধির পথ হতে ভ্রষ্ট করে, তা আমাদের কল্যাণকর নয়, তাই তা শ্রেয় নয়।

তাই কঠ উপনিষদ বলেন "তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি, হীয়তে অর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।" প্রেয় ও শ্রেয় যুগপৎ সিদ্ধির পথে মানুষকে এসে বলে আমার গলায় বরমাল্য দাও। যে ছেলে ঠিক করেছে পরীক্ষায় সে ভাল করবে, তার পক্ষে শ্রেয় হল পরীক্ষায় সুফল লাভ।

সে হল দীর্ঘ সাধনার পথ, বহুদিন নিরলস অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে তাকে পাওয়া যায়। তাই তা আপাত-দৃষ্টিতে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু নয়। একটা ভাল সিনেমা তার মনকে টানে, তার বন্ধুর দল তাকে খেলা দেখতে ডাকে। এগুলি প্রেয়ের আহ্বান। তা আপাতমধুর, তার আকর্ষণ-শক্তি প্রবল। এখন সে কাকে বরণ করবে এই হল সমস্যা। উপরের বচনটি বলে, "আমার উপদেশ শোন, শ্রেয়কে বরণ কর তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। আর যদি প্রেয়কে বরণ কর তুমি ঠকে যাবে, সিদ্ধির পথ হতে তুমি ভ্রষ্ট হবে।"

এই দেখে মনে হয় যে পুরাণে আমরা তপোবিঘ্নকারিণী অপ্সরাদের গল্প শুনে থাকি তা বোধ হয় একটি রূপক এবং তার ব্যবহার হয়েছে একটি সাংকেতিক অর্থ সূচনা করতে। কোন বিশেষ মুনি সিদ্ধিলাভের জন্য তপস্যা করতে সুরু করলেই ইন্দ্রের ভয় হয়—তাঁর ইন্দ্রিয়ত্বই বুঝি কেড়ে নেয়। তাই তিনি অপ্সরাদের পাঠিয়ে দেন তাঁর চিত্ত বিক্ষেপ ঘটাতে। অপ্সরার আকর্ষণে যদি তাঁর তপোভঙ্গ হয় তিনি আর সিদ্ধিলাভ করেন না। আর অপ্সরার আকর্ষণের চেষ্টা যেখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সেখানে সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত। এই অপ্সরাগুলি প্রেয়, আর সিদ্ধির পথ শ্রেয়। যিনি ধীর, যিনি বুদ্ধিমান তিনি অপ্সরাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাই কঠ উপনিষদ বলেন—"শ্রেয়ো হি ধীরো অভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগ ক্ষেমাদ্ বৃণীতে।"

বানপ্রস্থ

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

আনন্দময়ীর আর কোন বন্ধন নেই এ সংসারে। জীবনের গ্রন্থি আজ শিথিল হ'য়ে এসেছে। অথচ এ সংসার তাঁর বড় সাধের—তাঁর নিজের হাতে গড়া এই ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। তিল তিল ক'রে সঞ্চয় ক'রেছেন তিনি—কৃপণের ধন ভ'রে উঠেছে কুবেরের ঐশ্বর্য সম্ভারে।

গরিবের মেয়ে তিনি। আজন্ম লালিতপালিত হ'য়েছেন হতাশায়, অনাদরে, অবজ্ঞায়। বিয়ে যখন হ'ল তাঁর, তখনও কোন পরিবর্তনকে তিনি উপলব্ধি ক'রতে পারেন না। নিত্য অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম, আর ঝড়-ঝাপ্‌টার আঘাত—জীবনে কখন যে বসন্ত এলো, দক্ষিণের বাতাস কখন যে বইলো, শহরের জরাজীর্ণ রুদ্ধ ঘরে, অবরুদ্ধ-জীবনে তা তিনি অনুভবই করতে পারেন নি।

স্বামী শঙ্করনাথ শুধু আশাবাদী। তিনি কেবল আনন্দময়ীকে প্রেরণা দিতেন—দুঃখের মাঝেই থাকে ভগবানের ঐশ্বর্য! এ দুঃখ ক্ষণিকের। একদিন দেখো কত বড় লোক হবে তুমি। বাড়ি গাড়ি, ছেলে, বৌ, নাতি, নাতনী—

ছিটে দিয়ো না। বাড়ি গাড়ি তো তোমার কাছে চাই নি। ছেলেমেয়েগুলোকে দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে দিতে পারি নে। খিদের জ্বালায় আজ ওরা না খেয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে প'ড়েছে!

নির্বিকার শঙ্করনাথ। স্ত্রীর এত বড় আঘাতেও মনে তাঁর কিছুমাত্র আলোড়ন জাগে না। গরিবের সংসারে একবেলা খেতে না পাওয়া এমন কিছু অঘটন নয়। তাঁর বাল্যের ইতিহাস আরও লাঞ্ছিত, আরও নিপীড়িত। আনন্দময়ীকে সেকথা তিনি অনেক বার ব'লেছেন। আনন্দময়ীর ছেলেমেয়েরা তবু মা-বাপের স্নেহ যত্ন পায়। তাঁর ভাগ্যে তাও জোটে নি। পরান্নে এবং পরগৃহে প্রতিপালিত তিনি। জীবনে শুধু অনাদরকেই সঞ্চয় ক'রেছেন। আনন্দময়ী শঙ্করনাথের এ বেদনাকে উপলব্ধি ক'রতে পারেন না। দরিদ্রের ঘরে জন্ম তাঁরও। অভাবের সঙ্গে তাঁরও পরিচয় আজন্মের। তবুও ক্ষিধের সময় রান্নাঘরে মার কাছে গিয়ে অভিযোগ জানাবার পথ ছিল তাঁর। পিতার কণ্ঠে 'মা আনন্দ' স্নেহ সম্ভাষণও শুনেছেন

বেয়ে তাঁর অশ্রুধারা নেমে আসে! রূঢ় স্বামীর হৃদয়হীন ব্যবহারে হৃদয় তার হাহাকার ক'রে ওঠে। গরীব হ'লেও তাঁর বাপের বাড়ীতে অনাহারের জ্বালা ছিল না। ছেলে-মেয়েদের অভুক্ত রাখার মত দৈন্যদশাকে তিনি কল্পনাই করেন নি কোনদিন।

শঙ্করনাথের শুধু একই কথার পুনরাবৃত্তি—যেদিন ব্যবসা ফেঁপে উঠবে, সেদিন দেখো কত বড় লোক হবে তুমি। সোনা-দানায় ঘর ভ'রে উঠবে। তোমার ছেলে-মেয়েরা মোটরে চ'ড়বে। আর তুমি আর আমি তখন ছেলে বৌয়ের হাতে সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে কাশী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবনে তীর্থ ক'রে বেড়াবো।

স্বামীর এ কথা—তীব্র ব্যঙ্গের মতই মনে হয় আনন্দময়ীর। এই আকাশ-কুসুমের বাস্তব পরিবেশ আনন্দময়ীর জানা আছে। পোড়া কপালের ধিক্কার দিতে দিতে অভুক্ত সন্তান-সন্ততির পাশে ছেঁড়া আঁচল বিছিয়ে শুয়ে প'ড়েন তিনি। রাত অনেক হ'য়ে গেল। নির্বোধ স্বামীর সঙ্গে অযথা বাক্যব্যয়ে আর কোন লাভ নেই তাঁর।

অভাবের সঙ্গে লড়াই ক'রে এমনিভাবেই জীবন কেটেছে আনন্দময়ীর। এরই মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তাঁর অতিবাহিত হ'য়েছে।

কিন্তু দিন সমান যায় না। আশাবাদী শঙ্করনাথের কথা এতদিন নির্বোধের উক্তি ব'লে প্রতিপন্ন হ'লেও একদিন কিন্তু তা সত্যে পরিণত হ'ল। দ্বিতীয় যুদ্ধের ঝড়ে যখন রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনে বিপুল পরিবর্তন সুরু হ'য়েছে—তখন অনেক কিছু ওলোট-পালটের মধ্যে আনন্দময়ীর দরিদ্র সংসারের টিনের চাল উঠে প্রকাণ্ড সৌধ গ'ড়ে উঠলো সেখানে। আশ্চর্য ব্যাপার। কেমন ক'রে যে শঙ্করনাথ মুঠো মুঠো টাকা এনে আনন্দময়ীর হাতে গুঁজে দিলেন—তা এক অভাবনীয় ব্যাপার।

আনন্দময়ীর বিশ্বাস হয় না—আত্মপ্রত্যয় নেই তাঁর—এই এত, এত টাকার অধিকারিণী তিনি? এই প্রাসাদসম অট্টালিকা, দাস দাসী, পাচক, সোফার, গাড়ি, অলঙ্কার—এ সমস্তের অধিশ্বরী তিনি? সন্দেহ হয় তাঁর! এই পরিণত বয়সে শঙ্করনাথ কী শেষকালে চুরি ডাকাতির আশ্রয় নিলে?

শঙ্করনাথ বলেন—নাগো না। যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে। লাক্ টাকার চেক্ কাটছি এখন আমি। ব্যাঙ্কে মোটা সুদে ফিক্সড ডিপোজিট ক'রেছি। আর তোমার কোন ভাবনা নেই; ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন? আর তোমার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে উপোস ক'রে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে প'ড়বে না। বংশপরম্পরায় তারা ঐশ্বর্য ভোগ ক'রবে। এই বাড়ি, গাড়ি, সোনা দানা—এ সব তাদের।

আনন্দের আতিশয্যে দিশেহারা হ'য়ে ওঠেন আনন্দময়ী। মনে তার অদম্য উৎসাহ। এখনও গড়ার বয়েস পার হ'য়ে যায় নি তাঁর। এই সংসারটিকে তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলবেন। প্রাণ ভ'রে ভোগ ক'রবেন এই ঐশ্বর্যের সম্ভার!

শঙ্করনাথ ঠাট্টা ক'রে বলেন—কেমন যা বলেছিলাম খাটলো তো! তা ঠিক! ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে চলো এইবার আমরা তীর্থ ধর্ম ক'রে বেড়াই।

আনন্দময়ী ব'লেন—এরই মধ্যে কেন? দাঁড়াও আগে বৌমাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিই। ছেলেরা আরও একটু শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করুক!

শঙ্করনাথ বলেন—পঞ্চাশ উর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ—এ কিন্তু শাস্ত্র বাক্য। একান্ন বছর বয়েস হ'ল আমার।

আনন্দময়ী বলেন—পঞ্চাশ হ'তে আমার এখনও দশ বছর বাকী। শাস্ত্র বাক্য মেনে বনে যেতে চাও তো তুমি যেতে পারো—আমার মন এখনও বানপ্রস্থে নিমগ্ন হয় নি।

সত্যিই আনন্দময়ীর মনে তখন অপার কামনা। যে জীবন তাঁর স্বপ্নেরও অতীত, ভাগ্য প্রসন্নতায় আজ তা তিনি লাভ ক'রেছেন। কিসের কাশী, বৃন্দাবন! এই সংসারই তাঁর আরাধ্য। এইখানেই তিনি বড় ক'রে ঠাকুর ঘর প্রতিষ্ঠা করবেন। নব বৃন্দাবনের দোলমঞ্চে তাঁর প্রাণের রাধাকৃষ্ণ এইখানেই দোল খাবে!

আনন্দময়ীর জীবন ঘিরে থাকে সংসার, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা-জামাই, নাতি-নাতনী, দাস-দাসী পরিব্যাপ্ত হ'য়ে। কাজের আর অন্ত নেই তাঁর জীবনে। সংসারের চাকা এখন ঘুরে গেছে। সোসাইটি, পজিশন, পার্টি প্রভৃতি বড়লোকের আনুসঙ্গিক সভ্যতা তাঁকে সম্পূর্ণ বিপরীত

ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। সুরম্য অট্টালিকার তেতলায় মোজায়েক্ করা ফ্লোর—সেখানে তাঁর ঠাকুর ঘর। কিন্তু সংসারের সমস্ত কিছুর দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত দিনই কেটে যায় তাঁর। নিবিষ্ট চিত্তে পূজা-অর্চনার সময়ও তাঁর নেই।

কিন্তু আশ্চর্য জীবন-শঙ্করনাথের। পুরাতন দিনের শঙ্করনাথ আজও ঠিক তেমনই আছেন। সেই গলাবন্ধ কোট, আর মোটা ধুতি, পায়ে শস্তা জুতা, চোখে নিকেলের চশমা, লক্ষ টাকার মালিক শঙ্করনাথ আজও সেই পুরাতন দিনের জাবর কেটে চলেছেন। গাড়ী ক'রে বেড়াতে তাঁর ইচ্ছা হয় না, একদিন কারবার নিজে চোখে না দেখে দিবানিদ্রায় নিশ্চিন্ত আরাম উপভোগ ক'রতে মন চায় না। কর্মঠ, বলিষ্ঠ, সাধাসিধে মানুষ তিনি।

ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূ এদের অভিযোগ তিনি কানেই তোলেন না। কিন্তু আনন্দময়ী এসে যখন কলহ সুরু করেন, তখন তিনি মৃদু হাস্যে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন—এসবই ভগবানের দান, আমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। ভোগের আধিক্য ভালো নয়—তাতে স্পৃহা থাকে না আর। অপব্যয়ের দ্বারা ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায় না।

আনন্দময়ী ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলেন—ন্যাকামী রেখে দাও তোমার। লোক ঠকিয়ে খাওয়া যাদের ব্যবসা, তারা আবার ধর্ম-নীতির ব্যাখ্যা ক'রতে আসে? তোমার এই চামারবৃত্তির পয়সা খাবে কে?

শঙ্করনাথ বলেন—কেন তোমার সংসার পরিজন, যাদের জন্যে চিরকাল তুমি অভিযোগ ক'রে এসেছো।

শঙ্করনাথের একথার মধ্যে কোথায় যেন একটু প্রচ্ছন্ন বেদনা লুকিয়ে আছে—ঐশ্বর্যময়ী আনন্দময়ী তা বুঝতেই পারেন না। তবুও স্বামীকে তিনি বলেন—তোমার লজ্জা না ক'রলেও ছেলেদের লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে যায়। তারা আমাকে প্রায়ই বলে—বাবার বেশভূষা, চাল-চলন সংশোধন করতে বলো। লোকে কৃপণ ব'লে বড্ড ঠাট্টা করে আমাদের।

শঙ্করনাথ অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দেন—হ্যাঁ, তা বটে। তবে এতে তো লজ্জার কিছুই নেই। ছেলেরা বড়লোকের ছেলে, কিন্তু তার বাপ যে আজন্ম দরিদ্র। তাই দারিদ্র্য ... চিরকালের সঙ্গী।

শঙ্করনাথের এ হেঁয়ালীভরা কথার অর্থ আনন্দময়ী বোঝেন না, রাগে গর গর ক'রতে ক'রতে তিনি রান্নার তদারকে যান—বড় বৌমার জন্মতিথি আজ—সম্ভ্রান্ত গেস্ট্‌ আসবেন অনেক। শঙ্করনাথের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। জীবনের সঞ্চয় তাঁর আজও শেষ হয় নি। বিপুল কাজের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত!

কিন্তু জীবনের জোয়ারের গতি অতি আকস্মিকভাবে একদিন থেমে এলো আনন্দময়ীর। পার্থিব জগতের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। কেন, সেকথা তিনি প্রকাশ ক'রতে চান না। স্বামী শঙ্করনাথকে শুধু বলেন—ওগো, চল, আর নয়।

—কোথায়?

—বানপ্রস্থে।

—কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়েস হ'তে এখনও যে তোমার বছর পাঁচেক দেরি আছে।

—থাক্! আর পঞ্চাশে আমার কাজ নেই। চোখের কোণ বেয়ে তাঁর অশ্রুরেখা চিক চিক ক'রে ওঠে।

শঙ্করনাথের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই। তিনি তন্ময় হ'য়ে কী যেন ভাবছিলেন।

আনন্দময়ী বলেন—শুনছো আমার কথা। তুমি আজই ব্যবস্থা করো। আমি হরিদ্বারে যাবো।

শঙ্করনাথ বলেন—কেন, কী হ'ল তোমার আবার?

—বলছি তো। সংসারে আর আমার কাজ নেই। অনেক সংসার ক'রেছি। এখানে তোমাকে আর আমাকে কেউই চায় না এখন আর।

শঙ্করনাথ বলেন—ও! আচ্ছা।

—আচ্ছা নয়, আমি আর তিলার্ধও এ বাড়িতে থাকবো না। আমারই বাড়ি ঘর, আজ আমাকেই কিনা তুচ্ছতাচ্ছিল্য। ছেলেরা তো কোন কথাই আমার কানে তোলে না। বৌরা পর্যন্ত হেনস্থা ক'রে। ছোট বৌএর ছেলেকে শাসন ক'রেছি ব'লে আমাকে চরম অপমান ক'রলে আজ ছেলের বৌ।

শঙ্করনাথ এ সব কথার কোন গুরুত্বই দিচ্ছিলেন না। তিনি তখন কিসের চিন্তায় যেন আত্মনিমগ্ন!

ফেলেন। অভিমানের অশ্রু-বন্যায় তাঁর অন্তর উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে।

শঙ্করনাথ এইবারে বিচলিত হ'য়ে পড়েন—কী? কী হ'ল তোমার?

অশ্রু-ভাঙা কণ্ঠে আনন্দময়ী বলেন—সারাজীবনই আমার এমনি অবজ্ঞায় কাটলো! যার স্বামীই স্ত্রীর উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না—তাকে আবার তা'র ছেলে-বৌই বা গেরাহ্যি ক'রবে কেন? আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?

শঙ্করনাথ বলেন—কিন্তু ছেলে বৌএর জন্যই যে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের।

—কেন, কিসের জন্যে?

—তাদের বাঁচাবার জন্যে।

—তাদের জন্যে তো যথেষ্ট ক'রেছি। কাঙালের ছেলে আজ রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ ক'রছে। কিন্তু এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই তার জন্যে!

—এই তো সংসারের নিয়ম।

স্বামীর এ কথায় আনন্দময়ীর পিত্ত পর্যন্ত জ্বলে যায়।

স্ত্রীর এতবড় অভিযোগের পরও শঙ্করনাথ কার্যত: কোন কিছুই ক'রলেন না। শুধু পরিবর্তনের মধ্যে দেখা গেল অনেক রাত ক'রে তিনি বাড়ি ফেরেন—কারুর সঙ্গেই বড় একটা কথাবার্তা ক'ন না। ছেলেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আগে প্রশ্ন ক'রতেন, নিজে তার সমস্ত জটিল দিকগুলো দেখতেন, পরামর্শ দিতেন—আজকাল আর কোন খবরই রাখেন না। আনন্দময়ী রাগে, অভিমানে—এমন কি শঙ্করনাথের সঙ্গেও কোন কথাবার্তা বলেন না।

বাড়ির কর্তাগিন্নীর মধ্যে এমন একটা পরিবর্তনের ভাব অপর কেউই ভ্রূক্ষেপ করে না। ছেলে, বৌ—তারা সব নিত্যকার জীবন-প্রাচুর্যে ভরপুর। আজ পার্টি, কাল সিনেমার শো, বিলাস, প্রাচুর্য, ভোগ—এ সবের কোন ব্যতিক্রমই তাদের জীবনে নেই।

কিন্তু আনন্দময়ী এবং শঙ্করনাথ একদিন একান্ত নিরালায় দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে নিজেদের যেন নূতন ক'রে চিনলেন। চোখের কোণে দু'জনেরই কালি প'ড়ে গেছে, বিস্তীর্ণ কপালে চিন্তার মসীরেখা, শুষ্ক চেহারায় লালিত্যের অভাব, মাথার চুল যেন অতি তাড়াতাড়ি সাদা হ'য়ে গেছে—তাদের দুই স্বামী স্ত্রীর।

শঙ্করনাথ ব'ললেন—এখানে তোমার সত্যিই আর থাকতে ইচ্ছে নেই?

আনন্দময়ী কোন কথাই বলেন না। কিন্তু অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টি স্বামীর দৃষ্টিপথ হ'তে স'রিয়ে নেবার সময় পেলেন না তিনি।

শঙ্করনাথ ব'ললেন—ক'দিন ধ'রে আমিও এই কথাই ভাবছি—এ বাড়িতে আমাদের আর থেকে কোন লাভ নেই। চল, আমরা অন্য কোথাও চ'লে যাই। এমন জায়গায় যাবো যেখানে আমাদের সন্ধান কেউই আর পাবে না।

স্বামীর এ কথায় আনন্দময়ীর অভিমান আরও বেড়ে যায়। কিন্তু স্বল্পভাষী শঙ্করনাথের জীবনে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য কম। তিনি আর কোন কথাই বলেন না।

দু' একদিনের মধ্যেই অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

শঙ্করনাথ নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে স্বল্প প্রয়োজন মাফিক জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে এসে আনন্দময়ীকে তাড়া দিলেন—চলো। আর দেরি ক'রলে চ'লবে না।

ছেলে, বৌ, চাকর, চাকরাণি ছুটে এলো—ব্যাপার কি? সংক্ষেপে শঙ্করনাথ বললেন—তীর্থভ্রমণে যাচ্ছি।

আনন্দময়ীও কম অবাক হ'ন নি। এতখানি গুরুত্বে বিস্মিত হবারই কথা।

কিন্তু শঙ্করনাথের দৃঢ়তা অটুট—পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ; সংসারের প্রতি আর এ বয়সে মায়া-মমতা কেন? এখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

সংসারের তরফ থেকে তবু বাধা এলো—কোথায় যাবেন? কি ঠিকানা, সেখানে থাকার ব্যবস্থা কী? ইত্যাদি ইত্যাদি! প্রকাণ্ড আশ্রয় আজ ধ'রে যাওয়াতে সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

শঙ্করনাথ বলেন—সে সব জানানো যাবে পরে।

আনন্দময়ী এতখানি বৈরাগ্যের জন্যে প্রস্তুত হ'ন নি; কিন্তু শঙ্করনাথের কাছে কোন ওজর আপত্তিই টি'কে না।

আনন্দময়ীর বেদনা তিনি অনুভব ক'রেছেন—তিনি তার প্রতিকার ক'রবেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো শহরের জরাজীর্ণ একখানি বাড়ির দরজায়। শঙ্করনাথের উৎসাহের আর সীমা নেই। নিজেই মালপত্তর নামিয়ে ঘরের তালাচাবি খুলে ঘরগুছোতে সুরু ক'রে দিলেন।

বিস্মিত আনন্দময়ী ব'ললেন—পচা এঁদোপড়া গলির মধ্যে এই ভাঙ্গা বাড়ি—এ আবার তোমার কী উৎকট খেয়াল?

শঙ্করনাথ ব'ললেন—কেন, এই তো আমাদের তীর্থ—যেখানে তুমি আর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচবো। যেখানে তোমার স্বাধীনতা অখণ্ড—কেউ সেখানে তোমাকে অপমান ক'রতে পারবে না।

আনন্দময়ী বলেন—না বাবু, এখানে আমি একদণ্ডও থাকতে পারবো না। আর নিজের অমন বাড়ি ছেড়ে এখানে আমি থাকতে যাবো কী দুঃখে?

স্থির ধীর দৃঢ় শঙ্করনাথ উত্তর দেন—ও বাড়ি আর আমাদের নেই আনন্দ। ও বাড়ি বিক্রী হ'য়ে গেছে।

বিক্রী হ'য়ে গেছে? কেন, কিসের জন্যে?

—দেনার দায়ে, ব্যবসার লোকসানের জন্যে।

—কে লোকসান দিলে?

—যে ও বাড়ি ক'রেছিল, সেই আমিই।

আনন্দময়ী দুঃখে, অনুশোচনায় কেঁদে ফেললেন—আমার বাছাদের তবে কী হবে?

—তাই জন্যেই তো আবার নূতন ক'রে সংগ্রাম সুরু ক'রলাম।

—এতো তোমার বানপ্রস্থ, লুকিয়ে পালিয়ে আসা। শঙ্করনাথ মৃদু হেসে বললেন—যে গ'ড়তে পারে, সেই ভাংতে জানে। কিন্তু কাদের জন্যে গ'ড়বো বলতো আনন্দ?

আনন্দময়ীর এসব তত্ত্বকথা এখন আর ভালো লাগে না। দুর্ভাগ্যের জন্যে না হয় সবাই একসঙ্গে কষ্ট করবেন তাঁরা। কিন্তু ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনীদের অকূলে ভাসিয়ে এমনিভাবে আত্মগোপন ক'রে কিছুতেই তিনি থাকতে পারবেন না।

শঙ্করনাথের মুখে কিন্তু প্রসন্ন হাসির ব্যঞ্জনা। আশা-ভরাকণ্ঠে তিনি আনন্দময়ীকে সান্ত্বনা দেন—ভয় কী তোমার। ভগবান নিয়েছেন আবার ভগবানই ফিরিয়ে দেবেন আমাদের ঐশ্বর্য। আবার দেখবে কত সোনাদানা, গাড়ি, বাড়ি আমাদের ঘিরে থাকবে। ব্যবসাটা আর একবার ফেঁপে উঠুক না—দেখবে তখন! কিন্তু শঙ্করনাথের এ আশাবাদ আনন্দময়ীকে আর উৎসাহ দিতে পারে না। জীবনের শেষভাগে আবার কী জীবনকে নূতন ক'রে গড়ে তোলা যায়?

গত এব

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ

সংসারে নেই নবীনতা—জীবনে নেই স্বাদ,
আকাশ ফাঁকা ক'রছে খাঁ খাঁ—কোথায় রাকা চাঁদ?

পুষ্পে শোভার কই চাতুরী—
নারীতে আর নেই মাধুরী,
শকুন্তলা-সাগরিকার কোথায় মায়া ফাঁদ!

শিউলি-ঝরা শরৎ কোথা?—কোথায় মধুমাস?
মনে বনে আর কি তেমন জাগে কলোল্লাস!

কোন্ রূপালি নদীর কূলে
কাশকুসুমের চামর দুলে—
দেখিনি যে নয়ন তুলে—হয়নি অবকাশ!

এসেছিল কোয়েল বটে—গেয়েছিল গান,
কানে সে সুর শুনেছিনু,—শোনেনি তো প্রাণ!
স'বি যেমন তেমি আছে—
রজনী ধায় দিবার পাছে,
তবু কি যে হারিয়ে গেছে পাইনিকো সন্ধান!

সৌর-সম্পদের সদ্ব্যবহার

লেঃ কর্ণেল সুধীন্দ্রনাথ সিংহ এম-বি

মানুষের অন্তরের কথারই অভিব্যক্তি দিয়েছেন কবি তাঁর সুন্দর ভাষায়,

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

'মরলেই রক্ষা পাই'—এ ধরণের আক্ষেপোক্তি মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে; এ সাময়িক অভিমান মাত্র। মরতে কেউ চায় না, না চাওয়াটাই স্বাভাবিক। সুখেদুঃখেভরা এই পৃথিবীর মায়া কাটান সহজ নয়! সেই অনেকবার বলা গল্পের বৃদ্ধাও পারে নাই। জরাজীর্ণ বৃদ্ধা, আপন বলতে তার কেউ ছিল না। অসীম তার দারিদ্র্য, অফুরন্ত তার দুঃখ। দুঃখ কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে একদিন সে যমরাজের উদ্দেশে বললে, প্রভু, কত লোককে তুমি টেনে নাও অকালে, এ হতভাগিনীর কি যাবার সময় হবে না। প্রভুর দয়া হ'ল। তিনি এসে হাজির বৃদ্ধার সামনে। হঠাৎ তাঁকে সামনে দেখে বৃদ্ধা ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পড়লো। বাক্‌শক্তি তার আড়ষ্ট হয়ে গেল। কোন রকমে বললে, প্রভু, আপনি কে? যমরাজ বললেন, আমি মৃত্যুর দেশের অধিপতি। তোমার কষ্টে আমার আসন টলছে, তাই তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলাম না। চল, তোমাকে নিয়ে যাই আমার পুরীতে। এ কথা শুনে বৃদ্ধা গেল বেজায় ঘাবড়ে। সে তো ভাবতেই পারে নি যে শুধু তার মুখের কথা শুনে যমরাজ এমন কাজ ক'রে বসবেন। তার মনের কথা তবে কি তিনি শুনতে পান নি! যমরাজকে প্রণাম ক'রে সে বললে, প্রভু, আপনাকে ডেকেছিলাম, সত্যি। তবে, সে কেবল এই ঘাসের বোঝাটা আমার মাথায় তুলে দেবার জন্য।

সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম দেহ নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে এ সুন্দর ভুবনের আনন্দ প্রাণভরে উপভোগের আকাঙ্ক্ষা কার না হয়? জরাগ্রস্ত না হ'য়ে, আস্তে আস্তে বার্দ্ধক্যে পৌঁছান যায় এমন কোন ব্যবস্থা কি আছে? এ প্রবন্ধের বক্তব্যই এ প্রশ্নের জবাব।

রোদের দেশের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত যে পাশ্চাত্য-দেশবাসীরা—যাদের দেশে দিনগুলি সূর্য্যের আলোয় তেমন উদ্ভাসিত থাকে না—রোদ লাগিয়ে নিজেদের সাদা ত্বক 'রঙ্গীণ' করবার জন্য রোদে শুয়ে বসে থাকে খালি গায়ে। নিয়মিতভাবে না পারলেও কাজের ফাঁকে তারা গায়ে একটু রোদ লাগিয়ে নেয়। ছুটীর দিনে দলে দলে ছেলে, মেয়ে, বুড়ো চলে যায় যেখানে খোলা গায়ে রোদ লাগানোর সুবিধা এবং সুযোগ আছে। ছোট একটি ফরাসী মেয়ের কথা মনে পড়ে। তার মা বাবার সঙ্গে সে তার বোনকে দেখতে আসে লেজাঁতে (সুইজারল্যাণ্ড)। হাড়ের টিউবারকিউলোসিস্ হওয়ায় সে মেয়েটার সূর্য্যরশ্মি চিকিৎসা হচ্ছিল ডাক্তার রোলিয়ার অধীনে। এই ফরাসী পরিবার আমাদের হোটেলে ছিলেন। ছোট মেয়েটা ভারি মিশুক ছিল। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে—কি উপায়ে (অর্থাৎ, কোন্ বিশেষ 'মলম' বা 'লোসন' লাগিয়ে) আমার ত্বকের এমন সুন্দর রং করেছি। সে চায় তার ত্বকের রং এমনি হয়। এটা আমার স্বাভাবিক রং—ছোট মেয়েটী কিছুতেই বিশ্বাস করলেনা। রুমাল দিয়ে সে আমার হাত ঘসতে লাগলো—রংটা উঠে না কৃত্রিম দেখবার জন্য। বয়স তার তখন ৭-৮ বছর মাত্র। পাশ্চাত্যদেশের অধিবাসী—যারা গ্রাম-প্রধান দেশে বাস করেন, খালি গায়ে রোদ লাগানোর সুযোগ তারা ছাড়েন না। বিশেষতঃ, ছোটদের সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম তারা হ'তে দেন না। 'রঙ্গীণ' হওয়ার জন্য এদের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর প্রচেষ্টার মূলে আছে সেই স্বাভাবিক আকর্ষণ—যার দারুণ জন্ম থেকেই মানুষ চায় সূর্য্যরশ্মির পরশ, চায় না অন্ধকার।

সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগের পূর্বে

নিয়মিত রৌদ্র-স্নানে শরীর সুস্থ, সবল ও শ্রী-সম্পন্ন হয়; মন প্রফুল্ল থাকে; কোন ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে না, আক্রান্ত হ'লেও শরীর সে আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে পারে। সৃষ্টির গোড়া থেকেই মানুষের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই যুগের পর যুগ ধরে চলে এসেছে

সূর্য্যের উপাসনা। অতীতের নিদর্শন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বৈদিক-যুগে জীবনের মূলাধার, পরিপোষক ও সর্ব্বপাপনাশকরূপে সূর্য্যকে পূজা করা হ'ত। মহাভারতে সূর্য্যকে জগতের চক্ষু, সমস্ত প্রাণীর আত্মা, সকল প্রাণীর কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সূর্য্যই সমস্ত জগতকে ধারণ ও পালন করেন। তিনিই সমস্ত জগৎ প্রকাশ করছেন ও পবিত্র রাখেন, এরূপ উল্লেখ মহাভারতে আছে। সূর্য্যের বহু নামের প্রত্যেকটী তার কোন না কোন বিশেষ গুণের পরিচায়ক। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের (Herodotus) লিখিত বিবরণীতে জানা যায় যে মাথার চুল খুব ছোট ক'রে কাটতেন বলে (তখনকার) মিশরবাসীদের মাথায় বেশী রোদ লেগে তাদের মাথার হাড় খুব মজবুত হত। পক্ষান্তরে, অধিকাংশ সময় মাথায় টুপি ব্যবহারের ফলে (তৎকালীন) পারসিকদের মাথায় রোদ না লাগার দরুণ তাদের

সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগের পরে

মাথার হাড় তেমন শক্ত হ'য়ে উঠতো না। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি-প্রবর্ত্তক হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates) খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ শত বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর রোগীদের সূর্য্যরশ্মি দিয়ে চিকিৎসা করতেন। নানা জাতির ক্ষত এবং ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেওয়ার জন্য সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগের কথা তিনি বিশেষ ক'রে উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন চার শত বছর পরে অরিবেসিয়াস্ (Oribasius) নামক গ্রীসদেশীয় অপর এক চিকিৎসক লিখে গেছেন যে শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য—বিশেষতঃ মাংসপেশীর পুষ্টির জন্য—নিয়মিত সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগ করতেই হবে। ইনি সম্রাট জুলিয়ানের (Emperor Julion) চিকিৎসক ছিলেন। সূর্য্যস্নানের সুবিধার জন্য তৎকালে পাশ্চাত্যে, প্রধানতঃ গ্রীসে ও রোমে, প্রত্যেক বসতবাটীর ছাদ-সংলগ্ন সৌর-স্নান-মঞ্চের চিহ্ন সেই নগরীর ধ্বংসাবশেষে এখনও দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সূর্য্যরশ্মির রোগ-নিবারক ও রোগ-নাশক শক্তির উল্লেখ আছে এবং বিভিন্ন রোগে সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগের নির্দ্দেশও আছে।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্ম্মের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গ্লানিকর বিবেচনায় পৌত্তলিকতা সংশ্লিষ্ট অনেক আচার ব্যবহার ও বিধিব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা হয়। সেই সঙ্গে সৌর-স্নান বিধিও নিষিদ্ধ হয়। মানুষের পরম সৌভাগ্য এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই এবং সূর্য্যস্নানের পুনঃ প্রচলন হয়।

অতি প্রাচীন কালের কথা ছেড়ে গত এক শত বছরের স্বাস্থ্যবিধির ক্রমোবিকাশের আলোচনায় দেখা যায়, মানুষের শরীরের উপর সূর্য্য-রশ্মির প্রভাব নির্দ্ধারণের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বহু গবেষণা চলে। তা' থেকে জানা যায় যে নিয়মিত সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে জীবনী-শক্তি উদ্দীপিত হ'য়ে মানুষকে স্বাস্থ্যবান্ ও কর্ম্মতৎপর করে। তাই, পাশ্চাত্যে সূর্য্যরশ্মির উপকারিতা সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নেই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সৌরস্নান সে দেশে ক্রমশঃ অধিকতর জনপ্রিয় হচ্ছে। বিশেষতঃ, শিশুমঙ্গল প্রচেষ্টায় সৌরস্নান অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রক্রিয়ার উপর সূর্য্যরশ্মির প্রভাব জানা থাকলে সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে কেমন ক'রে স্বাস্থ্য ভাল হয় তা' সহজে বোঝা যাবে। তাই বিভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে, প্রত্যেকটী কিভাবে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তা' এ প্রবন্ধে বলা হবে।

আমাদের শরীরের বহিরাবরণ ত্বকে এসে লাগে সূর্য্যকিরণের প্রথম ছোঁয়া। তারপর বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তনের পর রশ্মির প্রভাব শরীরে শোষিত হয়। সেই প্রভাবে দেহ-যন্ত্র কর্ম্মতৎপর হ'য়ে উঠে। ত্বক আমাদের শরীরের এক প্রধান ও অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। একে শরীর-দুর্গের প্রথম ও প্রধান তোরণ বলা চলে। কিন্তু বহিরাবরণ হিসাবে শরীর রক্ষা করা এর একমাত্র কাজ মনে করলে ভুল হবে। এর দায়িত্ব অনেক। সূর্য্যরশ্মির দুর্নিবার শক্তিকে সংযত করে তাকে শরীরের গ্রহণোপযোগী ক'রে দেওয়া ত্বকের প্রধান এক দায়িত্ব। ত্বকে সূর্য্যরশ্মির এ রূপান্তরের ব্যবস্থা না থাকলে সূর্য্যের রুদ্রতেজে মানুষের বাঁচা অসম্ভব ছিল। প্রধানতঃ এই কারণে এবং অন্য কারণেও বটে, ত্বকের উপর সমস্ত দেহের মঙ্গল নির্ভর করে। ত্বকের বিভিন্ন কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল।

শরীর রক্ষা

সর্ব্বপ্রকার নৈসর্গিক, রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক আঘাত এবং বীজাণুর আক্রমণ থেকে ত্বক শরীর রক্ষা করে। শরীরের কোন কোন অংশ নিয়ত কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আসে। সেখানকার ত্বক পুরু হয়—যেমন হাতের তালু, পায়ের তলা। সুস্থ ত্বক ভেদ ক'রে জলীয় পদার্থ বা গ্যাস

[illegible]

বর্ণকণিকা আছে যার দরুণ ত্বকের রং হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীদের ত্বকে বর্ণকণিকার প্রাচুর্য্য, তাই তারা 'রঙীণ'। শীতের দেশের অধিবাসীদের ত্বকে বর্ণকণিকা কম এবং ত্বকের বিশেষ কোন রং নাই; তাই, তারা 'সাদা'। নিয়মিত রোদ লাগলে এদেরও ত্বকে বর্ণকণিকার প্রাচুর্য্য হ'য়ে রঙের পোঁচ লাগে। রোদের প্রখর তেজ থেকে শরীর রক্ষা করার শক্তি বর্ণকণিকার আছে। এই শক্তি প্রধানতঃ তিন-ভাবে কাজ করে।

(১) অসংগত ও অনিষ্টকারক রশ্মি শরীরে প্রবেশ করতে না দেওয়া।

(২) যে আলোকরশ্মি শরীরে শোষিত হয়, তাকে শরীরের প্রয়োজনে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা।

(৩) আলোকশক্তিকে এমন এক বিশেষ শক্তিতে রূপান্তরিত করা— যা' দেহের প্রতিরোধ শক্তির পরিপোষক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে।

রেচন-ক্রিয়া

বিভিন্ন দৈহিক প্রক্রিয়ায় এমন কতগুলি আনুষঙ্গিক পদার্থ উৎপন্ন হয় যেগুলির নিয়মিত নিষ্কাশণ না হ'লে শরীরের অনিষ্ট হয়। আমরা

সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগের পূর্বে

যে খাদ্য খাই তা' শরীরের ভিতর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হ'য়ে পুষ্টিতে পরিণত হওয়ার পর খাদ্যের অশোষিত এবং অব্যবহার্য্য উপাদানগুলি শরীরের ভিতর জমতে দিলে তারা শরীরে বিষ-ক্রিয়া সুরু করে। শরীর থেকে এ ধরণের পদার্থ নিষ্কাশণের যে সু-ব্যবস্থা আছে তা'তে ত্বক প্রধান এক অংশ গ্রহণ করে। ঘামের সাথে বহু অনিষ্টকারক পদার্থ শরীর থেকে নির্গত হয়। শরীরে অন্যান্য রেচন-যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত বা কোন কারণে তাদের কর্ম্মশক্তি মন্থর হ'লে ত্বকের রেচন-ক্রিয়া উদ্দীপিত হয় বা ক'রে দিতে হয়।

তাপ-নিয়ন্ত্রণ

নির্দ্দিষ্ট মাত্রার তাপ আমাদের শরীরকে সর্ব্বক্ষণ উষ্ণ রাখে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ তাপের তারতম্য হয় না এবং সুস্থ শরীরের স্বাভাবিক কর্ম্মদক্ষতা বজায় রাখার জন্য এই পরিমাণ উষ্ণতাই বাঞ্ছনীয়। আবহাওয়া-ভেদে শরীরের তাপের মাত্রার তারতম্য হয় না বলেই মানুষ বরফের দেশের ঠাণ্ডায় বা মরুভূমির গরমে বেঁচে থাকে। শরীরের তাপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত। এ ব্যবস্থায় যে সব অঙ্গ অংশ গ্রহণ করে ত্বক তাদের অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে, ত্বকের দক্ষতার উপর এ ব্যবস্থার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। তাপ বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন ত্বকই প্রথম অনুভব করে। সেই অনুভূতি চলে যায় তাপনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে, এবং কেন্দ্রের নির্দ্দেশে তাপ উৎপাদন প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভিটামিন-ডি তৈরী

শরীরের (বিশেষতঃ হাড় ও দাঁতের) বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য চাই ক্যালসিয়াম (Calcium) ও ফসফরাস (Phosphorus)। খাদ্য থেকে দেহ তা' পায়। কিন্তু শরীরে প্রয়োজনানুযায়ী ভিটামিন-ডি (Vitamin-D) না থাকলে শরীর ক্যালসিয়াম বা ফসফরাস গ্রহণ

সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগের পরে

করতে বা কাজে লাগাতে পারে না। সাধারণতঃ দুই বিভিন্ন উপায়ে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, খাদ্য থেকে এবং সূর্য্যকিরণের প্রভাবে ত্বক থেকে। ভিটামিন-ডি অনেক খাদ্যেই থাকে না। কাজেই ত্বক থেকে পাওয়ার ব্যবস্থাই সহজ সুলভ এবং এ উৎস নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়ার আশঙ্কা নাই।

অনুভূতি

শরীরের বাইরে নিয়ত এমন সব ব্যাপার ঘটছে যার উপর শরীরের ভাল মন্দ নির্ভর করে। এই সব ঘটনা অনুভব ক'রে শরীরকে তদনুসারে চলবার যোগ্যতা দেওয়ার জন্য আমাদের শরীরে এমন এক যন্ত্র-কৌশল আছে যা'তে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে বাইরের জগতের ক্ষুদ্রতম পরিবর্ত্তনও এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সে তত্ত্ব চলে যায় দেহ-পরিচালক কেন্দ্রে যথোপযোগী ব্যবস্থার জন্য। এই যন্ত্র-কৌশলের বনিয়াদ শরীরের ত্বক। যে অসংখ্য স্নায়ুতন্তু বহুধা বিভক্ত হ'য়ে ত্বকে ছড়িয়ে আছে তারাই এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে। এরূপ ব্যবস্থা না থাকলে বাঁচা অসম্ভব ছিল। বলতে গেলে ত্বকই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

আবেগের অভিব্যক্তি

অনেক ক্ষেত্রে আবেগের ছাপ পড়ে ত্বকে। ভয় পেলে মুখ ফ্যাকাশে হয়; লজ্জায় মুখ লাল হয়, কপাল ঘেমে উঠে। মেয়েদের কারো কারো মুখ এবং বুকের উপরিভাগ রক্তিমাভা ধারণ করে লজ্জার আধিক্যে। অপরিচিত বা একাধিক লোকের সাথে আলাপ করতে হ'লে কারো কারো মুখ লাল হয়, কপাল এবং ঘাড় ঘামে ভিজে যায়। মনে তীব্র আবেগের সৃষ্টি হ'লে ব্যাধির আকারে তার অভিব্যক্তি হয় ত্বকে—এমনও দেখা যায়।

শোষণ

ঘসে দিলে তৈলাক্ত বা স্নেহজাতীয় পদার্থ শুষে নেওয়ার ক্ষমতা ত্বকের আছে। প্রয়োজন মত ঔষধ বা খাদ্য এ উপায়ে দেওয়া হয়।

সিবাম ক্ষরণ

ত্বকের সিবাম গ্রন্থি (Sabaceous gland) থেকে সিবাম ক্ষরিত হ'য়ে রুক্ষতা দূর ক'রে ত্বক মসৃণ রাখে।

মুক্ত সূর্য্যালোকে ব্যায়াম

জল এবং চর্ব্বি সঞ্চয়

জল এবং চর্ব্বি ত্বকে সঞ্চিত হয়। শরীরের অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজন মত এখান থেকে যায়।

দেহের উপর সূর্য্যরশ্মির প্রভাব

ত্বক—পরিমিত ও নিয়মিত সূর্য্যরশ্মি সংস্পর্শে ত্বকের যাবতীয় স্বাভাবিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, স্থিতি-স্থাপকতা বাড়ে: জীর্ণ এবং অসুস্থ ত্বক অল্প দিনেই সুস্থ, সবল হয়ে উঠে। বর্ণকণিকা বৃদ্ধি পে'য়ে ত্বকের রং গাঢ়তর হয়; ত্বক মসৃণ ও শ্রী-সম্পন্ন হয়। ত্বকের বীজাণু-নাশক শক্তি উদ্দীপিত হয়; ঠাণ্ডা এবং গরম-সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ে; ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়ে রক্তের সাথে শরীরের ভিতরে চলে যায়।

রক্ত

আমাদের শরীরে রক্ত আছে, কেটে গেলে রক্ত বেরোয় এবং রক্তের রক্ত সম্বন্ধে দু'একটা কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রক্তের উপাদান—প্রধানতঃ—

(১) রক্তরস (blood plasma)—ফিকে হলদে রংয়ের তরল পদার্থ।

(২) লোহিত এবং শ্বেতচক্রিকা (red and white corpuscles)—রক্তরসে ভেসে বেড়ায়। শ্বেতচক্রিকা আকারে বড়, কিন্তু লোহিত-চক্রিকা সংখ্যায় অনেক বেশী।

(৩) হিমোগ্লোবিন (haemoglobin)—যার দরুণ রক্তের রং লাল; লোহিতচক্রিকায় থাকে।

(৪) অনুচক্রিকা (platelets)—আকারে লোহিতচক্রিকার চেয়েও ছোট; সাধারণতঃ গুচ্ছাকারে রক্তরসে ভেসে বেড়ায়।

রক্তের প্রয়োজনীয়তা—

(১) শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি (nutrition) আসে খাদ্য থেকে, এবং রক্তের সাথে মিশে শরীরের সর্ব্বত্র পরিবেশিত হয়।

(২) শরীরের তাপের সমতা ও মাত্রা রক্ষার ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে। রক্তই তাপ বহন ক'রে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত করে। শরীরের তাপ বেশী হলে ত্বকের রক্ত শিরার প্রসারণ হয়ে রক্ত চলাচল বেশী হয় এবং ভিতর থেকে রক্তের সাথে তাপ ত্বকে এসে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় বিকীর্ণ হয়।

(৩) লোহিতচক্রিকার হিমোগ্লোবিন ফুসফুস্ থেকে অক্সিজেন (oxygen) সংগ্রহ ক'রে সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত করে। বিভিন্ন দৈহিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্‌বন্ ডায়ক্সাইড্ (corbon dioxide) ও অন্যান্য অনেক দূষিত পদার্থ রক্তের সাথে রেচন-যন্ত্রে আসে এবং সেখান থেকে নিষ্কাষিত হয়।

(৪) অন্তর্গ্রন্থির (endocrine gland) ক্ষরণ সরাসরি রক্তের সাথে মিশে দৈহিক ক্রিয়া প্রভাবান্বিত করে।

(৫) রোগবীজাণু ধ্বংস করার ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ রক্ত-রসে থাকায় কোন বীজাণু বা বীজাণু-জাত বিষ রক্তে সক্রিয় থাকতে পারে না। শত্রুনিধন শ্বেতচক্রিকার বিশেষ কাজ। অনুচক্রিকাও এ কাজে যোগ দেয়, যদিও রক্ত জমাট বাঁধার জন্য (blood coagulation) এদের প্রধানতঃ প্রয়োজন।

নিয়মিত সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে রক্তের লোহিত ও শ্বেতচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; রক্তের স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তি এবং বীজাণু-ধ্বংসী শক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু রোদের মাত্রা বেশী হ'লে বীজাণুনাশ করার ক্ষমতা কমে যায়।

রোদের সংস্পর্শে রক্তসংবহ শিরা (vein) এবং ধমনীর (artery) প্রসারণ (dilatation) হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে শরীরের যে অংশে নিয়ত রোদ লাগে সেখানকার ত্বকে রক্তশিরার আধিক্য এবং শিরাগুলি প্রসারিত এবং সেখানে রক্ত চলাচলও বেশী। বেশী রক্ত চলাচলের ফলে এসব অংশের ত্বক পুষ্ট ও সবল। ত্বকের রক্ত শিরা ও

এবং রক্ত চলাচল সহজ হয়। রক্ত-সংবহন ক্ষিপ্রতর হওয়ায় ভিতরের যন্ত্রগুলি অত্যধিক রক্তের চাপ থেকে মুক্তি পায়, তাদের কর্ম্মশক্তি আবার সহজ ও স্বাভাবিক হয়। সূর্য্যকিরণের এই অপ্রত্যক্ষ (derivative) প্রভাব নানা প্রকার ঘাপা রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

মাংসপেশী

নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে মাংসপেশীর বিস্ময়কর পুষ্টি হয়। দুর্ব্বল ও ক্ষীয়মান্ পেশী আবার সুস্থ, সবল ও পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। সূর্য্যরশ্মি চিকিৎসাধীন দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী রোগীদের মাংসপেশীর ক্রমোন্নতি দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ হয়। এত সহজে ও অল্প সময়ে এমন আশাতীত উপকার অন্য কোন রকমে সম্ভব নয়। দেড় হাজার বছর আগে গ্রীসের ডাক্তার অরিবেসিয়াসের অভিমত কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত ছিল না।

হাড় (ও দাঁত)

বিভিন্ন আকৃতির কিঞ্চিদধিক দুশো হাড়ের সমন্বয়ে গড়া কাঠামোর উপর শরীরের ভারবহন, স্বাভাবিক আকৃতি ও গঠন-সামঞ্জস্য রক্ষা করার দায়িত্ব। ক্যালসিয়াম হাড়ের প্রধান উপাদান, তাই হাড় শক্ত। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় শক্ত হ'তে পারে না, শরীরের ভারে বিকৃত আকার ধারণ করে এবং সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে যেতে পারে। এর অভাবে দাঁত অপুষ্ট থাকে, ক্ষত হ'য়ে ক্ষ'য়ে যায়। ত্বকে নিয়মিত রোদ লাগলে ক্যালসিয়ামের অভাব জনিত ব্যাধির আশঙ্কা থাকে না। ত্বকে ভিটামিন ডি উৎপন্ন হয় এবং তাই শরীর ক্যালসিয়াম শোষণ করে কাজে লাগাতে পারে।

স্নায়ু-মণ্ডল

স্নায়ুমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ব্যতিরেকে মানুষের শরীর এবং মনের সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মধারায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। স্নায়ুর শক্তি বা কর্ম্মতৎপরতা সামান্য মাত্রও ক্ষুণ্ণ হ'লে শরীর নিসাড় ও অশক্ত হ'য়ে পড়ে। নিয়মিত ও পরিমিত সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে স্নায়ুমণ্ডলী উদ্দীপিত হয়, তার স্বাভাবিক কর্ম্মতৎপরতা ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মন আবার স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে থাকে।

অণ্ডগ্রন্থি (Endocrine Gland)

মানুষের শরীরে এমন কতকগুলি গ্রন্থি আছে—পিটুইটারী, থাইরয়ড্, সুপ্রারিণাল্, গোনাদ ইত্যাদি—যাদের অন্তঃক্ষরণ হয়, কিন্তু ব'য়ে নিয়ে যাবার নালি (duct) নাই। এদের বলা হয় অণ্ডগ্রন্থি। প্রত্যেক অণ্ডগ্রন্থির নিজস্ব বিশিষ্ট ক্ষরণ আছে। ক্ষরণ সরাসরি রক্তের সাথে মিশে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং যাবতীয় দৈহিক প্রক্রিয়া প্রভাবান্বিত করে। বশেষতঃ, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও প্রজনন—শরীরের এই তিন প্রধান প্রক্রিয়ার উপর এদের বেশী প্রভাব। দেহের ও মনের পূর্ণ পরিণতি একান্ত নির্ভর করে এদের ক্ষরণের উপর। সবগুলি গ্রন্থির ক্ষরণের সমন্বয়ে দেহের ও মনের স্বাভাবিক গঠনসামঞ্জস্য, কর্ম্মক্ষমতা ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এক বা একাধিক গ্রন্থির ক্ষরণের অল্পতা বা আধিক্যে দেহে ও মনে পরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে—নিয়মিত সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে নিষ্ক্রিয় গ্রন্থি সক্রিয় হয় এবং বিকৃত গ্রন্থি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

মেটাবলিজম্—(পুষ্টি ও দেহ চালকশক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া)

শরীর অবিরাম কাজ করছে; ঘুমন্ত অবস্থায়ও কাজ বন্ধ থাকে না। রক্তসংবহন (circulation of blood), শ্বাস (respiration), পরিপাক (digestion) প্রভৃতি প্রক্রিয়া—যা' বন্ধ হ'লে জীবনান্ত হয়—সর্ব্বক্ষণ চলে। এই সব কাজের শক্তি আসে খাদ্য থেকে। শরীরের ভিতর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয় পুষ্টি বা শরীরের ক্ষয়পূরণের উপাদান এবং দেহ চালক শক্তি। প্রক্রিয়াকে মেটাবলিজম্ বলা হয়। এ প্রক্রিয়া ঠিক ভাবে না চললে শরীর পুষ্টি পায় না, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়। শরীরে নিয়মিত সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে মন্থর মেটাবলিজম প্রবুদ্ধ হয়; শরীর আবার ঠিক মত পুষ্টি পেয়ে সুস্থ হয়।

মুক্ত সূর্য্যালোকে শীর্ণানন্দ

পুষ্টি ও সূর্য্যরশ্মি
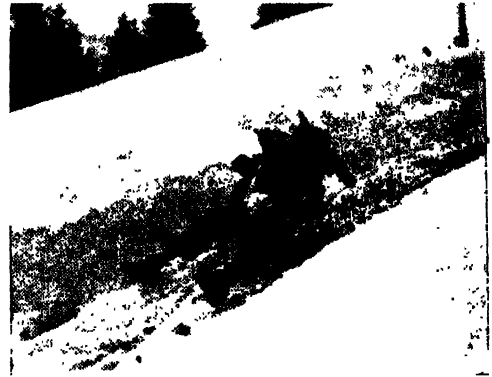
অনাহার বা অল্পাহার আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকের নিত্যসাথী। অপুষ্ট দেহে প্রতিরোধ-শক্তির (resistance) অভাব। খাদ্যাভাব-জনিত ও অন্যান্য ব্যাধি অতি দ্রুত দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। দেহতত্ত্ববিদরা বলেন সূর্য্যরশ্মির অভাবে শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, কর্ম্মশক্তি মন্থর হয় এবং ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি কমে আসে। এ অবস্থা কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে সুনির্ব্বাচিত পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে দিয়ে গেলে। কারণ, খাদ্য থেকে সূর্য্যরশ্মিজাত শক্তি আহরণ করে শরীর সূর্য্যরশ্মির অভাব কিয়ৎপরিমাণে পূরণ করে। তাঁরা আরো বলেন যে আহার্য্যের অভাবে দেহের যে ক্ষতি হয় বা হওয়ার আশঙ্কা থাকে তা' দূরে রাখা সম্ভবপর শরীরে নিয়মিত রোদ লাগিয়ে। অর্থাৎ, খাদ্যাভাব সত্ত্বেও শরীর অশক্ত হবে না যদি নিয়মিত রোদ পায়। খাদ্যাভাব পূরণের

শক্তি সূর্য্যরশ্মির নিশ্চয়ই আছে, নতুবা আমাদের নিরন্ন দেশে মৃত্যুর হার আরো বেড়ে যেত নিঃসন্দেহে।

সূর্য্যরশ্মি ও প্রজনন শক্তি (Reproduction)

বৈজ্ঞানিকদের মতে মানুষ ও ইতর প্রাণীর প্রজনন শক্তি হ্রাস পায় সূর্য্যরশ্মি থেকে বেশী দিন বঞ্চিত থাকলে। কথিত আছে, মেরুদেশের এস্কিমো (Eskimo) রমণীরা সে দেশের শীতকালে—যখন মাসের পর মাস সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না—সাধারণতঃ ঋতুমতী হন না। তাদের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ফিরে আসে শীত অন্তে রোদের আবির্ভাবের সঙ্গে। হাঁস, মুরগী প্রভৃতি বেশী ডিম প্রসব করে যদি তারা নিয়মিত রোদের পরশ পায়। যে সব গরু, মহিষ নিয়মিত রোদ পায় তাদের দুধের পরিমাণ বেড়ে যায়।

মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সুস্থ, কর্ম্মক্ষম দেহ—মানুষ মাত্রেরই কাম্য। কিন্তু, আকাঙ্ক্ষা থাকলেই স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় না। তার জন্য চাই চেষ্টা ও যত্ন। শরীরের সব অঙ্গেরই সুনির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, যার সুচারু সম্পাদনের উপর নির্ভর করে স্বাস্থ্য। কিন্তু, শুধু অঙ্গ বিশেষের উপর নির্ভর করে শরীর চলতে পারে না। ত্বক ও অন্যান্য অঙ্গের কাজের সমন্বয়ে এবং সম্মিলিত প্রভাবে চলে মানুষের শরীর। এ প্রবন্ধে ত্বক সম্বন্ধে যা' বলা হয়েছে তাতে প্রতীয়মান্ হবে যে ত্বক সুস্থ ও সবল না থাকলে শরীর সুস্থ থাকতে পারে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী হ'য়েও যে ধরণের পোষাক পরিচ্ছদে শরীর ঢেকে রেখে আলোবাতাসের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি, সেটা সম্ভব হয় আমরা ত্বকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে। সভ্যতার দাবী মেটাতে গিয়ে আমাদের অধিকাংশের ত্বক ফ্যাকাশে, নিষ্প্রভ ও কিয়ৎপরিমাণে রক্তশূন্য। বাধ্য হয়েই যে অংশ ঢেকে রাখা যায় না, শুধু সেখানে স্বাস্থ্যের লালিমা চোখে পড়ে। বস্ত্র বাহুল্য থেকে শিশুরাও অব্যাহতি পায় না। জামা কাপড় দিয়ে তাদের ঢেকে রেখে 'সভ্য' ক'রে তোলবার চেষ্টায় তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করা হয়—এ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত শিশুদের এ দুর্গতি দূর হবে না। আমাদের দেশের শিশুদের প্রতি এই অত্যাচারের ছবি বেশী করে চোখের সামনে ভাসতো—যখন দেখতাম শীতের দেশে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খালি গায়ে রোদ লাগাচ্ছে বরফের উপরও।

এ দেশে সূর্য্যের আলোর অপ্রাচুর্য্য নেই। অথচ একে কাজে লাগান হয় না। কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ কৃত্রিম রশ্মি প্রয়োগ সম্বন্ধে উৎসাহের অভাব নাই। খাঁটি দুধ পাওয়া দুষ্কর, তাই আমরা কৃত্রিম দুধ ব্যবহার করি। কিন্তু রোদের বেলা একথা চলে না। তবে, এই দরিদ্র এবং নিরন্ন দেশে স্বাস্থ্যের জন্য সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগ কেন হয় না এ প্রশ্ন মনে জাগে।

দেশের জন-সম্পদ রুগ্ন, জীর্ণ এবং জরাগ্রস্ত। সব কিছুর অন্তরালে, সব কিছু থেকে দূরে সরে থেকে কোন রকমে দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখে নির্দ্ধারিত দিনগুলি কাটিয়ে দেওয়া—এ ছাড়া অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বা আশা ক্ষীয়মান্ ভারতবাসীর মনে জাগেনা। লোকের প্রতিরোধ-শক্তি নাই। ব্যাধির প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, সূতিকা প্রভৃতি রোগ প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নিচ্ছে এবং আরো কত লক্ষ লক্ষ লোককে প্রাণে না মেরে পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য করে রেখে যাচ্ছে। এভাবে চলতে দিলে এ জাতির পরিণাম কি হবে অনুমান করা কঠিন নয়। দেশের নেতারা—জনগণের হিতার্থে যারা নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরো অনেক কিছু উৎসর্গ করে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করবার ব্রত নিয়েছেন—নিশ্চয়ই ভাবছেন কি ভাবে দেশবাসীকে সুস্থ ও সবল ক'রে তোলা যায়। ইতিমধ্যে, অন্য উপায়ে সে কাজ যদি কিছু পরিমাণেও সফল করা যায়, তবে কোন প্রকার বাধা বা আপত্তির প্রশ্রয় না দিয়ে তা' অবলম্বন করতে হবে।

হিন্দু প্রাণি-বিজ্ঞান

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম-এস্-সি

অনেকের ধারণা, প্রাণিবিজ্ঞান একটী অতি আধুনিক শাস্ত্র ও প্রধানতঃ য়ুরোপীয়গণই ইহার উদ্ভোক্তা। প্রাণিজগতের সম্যক্ ও ধারাবাহিক পর্য্যালোচনা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাই অনেকের মত। কিন্তু ইহা ভুল। আমাদের দেশের মনীষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জীবগণের রীতি-নীতি, স্বভাব, গঠন, জননক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তানপালন প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য করিয়া নানা সংস্কৃত গ্রন্থে, নানা কথাচ্ছলে তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, জীবগণের বিভিন্নরূপ শ্রেণীবিভাগও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন; জীবগণের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে ভুলেন নাই। তাহার পর জীব-বিজ্ঞান ও ... সম্বন্ধেও তাঁহারা একটা নির্দ্দেশ ধারণা রাখিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যেরূপ ধারাবাহিকভাবে শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে সত্য সত্যই অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, ভাগবত, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য প্রভৃতি বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থে আমরা বহু প্রাণিবিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। কথা ও উপমাচ্ছলে শ্লোকগুলির অবতারণা করা হইলেও উহা হইতে আমরা বহু মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পাই। এই বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি সঙ্কলন করিয়া একত্রিত করিলে উহাই একটী সুচিন্তিত প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থে পরিণত হইতে পারে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের দেশে পূর্ব্বে কথা

প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া কোন পুস্তক ছিল কি না? কে বলিতে পারে যে, ছিল না? পূর্ব্বেকার কয়খানি পুস্তকই বা আমরা পাইয়া থাকি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবশতঃ অনেক প্রাচীন পুস্তকই গ্রন্থকীটের উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া বৈদেশিক আক্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিতে কত পুরাতন হিন্দু ও বৌদ্ধ পুস্তকাগার যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া প্রয়োজনের সময় নিছক ধর্ম্ম ও দর্শনমূলক গ্রন্থাদি ছাড়া অন্যান্যবিষয়ক পুস্তকগুলির রক্ষাকল্পে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ তত সচেষ্ট হন নাই। ফলে দর্শন ও ধর্ম্মপুস্তকগুলির ন্যায় বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি, বিপর্য্যয়ের মধ্যে প্রায়ই রক্ষা পায় নাই। কয়েকখানি চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়া প্রায় সমুদয় ইতিহাস, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক রক্ষা পায় নাই। যে দুই একখানি আমরা এখন পাইয়া থাকি, তাহাদের "বিষয়ের" সমধিক উৎকর্ষ হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, বহুকাল হইতেই ঐ বিষয়গুলি এদেশে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল এবং এ সম্বন্ধে বহুবিধ পুস্তক সে যুগে প্রচলিত ছিল। কিরূপ প্রচেষ্টাদ্বারা চরক ও সুশ্রুত আদি পুস্তকগুলি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সে যুগে বৃদ্ধ চিকিৎসকগণ মৃত্যুকালে "অমুক বৃক্ষের তলদেশে তাম্রপেটিকায় আয়ুর্ব্বেদপুস্তকাদি প্রোথিত আছে" বলিয়া তাঁহাদের সন্ততিদিগকে নির্দ্দেশ দিয়া যাইতেন। রাজ্যবিপ্লবের পর সন্ততিগণ সেই নির্দ্দেশ বা উইল অনুযায়ী পিতা বা পিতামহের মৃত্যুর বহু বৎসর পর সেই সকল পুস্তক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইত। এইরূপ প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় ধর্ম্ম, দর্শন ও চিকিৎসা-পুস্তকগুলিই রক্ষিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি ধর্ম্ম ও দর্শনপুস্তকাদির তুলনায় সে যুগে অল্পপ্রয়োজন বিধায় এই ভাবে রক্ষিত হয় নাই।

অনেক তথ্য বা জ্ঞান আবার এদেশে শ্রুতি বা স্মৃতি দ্বারা শিষ্যপরম্পরায় রক্ষিত হইত। কদাচিৎ উহা লিপিবদ্ধ হইত। অধুনাপ্রাপ্ত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে কথাচ্ছলে প্রাণিবিষয়ক তথ্যের উল্লেখ দেখা যায়, কে বলিতে পারে যে তাহা কোনও একখানি সুলিখিত তৎকালীন প্রাণিবিজ্ঞানপুস্তক হইতে গৃহীত হয় নাই? বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, ঐ সকল শ্লোক কোনও একখানি অধুনালুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞানের পুস্তক হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ আমরা অনেক সময় একই প্রাণিবিষয়ক শ্লোক বিভিন্ন পুস্তকগুলির মধ্যে সমভাবেই পাইয়া থাকি। এমন কি, কোনও কোনও শ্লোকে উহাদের ভাষা ও শব্দের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। প্রমাণস্বরূপ মাত্র কয়েকটী তুলনামূলক শ্লোক বিভিন্ন পুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পরাশর উবাচ

তির্য্যক্‌স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্‌যোন্যঃ স উচ্যতে।
ঊর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ সতু মানুষঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫ অঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তির্য্যক্‌স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোন্যঃ স পঞ্চমঃ।
ততোঽর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ॥

—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়

উপরিউক্ত শ্লোক দুইটীতে যে সকল জীব চারিটী পায়ের উপর ভর দিয়া চলে ও তজ্জন্য তির্য্যক গতিতে আহারাদি গ্রহণ করে, তাহাদের তির্য্যক্ জীব বলা হইয়াছে এবং যে সকল জীব সোজা হইয়া চলে ও তাহার ফলে আহারাদি উপর হইতে নিম্নে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অর্ব্বাক্ জীব বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শব্দ দুইটী শ্রেণীবাচক ও বৈজ্ঞানিক শব্দ। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রথম শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণকার পরাশরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ও দ্বিতীয় শ্লোকটী মার্কণ্ডেয় তাঁহার মার্কণ্ডেয়পুরাণে নিজের নামে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, গ্রন্থকারদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তৎকালীন কোনও একখানি পুস্তকবিশেষ হইতে শ্লোক দুইটী নিজ নিজ গ্রন্থে তুলিয়া লইয়াছেন মাত্র। আর দুইটী অনুরূপ শ্লোক উক্ত পুস্তক দুইখানি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

পরাশর উবাচ

গৌরজঃ পুরুষা মেষা অশ্বতরাঃ খরা।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥
শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ।
ঔদকা পশব ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫ অঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

গৌরজো মহিষো মেষঃ অশ্বাশ্বতরগদ্দভাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥
শ্বাপদং দ্বিখুরং হস্তী বানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।
ঔদকা পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ॥

—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়

উপরিউক্ত শ্লোক কয়টী ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকাদি হইতে এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আরও চারিটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে শ্লোক কয়টী লিখিত। উহা পাঠে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার হিন্দুদিগের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। শ্লোক কয়টীতে জলজ জীব হইতে স্থলজ জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। একটী জীব হইতে অপর একটী জীবের উৎপত্তি হইতে কত লক্ষ বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহারও একটা হিসাব দেওয়া আছে। শ্লোককয়টীর রচনা বিভিন্নরূপ হইলেও বক্তব্য বিষয় একই। সময় নির্দ্দেশ ছাড়া প্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্লোক কয়টীতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কথাচ্ছলে বিজ্ঞানের অবতারণা করা হইয়াছে।

চতুরশীতিলক্ষানি চতুর্ভ্ভেদাশ্চ জন্তবঃ।
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ।

একবিংশতিলক্ষানি হ্যণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
স্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাস্তৎপ্রমাণতঃ ॥
জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যাস্তাশ্চ জন্তবঃ।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং মানুষত্বং সুদুর্লভম্ ॥
—গরুড়পুরাণ, ২য় অধ্যায়

জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতি।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যাকা পক্ষিণাং দশলক্ষকম্ ॥
ত্রিংশলক্ষানি পশবশ্চতুর্লক্ষানি মানুষাঃ।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যগাৎ ॥
—নিবন্ধধৃতবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ

স্থাবরাস্ত্রিংশল্লক্ষাশ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
কৃমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ ॥
পশবো বিংশলক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষাশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে ॥ —কর্ম্মবিপাক

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥—বিষ্ণুপুরাণ

এইরূপে পুরাণ ও তৎকালীন বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকাদি পাঠে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় আখ্যানভাগেই উক্তরূপ একার্থক শ্লোক পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাদের ভাষার মধ্যেও প্রায় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির দর্শনসম্বন্ধীয় আখ্যানভাগে ভাষা, অর্থ ও ভাবের প্রচুর প্রভেদ লক্ষিত হয়। দর্শনভাগে তাঁহারা ভিন্নমত হইলেও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকে তাঁহারা এক মতই প্রকাশ করেন; শব্দগুলিও ব্যবহার করেন এক রকমের। তাহার পর ঐ শ্লোকগুলির লিখনভঙ্গি হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ শ্লোকগুলি অধুনালুপ্ত তৎকালীন কোন বিজ্ঞানপুস্তকে প্রচলিত মতবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কতক বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে; কতকগুলি বা হুবহু নকল করিয়া লওয়া হইয়াছে। উপরের "পরিকীর্ত্তিতা" শব্দটী প্রণিধান যোগ্য। তাহার পর ধারাবাহিক ও সুলিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রমাত্রেই কতকগুলি পরিভাষামূলক বা technical বৈজ্ঞানিক শব্দ থাকে। আমাদের তথাকথিত প্রাণিবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোক বা পুস্তকগুলিতেও ঐরূপ বহু শব্দ ব্যবহৃত হইত। জরায়ুজ, অণ্ডজ, রসজ, স্বেদজ, পোতজ, উদ্ভিজ্জ, উদ্ধক, অন্ধক, অর্ব্বাক, গন্ধবেদী, ঔদক, সরীসৃপ, একতোদত, উভয়তোদত, একশফ, দ্বিশফ, পঞ্চনখ, রূপবেদী, শফ, নখ, স্পর্শবেদী, শব্দবেদী, কর্ম্মবেদী, অনস্থিকা, অপাদা, কোশস্থ, চর্ম্মপক্ষ, নূপুরক, খড়্গা, শৃঙ্গী, জঙ্গাল প্রভৃতি শ্রেণীবাচক শব্দগুলি যে প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষামূলক বা technical শব্দ তাহাতে কোন ভুল নাই। ঋগ্‌বেদ হইতে পুরাণ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের গ্রন্থগুলির মধ্যে উক্ত শব্দগুলির সম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে মাত্র কয়েকটী শ্লোকাংশ প্রদত্ত হইল।

যে কে চোভয়তোদতঃ—ঋগ্‌বেদ, পুরুষসূক্ত
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ—শ্রীমদ্ভাগবত
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।—মনুসংহিতা
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ ॥—মনুসংহিতা, ৫ অঃ

উক্ত উদ্ধৃতি কয়টী যথাক্রমে ঋগ্‌বেদ, ভাগবত ও মনুসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। তিনখানি গ্রন্থই বিভিন্ন গ্রন্থকার দ্বারা বিভিন্ন যুগে লিখিত বা সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু তিনখানি গ্রন্থেই আমরা এই 'উভয়তোদত' ও 'একতোদত' শব্দ দুইটি একই অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানে 'একতোদত' অর্থে যে সকল জীবের একবার করিয়া দাঁত উঠে, তাহাদের বুঝায় ও 'উভয়তোদত' অর্থে যে সকল জীবের দুইবার দাঁত উঠে অর্থাৎ দুধ-দাঁত পড়িয়া গিয়া তেলা-দাঁত উঠে, তাহাদিগকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখন এই শব্দ দুইটীর বিভিন্ন গ্রন্থে একই অর্থে উক্তরূপ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, এই দুইটী শব্দ পরিভাষামূলক বৈজ্ঞানিক শব্দরূপেই তৎকালে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এইরূপ বহু বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রাচুর্য্য হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া একখানি পৃথক্ বিজ্ঞানশাস্ত্র হয়ত আমাদের দেশে পুরাকালে প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়া শাস্ত্রকারগণ নিজ শাস্ত্রে প্রাণিসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই "ইতি কথিতঃ" বলিয়া তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করেন। ইহার কারণ, বোধহয় পুরাকালে অপর কোনও গ্রন্থকার বা তাঁহার গ্রন্থের নাম নিজগ্রন্থে উল্লেখ করিবার প্রথা ছিল না। কিংবা হস্তলিখিত পুঁথিগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ও কবিতাগুলির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই এই রীতির প্রচলন ছিল। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পঙ্‌ক্তি কয়টি দাল্‌ভ্য কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি রুরু, কারণ্ডব ও কঙ্কজীব সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, সেই বিবরণ যে কোন একখানি অমুক্তনামা (unnamed) পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা প্রকারান্তরে তিনি বলিয়াই দিয়াছেন। উপরিউক্ত পক্ষী ও হরিণ জীব সম্বন্ধে বিবরণসম্বলিত নিম্নে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টী অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। তবে কোন্ পুস্তক হইতে পঙ্‌ক্তি কয়টী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

"কুলেচরমাহ……রুরুঃ শরদি শৃঙ্গত্যাগী।
তল্লক্ষণং উচ্যতে—বিকটবহুবিষাণঃ শম্বরাকারদেহঃ,
সলিলতটচরিত্বাৎ সরুরেভ্যো বিচিত্রঃ। ত্যজতি
শরদি শৃঙ্গং রৌতি—ইত্যসৌ রুরুঃ স্যাৎ।
কারণ্ডবঃ শুক্লহংসভেদোঽল্লঃ অন্যে কয়হরমাহঃ।
উক্তঞ্চ—কারণ্ডবঃ কাকবক্ত্রো দীর্ঘাঙ্ঘ্রিঃ কৃষ্ণবর্ণভাক্ ইতি।
প্রসহানাহ…কঙ্কঃ দীর্ঘচঞ্চুর্ম্মহাপ্রাণঃ।
উক্তঞ্চ—কঙ্কঃ স্যাৎ কঙ্কমল্লাখ্যো বাণপত্রার্হপক্ষকঃ।
লোহপৃষ্ঠো দীর্ঘপাদঃ পক্ষাধঃ পাণ্ডুবর্ণভাক্ ॥ ইতি (ক্রমশঃ)

(চিত্র-নাট্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

লিলির ড্রয়িং রুমে দাশু ও ফটিক পাশাপাশি সোফায় বসিয়া আছে। লিলি টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া একটি কাচের সোরাই হইতে গেলাসে বরফ-জল ঢালিতেছে। সকলের মুখের ভাব চিন্তাকুল। তাহারা মন্মথর প্রতীক্ষা করিতেছে।

দাশু: (হাতঘড়ি দেখিয়া) সাড়ে বারোটা।—লিলি, তোমার পাখী উড়েছে। সব পণ্ড হল।

লিলি: না, সে আসবে, নিশ্চয় আসবে।—ঐ!

বাড়ীর সদরে মোটর আসিয়া থামার শব্দ হইল। লিলি ছুটিয়া গিয়া দ্বারের কাছে কান পাতিয়া শুনিল, তারপর হাত নাড়িয়া দাশু ও ফটিককে ইসারা করিল। তাহারা ত্বরিতে পাশের ঘরে লুকাইল।

ক্ষণেক পরে মন্মথ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা উস্কখুস্ক, হাত-পা কাঁপিতেছে, চোখে জ্বরগ্রস্তের তীব্র দৃষ্টি। লিলি উদ্ভাসিতমুখে তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল এবং দরজা ভেজাইয়া দিল। মন্মথ সভয়ে চারিদিকে চাহিল।

মন্মথ: এখানে আর কেউ নেই তো!

লিলি: না না, শুধু তুমি আর আমি। তোমার জন্যে একলাটি জেগে ব'সে আছি। জানতাম তুমি আসবে।

মন্মথ সোফার উপর বসিয়া পড়িল।

মন্মথ: কি ক'রে যে এসেছি।—লিলি, চল, এখনি পালিয়ে যাই। আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

লিলি: যাব যাব। কিন্তু কী এনেছ আগে দেখি।

মন্মথ পকেট হইতে সূর্যমণি লইয়া মুঠি খুলিয়া লিলির সম্মুখে ধরিল; ডিম্বাকৃতি সিন্দুরবর্ণ মণি তীব্র আলোক সম্পাতে ঝলমল করিয়া উঠিল। লিলি মণিটি মন্মথর হাত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইয়া দুই চক্ষু দিয়া গিলিতে লাগিল।

সোফার পিছন দিকের দরজা দিয়া দাশু ও ফটিক নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। উভয়ের হাতে পুলিসের রুলের মত একটি করিয়া গেঁটে।

মন্মথ: দেখলে তো? এবার চল—

এই সময় দাশুর গেঁটে তাহার মাথায় পড়িল। মন্মথ একটা অব্যক্ত চিৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ফটিক তাহার মাথায় আর এক ঘা দিল। মন্মথ অজ্ঞান হইয়া সোফার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল।

দাশু: ব্যস, কাম ফতে!

ফটিক: চল এবার কেটে পড়া যাক।

লিলি: দ্যাখো দ্যাখো—কত বড় রুবি!

লিলি দুই আঙুলে সূর্যমণি তুলিয়া ধরিল; দাশু ও ফটিক লুব্ধদৃষ্টি লেহন করিয়া দেখিতে লাগিল।

ফটিক: আর আমাদের খেটে খেতে হবে না।—

দ্বারের নিকট হইতে ব্যঙ্গ-পূর্ণ হাসির শব্দ আসিল। তিনজনে চমকিয়া দেখিল, এক দাড়িওয়ালা শিখ দাঁড়াইয়া হাসিতেছে; তাহার হাতে পিস্তল।

দাশু: কে তুমি? কোন হ্যায়?

দিবাকর: চেহারা দেখে চিনতে পারবে না। তবে নাম শুনেছ বোধ হয়—কানামাছি।

লিলি: কানামাছি!!

তিনজনে দারুভূত মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। দিবাকর দাড়ি গোঁফ টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া উদ্যত পিস্তল হাতে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল। কড়া সুরে বলিল—

দিবাকর: মাথার ওপর হাত তোলো।

তিনজনে বাক্যব্যয় না করিয়া মাথার উপর হাত তুলিল। দিবাকর লিলির হাত হইতে সূর্যমণি লইয়া পকেটে রাখিল।

দিবাকর: (দাশু ও ফটিককে) তোমরা দু'জন সোফায় বোসো। হাত নামিও না। চালাকি করতে গেলে বিপদে পড়বে।

দাশু ও ফটিক ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সোফায় বসিল। মন্মথ অজ্ঞান অবস্থায়

মেঝের পড়িয়াছিল, দিবাকর তাহার প্রতি একবার দৃক্‌পাত করিয়া লিলিকে বলিল—

দিবাকর: তুমি ওর মুখে জলের ছিটে দাও—

জলের গ্লাস দিবাকর লিলিকে দিল ; লিলি যন্ত্রচালিতবৎ মন্মথর মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। দিবাকর তখন তাহাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কোণাচে ভাবে টেলিফোনের দিকে চলিল।

দিবাকর: তোমাদের দিকে আমার নজর আছে। একটু বেচাল দেখলেই গুলি করব।

দিবাকর বাঁ হাতে টেলিফোন তুলিয়া একটা নম্বর দিল। তাহার চক্ষু কিন্তু তিনজনের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

কাট্।

যদুনাথের হলঘর। নন্দা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল নিজের ঘরে প্রতীক্ষা করিয়া আর মনের অস্থিরতা দমন করিতে না পারিয়া চুপি চুপি নীচে নামিয়া আসিতেছে।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। নন্দা ছুটিয়া আসিয়া টেলিফোন তুলিয়া লইল।

নন্দা: হ্যালো—তুমি! কি! কী হয়েছে? দাদার বিপদ! প্রাণের আশঙ্কা!—কোথায়?

টেলিফোনের শব্দে যদুনাথের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল ; তিনি আলুথালু বেশে বাহির হইয়া আসিলেন।

যদুনাথ: নন্দা! তুই এত রাত্রে? কার ফোন?

নন্দা: দাদু, দাদা বিপদে পড়েছে—প্রাণ-সংশয়। (টেলিফোনে) অ্যাঁ, কি ঠিকানা?...আচ্ছা, দাদু আর আমি এখনি যাচ্ছি—

যদুনাথ: কে ফোন করছে?

নন্দা: দিবাকরবাবু।

যদুনাথ: দিবাকর! চল চল, আর দেরী নয়।

কাট্।

লিলির ঘর। দিবাকর টেলিফোন রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। মন্মথর এতক্ষণে জ্ঞান হইয়াছে ; সে মেঝেয় বসিয়া বুদ্ধিভ্রষ্টের মত মাথাটি দক্ষিণে-বামে আন্দোলিত করিতেছে।

দিবাকর: (লিলিকে) তুমিও সোফায় গিয়ে বোসো—ওদের মাঝখানে। হাত তোলো।

লিলি আদেশ পালন করিল। দিবাকর মন্মথকে বাহু ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইল।

মন্মথ: অ্যাঁ—কি?...আমার সূর্যমণি!

দিবাকর: কোথায় সূর্যমণি?

মন্মথ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এদিক ওদিক তাকাইল, লিলির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল।

মন্মথ: ঐ—লিলি! আমার সূর্যমণি নিয়েছে।

লিলি: আমি নিই নি। ঐ যে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে নিয়েছে। ও কে জানেন?—কানামাছি!

ত্রাস-বিকৃতমুখে মন্মথ দিবাকরের পানে তাকাইল।

মন্মথ: অ্যাঁ—কানামাছি! দিবাকর—কানামাছি! তবে আমার কি হবে! সূর্যমণি—আমার যে দু'কূল গেল!

মন্মথ আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দিবাকর মন্মথর বাহু ধরিয়া নাড়া দিল।

দিবাকর: কেঁদো না, মন্মথবাবু, তোমার দাদু এখনি আসছেন।

মন্মথ: দাদু—অ্যাঁ, দাদু আসছেন! তবে আমি এখন কোথায় যাই!

দিবাকর: মন্মথবাবু, পাগলামি কোরো না, তোমার দাদু আর নন্দা দেবী এখনি এসে পড়বেন। শোনো, আমি যা বলছি করো।

মন্মথ: অ্যাঁ—কিন্তু আমি যে—

দিবাকর: (প্রচণ্ড ধমক দিয়া) যা বলছি করো।

মন্মথ: আচ্ছা—কি করব?

দিবাকর: এই পিস্তল নাও। (মন্মথকে পিস্তল দিল) এইবার ওদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াও।—বেশ, ওদের ওপর নজর রাখবে, কেউ একটু নড়লেই তাকে গুলি করবে।

ধমক খাইয়া মন্মথ একটু ধাতস্থ হইয়াছে। সে পিস্তল উঁচাইয়া সোফার পিছনে দাঁড়াইল। দিবাকর তখন দ্রুতপদে দ্বারের কাছে গিয়া শুনিল ; বাহিরে মোটরের শব্দ হইল।

দিবাকর ঘরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল ; তাহার মুখ কঠিন, চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। ফৌজী কাপ্তেনের মত কড়া সুরে সে বলিল—

দিবাকর: ওঁরা এসে পড়েছেন।—যদি প্রাণের মায়া থাকে, তোমরা কেউ একটি কথা বলবে না। যা বলবার আমি বলব।

তাহার হিংস্র চেহারা দেখিয়া কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। দিবাকর আসিয়া সোফার পাশে দাঁড়াইল। দুই হাত ফেলিয়া ...

দাঁড়াইয়া রহিল যেন সেও দাশুদের দলে, মন্মথ পিস্তল দিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিয়াছে।

যদুনাথ প্রবেশ করিলেন ; সঙ্গে নন্দা। ঘরের মধ্যে বিচিত্র পরিস্থিতি দেখিয়া দু'জনেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন—

যদুনাথ : এ কি! মন্মথ!—দিবাকর—!

দিবাকর ছুটিয়া আসিয়া যদুনাথের পায়ের কাছে পড়িল! তাঁহার জানু জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল—

দিবাকর : ক্ষমা করুন—আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অপরাধ করেছি, আপনার সূর্যমণি চুরি করেছি—

যদুনাথ ক্ষণকালের জন্য হতভম্ব হইয়া গেলেন।

যদুনাথ : আমার সূর্যমণি! চুরি করেছ! কোথায় আমার সূর্যমণি?

দিবাকর সূর্যমণি তাঁহার হাতে দিয়া বলিয়া চলিল—

দিবাকর : আমি আর এই তিন জন মিলে (সোফায় উপবিষ্ট তিনজনকে দেখাইল) সূর্যমণি চুরি করবার ষড়যন্ত্র করেছিলাম—আজ রাত্রে আমি সূর্যমণি চুরি ক'রে এখানে নিয়ে আসি—কিন্তু মন্মথবাবু কি ক'রে আমাদের মৎলব জানতে পেরেছিলেন—তিনি এসে আমাদের ধ'রে ফেলেছেন।

মন্মথ অবাক হইয়া শুনিতেছিল এবং দিবাকরের প্ল্যান বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নন্দাও চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু একটা কথাও বিশ্বাস করে নাই। সত্য ঘটনা যে কী তাহা সে কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল।

যদুনাথ বিহ্বলভাবে গিয়া মন্মথকে জড়াইয়া ধরিলেন।

যদুনাথ : মন্মথ, তুই আজ বংশের মুখ রক্ষে করেছিস।—

এদিকে নন্দা ও দিবাকরের কাছে কেহ ছিলনা। নন্দা দিবাকরকে চাপা গলায় বলিল—

নন্দা : কেন মিছে কথা বলছ! তুমি সূর্যমণি চুরি করনি।

দিবাকর : নন্দা, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। তুমি শপথ করেছ আমাকে সাহায্য করবে।

নন্দা : (অধর দংশন করিয়া) কিন্তু—

দিবাকর : সাহায্য করবার এই সময়। ঐ টেলিফোন রয়েছে, যাও, পুলিসে খবর দাও—

নন্দা দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যদুনাথ মন্মথকে ছাড়িয়া দিবাকরের কাছে ফিরিয়া আসিলেন, ক্ষুব্ধ ব্যথিত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

যদুনাথ : দিবাকর, তুমি যে আমার সূর্যমণি চুরি করবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু যখন অপরাধ করেছ তখন তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। বুঝতে পেরেছি তোমার লজ্জা হয়েছে, অনুশোচনা হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করার অধিকার আমার নেই।—মন্মথ, পুলিসে খবর দিতে হবে।

মন্মথ অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। দিবাকর নন্দাকে চোখের ইসারা করিল। নন্দার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু সে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল—

নন্দা : দাদু, আমি পুলিসকে টেলিফোন করছি—

নন্দা ঘরের কোণে গিয়া টেলিফোন তুলিয়া লইল।

ডিজল্‌ভ্।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

যদুনাথের গৃহ। নন্দা নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছে ; তাহার হাঁটুতে মাথা রাখিয়া মন্মথ মেঝের উপর নতজানু হইয়া আছে। নন্দার মুখ রক্তহীন, চোখের কোলে কালো ছায়া।

মন্মথ : (সহসা মুখ তুলিয়া) নন্দা, আমি আর পারছি না। আমি যাই, দাদুকে সত্যি কথা বলি।

নন্দার অধর কাঁপিতে লাগিল।

নন্দা : তাতে কোনও লাভ হবে না। এর ওপর আবার এতবড় ঘা খেলে দাদু বাঁচবেন না। তুমি বুঝতে পারছ না দাদা, শুধু তোমার জন্যে নয়, দাদুকে বাঁচাবার জন্যেও তিনি এই অপরাধের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন।

মন্মথ : কিন্তু কেন? কেন? আমরা তার কে? কি দরকার ছিল আমাদের জন্যে এ কাজ করবার?

নন্দা : হয়তো একদিন বুঝতে পারবে।—তুমি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ আপাততঃ এই যথেষ্ট।

মন্মথ : হ্যাঁ বোন্, আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, আর কখনও ও পথে যাব না।

সে আবার নন্দার হাঁটুতে মাথা রাখিল। নন্দা নীরবে তাহার চুলের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে।

সকালবেলা হল্‌ ঘরের টেবিলের সম্মুখে বসিয়া যদুনাথ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। টেবিলের উপর তাঁহার চা ও প্রাতরাশ রাখা রহিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার মুখ বেদনা-পীড়িত।

সংবাদপত্রে স্থূল শিরোনামায় লেখা রহিয়াছে—

কানামাছির কারাবাস

তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ইত্যাদি—

যদুনাথ কাগজ পড়িতেছেন, সেবক আসিয়া তাঁহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল; কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—

সেবক: বাবু, মোকদ্দমার কিছু খবর আছে নাকি?

যদুনাথ কাগজ মুড়িয়া সরাইয়া রাখিলেন।

যদুনাথ: হ্যাঁ, রায় বেরিয়েছে। দিবাকরকে তিন বছর জেল্‌ দিয়েছে।—দিবাকর চোর ছিল সত্যি; কম বয়সে দুরবস্থায় প'ড়ে মন্দ পথে গিয়েছিল। কিন্তু তবু—

সেবক: তবু কি বাবু?

যদুনাথ: কোথায় যেন একটা গলদ আছে। দিবাকর আমার সূর্যমণি চুরি করেছিল এ যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। বড় ভাল ছেলে ছিল রে—। কপাল—সবই কপাল। ওর ভাগ্য তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

নিশ্বাস ফেলিয়া যদুনাথ চায়ের পেয়ালা টানিয়া লইলেন। এই সময় দেখা গেল নন্দা ও মন্মথ পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। মন্মথর পরিধানে ধুতিচাদর; দেশী পোষাক।

তাহারা আসিয়া যদুনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল।

নন্দা: দাদু, আমরা একটু বেরুচ্ছি।

যদুনাথ: ও—তা বেশ তো। কোথায় যাচ্ছ?

নন্দা: একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

যদুনাথ: আচ্ছা, এস।

নন্দা ও মন্মথ দ্বারের দিকে চলিল। যদুনাথ চায়ে চুমুক দিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন; ত্বরিতে চাল্‌শের চশ্‌মা খুলিয়া একদৃষ্টে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন; যেন অনুমানে বুঝিতে পারিলেন তাহারা কোন্‌ বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছে। তিনি দুই তিনবার আনুকূল্য-সূচক ঘাড় নাড়িলেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ উৎফুল্ল হইল।

ডিজল্‌ভ।

জেলখানার ভীম লৌহদ্বার পার হইয়া নন্দা ও মন্মথ পাষাণপুরীতে প্রবেশ করিল।

দিবাকর নিজ প্রকোষ্ঠে ছিল; সেইখানেই সাক্ষাৎ হইল। তিনজনেই কুণ্ঠিত, অপ্রতিভ। নন্দা চোখের জল চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

মন্মথ সহসা দিবাকরের হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মন্মথ: দিবাকরবাবু, আমি আপনার কাছে মাফ চাইতে এসেছি। আমাকে মাফ করুন।

দিবাকর শান্তকণ্ঠে বলিল—

দিবাকর: মাফ্‌ করবার কিছু নেই, মন্মথবাবু। আমি যা করেছি, নিজের প্রয়োজনেই করেছি। তিন বছর পরে আমি যখন জেল্‌ থেকে বেরুব, তখন আমার অপরাধ ধুয়ে যাবে; তখন আমি নতুন মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করব। —মন্মথবাবু, আমি দেখেছি, ভাল মেয়ের ভালবাসা অতি অধম মানুষকেও সৎ পথে টেনে আনে; আর মন্দ মেয়ের মোহ সাধু লোককেও নরকে টেনে নিয়ে যায়। আশা করি আপনি যে শিক্ষা পেয়েছেন তা সহজে ভুলবেন না।

মন্মথ: না, ভুলব না।

নন্দা চোখ মুছিল।

নন্দা: দাদু দাদার বিয়ের ঠিক করেছেন।

মন্মথ সঙ্কুচিত ভাবে সরিয়া গেল।

দিবাকর: বাঃ বেশ। (ঈষৎ হাসিয়া) আর তোমার বিয়ে? কর্তা এখনও তোমার বিয়ে ঠিক করেন নি নন্দা?

নন্দা অপলক-চক্ষে দিবাকরের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

নন্দা: আমার বিয়েও ঠিক হ'য়ে আছে। কিন্তু দাদু বলেছেন, তিন বছরের মধ্যে আমার বিয়ের যোগ নেই।

দিবাকরের চোখের সহিত নন্দার চোখ নিবিড় আশ্লেষে আবদ্ধ হইয়া গেল।

ফেড আউট্‌।

সমাপ্ত

নিরুপমা দেবীর "দিদি"

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি, ডি-এস-আই

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নবীনা পাঠিকা হয়ত সুরমার এই আত্ম নিবেদনটিকে সমর্থন করিবেন না এবং তাহাদের এই পুনর্মিলনটিকে নারীত্বের পরাজয় বলিয়াই মনে করিবেন। কিন্তু সত্যই কি ইহা নারীত্বের পরাজয়? আত্মীয়ের ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা করার মধ্যে উদারতার গৌরব কি কিছুই নাই? শুধু অভিমান, জেদ ও দম্ভকে পাথেয় করিয়া সংসার-পথে বিচরণ করার মধ্যেই কি তৃপ্তি আছে? নারী কি শুধু দাবীই করিবে, অভিমানই করিবে, ত্রুটি অন্বেষণই করিবে? দাবীতেই তাহার গৌরব? ত্যাগে কিছুই নাই? সে সীতার মত সহ্য করিতে পারিবে না? দেবীর মত ক্ষমা করিতে পারিবে না? ভালবাসিতে পারিবে না?

অন্য কোন্ পরিণতি সুরমার পক্ষে সুশোভন হইত? নিরুপমা দেবী যদি আধুনিকা হইতেন, তাহা হইলে হয়ত সুরমাকে আর একটি বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা তাহাকে কোনও মঠ বা নারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী করিয়া অবশিষ্ট জীবনটা পুরুষ-বিদ্বেষী বঞ্চনা-শুষ্ক অতৃপ্ত-কাম অবদমন-ক্লিষ্ট হৃত-সৌন্দর্য্য জীবনযাপন করাইতে বাধ্য করাইতেন। কিন্তু তাহা হইলেই কি সুরমার পরিণতিটি শিল্প-সৌন্দর্য্যের ফুলে-ফলে সুশোভিত হইয়া উঠিত?

আমাদের মনে হয় সুরমা ও অমরনাথের মিলনটি শিল্প কলার অভ্রান্ত এবং অনিবার্য্য গতি-পথেই পরিণতি লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের মূল কাহিনীটি যেমন অভ্রান্ত হইয়াছে, ইহার অন্তর্গত উমা ও প্রকাশের গৌণ কাহিনীটিও সেইরূপ অভ্রান্ত এবং সুশোভন পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এ্যারিষ্টটেলীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে মূল কাহিনীর সহিত কোনও উপকাহিনীর গ্রন্থন করিলে রসহানি হয়। কিন্তু সেক্সপিয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া বহু আধুনিক সাহিত্যিকই একথা স্বীকার করেন না এবং তাঁহাদের অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত রচনার মধ্যেই মূল কাহিনীর সহিত দুই একটি উপকাহিনী সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ইহার ফলে এসরাজ সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে জোয়ারী তার গুলির অনুরণন যেমন মূল তন্ত্রীটির সুরকে আরও সমৃদ্ধতর করিয়া তুলে, সেইরূপ উপকাহিনীর ব্যঞ্জনাটিও মূল কাহিনীকে আরও বিশদ ও ব্যঞ্জনাময় করিয়া তুলে। সেক্সপীয়ারের কিং লিয়ারের মূল কাহিনীর অপত্য-কৃতঘ্নতা-জনিত দুর্ভাগ্য যখন আমাদের অভিভূত করে, তখন গ্লসষ্টার (Gloucester) এর অনুরূপ দুর্ভাগ্যও আমাদের সেই অনুভূতিকে আরও ব্যাপক ও গভীরতর করিয়া তুলে—। আকস্মিক মেঘ গর্জ্জনে আমরা চমকিত হইলেও অভিভূত বা অবসন্ন হই না, কিন্তু মেঘায়মান আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিকাশ ও বজ্রধ্বনি আমাদের মনকে ভয় বিহ্বল ও অবসন্ন করিয়া তুলে। এইজন্যই উপকাহিনীর সুরটি যদি মূল কাহিনীটির স্বগোত্রীয় বা সহায়ক হয়, তাহা হইলে তাহাতে—রস সমৃদ্ধি বাড়িয়াই উঠে। বস্তুতঃ বিভিন্ন বাদ্য ও স্বরের গ্রন্থন যেমন সঙ্গীতশিল্পীর নিপুণতারই পরিচয় দেয়, মূল কাহিনীর সহিত উপকাহিনীর গ্রন্থনের মধ্যেও সেইরূপ সাহিত্যিকের কৃতিত্বের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

নিরুপমা দেবীর 'দিদি'র ও সুরমা অমর ও চারুর মূল কাহিনীটির সহিত মন্দাকিনী প্রকাশ ও উমার গৌণ কাহিনীটির গ্রন্থনের মধ্যে এইরূপ একটা কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গৌণ কাহিনীটির প্রভাবটিই মূল কাহিনীটিকে অনিবার্য্য পরিণতির দিকে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছে এবং তাহাকে মনোবিজ্ঞান ও যুক্তি বিজ্ঞান সম্মত করিয়া গ্রন্থের রস ব্যঞ্জনাকে আরও গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে।

মন্দাকিনী প্রকাশ ও উমার কাহিনীটি যে শুধু সুরমা ও অমরের প্রেমের পরিণতির সহায়ক হিসাবেই প্রয়োজনীয় তাহা নহে। "কাব্যের উপেক্ষিতা" নায়িকা হিসাবেই—মন্দাকিনী ও উমার স্থান নহে, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্য-সম্পর্কে-নিরপেক্ষ কাহিনী হিসাবেও ইহার পরিণতি অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। উমা ও প্রকাশের প্রেম হয়ত আন্তরিকই ছিল। কিন্তু এই প্রেমটিকে গ্রন্থকর্ত্রী যদি তাহাদের বিবাহে পরিণত করাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপন্যাসটি হয়ত বিধবা-বিবাহের "প্রোপাগণ্ডা" হিসাবে গণ্য হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয়ত রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালী পাঠকদের অন্তরের সমর্থন লাভ করিতে পারিত না।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে 'An artist is known by what he omits" ; সত্যিকারের আর্ট উদগ্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করে না, আভাসে ইঙ্গিতে ইসারা ব্যঞ্জনায় ইহা অপরূপ হইয়া উঠে। নিরুপমা দেবীর আর্ট এই জাতীয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে নিরুপমা দেবীর রচনা নিরাভরণা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা নিরাভরণা নহে। ইহা সংযত ও সহজশিল্প সমৃদ্ধ। তাঁহার ভাষায় উচ্ছ্বাস নাই, বিক্ষোভ নাই, তাহা অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত নহে, পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে বিক্ষুব্ধ নহে, দার্শনিকতার জ্যাঠামিতে গুরুপাক নহে, মনস্তাত্ত্বিক স্বগত উক্তি বা আত্ম-বিশ্লেষণে মন্থর নহে।

অথচ মনস্তাত্ত্বিক কলা কৌশল এই উপন্যাসটির মধ্যে যথেষ্ট আছে। তবে সেই জিনিষটিও আপাতঃ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। তাঁহার বিশ্লেষণ-কৌশল অত্যন্ত সংযত। শুধু বিবৃত পন্থায় তিনি গল্প বলিয়া গিয়াছেন ; শরৎচন্দ্রের অনেক নায়িকার মত তাঁহার চরিত্রগুলি সংলাপের ক্ষেত্রে তর্কের আস্ফালন করে নাই, অতি-নাটকীয় আড়ম্বর দেখায় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী বা শ্রীশচন্দ্রের মত দীর্ঘায়িত স্বগত উক্তির ভিতর দিয়া আত্ম-বিশ্লেষণ করে নাই ; ঔপন্যাসিক নিজে বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া নিজের ব্যক্তিগত মন্তব্য ও সমালোচনা দিয়া নায়ক

নায়িকার মনোবিকলন করেন নাই। তবুও তিনি ঘটনা সংস্থানের জটিলতার ভিতর দিয়া যাহা ঘটাইয়াছেন, মনস্তাত্ত্বিক পরিণতির দিক দিয়া তাহা যেমন স্বাভাবিক—তেমনই অনিবার্য্য।

যাহা অসম্ভব ভালো তাহা আমাদের মনকে তেমন ভাবে স্পর্শ করে না, কিন্তু যাহা স্বাভাবিকভাবে ভালো তাহাই আমাদের মনকে দোলা দেয়। নিরুপমা দেবী সুরমা প্রভৃতিকে অসম্ভব ভালো করিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়াই তাহা স্বাভাবিক এবং মনোজ্ঞ হইয়াছে, হয়ত শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনেক নায়িকার মত রোমান্টিক বা চমকদার হয় নাই। শুধু সুরমা কেন, অমরনাথ চারু মন্দাকিনী প্রকাশ উমা ইহারা সকলেই আমাদের আশপাশের পরিচিত মানুষ, শুধু ঘটনা-সংস্থানের অপ্রতিবিধেয় প্রভাবেই তাহাদের ভাল মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই উপন্যাসের মধ্যে তত্ত্বের প্রোপাগাণ্ডা নাই, কিন্তু তত্ত্ব ইহাতে একটা আছে। শিব ও সুন্দরের সহিত সেই তত্ত্বের সত্যটি এই উপন্যাসের মধ্যে একাত্ম হইয়া রূপায়িত হইয়াছে। সেই তত্ত্বটি কি?

জীবনের অনেক জিনিষই আমাদের মনের মত হয় না। পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পরিবেশ গৃহ সমাজ ইহাদের অনেকগুলিই হয়ত আমাদের হৃদগত আদর্শের অনুরূপ হয় না। কিন্তু তবুও ত আমরা তাহাদের মানাইয়া চলিতে পারি। এই মানাইয়া চলিয়া, সংঘাত বর্জ্জন করিয়া আত্মীয় বন্ধুর ছোট ছোট ত্রুটি বিচ্যুতি গুলিকে ক্ষমা করিয়া, অথচ নিজের আদর্শ যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের সঙ্গে কারবার করার মধ্যেই আছে সুস্থ মনুষ্যত্ব। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শুধু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে না মানাইয়া চলাই কি হইবে দাম্পত্য-জীবনের চরম কৃতকৃত্যতা? নারীত্ব বা পুরুষত্বের পরম পরিচয়? স্বামীকে যে স্ত্রীর মনের মত সর্ব্বাংশেই হইতে হইবে অথবা স্ত্রীকে যে জোর করিয়াই স্বামীর অনুবর্ত্তী করিতেই হইবে এমন কোনও কথা আছে কি? আমরা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজন সকলকার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিতে পারিব, আর পারিব না শুধু জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু স্বামী অথবা স্ত্রীর ভুল ভ্রান্তি গুলিকে? এ আদর্শ দাম্পত্য তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে। ইহার মধ্যে সুখও নাই, স্বস্তিও নাই, মহত্ত্বও নাই। দুঃখ অনেক সময়েই আমাদের অপ্রতিবিধেয় হয়, কাজেই তাহার সহিত সন্ধি করিতে হইবে, মানাইয়া চলিতে হইবে। সুরমা যদি অমরনাথকে ক্ষমা না করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিত, অথবা ভ্রষ্টা হইত তাহা হইলেই কি সে জয়ী হইত? অথবা সুখী হইত? যিশুখৃষ্ট তাঁহার স্নেহাস্পদ মানুষের জন্য "Wounds of love" গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই ত তাঁহার গৌরব। প্রেমাস্পদের জন্য দুঃখবরণের মধ্যেই আছে প্রেমের গৌরব। সুরমার আত্ম-নিবেদন এই দুঃখবরণের গৌরবে গৌরবান্বিত। ইহা যিশুর "ক্রশ" গ্রহণ করার মতই সুন্দর। নিরুপমা দেবীর দিদি উপন্যাস আমাদিগকে এই দুঃখের "ক্রশ্" গ্রহণে শিক্ষা দেয়। ইহাই দিদি উপন্যাসের তত্ত্বকথা।

হার জিত

শ্রীহরিহর শেঠ

এই বয়সের মধ্যে জীবনে কতবার হারিলাম কতবার জিতিলাম। কতবার বন্ধু ও আত্মীয় সমীপে বুদ্ধিমান, আবার কতবার মূর্খ প্রতিপন্ন হইলাম। দেশবাসী এবং জনসাধারণের কাছেও কতবার বাহবা এবং কতবার নির্ব্বোধ অভিধানে অভিহিত হইলাম। ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তাহাই। কিন্তু হায়, জীবনের এই শেষ অঙ্কে পৌছিয়া আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, কোনটা হার—কোনটা প্রকৃত জিত। কোনটা বুদ্ধিমত্তা, কোনটা মূর্খতা। আর সাধারণের কাছে বা কাজে বাহবা ও হতাদরের মধ্যে কতটা আন্তরিকতা থাকে ও প্রকৃত মূল্য কি!

শৈশবে মায়ের কোলে ব'সে শিশুরা মায়ের বকুনি তিরস্কারে কেঁদে জেতে, আবার হাসিভরা মুখে বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মায়ের মুখ চেপে ধরেও তাঁর ক্রোধ জয় করে। কৈশোরে হার জিত খেলার সাথীর সঙ্গে। তার পর প্রথম যৌবনের নবীন আশা নূতন দৃষ্টিতে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে শত স্বপনের মাঝে হার জিতের পালা যে আরম্ভ হয়, মানে অভিমানে ভালবাসায় প্রেমে তার জের মিটতে লাগে অনেকদিন। আর সেই সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন মোহ উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হ'য়ে সবচেয়ে চ'খের সামনে যা উদ্ভাসিত হয়, প্রাপ্তবয়সে যখন তা টুটে যায়, তখন একটা হার জিতের হিসাব এসে পড়ে। অনেক নেতার পশ্চাতে বড় হারের অস্পষ্ট ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়।

জীবনের পথে চলতে চলতে বহুতররূপে হার জিতের সঙ্গে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হয়ে থাকে; তা ছাড়া আর এক প্রকার জিতের জন্য প্রবল আকাঙ্খা উদ্যম দেখা যায়,—যেখানে খেলার কসরৎ বা নৈপুণ্য দরকার হয় না, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তরে তা স্থির হয় না, অথবা সম্মুখ-সমরে বিপুল সৈন্য সমাবেশে রণক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত হয় না; সে হইতেছে রাষ্ট্রক্ষেত্রে তার সেবার অধিকার করায়ত্তের জন্য সংগ্রাম। জিতিবার জন্য এমন বিপুল উৎসাহ, আকুল আগ্রহ বুঝি আর কিছুতে দেখা যায় না। এখানে যুবক নেই, প্রৌঢ় নেই, বৃদ্ধ নেই, এ সংগ্রামে প্রায় সকলকেই দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় এই বহু শক্তিক্ষয় ও অর্থব্যয়ে যে জিত সেইখানেই [illegible]

যায়, যে সেই জিতের পশ্চাতে এমন হার লুকান থাকে যা অসংশোধনীয়, যা থেকে হয়ত আর সারাজীবনে কখন উঠতে পারা যায় না। কিন্তু তখনও যদি একটুও সামর্থ্য থাকে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে জয়ের দুরাশায় নিজেকে সামলে রাখতে পারে এমনও ও বড় দেখা যায় না।

বুঝি পৃথিবীর আদি যুগ হ'তে এমনই কত রকমের হার-জিতের নিত্য অভিনয় চল্‌চে। কোনটা হার আর কোনটা জিত—ঠিক মত নিরাকরণ করতে পারি না বলেই অভিনয় বললাম। যতই বয়স বেড়ে চলেছে, আমাদের মনে করার মূল্য কত তা ভাল করেই বুঝচি। যে জিতের জন্য হয়ত একদিন শত আনন্দে উল্লসিত উৎফুল্ল হইতে দেখিয়াছি কালে তাহাই নিছক হার বলে নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়েছে। আবার যে হারে একদিন দুঃখভারে হৃদয় মথিত উদ্বেলিত হয়েছে, তাহাই পরে প্রকৃত আনন্দ উল্লাসের হেতু হয়েছে ইহাও দেখা গিয়াছে। সুতরাং উপস্থিতের হার বা জিত ভবিষ্যতের কি—তাহা কে বলিবে। আরও এক কথা, শিক্ষাসম্পদের ক্ষেত্রে পুত্রের কাছে পিতার হার, প্রেমের রাজ্যে নায়িকার কাছে নায়কের হার অনেক সময় জিতেরই নামান্তর। সুতরাং যথার্থ হার জিতের তালিকা করা সহজ নয়।

আজ ব্যক্তিগতভাবে যাহা আমার কাছে জিত মনে হয়, তাহা যদি সমষ্টির বা জাতির কাছে অন্যরূপ হয়, তবে তাহাকে কি বলিব—জিত না হার—তাহাও বুঝিতে পারি না। আবার হার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। যে হার জিতের ফল ব্যক্তিবিশেষে বা সময় বিভেদে ভিন্নরূপ, অর্থাৎ একের পক্ষে যাহা পাঁচজনের পক্ষে অন্যরূপ, অথবা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে পার্থক্য দেখা দেয়; তাহাও প্রকৃত হার বা জিত • তাহা কে বলিয়া দিবেন।

সময় বিশেষে ঠকান ও জেতা প্রায় একই কথা। উদ্দেশ্য বা অন্তরের ইচ্ছাকে লুকাইয়া রেখে বাহিরে দুটো কাজ করিয়া বা কাজ দেখাইয়া আবার কত লোক কত লোকের চ'খে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কত বাহাদুরি না লইতেছে। মানুষ দুটো দান করিয়া, দুটো সহানুভূতি দেখাইয়া বা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া সরল জনসাধারণকে ঠকাইয়া কি জেতাই না জিতিতেছে। বাহাদুরি পাওয়া তাহা জেতারই নামান্তর। এমনই বাহাদুরি লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদে মানুষ নিজেকে হারাইয়া ফেলে।

যিনি যত উদার তাঁহার কাছে হার জিতের গণ্ডী তত প্রশস্ত। প্রায় যাবতীয় হার জিতের মধ্যে একজনের হারে অপরের জিত বা জিতে অপরের হার হইয়াই থাকে। সুতরাং উহা হইতে লাভ লোকসানের একটা ঠিকমত হিসাব হইতে পারে না।

তাই বলি প্রভু, যদি কৃপা থাকে সাফল্য দাও, তাহার মানে যদি জেতা হয় ত জিতিতে দাও। কিন্তু দিও না জিতবার অদম্য আকাঙ্খা, দিও না জিতবার জন্য আকুলতা; তাহার অপেক্ষা যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি, যার জেতায় ব্যক্তিগত লাভ অপেক্ষা সমষ্টিগত লাভের সম্ভাবনা অধিক, আমাকে রাখিয়া তাহাকে জিতিতে দাও।

রক্ত-মোক্ষণ কি বর্দ্ধিত রক্ত-চাপের চিকিৎসা

ডাঃ জে-এন্-মৈত্র

ভারতীয় মেডিকেল জর্ণাল মার্চ মাসের একটী প্রশ্নের জবাবে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা রক্তের চাপ বাড়লে রক্ত মোক্ষণকে চিকিৎসা-রূপে চাহেন না।

আমরা কি জানি? আমরা কি চাই? এটা ভাববার কথা, আমরা কি চাই, কি আমাদের আছে ও কোথায় আটকাচ্ছে!

কি চাই? সুস্থভাবে কাজকর্ম্ম সেরে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ কি সবার কাম্য নয়? আমি ব্যবসায়ী, বয়স ৭০ বৎসর। প্রত্যহ ডাক্তার-বাবু মাথার কোনদিকে ভার লাগে, বুকের বাঁধারে কি ঠিক মাঝখানে বাধে···ইত্যাদি প্রশ্ন সেরে নিত্য নূতন জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কার করে আমার জন্য কত শ্রম স্বীকার করছেন, ইউফাইলিন্, তেরিফাইলিন্, কারভোফাইলিন্, এমাইনোফাইলিন্ প্রভৃতি ফাইলিনের শিশিতে ঘর ভর্ত্তি। নাইট্রাইট, ডাই, ট্রাই টেটরা এক এক করে তিনি পেন্টা নাইট্রাইট পর্য্যন্ত পৌঁচেছেন। খাইলে, শুঁকিলে বা ইনজেকসনে ১০ হইতে বড়জোর ৩০ কমে। এখন আমি যদি ২৫০ শিশি রক্ত মোক্ষণান্তে বেশী সুস্থ মনে করি, মাথার চাপ, বুকের চাপ কমে ও সুনিদ্রা হয়—কেন আমি রক্ত মোক্ষণ করিব না? এ প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান দেবে।

প্রয়োজনের অধিক রক্ত আমার আছে কি না? রক্ত প্রস্তুত ও রক্ত ধ্বংসকারী কি কি যন্ত্র আমার শরীরে কেমন ভাবে ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চালাচ্ছে, এ অবস্থায় প্রয়োজন মত ওজনের বেশী ওজন আমার আছে কি না প্রভৃতি তাবৎ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীর কাছ থেকে জেনে যদি দেখতে পাই—আমার কোনও অনিষ্ট হচ্ছে না, বরং রক্ত দিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্কে একটা হিসাব খোলা হল। নিজের ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে বা কোনও আত্মীয় আত্মীয়ার প্রয়োজনে রক্ত রইল। এমন কি যদি অর্থাভাব-প্রযুক্ত কিছু অর্থাগম হয় (এ জনার রক্ত বিক্রি করে) কেন রক্ত মোক্ষণ করবো না?

ডক্ত জর্ণাল বলেন যে যদি হার্টফেলিয়র বা হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হয় বা রক্তচাপজনিত মস্তিষ্ক প্রদাহ হয়, তবেই নেহাৎ কর্ত্তব্যের খাতিরে রক্ত মোক্ষণ করিবে? আমার জিজ্ঞাস্য, টিকা লয় লোকে কখন? নেহাৎ ভয়ের তাড়নায়। গাধামর্দ্দিনী মা শীতলার পূজায়ও বসন্তদেবীর প্রকোপ কমিল না, নিশিরাত্রিতে কালী পূজায় ও কলেরা বা ওলা-দেবী সন্তুষ্ট হইলেন না। যদি সময় মত বসন্তের টিকা দেওয়া হইত, কলেরার ইন অকিউলেসন বা কলেরার টিকা দেওয়া হইত ঐপ্রকার ব্যাধির প্রকোপ হইত না। তেমনি আমি বৈজ্ঞানিক হিসাবে বলিব। পুরাতন হিসাব মত বয়সের সহিত ১০০ যোগ করিয়া ১৭২ রক্তের চাপই নর্ম্মাল বা সাধারণ বলিব না। আমি বলিব রক্তের চাপ ১৫০ এর বেশী কিনা? ডায়াষ্টোনিকটা ১০৫ এর বেশী কিনা। যদি বেশী হয়, ঘাড়ে, বুকে, শিরদাঁড়ায় কোন ও ভার, চাপ বা ব্যথা হয় কিনা? চলিলে, হাঁটিলে, সিঁড়ি উঠিলে কষ্ট হয় কিনা। বুক ধড়ফড় করে কিনা? প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক ডাক্তার দিবে। সন্তুষ্ট হলে ডাঃ সেন বা বসু যিনি ব্যাঙ্কে উপস্থিত থাকবেন প্রয়োজন মত রক্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখিবেন ও আমাকে কাজের উপযুক্ত করবার মত করে ছেড়ে দেবেন। প্রতি মাসে ব্যাঙ্কের কাউন্টারে ব্যালেন্স দেখবেন ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্ত জমা দেবেন।

(পূর্বানুবৃত্তি)

মৃন্ময়ের দিকে বাইরে বাইরে কাটলেও, মনের ভেতরটাও যে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলই—এ কথাটা হয়তো বলা যায় না। সে সেদিনকার অপমানটা অবশ্য মনে পুষে রাখলে না, কিন্তু তার কারণ এ নয় যে একজন মেয়ের হাতে অপমান তার কাছে সুমিষ্ট—আসল কথা এ অধৈর্যের গোড়ায় আছে একেবারে অন্য জিনিস, যা মাত্র সে আর সরমা জানে, আর যার সম্বন্ধে সন্দেহটা এই ঘটনাটুকুতে পুষ্টই হোল।

কিন্তু সে ছেড়েই দিলে গোয়েন্দাগিরি। এই রহস্য উদ্ঘাটন চেষ্টায় তার সময় যাচ্ছে, অথচ এর ফল কি হোল?—একটা নূতন জায়গায় এসে তার বায়ু বিষাক্ত করা মাত্র এইটুকু নয় কি? তাই পার্টির জন্য এই যে আয়োজন এর পূর্ণ সদ্ব্যবহারই করলে মৃন্ময়—যাতে তার এতদিনের গোয়েন্দাগিরির ভাবটা মুছে যায় সরমার মন থেকে। কতবার পরস্পরের মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে কথা কইতে হোল, সাজানো-গোছানো নিয়ে পরামর্শ, এমন কি তর্ক পর্যন্ত, কিন্তু চোখে এতটুকুও সেই আগেকার কৌতূহলের ভাব থাকতে দিলে না। প্রথমটা চেষ্টাই করতে হোল, তার পর এইটেই বেশ সহজ হয়ে এল এবং ক্রমে মনে একটি বেশ শুচিতার ভাবও যেন ফুটে উঠছে বলে অনুভব করতে লাগল মৃন্ময়। এ সবের প্রতিক্রিয়া সরমার ওপর দিল দেখা—কাজের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা আদেশ-অনুরোধে এমন একটি রূপ ফুটেছে আজ যার পানে নিষ্কলুষ সখ্যের দৃষ্টি ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে চাওয়াই যায় না। বড় চমৎকার লাগছে মৃন্ময়ের। এই সখ্যই কি সাধনার বস্তু নয়?···চেষ্টা করতে ইচ্ছা করছে।

কতকটা এই জন্যই একবার অবসর ক'রে এবং খানিকটা সাহস করেও সেদিনের ফটোগ্রাফির প্রসঙ্গটা তুললে। অবশ্য একটু ঘুরিয়ে। বললে—"কাল আপনি বাবু বীরেন্দ্রসিংকে ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে যে-কথাটা বললেন সেটা আমার খুব মনে লেগেছে সরমা দেবী—অর্থাৎ ফটোগ্রাফির আর্ট না হয়েও আর্টের স্পর্ধা করা।"

সাজানো-গোছানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এবার ওরা বাসায় ফিরচে পার্টির জন্য তোয়ের হয়ে আসতে। এখানে-ওখানে যা একটু আধটু ত্রুটি আছে, চাকরদের নির্দেশ দিয়ে ঠিক করিয়ে দিচ্ছে, তারই মধ্যে একটা সিগরেট বের করে রূপার কেসে ঠুকতে ঠুকতে কথাটা বললে মৃন্ময়।

সরমা একবার চকিতভাবে ঘুরে চাইলে, তারপর দৃষ্টি নত করে ব্যথিতস্বরে বললে—"ও-কথাটা মন থেকে সরিয়ে ফেলুন মৃন্ময়বাবু···দয়া করে।"

মৃন্ময় বললে—"আপনি নিশ্চয় সেদিনকার কথা ভেবে বলছেন—সেই যে ফটো নেওয়া পণ্ড হোল। তা হলে আপনাকে মন পরিষ্কার করেই সব বলি, কেন না মনে পাপ পুষে লাভ নেই; আমি সেদিন সত্যিই বড় আঘাত পেয়েছিলাম, তার কারণ সেদিন এইটুকুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সে আমার হাতে ফটো তোলানোতেই আপনার আপত্তি। কাল বাবু বীরেন্দ্রসিংের মুখে প্রকৃত কারণটা বুঝতে পেরে পর্যন্ত আমি যে কী স্বস্তি অনুভব করছি!···"

"কিন্তু আমার সে কী অস্বস্তি!"

"না, আপনি ও-সব মুছে ফেলুন মন থেকে, আমার অনুরোধ। আমি শুধু স্বস্তিই অনুভব করছি না সরমা-দেবী, যে নিজের প্রিন্সিপলের কাছে আর সব কিছুকেই তুচ্ছ করতে পারে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও যে কতখানি তা আমি কখনই কথায় বুঝিয়ে উঠতে পারব না।"

"তুচ্ছ করবারও তো একটা সীমা থাকা চাই? সেটা লঙ্ঘন করে আমি কি করে নিজেকে ক্ষমা করি বলুন? আপনিই বা অন্তর দিয়ে এখন মানুষকে কি করে শ্রদ্ধা করতে পারেন?"

—মার্জনা পেয়েছে বলেই সরমার দৃষ্টিটা আরও ব্যথিত হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে গিয়ে আরও

বেড়ে গেল দেখে মৃন্ময় যেন নিরুপায় হয়ে দৃষ্টি নত করে আস্তে আস্তে সিগারেট টানতে লাগল। সরমা আড়চোখে দু'তিনবার দেখলে; এমন চমৎকার দিনটি আবার মলিন হয়ে আসে দেখে সেও যে কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। তারপর মৃন্ময়ই, যেন চমৎকার একটি যুক্তি পেয়েছে এইভাবে একটু উল্লসিত হয়েই বলে উঠল—"বেশ, আর সব কথাই ছেড়ে দিন, কিন্তু যে আঘাত পেলে যে ভুলতে পারছে—অথচ যে আঘাতটা দিলে সে অনুতপ্ত, নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না—এ মহত্ত্বের কাছেও শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুইয়ে আসবে না?"

সরমা একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠে বাতাসটা হাল্কা করে দিলে, বললে—"না, মানুষে জোর করে দেবতার আসনে বসাচ্ছে অথচ সে আসন নিতে চাইছি না—এ-বোকামির এইখানেই শেষ হোক।…এবার চলুন, আবার ফিরতে হবে, আমাদের তো এইখানেই শেষ নয়, নাটকের হাঙ্গাম আছে। দাঁড়ান, বুবুয়াকে, মাইয়াকে বলে আমি, আমাদের দুজনের ঘাড়ে সব চাপিয়ে সবাই বেশ সরে দাঁড়িয়েছেন।"

"জানেন, আপনি রয়েছেন, কোন রকম ত্রুটি হবার ভয় নেই।"

"আর, আমিও যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি—হাজার ত্রুটি হলেও কারুর শ্রদ্ধা কমবে না জেনে…"

মুখের পানে চেয়ে কথাটা বলতে বলতে, শেষ না করেই সরমা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

পার্টিটি বেশ হোল। এর অনেকখানি কৃতিত্বই তার, কিন্তু আত্মপ্রসাদে আজ মনটি এমন উথলে উথলে উঠছে যে সমস্ত যশটুকু সরমার ওপর অর্পিত করবারই চেষ্টা মৃন্ময়ের। এটা তো ঠিক যে আজ যদি অমন করে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব-সাধনের চেষ্টা না করত—আর তাইতে ওর এমন আনুকুল্য না পেত তো সমস্ত মন দিয়ে জিনিসটাকে এমন নিখুঁতভাবে গড়তেও পারত না সে…এই নিজের যশ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাতে হাসিমুখে সে একটু কলহ-কথা-কাটাকাটি হোল, তাতে ওদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি আরও নিবিড় হয়ে উঠল, পুরণো কটা মাস যেন মুছে গেল ওদের মন থেকে।

মৃন্ময় ভাবছিল—মেয়েছেলেকে তাহ'লে অন্য আর এক ভাবেও তো কামনা করা যেতে পারে! নিজেকে প্রশ্ন করছিল—নিষ্কলুষ কামনা কি আরও মধুর নয়?

পার্টি আরম্ভ হয়েছিল সন্ধ্যার সময়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শেষ হোক, এর পর হবে হিন্দী থিয়েটারটা।

পার্টিতে একটু ত্রুটি ছিল, অবশ্য শুধু মৃন্ময়েরই হিসাবে; খানাপিনার দিক দিয়ে প্রায় বিলাতী ডিনারেরই মতো, কিন্তু পিনার আসল জিনিসটাই বাদ। অথচ আজ মনটি এমন ভরপুর যে কোন জিনিসেরই অঙ্গহানি হতে দিতে ইচ্ছা হয় না। জায়গাটা পরিষ্কার করে যতক্ষণে দর্শকদের বসবার জন্য প্রস্তুত করা হবে, ততক্ষণে একবার বাসা হয়ে আসতে গেল মৃন্ময়, একটা ছুতো করে। খুব মাত্রা রেখে একটু সুরা কণ্ঠে ঢেলে নিয়ে মোটরে ক'রে ফিরে আসবে, স্টার্ট দিয়েছে, চাকা একটু একটু ঘুরতে আরম্ভ করেছে, পেছন থেকে ডাক পড়ল—"শুনুন!"

রুম্মার কণ্ঠস্বর। যেখানে হাসপাতালের রাস্তা থেকে তাদের বাড়ির রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে, সেইখানটায় দেখলে তাকে, এইদিকেই আসছে একটু আলুথালু ভাব, যেন মোটরের শব্দ শুনেই যেমন ছিল বেরিয়ে এসেছে।

সমস্ত পাড়াটা নির্জন, চাকরবাকরেরা পার্টির তামাসা দেখতে গেছে, আসবার সময় ঝাড়ু পর্যন্ত চোখে পড়েছিল মৃন্ময়ের।…কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একটা বিভ্রম, অল্প মাত্রায় হলেও সুরটুকু সদ্য সদ্য মাথায় উঠছে। প্রশ্ন করলে—"আমায় ডাকছ?"

"আর কাকে?"

কিন্তু যা ধ্বংসের সহায় তাই আচার ধর্মেরও, ঐ সুরার শক্তিতেই মৃন্ময় আপনাকে সংযত করে নিলে। মোটরটা থামিয়েছিল, কিন্তু ইঞ্জিনটা বন্ধ করে নি, গলা বাড়িয়ে হাত নেড়ে বললে—"এখন একেবারে সময় নেই, ভয়ানক ব্যস্ত।"

চালিয়ে দিলে মোটর, আর ফিরে দেখতেও সাহস হোল না।

মাথাটা চনচন করছে, তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মোটরটা আবার নরম ক'রে দিলে।…একটা অনুশোচনা ঠেলে আসছে, কিন্তু তাও ক্ষণস্থায়ী।…আজ ওর বিজয়েরই দিন, এটা দ্বিতীয়, রুম্মাও যাক ওর পথ থেকে সরে…ওর নবজীবনের নূতন পথ…

সুরা যে-মাত্রায় সেবন করেছে তাতে ধরা পড়বার কোনই সম্ভাবনা নেই, তবু আর কারুর সঙ্গে মেলামেশা না করে মৃন্ময় একেবারে স্টেজে গিয়ে উঠল; রিহার্সেলটা পরিচালনা করতে সমস্ত প্রভাবটুকু কেটে যাবেথন, তারই তো চার্জ।

বেশ ভালো হোল। বেরিয়ে আসতে খানিকটা প্রশংসা-অভিনন্দনের তোড় উঠল; সেটা কাটিয়ে কিন্তু মৃন্ময় সবার থেকে খানিকটা তফাৎ হয়েই পেছনে গিয়ে বসল। সেই একই কারণ, একটু বেশি সাবধান থাকা। প্রশ্ন হোলে হেসে বললে—"আমারটা বলছেন ভালো হয়েছে, কিন্তু শুধু তাইতেই হবে না তো; সরমা দেবীরটার খুঁৎ বের করতে হবে যে এই সঙ্গে, তাই একটু একা একাই বসি।"

মিনিট পনের পরেই বাংলা নাটিকাটা হোল আরম্ভ। চমৎকার হচ্ছে। আজ সরমার সঙ্গে যা সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে তাতে তার সফলতার একটা অদ্ভূত আনন্দ ঠেলে উঠছে মৃন্ময়ের মনে, সুরার একটা সূক্ষ্ম প্রভাব মস্তিষ্কের কোন্ এক জায়গায় একটু রয়েছেই তো—তাইতে এক একবার মনে হচ্ছে—উঠে যাই, স্টেজের ভেতরে গিয়ে সদ্য সদ্য অভিনন্দনটা ক'রে আসি গিয়ে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে ফেলছে।

এক সময় কিন্তু আর রাখা গেল না সংযম পুরোপুরি। অন্তত আর পাঁচজনের মধ্যে ব'সে দু'টো প্রশংসার কথা না উচ্চারণ ক'রে পারছে না মৃন্ময়। তার মধ্যে সরমার পরেই সুকুমারকে সবচেয়ে উপযোগী ভেবে তার পেছনের চেয়ারটিতে গিয়ে বসতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল।

বাধা আর কিছু নয়—যে মেয়েটি শ্রীমতীর ভূমিকা নিয়েছে, বিলম্বিত নৃত্যচ্ছন্দে সে করছে স্টেজের মধ্যে প্রবেশ। মেয়েটিকে চেনে, তারই অধীনের কর্মচারী ভাগবতপ্রসাদের কন্যা চন্দ্রকলা। বেহারী হলেও ভাগবত একটু প্রগতিশীল, পনের-ষোল বৎসর বয়স, তবুও মেয়েটিকে দেখাতে-শোনাতে বাঁধ-কল অঞ্চলে নিয়ে যায়, বার দুয়েক মৃন্ময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ায় পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছে। আশ্রম-স্কুলে একটু উঁচু ক্লাসেই পড়ে, বেশ সপ্রতিভ।

কিন্তু এসবের জন্য নয়; মৃন্ময় যে জন্য থমকে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে তার স্মৃতির তন্ত্রীতে হঠাৎ একটা মৃদু আঘাত। যে-ছন্দে চন্দ্রকলা প্রবেশ করলে—তার চোখের চাউনি, গ্রীবার ভঙ্গি, পায়ের টিপ, সমস্ত তনুখানির লীলায়িত মৃদু আক্ষেপ—এ যেন কবে কোথায় দেখা, আর সে এমনভাবে দেখালে জীবনে এই দেখার মধ্যে হারিয়ে যায় নি!···কিন্তু মনে পড়ছে না তো কবে দেখা, কোথায় দেখা, কার অঙ্গে ঠিক এই ছন্দ একদিন উঠেছিল দোল খেয়ে।···একটু এগিয়ে এসেছিল, মৃন্ময় আস্তে আস্তে আবার একটা চেয়ারে ব'সে পড়ল।

নাচটা আরম্ভ হোল, একটু দ্রুত লয়ে, তারপর আর একটু, তারপর আবার বিলম্বিতে ফিরে এল। নিজের সামনের চুলগুলো মুঠিয়ে ধ'রে মৃন্ময় স্থির দৃষ্টিতে আছে চেয়ে, খুব অল্প আভাস দিয়ে স্মৃতিটা আছে মিলিয়ে।··· মাথার কোন্ এক কোণে যেটুকু সুরার প্রভাব এখনও অবশিষ্ট আছে সেটুকুকে প্রাণপণে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে—বুকে এরই মধ্যে একটা ধড়ফড়ানি এসে গেছে—কখন্ থেমে যায় নাচটুকু, বহুদিনের একটা হারানো স্মৃতি আবার বুঝি চিরকালের জন্য অবলুপ্ত হয়ে যায়।

ছন্দ ক্রমে আরও দ্রুত হয়ে উঠছে, নৃত্যটা ক্রমে রূপের পূর্ণতায় যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠছে—একটু একটু যেন আসছে আভাস—হ্যাঁ, এমনি একটা উৎসবের দিন—কবে—কোথায়?···কিন্তু কায়াবদ্ধ নয়—যেন কোনও ছায়ার অস্পষ্টতার মধ্যে, যেখানে প্রত্যক্ষের কামনার সঙ্গে মেশানো থাকে অপ্রত্যক্ষের বেদনা—একটা অপূর্ণতার হাহাকার···

ক্রমে এসে পড়ছে—হ্যাঁ, এসেই পড়ছে যেন·· লখমিনিয়া মিলিয়ে গেছে—এলাহাবাদের একটি ধনীগৃহের উৎসব প্রাঙ্গণ—একজন বাঙালী ধনকুবের···এই নাচই কিন্তু কারুর রক্ত-মাংসের দেহে নয়, সিনেমার রূপালী পর্দায়!

তারপরেই যা স্মৃতির লহর, যা স্পষ্টতা, তাতে মৃন্ময়ের সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল—সামনে চেয়ে আছে চন্দ্রকলার দিকে—নিজেই অনুভব করছে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে··· পেয়েছে মৃন্ময়—এই কয়মাসের সাধনার পর যেদিন ছেড়ে দিলে হতাশ হয়ে, সেইদিনই প্রসন্ন অদৃষ্ট তার হাতে দিলে

তুলে।...সেই রুপালী পর্দায় এই নাচ, আর ভুল নেই—সেদিন ছিল ঐ সরমা—নামটাও মনে করবেই মৃন্ময়—সেদিনকার ছায়ারূপিণী সরমাই আজ চকরালার কায়ায় সেই ছন্দ ঢেলে দিয়েছে...

—নিজেকে সংযত রাখে কি ক'রে মৃন্ময় এতবড় একটা বিরাট উল্লাসের মধ্যে ?—তার মাথার সুরা যেন শতগুণ মত্ত হয়ে উঠেছে !

তেইশ

সরমা তাহলে একজন সিনেমা-ষ্টার !

কিন্তু এতবড় একটা আবিষ্কারে যেন এতটুকুও না সন্দেহ থাকে। নাচটা থেমে গেলে সে এনকোর দিলে। সবাই তার দিকে মুখ ফিরিয়ে যে একটু বিস্মিতভাবেই চাইলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বেশ ভালো ক'রে স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিচ্ছে, একবার নয়, দু'বার দেখে নিয়ে...দরকার হয় তো আরও দেবে এন্‌কোর—নিজেকে সংযত করা শক্ত হয়ে পড়ছে। তারপর যতক্ষণ নাটিকাটুকু চলল, সে একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল, কি দেখছে একেবারে খেয়াল নেই। শেষে হোল হুঁস। হুঁস হোল যে ছেলেমানুষের মতো এনকোর দিয়ে বসেছিল, তাতে তার মনের চঞ্চলতা খানিকটা ছলকে বেরিয়েছে—কী ভাবলে সবাই ?

উত্তেজনায় শরীরটা তখন ভেতরে ভেতরে কাঁপছে, তবু উঠে গিয়ে পেছন থেকে সুকুমারের ডান হাতটা চেপে ধরলে, বললে—"কন্‌গ্র্যাচুলেট্ করি মিষ্টার সেন।"

পত্নীর যশটা একটু খাটো করবারই চেষ্টা করলে সুকুমার, একটু হেসে বললে—"সত্যি ভালো হয়েছে নাকি ? কে জানে, কাটখোট্টা মানুষ, এসব বুঝিনা মশাই।"

মাষ্টারমশাইয়ের কথায় একটু হাসির লহর উঠল, বললেন—"বিয়ের সময় জুঁইয়ের গোড়ের বদলে তোমার গলায় একটা ষ্টেথেস্কোপই লটকে দিলে ভালো করত নাতনী আমার।"

সরমা বেরুতে দেরি করছে, নিশ্চয় প্রশংসার সম্মুখীন হওয়ার সঙ্কোচ; মৃন্ময়ের কিন্তু আর ধৈর্য রাখা দায় হয়ে উঠেছে, এইবার একবার দেখতে হবে নবাবিষ্কৃতা সরমাকে,—স্মৃতির সরমার সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মিলিয়ে। বললে—"না, সুখ হোল না মিষ্টার সেন, দমিয়ে দিলেন। ...কেন যে বেরুতে দেরি করছেন সরমাদেবী—যাই "আত্মনেপদেই কন্‌গ্র্যাচুলেশনটা দিয়ে আসি"

এগুতে যাবে, তার পূর্বেই সরমা সবার সঙ্গে বেরিয়ে এল। মৃন্ময়ই আগে অভিনন্দিত করলে—"পরাজয়েও যে একটা আনন্দ আছে সেটা আজ বুঝলাম সরমা দেবী।"

সরমা লজ্জিতভাবে ঈষৎ হেসে উত্তর দিলে—"সেটা সত্যিকার পরাজয় না হোলে; আমি তো জানছি, আমারই হার, হিন্দীটার সামনে; কৈ আনন্দ পাচ্ছি না তো।"

আবিষ্কারটুকু যেমন সরমার জীবনের সমস্ত রহস্য উন্মোচন ক'রে দিলে, তেমনি মৃন্ময়ের একদিনের সংযমকে সঙ্গে সঙ্গে দিলে আলগা করে; আর দরকার কি ? লখমিনিয়ার রসটুকু এবার নিংড়ে পান করতে হবে; একদিকে রইল রুম্মা, একদিকে সরমা। তবে, অনুষ্ঠান পর্যন্ত মৃন্ময় সামলেই রইল। সরমার দিকে এখন শুধু একটা তথ্য জানা দরকার—সে যে একজন সিনেমা-অভিনেত্রী এটা ওরা কি জানে ?—অর্থাৎ সুকুমার আর বীরেন্দ্র সিং। মৃন্ময়ের পক্ষে ভালো হয়—যদি মাত্র সুকুমারের থাকে জানা, তার চেয়েও ভালো হয় যদি সরমা তার কাছ থেকেও সব লুকিয়ে থাকে। এটার সম্ভাবনা অবশ্য কম, হোলে কিন্তু সরমা একবারে মুঠোর মধ্যে এসে পড়ে এবং তার যেমন প্রতিপত্তি তার জোরে লখমিনিয়ায় মৃন্ময়ের প্রতিষ্ঠাও চারিদিক দিয়ে হয়ে পড়ে সুদৃঢ়।

অনুষ্ঠান পর্যন্ত নানাভাবে এই সন্ধানেই রইল, অবশ্য খুব সতর্কভাবে, খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সঙ্গে। বীরেন্দ্র সিংহে জানেন না তাতে সন্দেহ রইল না মৃন্ময়ের, তবে সুকুমারের ভাবটা বোঝা গেল না; হয় সে জানেই না, না হয় সে নিজেই এমন পাকা অভিনেতা যে নিখুঁৎভাবে অজ্ঞতার ভাণ করে চাপা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মৃন্ময়কে জানতেই হবে, কেননা এই তথ্যের ওপরই সরমার সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধটা নির্ভর করছে। সে আর আড়-আবডালের ভরসা না রেখে যতটা সম্ভব সোজাসুজিই কথাটা তুললে সুকুমারের কাছে। একলাই ছিল সুকুমার; তিনজনে মিলে নদীর ধারে তাদের বাগানে বসে চা খাচ্ছিল, মাষ্টার মশাইয়ের

কাছে সরমার বৈকালিক পাঠের দিন বলে সে উঠে গেল। কথাবার্তা সেদিন বেশ জমে উঠেছিল, আর তাতে সরমার ভাগই ছিল সবচেয়ে বেশি; সে চলে গেলে যে ছেদটুকু পড়ল তার মধ্যে মৃন্ময় বললে—"আপনাকে কন্‌গ্র্যাচুলেট করি সুকুমারবাবু।"

এমন প্রসঙ্গের মাঝখানে কথাটা পড়ল যে উদ্দেশ্যটা বুঝতে সুকুমারের বাকি রইল না, একটু লজ্জিতভাবে বললে—"হ্যাঁ, মন্দ নয় সরমা, মৃন্ময়বাবু,—Rather a good girl." (ভালো মেয়েই একরকম)।

"Good is no word for it, (শুধু 'ভালো' বলা—সে তো কিছুই নয়):

সরমা দেবী সেই শ্রেণীর মেয়ে যাদের কল্যাণদীপ্তি নিজের সংসার ছাড়িয়ে আশপাশের সমস্ত আবেষ্টনের ওপর গিয়ে পড়ে। লখমিনিয়ায় অন্তত এদিককার জীবনের সরমা দেবীই প্রাণকেন্দ্র; One is tempted to have a home of one's own." (দেখে-শুনে নিজেরই সংসার পাততে ইচ্ছে হয় লোকের)।

এমন কথার ওপর মানুষে যে প্রশ্ন করে থাকে, তাই করলে সুকুমার—"করছেন না কেন বিবাহ মৃন্ময়বাবু? সত্যি, আমরা সেই কথাই বলাবলি করি।"

মৃন্ময় একটু ম্লান হেসে মুখটা নিচু করলে, ছোট একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেললে।

ওকে নিজে হ'তেই বলবার একটু সময় দিয়ে সুকুমার বললে—"সে রকম কোন বাধা আছে?···মানে, বন্ধু হিসেবে আমরা যদি পারি কিছু করতে···"

মৃন্ময় আর একটু সময় নিলে, যেন বলবে কি বলবে না ঠিক করতে পারছে না। তারপর দৃষ্টি তুলে উত্তর করলে—"বন্ধু হিসেবে শুধু শুনতে পারেন, কেননা করবার আর কিছু নেই মৃন্ময়বাবু। আর শুনবেনও যে সে শুধু আপনি।"

"আপনার সিক্রেট্ অন্য কোন কাণেই যাবে না মৃন্ময়বাবু, নিশ্চিন্দি থাকতে পারেন। এমন কি, তেমন আপত্তি থাকলে আমাকেই বা কেন বলছেন? লাভ তো নেই কোনও।"

"একজন বন্ধুর কাণে তুলে দেওয়াও একটা মস্ত বড় লাভ, তবে জীবনে শোনবার মতন বন্ধুই পাওয়া যায় না সব সময়।···দাম্পত্য-জীবন সৃষ্টি করতে আমি এক সময় খুব একটা দুঃসাহসের কাজ করেছিলাম। বয়স তখন আরও কম—ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিটা নিয়ে আমি জার্মেনীতেই রয়েছি, একটা ছোটখাট কন্টিনেণ্টাল টুর সেরে দেশে ফিরব, এই সময় হামবুর্গের পথে ট্রেণেই একদিন একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে দেখা হোল···"

"একা?"

"ঠিক একা নয়, তবে একা থাকলেও ক্ষতি হবার কথা নয়—অল্প পরিচয়েই প্রকাশ পেল, একজন সিনেমা-এ্যাক্ট্রেস্—ষ্টার কিনা ঠিক জানবার কথা নয়, তবে আমার আকাশে একেবারেই উজ্জ্বলতম ষ্টার হয়ে তিনি দেখা দিলেন।"

চুপ করে স্থিরদৃষ্টিতে সুকুমারের মুখের পানে চেয়ে রইল মৃন্ময়; বাইরে বাইরে একটা করুণ হাসি, তার অন্তরাল থেকে কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে এত বড় একটা সাদৃশ্যের কাহিনীতে মুখের একটুও পরিবর্তন হোল কিনা।

পরিবর্তন অবশ্য হোলই; কিন্তু সে ধাঁধা খেয়ে যাওয়ার বিবর্ণতা নয়।

সহজ একটা উগ্র কৌতূহলে সুকুমার প্রশ্ন করলে—"সিনেমা স্টার!···তারপর?"

অবস্থা বুঝে সদ্য সদ্য সৃজন-করা গল্প, মৃন্ময় সাদৃশ্যটা আরও বাড়িয়ে দিলে—"রোমান্সটাকে সংক্ষিপ্ত করেই বলব। ওদিক থেকে প্রতিদান পেলাম। ঠিক হোল ঘোরাঘুরি ছেড়ে একটা নিবিড় বিশ্রামের মধ্যে পরস্পরকে দিনকতক পেয়ে নিই, তারপর একটা দীর্ঘ টুর—অ্যামেরিকাটাও তার মধ্যে ধরা ছিল—তারপর ইণ্ডিয়ায় ফিরে আমাদের নীড় রচনা।···আমরা রাইনের তীরে একটি ছোট নির্জন পল্লী বেছে নিয়ে এক কৃষক পরিবারের পেড্ গেস্ট্ হয়ে উঠলাম। লখমিনিয়ার সঙ্গে জায়গাটার অদ্ভুত মিল—এই রকম পাহাড়ে-ঘেরা, এই বুলানীর মতন রাইনের একটা সুঁতি তলা দিয়ে গেছে ব'য়ে। জায়গাটা অজ পাড়াগাঁ, তবে আমরা যখন পৌঁছুলাম ঠিক লখমিনিয়ার মতনই এই রকম একটা ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি সেখানে গড়ে উঠেছে, ভাগ্যক্রমে আমি তাইতে একটা ছোট-খাট কাজও পেয়ে গেলাম, মাস ছয়েকের কনট্রাক্টে।

অরুণাই জিদ করলে নিতে···হ্যাঁ, ওর সিনেমার নাম

ছিল চন্দ্রা দেবী; নতুন হয়ে বেরিয়ে এল বলে, দুজনে পরামর্শ করে আমরা আবার নতুন করে নাম রাখলাম অরুণা।”

স্থির দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে মৃন্ময়। না, এত মিল, তবু সে-ধরণের কোনও পরিবর্তন নেই সুকুমারের মুখে; সেই নিতান্ত একটু নূতন ধরণের একটা জীবনকাহিনী শোনা, পরিচিত বলে একটু বেশি কৌতূহল, মাত্র এই।…কাহিনী বলার তাগিদ কমে এসেছে মৃন্ময়ের, তবু খানিকটা চালিয়ে গেল। একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে সাদৃশ্যটা আর একটু বাড়িয়ে দিলে—“অরুণা, তার শিক্ষা, কর্মতৎপরতা আর মিষ্ট ব্যবহারে সেখানকার পাঁচটা সামাজিক কাজে এমন মিশে গেল যে অল্প দিনের মধ্যে ছোট জায়গায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল, ফাক্টরির যিনি মালিক—ফন্‌ক্রলার—তার তো মেয়ের মতোই হয়ে উঠল—এতটা যে শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল, আমাদের বিয়েটা ঐখানেই সেরে নোব, আর তিনি হবেন অরুণার গড-ফাদার।”

সুকুমার শুদ্ধ বিস্ময়ে ঈষৎ একটু হাসির সঙ্গে বললে—“তারপর!…একটা দিকে সরমার সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল দেখুন! আপনি যে বলতে বারণ করলেন, নৈলে…তা হোল কি শেষ পর্যন্ত? আপনি তো দেখছি একাই।”

আর ফল নেই গল্প বাড়িয়ে, মৃন্ময় মুখটা বিষণ্ণ করে নিলে। সুকুমার হঠাৎ পরিবর্তনটা দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বললে—“কষ্টকর কিছু? তবে থাক না মৃন্ময়বাবু, তিনি যখন নেইও আপনার জীবনে…”

মৃন্ময় একটু ম্লান হাসলে, বললে—“কী ক'রে বলি আমার জীবনে নেই? নেই তো আমি আবার অন্য কাউকে নিয়ে নূতন ক'রে আমার নীড় রচনা করতে পারছি না কেন?…O, the memory! (হায়, সেই স্মৃতির বেদনা!)…আর একদিন ট্রাই করব সুকুমারবাবু, আজ ক্ষমা করতে পারবেন?”

শেষ করে দিলে।

সরমা তাহলে সুকুমারের কাছেও লুকিয়েছে। কিন্তু এল কি করে ওর জীবনে? আছেই বা কি সম্বন্ধে? উদ্বোধনের উৎসবটা আরও মাসখানেক পেছিয়ে দিতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশ সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়ে গেল। তার পরদিন থেকেই মৃন্ময় সুযোগের পথ খুঁজতে লাগল।

সেদিন রুম্মাকে অমনভাবে প্রত্যাখ্যান করার প্রায়শ্চিত্তও কিভাবে করা যায় সে-চিন্তাটাও মনে রইল লেগে। (ক্রমশঃ)

অহম্

শান্তশীল দাশ

দেবতার পূজা করি না তো আমি
পূজা করি মোর অহমিকার;
মন্দির মাঝে রচেছি আসন
মোর লাগি, নহে সে দেবতার।
মহা গৌরবে ধূপ, দীপ জ্বালি
নানা উপাচারে ভরে নিয়ে থালি
সুর ঝংকারে যে মন্ত্র রচি
সে নহে দেবতা আরাধনার।

দেবালয় মাঝে কনক প্রদীপে
উজল আলোর শতশিখা;
নহে সে দেবতা আরতির লাগি
ঘোষিছে সে মোর অহমিকা।
‘আমি আছি’ এই ধ্বনি বারে বারে
জানাই সরবে দেবতার দ্বারে’
স্রষ্টা সে যদি চির-ভাস্বর,
সৃষ্টি নহে তো তুচ্ছ তার।

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খাইবার গিরিবর্ত্মের পথও রীতিমত দুর্গম, দুরারোহ…যেমন খাড়া চড়াই, তেমনি ঢালু উৎরাই—পাহাড়ের গা বেয়ে যেন সাগরের ঢেউ সর্পিল ভঙ্গীতে পাক খেয়ে ঘুরে এঁকে বেঁকে উত্তুঙ্গ-ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এ পথে এগুনো বেশ কষ্টসাধ্য…সর্ব্বক্ষণ সজাগ না থাকলে নীচে গড়িয়ে প্রাণ হারাবার আশঙ্কা প্রতিপদে!

কাবুলের পথে খাইবার গিরিবর্ত্মের দৃশ্য

এমনি নানা অজানা-অদেখা বিষয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে আমরা উত্তুঙ্গ পাহাড়ের পথ মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি সজাগ হুঁশিয়ার হয়ে। পথের খাড়া-চড়াই অতিক্রম করে চলতে আমাদের সুনির্ম্মিত অতি-আধুনিকতম যন্ত্রবাহন মোটর-ভ্যান্ দুখানিরও যে কী প্রাণান্ত পরিশ্রম হচ্ছিল, তার সুস্পষ্ট আভাস পাচ্ছিলুম, তাদের মন্থর-গতি এবং শ্বাস-গর্জ্জনে।

আমাদের গতি-পথের সামনেই মাথা তুলে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে—দেখি উত্তুঙ্গ 'ফোর্ট মড্' (Fort Maude)। পাহাড়ের শিখরে সুদৃঢ় মাটি-পাথরের তৈরী 'ফোর্ট মড্' দুর্গ…দুর্গের নামেই ইংরাজ-আমলে নামকরণ হয়েছে পাহাড়টির। আজ পাকিস্তানী আমলেও সেই নামই বজায় রয়েছে।

দুর্গের নীচে আশে-পাশে গিরিগাত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে ছোট-খাটো আরো অনেকগুলি মাটি ও পাথরে-গড়া গড় বা প্রহরীদের 'গুমৃত-ঘর'। দুর্গে এবং আশ-পাশের এই সব 'গুমৃত-ঘরে' রাইফেল বুলেট কামান হাতিয়ার নিয়ে সদা-সর্ব্বদা সজাগ পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে সীমান্ত-রক্ষী 'ফ্রণ্টিয়ার-পিকেট'…এদের একমাত্র কাজ সীমান্ত-ঘাঁটি আগ্‌লানো। এ-অঞ্চলের বিভিন্ন গিরি-গাত্রে ছড়ানো রয়েছে এমনি সব বহু সুদৃঢ় দুর্গ বা প্রহরীর ঘাঁটি-ঘর! এখানকার এই সব রক্ষী-দুর্গ এবং উপ-দুর্গগুলিতে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বেতারের সুব্যবস্থা আছে; তার ফলে, দূরান্তে কোনো জায়গায় কোনো বিপদ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যেকটি রক্ষীপ্রহরীকে জানিয়ে তাদের সচকিত রাখা হয়।

পথের আশে-পাশে যেমন দুর্গ, উপদুর্গ, তেমনি পাহাড়ের গায়ে অজস্র ছোট-ছোট বিচিত্র গহ্বর—গর্ত্ত চারিদিকে। শুনলুম, এ সব গিরি-গহ্বরে বসবাস এবং আত্মগোপন করে থাকে সীমান্তের দীন-দরিদ্র উপজাতি বাসিন্দা এবং পার্ব্বত্য দস্যু-তস্করের দল। বসবাসের উপযোগী কাদা মাটি পাথরের সামান্য ঘর বানিয়ে তোলার সঙ্গতি-সামর্থ্যের অভাবে দীন-দরিদ্র পাহাড়ী উপজাতিরা বন্য পশুর মতই পাহাড়ের এই সব গিরি-গহ্বরে আশ্রয় নিয়ে কষ্টে দুঃখে দুর্দ্দশায় কোনো মতে দিনপাত করে। কাঠ-পাথরের পাকা বাড়ীর কথা দূরে থাক—কাদা-মাটির, সামান্য একখানি পর্ণ-কুটিরে বাস করবার কল্পনাও এদের অনেকের কাছে প্রায় দুঃস্বপ্নের সামিল। দুর্দ্ধর্ষ নির্ম্মম ধূর্ত্ত পাহাড়ী দস্যুর দলও রাইফেল বন্দুক হাতিয়ার হাতে এই সব গিরি-গহ্বরে আত্মগোপন করে ওৎ পেতে শ্যেন-দৃষ্টিতে সজাগ বসে থাকে—পথ-যাত্রী পণ্য-ব্যবসায়ীদের প্রতীক্ষায়। শিকার এবং সুযোগের সন্ধান পেলেই অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পথের অসহায় যাত্রীদের উপরে—ছোঁ মেরে তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। অপহরণের অবসানে গিরিগাত্রের গোপন সুড়ঙ্গ-পথে স্বচ্ছন্দে অপহৃত

হলে পাকা পার্ব্বত্য-প্রহরীদের সাধ্য থাকে না অপরাধীদের খুঁজে বার করবে !

এ পথে গাড়ী আমাদের এগিয়ে চলছিল হুঁশিয়ার মন্থর-গতিতে। পেশোয়ার থেকে পাকিস্তান-রাজ্যের শেষ সীমান্ত লাণ্ডিখানার দুরত্ব হবে প্রায় মাইল চল্লিশ। সমতল পথে এ দুরত্বটুকু পার হতে সময় লাগতো বড় জোর দেড় ঘণ্টা...কিন্তু দুর্গম পাহাড়ী-পথ পার হয়ে এগুতে হচ্ছিল বলেই সুদীর্ঘ সময় লাগছিল আমাদের—পথের বাহন মোটর-যান দুখানি ক্ষিপ্রগতিশীল ও নতুন হওয়া সত্ত্বেও !

'ফোর্ট মড্' পাহাড় পিছনে ফেলে অগ্রসর হতেই নজরে পড়লো 'রোহ্তাস্' পর্ব্বতের (Rohtas Cliffs) শ্রেণী। তার একটু পরেই পেলুম 'শাগাই' পাহাড় (Shagai Ridge)...পাহাড়ের উপরে দেখলুম সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে গৈরিক পাথরের কঠিন উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা সুদৃঢ় শাগাই দুর্গ। দুর্গটি আকারে বিরাট...অসীম উন্মুক্ত আকাশের বুকে সীমান্ত-রক্ষার পাহারায় সদা সজাগ প্রহরীর মতই নির্ভীক-দম্ভে উঁচু পাহাড়ের চূড়ার উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকার বীরত্ব-ব্যঞ্জক দৃশ্যটি দূর থেকেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পেশোয়ার আর লাণ্ডিখানার মাঝে শাগাই দুর্গটিই হচ্ছে সীমান্ত রক্ষার সব চেয়ে বড় এবং প্রধান ঘাঁটি। তাই এখানকার কেল্লাটিও যেমন আকারে বৃহৎ, সৈন্য, রসদ ও হাতিয়ারের আয়োজনও তেমনি এখানে ভরপুর !

তিনতলা পথ—উপর তলায় উটের সওয়ার, মাঝের তলায় ভারী লরী, নীচের তলায় দ্রুত গাড়ির অর্থাৎ হালকা মোটর গাড়ির পথ

শাগাই পাহাড়ের পর থেকেই পথ ক্রমশঃ নেমে গেছে ঢালু হয়ে গড়িয়ে—খাইবার গিরিবর্ত্মের সঙ্কীর্ণ অংশের মধ্য দিয়ে অদূরে 'আলি মসজিদ' পার্ব্বত্য-দুর্গ পার হয়ে লাণ্ডিখানার অভিমুখে। পথ এখানে সঙ্কীর্ণ...পার হয়ে চলতে বিপদের আশঙ্কা পদে-পদে...প্রাণ আতঙ্কে ছম্ ছম্ করে—পাশের উঁচু পাহাড়ের গা থেকে হঠাৎ যদি পাথরের চাঙড় খসে পড়ে, তাহলেই সর্ব্বনাশ ! অথচ ইতিহাসের আদিকাল থেকে আজ অবধি যুগ-যুগান্ত ধরে এই সঙ্কীর্ণ গিরি-পথেই দেশ-বিদেশের যাত্রীদের আসা-যাওয়ার স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছে। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ, সব চেয়ে প্রাচীন পথ হলো এই খাইবার গিরিবর্ত্ম ! এই পথেই আদি যুগে ভারতে এসে বাসা বেঁধেছিলেন আর্য্যেরা। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই পথ বেয়ে ভারত-ভূমিতে আসা-যাওয়া করেছে বহু বিদেশী—এঁদের মধ্যে কেউ এসেছিলেন সসৈন্যে দিগ্বিজয়ে ভারতবর্ষের বুকে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মানসে—কেউ বা দোর্দণ্ড-প্রতাপে ভারতবর্ষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশানে পরিণত করে শোষণ-লালসায় লুঠে নিয়ে গেছেন ভারতের ধন-রত্ন-দৌলতের সম্ভার, শিল্প কৃষ্টি সভ্যতার স্মৃতি এবং অগণিত বন্দী নর-নারী পশু-পক্ষীর পসরা !

আর্য্যদের পর খৃষ্টপূর্ব্ব ৫১৬ শতকে সুদূর পারস্যের পরাক্রান্ত-বীর দারিয়ুস সসৈন্যে এসেছিলেন ভারত অভিযানে—এই খাইবার-গিরি-পথেই ! তারপর খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ শতকে গ্রীস দেশের ম্যাসিডোনিয়া-অধিপতি অজেয় আলেকজান্দার এই গিরি পথ বেয়ে এসে ভারতে গ্রীক-আধিপত্যের ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্ত্তী কালের ইতিহাসে দেখি মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী আরো অনেক অত্যাচারী অভিযান কারীদের ভারত-লুণ্ঠনের বর্ব্বর কাহিনীর কথা। আফগানিস্তানের রাজধানী গজ্নী অধিপতি সুলতান মামুদ দুর্গম পথে বার-বার সতেরো দফায় এসেছিলেন ভারতের ধন-রত্ন-লুণ্ঠনে—এমনই খাইবার-গিরির মত দুর্ব্বার ছিল তাঁর লোভ-লালসা ! সুলতান মামুদ ছাড়া ভারতের বুকে লুণ্ঠন-অত্যাচারের পৈশাচিক তাণ্ডব লীলা করে গেছেন মধ্য-এশিয়ার আরো অনেক অমানুষ অভিযানকারী ! তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মঙ্গোলিয়ার কুখ্যাত-অত্যাচারী দুর্দ্দমনীয়-দস্যু চেঙ্গিস্ খাঁ। ১২১৯ খৃষ্টাব্দে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ইনি ভারত-লুণ্ঠনে এসেছিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে লুণ্ঠন-অভিযানে এসে ভারতের স্বর্ণ-রাজ্যকে অমানুষিক অত্যাচারের দাপটে শ্মশানে পরিণত করে গিয়েছিলেন সমরখন্দের দুর্দ্ধর্ষ তাতার-তস্কর তাইমুরলঙ্গ ! তবে এঁরা সকলেই এসেছিলেন লুণ্ঠনের লোভে, তাই ভারতের বুকে রাজ্য-বিস্তারের পরিকল্পনার দিকে এঁদের দৃষ্টি ছিল না। অবশেষে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে একদা কাবুলের রুক্ষ-অঞ্চল ত্যাগ করে খাইবার-গিরি-পথেই ভারতের শ্যামল-ভূমিতে বিজয়-অভিযানে এলেন

মোগল-বীর বাবর। অভিযান-অন্তে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত দেশে ফেরে না গিয়ে 'এই ভারতবর্ষেই বসবাস সুরু করলেন বাবর সুপ্রসিদ্ধ মোগল বংশের প্রতিষ্ঠা করে। বাবরেরই বংশধর, রাজনীতি-শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প কৃষ্টি সভ্যতা সমাজ এবং হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় সাধনে সদাব্রতী ভারতে মোগল সম্রাটদের শিরোমণি শাহান্ শা আকবর এই খাইবার গিরিপথ বেয়েই বহুবার আসা-যাওয়া করেছেন তাঁর স্বপ্রবর্ত্তিত হিন্দু-মুসলিম একীকরণের উদার ধর্ম্ম ভারত আফগান-মধ্য-এশিয়ার সর্ব্বত্র 'সুফী' মতবাদ প্রচার-কল্পে। সম্রাট আকবরের পরে মোগলের সৌভাগ্য-সূর্য্য ভারতের আকাশ থেকে চিরতরে অস্তমিত হয়ে কি ভাবে ইংরেজদের দখলে আসে এই খাইবার গিরিবর্ত্ম—সে কথা সকলেরই জানা আছে—কাজেই তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য ছাড়াও পার্ব্বত্য উপজাতিদের এই সব গ্রামগুলির বিশেষ একটি নিজস্ব রূপ আছে। এদেশী-প্রথায় চারিদিকে কাদা মাটি পাথরে গড়া রীতিমত কঠিন এবং পুরুষ্টু মোটা কেল্লার মত ছাঁদে তৈরী সুউচ্চ প্রাচীরে সুরক্ষিত বেষ্টনী-আড়ালে বাইরের শত্রু বা দস্যু তস্করের অতর্কিত আক্রমণ-অত্যাচারের উৎপাত থেকে 'আত্মরক্ষা করে শঙ্কিত-শাস্তিতে ছোট-ছোট মাটির কুঠুরীর কন্দরে জীবন-যাত্রা চালায় পার্ব্বত্য-গ্রামের উপজাতি বাসিন্দারা। প্রাচীরে-ঘেরা প্রত্যেকটি পাহাড়ী গ্রামের মধ্যস্থলে প্রহরীর মত আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে সজাগ পাহারার মত দাঁড়িয়ে আছে, মসজিদের মিনারের ধরণে তৈরী একটি 'পর্য্যবেক্ষণ-স্তম্ভ' বা 'Watch-Tower!' বন্দুক-গুলি-হাতিয়ার নিয়ে এই সব উঁচু স্তম্ভের চূড়োয় বসে গ্রাম-রক্ষী প্রহরীরা পালা করে দিন-রাত সজাগ-পাহারায় মোতায়েন থাকে—দূরে, গ্রামের পাঁচিলের বাইরে কোথাও কোনো বিপদ বা বহিঃশত্রুর অতর্কিত-আক্রমণের আশঙ্কা বুঝলেই অবিলম্বে সঙ্কেতে হুঁশিয়ার করে দেয় ভিতরের গ্রামবাসীদের। তারাও তৎক্ষণাৎ তৈরী হয়ে ওঠে আত্মরক্ষার স্বার্থে রণ-সজ্জায়! আদিম বন্য জানোয়ারদের মত সর্ব্বদা আশঙ্কা-অশান্তি এবং আত্মরক্ষার আয়োজন নিয়েই জীবন কাটাতে হয় এদের এমনিভাবেই।

এ-ধরণের আরো অনেকগুলি 'জাকা খেল' আফ্রিদীদের গ্রাম পিছনে ফেলে এগিয়ে অবশেষে আমরা এলুম—'লোয়ারগী' (Loargi Plateau) পার্ব্বত্য-জনভূমিতে···খাইবার গিরি-পথে এইটিই হলো সর্ব্বোচ্চ সমতল প্রান্তর।

খাইবার গিরিবর্ত্মের পশ্চিমপ্রান্ত সীমান্ত অঞ্চলের একটি গ্রাম

অতীত-দিনের এমনি সব টুকরো-টুকরো ইতিহাসের কথা ভাবতে ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে এগিয়ে চলেছিলুম যে, খাইবার গিরিবর্ত্মের অপর-প্রান্তে কখন এসে পৌঁচেছি, খেয়াল করতে পারিনি। হুঁশ হতে চেয়ে দেখি—আলি মসজিদ পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ পার হয়ে খাইবার-গিরিবর্ত্মের পশ্চিম-মোহনায় এসে হাজির হয়েছি। এইখানেই উত্তুঙ্গ-পর্ব্বতের পরিশেষ! এতক্ষণের খাড়া চড়াইয়ের পরিবর্তে পথ আমাদের সুপ্রশস্ত-আকারে প্রবাহিত হয়ে এঁকে-বেঁকে ঢালু নেমে গেছে খাইবার-গিরিরাজির পাদদেশে উপত্যকা-প্রান্তরের সমতল-ভূমির বুক চিরে অজানা-সুদূরের পানে। পথের পাশে প্রান্তরের মাঝে মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে ছোট-ছোট পাহাড়ী উপজাতিদের গ্রাম। এই সব গ্রামে বসবাস করে দুর্দ্ধর্ষ-দুরন্ত আফ্রিদী-গোত্রের 'জাক্কা'-খেল্' (Zakka-khel) উপজাতি দল। সভ্য-সমাজের শাসনের শিকলে এদের বন্দী করা যায় না কোনো-

খাইবার গিরি বর্ত্মটি দৈর্ঘ্যে প্রায় সাতাশ মাইল! কিন্তু এমন দুর্গম এ-পথ—মোটরে পার হতেও সুদীর্ঘ সময় লাগলো। দুপুর ছাড়িয়ে বেলা প্রায় গড়িয়ে চলেছে···এখনো আমাদের পার হতে হবে লান্ডি-কোটাল্, লান্ডিখানা—তবেই আমরা পাকিস্তান-সীমান্তের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারবো আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য এলাকায়। সীমান্তের সীমানায় আবার আছে কাষ্টমসের কঠোর পরীক্ষা···তাতেও সময় লাগবে বেশ খানিক! ওদিকে বেলা ক্ষয়ে আসছে ক্রমে···সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই মুস্কিল! রাত্রে পাহাড়ের এই পথে গাড়ী বা লোক-চলাচল একেবারে নিষিদ্ধ···কারণ একে পাহাড়ী পথে নেই আলোর কোনো ব্যবস্থা, তার উপরে রয়েছে রাতের অন্ধকারে অজানা পাহাড়ে পা ফশ্‌কে পড়ে কিম্বা

আমরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলুম—কতক্ষণে পাকিস্তানের সীমানাটুকু পার হয়ে যাবো! লোয়ারগী মালভূমি থেকে লাণ্ডিখানায় সীমান্ত-সীমানা শেষের দূরত্ব খুব বেশী নয়, কিন্তু পাহাড়ী পথের দুর্গমতা আমাদের অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে—এই ছিল আশঙ্কা। তাছাড়া ঠিক ছিল পেশোয়ার থেকে কাবুলের মধ্যপথে-একশো মাইল দূরে আফগানিস্থানের বিশিষ্ট শহর জালালাবাদের হোটেলে পৌঁছে সে রাত্রির মত বিশ্রাম নেবো আমরা।

…মোটর সামনে এগিয়ে চলেছে। পথ বেশ…তবে উপলাকীর্ণ…ধূলিময়! পথের ধারে ঘন ঘন চোখে পড়ছিল সৈন্য-প্রহরীদের ছোট বড় নানান্ ঘাঁটি, কেল্লা, ছাউনী আর পাহারা দেবার গুমত্ টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের লাইন্ চলে গেছে এঁকে বেঁকে নানা দিকে…কখনো রাস্তার এপাশে, কখনো ওপাশে, কখনো উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে, আবার কখনো বা খাদের নীচে দিয়ে! রেলের লাইনও পথের পাশে পাশেই প্রায় চলতে সুরু করেছে—খাইবার গিরিবর্ত্মের শেষে খাড়াই থেকে উৎরাইয়ে নেমে আসার পর থেকেই। পথে, দূর থেকেই নজরে পড়লো—পাহাড়ের বুকে সুন্দর ছবির মত সাজানো সেনানিবাস শহর লাণ্ডি-কোটাল। সামনে উন্মুক্ত অনুর্ব্বর প্রান্তর…তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য সৈন্য-ব্যারাক আর তাঁবুর ভিড়ে ভরা ছোট্ট শহরখানি। চারিদিকে সৈন্য সমাবেশের এমন আবহাওয়া যে, মনে হয়, যেন আশে-পাশে কাছেই কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে পুরোদমে—তারই ঢেউ এখানে এসে লেগেছে এই রণাঙ্গনের পিছনে। ইংরাজ আমলে লাণ্ডিকোটাল ছিল সীমান্ত-রক্ষার প্রধান ঘাঁটি। আজ পাকিস্তানী আমলেও দেখলুম, অনুরূপ ব্যবস্থাই বজায় রয়েছে।

লাণ্ডিকোটাল ছেড়ে এগুলুম আমরা লাণ্ডিখানার অভিমুখে। খাইবার গিরিপথের পশ্চিম মোহনা হলো এই লাণ্ডিখানা…খাইবার পার্ব্বত্য-পথ এইখানেই শেষ। তাছাড়া লাণ্ডিখানা হলো পাকিস্তান সীমান্তের শেষ সীমা…সীমান্তের রেল-পথও এইখানে শেষ হয়েছে! এখানে দুর্গ নেই—আছে রক্ষী-সৈন্য-প্রহরীদের ছাউনী! মাল-পত্র এবং যাত্রীদের আসা-যাওয়ার সময় কড়া-নজর এবং তল্লাশীর জন্য এখানে একটি সরকারী দপ্তর আছে!

মাইল চারেক পথ মাড়িয়ে, অল্পক্ষণ পরেই আমাদের মোটর-ভ্যান্ দুখানি এসে থামলো পথের ধারে অবস্থিত লাণ্ডিখানার সীমান্ত-রক্ষীদের দপ্তরের সামনে। লাল-ইঁটে গাঁথা টিনের চালা দেওয়া উঁচু টিলার উপরে বাংলো-ধরণের লম্বা-সুবৃহৎ একতলা বাড়ী—সামনে সবুজ ঘাসে-ঢাকা লন্…গাছপালায় সাজানো! দেখলুম আরো কয়েক খানা মাল ও যাত্রী বোঝাই মোটর-বাস ও লরী জড়ো হয়ে রয়েছে দপ্তরের সামনেকার পথের ওপরে!

আমাদের গাড়ী থামতেই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সুদর্শন এবং বিশাল-দেহ পাঠান-কর্ম্মচারী তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে নেমে এলেন বিদেশী যাত্রীদের বিষয়ে তথ্য-তল্লাশ নিতে। দপ্তরের লোকেরাই আমাদের মাল-পত্র সব গাড়ী থেকে নামিয়ে এনে জমা করলে প্রাঙ্গণের উপর। এখানে যাত্রীদের ছাড়-পত্রাদি এবং মাল-পত্র সব পরীক্ষা করে দেখেন কাষ্টমস্ কর্ম্মীরা—সীমান্ত এলাকা পারাপারের সময়। লোকজন এখানে সকলেই পাঠান! সুদর্শন পাঠান কর্ম্মচারীটি আমাদের পাশপোর্ট দেখে সবাইকার কুলকুণ্ডী জানতে চাইলেন…অর্থাৎ, সেই সনাতন প্রশ্নমালা! আমরা বিদেশী বলে প্রথমে খুব সন্দেহ এবং আমাদের সঙ্গে প্রথম আচরণ ছিল সংশয়াচ্ছন্ন। পরে যখন 'সিনেমাওয়ালা' বলে পরিচয় পেলেন, তখন সহৃদয়তার বন্যা বয়ে গেল সীমান্তের সরকারী দপ্তরে! সকলেই সাগ্রহে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কাষ্টমসের যে কর্ম্মীরা আমাদের মাল-পত্র ঘেঁটে খুঁটে হাতড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে কড়া তল্লাশী চালাচ্ছিলেন এতক্ষণ—সিনেমার সোনার কাঠির স্পর্শে তার শান্তি হলো…পাশ্‌পোর্ট আর পথের Visa দেখানোর প্রাণান্ত পালাও প্রশমিত হয়ে সুরু হলো সিনেমা ষ্টুডিওর গালগল্প। কৌতূহলী দর্শকের ভীড় জমে গেল আমাদের আশেপাশে। পলকের মধ্যেই পরম-বন্ধু হয়ে উঠলেন সেখানকার সবাই!

দপ্তরের দরদী-কর্ম্মীরা আমাদের মালপত্র সব নিজেরাই প্রাঙ্গণ থেকে তুলে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে আবার যথাস্থানে বোঝাই করে রেখে এলেন পথে অপেক্ষমান মোটর ভ্যান্ দুখানিতে। সুদর্শন পাঠান-কর্ম্মচারীটি সাদরে সামনে ধরে দিলেন 'সীমান্ত দেশের মেহ্‌মান্'—আমাদের সম্মান-জানাবার জন্যে—একরাশ সদ্য খাসা টাটকা আপেল-নাশপাতি আঙুর আখরোট বাদামের ডালা। সারাক্ষণ সঙ্গে রইলেন আমাদের আত্মীয়ের মত আপ্যায়ন জানিয়ে। আমরা সকলেই যে অজানা বিদেশী—এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম সেদিন।

যাত্রা-পথে বিরতির ফাঁকে সোভিয়েট সঙ্গী আভাকভ আর প্যাস্তেল, পেশোয়ার থেকে আনা-খাবারের প্যাকেট ও থালা, গেলাশ, চায়ের বাটি সাজিয়ে ইতিমধ্যেই দপ্তরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণেই ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন আমাদের বৈকালিক জলযোগের…দপ্তরের কর্ম্মীদের আহ্বান করে একত্রে সারি দিয়ে বাগানের সবুজ ঘাসের আসনে বসেই আমরা পরমানন্দে বসে গেলুম আহারে, সীমান্তের সীমাহীন উন্মুক্ত আকাশের নীচে, শান্ত প্রকৃতির কোলে বিশ্বমানবতার বিচিত্র বন্ধুত্বের বন্ধনে—এক হয়ে, সমান হয়ে, ভাইয়ের মত ভালোবেসে!

কিন্তু এ ক্ষণস্থায়ী যোগাযোগ…সামনে সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য পথ মাড়িয়ে, চলতে হবে এখনও—জালালাবাদে পৌঁছতে হবে। কাজেই জলযোগ সেরে ক্ষুন্ন মনে নবলব্ধ ক্ষণিকের বন্ধুদের ছেড়ে লাণ্ডিখানার দপ্তরের মায়া কাটিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম আমরা! বিদায়ের মুহূর্ত্তে 'আল্লার দোয়া' জানিয়ে আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন সেই সুদর্শন পাঠান বন্ধুটি!

লাণ্ডিখানার দপ্তর এবং বন্ধুদের ছেড়ে খানিক এগুতেই পথের ডান পাশে বিরাট একখানি ফলক চোখে পড়লো—তাতে লেখা আছে…"It is Absolutely Forbidden to cross this border into Afghan Territory"—অর্থাৎ এই সেই সীমান্তের শেষ সীমানা…আগে ছিল ইংরাজের, আজ পাকিস্তানীদের…রূপান্তর ঘটেছে শুধু চেহারায়—মনে নয়!

সামনেই পথের উপরে এবং আশে পাশে আগাগোড়া কাঁটা তারের উঁচু বেড়া-জাল দিয়ে ঘিরে রাখা…শুধু যাতায়াতের পথটুকুর উপর কাঁটা তারের এক ফটক—সেটি বন্ধ থাকে সর্ব্বদা, শুধু যাত্রীদের যাতায়াতের সময় খুলে দেওয়া হয়—তাও পথিকের কাগজ পত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখবার পর ! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—বেড়ার এপাশে পাকিস্তানী সীমান্তে পাহারার এত কড়াকড়ি, অথচ ওপারে আফগান্ সীমান্তে তার এতটুকু আয়োজন নেই…কাঁটা ঘেরা বেড়াজালের ওপারে পড়ে আছে দেখলুম বিশাল উন্মুক্ত পার্ব্বত্য প্রান্তর !

পাকিস্তানের সীমানায় কাঁটা বেড়ার ফটকের পাশেই রয়েছে পেট্রোলের দোকান—একেবারে আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুসজ্জিত ! সীমান্তের মোটর-আরোহী যাত্রীরা এখানে ইচ্ছামত তাঁদের গাড়ীতে সঞ্চয় করে নিতে পারেন যন্ত্র বাহনের পথ চলবার খোরাক ! আফ্‌গানিস্তানের অজানা পথে পাড়ি দেবার পূর্ব্বে প্যাণ্ডেলস্ত প্রচুর পেট্রোল ভরে নিলে আমাদের মোটর ভ্যান দুখানিতে ! তারপর পাকিস্তান পিছনে ফেলে কাঁটা তারের ফটক পার হয়ে গাড়ী আমাদের বয়ে নিয়ে চললো আফগানিস্তানের পাহাড়ী পথে। (ক্রমশঃ)

একাডেমির বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সমগ্র ভারতে 'একাডেমি অফ্‌ ফাইন আর্টস্'-এর নাম আজ সুবিদিত। জাতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ইহাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। প্রতিবৎসর বড়দিনের সময় কলিকাতায় একাডেমি যে বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া থাকেন, তাহার জন্য শিল্প-রসপিপাসু নরনারী মাত্রেই উহার পরিচালকদের নিকট কৃতজ্ঞ।

'ক্ষেতের কথা' স্বর্গত হেমেন্দ্র মজুমদার

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের তিরোধানের (৫ই ডিসেম্বর ১৯৫১) কয়েকদিন পরেই ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে এবারের বার্ষিক প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন—"বর্ত্তমানে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানকারী নেতা হিসাবে তিনি বহু শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা তাঁহার ধারা যে কেবল অক্ষুণ্ণ রাখিবেন তাহা নয়, ইঁহাদের শিল্পগুরুর ভবিষ্যৎ স্বপ্নও সফল করিতে হইবে।"

রাজ্যপাল উদ্বোধন বক্তৃতায় আরও বলেন—"প্রাচীন ভারতে শিল্পকলা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। বাসগৃহে, উপাসনা মন্দিরে, প্রাচীরে, পোষাক-পরিচ্ছদে, বস্ত্রবয়নে, শাল ও কার্পেটে এবং জাতীয় উৎসবাদিতে শিল্পকলার বিশেষ স্থান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রদর্শনী, চিত্রশালা ও যাদুঘরে উহা স্থান পাইয়াছে। শিল্পের রসগ্রাহী স্বল্প কয়েকজনের মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ। যতদিন না জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি পায়, ততদিনের জন্য শিল্পকলা প্রচারের কার্য্য স্থগিত রাখিতে হইবে। 'খাওয়া পরা লইয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু শিল্প ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া যে চির-আনন্দ লাভ করা যায়, তাহার তুলনা নাই। যাঁহাদের সামর্থ আছে, তাঁহাদের শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণ মানুষের মনে শিল্পপ্রীতি জাগাইতে পারিলে, তাহার বাসগৃহে, আসবাবপত্র ও পোষাকে, ব্যবহারের তৈজসপত্রে, এমন কি জীবিকার্জ্জনে

রাজ্যপালের কথাগুলি শিল্পরসিক ও শিল্পপ্রসারে আগ্রহশীল সকলের পক্ষেই বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

ভারতে শিল্পকলা চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীতে একটি 'ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারী' স্থাপনের প্রচেষ্টা বিগত কয়েক বৎসর হইতে চলিতেছে। এই সম্পর্কে 'একাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এর সভানেত্রী লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় সেদিন জানাইয়াছেন—প্রস্তাবিত ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারির জন্য তাঁহারা একটি নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ভবন নির্ম্মাণের জন্য যে অর্থ আবশ্যক তাহা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিও পাইয়াছেন। একাডেমি ইতিমধ্যেই উহার জন্য ধীরে ধীরে চিত্রাদি ও অন্যান্য শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ সুরু করিয়াছেন কিন্তু এখনও উপযুক্ত জমির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

'স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা' সতীশ সিংহ

লেডি মুখার্জ্জি আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আর্ট গ্যালারীর প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, গৌরবময়ী কলিকাতা মহানগরীর গৌরব যে আরও বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একাডেমি অনেকদিন হইতে এই চিন্তা করিতেছিলেন যে, তাঁহারা পদক ও পুরস্কারপ্রদান বন্ধ করিয়া দিবেন। কারণ, বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনীতে পদক ও পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প নিদর্শনকেই সাধারণে ভ্রমবশতঃ সেই বৎসরে প্রদর্শিত শিল্পকলার সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

'দুপুরের গাল-গল্প' সুনীলচন্দ্র সেন
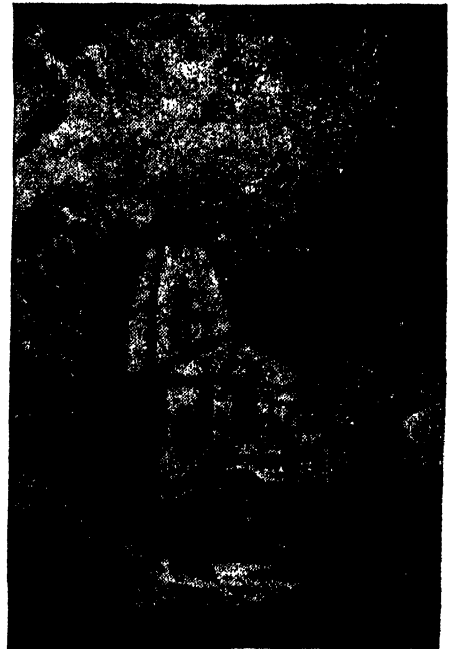
'কেদারনাথ' নগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (দিল্লী)

কোন ভাল অয়েল পেন্টিংকে পদক দেওয়া হইলে লোকের ধারণা জন্মিয়া থাকে যে, সেই চিত্রখানি সমগ্র প্রদর্শনীক্ষেত্রে অয়েলপেন্টিংএর শ্রেষ্ঠতম

'বাকিংহাম ক্যানাল' জি, ডি, থিয়াগারাজ (মান্দ্রাজ)

নিদর্শন। কিন্তু ইহা সত্য নহে! খ্যাতনামা শিল্পীরা প্রদর্শনীতে চিত্রাদি পাঠাইলেও প্রতিযোগিতায় যে যোগদান করেন না, ইহা জানা কথা। তথাপিও লোকে উক্তরূপ ভ্রমে পতিত হন। এবার একাডেমি হইতে কাহাকেও কোন পুরস্কার বা পদক দেওয়া হয় নাই। তবে যাহাতে শিল্পীদের প্রদর্শিত চিত্রাদি বিক্রয় হয় সে জন্য একাডেমির কর্ত্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সে চেষ্টা আশাপ্রদভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও ভারতের নানাস্থান হইতে অয়েল, ওয়াটার, প্যাষ্টেল এবং ব্লাক এণ্ড হোয়াইট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বহু চিত্র এবং প্লাষ্টার ও কাঠের ভাস্কর্য্য নিদর্শন প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল। এ সকলের মোট সংখ্যা প্রায় তিনহাজার হইবে। এই সংখ্যাধিক্যের জন্য নির্ব্বাচকদের বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাঁহারা ইহার মধ্য হইতে কিঞ্চিদধিক ছয়শত শিল্প নিদর্শনকে প্রদর্শনীর জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

একাডেমির ষোড়শ বার্ষিক প্রদর্শনীক্ষেত্রে এবার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়—আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। পূর্ব্বে প্রদর্শনীতে যাইলে চক্ষুকে যৎপরোনাস্তি পীড়িত না করিয়া কখনও সুষ্ঠুভাবে ছবি দেখা যাইত না, কিন্তু এবার একাডেমির কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে কি অয়েল, কি ওয়াটার, কি প্যাষ্টেল সকল ছবিরই পূর্ণরূপ দর্শকের চক্ষে সহজ প্রতিভাত হইয়াছে।

প্রদর্শনীর সকল চিত্রের পরিচয় প্রদান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। যেগুলির কথা মোটামুটি এখানে আলোচনা করিব, সেগুলি ব্যতীত উল্লেখ ও প্রশংসার যোগ্য আর অন্য কিছু ছিল না, এরূপ না কেহ মনে করেন। অয়েলকলার চিত্রসমূহের মধ্যে প্রথমেই শিল্পাচার্য্য শ্রীযামিনী-প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্য কয়েকখানির উল্লেখ করিতে

চিরখ্যাতিমান সুদক্ষ শিল্পী ৭৫ বৎসর বয়স পার হইয়া এখনও যে নিজ তুলির শক্তি পূর্ব্বের মত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রতিকৃতি চিত্রে সবিশেষ খ্যাতিমান শ্রীঅতুল বসু অঙ্কিত রায়বাহাদুর এন্, সি, ঘোষ ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর চিত্র দুইখানিই অতি সুন্দর হইয়াছে। বর্ণের এরূপ সামঞ্জস্য অতি অল্প চিত্রেই দেখা যায়। অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'নিশিথে বারাণসীঘাট' সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। অল্প কাজ করিয়াও তিনি চিত্রে সুন্দররূপ ফুটাইয়াছেন। স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ক্ষেতের কথা' চমৎকার। এইখানি শিল্পীর অঙ্কিত শেষ চিত্র। সুন্দরীনারীর অনবদ্যরূপের চিত্র তিনি যেরূপ দরদ দিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন, এই অতি সাধারণ-জীবনের সাধারণ চিত্রখানিতেও সেই দরদের প্রমাণ পাওয়া যায়। এইখানি চিরদিন তাঁহার স্মৃতি সমানভাবে বহন করিবে। শ্রীসতীশ সিংহের "স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা" পরিকল্পনায়, অঙ্কনে ও বর্ণে সুন্দর হইয়াছে। চিত্রখানির বিষয়ের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। কলিকাতা মহানগরীর রাজপথেই আমরা এইরূপ বাসিন্দার দেখা পাইতেছি। শ্রীসুশীলচন্দ্র সেন অঙ্কিত "দুপুরের গাল-গল্প" চিত্রখানির কম্পোজিসন ও ড্রয়িং সুন্দর হইয়াছে—পরিবেশের সঙ্গে বেশ মিল আছে। কর্ম্মের অবসরে, শীতের দুপুরে মহিলারা রৌদ্রে বসিয়া গল্প করিতেছেন। চিত্রখানি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। শ্রীনগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "কেদারনাথ" অতি সুন্দর। চিত্রশিল্পী হিমালয়ের মধ্যে যাইয়া ছবিখানি আঁকিয়া আনিয়াছেন—তাহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। ডোরোথি মেরি অঙ্কিত 'কর্ণিস ফিসারম্যান' চিত্রটি আধুনিক ধরণে অঙ্কিত চিত্রসমূহের মধ্যে আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। কিশোরী রায়ের অঙ্কিত প্রতিকৃতি-চিত্র শ্রী জে, পি, গাঙ্গুলী এবং 'অতি বৃদ্ধা' দেখিয়াও আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীবিমল মজুমদারের অনবদ্য ল্যাণ্ডস্কেপ্ চিত্রগুলি দর্শক মাত্রেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

অয়েল কলারে অঙ্কিত মডার্ণ আর্টের অনেক চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছিল। তাহার মধ্যে রামকিঙ্কর, রথীন মৈত্র প্রভৃতির চিত্র বিশেষ

'তরুণী বিধবার একমাত্র আশা' বি, এন, জিজ্জা (দিল্লী)

উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের চিত্রের সকলগুলি বুঝিতে না পারিলেও, ইহাদের মধ্যে যে নূতনত্বের ছোঁয়াচ রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রদর্শনীতে ওয়াটার-কলার বা জল-রং চিত্র যাহা ছিল, তাহার অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবি। আমাদের বাঙ্গলার শিল্পীরা এবং অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীরা সাব্জেক্ট পেন্টিং ও নানা প্রকারের কম্পোজিসন করিতেন। কিন্তু এবারের প্রদর্শনীতে জল রং-এর ফিগার-কম্পোজিসন ছিল না বলিলেই চলে। মনে হয়, সমস্ত ভারতের চিত্র শিল্পীরা গোপন পরামর্শ করিয়া একযোগে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন। এই বিষয়ে মান্দ্রাজী শিল্পীরাই অগ্রগণ্য। ইঁহাদের মধ্যে জি, ডি, থিয়াগারাজ, সি, এম্, সুন্দররাজন ও জে, জ্ঞানাযুগাম প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। থিয়াগারাজের অঙ্কিত মান্দ্রাজের একটি দৃশ্য 'বাকিংহাম ক্যানাল' একখানি সুন্দর চিত্র। সকলেই এই ছবিখানির প্রশংসা করিয়াছেন।

ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের মধ্যে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত 'দুর্গা' এবারের একটি বিশেষ দর্শনীয় চিত্র ছিল। পরিকল্পনায়, রেখায়, বর্ণে ও সুষমায় ইহা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। নন্দলালের এত ভাল ছবি অনেকদিন দেখা যায় নাই। কমলারঞ্জন

'দি ষ্ট্রীট সিন'　　সোলেগাওনকর (বোম্বাই)

ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্র "শেষ্ঠ ভিক্ষা" সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বি, এন্, জিজ্জা অঙ্কিত "তরুণী বিধবার একমাত্র আশা" চিত্রখানি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভাব ও অঙ্কন উভয়ই সুন্দর। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্ম্মণের 'ইওলো ফ্লাওয়ার' এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ফ্লাওয়ার ষ্টাডি' উভয়ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ভারতীয় পদ্ধতিতে ও জল-রং এ বিশেষ পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্র কয়খানিই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তাহার মহাপ্রভু সম্পর্কিত দুইখানি ও নর্ত্তকীর চিত্রখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য

ভারতীয় পদ্ধতিতে আর একটি শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এই শিল্পীর নাম রাধাচরণ বাগচী। ইঁহার প্রদর্শিত চারখানি চিত্রই অপূর্ব্ব হইয়াছে। রেখা, বর্ণযোজনা, লাইট এণ্ড শেডে মোগলযুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীগণের কার্য্যের সঙ্গে তুলনীয়। "কাশ্মীরের পথে জাহাঙ্গীর ও নুরজাহান" চিত্রখানি যে কত পরিশ্রম করিয়া শিল্পীকে আঁকিতে হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বোম্বাই-এর শিল্পী সোলেগাওঙ্করের অঙ্কিত 'দি ষ্ট্রীট সিন' (টেম্পারা) চিত্রটি প্রশংসনীয়। সাধারণ পদ্ধতিতে আলোছায়ার দৃশ্য সুন্দর হইয়াছে। ঐ স্থানের এইচ. এ. গাদে, ও এম. এফ্. হুসেন, মাদ্রাজের পানিকর, দিল্লী ও মধ্যভারতের কানওয়ালকৃষ্ণ, চিনচিল্কার প্রভৃতি খ্যাতনামা পরিচিত শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচাঁদ

'প্রথম দৃষ্টিপাত'　　ইন্দ্র দুগার

দুগারের 'মুলেনা নগরী' (উদয়পুর) দৃশ্য-চিত্রখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ইন্দ্রদুগার কর্ত্তৃক সিল্কের উপর অঙ্কিত একরঙা চিত্র "প্রথম দৃষ্টিপাত" সুন্দর হইয়াছে। ভঙ্গী মনোহর, ভাবও সুপরিস্ফুট। শিল্পী গোপাল ঘোষের অঙ্কিত চিত্রগুলি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে

সক্ষম হইয়াছে। প্যাষ্টেল চিত্রে শিল্পী অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কারুশিল্প বিভাগে উড্‌কাট্‌, রঙ্গীণ উড্‌কাট ও লিথো ইত্যাদি দর্শকদের আনন্দ দান করিয়াছে। হরেন দাস রঙ্গীণ উড্‌কাট ও লিথো উভয়েই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শিল্পী এল্‌. এম্‌ সেনের কাঠ-খোদাই মূর্ত্তি দুইটি অতি সুন্দর। মিসেস্ লীলা ভাটের নির্ম্মিত 'ইনিষ্টিক্‌ট' নারীমূর্ত্তিটি অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে ও সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ইন্দুমতী লাগেটে কৃত ভাস্কর্য্য নিদর্শন 'নিগ্রো হেড্‌' সুন্দর হইয়াছে।

তালিকাভুক্ত শিল্পনিদর্শনগুলি ব্যতীত, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের পাঁচখানি সুপরিচিত চিত্র, রুশ-শিল্পী রোরিকের অঙ্কিত দুইখানি হিমালয়ের দৃশ্য এবং শিল্পাচার্য্য অসিতকুমার হালদারের কৃত চিত্রগুলি প্রদর্শনীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল।

আনন্দের কথা, প্রদর্শনীক্ষেত্রে বহুচিত্র বিক্রয় হইয়াছে! এ বিষয়ে মাদ্রাজী শিল্পীদের ভাগ্যই এবার সুপ্রসন্ন। তবে বাঙ্গালী শিল্পীদের ভাগ্যে যে অর্থ যোগ ঘটে নাই, এমন নহে। এই প্রদর্শনীকে বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য, সভানেত্রী লেডি রাণু মুখার্জ্জি, পরিচালকবর্গ এবং সম্পাদকগণ যে অপরিমিত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। *

* প্রবন্ধে প্রদত্ত চিত্রগুলির ফটো, কলিকাতা, ১৫৭-বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের 'ফটো সোসাইটি' কর্ত্তৃক গৃহীত।

বিস্মৃত কিশোর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মনে পড়ে সেই এক কিশোরের কথা
আজি মোর মনে জাগে ব্যথা।
সারাদিন বিদ্যালয়ে খেটে
বাড়ী ফেরে ক্রোশাধিক হেঁটে,
দ্বারে এসে ধূলা পায়ে মা বলিয়া ডাকে,
ঘরে ঢুকে বই খাতা রাখে।
কিছু খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে
ক্লান্তদেহে পড়ে না সে শুয়ে,
চলে যায় কাটি-গঙ্গা পানে
যেন সেই সঞ্জীবের 'পালামৌ পাহাড়ের' টানে।
নিঃসঙ্গ জীবন তার, নাই বন্ধু, সাথী
কি যেন কি বনে বনে খুঁজে পাতি পাতি।
ফুল তোলে পথে পথে ছড়ায় সে ফুল
ভালবাসে বৈকালের কাটি-গঙ্গা কূল।
সন্ধ্যা যবে ঘনাইয়া আসে
ফিরে আসে আপন আবাসে।
তখন ন'বৎ বাজে রাজার ভবনে
শঙ্খ বাজে জননীর মুখের পবনে।
বাসা বাড়ী! একদিন ছিল বড় রেশমের কুঠী
আজ ব্যবহারে আসে মাত্র ঘর দুটি,
বাকি সবি শূন্য প'ড়ে থাকে,
চারিপাশ এ কুঠীরে জঙ্গলেতে ঢাকে।
রাতের আহার সারি রেড়ীর প্রদীপখানি জ্বালে,
শিশি হ'তে সেই দীপে কিছু তৈল ঢালে।

চেয়ার টেবিল নাই চৌকিতেই বসে,
ম্যাপ আঁকে, গোটা দশ বারো অঙ্ক কষে
ভালো লাগেনাক তার ইস্কুলের পড়া,
অপাঠ্য পুস্তকে তার শেল্‌ফখানি ভরা।
গোটাদশ শ্লোক পড়ে খুলি ছোট্ট গীতা,
তারপর বুঝিবারে শেলীর কবিতা
প্রাণপণে চেষ্টা করে বার বার খুলি অভিধান,
বুঝিতে না পারি শেষে জন্মে অভিমান।
ইংরাজি প্রাইজ পাওয়া বইগুলি একে একে খুলি
দুই এক পাতা পড়ি ঝেড়ে মুছে ধূলি
রেখে দেয়, কিছু বোঝে কিছু সে না বোঝে,
পুঁথির-পাতায় নিত্য কি যেন কি খোঁজে।

তারপর টেনে নিয়ে কালীসিংহী শ্রীমহাভারত
কিংবা সেই রাজস্থানী কাহিনী বৃহৎ
পড়ে যায় কিছুক্ষণ। টেনে নিয়ে গণিতের খাতা
কবিতা লিখিতে বসে অকস্মাৎ ছিঁড়ে তার পাতা,
লিখিতে লিখিতে মিল খুঁজে নাহি পেলে
গ্রন্থ স্তূপে মাথা রাখি ভাবে সব ফেলে।
ঘুমাইয়া পড়ে শেষে কেতাবের ভিড়ে,
মশারি খাটায়ে দেয় মা আসিয়া সন্তর্পণে ধীরে।
লক্ষ্যহারা এ কিশোরে তোমরা কি চেন ?
মনে হয়—চিনি চিনি যেন ?

বিলাতের হ্রদ-পল্লী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

তখনও আমরা হ্রদ-বহুল প্রদেশে পৌঁছাইনি। মাত্র প্রথম দিন লণ্ডন হ'তে রওনা হ'য়ে সন্ধ্যার পর ওয়ারউইক-সায়ারের লিমিংটনে এসেছি। কুকের যাত্রী-কোচ—ভারতবাসী আমি একেলা। বাকী যাত্রীদের মধ্যে আছে—আমেরিকা, কানাডা, কেনিয়া এবং ইংলণ্ডের লোক। মোট ১৭ জন মহিলা। পুরুষ-যাত্রী পরিদর্শক ও মোটর-চালক ছাড়া চারজন।

আরও আটদিন একত্র থাকতে হ'বে। রিজেন্ট হোটেলে ভোজনের পর হলঘরে আমরা ভ্রাম্যমানের দল দু-তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে বসলাম। সহরের লোকেরা ভিন্ন শ্রেণী। সারাদিনের যাত্রা সম্বন্ধে এক কৌতুক কবিতা পাঠ করলাম—নিজের বিষয়। কারণ অপরকে ব্যঙ্গ করবার মত যথেষ্ট পরিচয় পরের সাথে তখনও হয়নি। কিন্তু সেই খাপছাড়া ছন্দহীন কবিতা মৃতের অস্থির মত ভেল্‌কী খেললে। আমার সবগুলি সহযাত্রী পরস্পর ফ্রি-মেশনের মত আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধা পড়লো। পরদিন রাত্রে আমেরিকী শ্রীমতী হোয়াইট এক কবিতা রচনা করলেন যাতে আমি বর্ণিত হ'লাম—"ইণ্ডিয়ান মিষ্টিক।" কারণ ইতিমধ্যে দু'একজনের কর-রেখা দেখে তাদের বন্ধু লোকের নিকট হ'তে পাওয়া সমাচার সরবরাহ করেছি।

কাজেই দ্বিতীয় রাত্রে ডার্বীসায়ারের বাক্সটন সহরের প্যালেস হোটেলের নামের উপযুক্ত প্রকাণ্ড সুসজ্জিত বসবার ঘরে যখন ইংরাজ মেম শ্রীমতী বেন্‌স প্রশ্ন করলেন দৃশ্য সম্বন্ধে, ক্যানাডার পাদরী রেভারেণ্ড মূর ভদ্রভাবে কথা এড়াবার জন্য একটা অভদ্র হেম্ উচ্চারণ ক'রে একটু কাস্‌লে।

মিস্ বেন্‌স নিজের মনে বল্লেন—এ সহরটি ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ—এক হাজার ফুট উচ্চে। কী সুন্দর গড়ানে মাল-ভূমি, সানুদেশ, উপত্যকা আর বেগবতী নদীর ধার দিয়ে এলাম।

মিস্ বেন্‌স লণ্ডনে এক সওদাগরী অফিসের সেক্রেটারী। আমাকে স্বীকার করতে হ'ল, ইংলণ্ডের সবুজ রঙের মাধুরী। সহরে যেমন গগনচুম্বী বাড়ির সারি লোককে প্রকৃতির

শ্রান্ত ধেনু

কোল থেকে তুলে নিয়ে ইট-পাথরের পিঁজরায় ভরে, তেমনি বিলাতের মাঠ তাকে স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছে দেয়, প্রকৃতির লীলা-ভূমির প্রাঙ্গণ পথে। এক এক জায়গায় দেশ যেন সোহাগে গড়িয়ে পড়ছে। আবার অদূরে অভ্রচ্ছ শৈল দেখে গা তুলে তার দিকে উঠছে। সারা দেশটা সবুজ। মাঝে মাঝে গাছ। কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে সেই সবুজের মাঝে সোণার বরণ বাটারকাপ আর ডেজী ফুটে আছে। যেথায় লোকের বাস, কুটীরের অঙ্গনে নানা জাতীয় ফুল। অনেক গৃহের প্রাচীর বহে উঠেছে কাঠ-গোলাপের

লতাতরু। মজা নদীতে অবশ্য মজা নাই, তবে বাক্সটনের কাছে গড়ানে নদী চঞ্চল।

আমেরিকার ব্লেকমুর সাহেব বৃদ্ধ। স্ত্রীর অনুরাগী। সদাই তাঁকে বগলদাবাই করে ঘুরতেন। তিনি সিকাগোর উচ্চপদস্থ ফ্রি-মেশন—আমার বাংলায় যে পদ তা অপেক্ষা তাঁর পদ উচ্চ। তিনি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেছেন, অবশ্য সস্ত্রীক।

ব্লেকমুর বল্লেন—ব্রাদার গুপ্ত। তোমাদের দারজিলিং কত উঁচু।

আমি হেসে বল্লাম—সাড়ে ছয় হ'তে সাত হাজার। কিন্তু—
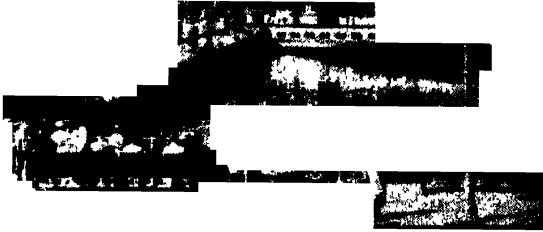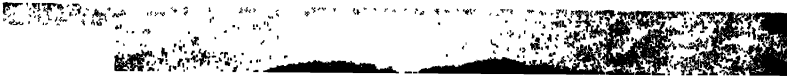
হ্রদের দৃশ্য

বেন্সের মুখের ওপর হোলির রং ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বল্লেন—আমি তুলনা করছি না। কাশ্মীরের কথা শুনেছি। আমাদের দেশের বাক্সটন সুদৃশ্য।

ব্লেকমুর অপ্রস্তুত হ'ল। আমি যে কথাটা ভাবি এবং দেশ-ভ্রমণে যে নীতি অনুসরণ করি, সে কথা বল্লাম। যখন যেমন তখন তেমন—যখন যে রস পান করবে তখন তারই স্বাদে ভরপুর হবে—তবে সুখ হবে পর্য্যাপ্ত। তার পর তুলনা করতে হয় কর।

এ কথা সকলকে স্বীকার করতে হ'ল। তার পর যে কথা বল্লাম তার ফলে অস্ট্রেলিয়ার মিসেস্ বেন্স হেসে

বল্লাম—আজ আমরা যে দুটি সহর দেখলাম তথায় জন্সটন, বস্ওয়েল, মুর প্রভৃতির পদ্য ও গদ্য রচিত হ'য়েছিল। তাদের কারও কবিতা পড়বার সময় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সঙ্গে তুলনা করলে, ওদের কবিতার মাধুরী উপভোগ করা যায় না। আবার টেগোরের সঙ্গে তুলনায় তাঁরও শক্তি ম্লান হয়।

মিসেস বেন্স বল্লেন—তোমাদের এ গর্বের কথা সবার মুখে।

হেসে ফুল ছুঁড়ে মারলেন।

মিসেস হোয়াইট আধা-বয়সী বিধবা। কবিতা লেখেন। ছবি অবশ্য সবাই তোলে। তিনি বল্লেন—তাঁর সব লেখা ইংরাজিতে অনূদিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহ'লে তোমাদের গর্বের কথা মানব। অনুরাগেরও প্রমাণ পাব।

অনুবাদ। পরের তোষণের জন্য! দেশের গরীব লোকের হাতে রবীন্দ্রনাথ পৌছতে পারে না। বিদেশীর কথা কর্তৃপক্ষের চিন্তা-ধারার নিশ্চয়ই ত্রিসীমায় প্রবেশ করে না। যাক্।

পথে দেখেছিলাম কেনিলওয়ার্থ। এখন দুর্গ ভাঙ্গা। তবু তার স্থিতি-ভূমি দেখে মনে হয়, স্থান রোমান্সের উপযোগী। স্কটের কথা পরে বলব—তাঁর বিশেষ কর্মক্ষেত্রের প্রসঙ্গে।

লিচ্ফিল্ড। এ সহরের ক্যাথিড্রলের কারুকার্য্য অসাধারণ। যে কয়টি গীর্জার সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব করে ইংলণ্ড, লিচ্ফিল্ড ক্যাথিড্রল তাদের অন্যতম। এর ভিতরের পাথরের মূর্ত্তিগুলি সুন্দর। আর তেমনি বাহার পিছনের কাঁচে পরদার মূর্ত্তির। এ গীর্জাটিকে বলা হয়—কুইন অফ ইংলিস মিন্স্টারস।

কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের জন্মভূমি বা কর্মভূমি সাহিত্য-

ইংরাজি লেখক ও কবি স্যামুয়েল জনসনের বাল্যের কর্মভূমি। তিনি হেথায় ১৭০৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মভূমি দেখলাম। আমাদের গাইড ডাঃ সেণ্ট লিউক। তাঁর পিতার পুস্তকের দোকান ছিল এ সহরে। লণ্ডনে ফ্লিট ষ্ট্রিটে জনসনের এক বাড়ী আছে।

লিচ্ফিল্ডের অনতিদূরে উত্তরে এস্বোর্ণ একটি ছোটো সহর। হেথায় ডাক্তার জনসন, তাঁর জীবনচরিত লেখক বস্ওয়েল, কবি টমাস মূর, জর্জ ইলিয়ট, ওয়ালটন, কনগ্রিভ, ক্যানিঙ প্রভৃতি মাঝে মাঝে বাস করতেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোসো কিছুদিন হেথায় ছিলেন।

আমাদের পরিদর্শক ডাঃ লিউক অক্সফোর্ডের পি, এচ্ ডি। যেমন পণ্ডিত তেমনি অমায়িক। তাঁর ঐতিহাসিক বিবৃতিতে আনন্দ লাভ করছিলাম বিশেষভাবে আমি এবং দুটি যুবতী—ক্যানেডার মিস্ মিচেল সদ্য এম্ এস্ সি পাশ করা মহিলা, আর মিস্ এস বারলিণ্ডি কোপেনহেগেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থরক্ষিকা। মেয়েটি এম্-এ। কিন্তু ইংরাজি অতি অল্প জানে। সুতরাং ডাঃ লিউকের পর আমাকে আর একদফা বোঝাতে হত তাদের। আর অস্ট্রেলিয়ার দুটি মহিলা প্রায়ই কঠোর সাহিত্য সমাচার পরিবেশনের সময় জোগাড়যন্ত্র করে আমাদের জন্য চকোলেট কিনে আনতেন কুপন দিতেন লণ্ডনের শ্রীমতী এন্টনী ও মিঃ ম্যানথর্প।

এ সহরের কিছু উত্তরে ম্যাটলক। ভারি সুন্দর জায়গা, উঁচু জমিতে হোটেল। হাজারীবাগের মত। পথে পড়ে ডাবলী ডেল—নিচু জমিতে তার এক প্রাচীন গীর্জায় লিউক একটি ইউ গাছ দেখিয়ে বল্লেন—ইংলণ্ডের এইটি সবার হতে প্রাচীন ইউ গাছ।

তথাস্তু! একজন সাহেব বল্লেন—হুম্। গাছ দেখতে হয় তো পূব আফ্রিকায় চলুন! আবার তুলনা!

ইংলণ্ডের ভারবীসায়ারের এই দেশকে বলে পিক্ কান্‌ট্রি।

এমন স্থলে মানুষের সকল জড়তা লোপ পায়। ডেনমার্ক, ক্যানাডা, মার্কিণ, পূব-এফ্রিকা অবাধে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশে এলোমেলো আবল তাবল বহু কথা কহিল। সবার আনন্দ। এর উত্তরে অ্যাশ্বিলসাইড ক্ষুদ্র সহর যাত্রীতে ভর্ত্তি ছিল।

তার পর আমরা গিয়েছিলাম গ্রাসমিয়ার। ঐ নামের লেকের উত্তর ধারে ক্ষুদ্র গ্রাম। সরোবরের ধারে সুন্দর একটি হোটেল, যুবতী সহযাত্রী দুটি ছুটতে সুরু করলে লেকের ধারে। বর্ষীয়সীরাও চঞ্চলা। ঠিক দুপুর বেলা। হোটেলের ঘরে বসে লেক দেখা যাচ্ছে। সেথায় এক পিয়ানো।
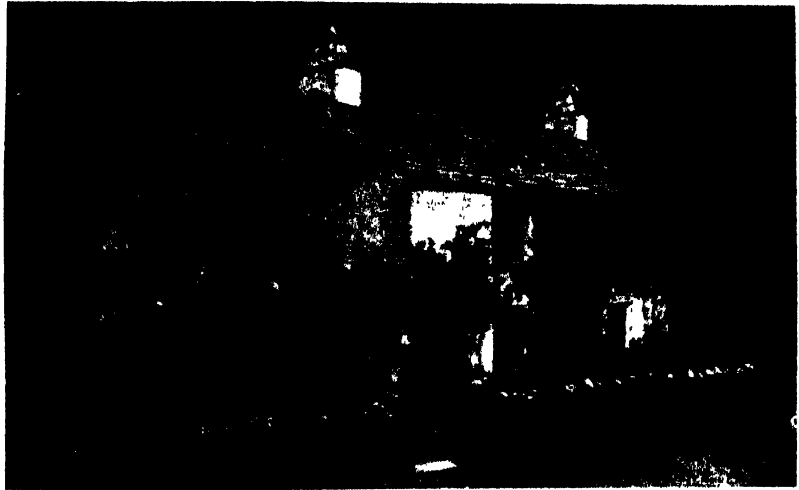
ওয়াড্স্ওয়ার্থের গৃহ

মিস্ লিউইস (মার্কিণী) প্রস্তাব করলেন মিষ্টার গাপ্টা ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। সকলে একবাক্যে সমর্থন করলে। দুজন মেম সাহেব ভারতীয় মিস্তিককে ধরে নিয়ে গিয়ে পিয়ানোর ষ্টুলে বসিয়ে দিলে।

আমার বাংলার যন্ত্র সঙ্গীতের ছন্দে ওদের ফক্সট্রট নৃত্য চলে। সুতরাং তেমন ইচ্ছা প্রকটিত হ'ল। কিন্তু বাকী তিন জন পুরুষ আর মহিলার সংখ্যা তিনগুণের বেশী। সে

শুভ ইচ্ছা বন্ধ হল। আমি এ ঘটনার উল্লেখ করছি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মাঝে মানব-মনের প্রতিক্রিয়া বোঝাবার জন্য।

এই গ্র্যাসমিয়রে ডাভ কটেজে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বাস করতেন। ইংরাজি কবির মধ্যে ভারতীয় কবির মত, প্রকৃতির প্রাণের সাড়া পেতেন তিনিই অধিক এই কপোত কুটীরে বসে। তাঁর "আমরা সাতজন," "লুসি গ্রে" "ড্যাফোডিল" "অমর জীবনের গীতিকা" এ দেশের ইংরাজি শিক্ষার্থীর মনে আনন্দ জাগায়। এই সুন্দর পরিবেশেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর অজস্র বিমোহন কবিতা। হঠাৎ লিউক সাহেব তাঁর কবিতার চার লাইন আবৃত্তি করলেন।

ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের সমাধি স্থান

আমি কপোত কুটীরের সংগ্রহশালায় বসে তার তর্জমা করলাম। আশ্চর্য! আমার বাংলার শব্দ-ছন্দ সবার প্রশংসালাভ করলে। তিন জনের অটোগ্রাফ খাতায় এই বাংলা কবিতাটি লিখতে হ'ল।

শৈলে, উপত্যকা তলে চলে মেঘ ভাসি
তেমতি পথিক আমি নিঃসঙ্গ নির্জন,
যাত্রা পথে আচম্বিতে পৌছিলাম আসি—
হেরি ডাফোডিল সারি কাঞ্চন বরণ
বায়ুভরে বৃক্ষতলে সরসীর কূলে
খেলিছে অজস্র ফুল নৃত্য ছন্দে দুলে।*

এই স্থলের সন্নিকটে রাইডাল মাউণ্ট। সেথায় কবি বহু কাব্য ও কবিতা রচনা করেছিলেন। শেষে দেখলাম তাঁর সমাধিস্থল গ্রাসমিয়ার গির্জার প্রাঙ্গণে। অনাড়ম্বর শেষ বিশ্রামস্থল। বহু গ্রামবাসীর পাশে নিহিত বরদেহ। তারিখ ২৭শে এপ্রেল ১৮৫০ সাল।

আকাশপথের যাত্রী শ্রীমতী সুষমা মিত্র সেক্সপীয়রের জন্মভূমি দেখার প্রসঙ্গে তাঁর কন্যার বিষয় বলেছেন—"আজ যে সেক্সপীয়র সম্বন্ধে সে এত সজাগ, তার কারণ স্কুলে সে সেক্সপীয়রের বিষয় অনেক কিছু পড়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। কেন খুকুর মত ছেলে মেয়েরা এ দেশের কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের খুঁটিনাটী সম্বন্ধে জানতে অনুপ্রাণিত হবে না?"

ও-দেশের কবিদের জন্মভূমি ও কর্মভূমি দেখে আমারও ঐ কথা মনে হয়, সবারই হয়। ওরা রাজার জাত ছিল, ইংরাজি পড়িয়ে আমাদের ঔৎসুক্য জাগিয়েছে তাই ইংরাজি শ্রেষ্ঠ মনীষীদের রচনা সম্বন্ধে আমাদের সম্যক হবার বাসনা জাগে চিত্তে। কিন্তু ভিক্টর হিউগো, জোলা, টলস্টয়, তুর্গেনিভ বা স্কট হ্যামসন তো রাজার জাতির লোক ছিলেন না। তাঁদের ওদেশের লোকই আমাদের চিনিয়েছে। আমরা বিদেশী ভাষায় বিশ্ব কবি বা বঙ্কিমচন্দ্রের অমর রচনা দান না করলে করবে কে?

কিছুক্ষণ পূর্বে রবীন্দ্র রচনাবলী সম্বন্ধে যে কথা বলেছি, সভা সমিতিতে সে কথার উল্লেখ করে সময়ে সময়ে অপ্রিয় হয়েছি। তবে কর্তৃপক্ষের কৃপালাভে বঞ্চিত হব না, যদি বলি যে আমার মত গরীবের ঘরেও সেক্সপীয়র, বার্ণার্ড সা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি বিশ্ব-বরেণ্যদের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী, আছে এবং কোনোখানির জন্য দশ টাকার অধিক অর্থ ব্যয় করিনি।

* "I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills
When at once I saw a crowd
A host of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze

কাশ্মীরে শ্রীঅমরনাথ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল

চার

"শরণকুমারী"

১৭ই আগষ্ট ১৯৫১ শুক্রবার। অমরনাথের গুহা মন্দিরে যাওয়ার পথে শেষ তাঁবু ফেলার জায়গা পঞ্চতর্ণী থেকে ভোর বেলা রওনা দিয়েছি অমরনাথের দিকে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় যত কাদা তত পিছল। মাঝে মাঝে আধ মাইল সিকিমাইল ব্যাপী বরফের জমাট চাপ হেঁটে পার হতে হয়। রাস্তা এত পিছল যে, শুনলুম সেদিন সকালেই দু'একটা ঘোড়া পর্যন্ত পিছলে পড়ে গেছে। সেই জন্য ক্যারাভানের সঙ্গে তত্ত্বাবধান করার জন্য যে পুলিস আসছিল, তারা ঘোড়া, পাল্কী, কাণ্ডী ইত্যাদি সমস্ত বাহন বন্ধ করে দিয়েছিল। যাত্রীরা নিজেদের পায়ের ওপোর ভরসা করে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে এগিয়ে চলে। মাতা, পুত্র এবং স্ত্রী এক হাতে পাণ্ডা বা কুলির হাত ধরে, অন্য হাতে লাঠী নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন একদম ভোরবেলা; অধম আমি অনেক পরে ছাতাটি মাথায় দিয়ে আমার সেই পুরাতন গাছের ডাল-ভাঙ্গা লাঠীখানি হাতে নিয়ে চলেছি। জামা কাপড় সবই ভিজে গেছে। ছুঁচের মত ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লেগে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে, তবে নেহাৎ হাঁটছি বলে শরীর কিছুটা গরম আছে, এই যা।

পঞ্চতর্ণীর তাঁবু থেকে কিছুটা এগিয়ে এসে একটা ঢালু বরফের চাপ পার হতে গিয়ে দেখি, বরফ এত পিছল হয়ে আছে যে, রবার-সোল জুতো পরে যাওয়া অসম্ভব। জুতো হাতে নিয়ে খালি-পায়ে প্রায় একশ-দেড়শ গজ বরফ পার হতে পায়ের তলা একেবারে অসাড় হয়ে গেল। পরে একটা উঁচু পাথরে কয়েকবার পা ঠুকে আবার যখন পায়ের সাড় ফিরে এল, তখন জুতোটি পরে আবার ধীরে ধীরে এগোনো গেল। বেলা তখন আন্দাজ সাড়ে আটটা হবে। বহু যাত্রী ফিরে আসছে। প্রত্যেকেরই জামা-কাপড় ভিজে এবং সকলেরই গায়ে এত কাদা যে, স্থির জানা যাচ্ছে, তারা নিরাপদে আছাড় খেয়েছে। নিরাপদ-আছাড় বল্‌ছি এই কারণে যে, আপদযুক্ত আছাড় হলে তারা আর ফিরতো না। এই সব যাত্রীদেরই মুখে শুনলুম যে, দুএকজন পিছলে খাদে পড়ে গেছে, অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন। পুলিসও বল্লে, তিন আদমী খদমে গির গিয়া।

সাহসে ভর করে একটা চড়াই পার হয়ে সামনে দেখি, এক দারুণ উৎরাই। কাদা ও পিছলে চড়াইয়ের তুলনায় উৎরাই আরও বেশী বিপজ্জনক। এদিকে আমার সঙ্গে যাওয়ার যাত্রী কেউ নেই। সকলেই ফিরছে। দেরী করে বেরিয়েছি বলে এইরূপে সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছি। অনেক নীচে, প্রায় হাজার ফুট আন্দাজ তলায় অমরগঙ্গা নদী, যেটা কাশ্মীরে সিন্ধু নদ নামে পরিচিত। সেই নদটি বরফে একবারে ঢাকা রয়েছে, তার ওপোর দিয়ে মিলিটারী পোষাক পরা প্রায় ২০।২৫ জন লোক পুতুলের মতো হাঁটছে। পরে শুনলুম, এই সিন্ধু নদের ওপোরের জমাট বরফের রাস্তা দিয়েই বালটাল যাওয়ার পথ। এই পথ দিয়ে মাত্র মিলিটারীরাই যাতায়াত করে, এ পথে সাধারণের যাতায়াত নিষেধ। আমি যে রাস্তা দিয়ে চলেছি, সেই পথ নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে এই নদের ওপোরই এসে পড়বে। কিন্তু উৎরাই এবং তার কাদা ও মধ্যে মধ্যে বরফের চাপ দেখে এমন একটা আতঙ্ক এল যে মনে হোল আমার দ্বারা আর যাওয়া বুঝি হবে না। সঙ্গে একজনও লোক নেই, যারা ফিরে আসছে, তারা বলে, ভোরবেলা যাওয়ার সময় এত পিছল ছিল না, এখন যাওয়া বড়ই মুস্কিল। মেয়েরা চলে গেছে পাণ্ডার সঙ্গে; কিন্তু আমার সঙ্গে কেউই নেই। মনে মনে ঠিক করলুম, এ যাত্রা আর আমার যাওয়া হবে না। ছাতাটি মাথায় দিয়ে লাঠী হাতে স্থির হয়ে দাঁড়ালুম, কি করবো, ঠিক করতে পারছি না।

পেছন থেকে একটি বছর আটেক আন্দাজ বয়সের মেয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। খালি-পা, ছিটের ফ্রক পরা, গরম জামার নাম-মাত্রও নেই, মাথার চুল সমস্ত ভিজে, বৃষ্টির জলে হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত চুপ্‌সে গেছে। আমার পাশে এসে পরিষ্কার হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলে, আমি মন্দিরে যাচ্ছি কিম্বা ফিরে আসছি।

আমি বল্লুম, ঠিক নেই, বোধ হয় এই স্থান থেকেই ফিরবো।

সে বল্লে, আপ্‌কা দর্শন হো গয়া ?

আমি বল্লুম, না, দর্শন হয় নি, তবে যাবো কি করে? সাহস হচ্ছে না।

উৎসাহে নেচে-কুঁদে সে বল্লে, সে কি বাবু, আপনি এতদূর এসে দর্শন না করে ফিরে যাবেন? তাও কি হয়, আসুন আমার সঙ্গে।

বল্লুম, সে কি খুকী, তুমি আমায় নিয়ে যাবে?

সে বল্লে, জরুর। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমার হাত ধরে মন্দিরের পথের দিকে এগিয়ে পড়লো।

যাওয়ার ইচ্ছা আমার ষোল আনা, কাজেই এতটুকু সাহস পেয়ে ঐ খুকী-সঙ্গিনীর সঙ্গে আবার চল্‌তে সুরু করলুম। মেয়েটী গলা ছেড়ে গান ধরলে—

> মেরী আস শরণ কুমারী
> দয়া করো, দয়া করো, শম্ভু ত্রিপুরারি।
> শরণকুমারী—

ঐ তিন লাইনের গানে আর কোন ভাষা নেই, বারম্বার ঐ একই পদ

সে গাইতে গাইতে কাদা, পেছল ও বরফের ওপোর দিয়ে আমায় টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চল্‌লো।

খানিকক্ষণ যাওয়ার পর আমার হুঁস্ হোল্ যে, এতটা পথ যে এলুম, পা ত একটুও পেছ্‌লায় নি, বা অন্য কোন রকম অসুবিধাও ত হয় নি। এক সময় তার গানের মাঝখানেই বাধা দিয়ে কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, খোকী, তোমারা নাম কেয়া।

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, 'শরণকুমারী'

ঘর কাঁহা?

সে বল্লে, জম্মু।

বল্লুম, তোম্‌হারে সাথ মে কোন্ আয়?

'আউর কৌন্ হোগা বাবুজী, সাথ্‌মে অমরনাথজী হ্যায়্।

বল্লুম, অমরনাথজী ত হ্যায়হি, মগর্ কিস্‌কে সাথ তুম জম্মুসে আয়ী?

হাসিতে ফেটে পড়ে সে উত্তর দিলে, কিসিকে সাথ নহী বাবুজী, খুদ্ অমরনাথজী সাথ্‌মে হ্যায়, আউর কৌন্ হোগা সাথমে!

পকেট থেকে কৌটো বার করে একটু সুপারি এলাচ মুখে দিয়ে তাকে ইসারায় দেখালুম। সে বল্লে, এলাইচি হ্যায় জী, হো ত একঠো দে দিজিয়ে।

একটা এলাচ দিতেই সে সেটা ছাড়িয়ে মুখে দিয়ে দিলে এবং তারপর একটুমাত্র সময় না দিয়ে খুব তাড়া করে বল্লে, চলিয়ে জী চলিয়ে, আউর থোড়া দূর হ্যায়, চলিয়ে।

এর পর অল্প একটু এগিয়ে গিয়ে একটা মোড় ঘুরেই আঙ্গুল দিয়ে ওপোরে অমরনাথের গুহা মন্দিরের মুখটা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, উয়ো অমর নাথজীকা মন্দির। তারপর খুব হেসে সোরগোল করে আমার হাতটা ধরে বল্লে, আবহি ত আ গয়া বাবুজী, আচ্ছে সে দর্শন কি জীয়ে।

গুহা মন্দিরের মুখটা দেখে প্রাণে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ এলো। দেখি মাতা, গৃহিণী এবং পুত্র একসঙ্গে গুহা মন্দিরের মুখে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে, আর সেই বরফের জলে আমাদের মুসলমান কুলীরা স্নান করছে। আমাদের পাণ্ডা আরও দু'একজন যাত্রীর সঙ্গে কথা কইছে।

সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ নজরে এলো যে, শরণকুমারী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আবার পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে।

চীৎকার করে ডাকলুম, 'এ শরণকুমারী, শরণকুমারী—

মুখ ফিরিয়ে সে বল্লে, কেয়া জী?

বল্লুম, তুম্ ভি আও, তুম্ কাঁহা যাতা হো?

সে বল্লে, আবহি আতী হুঁ, আপ্ যাইয়ে বাবুজী, উপরমে যাইয়ে। আঁচড়ে পিচড়ে ঢালু রাস্তা দিয়ে গুহা মন্দিরে উঠ্‌লুম, মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। একটি মাত্র সুতীর ফ্রক-পরা আট বছরের ছোট মেয়েটি আপাদমস্তক ভিজে আমায় মন্দিরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে নিজে মন্দিরে না এসে আবার কোথায় পেছনের দিকে চলে গেল, কে জানে।

মন্দিরে এসে কেবলই তার কথা মনে হতে লাগলো। মেয়েটি কে? সঙ্গে এর কোন অভিভাবক দেখলুম না। সেও বল্লে, সঙ্গে একমাত্র অমরনাথজীই আছে, আর কেউ নেই, সেটাই বা কি রকম কথা! এই সে যাই হোক্, স্থির উপলব্ধি হোল' যে, এই অজ্ঞাতকুলশীলার সাহচর্য্য ছাড়া হয়ত এই পথশ্রান্ত শঙ্কিত যাত্রীটিকে অমরনাথ মন্দিরের দেড় ক্রোশ দূর থেকেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হোত'।

মন্দিরে ছিলুম প্রায় ঘণ্টা দুয়েক! মাতাঠাকুরাণী সধবা ও কুমারী কন্যার জন্য কাপড়, খাবার ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিলেন। খুব ইচ্ছে ছিলো, এই মেয়েটিকেই কুমারী করে পুজো করাবো। কিন্তু আশ্চর্য্য, দু'ঘণ্টার মধ্যে এই মেয়েটাকে দেখলুম না। অথচ ছোট্ট জায়গা। সকলের সঙ্গেই সকলের দেখা হতে বাধ্য। কিন্তু কোথায় গেল সেই শরণকুমারী? সেদিন মন্দিরে বা ফেরার পথে কোথাও তার দেখা আর মিল্‌লো না।

শুক্রবার বিকালে সকলেই ফিরে এসে পঞ্চতর্ণীর তাঁবুতে হাজির হলুম। খাওয়া দাওয়া সেরে মন-মন সকল তাঁবুতেই অনুসন্ধান করলুম কিন্তু শরণকুমারীকে কোথাও মিল্‌লো না। ভেবেছিলুম, হয়ত আর দেখাই পাবো না।

কিন্তু আবার দেখা পেয়েছিলুম ঠিক তার পরের দিনেই। সেও 'এক এম্‌নি ধারা দ্বিধাগ্রস্ত শঙ্কিত মুহূর্ত্তে।

ফেরার পথে শনিবার দিন পুলিসের নির্দ্দেশমতে একদিনে ষোল মাইল পথ আসতে হোল! এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিশদ বিবরণ দেওয়া যাবে। মোটের ওপোর শনিবার সকালে যখন জানা গেল যে, আজই পঞ্চতর্ণী থেকে বেরিয়ে বায়ুযান টপ্‌কে একেবারে চন্দনবাড়ীতে ষোল মাইল দূরে যেয়ে উপস্থিত হতে হবে, তখন আমি সকলকেই বলে দিলুম যে, মা, স্ত্রী বা পাণ্ডা যেই আগে যাবে, সেই যেন বায়ুযানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে আবার সব একসঙ্গে মিলিত হয়ে যাত্রা সুরু করে। সকলেই এ কথায় রাজী হয়ে গেল এবং সেই মতেই পঞ্চতর্ণী থেকে বেরোনো গেল। খানিক পথ যেতে যেতেই ঘোড়সওয়ারী স্ত্রীপুত্র এবং পিট্টুবাহিনী জননী যষ্ঠীধারী-আমাকে পেছনে রেখে এগিয়ে পড়্‌লেন। স্থির জানি, আবার আমাদের দেখা হবে বায়ুযানে, কিন্তু—

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আট মাইল হেঁটে যখন বায়ুযানে পৌঁছলুম, তখন বাড়ীর লোক কারুর নামগন্ধও নেই। এতগুলি কুলি, পাণ্ডা, ছড়িদার কেউই নেই, বেলা তখন প্রায় একটা বাজে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত, অথচ পথে পাথরের ওপোর ছাড়া অন্য কোন বস্‌বার জায়গা পর্য্যন্ত নেই। যাওয়ার সময় পথে তাঁবু ফেলে দু'একজন শিখ পাঞ্জাবী চায়ের দোকান করে বসেছিল দেখে গিয়েছি, এখন ফেরার পথে সে রকম কোন তাঁবুর চিহ্নও নেই। যে সব যাত্রী আসছে, তারা দু'পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে আবার রওনা দিচ্ছে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে যাদের সঙ্গে মুখচেনা হয়েছে, তারা বললে, বাবুজী, এগিয়ে পড়ুন, নইলে মেঘলা দিনে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এলে এই পাহাড়ী রাস্তায় চন্দনবাড়ী ফিরতে পারবেন না, তখন মহা বিপদ হবে। এই বিপদ যে কি, তা পথেই দেখে এসেছি। আজ সকালের অতিক্রান্ত আট মাইলের মধ্যে তিনটে মৃতদেহ দেখে এসেছি।

কিন্তু বড়ই চিন্তার বিষয়। মা, স্ত্রী এবং ছেলে আসছে বাহনের

পাকডাণ্ডি ধরে। হয়ত এমনও হতে পারে যে, তারা কোথাও কোন পাথরের আড়ালে বিশ্রাম করছে, আর আমি পাকডাণ্ডি দিয়ে এগিয়ে এসেছি। তাহ'লে তারা এসে আমার কথামত এখানে অপেক্ষা করবে এবং আমাকে না পেলে একটা গুরুতর দুর্ভাবনায় পড়ে গিয়ে কি করবে ঠিক পাবে না। অথচ যদি তারা এগিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমিই বা কতক্ষণ অপেক্ষা করবো? এদিকে আবার অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। সামনে আট মাইল পাহাড়ীয়া পথ। সন্ধ্যের আগে এটা অতিক্রম করতে না পারলে জীবন সম্বন্ধে দারুণ অনিশ্চয়তা, অতএব—

মিনিট পনর এদিক ওদিক ঘুরলুম। যাত্রীরা থামছে এবং দুপাঁচ মিনিট বিশ্রাম করে রওনা দিচ্ছে। একটা ঝরণার ধারে গিয়ে পকেট থেকে আগের দিনের হাতে-গড়া শুরুটী বার করে ঝরণার বরফ-গলা জলে ভিজিয়ে বিনা চিনি এবং বিনা তরকারীতেই চিবিয়ে গলাধঃকরণ করলুম। তারপর ঝরণা থেকে এক গণ্ডুষ জল খেয়ে শুপারী লবঙ্গ চিবুতে শুরু করে দিলুম। জলপিপাসা প্রচুর, কিন্তু জল এত ঠাণ্ডা যে, একগণ্ডুষ জল খেলে পাঁচ মিনিট ধরে দাঁত কন্‌কন্ করে। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর হঠাৎ দেখি, পেছন থেকে সেই পরিচিত ফ্রক পরিহিতা শরণকুমারী লাফাতে লাফাতে আসছে। বিনা দ্বিধায় একেবারে আমার গায়ের ওপোর এসে পড়ে সে বল্লে 'কেয়া বাবুজী, আপ্ ঠহর গয়া কেঁও।'

তাকে দেখেই মনে একটা অপূর্ব আনন্দ এলো! অনেক কথাই তাকে জিজ্ঞাসা করবার ছিল, কিন্তু মুখে জিজ্ঞাসা করলুম, কি করি বলত, যাবো না দাঁড়াবো।

সে বল্লে, এখনই যাও, দেরী করলে রাত হয়ে যাবে, তখন আর পথ চলতে পারবে না।

বল্লুম আমার মা, ছেলে, এরা সব আগে গেছে, না পেছনে আছে, কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না।

সে বল্লে, সব কুছ অগাড়ী গয়া বাবুজী, সবকুছ চলা গয়া, আপ্ যাইয়ে, যাইয়ে। বলতে বলতে সে আমার হাত ধরে যে রকম টেনে মন্দিরের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো সেইভাবেই চন্দনবাড়ীর পথের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। আমিও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাঁটতে লাগলুম। মনে আমার স্থির বিশ্বাস হোল' যে, এখন আমার এগিয়ে পড়াই উচিত।

মেয়েটি বোধ হয় আমার সঙ্গে পঁচিশ গজ হাঁটলে, তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বল্লে "আপ্ যাইয়ে বাবুজী, ম্যয় অব্‌হী আতী হুঁ"

বল্লুম, কোথায় যাচ্ছ, কোথায়?

ততক্ষণে সে পেছিয়ে গেছে প্রায় দশগজ, লাফাতে লাফাতে ছুটছে। ঘাড় ফিরিয়ে বল্লে, এখুনি যাও, কোথাও দেরী কোরো না, ঠিক সন্ধ্যের সময় চন্দনবাড়ী যাবে, সেখানে সকলের দেখা পাবে।

চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। কুলী, ঘোড়া এবং যাত্রীরা সকলেই যাচ্ছে, আর তাদের মাঝখান দিয়ে লাফাতে লাফাতে একটি ছোট ফ্রক-পরা মেয়ে একা উল্টো দিকে ছুটে চলে গেল। কানের মধ্যে বাজতে লাগলো, মেরি আঙ্গি শরণকুমারী, দয়া করো দয়া করো শম্ভু ত্রিপুরারী, শরণ কুমারী।"

কিন্তু আর দাঁড়ালুম না। শরণ কুমারী বলে গেছে, দাঁড়িও না। এখুনি যাও, যাত্রার শেষে সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার আপনজনকে মিলবে। তাই একা একা চলতে লাগলুম। উঁচু নিচু ঘোরানো রাস্তায় মাঝে মাঝে পাথরের ওপোর দিয়ে টপ্‌কে লাফিয়ে ছোট ছোট জলের ধারা ডিঙ্গিয়ে, মাথায় ছাতা হাতে লাঠি নিয়ে আপনমনে অনেকটা নেশাখোরের মত হাঁটতে লাগলুম, আর কাণের মধ্যে বাজতে লাগলো, মেরি আঙ্গি শরণকুমারী।

চন্দনবাড়ীতে এসে দেখি অনেকগুলি তাঁবু পড়েছে, ওদের মধ্যে একখানা আমাদের। উনানে ভাতের হাঁড়ী বসানো হয়েছে। সামনে রাস্তার দিকে চেয়ে মা বসে আছেন। আমাকে দেখেই প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন, কষ্ট হয়েছে কি?

বল্লুম, না। মনে মনে বল্লুম, শরণকুমারী যাকে পথ দেখিয়ে দেয়, তার কি কষ্ট হতে পারে।

তারপর আর সেই শরণকুমারীর দেখা পাই নি, পাবো বলে আশাও আর করি না। কিন্তু এটা আমার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে, জীবনে যেখানে যখনই কোন জীবন-মরণ সমস্যায় দ্বিধাজড়িত হয়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবো, তখনই তার দেখা আমি পাবোই। যখনই আমার প্রয়োজন হবে, তখনই সেই অজ্ঞাতকুলশীলা ফ্রক-পরা খালি পায়ে মেয়েটা যে দৌড়ে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে আমায় উপযুক্ত পথে এগিয়ে দিয়ে চলে যাবে, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহই নেই। অমরনাথের লোকালয়হীন পথে অভিভাবকহীনা, অমরনাথ-সঙ্গিনীর গান আমি এখনও শুনতে পাই, হয়ত দুনিয়ার সব মানুষই এই গান শুনতে পায়, কিন্তু কখনও বা উপলব্ধি হয়, কখনও বা হয় না। সে যেন অহর্নিশ গান গেয়ে যাচ্ছে—

"মেরী আঙ্গি শরণকুমারী, দয়া করো দয়া করো শম্ভু ত্রিপুরারি
শরণকুমারী"

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে

শ্রীসুষমা মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১লা জুন। উপসালার পথে। স্টকহলম থেকে ট্রেণে করে উপসালা পৌঁছতে একঘণ্টা লাগল। শহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম। উপসালা সুইডেনের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র এবং অতি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জগদ্বিখ্যাত। এক কথায়, উপসালাকে সুইডেনের কেম্ব্রিজ বলা যায়। প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু সুইডেন নয়, পৃথিবীর সর্বত্র হ'তে বহু ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, দর্শন এবং বিশেষ করে বিজ্ঞান-বিভাগে শিক্ষা লাভ ক'রে কৃতী ও যশস্বী হয়েছেন। যে অ্যাটম-বোমা আজ সমস্ত পৃথিবীকে তোলপাড় করে তুলেছে, তার প্রাথমিক গবেষণা অর্থাৎ আণবিকশক্তিকে তেজোময় করবার প্রচেষ্টা এই উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারেই শুরু হয়। সুইডেনে মাত্র সত্তর লক্ষ লোকের জন্য আরো তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্বের দরবারে শিক্ষার মর্যাদা সুইডেন

উপসালা য়ুনিভার্সিটির সম্মুখ ভাগ

বরাবরই পেয়ে এসেছে এবং বিশ্বকে মর্যাদা দিয়েও এসেছে নোবেল পুরস্কারের (Nobel Prize) ভিতর দিয়ে। এমন কি এই সুদূর ভারতও তাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমনকে নোবেল জয়মালা-ভূষিত (Nobel Laurels) ক'রে ভারতবাসীকে মুগ্ধ করেছে।

২রা জুন। রাত ৯টার ট্রেনে আমরা উপসালা ছেড়ে নার্ভিক অভিমুখে রওনা হলাম। রিজার্ভ-করা কুপেতে পরিষ্কার বিছানায় আরামে ঘুমোনো গেল। রাত প্রায় ২টার ট্রেন স্টেশনে থামতে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে; জানলার পরদা একটু ফাঁক করে দেখি—সুপ্রভাত, সূর্যকিরণে দিক উদ্ভাসিত।

ট্রেন ছুটে চলেছে অরণ্যাকীর্ণ পার্বত্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে। প্রচণ্ড শীতে বিছানা ছেড়ে ওঠা দায়। উত্তরমেরু অভিমুখে যতোই এগিয়ে চলেছি, শীতের প্রকোপ ততোই তীব্র অনুভূত হচ্ছে। বেলায় প্রাতরাশ খেয়ে জানলার ধারে আরামে সোফায় বসে বাইরের দৃশ্য দেখছি। ট্রেন এঁকে বেঁকে ভুজঙ্গভঙ্গীতে পাহাড়তলীর উপর উঠে চলেছে। দেখতে দেখতে নেমে এল উপত্যকার মাঝে শ্যামস্নিগ্ধ বনানীর ছায়ায়। গুরু গম্ভীর গম্ গম্ শব্দে পর্বতগাত্রে টানেলের পর টানেল পার হয়ে চলল। দিবারাত্র সর্বক্ষণ ট্রেনের কামরায় আলো জ্বলছে, নচেৎ ক্রমাগত এই অন্ধকার পর্বতগহ্বরের সুড়ঙ্গপথে দীর্ঘ বিশ বাইশ মিনিট পর্যন্ত থাকা খুবই অস্বস্তিকর হত। খেলাঘরের মত ছোট ছোট স্টেশন। লোকবসতি এখানে ওখানে অল্প-স্বল্প, ছড়ানো।

মেঘলা আকাশ। ঝোড়ো হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ শব্দে। তাপ নামছে ধীরে ধীরে। ট্রেনের গরম করা ঘরে বসেও শীতে হাত পা জমে
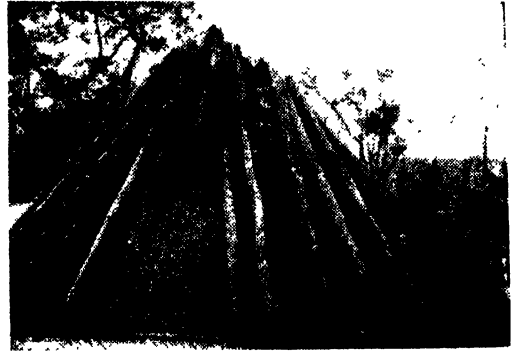
ল্যাপদের কাঠের তাঁবু

যাবার জোগাড়। পায়ে ডবল মোজা ও গায়ে যথেষ্ট গরম জামা পরেও শীত মানে না, তার উপর আবার ওভারকোট পরে বসেছি।

দিগন্তবিস্তৃত প্রস্তরসঙ্কুল মালভূমি মরুভূমির মত ধূ ধূ করছে। দেখতে দেখতে আমরা অধিত্যকার উপর উচ্চ গিরিমালার পাদমূলে উপস্থিত হলাম। ট্রেন পর্বতপ্রদক্ষিণ করে চলেছে। চারিদিকে শুধু অগণিত তুষার-কিরীট গিরিশৃঙ্গ, মনে হয়—ধরিত্রী যেন শতবাহু প্রসারিত করে ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে শ্বেতপদ্মের পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে। নির্জন স্তব্ধ পার্বত্যপুরী। শুধু কাঁকর-ভরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে সারি সারি শুকনো সরু ডালপালা-মেলা পল্লবহীন গাছগুলি; শীতে তুষারের ঝড়ে সব হারিয়ে এরা হয়েছে রিক্ত নিঃস্ব পথের পথিক। পাশে শুধু গর্বভরে সবুজ রং ফলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাইন গাছের সারি।

প্রকৃতির মন-মাতানো রূপে চিত্ত তন্ময় হয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে নিসর্গ

দৃশ্যপটে নব নব রূপের আবির্ভাব। মৃন্ময়ী ধরিত্রী যেন এখানে চিন্ময়ী-রূপিণী। মনে বিস্ময় জাগে—যে মাটীর পৃথিবীতে আমরা বাস করি, একি সেই পৃথিবী! এ দেশে সূর্য ওঠে গভীর রাতে, রাতের আকাশ গোধূলির ম্লান আলোয় ঢাকা। পাহাড়তলীর বনরাজিপূর্ণ উপত্যকার মাঝে ছোট ছোট গ্রামের স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াচ্ছে। সুইডেনের মধ্যভাগে জেমট্‌ল্যাণ্ড (Jamtland) প্রদেশ পেরিয়ে আমরা ল্যাপল্যাণ্ডে (Lapland) এসে পড়েছি। ল্যাপল্যাণ্ড প্রদেশটি নরল্যাণ্ড (Norrland) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সুইডেনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ এই ল্যাপল্যাণ্ড।

সুইডেন দেশটি প্রায় হাজার মাইলব্যাপী লম্বা এক ফালি জমি। দেশের পশ্চিমে উচ্চ গিরিমালা হ'তে অসংখ্য নদী নেমে বয়ে চলেছে পূবদিকে সাগরপানে। সারা দেশময় ছড়ানো রয়েছে তুষারগলিত অঙ্গুলাকৃতি অসংখ্য হ্রদগুলি। দেশটি নদীবহুল ও পর্বতময়।

নরল্যাণ্ড প্রদেশটি হল সুইডেনের ধনভাণ্ডার-বনজসম্পদ ও খনিজ-সম্পদে ভরা। শিল্প ও বাণিজ্যে প্রধান কেন্দ্র হল পূর্ব অঞ্চল, সেখানে গড়ে উঠেছে কাঠের কারখানা ও কাগজের কারখানা, লৌহ ও ইস্পাতের বিভিন্ন রকম কারখানা। দেশে কয়লার অভাবে যথাসম্ভব তড়িৎশক্তির সাহায্যেই কাজ চালানো হয়। পার্বত্যনদী ও ঝরণার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরী করে অতি অল্প খরচায় সারা দেশময় সরবরাহ করা হয়। তাই বৈদ্যুতিক শক্তিতে ট্রেন ছুটেছে পূব-পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে। দেশের অতি নিভৃত পল্লীর কোণটিতেও রেল-লাইন পাতা; সেখানে নিত্য সরবরাহ হয় মানুষের বাসের সকল অপরিহার্য দ্রব্য। জীবনযাত্রার প্রয়োজনের দিক থেকে তাই শহর ও পল্লীতে বিশেষ পার্থক্য ঘটেনি। শহরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য গ্রামে বসেও মেলে।

এই সকল পার্বত্যস্থানের একটি বিশিষ্ট ব্যবসাপদ্ধতি হল—স্রোতস্বল নদীর বুকে বড় বড় কাটা গাছ স্তূপাকারে ভাসিয়ে স্থানান্তরিত করা। শীতকালে বরফ-জমাট নদীর উপর গাছ কেটে বোঝাই করে রাখা হয়; বসন্তের আগমনে বরফ গলা সুরু হলেই স্রোতের মুখে কাঠের বোঝা ভেসে চলে পূবদিকে। কারখানায় কাঠগুলি পৌঁছে সরাসরি চেরাই হয়, এবং পূববন্দর হ'তে জাহাজ-বোঝাই কাঠ রপ্তানি হয় দেশ-দেশান্তরে।

দেখতে দেখতে আমরা গ্রামের পথ ছেড়ে উঁচু পার্বত্যভূভাগে উঠে চলেছি। চারিদিকে শুধু তুষার আর তুষার। দিগন্তবিস্তৃত বালুকা-গিরিপথ দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটেছে। ক্ষণমধ্যে অগণিত গিরিমালা আমাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ করে ঘিরে ফেলল। চিকণ কালো কঠিন পাহাড়গুলির মসৃণ দেহ ঘিরে জড়িয়ে আছে হৈম উত্তরীয়। সাদায় কালোয় বর্ণবৈচিত্র্যের এক অপূর্ব সমাবেশ। নীল নিঃসীম গগনাঙ্গনে উজ্জ্বল তেজ রেখায় টানা নীহারশৃঙ্গরাজি।

ট্রেনের একজন কর্মচারী এসে জানিয়ে গেল, এইবার আমরা সুমেরু সীমানার (Arctic Circle) নিকট এসে পড়েছি। হঠাৎ ট্রেন তিনবার হুইসিল দিয়ে উঠল। জানলা দিয়ে দেখি অদূরে মাঠের মাঝে একটি সাইনবোর্ডে লেখা—"Arctic Circle"—সুমেরু বৃত্ত। সাইন বোর্ডের নীচে মাটীর উপরে সাজানো সাদা পাথরের সারি একটানা চলে বহুদূর অবধি চলে গেছে।

কিরুনা শহর—অদূরে লৌহখনি দৃশ্যমান

ট্রেন হু হু করে ছুটল সুমেরু বৃত্তের ভিতর দিয়ে। শীতের তীব্রতা ক্রমেই যেন অসহ্য বোধ হচ্ছে। বায়ুর স্বল্পতা বোধ করে শরীর আনচান্ করছে। আমি কামরা থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় গিয়ে জানলার কাচ একটু তুলে দিলাম। প্রচণ্ড শীত, কিন্তু বাইরের হালকা হাওয়া আসতে অনেকটা সোয়াস্তি বোধ হল। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন দাঁড়াল ছোট্ট একটি স্টেশনে। কাঠের ঘরের স্টেশন, যাত্রী নেই, শুধু ট্রেনের ক্রু রাই নেমে ঘোরা ফেরা করে আবার উঠে এল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝির ঝির করে ধূলিকণার মত তুষার ঝরা সুরু হল। আমি জানলা বন্ধ করে ক্রু'দের কাছে জানতে গেলাম ঘর আরো গরম করার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। তারা তাড়াতাড়ি আমাদের কূপেতে এসে তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখে জানালে ঘর পুরোমাত্রায় গরম করা আছে। মনে মনে বোধ হয় বিস্মিত হল—এখন এই গ্রীষ্মকালে আবার এর চেয়ে গরম কারুর প্রয়োজন হয় নাকি।

বুঝবে আমাদের শীত কি ? ট্রেণের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দেখলাম ট্রেণটি একেবারেই খালি। এসেছিলাম এক ট্রেণ ঠাসা লোক, পথে নামতে নামতে অবশিষ্ট রয়েছি মাত্র দশ বারো জন বিদেশী যাত্রী।

নাভিক শহর

ট্রেন ল্যাপল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে চলেছে। চিরনীরব গুরুগাম্ভীর্যপূর্ণ তুষার প্রান্তরের সুগভীর স্তব্ধতা ভেদ করে শুধু আমাদের বৈদ্যুতিক ট্রেনখানি ছুটেছে। বায়ু স্তব্ধ নিষ্কম্প, আকাশ সুশান্ত স্তব্ধময়; এখানে প্রতি শব্দটি দ্বিগুণ রবে ফিরে আসে কানে। ল্যাপজাতি এদেশের আদিম অধিবাসী। প্রায় দু'হাজার বছর ধরে সারা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তরাংশে জেমট্ল্যাণ্ড অবধি এরা ছড়িয়ে বাস করছে। ল্যাপরা জাতিতে মঙ্গোলিয়ান। এদের ভাষা কতকটা ফিন্ জাতির ভাষার মত। সুইডেনের অধিবাসীদের মধ্যে আরো একটি ভিন্ন জাতি রয়েছে, সে হল ফিন্ জাতি। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিনরা দলে দলে আসে এই দেশে এবং উত্তরে ও মধ্যপ্রদেশে বসবাস সুরু করে। এখনও এই অঞ্চলেই এরা বাস করছে। সুইডেনে সুইড্‌দের সংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ, ল্যাপদের ছয় হাজার ও ফিনরা পঁয়ত্রিশ হাজার মাত্র। ল্যাপজাতির মধ্যে সাধারণতঃ দু'টি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়—ভ্রাম্যমান ও ফরেষ্ট ল্যাপ্। ভ্রাম্যমানের দল বল্গা হরিণ শীকার ক'রে স্থানে স্থানে বেড়িয়ে বেড়ায়। বল্গা হরিণ পালন করাই হল ল্যাপদের বৈশিষ্ট্য। শীতকালে এরা বল্গা হরিণের দলবল নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে উপত্যকায়। সেখানে বনের ধারে বল্গা হরিণ ধরবার জন্যে কয়েক মাস বাস করে; আবার গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই পর্বতের উপরে উঠে চলে যায়।

ফরেষ্ট ল্যাপদের জীবনযাপন কিন্তু স্বতন্ত্র-ধরণের, অপেক্ষাকৃত উন্নত বলা যায়। এরা শিখেছে চাষের কাজ। তাই চাষ-আবাদের জন্য একই স্থানে প্রায় সারা বছর বাস করতে হয় এদের। বল্গা হরিণ লালন-পালন করা, মাছ ধরা ও চাষ-আবাদ করাই হল এদের প্রধান উপজীব্য।

এমনি জীবনধারার জন্য এদের বাসা বাঁধতে হয় সাময়িকভাবে। এদের তৈরী ছোট কাঠের তাঁবুগুলি দু'দিনের বাসা বাঁধবার জন্য ভাঙ্গাগড়া কাজের পুঁতে তার উপর চামড়া দিয়ে ঢেকে দিয়ে ঘাসের চাব্‌ড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়।

কিরুণা ষ্টেশনে ট্রেণ দাঁড়াল অনেকক্ষণ। আমরা ষ্টেশনে নেমে হেঁটে বেড়ালাম। ষ্টেশনটি অপেক্ষাকৃত বড়। যাত্রীর ভিড় নেই, তবে স্থানীয় লোকেরা মাল তোলানামানোর কাজে বিশেষ ব্যস্ত। ষ্টেশনে অনেক ল্যাপও রয়েছে। এদের মুখাকৃতি চেপ্টা গোলাকার, সুইড্‌দের মুখাবয়ব হ'তে বেশ পার্থক্য রয়েছে। ল্যাপদের পোষাকপরিচ্ছদ অতি অদ্ভুত ধরণের-জমকালো গাঢ় ডগ্‌মগে রঙের।

কিরুণা শহর উচ্চ অধিত্যকার উপর গিরি-উপত্যকায় অবস্থিত। অগণিত লৌহখনি পর্বত সানুদেশে দেখা যায়। কানে আসে তরঙ্গ চঞ্চল গিরি-নির্ঝরিণীর ঝপ্ ঝপ্ শব্দ। দূরে নীল কুয়াশার পরদা ঢাকা পাহাড়ের সারি আব্‌ছা আব্‌ছা ফুটে উঠছে। নীল পাহাড়ের কোলে হ্রদগুলি হিমরজের শ্বেত আস্তরণে ঢাকা। পাইনতরু সমাকীর্ণ শ্যামস্নিগ্ধ উপত্যকার মাঝে সারি সারি কুঞ্জকুটীরগুলি যেন প্রকৃতির কোলে সুখময় নীড়।

সুইডেনের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ—Kebnekaise এই স্থানেই রয়েছে; পর্বতটি উচ্চতায় প্রায় সাত হাজার ফুট। সম্প্রতি কিরুণায় দু'টি বিরাট লৌহময় পর্বতের অন্তর্নিহিত লৌহস্তর আবিষ্কৃত হওয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করছে অতি দ্রুত। ফলে, এই সব অঞ্চলে লোক বসতি বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে উঠছে নতুন শহর। কিরুণার অধিকাংশ লৌহমাটী রপ্তানি করা হয় নরওয়ের নার্ভিক বন্দর হ'তে। সেই কারণেই নরওয়ের নার্ভিক শহর অবধি এই সুইডিশ রেললাইন পাতা।

রূপময়ী কিরুণায় শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুই পরম রমনীয়। শীতের ঘন তমসাবৃতা রজনীতে আকাশ-প্রান্তে সুমেরুজ্যোতি (Aurora Borealis)

নার্ভিক মোটর-বাস-ষ্টেশন
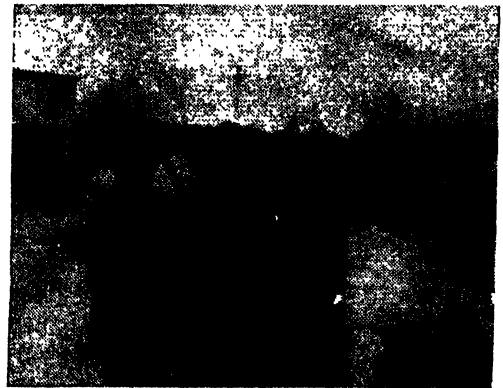
যখন জলন্ত পাবক শিখার ঝলকের মত চক্‌মকিয়ে ওঠে, তখন সেই নৈসর্গিক রূপৈশ্বর্য দেখতে দূর দূরান্তের যাত্রী আসে এই দেশে।

কিরুণা ছেড়ে ট্রেণ চলল পর্বতসানুদেশের উপর দিয়ে। দেখতে

বিশাল তুষারময় মরুপ্রান্তর। কোথাও একটু তৃণকুটোও নেই। মাইলের পর মাইল তুষার পথ পেরিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়ালো Riksgransen স্টেশনে। রিক্সগ্রেনসন্ সুইডেনের উত্তরে শেষ সীমানার স্টেশন। ট্রেন থামতে আমরা আপাদমস্তক বেশ করে গরম কাপড়ে ঢেকে স্টেশনে নেমে পড়লাম। বরফের স্তূপের মাঝে ছোট্ট স্টেশনের ঘরটি। কন্‌কনে শীতে দাঁড়িয়ে হাত পা অবশ হবার জোগাড়। শ্বাস-প্রশ্বাসের অল্প অল্প কষ্ট সর্বক্ষণই অনুভব করছি। তাড়াতাড়ি উঠে এলাম ট্রেনের গরম-করা কামরায়।

নরওয়েতে ট্রেন প্রবেশ করতেই পাশপোর্ট এবং শুল্কবিভাগের পরীক্ষা শেষ হল ট্রেনের ভিতরেই। ট্রেন চলল ধীরে ধীরে খাড়াই পাহাড়ের ধার দিয়ে, পাশেই সাগরসলিলপূর্ণ সুগভীর খাদ। কি ভীষণ ভয়াবহ ফিয়র্ডের দৃশ্য! ট্রেনের একজন চেকার আমাদের দেখিয়ে দিল, নীচে ওপারে ঐ ফিয়র্ডের জলের ধারে জার্মানদের সাব্‌মেরাইনগুলির কঙ্কাল পড়ে রয়েছে! ফিয়র্ডের পাড়ে জার্মানকর্তৃক প্রোথিত টেলিগ্রামের তার-গাঁথা লোহার খুঁটিগুলি বরাবর সাজানো রয়েছে। গত যুদ্ধে জার্মানরা নরওয়ে সাময়িক অধিকার করে যেখানে যা কিছু তৈরী করেছিল, আজও সেই সকল সেই সব জায়গায় তেমনি ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে।

ট্রমসোর পথে—চির তুষার মেরু

আমরা নার্ভিক পৌঁছলাম রাত ৮টায়। স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে করে উপস্থিত হলাম রয়েল হোটেলে; পূর্ব থেকেই আমাদের ঘর রিজার্ভ করা ছিল। আকাশে এখন মধ্যাহ্নের আলো। সূর্যদেব মাথা গগনে মেঘান্তরালে। এখানে রাত্রি নিরূপণ করতে হয় ঘড়ির কাঁটা দেখে, আকাশ দেখে নয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে রাতের কালিমা এ দেশের আকাশকে মলিন করতে পারে না; দিবালোকে রাত্রি সমুজ্জ্বলা।

উপত্যকার মাঝখানে এই নার্ভিক শহর। ফিয়র্ডের ধারেই আমাদের হোটেল। আমরা হোটেলে আহারাদি সেরে রাত বারটায় শহর বেড়াতে বেরিয়েছি। রাস্তার ধারে দোকান সব বন্ধ। পথে পথিক মাত্র দু'চার জন। গৃহস্থেরা সব জানলার পরদা টেনে রাতের আঁধার সৃষ্টি করে ঘুমাচ্ছে। শহর নিঝুম। সূর্য হেলেছে ঈষৎ পশ্চিমে। সুইডেনের সীমানা পেরিয়ে যখন ফিয়র্ডের দেশে উত্তরাপথে এলাম, তখন ভেবেছিলাম রিক্সগ্রেনসনের মত সবটাই বুঝি বরফে ঢাকা দেশ হবে। নার্ভিকের শুকনো খট্‌খটে মাটী দেখে একটু দমে গেলাম।

[illegible] ফিয়র্ডে জলা পার্বত্য দেশ। সারা দেশময় পাহাড়কাটা ফিয়র্ডের অতীতকালে সেই তুষারের যুগে পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হ'তে থাকে, তখন পৃথিবীর মাটী বিশাল হিমবাহের ভারে নেমে পড়েছিল;—এই সব মেরুপ্রদেশ তখন বিরাট বিরাট হিমবাহের স্তূপে ঢাকা। প্রকৃতির সেই অভূতপূর্ব রূপবৈচিত্র্য আমাদের কল্পনারও অতীত। কালে একদিন সেই সব তুষার প্রবাহ পর্বত বিদীর্ণ ক'রে গভীর খাদ কেটে নেমে পড়ল সাগরজলে, সাগরসলিল বয়ে এল খাদগুলিতে। সারা নরওয়ে দেশটাই হল এই রকম বরফকাটা ফিয়র্ডে, দ্বীপে ও হ্রদে সাজানো। পশ্চিমে সুদীর্ঘ সাগর উপকূল ঘিরে আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ। কোথাও আবার ফিয়র্ডের জল বয়ে এসেছে দেশের মধ্যভাগ অবধি। জলে ও পাহাড়ে দেশটি ভরা, সমতলক্ষেত্র যেন নেই।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে আমাদের মনও নিরাশায় বিষাদাচ্ছন্ন হল। এই সুদূর উত্তরমেরুর শেষ প্রান্তের কাছ বরাবর এসেও বুঝি নিশীথ সূর্যোদয়ের দর্শনানন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হল। আমাদের হোটেলে লোক অতি অল্প। তার মধ্যে এক মিশরবাসীর সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছে। তিনি এই সবেমাত্র ট্রমসো (Tromso) শহর থেকে ফিরছেন। তাঁর কাছে শুনলাম ট্রমসোর আকাশ মেঘমুক্ত, সেখানে মধ্যরাত্রে সূর্যোদয়ের শোভা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। নার্ভিক থেকে ট্রমসো যাবার পথের দৃশ্যও নাকি অতীব মনোরম। যাত্রাপথের সন্ধান পেয়ে আনন্দ ও উৎসাহে মন ভরে উঠল।
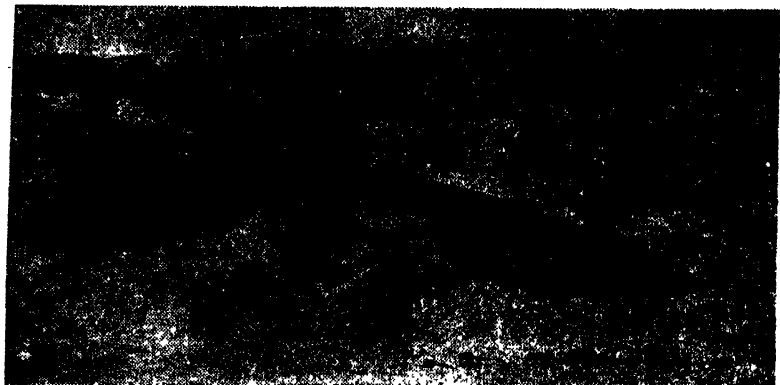
৩রা জুন, ট্রমসোর (Tromso) পথে: বেলা ১০টায় বাস-স্টেশনে উপস্থিত হয়েছি। মোটর-বাসটি বেশ বড় এবং আরামের। আমাদের মিশরবাসী বন্ধুটি স্টেশনে তুলে দিতে এলেন। যাত্রীরা একত্র হতেই আধঘণ্টার মধ্যে বাস রওনা হল। মোটর-বাস খানিকটা গিয়ে একটি ফেরি স্টীমারে বিরাট ফিয়র্ড পার হল। ফিয়র্ডের জলের ধারে সরু পথ দিয়ে বাস চলেছে। জলের পাড়ে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে কৃষকদের বাস, তাদের ছোট ক্ষেতগুলি শস্যে পরিপূর্ণ। উপত্যকার মাটী অতি উর্বর। উঁচ নীচ পথে, হ্রদের ধারে, পাহাড় পেরিয়ে ক্রমেই আমরা

প্রাচীরের মধ্য দিয়ে, কোথাও বা ঢালু পথ নেমেছে উপত্যকার মাঝখানে সুনীল জলরাশির ধারে ধারে।

নীল আকাশে হালকা মেঘের ওড়্না ঢাকা। ফিয়র্ডের জল গাঢ় নীল শান্ত, নিস্তরঙ্গ। ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা 'সি গাল্‌স্'-পাখীগুলি ফেনিল তরঙ্গের বিন্দু বিন্দু ফেনার মত জলের উপর ভাসছে।

ফিয়র্ড পিছনে ফেলে বাস উঠে চলল সুবিস্তৃত মালভূমির উপরে। পথের দু'ধারে-বৃহৎ বৃক্ষরাজি ক্রমেই ক্ষুদ্রকায় হয়ে আসছে। পাহাড়ে পথের পাথরটুকরাগুলি চাকার গায়ে ছিট্‌কে এসে বাসের গায়ে বেজে উঠছে ঝন্ ঝন্ শব্দে।

দেখতে দেখতে আমরা উত্তরাপথের তুষারমেরুর ভিতর প্রবেশ করলাম। পথ ঘাট মাঠ তুষারমণ্ডিত। সামনেই দেখা যায় অগণিত

উত্তরাপথে ফিয়র্ডের দৃশ্য

হিমগিরি। বিরাট হিমাদ্রির পাদমূল পরিক্রমা করে বাস এগিয়ে চলল। পথপ্রান্তে তুষারস্তূপের মাঝে অর্ধনিমজ্জিত তরুরাজি পর্বতসানুদেশ পরিবেষ্টন করে আছে। মনে হয় ঐ শৈলশিখরে বুঝি রাজাধিরাজ গোলোকনাথ আসীন; পদপ্রান্তে তাই শত দ্বারী দ্বার আগলে দণ্ডায়মান। লীলাকীর্তন পদাবলীর একটি ছত্র মনে হল,—

"সপ্তম দ্বার—পারে রাজা বৈঠত,
তাঁহা কাহা যাওবি নারী।"

ঐ মহা গিরিশৃঙ্গ শ্বেতাম্বরে শুভ্র মেঘলোকে মিলিয়ে রূপে বর্ণে এক হয়ে গেছে। মনে হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী যেন মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে—

"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।"

কত যুগ যুগ ধরে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মাঝে নিথর নিস্পন্দ তুষার এ ধরায় চিরমুক্তিকাশায়ী। এই তুষার রাজ্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটে শুধু তুষারস্তূপের পর তুষারস্তূপ জমে,—শীতের পর শীত আসে অতি কঠিন রূপে, গ্রীষ্মের উষ্ণতা যেন এ দেশে নাই।

প্রায় দেড়ঘণ্টা এই তুষার মেরুর পথ অতিক্রম করে আমরা নেমে এলাম উপত্যকার মাঝে। ছোট্ট একটি পান্থশালায় বাস এসে থামলো; এখানে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে আমরা কেক্, স্যাণ্ডউইচ ও কফি খেয়ে আবার গিয়ে বসলাম বাসে। মাইলের পর মাইল উত্তরমেরু-মণ্ডলের তুষারক্ষেত্র পেরিয়ে নেমে এলাম ফিয়র্ডের জলের ধারে।

গ্রামের পথ দিয়ে চলেছি। বাস থামছে স্থানে স্থানে। কোথাও দু'একটি যাত্রী বাস থেকে নেমে গ্রামের ভিতর চলে যাচ্ছে, আবার কোথাও বা গ্রাম থেকে লোক উঠছে বাসে। ঘণ্টা দুই পরে বাস দাঁড়াল একটি রেস্টুরেণ্টের সামনে। যাত্রীদের লাঞ্চ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে এইখানে।

বাইরে প্রচণ্ড শীত; বাসের ঘর বেশ গরম করা। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার পথ চলা সুরু হল।

শীতকালে নরওয়ের পশ্চিমে 'গাল্‌ফ ষ্ট্রীমের (Gulf Stream) উষ্ণস্রোত প্রবাহিত হয়ে দেশটিকে হিমসাগরের হাত থেকে খানিকটা বাঁচায়;—সারা দেশময় জল জমাট বেঁধে কঠিন বরফে পরিণত হতে পারে না; নচেৎ এই সকল অঞ্চলে প্রাণীবাস একেবারেই অসম্ভব হত, গ্রাম গড়ে ওঠা তো দূরের কথা।

বেলা ৫টায় সূর্য ঠিক মাঝ গগনে মাথার উপরে। আরো দু'ঘণ্টা পথ অতিক্রম করে এসে সন্ধ্যায় প্রায় ৭টায় ট্রমসো (Tromso) পৌঁছলাম। বাস-স্টেশনের কাছেই গ্র্যাণ্ড হোটেল (Grand Hotel)। তীব্র শীতে বাইরে থাকা দায়! শীতে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলের দিকে ছুটে চলেছি। রাস্তায় নতুন দেশের মানুষ দেখে সবাই আমাদের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছে। এই গ্রীষ্মকালে তাদের কারুর গায়ে রয়েছে হালকা গরম কোট, আর কেউ বা পরেছে শুধুই সিল্কের জামা।

(ক্রমশঃ)

মহাব্যোম

বিনয়কৃষ্ণ কর

শূন্যের কি আছে কোন রূপ?
কোথা-তার স্থিতি?
কেউ বলে, আছে রূপ, আছে স্থিতি;

আমি বলি, যেথা আমি নাই
শূন্য ত তাই,
যে রঙে আঁকা তার রূপ

৯

কালকূট তপস্যা করিতেছিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যাশা করিতেছিলেন যে স্বয়ং পিতামহ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল, ঝোপের অন্তরালে চার্ব্বাক নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটিল না। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ছিন্নভিন্ন হস্তকে ঘিরিয়া কতকগুলি রক্তলোভী মক্ষিকা ভনভন করিতে লাগিল কেবল। নিমীলিত নয়নে কালকূট মক্ষিকাদের গুঞ্জন কলরবই শুনিতেছিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল মক্ষিকা-গুঞ্জনের অন্তরালে যেন মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। বহুদূর হইতে কে যেন বলিতেছে—ভয় নাই, আমি আসিতেছি। কালকূট একাগ্রচিত্তে সেই আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল স্বয়ং পিতামহই বুঝি মক্ষিকাগুঞ্জনের ভিতর দিয়া বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কিন্তু মক্ষিকাগুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া গেল। কালকূট চক্ষু উন্মীলন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শবদেহও উঠিয়া বসিল এবং তাহার অক্ষি-বাতায়নে সেই রূপসী আবির্ভূতা হইলেন। কালকূটকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনার অনুসন্ধান কি সমাপ্ত হয়েছে? আপনি এর হস্তের শিরা উপশিরা পেশী স্নায়ু ছিন্নভিন্ন করে' কোন রহস্যের সন্ধান পেলেন কি? যে হস্ত গুরু খড়্গ ধারণ করে' নৃশংস হত্যায় সহায়তা করে, যে হস্ত নিপুণ বিলাসে লঘু তুলিকা চালনা করে' মনোরম চিত্র অঙ্কন করে, যে হস্ত এক মুহূর্ত্তে পেলব পল্লবতুল্য—পরমুহূর্ত্তে কঠিন বর্ত্তুলবৎ হ'তে পারে, যে হস্ত বরদান করে ভিক্ষাদান করে, যে হস্ত সেবা করে, চপেটাঘাত করে, যে হস্ত কখনও মৌন কখনও ভাষাময়, কখনও লুণ্ঠক কখনও দাতা, সে হস্তের প্রকৃত রূপ কি আপনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন? যদি পেরে থাকেন তাহলে অনুমতি দিন আমি অন্যান্য প্রাণীদের বাসনা চরিতার্থ করবার আয়োজন করি। আপনি যখন তপস্যায় রত ছিলেন তখন একদল প্রাণীর বাসনা আমি পূর্ণ করেছি—"

কালকূট উত্তর দিলেন, "দেবি, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না!"

"ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শবদেহে আপনার যেমন প্রয়োজন ছিল, আরও অনেকের তেমনি প্রয়োজন আছে, সকলকেই আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যে তাদের প্রয়োজনও আমি মেটাব। আপনাদের প্রয়োজনের বৈচিত্র্যেই আমি আনন্দিত। এখনই একদল মক্ষিকা ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ক্ষতস্থানে বসে' আমাকে প্রচুর আনন্দ দান করে' গেল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের দেহব্যবচ্ছেদ করে' আপনি যে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন তাতেও আমি কম আনন্দিত হই নি। ওই দেখুন, আর একদল প্রাণী বসে আছে—"

কালকূট দেখিলেন অনতিদূরে কয়েকটি শৃগাল বসিয়া রহিয়াছে।

"ওই শৃগালদের মুখে আপনি আত্মসমর্পণ করবেন?"

"আত্মসমর্পণ করেই আমি যে কৃতার্থ"

"দেবি, আমি কিন্তু এখনও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিনি"

"কি ধরণের সিদ্ধি আপনি লাভ করতে চান বলুন। হস্ত ব্যবচ্ছেদ করে' আপনি কি পেলেন?"

"আমি যা পেয়েছি তা সবই প্রত্যাশিত। আমি আশা করেছিলাম অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে—"

"সে প্রত্যাশাও আপনার সফল হবে হয়তো। এই মানবদেহ অসীম সম্ভাবনা পূর্ণ। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ব্যবচ্ছেদিত হস্তের মধ্যবর্ত্তী শিরাটি লক্ষ্য করুন। শিরাটি কি ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছে না?"

কালকূট অবিলম্বে শিরাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে সত্যই তাহা ক্রমশ

তকার হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহা বৎ হইয়া উঠিল, তাহাতে বহুবর্ণের শব্দ সমাবিষ্ট হইল শেষে তাহা আর শিরা রহিল না, সর্পে রূপান্তরিত হইয়া ল। সেই সর্প মুহূর্ত্তমধ্যে ফণা বিস্তার করিয়া কালকূটকে াধনও করিল—

"কালকূট, তুমি স্পষ্ট ভাষায় বল তুমি কি চাও। সৃষ্টি-র্ত্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব তুমি কামনা করছ কেন? তাঁর টা বিশেষ রূপ প্রত্যক্ষ করাই কি তোমার উদ্দেশ্য? আর কোনও উদ্দেশ্য আছে? সত্যভাষণ যদি কর হলে আমি তোমাকে সহায়তা করব"

"আপনি কে"

"আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ কশ্যপ! পিতামহের দেশে আমি তোমার প্রকৃত মনোভাব জানতে এসেছি। মি যদি তোমার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত কর তাহলে তিনি ামার বাসনা পূর্ণ করবেন"

"তিনি কি আমার মনোভাব জানেন না?"

"তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সবই জানেন। কিন্তু তোমার থেকে তিনি তোমার অভিলাষ আমার মাধ্যমে শুনতে ন। তুমি নাগপুরী পাতাল পরিত্যাগ করে' এসেছ ন? সেখানেও তো তপস্যার উপযোগী বহু স্থান ছিল"

কালকূট কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন—আমার পত্নী বর্ণমালিনীর অগোচরে আমি এ তপস্যা রতে চাই, নাগপুরীতে তা সম্ভব নয়"

"বর্ণমালিনী সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা এই প্রমাণ করতে তুমি বরিয়েছ, বর্ণমালিনীকে এই কথা তুমি বলেও এসেছ, তা ক তাহলে মিথ্যা?"

কালকূট বলিলেন, "আমি যা বলব তা বর্ণমালিনী টের াবে না তো?"

"না। তুমি নির্ভয়ে সত্যভাষণ কর"

"হ্যাঁ, তা মিথ্যা। আমি তাকে প্রতারণা করেছি"

"কেন"

"আমি যা কামনা করছি তা সফল হলে' বর্ণমালিনী ক্ষেপে যাবে। ক্ষিপ্তা বর্ণমালিনীর প্রকোপে আমার জীবন ছারখার হয়ে যাবে তাহলে"

বর্ণমালিনী ক্ষিপ্তা হয়ে উঠবে একথা কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। পিতামহকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়, বর্ণমালিনীই বা না হবে কেন। তুমি কি তাহলে পিতামহকে দর্শন করতে চাও না?"

"পিতামহকেই আমি দর্শন করতে চাই"

"তাহলে বর্ণমালিনী রাগ করবে কেন বুঝতে পারছি না। বৎস কালকূট, তুমি সরলভাবে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর"

"আপনি আমার আদিপুরুষ পরম পূজনীয় কশ্যপ। আপনার কাছে আমি অকপটে সব কথা বলতে লজ্জিত হচ্ছি—"

"আমার শারীরিক সান্নিধ্যই কি তোমার লজ্জার কারণ হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"বেশ, আমি অশরীরী হচ্ছি। তুমি স্পষ্ট করে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর"

সর্প অন্তর্হিত হইল।

কালকূট শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি মেঘমালতীকে চাই, তাই আমার এ তপস্যা। পিতামহ অসম্ভবকে সম্ভব কর। শবদেহের মধ্যে একদিন আমি অসম্ভবকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাই আমি শবসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম, মর্ত্ত্যের মায়ানদীর পারে অবস্থিত সন্ধানলোকে আমি বিরাটকায় এক শবের সন্ধান পাব যদি আমি সেই মায়া নদী পার হতে পারি। বর্ণমালিনীর জিহ্বার সাহায্যে আমি সে নদী পার হয়েছি, বর্ণমালিনী আমাকে জিহ্বা বিস্তার করে' সহায়তা করেছে, কারণ তাকে বলেছি যে ত্রিভুবনে তারই রূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই আমার তপস্যা। কিন্তু তুমি তো, জান, পিতামহ, আমার তপস্যা মেঘমালতীর জন্য, তুমি আমার এ বাসনা চরিতার্থ কর। যতক্ষণ আমি সিদ্ধিলাভ না করি ততক্ষণ আমি প্রার্থনা করব, হে অসম্ভব-সম্ভব-কর্ত্তা আদিজনক, তুমি প্রসন্ন হও—"

মহাশূন্যলোকে একটি শুভ্র মেঘখণ্ড ভাসিতেছিল, মনে

স্বর্ণালোককে সম্বোধন করিয়া শুভ্র মেঘখণ্ড বলিল, "সরো, শুনলে তো?"

"শুনলাম"

"মানে, ও ক্রমাগত জ্বালাতন করবে। খেলনাটা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকবে ক্রমাগত। চল, আর দেরি করে' কি হবে? নেবে পড়ি। তুমি বায়ুরূপে বহন কর আমাকে"

"বহন করে' কোথায় নিয়ে যাব"

"সেই পদ্ম সরোবরে। তারা সেখানে পদ্মের পরাগ মাখছে ভ্রমরীর বেশ ধরে'"

"চলুন"

বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হইল। শুভ্রমেঘ লীলায়িত গতিতে ধীরে ধীরে চক্রবাল রেখার পরপারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কালকূটের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক কালো হইয়া গেল। সূর্য্যালোক অবলুপ্ত হইল না, কেবল তাহা কৃষ্ণাভ হইয়া হিংস্র হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন অভূতপূর্ব্ব উপায়ে কোন ক্রুর বিষধরের নয়নের দৃষ্টি মূর্ত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সেই কৃষ্ণাভ আলোকে কশ্যপ পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। কালকূট কশ্যপকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ তিনি এবার সর্পরূপে আসেন নাই, নীলাভ জলন্ত শিখার রূপে আসিয়াছিলেন। সেই শিখা যখন কথা কহিয়া উঠিল তখনই কালকূট বুঝিতে পারিলেন। শিখা বলিল, "বৎস কালকূট, তোমার অকপট মনোভাব জ্ঞাত হয়েছি। এখনই পিতামহের নিকট গিয়ে তা আমি ব্যক্ত করব। কিন্তু একটা কথা তোমাকে না বলে' পারছি না। আমি লজ্জিত হয়েছি। নাগবংশের কুলতিলক শেষ-নাগ কেন যে সহোদরদের সংসর্গ বর্জ্জন করে' তপস্যায় দেহপাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন তা এখন আমি বুঝতে পারছি। নাগ বংশীয়েরা ক্রূর ও খল; তারা কুলাঙ্গার ও মন্দস্বভাব, তাদের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, তাদের তপস্যা তুচ্ছ বরলাভের জন্য। আমি সুর, অসুর, দৈত্য দানব নাগ পশুপক্ষী সকলেরই জনক, তাদের আচরণের নিন্দা বা গৌরব আমাকেই বহন করতে হয়, তাই আমি কঠিনপৃষ্ঠ কূর্ম্মরূপ জঞ্জালস্তূপও আমি বহন করব। কিন্তু বৎস, তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি পরিচ্ছন্ন হও, সত্যকে কামনা কর, সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে ধ্রুবকেই সন্ধান কর—"

কালকূট বলিলেন, "বর্ণমালিনী এবং মেঘমালতীর মধ্যে কে ধ্রুব—"

জলন্ত শিখা ইহার কোন উত্তর দিল না। সহসা তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া পরমুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কালকূট সবিস্ময়ে দেখিল এক পর্ব্বতাকার বিরাটকায় কূর্ম্ম দিগ্বলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার বিশাল পৃষ্ঠে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন বস্তুর বিচিত্র সমাবেশ। সে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মণিমাণিক্য, স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ, আবর্জ্জনা কঙ্কাল, কর্দ্দম, বহুবিধ সুদৃশ্য খাদ্য, বহুবিধ ভীষণ দর্শন অস্ত্রশস্ত্র, বিবিধ বর্ণের পুষ্পসম্ভার—একটা বিরাট জগৎ যেন। কালকূট বিস্ফারিত নয়নে সেই চলমান পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা সে দেখিতে পাইল কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থ একটি নরকঙ্কাল ক্রমশ যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহা মেঘমালতীর রূপ পরিগ্রহ করিল। কালকূটের মনে হইল মেঘমালতী হস্ত সঙ্কেতে যেন তাহাকে আহ্বানও করিতেছে। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সে অনুসরণ করিতে লাগিল।

১০

আকাশ যেখানে গিয়া কল্পলোকে মিশিয়াছিল সেখানে সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র কিছুই ছিল না, বাতাসও ছিল না, আলোক তো ছিলই না। কল্পলোকের প্রগাঢ় অন্ধকার তথাপি স্পন্দিত হইতেছিল। নিরবচ্ছিন্ন একটি সুর সেই অন্ধকার জগতকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন সেই অদৃশ্য সুরেই সেই অন্ধকার লোক বিধৃত হইয়া আছে; তাহার অণুপরমাণু যেন সেই সুর-স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে। ক্রমশ একটি সুর ভাঙিয়া দুইটি হইল, একই যেন দুই বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। মনে হইতে লাগিল দুইটি সুর-রেখা সমান্তরালে যেন অদৃশ্যলোকের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তাহারা বাঙ্ময় হইল।

"হে স্রষ্টা, তুমি আর একবার বল, কিসে তুমি প্রকৃত

"সৃষ্টিতে"

"সৃষ্টির অর্থ কি"

"অয়ি ছলনাময়ি, তুমিই তো আমার সর্ব্ব সৃষ্টির বাণী। সৃষ্টির অর্থ কি তোমার জানা নেই? না, এটা তোমার ছলনা"

"যদি ছলনাই হয় তাহলে তা-ও আপনার সৃষ্টি। কারণ আমি আপনারই বাণী। আমি আপনার সৃষ্টি-প্রেরণার ভাষা। কিন্তু সৃষ্টি মানে কি তা আমি জানি না"

"যা ছিল না তাই সম্ভব করাই সৃষ্টি। এতেই আমার আনন্দ"

"সৃষ্টি-রক্ষায় আপনার আনন্দ নেই?"

"সৃষ্টি-রক্ষা বিষয়ে আমি উদাসীন"

"তাহলে আপনি বিষ্ণুকে সৃষ্টির হিসাব দাখিল করতে বলেছেন কেন"

"তাতেও একটা সৃষ্টি হবে"

"কি রকম সৃষ্টি"

"রস-সৃষ্টি"

সহসা দুইটি বিভিন্ন সুরের কলহাস্যে অন্ধকার আনন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার পর একটা নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। মনে হইতে লাগিল কল্পলোকের সেই নিবিড় অন্ধকার যেন তপস্যা-মগ্ন হইয়া গিয়াছে। নিবিড় অন্ধকার যেন নিবিড়তর হইতেছে, যুগ যুগান্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। সহসা সেই মহাশূন্য আবার বাঙ্ময় হইয়া উঠিল।

"বাণী, কোথা তুমি"

"এই যে"

"আমাকে আর তুমি স্রষ্টা বলে 'সম্বোধন কোরো না"

"কেন"

"কারণ আমি স্রষ্টা নই। মানুষই স্রষ্টা। মানুষই তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করেছে। তাদের কল্পনা আমাদের সৃষ্টি করছে, তাদের অনুসন্ধিৎসা আমাদের ধ্বংস করছে। আমি সেই সংশয়াচ্ছন্ন সত্য-সন্ধানীকে, তোমার আমার স্রষ্টাকে, যেন দেখতে পাচ্ছি। সে ধন চায় না, মান চায় না, স্তুতিনিন্দাকে গ্রাহ্য করে না, চায় শুধু সত্য—অর্দ্ধ-সত্য নয়, [illegible] তাকেই

তৈরি খেলনা মাত্র। আমাকে স্রষ্টা বলে' আর ডেকো না তুমি"

"আপনি কি চার্ব্বাক কালকূটদের কথা ভাবছেন?"

"ওরা সত্য চায় না, ওরা চায় আত্মপ্রসাদ। সেই আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে ওরা সব অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ওদের মধ্যেই সেই সত্য-সন্ধানী আছে যে দ্রষ্টা যে স্রষ্টা—"

"আমি আপনি কেউ নই তাহলে—"

"আমি ওদের প্রেরণা, আর তুমি ওদের ভাষা। ওরা যেমন বদলাবে আমরাও তেমনি বদলাব। ওরাই কবি, আমরা ওদেরই সৃষ্টি—"

"কিন্তু আপনি যে স্বৈরচর সৃষ্টি করলেন"

"তা ওদেরই কবির প্রেরণায়, ওদেরই প্রেরণাকে আমি রূপ দিয়েছি কল্পলোক। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় মানুষ হয়তো থাকবে না, আমরাও তখন থাকব না—"

"মানুষ থাকবে না কেন"

"যারা একান্তভাবে সত্যকে চায় তারা একদিন সত্যেই লীন হয়ে যায়, তাদের আলাদা অস্তিত্ব আর থাকে না। সত্য সৃষ্টির অপেক্ষা রাখে না, বাণীরও প্রয়োজন নেই তার"

"এ অবস্থায় পৌছতে মানুষের কত দেরি আছে"

"অনেক দেরি। হয়তো কোনও দিনই কেউ পৌছবে না। কিন্তু সম্ভাবনা আছে ওদেরই—"

"যতদিন না পৌছচ্ছে ততদিন—"

"ততদিন এস আমরা খেলা করি দেব-দৈত্য দানব-মানবদের কামনা নিয়ে। ভবিষ্যৎ যুগের এক চার্ব্বাকের ছবি তুমি দেখাবে বলেছিলে—"

"চলুন তাহলে নিয়ে যাই আপনাকে ভবিষ্যৎ যুগের কবির মানসলোকে"। কিন্তু উপস্থিত যে চার্ব্বাকটি ঝোপের ভিতর বসে আছে তার গতি কি হবে"

"তাতো আমি এখনও জানি না। ওর নব প্রেরণায় যে নবব্রহ্মা সৃষ্টি হবে সেই চালিত করবে ওকে—"

সহসা সেই কল্পলোকে এক আর্ত্তকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—"পিতামহ, পিতামহ, গরুড় আমাকে ত্যাগ করে' যাচ্ছে, আমি অসহায় হয়ে পড়েছি। আমাকে রক্ষা করুন—"

পিতামহ বলিলেন—"চল! নাটক করা যাক্—"

ক্রমশঃ

বেঙ্গল কেমিক্যালের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ৪ঠা বৈশাখ বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলা কারখানা প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত একটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে সমাগত অতিথিদের এবং আচার্য্য দেবের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যালের পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লিখিত পুস্তিকা বিতরিত হয়। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাসায়নিক ও ঔষধ শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কিরূপে সামান্য অর্থ সম্বল করিয়া শুধু অসাধারণ পরিশ্রম, দূরদৃষ্টি ও অনন্যসাধারণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ক্রমশঃ কিভাবে উহা বর্তমান বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ চিত্তাকর্ষক বিবরণী পাঠ করিলে গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। অশ্বত্থের ক্ষুদ্র একটি বীজ উপ্ত হইয়া একটিমাত্র ক্ষীণকাণ্ড রৌদ্রবৃষ্টি ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এবং কালে মহামহীরূহে পরিণত হইয়া অগণিত পশুপাখীকে আশ্রয়দান করে এবং কত আতপতাপক্লিষ্ট পথিকের ক্লান্তিদূর করে তার ইয়ত্তা নাই। বেঙ্গল কেমিক্যালের ইতিহাস অনুরূপ চিত্রই মনে অঙ্কিত করে। ৯১নং অপার সার্কুলার রোডে অধ্যাপক রায়ের বাসভবনে বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্ম। অধ্যাপক তাঁহার অবসরকালে নিজের হাতেই ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত। তাঁহার ব্যবহার-মাধুর্য্য ও তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন শিক্ষিত যুবক তাঁহার সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার অমূল্যচরণ বোস, সতীশচন্দ্র সিংহ এবং চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার কথা ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আচার্য্যদেবের সঙ্গে মাত্র দেড় বৎসর কাজ করিবার পরই সতীশচন্দ্র আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮৯৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর অমূল্যচরণও প্লেগের কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। সহকর্মীদের শোকে বিহ্বল হইলেও কর্মযোগী প্রফুল্লচন্দ্র শীঘ্রই আত্মস্থ হইয়া পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০১ সালের ১২ই এপ্রিল শ্রীচন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, শ্রীভূতনাথ পাল, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু, শ্রীচারুচন্দ্র বসু, অমূল্যচরণ এবং সতীশচন্দ্রের বিধবা পত্নীদের লইয়া আচার্য্য রায় একটি লিমিটেড লায়েবেলিটি কোম্পানি গঠন করিয়া উহার নাম রাখিলেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড'। ১৯০১ সালের ব্যালান্স শিটে দেখা যায় কোং-র মূলধন ২৩৫০০্ টাকা। এই সময় মাণিকতলাতে ১০ বিঘা জমি কিনিয়া কারখানার সম্প্রসারণ

চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএ বিশেষ জ্ঞান থাকায় বহু নতুন নতুন যন্ত্রাদি বসানো হয়। বিখ্যাত ডাক্তার কার্তিক চন্দ্র বসুও বিশেষ উদ্যম সহকারে কার্য্যে যোগদান করেন ১৯০২ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন এবং ভূতনাথবাবু এবং কার্তিকচন্দ্র ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত যুগ্মভাবে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজ করেন। অতঃপর ঐ পদ তুলিয়া দেওয়া হয়।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় ১৯০৩ সালে কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং ১৯০৪ সালে ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। বেঙ্গল কেমিক্যালের সমুদয় উন্নতির মূলেই এই মনীষীর প্রতিভা বিদ্যমান। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করিলেও এখন পর্য্যন্ত তিনি কোং-র প্রধান উপদেষ্টা ও পরিচালকরূপে কাজ করিতেছেন।

সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯ বৎসরকাল এই কোং-র সহিত যুক্ত ছিলেন এবং বহু বৎসর ফ্যাক্টরি সুপারিনটেনডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার অসাধারণ গঠনমূলক কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর কর্মীর প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ সহৃদয় ব্যবহার—এবং যোগ্যতার যথোচিত মর্য্যাদাদানের জন্যও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে কোং-র নানাদিকে সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়। সালফিউরিক, নাইট্রিক প্রভৃতি অ্যাসিড, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, হাইপো (সোডিয়ম থায়ো সালফেট), ক্যাফিন (চায়ের পরিত্যক্ত গুঁড়া থেকে) প্রভৃতি বহুল পরিমাণে গবর্ণমেন্টকে সরবরাহ করিতে হয়। উন্নত ধরণের কেমিক্যাল ব্যালান্স প্রভৃতিও যন্ত্রশালায় তৈরি হইতে থাকে। ষ্টেরিলাইজড্ সারজিক্যাল ড্রেসিংএর চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং সুরাসার সংযুক্ত ঔষধপত্রাদি প্রচুর পরিমাণে তৈরির জন্য একটি বণ্ডেড ল্যাবরেটরিও খোলা হয়।

মাণিকতলা কারখানায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯১৯-২১ সালে পানিহাটিতে ১৫০ বিঘা জমি কিনিয়া কারখানার সম্প্রসারণ আরম্ভ হয়। এই নূতন কারখানায় ১৯২২ সাল হইতে আলকাতরা ডিসটিলেশন এবং ১৯২৪ সালে প্রচুর পরিমাণে ষ্টেরিলাইজড্ সারজিক্যাল ড্রেসিং তৈরির সূত্রপাত হয়। ১৯৩১ সালে পানিহাটিতে একটি সুবৃহৎ "রিকভারী" ব্যবস্থা সহ ভারতে প্রথম সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতের প্ল্যান্ট বসান হয় এবং ১৯৪০ সালে একটি "কনট্যাক্ট" সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়। এই দুইটি প্ল্যান্ট হইতে প্রতিদিন ২০ টন করিয়া অ্যাসিড প্রস্তুত হইতেছে। ১৯৩৪ সালে পানিহাটিতে সাবান প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রভৃতি প্রস্তুত আরম্ভ হয়। এতদ্ভিন্ন পানিহাটি কারখানাতে হীরাকস, অ্যালুমিনিয়ম সালফেট, অ্যালাম, জিঙ্ক সালফেট, ম্যাগসালফ, সিলভার নাইট্রেট, সোডিয়ম্ ডাইক্রোমেট, জিঙ্ক ক্লোরাইড, ইথর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দৈনিক ৩০ টন অ্যালাম তৈরির ব্যবস্থাযুক্ত আমেরিকার ডর কোং হইতে আনীত একটি বিরাট প্ল্যান্ট পানিহাটিতে বসিতেছে। এই বৎসরের শেষের দিকেই উহা চালু হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। সার্জিক্যাল ড্রেসিং, বোরিক কটন প্রভৃতি পানিহাটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। পানিহাটি কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী মণীন্দ্রচন্দ্র বকসী, প্রফুল্লরতন ঘোষ, সতীশচন্দ্র পর্বত প্রভৃতির কর্মনিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতা সুপরিচিত। রবীন্দ্রবাবু উভয়প্রকার সালফিউরিক অ্যাসিড্ যন্ত্রের গোড়াপত্তন হইতে প্রধান পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

'১৯২৯ সালে মাণিকতলা কারখানায় ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষের সহযোগিতায় বায়োলজি বিভাগ খোলা হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সিরাম, ভ্যাকসিন ও ইনজেকশন দিবার বিবিধ ঔষধপত্র এখানে তৈরি হইতে আরম্ভ করে। প্যাথলজি এবং ব্যাকটেরিওলজির অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ চারুচন্দ্র বসু বর্তমানে বায়োলজি বিভাগে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতেছেন এবং ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন।

ভারতের দূরবর্তী অঞ্চলে কলিকাতা হইতে ঔষধপত্রাদি পাঠান নানারূপ অসুবিধা, তদ্ভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশে সুরাসারঘটিত ঔষধাদির ডিউটি বিভিন্ন-প্রকারের হওয়ায় কোং ১৯৩৮ সালে বোম্বাইতে একটি শাখা কারখানা স্থাপন করিয়া ঔষধপত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনুরূপ কারণে ১৯৪৯ সালে কানপুরে ও একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশেও কোম্পানীর মালের যথেষ্ট চাহিদা জন্মিয়াছে। ১৯৩৮ সালে তদানীন্তন ম্যানেজার জগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া তত্রত্য ঔষধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া আসেন।

পাশ্চাত্যের রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বচক্ষে দেখিবার এবং কারখানার পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ১৯৩১-৩২ সালে সুরেন্দ্রভূষণ সেন ইংলণ্ড ও জার্মানিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনি রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরে ম্যানেজার হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনুরূপ উদ্দেশ্যে কোংর নব নব পরিকল্পনায় সহায়তার জন্য বর্তমান ম্যানেজার শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন ১৯৪৫ সালে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। রাসায়নিক কারখানার উপযোগী যন্ত্রপাতি কোথায় কিরূপ পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৪৮ সালে চীফ কেমিষ্ট হরগোপাল বিশ্বাসকে কোম্পানী ইংলণ্ড, জার্মানি ও সুইজার-[illegible] পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা কোংর উন্নতির বার্ষিক দেড় কোটি টাকার উপর উন্নীত হইয়াছে এবং বিভিন্ন কারখানায় এখন প্রায় ৪০০০ লোক খাটিতেছেন।

কোংর মাণিকতলা কারখানায় বিরাট আকারের যন্ত্র-শালা বা মেশিন-শপ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি মনীষীর আদর্শে অনুপ্রাণিত নিরলস দক্ষ কর্মী শ্রীসতীশচন্দ্র সেন এই যন্ত্র-শালার পরিচালক। এখানে কেবলমাত্র কোংর বিভিন্ন বিভাগের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি তৈরি ও মেরামত হয় তাহা নহে, কেমিক্যাল ব্যালান্স, গ্যাস এবং জলের ট্যাপ, গ্যাস বার্ণার (burner), গ্যাস প্ল্যান্টস্, অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র, সার্জিক্যাল ষ্টেরিলাইজার, হাসপাতালের ব্যবহার উপযোগী বহু জিনিস প্রস্তুত ও বিক্রয় হয়। কামারশালা, ছুতারশালা প্রভৃতিতে অনেক উন্নতধরণের যন্ত্রাদির সাহায্যে এই সব কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে প্রকাণ্ড একটি করাত কলও আছে। মালপত্র পাঠাইবার জন্য যে অসংখ্য বাক্স দরকার তাহা এখানেই তৈরি হয়।

কোংর ছাপার কালি-তৈরির বিভাগ বেশ বড়। সুলেখক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ইহা পরিচালনা করেন। ইনি প্রথমে বহুদিন গন্ধ দ্রব্য বিভাগে কাজ করিয়া যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কোংর বিশ্লেষণাগার বা অ্যানালিটিক্যাল ল্যাবরেটরি খুব বড় এবং বহু উচ্চশিক্ষিত কেমিষ্ট আধুনিক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে ঔষধপত্র বিশ্লেষণ করেন। এই বিভাগের উপর কোংর সুনাম যথেষ্ট নির্ভর করে। কারণ বিবিধ কাঁচামাল কিনিবার প্রাক্কালে তাহার গুণাগুণ কিরূপ তদ্বিষয়ে সঠিক না হইয়া— ঔষধ প্রস্তুত করা যায় না—তদ্ভিন্ন কোনও মাল বাজারে ছাড়িবার পূর্বে তাহার উৎকর্ষ (quality) ঠিক আছে কিনা তাহাও দেখিয়া দিতে হয়। শ্রীধরণীমোহন ঘোষ এই বিভাগ পরিচালনা করেন।

যে সকল ঔষধের গুণাগুণ নির্ণয়ে কেমিক্যাল টেষ্ট যথেষ্ট নয়—সেগুলি প্রাণি দেহের উপর পরীক্ষা করিয়া তাহাদের উৎকর্ষ দেখিতে হয়। এই বায়োলজিক্যাল বিভাগ একজন সুদক্ষ চিকিৎসক, ডাঃ বনবিহারী চ্যাটার্জি মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক (part-time) ফিজিওলজির অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

পানিহাটিতে হেভি কেমিক্যাল প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন মানিকতলা কারখানাতে ও প্রায় ১৫০ প্রকারের ষ্ট্যানডার্ড গুণসম্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্য (কেমিক্যাল) এবং বিশ্লেষণ কার্য্যের উপযোগী ধাতব অ্যাসিড ও অন্যান্য কেমিক্যাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রীনদীয়া বিহারী অধিকারী—এই কেমিক্যাল বিভাগের অধিকর্তা।

ফারমাসিউটিক্যাল বিভাগ প্রধানতঃ মাণিকতলাতেই সব চেয়ে বড়। এই বিভাগের কিছু কিছু অংশ—বম্বে, কানপুর এবং পানিহাটিতেও আছে। সুরাসার ঘটিত ঔষধাবলী বণ্ডেড ল্যাবরেটারিতে প্রস্তুত হয়। মাণিকতলা কারখানা ব্যতীত বোম্বাই এবং কানপুরেও বণ্ডেড ল্যাবরেটরি

গবেষণা বিভাগ হইতে যে সব নূতন নূতন ঔষধ বাহির হয় সেগুলিও ফারমাসি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিবিধ গন্ধ দ্রব্য, টুথপাউডার, গন্ধ তেল প্রভৃতি এই বিভাগেই প্রস্তুত হয়। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বসু এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

যে কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে গোড়া হইতেই গবেষণার মনোবৃত্তি প্রবল হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে তাঁহার সহকর্মী সুরেন্দ্রভূষণ সেন, জগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং শ্রীসত্য প্রসন্ন সেন—সকলেই অদম্য রিসার্চ স্পিরিট লইয়া অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে আলকাতরা ডিসটিলেশন, ইথর প্রস্তুত, প্রচুর পরিমাণে কুর্চির সক্রিয় উপাদান ও এফিড্রিন প্রস্তুতি ব্যাপারে সাফল্যলাভ করেন। কোম্পানির কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইঁহারা পৃথক্ একটি গবেষণাগার স্থাপন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব ছাত্র গবেষণায় হাত পাকাইয়াছে তাঁহাদের সহযোগিতায় রাসায়নিক শিল্পের প্রসার সাধনে যত্নপর হন। ১৯৩২ সালে ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম কেমিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয় এবং ভিটামিন সম্বন্ধে জোর গবেষণা কার্য্য চলিতে থাকে। ঐ বৎসরই প্রফুল্লকুমার পাল কেমোথেরাপি সম্বন্ধে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি ঐ তিন চার বৎসরের মধ্যেই আর্সেনিক ও অ্যান্টিমনিঘটিত সিফিলিস, আমাশয় ও কালাজ্বরের ঔষধ তৈরি করেন এবং আর্টান নামে বাতের ঔষধও প্রস্তুত করেন; শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ মৌলিক বহু গবেষণা করিয়া সোডিয়ম বাইক্রোমেট ও পটাস পারমাঙ্গানেট প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেন এবং শ্রীজগদানন্দ দত্ত ক্লোরোফরম প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। ১৯৩৭ সালে সার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ ল্যাবরেটারি নামে সুবৃহৎ গবেষণাগার স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে ১৯৩২ সালে শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস কোলয়েড কেমিষ্ট্রির গবেষণা সুরু করেন এবং কোলোয়ডাল ক্যালসিয়াম প্রভৃতি বিবিধ colloid জাতীয় ঔষধ প্রস্তুত করেন। শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ১৯৩৩ সালে ভিটামিন রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে ডক্টর গুহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীশকুমার সাহা যুদ্ধের পূর্বেই বিশুদ্ধ ক্যাফিন, ষ্ট্রিকনিন প্রভৃতি নূতন পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সেগুলি বিরাট আকারের যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে। যুদ্ধের মধ্যে ইনি এমিটিন এবং স্যান্টোনিনও প্রস্তুত করেন এবং পরে নিকোটিনিক অ্যাসিড, নিকোটিন অ্যামাইড, নিকেথ্যামাইড প্রভৃতিও প্রস্তুত করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে শ্রীসতীন্দ্রজীবন দাশগুপ্ত রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে নিযুক্ত হন। ইনি স্টিবিউরামিনের উন্নতি সাধন করেন, সলুসেপটামিন, প্যারামিন প্রভৃতি সালফাড্রাগ ও এনট্রোকিন নামে আমাশয়ের অতি উপকারী ঔষধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। সিবা কোং যাকে এনটারোভায়োফরম বলেন এই এনট্রোকিনও সেই পদার্থ। যুদ্ধের মধ্যে বিশ্বাস, দাশগুপ্ত ও সাহা একত্রে অ্যাটেব্রিনও প্রস্তুত করেন; কিন্তু উৎপাদক রাসায়নিক দ্রব্যাদির অভাব নিবন্ধন উহা ভূরি পরিমাণে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নি। এই রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কাজ করিয়াই হরগোপাল বিশ্বাস ও সতীন্দ্রজীবন দাশগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস প্রথমতঃ ভিটামিন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা এবং ভিটামিন ঘটিত ঔষধাদি প্রস্তুতি ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। পরে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইনি হরিতকি হইতে লিখিবার কালির প্রধান উপাদান ট্যানিক অ্যাসিড, মাজুফল ও টেরিপড হইতে বিশুদ্ধ ট্যানিক অ্যাসিড, গ্যালিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে থাকেন। গ্যালিক অ্যাসিড হইতে বিশুদ্ধ পাইরোগ্যালিক অ্যাসিড প্রস্তুতের একটি যন্ত্রও ইনি উদ্ভাবন করেন এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত বহুল পরিমাণ বিশুদ্ধ পাইরোগ্যালল ইনি যুদ্ধের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে সরবরাহ করিতে সমর্থ হন। অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের জন্য রিটাগল হইতে স্যাপোনিনও ইনি সহজ উপায়ে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করেন এবং ছানার জল হইতে বিশুদ্ধ মিল্ক সুগার প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধের মধ্যে উহার চাহিদা পূরণ করেন। ইনি এই ল্যাবরেটরিতে ডি ডি টিও প্রস্তুত করেন—কিন্তু কাচামালের মহার্ঘতার দরুণ ভূরি পরিমাণে ডি ডি টি উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। বিশ বৎসর আগে আচার্য্যদেবের সঙ্গে সংযুক্ত নামে ইনি ভিটামিন সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ভারতবর্ষে প্রকাশ করেন এবং পরে খাদ্য বিজ্ঞান নামে প্রামাণ্য গ্রন্থও আচার্য্যদেবের সঙ্গে সম্মিলিত নামে প্রকাশ করিয়া যশোলাভ করেন। ১৯৪৫ সালে ইনি Scope of Chemical Industry নামক পুস্তক কোংর অর্থসাহায্যে প্রকাশ করেন এবং ১৯৪৮ সালে বিদ্যোৎসাহী বর্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের সহিত যুক্ত নামে Development of Coaltar Colour Industry নামক মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেন। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সন্দর্ভ ইনি ইংরাজি ও বাংলা মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় প্রায়শ প্রকাশ করিয়া থাকেন। জার্মান ভাষাতেও ইঁহার অধিকার সর্বজনবিদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঁহার লিখিত জার্মান শিক্ষার পুস্তকের ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইঁহার জার্মান জ্ঞান রিসার্চ বিভাগের বহু জিনিস দাঁড় করাইবার পথ সুগম করিয়াছে। মৌলিক গবেষণাতেও ইনি সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ৭৬ বৎসর জুরিখের নোবেল-প্রাইজপ্রাপ্ত অধ্যাপক পলকায়ারের সহিত কালমেঘের সক্রিয় উপাদানের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঁহার মূল্যবান প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। বর্তমানে কুষ্ঠরোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ ডি ডি এস এবং তাহার ডেরিভেটিভ নভোট্রোন দেশীয় সস্তা রাসায়নিক দ্রব্য সম্ভার হইতে প্রভূত পরিমাণে তৈরির পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের পূত আদর্শে অনুপ্রাণিত এইরূপ কর্মীদের সহযোগিতায় সার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ ল্যাবরেটরির তথা বেঙ্গল কেমিক্যালের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আদর্শ মানুষ—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল খ্যাতনামা অধ্যাপক ও কোবিদ ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বর্তমান কালের একজন আদর্শ মানুষ। তিনি ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করিয়া মাত্র মাসিক ৬০ টাকা বেতনে সিটি কলেজে অধ্যাপকরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা আজ পশ্চিমবঙ্গে মাসিক সাড়ে ৫ হাজার টাকা বেতনের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। তিনি প্রাচীন আদর্শের ঋষির মত সারাজীবন অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল জীবনযাপন করিয়াছেন। নিজেকে সর্বদা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন এবং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল অর্থ শিক্ষা প্রচারে দান করিয়াছেন। বর্তমানেও তিনি নিজের জন্য মাসিক মাত্র ৫শত টাকা লইয়া অবশিষ্ট মাসিক ৫হাজার টাকা জনহিতে দান করিতেছেন। তাঁহার জীবনধারণ-প্রথা আজও পূর্বের মতই সহজ, সরল ও সাধারণ আছে। গান্ধীজি কংগ্রেস-সেবকদিগকে মাসিক ৫শত টাকার অধিক বেতন লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহা সকলকে শিক্ষা দিতেছেন। দেশের সকলের বিশেষতঃ তরুণের দলের নিকট আজ এই মহান আদর্শ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ শান্তিময় জীবন কামনা করি ও প্রার্থনা করি, বাংলা তথা ভারতে তাঁহার আদর্শ সর্বত্র অনুকৃত হউক।

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়—

গত ২৬শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার কংগ্রেস দলের নব-নির্বাচিত সদস্যগণ এক সভায় সমবেত হইয়া ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে দলের নেতা নির্বাচিত করিয়াছেন। বিধান সভার ২৩৭ জন সদস্যের মধ্যে ১৫১ জন কংগ্রেস দলের লোক—তাহার পর আরও ৫।৬ জন সদস্য কংগ্রেস দলে যোগদান করিয়াছেন—কাজেই ঐ দলই এখন বৃহত্তম—কাজেই ঐ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইবে। দল যাঁহাকে নেতা নির্বাচিত করিয়াছেন, তিনিও পশ্চিম বঙ্গে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত—তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মশক্তিই তাঁহাকে এই নেতৃত্ব দান করিয়াছে। সকলেরই বিশ্বাস, তাঁহার পরিচালনায় পশ্চিম বঙ্গের সর্ববিধ উন্নতি সম্ভব হইবে।

মনে প্রাণে বাঙ্গালী হও—

উত্তর প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থকে গত ২৪শে মার্চ কলিকাতায় বিরলা পার্কে অবাঙ্গালী কলিকাতা-বাসীরা এক প্রীতি সম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন—সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শ্রীপন্থ পশ্চিমবঙ্গবাসী অ-বাঙ্গালীদিগকে রাজ্যের উন্নতি সাধনে মনে প্রাণে বাঙ্গালী হইতে ও বাঙ্গালীদের সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আজ স্বাধীন দেশে আমাদিগকে প্রাদেশিকতা মুক্ত হইয়া কাজ করিতে হইবে—সমগ্র ভারতরাষ্ট্র আজ এক সূত্রে গ্রথিত—কাজেই আমরা আগে ভারতবাসী, পরে বাঙ্গালী। পশ্চিমবঙ্গে বহু অবাঙ্গালীর বাস—তাহাদের সহিত মিলিত না হইলে বাঙ্গালী জাতিরও উন্নতি সম্ভব হইবে না। শ্রীপন্থজী সকলকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া দেশের উপকারই করিয়াছেন।

শিল্পপতিদের প্রতি শ্রীনেহরু—

গত ২৯শে মার্চ দিল্লীতে ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতি সংগঠনও সংঘের রৌপ্য জুবিলী উৎসবের উদ্বোধন করিতে যাইয়া শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—দেশের সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণ যেন তাহাদের মান্ধাতার আমলের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া বর্তমান বিশ্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেন এবং জাতি গঠনের কাজে ঐক্যবদ্ধ হন। শিল্পপতিরা যেন তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যকলাপে ছত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থকেই সর্বোপরি স্থান দেন। শিল্পপতিরা অথবা সরকার যাহাই করুন না কেন, তাহার উপযোগিতা-

বিচারের একটিমাত্র মাপকাঠি আছে—তাহা হইল—উহা দ্বারা জনসাধারণের কতটুকু কল্যাণ হইতেছে এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কতটুকু সাহায্য হইতেছে তাহাই বিচার করিয়া দেখা।—জহরলালের কথাগুলি কি শিল্পপতিরা মনে প্রাণে গ্রহণ করিবেন? তাহা করিলে দেশ অবশ্যই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন—

কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল আইন অনুসারে সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য নির্বাচন হইয়া গিয়াছে—নূতন আইনে সমগ্র সহর ৭৫ ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগ হইতে একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত করা হইল। ৭৫টির মধ্যে ৪৫টি স্থানে কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন—কংগ্রেস-বিরোধীদল ১৯টি ও স্বতন্ত্র দল ১১টি আসন লাভ করিয়াছেন। কংগ্রেস যে দেশবাসীর মনে এখন তাহার প্রভাব রক্ষা করিতে সমর্থ—তাহা বিধান-সভার নির্বাচনে ও কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রমাণ হইয়াছে।

বাঁধ নির্মাণে সাড়ে ৫ কোটি টাকা—

কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে ময়ূরাক্ষী সেচ ব্যবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাড়ে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হইবে—ঐ অর্থ সম্পূর্ণভাবে মেসাঞ্জোর বাঁধ নির্মাণে ব্যয়িত হইবে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই বাঁধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে। কোপাই ও বক্রেশ্বর বাঁধের নির্মাণ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে—দ্বারকায় একটি নূতন বাঁধের কাজেও হাত দেওয়া হইয়াছে। বরাকর বাঁধের সাহায্যে এই বৎসরেই ৮ হাজার একর জমীতে সেচের ব্যবস্থা হইবে। বিনপাড়া বাঁধের দ্বারা গত বৎসর প্রায় এক লক্ষ একর জমীতে জল-সেচ করা হইয়াছিল। ঐ বাঁধের বিস্তৃতির ফলে এবার আরও ৩০ হাজার একর জমীতে চাষের ব্যবস্থা করা যাইবে।

পেপসু রাজ্যের নূতন মন্ত্রিসভা—

পাতিয়ালা লইয়া যে নূতন পেপসু প্রদেশ বা রাজ্য গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস দলীয় মন্ত্রিসভা পতনের ফলে যুক্ত বিরোধী দল ৪জন সদস্য লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন—(১) সর্দার জ্ঞানসিং রারেওয়ালা প্রধান মন্ত্রী (২) সর্দার চুপিন্দর সিং খান (৩) চৌধুরী রাম সিং, ও (৪) চৌধুরী আতার সিং। আর ২।৩জন ডেপুটী মন্ত্রীও গ্রহণ করা হইবে।

রাজভবনে সুভাষচন্দ্রের চিত্র—

সকলেই জানেন, কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট হাউসের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাজভবন নাম দেওয়া হইয়াছে। গত ২৪শে মার্চ শ্রীজহরলাল নেহরু রাজভবনের সিংহাসন কক্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—উহা কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর উদ্যোগে

রাজভবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তৈলচিত্র

ফটো—পান্না সেন

প্রস্তুত হইয়াছে—শ্রীঅতুল বসু উহা অঙ্কন করিয়াছেন—ছবিটি ৮ ফিট দীর্ঘ ও ৫ ফিট প্রস্থ—পূর্ণাবয়ব চিত্র। শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব ঐ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, মুখ্য মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি এই সম্মানে বাঙ্গালীমাত্রই আনন্দিত হইবেন। এখনও দেশবাসী সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাগমনের পথ চাহিয়া আছে—তাহা কি সত্যে পরিণত হইবে?

রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার—

পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ১৯৫১-৫২ সালের জন্য ৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি করিয়া রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) সংবাদ পত্রে সেকালের কথা,বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস ও সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (২) ভারতীয় বনৌষধির যুক্তলেখক ডাঃ কালীপদ বিশ্বাস ও
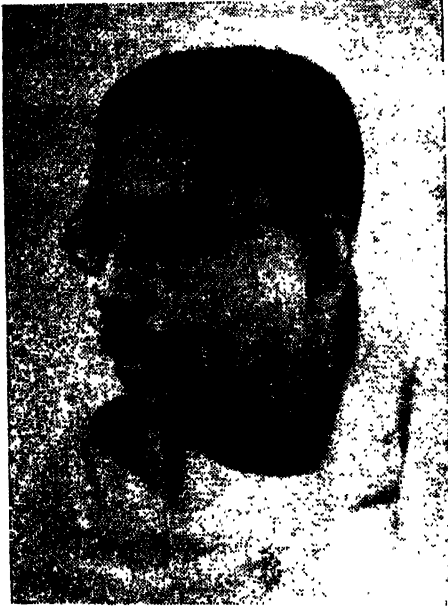
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীএককড়ি ঘোষ। ব্রজেন্দ্রবাবু সারাজীবন সাহিত্য-সাধনা করিয়া এই পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন এবং ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সুধী-সমাজে সুপরিচিত। আমরা শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস ও শ্রীএককড়ি ঘোষকে তাঁহাদের এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য সানন্দ অভিনন্দন জানাইতেছি।

ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—

খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত, সম্প্রতি মস্কো-প্রত্যাগত রাষ্ট্রদূত—ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বিনা বাধায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। কেহই

কর্মক্ষেত্রে আহ্বান—

গত ২৪শে মার্চ শ্রীজহরলাল নেহরু কলিকাতায় কংগ্রেসকর্মীদের এক সম্মিলনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ সম্মিলনে রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভার কংগ্রেসী সদস্যগণ, পশ্চিম বঙ্গ হইতে নির্বাচিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ ও রাজ্য কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। রুদ্ধ-দ্বারকক্ষে ঐ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনেহরু বলেন—"কংগ্রেসসেবীদের কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাঁহারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উন্মুখ এবং চাকরী ও সুযোগ-সন্ধানী লোক নহেন। জনগণের নিকট আমরা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহা পালন করিবার জন্যই আমরা নির্বাচিত হইয়াছি। আমাদের কাজের দ্বারাই আমাদের বিচার হইবে। আমাদের কথায় নহে। আমাদের কাজের দ্বারা আমাদের সততা ও উপযুক্ততার পরিচয় হইবে।" তিনি বিধান সভার প্রত্যেক কংগ্রেসী সদস্যকে নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রে গণ-সংযোগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহা দ্বারাই দেশে কংগ্রেসের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে।

তারকেশ্বর—

তারকেশ্বরের মোহান্ত দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম পদত্যাগ করায় গত ৪ঠা এপ্রিল তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃষীকেশ আশ্রমকে নূতন মোহান্ত পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। অধিকাংশ লোক মনে করেন—এই তরুণ ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও মোহান্ত পদের অনুপযুক্ত। তারকেশ্বরের মোহান্ত পদে একজন সুপণ্ডিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীর নিয়োগ প্রয়োজন ছিল। এত অল্পবয়স্ক কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান সঙ্গত হয় নাই। শুনা যায়, অভিষেক উৎসবে তারকেশ্বরের কোন প্রজা বা অধিবাসী যোগদান করেন নাই। এ সকল বিষয়ে জেলা জজের বিবৃতি প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক স্মৃতিসভা—

খ্যাতনামা উকীল ও দেশসেবক স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও তাঁহার পত্নী স্বর্গতা স্বর্ণপ্রভা মল্লিক তাঁহাদের

কেন্দ্র, প্রসূতি-ভবন, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—গত ১১ই এপ্রিল সিঙ্গুরের অধিবাসীরা এক সভায় সমবেত হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রাম-প্রীতি সকলের অনুকরণীয়। বৈদ্যবাটী হইতে তারকেশ্বরে নূতন পথ নির্মিত হওয়ায় এখন সিঙ্গুর ক্রমে সহরে পরিণত হইবে। কিন্তু তাহার মূলে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নীর দানের কথা চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যাঁহারা গ্রামের এই উপকারী বন্ধুটির কথা স্মরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলের ধন্যবাদ পাত্র।

বৈষ্ণব সম্মেলন—

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পার্ষদ দ্বাদশগোপালের অন্যতম কমলাকর পিপলাই ঠাকুরের বার্ষিক স্মরণ উৎসব উপলক্ষে গত ২৯শে চৈত্র হুগলী জেলার মাহেশ গ্রামে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সম্মিলন হইয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ সভাপতিত্ব করেন, শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী সভার উদ্বোধন করেন, অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী প্রধান অতিথি হন। আসামের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডাঃ এস-সি-রায় (বর্তমান নাম হরিদাস নামানন্দ) প্রভৃতি বহু সুধী বক্তৃতা করেন। বিশ্বের বর্তমান সঙ্কটমোচনে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেই তথায় বিবৃত করেন।

কোন্নগরে রামায়ণ আলোচনা—

হুগলী জেলার কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নূতন প্রধান শিক্ষক শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল সকালে স্কুল গৃহে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দ্বারা রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ ও তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। এ যুগে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের প্রচলন কমিয়া গিয়াছে। অথচ ভারতীয় ভাবধারায় মানুষ তৈয়ার করিবার জন্য উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ের পাঠ ও আলোচনা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। মণীন্দ্রবাবু এই আলোচনার আরম্ভ করিয়া দেশের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। সুকুমারমতি বালকগণের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ সকলেরই ভাল লাগিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, সর্ব্বত্র ইহা অনুসৃত হইলে দেশের আবহাওয়া পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিবে।

দিল্লীতে বাঙ্গালী বালিকার কৃতিত্ব—

দিল্লীবাসী খ্যাতনামা কবি ও লেখক শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রচারে অগ্রণী শ্রীমতী কমলা দাশের ৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা কুমারী অনুরাধা কথক-নৃত্যে বিস্ময়কর পারদর্শিতা দেখাইয়া দিল্লীর আন্তঃপ্রাদেশিক

কুমারী অনুরাধা দাশ

মহলে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। কথক-নৃত্য বহু শিক্ষা ও শ্রম সাপেক্ষ—বাঙ্গালীর মধ্যে তাহার অধিক প্রচলনও নাই। আমরা অনুরাধার দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

পশ্চিম বাংলার খাদ্য সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে উক্ত নামে একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। ঐ পুস্তিকায় আমাদের খাদ্য সমস্যার প্রধান বিষয়গুলি বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া দেখার চেষ্টা হইয়াছে। সাধারণ লোক ঐ পুস্তিকা পাঠ করিলে খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা স্পষ্ট হইবে ও তাহার ফলে সমস্যা সমাধানের পথনির্ণয় সহজ হইবে।

রকারী চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর পক্ষ হইতেও যদি এ বিষয়ে ব্যাপক চেষ্টা না হয়, তবে খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না। দেশবাসী সমবায় প্রথায় ছোট ছোট উদ্যোগ দ্বারা সে কাজ আরম্ভ করিলে তবেই সুফল দেখা যাইবে। আমরা সেজন্য সকলকে এই পুস্তিকা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কবি রামনিধি গুপ্তের স্মৃতি-পূজা—

বাংলার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নবধারার প্রবর্ত্তক রামনিধি গুপ্ত তথা নিধুবাবু ২শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। গত ৩১শে চৈত্র সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীকালীপদ পাঠক ও উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীহরিপদ ঘোষালের চেষ্টায় উলুবেড়িয়া (হাওড়া) কলেজে তাঁহার স্মৃতিপূজা হইয়াছিল। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উৎসবের উদ্বোধন করেন ও কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় সভায় পৌরোহিত্য করেন। কালিদাসবাবু নিধুবাবুর গান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং কালীপদবাবু নিধুবাবুর কয়েকটী গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

পরলোকে ক্রিপ্‌স—

খ্যাতনামা ইংরাজ রাজনীতিক সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ২১শে এপ্রিল ৬৩ বৎসর বয়সে জুরিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে 'চ্যান্সেলার অব দি একস্‌চেকার' ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ রাজনীতিক বুদ্ধির জন্য তিনি সর্বত্র সমাদৃত হইতেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভে তাঁহার দৌত্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সুর-ভারতী কর্তৃক উপাধি দান—

গত ৩০শে মার্চ্চ ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানীয় সুর ভারতী কর্তৃক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাহাতে ভাটপাড়া (২৪পরগণা) পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কাব্যবিনোদ, প্রধান অতিথি শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে সাহিত্যশাস্ত্রী ও বিশিষ্ট অতিথি শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গীত-বিশারদ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে শ্রীগোপী ভট্টাচার্য্য রচিত 'প্রকৃতির পরিশোধ' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। স্থানীয় যুবকগণের চেষ্টায় 'সুর ভারতী' ঐ

শ্রীঅখিল নিয়োগী—

খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক, যুগান্তরের ছোটদের পাততাড়ির পরিচালক শ্রীঅখিল নিয়োগী ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিশু ও কিশোর প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য গত ১৪ই এপ্রিল ইটালী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এক মাস পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার লব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশবাসী উপকৃত হইবে—ইহাই সকলে কামনা ও আশা করেন।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন—

উত্তর কলিকাতার দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডার নামক সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান গত ৩০ বৎসর কাল ঐ অঞ্চলে কাজ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গত ৩রা বৈশাখ কলিকাতা ১০৫।২ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দ্বিতল গৃহে উহার যক্ষ্মা হাসপাতালের উদ্বোধন হইয়াছে। শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রণামী হইতে ৭০ হাজার টাকা দান করায় হাসপাতালের নাম হইয়াছে—শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন। সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০ শয্যাযুক্ত যক্ষ্মা হাসপাতাল হইবে। ভাণ্ডারের অধীনে উত্তর কলিকাতায় ২টি এলোপাথিক ও ২টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় চলিতেছে। ১৯৪১ সাল হইতে 'কিরণশশী সেবায়তন' নামে একটি যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্রও চলিতেছে। সম্প্রতি কাঁকুড়গাছিতে ভাণ্ডারের একটি প্রসূতি সদনেরও ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। ভাণ্ডারের সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ও সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্তের অক্লান্ত চেষ্টায় ভাণ্ডারের বহুমুখী সেবা-প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করিতেছে।

ভারতচন্দ্র স্মৃতি উৎসব—

গত ৯ই মার্চ রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি ও ভারতচন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে হাওড়া জেলার হরিশপুরে কবির স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী পেঁড়ো গ্রামে কবির জন্মস্থান অবস্থিত। খ্যাতনামা কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় সভায় পৌরোহিত্য করেন ও সুকবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এম-এল-এ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় অধিবাসী,

উদ্যোগে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সংহতি-সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উৎসবে সমবেত হইয়া কবির জন্মস্থান দর্শন ও সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কবির জন্মস্থানে একটি স্মৃতি মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছিল।

মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৯শে—৩০শে মার্চ মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে বিদ্যাসাগর ভবনে উনচত্বারিংশ সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহোদয়, সভাপতিত্ব করেন কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। অভিভাষণে কবিশেখর তাঁহার দীর্ঘ দিনের সাহিত্যসেবার অভিজ্ঞতা হইতে বলেন—রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সত্ত্বেও দেশে বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অনাদর বাড়িতেছে। কবিশেখর ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্যের প্রমাণ-কল্পে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেন।

পরলোকে স্বামী যোগানন্দ—

গত ৭ই মার্চ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের লস্ এঞ্জেলস্ সহরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনের সম্বর্দ্ধনা সভায় বক্তৃতা করিয়াই তথায় তখনই খ্যাতনামা সন্ন্যাসী স্বামী যোগানন্দ পরলোকগমন করিয়াছেন। যোগানন্দ যোগদা মঠের প্রতিষ্ঠাতা। বি-এ পাশ করিয়া তিনি ১৯২০ সালে আমেরিকায় যান ও বোষ্টন সহরে যোগদা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ সালে লস্ এঞ্জেলস্ সহরে তিনি যোগদার প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ্ শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের ভ্রাতা এবং দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকিয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করিতেছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি আমেরিকায় গান্ধী স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—তিনি মাসিক পত্র ও পুস্তক প্রকাশ করিয়া সমগ্র আমেরিকায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিতেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও তিনি যোগদা মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম ভবনে জাতীয় মিউজিয়াম—

পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নৈহাটী কাঁঠালপাড়াস্থিত পৈতৃক বাসভবন সংস্কার করিয়া উহাকে জাতীয় মিউজিয়ামরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। গত ৩রা এপ্রিল পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রিসভার অধিবেশনে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি, তাঁহার ব্যবহৃত গ্রন্থ ও অন্যান্য জিনিষ ঐ মিউজিয়ামে রক্ষা করা হইবে। শীঘ্রই সরকার ঐ গৃহের দখল লইবেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা জাতি নিজের সম্মানই বর্দ্ধিত করিলেন।

মহাজাতি সদন নির্মাণ—

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা সহরে একটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার অন্তর্ধানের পর হইতে ঐ কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। ১৯৪৯ সালে বিশেষ আইন করিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার উহার নির্মাণ কার্য্য গ্রহণ করেন। বর্তমান বৎসরে (১৯৫২-৫৩) ঐ কার্য্যের জন্য ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ও শীঘ্রই ঐ গৃহের দ্বিতল নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইবে। কলিকাতার মধ্যস্থলে ঐ গৃহ নির্মিত হইলে জাতির সম্পদ বর্দ্ধিত হইবে—সংস্কৃতি প্রচারের পথও সুগম হইবে।

পূর্ব কলিকাতার উন্নতি বিধান—

কলিকাতা পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বেলিয়াঘাটা, মাণিকতলা, উল্টাডাঙ্গা ও শিয়ালদহের পূর্ব দিকে ধাপা পর্য্যন্ত এলাকার উন্নতি বিধান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১১ মাইল দীর্ঘ একটি পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত হইতেছে—ধাপার নিকট ঐ প্রণালীর পরিধি ১৪ ফিট হইবে—সকল স্থানেই উহা ৫ ফিটের অধিক। ঐ অঞ্চলে ১২০ ফিট চওড়া রাস্তা হইয়াছে—চিত্তরঞ্জন এভেনিউ ১০০ ফিট ও সাদার্ণ এভেনিউ ১৫০ ফিট চওড়া। তাহা ছাড়া বহু অপেক্ষাকৃত ছোট পথ ও নির্মিত হইতেছে। গ্রে ষ্ট্রীট হইতে সার্কুলার রোডের পর পূর্ব দিকে ওয়েষ্ট ক্যানেল রোড পর্য্যন্ত একটি নূতন পথও তাহার নীচে পয়ঃপ্রণালী হইবে—ঐ অঞ্চলে একটি নূতন লেক খনন করা হইয়াছে—তাহা ৩০ ফিট গভীর—তাহার এলাকা সিকি বর্গ মাইল। সার্কুলার রোডের পূর্ব দিকে খাল পর্য্যন্ত এলাকা এই ভাবে উন্নত করা হইলে

সহরের ভিড় স্বভাবতই কমিয়া যাইবে—ইহার পরে মাণিকতলা ও কাশীপুর এলাকার উন্নতির জন্য ২টি পৃথক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে। সহরের উন্নতি বিধান যে প্রয়োজন,সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর কলিকাতা—অর্থাৎ সহরের ৪দিকে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানের উন্নতি বিধানও প্রয়োজন।

ভারত সভার ৭৫ বৎসর—

কলিকাতাস্থ ভারতসভা (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন) নামক প্রতিষ্ঠান ১৮৭৬ সালে ২৬শে জুলাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৫১ সালে তাহার বয়স ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে আগামী ২৬শে জুলাই হইতে এক সপ্তাহকাল ইহার জুবিলী উৎসব করা হইবে স্থির হইয়াছে। ভারতসভার ৭৫ বৎসরের ইতিহাস বাঙ্গালী জাতির সকল ক্ষেত্রে উন্নতির ইতিহাস—আজ বাঙ্গালী সে কথা স্মরণ করিলে তাহার পূর্ব-গৌরবের পটভূমিকায় সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সমর্থ হইবে। বাঙ্গালীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা আজ সকলকে জানানো প্রয়োজন হইয়াছে। সে কার্য্যে সাফল্য লাভই যেন এই জুবিলী উৎসবের প্রধান অঙ্গ হয়—ইহাই আমরা কামনা করি।

কলিকাতায় নূতন ব্যাঙ্ক—

কলিকাতায় ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন লিমিটেড ও ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের সম্মিলনে গত ২৫শে মার্চ মেট্রপলিটন ব্যাঙ্ক লিমিটেড নাম দিয়া একটি নূতন ব্যাঙ্কের উদ্বোধন উৎসব পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৭নং চৌরঙ্গী রোডে মেট্রপলিটন হাউসে ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে। বাংলা দেশে ইহা নূতন দ্বিতীয় সম্মিলিত ব্যাঙ্ক—খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ধন্যবাদদানকালে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আজ সকলের কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। ব্যবসায় উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা গ্রাম হইতে উদ্ভূত বা গ্রাম-প্রসারী না হইলে আজ অর্থনীতির দিক দিয়া দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না—ইহাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিমত।

রাষ্ট্রসভায় সদস্য নির্বাচন—

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় ২৩৭ জন সদস্য গত ২৭শে মার্চ দিল্লীর রাষ্ট্রসভার (কাউন্সিল অফ ষ্টেট) ১৪ জন সদস্য নির্বাচন করিয়াছেন—তন্মধ্যে কংগ্রেস ৯, কমুনিষ্ট ২, কিষাণ মজদুর দল ১, ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কিষ্ট ১, ও জনসঙ্ঘ দলের ১ জন আছেন। শ্রীবেণীপ্রসাদ আগরওয়াল, শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীমায়া দেবী ছত্রিনী, ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীরাজপৎ সিং দুগার, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, সৈয়দ নৌশর আলি ও শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় কংগ্রেস দলের। শ্রীভূপেশচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার কম্যুনিষ্ট, শ্রীবিমলকুমার ঘোষ কৃ-প্র-ম-দল, শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কিষ্ট ও শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ জনসঙ্ঘ দলভুক্ত হইয়া নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচন—

গত ৩১শে মার্চ পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার নব নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে নিম্নলিখিত ১৭জন বিধান পরিষদের (রাজ্যের উচ্চতর সভা) সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে কংগ্রেস দল হইতে ১২জন—(১) শ্রীবিজয় সিং নাহার (২) শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ রায় (৩) শ্রীসুরেন্দ্রকুমার রায় (৪) শ্রীলছমন প্রধান (৫) শ্রীকামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় (৬) ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বাগচি (৭) শ্রীশিবপ্রসাদ কুমার (৮) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৯) শ্রীকমলাচরণ মুখোপাধ্যায় (১০) শ্রীসুবোধকুমার বসু (১১) শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ও (১২) জনাব মহম্মদ রসিদ—কি-ম-প্র দলের (১৩) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, হিন্দু মহাসভার (১৪) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ফরোয়ার্ড ব্লকের (মাঃ) (১৫) শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কমিউনিষ্ট দলের (১৬) শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও (১৭) জনাব আবদুল হাকিম নির্বাচিত হইয়াছেন।

গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মাণ—

গত ৩১শে মার্চ কলিকাতায় সরকারী দপ্তরখানায় গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মাণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে—পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অভিমত এই যে গঙ্গার উপর একটি সেতু নির্মাণই যথেষ্ট নহে—বাঁধ নির্মাণই প্রয়োজন। বাঁধ

পরিকল্পনার দ্বারা জলপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইবে এবং পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের সহিত ব্রিজ-সেচ রেলের দ্বারা অপরাংশের সংযোগ সাধনের ব্যবস্থাও করা চলিবে। উহার দ্বারা মৃতপ্রায় নদীসমূহের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হইবে। উহার দ্বারা বিস্তৃত অঞ্চলে জল সেচনের ব্যবস্থা করা হইবে, কলিকাতা বন্দর ও সহর রক্ষা পাইবে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সত্বর এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র

নূতন মেয়র—

গত ১লা মে কলিকাতা কর্পোরেশনের নব-নির্বাচিত কাউন্সিলার ও অলডারম্যানদিগের প্রথম সভায় শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র মেয়র ও শ্রীনরেশ-নাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্মলবাবু কলিকাতায় খ্যাতনামা এটর্ণী, প্রবীণ কংগ্রেস সেবক ও সামাজিক লোক হিসাবে সর্বজনপরিচিত। তাঁহার নির্বাচনে সকলেই আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন লাভ করিয়া কলিকাতার উন্নতি বিধান করুন, আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। নরেশবাবুও বহুদিন কর্পোরেশনের সেবা দ্বারা যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন।

পরলোকে নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—
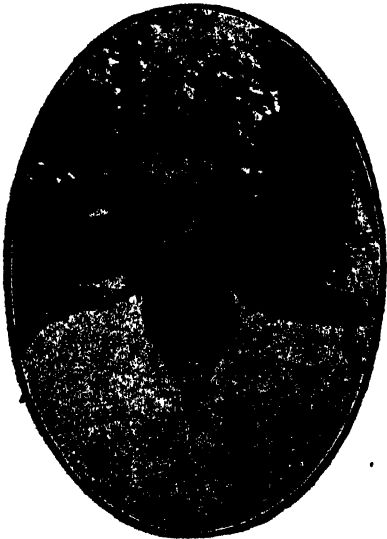
গত ১লা বৈশাখ খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৬৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের লেখক ছিলেন। নদীয়া জেলার বাহিরগাছি ভট্টাচার্য্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ৩০ বৎসরেরও অধিককাল কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৯ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্যালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার রচিত 'বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি' গ্রন্থ জনসমাজে আদৃত হইয়াছে। তিনি ১৯৩৫ সালে কলিকাতা সাহিত্য' সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ব্যাকরণ অধ্যাপকের সম্মান—

হাওড়া জেলার নারিট নিবাসী পণ্ডিত শ্রীশিবশঙ্কর শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য পাণিনি ব্যাকরণের অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সর্বজনপরিচিত। নবদ্বীপের বঙ্গবিবুধজননী সভা গত ২৪শে মার্চ তাঁহাকে নবদ্বীপস্থ সরকারী সংস্কৃত কলেজ ভবনে এক সভায় 'বাচস্পতি' উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

রেলপথ পুনর্ব্বিন্যাস—

ভারতের রেলপথ পুনর্ব্বিন্যাসের উল্লেখ আমরা গতবার করিয়াছি। ভারতে রেলপথগুলি যদৃচ্ছাক্রমে নির্ম্মিত হয় এবং তাহাদিগের কেন্দ্রসমূহ স্থাপনও সাময়িক সুবিধা অনুসারে হইয়াছিল। সুতরাং পুনর্ব্বিন্যাস অবাঞ্ছনীয় নহে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে এ বিষয় আলোচিত হইতেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পুনর্ব্বিন্যাসের ফলে ইংলণ্ডে রেলপথগুলি নিযুক্ত লোকসংখ্যা ও বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস না করিয়া—প্রচার, সংযোগ প্রভৃতির দ্বারা—ক্ষতি এড়াইয়াছিল ; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অকারণ ব্যয়ও বর্জ্জন করিয়াছিল। দেশবিভাগের পরে, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে, রেল সম্বন্ধে পরিবর্ত্তনের আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ জন্য এক কমিটী গঠিত হইয়াছিল। তাহা কুঞ্জরু কমিটী নামে অভিহিত। এই কমিটী আড়াই বৎসর কাল বিচার বিবেচনা, অভিজ্ঞদিগের সহিত আলোচনা প্রভৃতির ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তদনুসারে প্রায় ৩ মাস পূর্ব্বে ৬টি কেন্দ্রের অবশিষ্ট ৩টি সম্বন্ধে (উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব) সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় প্রত্যেকটির অধীনে মাইল এইরূপ হইবে—

উত্তর রেলওয়ে—	৫,২৫৯ মাইল
উত্তর-পূর্ব্ব " —	৫,৫৫৭ "
পূর্ব্ব " —	৫,৬০৫ "

উত্তর রেলওয়ের কেন্দ্র দিল্লীতে এবং অবশিষ্ট ২টির কেন্দ্র কলিকাতায় হইবে।

পূর্ব্বে ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য মধ্য ও পশ্চিম রেলের কেন্দ্র বোম্বাই সহরে স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতায় ২টি কেন্দ্র স্থাপনে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু গত ৬ই মার্চ্চ রেলের কেন্দ্রী পরামর্শ পরিষদের অধিবেশনে স্থির হয়, উত্তর-পূর্ব্ব রেলের কেন্দ্র গোরক্ষপুরে স্থাপিত হইবে এবং শিয়ালদহ রেল গোরক্ষপুর হইতেই পরিচালিত হইবে।

ইহার পরে যখন এই ব্যবস্থায় আপত্তি উত্থাপিত হয়, তখন ভারত সরকারের রেলমন্ত্রী বলেন, এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া করা হইয়াছে—তিনি কেবল কলিকাতায় কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা রাখিতে বলিয়াছেন!

দিল্লীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, নির্ব্বাচনের সময় যুক্ত-প্রদেশের প্রধান-সচিব ঘোষণা করিয়াছিলেন, গোরক্ষপুরে একটি রেলকেন্দ্র স্থাপিত হইবে অর্থাৎ যুক্ত-প্রদেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত ও বেকার-সমস্যার উপশম হইবে। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে—এ বিষয়ে পূর্ব্বেই ভারত সরকারের সহিত যুক্ত-প্রদেশের সরকারের একটা ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সেই ব্যবস্থা বহাল করিবার জন্য কুঞ্জরু কমিটীর সিদ্ধান্ত বর্জ্জন ও পশ্চিমবঙ্গের অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব কলিকাতার কেন্দ্র-ত্যাগে সম্মতি দিয়াছিলেন।

এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ প্রবল হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার জন্য একটি সপ্তম কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এই অবিচার সম্বন্ধে লোকের চক্ষুতে ধূলি-নিক্ষেপরূপে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মুখপত্রে বলা হইয়াছে—"কলিকাতায় রেল চলাচল যোগাযোগ ব্যবস্থার মহাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব।" এই "মহাকেন্দ্রের" স্বরূপ—কলিকাতায় এক জনপ্রতিনিধি থাকিবেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব কি এই সর্ত্তেই গোরক্ষপুরে কেন্দ্র স্থাপনে প্রথমে সম্মতি দিয়াছিলেন?

এদিকে পূর্ব্ব ভারত রেলপথ বিভাগ সম্বন্ধেও কুঞ্জরু কমিটীর নির্দ্ধারণ বর্জ্জিত হইয়াছে।

কলিকাতায় বহুদিনে—বহু অর্থ ব্যয়ে যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে সে সকলের উপযোগিতা অস্বীকার করিয়া এবং কলিকাতার ব্যবসায়ীদিগের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া যে কাজ করা হইতেছে, তাহাতে রেলের যে কোন উন্নতি বা উপকার হইবে, এমন কুঞ্জরু কমিটীর রিপোর্ট পাঠ করিলে মনে করা যায় না। তবে—৬।৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া, যে সময় দেশে দুর্ভিক্ষ সেই সময়ে, গোরক্ষপুরে নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া যুক্ত-প্রদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ করা যে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিলম্বে হইলেও, লোকমতের প্রভাবে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা যে ভাবে অবজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা মত প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি করিবেন, তাহা জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।

ভারত সরকারের ব্যবস্থায় যে তাঁহাদিগের নিযুক্ত কুঞ্জরু কমিটীরও অপমান হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতে রেল পথ বিস্তারের প্রয়োজন আছে; কারণ, দেখা যায়—আমেরিকায় রেল পথের প্রতি মাইলে জন-সংখ্যা ৪৫০ ও প্রতি শত বর্গ-মাইলে প্রায় সাড়ে ৮ মাইল রেলপথ। আর ভারতে প্রতি মাইলে লোক সংখ্যা ৭,৮০০ হইলেও প্রতি বর্গ মাইলে রেলপথ মাত্র ২ মাইলের কিছু অধিক। সুতরাং গোরক্ষপুরে নূতন কেন্দ্র স্থাপন জন্য ৬।৭ কোটি টাকা ব্যয় না করিয়া রেলপথ বিস্তারে ও বর্ত্তমান রেল ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে ঐ অর্থ ব্যয় করিলে দেশের প্রকৃত উপকার হইত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা কেন্দ্রের বর্জ্জনে তাঁহাদিগের আপত্তি জানাইয়া পূর্ব্বদত্ত সম্মতি ভ্রান্তি-প্রণোদিত বলিয়া স্বীকার করিবেন কি?

মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ—

মাদ্রাজের রাষ্ট্রপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ দুর্ভিক্ষপীড়িত রায়ালাসীমা পরিদর্শন করিয়া আসিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে—দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গের লোক শিহরিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই।

রাষ্ট্রপালের মন্তব্যে একটি কথায় আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। সরকার এ পর্য্যন্ত লোককে মণ্ড অর্থাৎ তরল খাদ্য দিবার জন্য ৫ শত ৫০টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। লোককে যে খাদ্য দেওয়া হইতেছে, তাহাতে সরকারের ৩ পয়সা হিসাবে ব্যয় হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা এক আনা হইবে!

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতে লোকের খাদ্যের পরিমাণ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষা হইয়াছিল। ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিহারে দুর্ভিক্ষ হয়, তখন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, গড়ে আধ সের শস্য হইলে লোকের চলিতে পারে। সার রিচার্ড টেম্পল কিন্তু ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের নিকট হইতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কাজের ভার গ্রহণ করিয়া স্থির করেন—গড়ে প্রত্যেকের ৩ পোয়া খাদ্য-শস্য প্রয়োজন। তিনি বলেন, বাঙ্গালা দেশে কয়েদীদিগের গড় খাদ্য—এক সের। মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের সময় সরকার দিবার ব্যবস্থা করেন—

পুরুষের জন্য—২ আনা বা ৩ পোয়া শস্য ও এক পয়সা

স্ত্রীলোকের জন্য—এক আনা ৪ পাই বা আধ সের খাদ্য শস্য ও ২ পাই।

সে সময় অধিকাংশ জিলায় ২ আনায় প্রায় এক সের চাউল পাওয়া যাইত। কিন্তু আজ যে অবস্থা তাহাতে ৩ পয়সায় কতটুকু চাউল পাওয়া যায়?

গত দুর্ভিক্ষের সময় বাঙ্গালায় সহিদ সুরাবর্দ্দী যে মণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে যে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই অভিজ্ঞতার পরে মাদ্রাজ সরকার যে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের আহার্য্যের জন্য দৈনিক মাত্র ৩ পয়সা ব্যয় করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়—তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ-যাত্রীই করা হইবে।

আধ সের খাদ্য না দিয়া ৩ পোয়া দিতেই বলিয়াছিলেন—কিছু অধিক দেওয়া ও ভাল, কিন্তু আবশ্যক অপেক্ষা অল্প দেওয়া সঙ্গত নহে—

"It was better to err on the safe side, and give the people a fraction more than was absolutely essential rather than a fraction less."

আমরা মাদ্রাজ সরকারকে ডিগ্‌বীর পুস্তকে দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্যদান-ব্যবস্থার বিষয় যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতে বলি।

নির্ব্বাচনের জের—

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ঘোষণা করেন—অসাধারণ অবস্থা ব্যতীত সাধারণ (ব্যবস্থা পরিষদে) নির্ব্বাচনে পরাভূত কোন প্রার্থীকে কেন্দ্রী বা প্রাদেশিক বিধান পরিষদে নির্ব্বাচনের জন্য কংগ্রেস মনোনয়ন দিবেন না।

বোম্বাইএর মোরারজী দেশাই সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন, সে ব্যবস্থা অস্থায়ী—পরে মোরারজী দেশাইকে উপনির্ব্বাচনে জয়ী হইয়া ব্যবস্থা পরিষদেই প্রবেশ করিতে হইবে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচনে পরাভূত সচিবরা কেহ কেহ বিধান পরিষদে নির্ব্বাচনের জন্য মনোনয়ন পাইবেন, এই কথা শুনিয়া গত ৩১শে মার্চ্চ 'ষ্টেটস্‌ম্যান' জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তবে ঘোষণার মূল্য কি? বিধান সভায় নির্ব্বাচন যদি জনপ্রিয়তার কষ্টিপাথর হয়, তবে যাঁহারা—যত যোগ্য ব্যক্তিই কেন হউন না—জনপ্রিয় বলিয়া—গণতন্ত্রের ব্যবস্থায় দাবী করিতে পারেন না এবং সেই জন্যই গণপ্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহারা মনোনয়ন পাইবেন না, ৩রা ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার তাহাই বক্তব্য। পশ্চিম-বঙ্গের ১৩ জন সচিবের মধ্যে এক জন নির্ব্বাচন প্রার্থী হ'ন নাই; অবশিষ্ট ১২ জনের মধ্যে ৭জন পরাভূত হ'ন—

খাদ্য ও কৃষি সচিব প্রফুল্লচন্দ্র সেন, বাবসায় সচিব নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, সেচ সচিব ভূপতি মজুমদার, শিক্ষা সচিব রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজস্ব সচিব কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, স্বরাষ্ট্র সচিব কালীপদ মুখোপাধ্যায়, সরবরাহ সচিব নিকুঞ্জবিহারী মাইতী। দেখা যাইতেছে, ইঁহাদিগের মধ্যে ২ জনকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটী বিধান পরিষদে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে মনোনীত করিয়াছে—

প্রফুল্লচন্দ্র সেন (হুগলী-হাওড়া)

কালীপদ মুখোপাধ্যায় (২৪ পরগণা)। অবশিষ্ট ৫ জন মনোনয়ন চাহেন নাই, কি চাহিয়া পান নাই, তাহা জানা যায় নাই। তবে দেখা গিয়াছে, মনোনীতের তালিকায় সচিবাতিরিক্ত কয়জন পরাভূত প্রার্থীও আছেন। সে অবস্থা—"you swallow a camel and strain at a gnat!"

যাঁহারা বহু ভোটে পরাভূত হইয়াও নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়াছেন এবং যাঁহাদিগকে উপ-নির্ব্বাচনের সুযোগ দিবার জন্য দলের কোন জয়ী সদস্য পদত্যাগ করিতে সম্মত হ'ন নাই, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগের যোগ্যতায়ও আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিতে [illegible] যাকি না? [illegible]—

(১) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত মানিয়া কাজ করিতে বাধ্য কি না ?

(২) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর মনোনয়নে কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অবজ্ঞা করা হইয়াছে কি না ?

(৩) যদি কার্য্যকরী সমিতির নির্দ্ধারণ প্রদেশ সমিতি অবজ্ঞা করেন, তবে কার্য্যকরী সমিতি প্রদেশ সমিতি বাতিল করিতে পারেন কি না ?

আমরা এই ব্যাপার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু নিয়মানুগ ব্যবস্থা কি তাহা আজ অনেকের মত আমরাও জিজ্ঞাসা করিতেছি। কংগ্রেসের শৃঙ্খলার স্বরূপ কি, তাহাই জানিবার বিষয়।

গঙ্গায় সেতু ও বিহার—

গঙ্গার জল বর্ষার সময় স্বল্পকালের জন্য যে পথে প্রবাহিত হয়, সে পথ অন্য সময় শুষ্ক থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; ফলে মুর্শিদাবাদ হইতেই নদীর অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে এবং কলিকাতা বন্দরেরও বিপদ অনিবার্য্য। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রবাদ যে, গঙ্গার ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে গঙ্গার মোহনার তলদেশ তাম্রের চাদরের দ্বারা আবৃত ছিল। ১২৯২ সালের ভূমিকম্পের সময় সেই চাদর বাহির হয় এবং উহাকে তুলিয়া অনেক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হয়। সেই চাদর উঠাইয়া লইবার পর হইতেই ভাগীরথীর দুর্দ্দশা হইয়াছে।"

সে কথা সত্য কি না বলা যায় না। কিন্তু এখন যে ভাগীরথী রক্ষা করিতে হইলে বাঁধ দিয়া তাহার জলধারা নিয়ন্ত্রিত করা ব্যতীত উপায় নাই, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। সে কথা সার উইলিয়ম উইলকক্স প্রথম বলিয়াছিলেন। তখন কিন্তু ভারত বিভক্ত হয় নাই। ভারত বিভাগের পরে কয় বৎসরের পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে, মুর্শিদাবাদে (ভারত রাষ্ট্রের সীমানায়) ফরাক্কা নামক স্থানে বাঁধ দেওয়াই প্রয়োজন। এখন দেখা গিয়াছে, ঐ স্থানে বাঁধ দিয়া দুই কাজ এক সঙ্গে করা সম্ভব—বাঁধের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিলে এক দিকে যেমন জল-নিয়ন্ত্রণ হয়, তেমনই দুই পারে গতায়াতের সুবিধা হয়।

এই উপায় অবলম্বনীয় কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশ জন্য আহূত হইয়া সার বিশ্বেশ্বরায় অল্পদিন পূর্ব্বে ফরাক্কা দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু বিহারবাসীকে বলিয়াছেন, যাহাতে সেতু ফরাক্কায় না করা হইয়া পাটনায় হয়, তাঁহারা সে জন্য আন্দোলন করুন।

ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের সেচ-সচিব শ্রীভূপতি মজুমদার ও পূর্ত্ত-সচিব কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ এক যৌথ বিবৃতিতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর [illegible]

যে সময় রেল পুনর্ব্বিন্যাসের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের লোক মনে করিতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে অবিচার করা হইয়াছে, সেই সময় কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির এইরূপ উক্তি অত্যন্ত অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক। বিশেষ প্রস্তাবিত সেতুর সহিত গঙ্গার বাঁধ জড়িত এবং গঙ্গার বাঁধ দেওয়া পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান জন্য একান্ত প্রয়োজন। যে কংগ্রেস প্রাদেশিকতার বিরোধী সেই কংগ্রেসের এক জন সেবক—বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি যে সেতু সম্বন্ধে প্রাদেশিকতাদুষ্ট উক্তি করিয়াছেন, ইহা একান্তই পরিতাপের বিষয়।

অবশ্য বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিম-বঙ্গকে ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিয়া বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে বিহারী সচিবরা যে হীন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহাই যে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, তাহার পর বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির এই আচরণে আমরা বিস্ময়ানুভব করিতেছি না। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা।

ফরাক্কায় যে বাঁধ দেওয়া হইবে, তাহা যদি সেতুর কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়, তবে তাহাতে বিহারের কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং এই প্রস্তাবে আপত্তি কেবল পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক—ইহাই পশ্চিমবঙ্গের সচিবদ্বয়ের বক্তব্য।

বিহারের উন্নতির জন্য যদি গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ প্রয়োজন হয়, তাহা নির্ম্মাণে কাহারও আপত্তি করার কারণ থাকিতে পারে না। বিশ্বেশ্বরায়ও স্বীকার করিয়াছেন, বিহারের একটি সেতু হইলে ভাল হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় সেতুতে বিহারের কি আপত্তি থাকিতে পারে ? পশ্চিম বঙ্গের প্রয়োজনে কলিকাতায় একটি, বালীতে একটি ও নৈহাটীতে একটি—এই ৩টি সেতু ইংরেজের শাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছে—বিহারের সেরূপ প্রয়োজন তখন অনুভূত হয় নাই ; নহিলে ব্যবসায়ী ইংরেজ তথায় একটি সেতু নির্ম্মিত করিতেন, সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গার জল নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। সে বিষয় সার উইলিয়ম উইলকক্স বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজ সরকার সে বিষয়ে অবহিত হ'ন নাই। তাঁহারা কোন রূপে কলিকাতা-বন্দর বজায় রাখিতেই ব্যস্ত ছিলেন—এমন কি ম্যাঞ্চেষ্টার খালের মত ডায়মণ্ডহারবার হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত খাল কাটিয়া কলিকাতায় বড় জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিবার কল্পনাও করিয়াছিলেন।

ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠায় ফলে এ বিষয় নূতন ভাবে বিবেচিত হইতেছে। কয় বৎসর বহু উপকরণ সংগ্রহের পরে স্থির হইয়াছে, ফরাক্কায় বাঁধ দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় ; সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঁধের উপর দিয়া রেল ও যাত্রী চলাচলের ব্যবস্থা করাও অল্পব্যয়সাধ্য। তাহাতেও যদি বিহারের আপত্তি হয়, তবে ভারতের ঐক্যের স্বরূপ কি, তাহা চিন্তা করিয়া আতঙ্কিত হইতে হয়।

আমরা আশা করি, বিহারে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ফরাক্কায় বাঁধ ও সেতু নির্ম্মাণের কার্য্যে বিলম্ব [illegible] করিবেন না। কিন্তু কে সে বিষয়ে অবহিত হইবেন ?

সচিবসঙ্ঘ গঠন—

নির্ব্বাচন-পর্ব্ব প্রায় শেষ হইয়াছে—এখন প্রদেশে প্রদেশে ও কেন্দ্রে সচিবসঙ্ঘ ও মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পর্ব্ব। এ বার কংগ্রেস অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়ী হইলেও—কোন কোন স্থানে তাহার পক্ষে সচিবসঙ্ঘ গঠন দুঃসাধ্য হইয়াছে। মাদ্রাজে সেই দুঃসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য করিবার ভার লইয়া আবার শ্রীরাজাগোপালাচারী আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই প্রথমে বাঙ্গালা ও পঞ্জাব মুসলমান-প্রধান করিয়া অবশিষ্ট প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। দেশ বিভাগের পরে তিনি প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও তাহার পরে বড়লাট হইয়া আবার কেন্দ্রী সরকারে সাধারণ মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং অবসর গ্রহণের সময় বলিয়াছিলেন—তিনি আর রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না। কিন্তু সে কথা ভুলিয়া তিনিই আবার মাদ্রাজে প্রধান-সচিব হইয়াছেন। তিনি মাদ্রাজে কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। পেপসুতে কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পতন হইয়াছে এবং বিরোধী দল সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিয়াছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসদলীদিগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইলেও এখনও সচিবসঙ্ঘ গঠিত হয় নাই। প্রথমে শুনা গিয়াছিল, প্রধান-সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার একটি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধারের আশায় য়ুরোপে যাইবেন এবং তিনি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘই বহাল থাকিবেন। যেন এক জন লোকের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে সচিবসঙ্ঘ! তাহার পরে প্রকাশ, তিনি য়ুরোপে যাইবেন না; য়ুরোপ হইতে চিকিৎসক আসিয়া ভারতেই তাঁহার চক্ষুর চিকিৎসা করিবেন এবং তাহার পরে তিনি সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিবেন!

যে সচিবসঙ্ঘ এখন কাজ করিতেছেন ও করিবেন, তাহার ৭ জন নির্ব্বাচনে পরাভূত। এই পরাভবের পরে কোন সচিবের পক্ষে আর এক দিনও কাজ করা সঙ্গত কি না এবং তাহা সচিবের পক্ষে আত্মসম্মান-জ্ঞানের পরিচায়ক কি না, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। তবে শুনা গিয়াছিল, কৃষি ও খাদ্য সচিব বলিয়াছিলেন, পরাভূত হইয়া তাঁহারা আর কাজ করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ যে সকল সদস্যে গঠিত তাঁহারা ভারত রাষ্ট্রের শাসনবিধি অনুসারে নির্ব্বাচিত হ'ন নাই। সে জন্যও তাঁহাদিগের স্থানে নূতন সচিব নিয়োগ সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে যাহা হইতেছে, আর কোন প্রদেশে তাহা হয় নাই।

হয়ত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী দলে দলাদলির জন্যই ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীদিগের মধ্যে কয় জন তাঁহার নিকট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পরিচালকদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাহা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নির্ব্বাচনে পরাভূত এক জন সচিবও যে জওহরলাল সেই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কর্ত্তাদিগকে কৈফিয়ৎ দিতে বলিয়াছেন। অভিযোগকারীরা সে বিলম্বও সহ্য করিতে চাহিতেছেন না।

বাইবেলের কথা—"If a house be divided against itself, that house cannot stand."

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কর্ত্তারা আবার সভা করিয়া আপনাদিগের প্রতি আস্থার প্রস্তাব গ্রহণ করাইয়া লইয়াছেন। বিরোধীরা বলিতেছেন, তাহাও অসিদ্ধ।

ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় নব-নির্ব্বাচিত কংগ্রেসপন্থী সদস্যদিগকে ডাকিয়া নানারূপ উপদেশ দিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে কার্য্যভার দিতেছেন না। তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচন প্রভৃতিতে ভোট দিয়াছেন বটে, কিন্তু সদস্য পদে এখনও কায়েম হ'ন নাই এবং তাঁহারা টাকা পাইতেছেন কি না, সন্দেহ। এই অবস্থা যে তাঁহাদিগের পক্ষে প্রীতিপ্রদ, তাহাও মনে হয় না। তাঁহারা যখন নির্ব্বাচকদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে প্রাপ্য অধিকারে এবং লোকসেবার সুযোগে বঞ্চিত করা কখনই শাসন-পদ্ধতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কংগ্রেসী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও কি সচিবসঙ্ঘ গঠনের পরে তাঁহাদিগের মধ্যে ভাঙ্গন ঘটিবার কোন আশঙ্কা প্রধান-সচিবকে আতঙ্কিত করিয়া সচিব-সঙ্ঘ গঠনে বিলম্ব ঘটাইতেছে?

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন ফল ঘোষণায় বিলম্ব হইয়াছিল। তাহা আলোচনার বিষয়ও যে হয় নাই, এমন নহে। তাহার পরে সচিবসঙ্ঘ গঠনে যে বিলম্ব হইতেছে, তাহাও অসাধারণ। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থার এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যে, সেই জন্য ব্যবস্থায়ও বৈশিষ্ট্য ঘটিতেছে?

সচিবসঙ্ঘ গঠনে যে বিলম্ব হইতেছে, তাহাতে একদিকে যেমন লোকের অনাস্থাভাজন সচিবদিগকে অনাস্থা উৎপাদক আরও কাজ করিবার সুযোগ বা ছাড় দেওয়া হইতে পারে, তেমনই নির্ব্বাচনে যাঁহারা আস্থাভাজন প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কাজ করিবার সুযোগে বঞ্চিত করা হইতেছে।

এ অবস্থা কোনরূপেই বাঞ্ছিত বলিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রতীকার কোথায়?

বার্ত্তাজীবি-সম্মিলন—

কলিকাতায় শ্রীচলপতি রাও মহাশয়ের সভাপতিত্বে বার্ত্তাজীবীদিগের বার্ষিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা সংবাদপত্রে বেতনভুক ভাবে কাজ করেন; তাঁহাদিগকে বার্ত্তাজীবী বলা হয়। সেইজন্য সংবাদপত্রের অধিকারীদিগের সংখ্যার তুলনায় বার্ত্তাজীবীদিগের সংখ্যা অধিক। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক গার্ডিনার বলিয়াছেন—Journalism was a profession; এখন ইহা বাণিজ্য। সাবানের কারখানার অধিকারী যেমন পণ্য বিক্রয় করিয়া

তেমনই লাভবান হইবার জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তখন সংবাদপত্র লোকের হিতসাধনকল্পে পরিচালিত হইত। অনেকে ত্যাগ স্বীকার করিয়া সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করিতেন।

সংবাদপত্র যখন বাণিজ্য ও সংবাদপত্রের উৎপাদন কারখানার কাজ হইয়াছে, তখন অধিকারীর সঙ্গে সাংবাদিকদিগের সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়াছে।

সেই সম্বন্ধ যাহাতে উভয় পক্ষেরই সম্মানজনক ও প্রীতিপ্রদ হয়, সংবাদপত্রের সুষ্ঠু পরিচালন জন্য তাহাই প্রয়োজন। বিশেষ অধিকারী অল্প, সাংবাদিক অনেক। অধিকারী নীতি প্রবর্ত্তিত করেন, সাংবাদিককে সেই নীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাজ করিতে হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন সুপরিচিত সংবাদপত্রে পরিচালকদিগের সহিত কর্ম্মচারীদিগের সঙ্ঘর্ষে ধর্ম্মঘটও হইয়া গিয়াছে। সেই ধর্ম্মঘটের ফলে কোন কোন সাংবাদিককে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

এইরূপ অবস্থায় সাংবাদিকদিগকে আপনাদিগের সঙ্গত স্বার্থরক্ষার্থ চেষ্টিত হইতে হইয়াছে। সম্মিলন সেই চেষ্টার ফল।

বিশ্বযুদ্ধের সময় এ দেশে যে সর্ব্বভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সম্পাদক অপেক্ষা অধিকারীর সংখ্যা অধিক—অধিকারীদিগের প্রভাব ও প্রতাপ অধিক।

তাহাও বার্ত্তাজীবি-সম্মিলন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। এই সম্মিলনে ভারত রাষ্ট্রের নানা প্রদেশ হইতে বহু সাংবাদিক সমাগত হইয়া আপনাদিগের প্রয়োজনের আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনে সরকারকে বার্ত্তাজীবিদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য এক সমিতি গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকে তাঁহারা কি করিবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে।

বার্ত্তাজীবিদিগের এই সম্মিলনে অবশ্যই তাঁহাদিগের কতকগুলি দাবী প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে তাহাও যে লাভ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

মাদকদ্রব্য বর্জ্জন—

নীতি হিসাবে ভারত সরকার মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মাদকদ্রব্য বর্জ্জন সম্ভব নহে। তবে পরীক্ষামূলকভাবে তাঁহারা মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর ২টি জিলায় বর্জ্জন-ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাতেই ৩ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গে তালগাছ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। তালগাছ অযত্নজাত হইলেও বিশেষ উপকারী। ইহাতে চাষের কোন অসুবিধা হয় না—কারণ, ইহা ছায়াবহুল নহে। তালগাছের [illegible] ক্ষতি [illegible] হয় এবং পাতার [illegible] আবরণ হয়। তদ্ভিন্ন তাল পাতায় টুপী হইতে ভ্যানিটী ব্যাগ করিয়া বিদেশেও চালান দেওয়া হয়। কেবল তাহাই নহে, অন্যান্য দেশে তালের রস হইতে চিনি, মিছরী, গ্লুকোজ ও ইষ্ট ট্যাবলেট প্রভৃতি ঔষধও প্রস্তুত করা হয়। গান্ধীজী যখন মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের জন্য ব্যাপক আন্দোলন করিয়াছিলেন, তখন অনেক উৎসাহী লোক তালগাছ কাটিয়া তাড়ির ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তালের রস অন্য কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয় নাই। এখন সরকার তাড়ির জন্য ব্যবহৃত তালগাছের লাইসেন্স এক টাকা হইতে তিন টাকা করিবার পর বার্ষিক ১২ টাকা ৮ আনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য তাড়ির ব্যবহার বন্ধ করা। কিন্তু সে উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে ছিল:—

গাছের লাইসেন্স	৩ টাকা
" ভাড়া	১ টাকা
৮টি হাঁড়ি	২ আনা
ছুরী	৫ আনা
দড়ি	২ আনা
বাঁশ	৪ আনা
	মোট—৪ টাকা ১৩ আনা

এখ[illegible]ইয়াছে—

লাইসেন্স	১২ টাকা ৮ আনা
ভাড়া	৫ "
হাঁড়ি	১ "
ছুরী	১ " ৮ "
দড়ি	৮ "
বাঁশ	১ "
	মোট—২১ টাকা ৮ আনা

ব্যয়-বৃদ্ধিতে পূর্ব্বে যে স্থলে হয়ত ৩ জন লোক দলবদ্ধ হইয়া তাড়ি খাইত সে স্থলে এখন হয়ত ৮ জন লোক দলবদ্ধ হইয়া তাহা করে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সকল গুড় প্রস্তুত করিবার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, সেই সকল সম্পর্কে যদি প্রতি ২০৩টি ইউনিয়নে একটি করিয়া তালের গুড় প্রস্তুত করিবার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে তাঁহারা লাইসেন্স দিবার সময় সর্ত্ত করিতে পারেন, প্রত্যেক গাছ হইতে প্রতিদিন যে রস হইবে, তাহা তথায় বিক্রয় করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তালের রস বা গুড় হইতে গ্লুকোজ, ইষ্ট ট্যাবলেট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিদেশে বিক্রয়ার্থ পাঠান হয়। সে সব ভারত রাষ্ট্রেও আমদানী হয়।

সেই সকল ভারতে প্রস্তুত হয় এবং যাহাতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার কমে সে জন্য তালের রসে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলে দেশের যেমন উপকার হয়, তেমনই সরকারেরও আর্থিক ক্ষতি হয় না।

আইন করিয়া মাদক দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করা কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা

পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ—

গত ১৩ই বৈশাখ 'যুগান্তর' পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—

"পর পর গত ২ বৎসর অজন্মার ফলে ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকার হাড়োয়ার কতকাংশ ও সন্দেশখালি থানার ১০টি ইউনিয়ন—বিশেষ এই থানার অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২শত বর্গমাইল এলাকায় ৬টি ইউনিয়নে হাটগাছি, বয়ারমারি, বীরমজুর, কালীনগর, তুষখালি ও আগরাতলা ইউনিয়নে প্রায় এক লক্ষ নরনারী আজ খাদ্য-সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। খাদ্য-সঙ্কটের ফলে এই এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী ঘাসের বীজ, হোগলার গোড়া, শিরীষ পাতার ঝোল প্রভৃতি অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইতে বাধ্য হইতেছে। দুরবস্থার এই শেষ নয়। অচিরে সেখানে সরকারী সাহায্য ও কৃষিঋণ না পৌঁছিলে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হইলে প্রকৃতির আনুকূল্য ঘটিলেও আগামী বৎসরে চাষের কোনরূপ সুবিধা হইবে বলিয়া ভরসা কম।"

কিছু দিন হইতেই সুন্দরবন অঞ্চলে খাদ্যাভাবের কথা শুনা যাইতেছিল। এত দিনে ২৪ পরগণা জিলা ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের উদ্যোগে কয় জন সাংবাদিক, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের কয়জন কম্যুনিষ্ট সদস্য (ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইলেও কার্য্যভার প্রাপ্ত হ'ন নাই), পার্লামেন্টে সদস্য নির্ব্বাচিত শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী (পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবের ভ্রাতুষ্পুত্রী), শ্রীমতী শৈল পেরেইরা, কুমারী মীরা রায় প্রভৃতি ঐ অঞ্চল পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, কলিকাতা হইতে মাত্র ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী এই অঞ্চলে অনাহারে লোক মরণাহত হইলেও এবং অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনরূপ উল্লেখযোগ্য সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন নাই; কোন সচিব যে তথায় গিয়াছিলেন, এমনও জানা যায় নাই। বর্ত্তমানে এক সচিবসঙ্ঘের অবসান হইলেও সেই সঙ্ঘই পদস্থ, আর নূতন সচিবসঙ্ঘ গঠিত না হওয়ায় অবস্থা কতকটা "no man's land" হইয়াছে। সুতরাং কি হইবে, বলা যায় না।

কলিকাতার নানা দলের দৈনিক পত্রে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যেকোন সভ্য দেশের পক্ষে কলঙ্কের কথা।

আবার শুনা যাইতেছে, বহু জমীদার ও মহাজন লাভের আশায় বাঁধের সংস্কার না করিয়া—ইহাতে লোণা জল প্রবেশপথ করিয়া তাহা চাষের অযোগ্য করিয়া—তাহাতে মৎস্যের "ভেড়ী" করিতে দিয়াছেন! মানুষে সকলই কি সম্ভব?

'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রতিনিধি লক্ষ্ণৌ হইতে সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন, যুক্ত-প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে বলিয়া সে প্রদেশের প্রধান-সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালকে অবিলম্বে সাহায্যদান করিতে লিখিয়াছেন এবং ভারত সরকার ছোট ছোট সেচ-ব্যবস্থার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেও তাহা, যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই। বিহারে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটিতে না ঘটিতে কেন্দ্রী সরকার তথায় প্রভূত পরিমাণ খাদ্যোপকরণ দিয়া লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

সেরূপ প্রশংসনীয় কাজ পশ্চিমবঙ্গে কেন হইতেছে না, তাহা জানিতে কৌতূহল অনিবার্য্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পা'ন নাই বা পাইয়াও কেন্দ্রী সরকারের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হ'ন নাই?

'ষ্টেটসম্যান' হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দৈনিকপত্রে এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরে, সরকার পক্ষ হইতে এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুন্দরবন অঞ্চলে এই অবস্থার বিষয় অবগত নহেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণতঃই দুর্ভাগ্য—কারণ, জমীতে একাধিক ফসল হয় না। তাহার উপর গত দুই বৎসর অনাবৃষ্টিতে ও বন্যায় দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অঞ্চলে বাঁধ সংস্কারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। তদ্ভিন্ন কৃষি ঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বসিরহাট মহকুমায় (কেবল দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলেই নহে) সরকার অনেক টাকা দিয়াছেন। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং লোককে অর্থ সাহায্য, কাপড় প্রভৃতি দেওয়া হইবে।

সুসংবাদ। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এই সকল সাহায্য প্রদানে বিলম্বের জন্য কে বা কাহারা দায়ী? পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটীর মুখপত্র বলিয়াছেন—সমবায় ও সাহায্যদান সচিব ডক্টর আমেদ ১৬ই বৈশাখ ঐ অঞ্চল পরিদর্শনে যাইবেন। ইনি এবারও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ মুখপত্রে আরও প্রকাশ—"প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী উক্ত খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চলের জনগণকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।" অবশ্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী ও সরকার অভিন্ন নহে। সুতরাং সরকারের কর্ত্তব্য কমিটী নির্ব্বাহিত করিতে পারেন না। তাঁহারা কি স্বতন্ত্রভাবে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবেন?

সরকার কি ভাবে সাহায্যপ্রদানের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা জানিবার বিষয়।

এখনও যদি সাহায্য দেওয়া হয়, তবে বলিতে হইবে—Better late than never.

ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা—

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে যখন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দু নরনারী সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়-সন্ধানে আসিতে থাকেন, সেই সময় তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' লোকের নিকট তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ প্রার্থনা করেন। ফলে, অল্প দিনের মধ্যে মোট এক লক্ষ ১৭ হাজার ৫ শত ৫ টাকা ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। সে টাকা ব্যবহারের কোন উপায় করিতে না পারিয়া তাঁহারা গত ৮ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ করিয়া উহা তাঁহার মারফতে রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রদান করেন।

বাস্তুহারাদের কার্য্যে প্রযুক্ত করিবেন। দরিদ্রদিগকে শিল্প শিক্ষা প্রদান-কল্পে উহা মিশন কর্তৃক—মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর ও হাওড়া মোটর কোম্পানীর বদান্যতায়, কয় বৎসর পূর্ব্বে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মিশনকে এই অর্থ প্রদান প্রসঙ্গে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে ভাণ্ডারের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও রাষ্ট্রপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় জন সরকারী ব্যবস্থার যে দুইটি ত্রুটির উল্লেখ করেন সে সম্বন্ধে সরকার কি বলিবেন?

তুষারবাবু বলেন—সংগৃহীত অর্থে বাস্তুহারাদিগের জন্য একটি আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। সে জন্য তাঁহারা মধ্যমগ্রামে ৬০ বিঘা জমী নির্ব্বাচন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে উহা ক্রয় করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। ঐ বৎসর জুলাই মাস হইতে পত্রালাপের পরে পর-বৎসর মার্চ্চ মাসে সরকার জানাইয়াছেন—ঐ জমী সংগ্রহের পথ এমনই বিঘ্নবহুল যে, সরকার তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে সরকার বলেন, কাশীপাড়ায় জমী পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাও হয় নাই। কেবল সরকারের সহিত পত্রালাপে দেড় বৎসর কাল নষ্ট হয়!

ইহা সরকারের ক্ষমতার অভাবদ্যোতক—কি মনোযোগের ও তৎপরতার অভাবব্যঞ্জক, তাহা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন।

অগত্যা ভাণ্ডারের কর্ত্তারা ভাণ্ডারের অর্থ রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়া দায়ভারমুক্ত হওয়া সুবুদ্ধির কাজ মনে করিয়াছিলেন।

ঐ উপলক্ষে রাষ্ট্রপাল বলিয়াছিলেন—তিনি ও তাঁহার পত্নী পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০টি উদ্বাস্তু কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছেন। (তিনি কি কাশীপুরে পাট গুদামে উদ্বাস্তু কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন?) তিনি দেখিয়াছেন, আমাদিগের মাতা ও ভগিনীরা অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় রহিয়াছেন, অনেকের একখানির অধিক বস্ত্র নাই। তাঁহার বক্তব্য—

সরকার উদ্বাস্তুদিগকে আশ্রয় ও খাদ্য দিবার জন্য আয়োজন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আবশ্যক বস্ত্র দিবার ক্ষমতা সরকারের নাই। তিনি বহু কাপড়ের কলের নিকট বস্ত্র চাহিয়াছেন, কিন্তু আশানুরূপ বস্ত্রলাভ করিতে পারেন নাই।

রাষ্ট্রপালের এই উক্তির সহিত সরকারের উক্তির সামঞ্জস্যসাধন কষ্টসাধ্য। তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু সরকার ও সচিবদলের মুখপাত্র কেবলই ঘোষণা করিতেছেন—সরকার উদ্বাস্তুদিগের জন্য অবাধে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেষ্টায় আন্তরিকতায় কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও বলা যায়, তাঁহাদিগের ব্যবস্থায় যে সকল ত্রুটি আছে, সে সকলের সংশোধন প্রয়োজন।

নারী শিক্ষায় উৎসৃষ্ট জীবন—

গত ২৫শে এপ্রিল বাঙ্গালায় নারীশিক্ষা বিস্তারে উৎসৃষ্ট-জীবন— অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই দিন তাঁহার অস্থি হরিদ্বারে গঙ্গাজলে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রদ্ধেয়া অবলা বসুর মৃত্যুর পরে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য যাহাতে সুপরিচালিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। এক বৎসরে যে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। তিনি যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া বিদ্যাসাগর বাণীভবন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, তাঁহার স্মৃতি যথাযথরূপে রক্ষিত হইবে।

গোরক্ষপুরে শোচনীয় ঘটনা—

যে সময় রেল-পথের পুনর্বিন্যাসহেতু রেল কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উত্তেজনার ও অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছে, সেই সময়ে যে গোরক্ষপুরে পুলিসের গুলীতে ১৪ জন রেলকর্ম্মী আহত হইয়াছেন এবং পরে তাঁহাদিগের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, এই সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি।

এক জন রেল কর্ম্মচারীর উদ্ধত ব্যবহারের প্রতিবাদে যাঁহারা ধর্ম্মঘট করেন, তাঁহাদিগের ৭০ জনেরও অধিক লোককে গ্রেপ্তার করায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা হইতে ধর্ম্মঘট ও গুলী চালনা হয়—এই সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে। ঘটনা ১২ই বৈশাখের। উভয় পক্ষের বিবৃতির অভাবে আমরা ঘটনা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা অসঙ্গত মনে করি। কিন্তু এইরূপ ঘটনা যে পরিতাপের বিষয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কাশ্মীর, ভারত ও পাকিস্তান—

ডক্টর গ্রাহাম কাশ্মীর সম্বন্ধে তাঁহার যে রিপোর্ট নির্ব্বিঘ্নতা পরিষদের অবগতির জন্য দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে আরও বিলম্ব অনিবার্য্য। প্রথম কথা—তাঁহার মতে, ভারতের ও পাকিস্তানের কাশ্মীরে অবস্থিত সৈন্যসংখ্যা আরও হ্রাস করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি ভাবে তাহা হইবে, তাহা তিনি বলেন নাই।

জম্মু ও কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্তানে বিরোধের বিষয় গত চারি বৎসর কাল অমীমাংসিত রহিয়াছে! রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথম প্রতিনিধি যখন পাকিস্তানকে কাশ্মীরের একাংশে অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়াছিলেন, তখনও কিন্তু জাতিসঙ্ঘ পাকিস্তানকে কাশ্মীর ত্যাগ করিতে ও সেই সময় গণভোট গ্রহণ করিতে বলেন নাই। যে সময় ভারতীয় সেনাবল পাকিস্তানের সেনাবলকে কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত করিয়া আনিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ভারত সরকারের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতা চাহিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হইতেছে না। যত দিন যাইতেছে, ততই কাশ্মীরের একাংশে পাকিস্তান দৃঢ়মূল হইবার সুবিধা পাইতেছে।

কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা এতদিন বলিয়া আসিয়াছেন, কাশ্মীর ভারত-রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রও কাশ্মীরের রক্ষার জন্য সেনাবল ও উন্নতির জন্য অর্থবল দিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি শেখ আবদুল্লা কিন্তু পাকিস্তান সীমান্ত হইতে ৩ মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী

সহিত সম্বন্ধ-বিষয়ে পূর্ব্বকথার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার সেই বক্তৃতার সুযোগ লইয়া পাকিস্তানের সংবাদপত্রে বলা হইতেছে, কাশ্মীর গ্রাস করাই ভারত সরকারের উদ্দেশ্য। সে বক্তৃতায় শেখ আবদুল্লার বন্ধু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও বিচলিত হইয়াছেন।

শেখ আবদুল্লা বলিয়াছেন, অনেক কাশ্মীরী মনে করেন, যদি পণ্ডিত জওহরলালের মৃত্যু বা পদচ্যুতি হয়, তবে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইলে কাশ্মীরের কি হইবে? কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান; তাহারা কি মনে করে, ভারত রাষ্ট্র হিন্দুপ্রধান হওয়ায় তথায় মুসলমান-দিগের অসুবিধা ঘটা অসম্ভব নহে এবং একা পণ্ডিত নেহরুর জন্যই ভারত রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হইতে পারিতেছে না?

এই উক্তি যে পাকিস্তানী যুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। শেখ আবদুল্লার যদি ভারত রাষ্ট্রের বিঘোষিত ধর্ম্মনিরপেক্ষতার নীতিতে আস্থা না থাকে এবং তিনি কেবল এক জন লোকের প্রতি আস্থাবান হ'ন, তবে যে, যে কোন সময়ে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে ভারত রাষ্ট্রের নীতি পরিচালন করিতেছেন ও করিবেন—ভারত রাষ্ট্র তাঁহার নীতি পরিচালন করিতেছে না ও করিবে না, তাহাই গণতন্ত্রের নিয়মানুমোদিত। সে অবস্থায় যদি শেখ আবদুল্লা মনে করেন, ভারতে কেবল পণ্ডিত জওহরলালই সাম্প্রদায়িকতার গতি রুদ্ধ করিয়া আছেন, তবে তাহা যেমন অসঙ্গত তেমনই নির্ভরের অযোগ্য।

শেখ আবদুল্লাই পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন, কাশ্মীর স্বেচ্ছায় ভারত রাষ্ট্রে যোগ দিয়াছে। আজ তিনি যেন সে কথা আর রক্ষা করিতেছেন না। যদিও তাঁহার বক্তৃতায় ভারতে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, তিনি কেবল কতকগুলি কাশ্মিরীর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, তাঁহার বক্তৃতার যে অর্থ অনেকে করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নহে।

বিশেষ শেখ আবদুল্লা বলিয়াছেন, কাশ্মীর সর্ব্বতোভাবে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে না—দেশরক্ষাদি কয়টি বিষয়ে হইবে। ভারত রাষ্ট্র—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে গঠিত হয় নাই, সুতরাং শেখ আবদুল্লার এই উক্তির কারণ কি?

কাশ্মীর-সমস্যা ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে কয় বৎসর বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়া আছে এবং কাশ্মীরের জন্য ভারত রাষ্ট্রের রক্ত ও অর্থব্যয়ও অল্প হয় নাই। যে সময় কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিয়াছিল, সেই সময়, যে উপায়েই কেন হউক না, কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান করা ভারত সরকারের কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা তখন তাহা করেন নাই, সেই জন্যই দীর্ঘ চারি বৎসরকাল অনিশ্চিত অবস্থায় বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে।

শেখ আবদুল্লা তাঁহার বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় যেন বিব্রত হইয়াছেন। তিনি এখন ভারতের লোকদিগকে—বিশেষ সংবাদপত্রসমূহকে সতর্কভাবে মত-প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভারতে সংবাদপত্র-সমূহ এ বিষয়ে বিশেষ ধৈর্য্য ও সতর্কতাই অবলম্বন করিয়াছেন। তবে তাঁহারা তাঁহাদিগের সরকারের কার্য্যের সমালোচনায় অধিকার বর্জ্জন করেন নাই। আশা করি, শেখ আবদুল্লা তাহা করিতে বলিবেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বিদ্বেষ—

দক্ষিণ আফ্রিকায় উদ্ধত শ্বেতাঙ্গদিগের বর্ণ-বিদ্বেষ যে তথায় ভারতীয়দিগের নানা লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছে, সে সুদীর্ঘ কথার আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই। অথচ ভারতীয়রা সে দেশের সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় যে সাহায্য করিয়াছে, তাহা অসাধারণ। ভারতবর্ষ, যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখনও ভারতের বিদেশী সরকার সেই লাঞ্ছনা মনুষ্যত্বের অপমান বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রথম বুয়র যুদ্ধের সময় ইংরেজ তাহা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সেই অবস্থার প্রতীকার সাধন যে সম্ভব হয় নাই, তাহার কারণ, শ্বেতাঙ্গদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের হীন দৌর্ব্বল্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাতিরিক্ত বর্ণের লোকদিগকে নানা অধিকারে বঞ্চিত রাখা হয়—বাসস্থানের ব্যবস্থা সে সকলের অন্যতম।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ত্তমান সরকার শ্বেতাতিরিক্ত বর্ণের লোকদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে স্বতন্ত্র তালিকাভুক্ত করিয়া তাহাদিগের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সে দেশের বিচারালয় সে ব্যবস্থা আইনসঙ্গত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও সরকার আদালতের নির্দ্ধারণ স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া বিচারালয়ের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন। সরকার তাঁহাদিগের নীতির পরিবর্ত্তন করিতে অসম্মত। এ সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ সঙ্ঘবদ্ধভাবে করিবার আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে কাফ্রীরা ভারতীয়দিগের সহিত একযোগে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মনে হয়, এ বার প্রতিবাদ প্রবল হইবে।

এ বিষয়ে ভারত সরকার কি করিবেন, জানা যায় নাই। তবে ভারত রাষ্ট্রের সহানুভূতি যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাতিরিক্ত বর্ণের অধিবাসীরা অকুণ্ঠভাবে পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত সরকার সেই সহানুভূতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন কি?

এ বিষয়ে সমগ্র এসিয়ার মত কি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না?

সিংহলে ভারতীয়—

সিংহলে বহু ভারতীয়ের বাস। কিছুদিন হইতে ভারতীয়দিগের অধিকার-সঙ্কোচের চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। এ বার সিংহলের সরকার যে সকল ভারতীয় তথায় বাস করিয়া সিংহলের অধিবাসীর অধিকার চাহিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিদেশী বলিয়া সে সকল অধিকারে বঞ্চিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই কাজ আইনসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও আইন ত সিংহল সরকারের! সিংহল সরকারের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে ভারতীয়গণ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এখন বিবেচিত হইতেছে।

১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম।. বললাম—আমার কাছে কারও ঋণ নেই, কারও কাছে আমার ঋণ নেই; আমি সমস্ত কিছুকে অতিক্রম ক'রে এসেছি। তুমি ফিরে যাও।" সে ফিরে গেল। ঋণ আমার নেই। তিনি একটা প্রশান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইলেন।

অরুণা এতক্ষণ প্রায় শ্বাস রুদ্ধ করিয়া এই দীর্ঘ ইতিহাস শুনিতেছিল। অসংখ্য প্রশ্ন তার অন্তরের মধ্যে উঠিয়া একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু সে সব প্রশ্ন তুলিয়া এই ক্লান্ত অবসন্ন মানুষটিকে বিব্রত করিতে চাহিল না। শুধু বিষণ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটি হাত বরাবরই সে তাঁহার পায়ের উপর রাখিয়াছিল, সে পায়ে উষ্ণতা নাই, শীতল। এতক্ষণ এই বিচিত্র উপাখ্যান বা ইতিহাস শুনিতে বসিয়া সে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে এটা তাহার সচেতন উপলব্ধির মধ্যে এক বিন্দু সাড়া তুলিতে পারে নাই। এইবার তাহার সে খেয়াল হইল। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ওই বিচিত্র বৃদ্ধের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু সে সমস্ত জানিয়া বুঝিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? একজন চিকিৎসকের সাহায্যের প্রয়োজন যে অবিলম্বে! কিন্তু এই রাত্রির শেষ প্রহরে এই হিংসা-উন্মত্ত দাঙ্গার সময়ে কোন চিকিৎসক আসিবে? আসিতে পারিত এক দেবকী সেন। কিন্তু সে—! একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে সন্তর্পণে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে রামভল্লা আছে—তাহাকে একবার পাঠাইলে হয় না? কিন্তু কাহার কাছে! সুরপতিবাবুর কাছে পাঠাইতে পারে! দেবুবাবুর কাছেও পাঠাইলে হয়। তাঁহারা কোন চিকিৎসক অবশ্যই লইয়া আসিবেন। বাহিরে আসিয়া সে দাঁড়াইল।

রামভল্লা গভীর ঘুমে তাহার বিরাট দেহখানাকে এলাইয়া দিয়াছে। নাক ডাকিতেছে। অনেক ভাবিয়া সে তাহাকে গায়ে ঠেলা দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—রাম! রাম! রাম!

রামভল্লা ঘুমাইয়া পড়িলেও মনের মধ্যে দাঙ্গার ভাবনা লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গায়ে ঠেলা পাইয়া জাগিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, শুধু তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা আচমকা হাঁক দিয়া উঠিল যে—অরুণার লজ্জার সীমা রহিল না। আশঙ্কাও হইল যে, হয়তো ন্যায়রত্ন চঞ্চল হইয়া উঠিবেন। হয় তো সেই চাঞ্চল্যে তিনি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবেন। সে তাড়াতাড়ি মৃদুস্বরেই রামকে বলিল—চুপ কর রাম; ভয় নেই। চুপ কর! আমি—আমি! ভয় নেই।

রাঙা চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া রাম বলিল—মা! তুমি!

অরুণা মুখ ফিরাইয়া ঘরের ভিতরের দিকে চাহিয়া ন্যায়রত্নকে দেখিয়া লইয়া বলিল—হ্যাঁ আমি। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল সে। ন্যায়রত্ন স্থির হইয়া শুইয়া আছেন।

রাম বলিল—ডাকলে কেন মা?

—আস্তে বাবা। ঠাকুরের ঘুম ভেঙে যাবে। সবে এই একবার তাঁর তন্দ্রা এসেছে।. সমস্ত রাত্রি ঘুমান নি। একবার লাইন পার হয়ে ওপারে যেতে হবে বাবা। ঠাকুরের শরীরটা খারাপ হয়েছে। আমার যেন কেমন ভাল লাগছে না। হাত ঠাণ্ডা—পা ঠাণ্ডা। মধ্যে মধ্যে—বকছেন বিড় বিড় করে।

রাম ভুরু কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করিল—ঠাকুর নিজে কি বলছে গো? ওনাকে জিজ্ঞেসা করেছ?

—করেছি।

—কি বললেন?

অকস্মাৎ অরুণার বুকের মধ্যে আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কথা বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখ দিয়া জল গড়াইয়া আসিল।

—কাঁদছ কেনে? কি বলছে ঠাকুর?

প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া অরুণা বলিল—উনি বলছেন—

—কি বলছেন? দেহ রাখবেন?

—হ্যাঁ।

—তা যদি ব'লে থাকেন—তবে—। বার কয়েক ঘাড় নাড়িয়া রাম হাসিয়া বলিল—তবে আর এই রেতে ছুটে গিয়ে কি হবে? ওঁকে শুধিয়েছ?

—ওঁকে কি শুধাব রাম?

—এই দেখ—ওঁকে না শুধিয়ে ডাক্তার বদ্যি ডাকে? উনি যদি বলেন—কেনে ডাকলে?

—আমার মন যে মানছে না বাবা। তা ছাড়া অজয় ফিরে এসে যদি বলে—তুমি ডাক্তার ডাকলে না কেন?

—বলবে, উনি মানা করেছিলেন। চল—আমি শুধাই—। বলিয়া সে অরুণার সম্মতির অপেক্ষা করিল না, ভিতরে আসিয়া ডাকিল—তাহার স্বভাবসিদ্ধ উঁচু মোটা গলায় ডাকিল—ঠাকুর মশাই। বাবাঠাকুর!

—কে? ন্যায়রত্ন চোখ মেলিলেন।

—আমি রামভল্লা।

—কি?

—বলছি। আমার দেবতা মা বলছে—বদ্যি ডাকতে। বলছে—আপনি নাকি বলেছেন যে—এই বারে নাকি দেহ রাখবেন!

ন্যায়রত্ন হাসিলেন। বলিলেন—বদ্যি ডাকতে চায় অরুণা?

—হ্যাঁ।

—কি দরকার? কই অরুণা, কই?

—বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে হয় তো! ও দেবতা-মা! শুনছ গো!, ঠাকুর ডাকছেন। ভেতরে এস।

অরুণার আর অস্বস্তির সীমা ছিল না। এই রামটা কি মানুষ! ছি-ছি-ছি!

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—অরুণা!

অরুণা চোখ মুছিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

—তুমি চিকিৎসক ডাকতে চাও?

রাম বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ বলছেন, অজয় এসে যদি বলে—ডাক্তার ডাকনি কেন? তখন আমি কি জবাব দেব?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ। অরুণা সত্য বলেছে। কালের পরিবর্ত্তন হয়েছে। মহাগ্রামের ঠাকুরবংশের দীক্ষায় শিক্ষায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। হ্যাঁ—এ কথা অজয় বলতে পারে। আশ্চর্য্যের কথা নয়।

—তবে যাই, ডেকে আনি।

—এখন কত রাত্রি?

—শেষ প্রহর।

—তবে অপেক্ষা কর রাম। সকালে গিয়ে ডাকবি। বিলম্ব আছে এখনও।

—তবে আমি গিয়ে শুই গে। না কি?

—হ্যাঁ। তবে—যখন যাবি—তখন আর এক কাজ করবি রাম।

—কি বলেন।

—দেবু পণ্ডিতকে ডেকে আনবি।

—দেবু পণ্ডিত কে?

—হ্যাঁ।

—এই দেখ বাবা! সে মতিভ্রষ্টটাকে আবার কেনে গো? সে দুয়োরে দুয়োরে ফিরচে—আর বলছে—মুসলমানদের সঙ্গে মিটমাট কর। মিটমাট কর। মিটমাট কর। মিটিং কর।

—ভালই বলছে সে। মন্দ তো বলে নি।

—না বাবা। মানতে পারলাম না। তুমি যখন বল মিটমাটের কথা—তখন তার মানে বুঝি। কিন্তু দেবুর ও কথার মানে বুঝতে পারি না। কেনে বুঝতে পারি না জান? ও বলে কি? ও বলে—দোষ মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুর বেশী। ও আমি বুঝতে লারি। দাঙ্গা মন্দ—রক্তপাত ভাল না—এ কথা বুঝতে পারি; কিন্তু যে বলে—হিন্দু-মোসলমানে দাঙ্গা কর না, হিন্দু-মোসলমানে মিলে—ভদ্দলোক দিগে মার, ওই দেবু ঘোষ যাকে যাকে দেখিয়ে দেবে তাকে তাকে মার—তাদের সঙ্গে দাঙ্গা কর—তাঁর কথা কি করে মানব বল!

ন্যায়রত্ন ইতিমধ্যেই আবার ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া

পড়িয়াছেন। চোখের পাতা দুইটি আবার নিমীলিত হইয়া গিয়াছে। আবার তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

অরুণা অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল—আর নয় বাবা রাম। বলিয়া সে মুদিত চক্ষু দুটির পানে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল। রাম অপ্রসন্ন মুখে বাহিরে গিয়া আবার একবার শুইয়া শরীরটাকে এলাইয়া দিল। নিজের মনেই বক্ বক্ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

* * * *

অরুণাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রির শেষ প্রহরের একেবারে শেষের দিকে ন্যায়রত্ন যেন বেশ একটু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিশ্বাস বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। একসময় মনে হইল নাক ডাকিতেছে। হ্যাঁ! নাক ডাকিতেছে! অতি মৃদু! সে আশ্বস্ত হইয়া—বিছানারই একপাশে শুইয়া পড়িল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘুম ভাঙিল রামভল্লার ডাকে। তখন প্রভাতালোকে ঘরখানা ভরিয়া গিয়াছে। ন্যায়রত্ন প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। ঘরে প্রবেশ করিতেছে অজয়। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেবু ঘোষ এবং জংসনের প্রাচীন কবিরাজ দ্বারিক সেন।

অজয় মুক্তি পাইয়া ভোরের বাসে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ন্যায়রত্ন ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—এস অজুমণি এস। তোমার প্রতীক্ষাতেই বোধ করি দেহ ধারণ করে রয়েছি।

অজয় বলিয়া উঠিল—কেমন আছেন ঠাকুর?

—এখন ভাল। মাকে প্রণাম কর। প্রণাম কর।

ক্ষীণ প্রসন্ন কণ্ঠস্বর, মনে হয় দূর দূরান্তর—বা কাল কালান্তরের পার হইতে ধ্বনিত হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মর্মবাণী

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

মরমের পাত্র হ'তে যে সুধা ক'রেছ দান
সে কি বৃথা হবে?
কেহ জানিবে না কভু, কেহ করিবে না পান
মনি-মধু-চক্র মাঝে গোপনে লুকায়ে রাখা
সে কি ঠিক হবে?
গুপ্ত-মণি-কক্ষ-পটে যে ছবি রচিলে
জীবনের মাধুরী মিশায়ে,
কেন তারে ঢেকে রাখা চুপে অন্তরালে
কেন মিছে ব্যথা পাওয়া নীরবে নিভৃতে
অবমান ভয়ে!
যাহা জানাবারে চাও, চাও জানিবারে,—
কেন তারে দাও নাই ভাষা,
যার লাগি হিয়া তব অলখে কাঁদিয়া ফেরে,—
তার সুধামাখা দুটি মধু বাণী শুনে
পাবে না কি আশা?
মানস প্রদীপ জালি যা'রে নিবেদিলে প্রাণ
পূজিলে যতনে,
সে কি শুধু আপন অন্তরে রহিবে অম্লান,
চিরদিন রবে শুধু হাসি দিয়ে ঢাকা,
চির-সংগোপনে?

কাল রজনীতে

সন্তোষকুমার অধিকারী

কাল রজনীর ঝোড়ো বেদনায় আকাশ কেঁদেছে মোর
লুটিয়া লুটিয়া গরজি' উঠেছে বাতাসেরা নিশি ভোর,
ক্ষুব্ধ মেঘের অশ্রু সজল ব্যাকুল নয়ন ভরি
ঘন দুর্য্যোগে বেদনায় কাল গেছে মোর শর্বরী
ঝড় এসেছিলো অঙ্গনে আর এসেছিলো গৃহবাসে,
সুলতা গো, আজ সে কথা শোনাতে হৃদয় যে কাঁপে ত্রাসে।

নয়নের মেঘ দুলে উঠেছিলো রোষে ক্ষোভে বেদনাতে
আঘাতে আঘাতে ব্যাকুল বাতাস ছুঁয়ে গেলো চোখে চোখে
কাঁপন লেগেছে ঘন কেশভারে, লেগেছে আঁখির পাতে
রুষিয়া উঠেছে দুর্ব্বার মন কামনার ছায়ালোকে।
দেহের কিনারে মত্ত ঢেউয়ের বেজেছে কি কলরোল
কাল রাতে ঝড় মুছে দিয়ে গেছে নয়নের কজ্জল।

দুরু দুরু বুক কেঁপেছে সলাজ বেদনায় নিশি ভোর,
(সুলতা) তবু যে মুছে গেছে কাল আঁখি কজ্জল মোর
উত্তাল বুকে কান পেতে পেতে শুনেছি কলোচ্ছ্বাস।
দুর্য্যোগে একা খুঁজেছি রাতের অরণ্য ইতিহাস।
এ' পৃথিবী যদি ভেঙে ডুবে যেতো কাল রজনীর ঝড়ে।
সুলতা গো, মোর অভিযোগ কিছু রহিতোনা তব পরে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

হকি লীগ ঃ

১৯৫২ সালের ক্যালকাটা হকি লীগের প্রথম বিভাগের খেলায় মোহনবাগান ক্লাব অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে স্থানীয় ভারতীয় দলের পক্ষে উপর্যুপরি দু'বছর লীগ পাওয়ার রেকর্ড স্থাপন করেছে। এই নিয়ে মোহনবাগান মোট তিনবার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'ল। প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় ১৯৩৫ সালে অপরাজেয় সম্মান নিয়ে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫১ সালে, হার মাত্র একটা খেলায়। ভারতীয় দলের পক্ষে বেশীবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ডও মোহনবাগান দলের। এ পর্য্যন্ত লীগে রানার্স-আপ হয়েছে চারবার—১৯৪৫, ১৯৪৮, ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে। ১৯৫০ সালে কাষ্টমস লীগ চ্যাম্পিয়ান হলেও অপরাজেয় সম্মান পায়নি কিন্তু মোহনবাগান রানার্স-আপ হয়েও শেষ পর্য্যন্ত কোন খেলায় হারেনি। স্থানীয় ভারতীয় দলের পক্ষে মোহনবাগান দলের সাফল্য হকি খেলার ইতিহাসে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বাংলার তরুণ সমাজকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই, ক'লকাতা তথা বাংলা দেশের হকি খেলায় বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের দান নেই বললেই চলে। অতীতে সুদীর্ঘ কাল ধরে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়রাই প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন। বিগত চারটি বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলে বাংলা থেকে মোট ১৪জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ১২জন খেলোয়াড়ই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন, বাকী দু'জন অবাঙ্গালী। উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক সফরে ভারতীয় হকি দলে এ পর্য্যন্ত মাত্র তিনজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন।

আলোচ্য বছরের হকি লীগের খেলায় মোহনবাগান দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড সি এস গুরুং তাঁর হ্যাট-ট্রিক সমেত ৩৭টি গোল দিয়ে সর্ব্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ
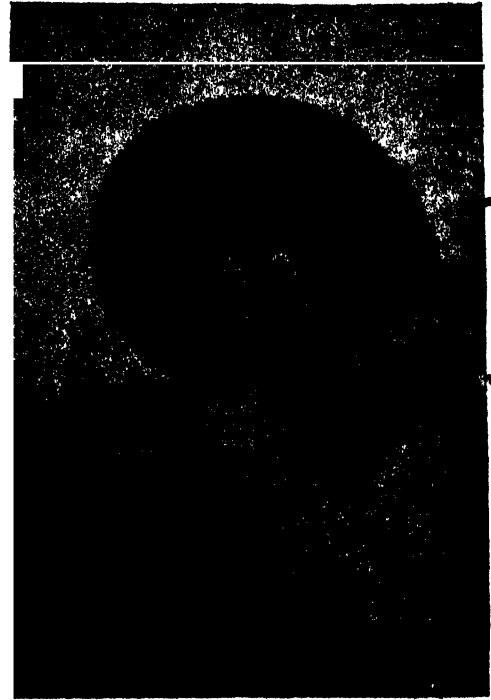
প্রথম বাৎসরিক নিখিল ভারত বন্দুক চালনা প্রতিযোগিতায় মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী গীতা রায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে খেলাধূলায় বাঙ্গালা দেশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন

করেছেন। গুরুংয়ের এই হ্যাট-ট্রিক হকি লীগের ইতিহাসে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। গোল এভারেজে দেখা যায়, মোহনবাগান এবার

৩৬টি গোল দিয়ে মাত্র ৪টি গোল খেয়েছে—ইস্টবেঙ্গল, গ্রীয়ার, মেসারার্স ও কাষ্টমসের কাছে। এই চার দলের সঙ্গে খেলার ফলাফল দাড়িয়েছে, মোহনবাগানের জয় ৪টিতে ড্র ১টিতে। ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১, গ্রীয়ারকে ৫-১ এবং মেসারার্সকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে। মোট ১৯টি খেলায় মোহনবাগানের জয় ১৬টি এবং ড্র ৩টি—মহমেডান স্পোর্টিং, আর্মড্‌পুলিশ এবং কাষ্টমসের বিপক্ষে যথাক্রমে ০-০, ০-০ এবং ১-১ গোলে। এ বছরের রানার্স-আপ কাষ্টমস্ ক্রীড়া-মহলে এক-সময়ে দুর্দ্ধর্ষ দল হিসাবে সুদীর্ঘকাল আধিপত্য বজায় রেখেছিল।

এ বছর প্রথম বিভাগ থেকে পার্শী এবং ক্যালকাটা দ্বিতীয় বিভাগে নেমেছে এবং দ্বিতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে উঠেছে এরিয়ান্স এবং হাওড়া ইউনিয়ন।

১৯৫২ সালের জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতার বিজয়ী বোম্বাই দল ফটো—পান্না সেন

৭।৫।৫২

দ্রষ্টব্য—এই সংখ্যায় স্থানাভাবের জন্য খেলাধূলার অন্যান্য খবর দেওয়া সম্ভব হ'ল না, আগামী সংখ্যায় থাকবে।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে 'ভারতবর্ষ' চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। বিগত ৩৯ বৎসর যাবৎ 'ভারতবর্ষ' বাংলা সাহিত্যের কিরূপ সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগোষ্ঠীর অবিদিত নয়। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্বের মতোই সহযোগিতা করিবেন। ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৭৷৷০ (+ মণিঅর্ডার ফি ৵০) ও ভিঃ-পিঃতে ৮৴০। ষাণ্মাসিক মণিঅর্ডারে ৪৲, +(মণিঅর্ডার ফি ৵০)—ভিঃ-পিঃতে ৪৷৷০, ডাকবিভাগের নিয়ম অনুসারে গ্রাহকগণের নিকট হইতে অনুমতি পত্র না পাইলে ভিঃ-পিঃ পাঠানো যাইবে না। সেইজন্য ভিঃ-পিঃতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক। তাহা ছাড়া ভিঃ-পিঃর কাগজ পাইতে অনেক সময় বিলম্ব হয়, ফলে পরবর্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়।

আমরা সকল গ্রাহককে আগামী ২০ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করিতে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। যাহারা ভিঃ-পিঃ করিবার জন্য পত্র দিবেন শুধু তাঁহাদিগকেই ভিঃ-পিঃতে কাগজ প্রেরণ করা সম্ভব হইবে।

আশা করি গ্রাহকগণ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আগামী বৎসরের চাঁদা (গ্রাহক নম্বর সহ) মণিঅর্ডারে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকই অনুগ্রহপূর্বক মণিঅর্ডার কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এম-এল-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।